বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

(ইংরেজপ্রভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত।)

"নানান্ দেশের নানান্ ভাষা।
বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা॥"

নিধুবাবু।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, বি. এ., প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।
(পরিশোধিত পরিবর্দ্ধিত)
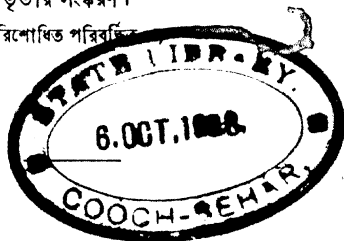
প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্—কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্—এলাহাবাদ।

মূল্য— ৪৲ চারি টাকা।

এলাহাবাদ
৩, পাইওনিয়ার রোড, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে
শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র দ্বারা মুদ্রিত
ও
কলিকাতা, ৭৩।১, সুকিয়া ষ্ট্রীট,
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্ কর্তৃক প্রকাশিত।

উৎসর্গ-পত্র।

অশেষ-গুণ-সম্পন্ন চন্দ্রবংশাবতংস প্রজারঞ্জক

স্বাধীন-ত্রিপুরার শ্রীশ্রীমন্মহারাজ

বীরচন্দ্রমাণিক্য দেব-বর্ম্মণ বাহাদুরের

শ্রীকর-কমলে,

ভক্তি ও কৃ[illegible]হ্ন-স্বরূপ

এই সামান্য পুস্তক

উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা।

অদ্য ছয় বৎসর হইল, একদিন আমার পুস্তকাধারস্থিত অতি জীর্ণ, গলিত-পত্র, প্রেমাশ্রুর নীরব নিকেতন চণ্ডীদাসের গীতিকবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা জন্মে; ভিক্টোরিয়া স্কুলের সেই সময়ের সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিত ৺ চন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থের সাগ্রহ প্রবর্ত্তনায় এই ইচ্ছা সুদৃঢ় হয়। বৈষ্ণবকবিগণের গীতি, কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসান ও অপর কয়েকখানি বটতলার ছাপা পুঁথিমাত্র আমার সম্বল ছিল, আমি তাহা পড়িতাম ও কিছু কিছু নোট সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম। ১৮৯২ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতার সিন এসোসিয়েসন হইতে বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখককে "বিদ্যাসাগর-পদক" অঙ্গীকার করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, এই সুযোগ পাইয়া তিন মাস কাল মধ্যে আমি সংক্ষেপে বঙ্গভাষা বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখি, উক্ত সমিতি আমার প্রবন্ধটি মনোনীত করিয়া "বিদ্যাসাগর-" আমাকে প্রদান করেন।

এই প্রবন্ধ রচনার সময় রতিদেব কৃত 'মৃগলব্ধের' একখানি প্রাচী
দৈবক্রমে আমার হস্তগত হয়, এবং বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হই যে
পল্লীতে পল্লীতে অনেক অপ্রকাশিত প্রাচীন পুঁথি আছে; এই
স্থানে পর্য্যটন করিয়া সঞ্জয়কৃত মহাভারত, গোপীনাথদ
শকুন্তলা, দ্বিজ কংসারির প্রহ্লাদচরিত্র, রাজারাম দ
মহাভারতোক্ত উপাখ্যান, প্রভৃতি বিবিধ হস্তলিখি
বঙ্গভাষার একখানি বিস্তৃত ইতিহাস লিখিবার স
আশ্রয় হইতে সুদূরে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে যে সব
হইয়া কোনরূপ প্রাণরক্ষা করিতেছে, সেগুলি
বৎসর কীট অগ্নি ও শিশুগণ কর্ত্তৃক উহারা
কিরূপে রক্ষা হয়? আমি এই বিষয় চিন্ত
মেম্বর ডাক্তার হোরন্‌লি সাহেবের নিক

তিনি প্রত্যুত্তরে আমাকে বিশেষরূপ ধন্যবাদ ও উৎসাহ দিয়া সাহায্য অঙ্গীকার করেন; এই সূত্রে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার পত্র-দ্বারা পরিচয় হয়; তিনি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য উদ্ধার করিতে ইতিপূর্ব্বেই উদ্যোগী ছিলেন,—আমার প্রতি তিনি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তাঁহার উপদেশানুসারে এসিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত শ্রীমান্ বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ আমার সহায়তার জন্য কুমিল্লায় আগমন করেন। আমরা উভয়ে মিলিয়া পরাগলী (কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত) মহাভারত, ছুটিখাঁর (শ্রীকরণ নন্দীর রচিত) অশ্বমেধপর্ব্ব প্রভৃতি আরও অনেক পুঁথি সংগ্রহ করি। বিনোদবাবু মধ্যে মধ্যে আসিয়া কতদিন কাজ করিয়া চলিয়া যাইতেন; কিন্তু আমি বৎসর ভরিয়া ত্রিপুরা, নোয়াখালী, শ্রীহট্ট, ঢাকা প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের নানা জেলা হইতে পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি, মধ্যে মধ্যে আমার খুল্লতাত শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর সেন, ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, মহাশয়ের সঙ্গে মফঃস্বলে ক্যাম্পে বাস করিয়া ক্রমাগত পর্য্যটন করিয়াছি। এই সময় কবি আলওয়াল কৃত পদ্মাবতী, রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল কৃত কাশীখণ্ড, রামেশ্বর নন্দীর মহাভারত, মধুসূদন নাপিত প্রণীত নলদময়ন্তী, প্রভৃতি গ্রন্থ মৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত পুস্তকের কয়েকখানি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অপরাপর কোন কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।* পল্লীগ্রামে হস্তলিখিত পুঁথি খোঁজ করা অতি বিশেষতঃ প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের ঘরে সাগ্রহ যুক্তি, তর্ক ও বুদ্ধির কৌশল অনেক সময়েই তাঁহাদের কুসংস্কারের [illegible] পারে নাই, তাঁহারা কোন ক্রমেই পুস্তক দেখাইতে সম্মত হয় পড়িলে কেহ কেহ তাড়কের ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া [illegible]০ মাইল পদব্রজে গমন ও সেই [illegible]০ মাইল পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন [illegible] ইহা ছাড়াও কোন কোন সময় নানারূপ বিপদে পতিত ত্রিপুরা জেলার মেহেরা গ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ঝড় ও অন্ধকারে বিরলবসতি জঙ্গলের পথে প্রায়

[illegible]রত", ভাদ্রে "প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য ও ধনরাম," [illegible] "ছুটিখাঁর মহাভারত", পৌষে "[illegible] কৃষ্ণকমল কাব্য" এবং [illegible] সনের জ্যৈষ্ঠে "ছুটিখান [illegible]র রাজকবি" ও চৈত্রে পরাগলী- মহাভারত

তিন ঘণ্টাকাল যে ভাবে হাঁটিয়াছিলাম, তাহা সেই দিনের সঙ্গী শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বর্ম্মণ এবং আমার মনে চিরদিন মুদ্রিত থাকিবে। কিন্তু এই সব বহুদর্শিতার মধ্যে মধ্যে সুখের কথা না আছে, এমন নয়; পাহাড়-বেষ্টিত দেশের পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ মধ্যে মধ্যে বড় প্রীতিকর হইয়াছে। ঘন শ্যাম পত্রাচ্ছাদিত চিত্রপটের ন্যায় সারি সারি তরুশ্রেণী, মধ্যে মধ্যে নির্ম্মল পুকুরের জলে ঝাপটা বাতাসে নির্ম্মল ঢেউ উঠিতেছে, তাহাতে সপত্র পদ্মফুলগুলি এক এক বার ডুবিয়া যাইতেছে, ও কিঞ্চিৎ পরে সুন্দরীগণের ন্যায় মুখ দেখাইতেছে—দূর নীল গগনের সঙ্গে মিশিয়া ভূসংলগ্ন মেঘপংক্তির ন্যায় পাহাড়রাজি বিরাজিত; পল্লীললনাগণের সরল অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য, পল্লী-কৃষকগণের সরল কৌতূহলাক্রান্ত দৃষ্টি, এইসব এখনও কোন অভিনয়ের দৃশ্যপটে অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় স্মৃতিতে জাগরূক রহিয়াছে।

এই ছয় বৎসরের চেষ্টায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথমভাগ অদ্য পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি। এই পুস্তকে ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া, সাময়িক আচার ব্যবহার, দেশের ইতিহাস ইত্যাদি নানারূপ প্রসঙ্গ সম্বন্ধে আলোচ্য গ্রন্থগুলিতে যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রথম তিন অধ্যায়ে ভাষার উৎপত্তি, বিভক্তি চিহ্ন প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিয়াছি। পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে সাহিত্যের আলোচনা করিয়া অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ভাষা, সামাজিক আচার, ঐতিহাসিক বিবরণগুলি ও অপ্রচলিত শব্দার্থের তালিকা প্রদান করিয়াছি। যে সব শব্দ ভিন্নার্থ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাও সেই সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। এই কার্য্যের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে; ছাপা পুস্তক হইতে হস্তলিখিত পুস্তকেরই অধিক আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছে। ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দ্বারা দুই তিন শত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত তাম্রকূটপত্রসমষ্টির ন্যায় পুঁথির পাঠোদ্ধার করা সুকঠিন ব্যাপার, রোগীর দেহে হস্তক্ষেপ করার ন্যায় অতি সাবধানে পত্রগুলি উল্টাইয়া অগ্রসর হইয়াছি। এই ছয় বৎসর নানারূপ পারিবারিক অশান্তিতে মন উদ্বিগ্ন থাকা সত্ত্বেও বিষয়কর্ম্ম করিয়া প্রতিদিন ধৈর্য্য সহকারে নিয়মিত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। এই পুস্তক লিখিতে যত্নের ত্রুটি হয় নাই, আমার অনুপযুক্ততাহেতু যে সমস্ত দোষ রহিয়া গিয়াছে, আশা করি পাঠকগণ তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

পুস্তক রচনার সময় আমি অনেক সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়াছি, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি; আমি বঙ্গভাষার ইতিহাস লিখিব শুনিয়া তিনি আমাকে সর্ব্বদা উৎসাহ দিয়া পত্র লিখিয়াছেন,

এতদ্ব্যতীত তিনি ১৩০০ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে সাহিত্যে 'কবিকৃষ্ণরাম' শীর্ষক প্রবন্ধে আমার পুস্তক সম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই ত্রিপুরায় বসিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দ স্মরণ ভিন্ন বৈষ্ণবসাহিত্যের আর কোনরূপ চর্চ্চা করা আমার পক্ষে সুবিধাজনক হইত কি না সন্দেহ; কিন্তু হুগলী বদনগঞ্জনিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে আমি যখন যে প্রশ্ন করিয়াছি, অগৌণে তাহার উত্তর দিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন; তাঁহার বয়স এখন ৬৫ বৎসর, কিন্তু আমার জন্য তিনি যুবকের ন্যায় শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীহট্ট, মৈনা-নিবাসী গৌরভূষণ শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় অযাচিত ভাবে আমার নিকট পত্র লিখিয়া পরিচয় স্থাপন করিয়াছেন, তিনি বৈষ্ণব কবিগণের জীবনী সম্বন্ধে নানা বিষয় জানাইয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন; তাঁহাকে আমি দেখি নাই, কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি আমার কল্পনায় দেবমূর্ত্তির ন্যায় নির্ম্মল—পর-উপকারব্রতের সুধা তাহা হইতে ক্ষরিত হইতেছে। আমার পরম শ্রদ্ধেয় আত্মীয় শ্রীযুক্ত অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয় আমার জন্য নানা কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তিনি সাহিত্য সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—রামগতি সেন, জয়নারায়ণ সেন, ও আনন্দময়ী দেবী এই তিন কবির পুঁথি আমি তাঁহারই অনুগ্রহে পাইয়াছিলাম, তাঁহার কৃতজ্ঞতা-ঋণ আমি আজীবন বহন করিব। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় আমাকে নানারূপ পুস্তকাদি ও উপদেশ দ্বারা উপকৃত করিয়াছেন, তিনি ১৩০১ সালের চৈত্র মাসের সাহিত্যে আমার এই পুস্তক-রচনার উদ্যমের বিশেষরূপ প্রশংসা করিয়া আমার অকিঞ্চিৎকর গুণাপেক্ষা স্বীয় স্নেহেরই বেশী পরিচয় দিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত ১৮৯৩ খৃঃ অব্দের ১২ই মার্চ্চ তারিখের হোপ পত্রিকার সম্পাদক আমার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেন। ঐ সনের ১৭ই আগষ্টের হিতবাদীতে, ১৩০০ সালের ৩২শে আষাঢ়ের অনুসন্ধানে, এবং সেই সালের ২০শে বৈশাখের দৈনিক ও সমাচারচন্দ্রিকায় আমার উদ্যমের উৎসাহবর্দ্ধক কথা প্রকাশিত হয়। ১৩০১ সালের শ্রাবণের পরিষদ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় আমার পুস্তক সংগ্রহের বিষয় উল্লেখ করেন। ১৩০১ সনের মাঘ মাসের ও ১৩০২ সনের কার্ত্তিক মাসের পরিষদ পত্রিকায় সাময়িক প্রসঙ্গে এবং ১৮৯৫ খৃঃ অব্দের ৬ই মার্চ্চের ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকায় আমার পুস্তক সংগ্রহ সম্বন্ধে নানারূপ উৎসাহসূচক সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া পরম শ্রদ্ধেয় সুকবি শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র, সি, এস, মহোদয়, প্রিয় সুহৃদ্ সাহিত্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দাসীসম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ

চট্টোপাধ্যায়, মাইকেলের জীবনচরিতপ্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু এবং কলিকাতা পিস এসোসিয়েসনের সেক্রেটরি শ্রীযুক্ত প্রবোধপ্রকাশ সেন গুপ্ত প্রভৃতি মহাশয়গণ আমাকে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন, আমি ইঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রহিলাম।

পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-গৌরব শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় এই পুস্তক রচনাকালে আমাকে যে অনুগ্রহ ও স্নেহ দেখাইয়াছেন, তাহা এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। বঙ্গ-সাহিত্যের জন্য এখনও তাঁহার পূর্ণ উদ্যম, আমার সংগৃহীত সবগুলি পুঁথিই তিনি সাহিত্যসমালোচনী-সভা হইতে মুদ্রিত করিবেন, ইহা তাঁহার সংকল্প; এই জন্য তিনি আমাকে ঢাকায় আহ্বান করিয়া সাক্ষাতে নানারূপ উৎসাহিত করিয়াছেন ও পুস্তক রচনা সময়ে প্রতি সপ্তাহে পত্র লিখিয়া নানারূপ উপদেশ দিয়াছেন; বলিতে কি, তাঁহার অবিরত উৎসাহ না পাইলে আমার উদ্যম শিথিল হইয়া পড়িবার আশঙ্কা ছিল। কলেজে অধ্যয়নকালে যখন সভামণ্ডপে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতাম, তখন তাঁহার প্রতিভাপূর্ণ মূর্ত্তি র‍্যাফেয়েল অঙ্কিত একখানা গ্রীক দেবতার ছবির ন্যায় বোধ হইত, আমার চক্ষে এখন তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়াছে।

বস্তুতঃ এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমার এই এক বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে যে, বঙ্গদেশে সহৃদয়তার অভাব নাই। আমার উপযুক্ততার এখন পর্য্যন্ত কোন প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই, তথাপি সৎকর্ম্মের রবে মাত্র আহূত হইয়া সদাশয় ব্যক্তিগণ আমাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় সম্বন্ধে আমি প্রথমতঃ শ্রীশ্রীযুক্ত ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করি। ত্রিপুরার তদানীন্তন মাজিষ্ট্রেট ও ত্রিপুরা রাজ্যের পোলিটিকেল এজেণ্ট শ্রীযুক্ত আর, টি গ্রীয়ার্ সাহেব আমার আবেদন সমর্থন করিয়া পত্র লিখেন। কিন্তু সেই আবেদনপত্রের উপর হুকুম হইতে একটু গৌণ হওয়াতে আমি কলিকাতা শোভাবাজারের রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেববাহাদুরের নিকট আর একখানি আবেদন পত্র পাঠাই। তিনি আমার পুস্তকের সমস্ত ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হইয়া পুস্তকের প্রুফ দেখার ভার পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সময় ত্রিপুরেশ্বরের সাহায্য হস্তগত হওয়াতে শোভাবাজারের রাজাবাহাদুরের সাহায্য গ্রহণ করার আবশ্যকতা হয় নাই। কিন্তু তাঁহার স্নিগ্ধ অমায়িক ব্যবহার, বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও তৎসম্বন্ধীয় প্রত্যেক শুভানুষ্ঠানে আন্তরিক সহানুভূতি গুণে তিনি বঙ্গীয় নূতন লেখক সম্প্রদায়ের অবলম্বন স্বরূপ হইয়াছেন। কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি, তিনি এই পুস্তকের

দ্বিতীয় ভাগের সমস্ত ব্যয় বহন করিতে স্বীকার করিয়াছেন। রাজা বাহাদুরের ভাগিনেয় আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু মহাশয় আমাকে সর্ব্বদা উৎসাহ দিয়া পত্র লিখিয়াছেন, তিনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

পরিশেষে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি, ত্রিপুরার শ্রীশ্রীমন্ মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য দেব বর্ম্মণ বাহাদুর আমার পুস্তকের এই খণ্ডের সমস্ত মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় বহন করিয়াছেন; সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার দানশীলতা বঙ্গদেশ-প্রসিদ্ধ। আমার এই সামান্য পুস্তক তাঁহার পবিত্র নামের সঙ্গে সংগ্রথিত করিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। এই দানপ্রাপ্তি-বিষয়ে ত্রিপুরেশ্বরের প্রাইভেট সেক্রেটরি বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীযুক্ত রাধারমণ ঘোষ, এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারি আমার সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু ও প্রাতঃস্মরণীয় ৺রাজমোহন মিত্র দেওয়ানজি মহাশয়দিগের নিকট হইতে সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখযোগ্য।

পুস্তকপ্রণয়নকালে নানা গ্রন্থেরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তৎসমস্ত উল্লেখ করার স্থান নাই। বঙ্গীয় আধুনিক লেখকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি লেখকগণের মাসিক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বঙ্গভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রী প্রণীত প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বিষয়ক ইংরেজী পুস্তিকা ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি. এস. মহাশয়ের বঙ্গসাহিত্যের ইংরেজী ইতিহাস পাঠে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

এই পুস্তকে নানারূপ ত্রুটি দৃষ্ট হইবে। এখনও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের একখানা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার সময় হয় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ ও বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির উদ্ধার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন; আশা করা যায়, আর কয়েক বৎসরের মধ্যে বহুসংখ্যক প্রাচীন অজ্ঞাত কাব্য সুপরিচিত হইবে। বোধ হয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, বঙ্গদেশে এমন পল্লী নাই, যাহাতে প্রাচীনকালে দুএকজন পল্লী-কবির আবির্ভাব হয় নাই, বৈষ্ণব-সাহিত্য অতি বিরাট—লূতাতন্তুজড়িত, জীর্ণ, গলিতপত্র শত শত বৈষ্ণবগ্রন্থ এখনও অজ্ঞাতভাবে পড়িয়া আছে। আর কয়েক বৎসর প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান-চেষ্টা অব্যাহত থাকিলে প্রাচীন সাহিত্যের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস লিখিবার উপকরণ হস্তগত হইতে পারে। আমার এই পুস্তক ভাষার ভাবী ইতিহাস রচনাকালে যদি কিঞ্চিৎ আনুকূল্য করিতে সমর্থ হয়, তবেই শ্লাঘ্য জ্ঞান করিব।

পুস্তক আকারে বৃহৎ হইল, এই জন্য তিন শত বৎসর পূর্ব্বের কবি অনন্তরাম মৈত্রের পুত্র জীবন মৈত্র রচিত পদ্মাপুরাণ, বিপ্রদাস কবি কৃত মনসামঙ্গল, চূড়ামণি দাস কৃত চৈতন্য-চরিত্র ও বিজয় পণ্ডিত প্রণীত মহাভারত এবং দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ প্রণীত মুক্তালতাবলী প্রভৃতি পুস্তকের বিষয় গ্রন্থভাগে উল্লেখ করিতে পারিলাম না। কিন্তু ১৩০৩ সালের বৈশাখের পরিষদ্ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় 'গৌরীমঙ্গল' নামক একখানি পুঁথির পরিচয় দিয়াছেন, তদ্বিবরণ পূর্ব্বে অবগত না থাকায় উহা উল্লেখ করি নাই। এই পুস্তক ১৭২৮ শকে (১৮০৬ খৃঃ অব্দে) পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। ইহার কবিত্ব মোটামুটি বেশ সুন্দর, কিন্তু আমরা এই কাব্যের কবিত্ব দেখাইতে আগ্রহান্বিত নহি। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যরূপ ফুলের বনে গৌরীমঙ্গলরূপ একটি সামান্য সেউতি ফুল অদৃশ্য হইলে বিশেষ ক্ষতির কারণ নাই; কিন্তু এই গ্রন্থের অবতরণিকায় কবি প্রাচীন সাহিত্যের সামান্যরূপ ইতিহাস দিয়াছেন, তাহা আবশ্যক মনে করি। সেই অংশ এই স্থানে উদ্ধৃত হইল;—"সত্যযুগে বেদ অর্থ জানি মুনিগণ। সেইমত চালাইল সংসারের জন॥ ত্রেতাযুগে বেদ অর্থ জানিতে নারিল। তেকারণে মুনিগণ পুরাণ রচিল॥ অনেক পুরাণ উপপুরাণ হইল। দ্বাপরে মনুষ্যগণ ধারণে নারিল॥ স্মৃতি করি মুনিগণ সংগ্রহ করিল। কলিযুগে তাহা লোকে বুঝা ভার হৈল॥ মতে ভাষা আশা করি কৈল কবিগণ। স্মৃতি ভাষা কৈল রাধাবল্লভশর্ম্মণ॥ বৈদ্যক করিয়া ভাষা শিখে বৈদ্যগণে। জ্যোতিষ করিয়া ভাষা শিখে সর্ব্বজনে॥ বাল্মীকি করিল ভাষা দ্বিজ কৃত্তিবাস। মনসামঙ্গল ভাষা হইল প্রকাশ॥ মুকুন্দ পণ্ডিত কৈল শ্রীকবিকঙ্কণ। কবিচন্দ্রে গোবিন্দমঙ্গল বিরচন॥ ভাগবত ভাষা করি শুনে ভক্তিমান। চৈতন্যমঙ্গল কৈল বৈষ্ণব বিজ্ঞান॥ বৈষ্ণবের শাস্ত্র ভাষা অনেক হইল। অন্নদামঙ্গল ভাষা ভারত করিল॥ মেঘ ঘটা যেন ছটা তড়িতের পাতা। শিবরাম গোস্বামী করিল ভক্তিলতা॥ অষ্টাদশ পর্ব্ব ভাষা কৈল কাশীদাস। নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব্বে ভারত প্রকাশ॥ চোর চক্রবর্ত্তী কীর্ত্তি ভাষায় করিল। বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি পয়ার রচিল॥ দ্বিজ রঘুদেব চণ্ডী পাঁচালী করিল। কবিচন্দ্র চোর কবি ভাষায় হইল॥ গঙ্গানারায়ণ রচে ভবানীমঙ্গল॥ কিরীটমঙ্গল আদি হইল সকল॥ এ সকল গ্রন্থ দেখি মন আশা হইল। গৌরীমঙ্গলের পুঁথি ভাষায় রচিল॥" এখন দেখা যাইতেছে, রাধাবল্লভ প্রণীত স্মৃতিগ্রন্থ, শিবরাম গোস্বামিকৃত 'ভক্তিলতা', চোর চক্রবর্ত্তী প্রণীত 'বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান', গঙ্গানারায়ণকৃত 'ভবানীমঙ্গল' এবং 'কিরীটমঙ্গল' প্রভৃতি পুস্তকের বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে সেগুলি বিদ্যমান ছিল, অনুসন্ধান করিলে তাহা পাওয়া অসম্ভব নহে।

প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় উদ্ধৃত অংশে উল্লিখিত কাশীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী নিত্যানন্দ কবির সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"গত চৈত্রের সাহিত্যে বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন যে কয়েকখানি বাঙ্গালা মহাভারতের নাম দিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে নিত্যানন্দ-প্রকাশিত মহাভারতের উল্লেখ দেখিলাম না।" (পরিষদ্ পত্রিকা, ১৩০৩, বৈশাখ, ৫১ পৃঃ)। আমরা এই পুস্তকেও নিত্যানন্দ কবির উল্লেখ করি নাই, কিন্তু নিত্যানন্দ ঘোষ নামক এক কবির ভণিতাযুক্ত আদিপর্ব্বের অনেকাংশ আমরা পাইয়াছিলাম, সেই অংশের একটি স্থলের ভণিতা এইরূপ, "কাম্য করি যে শুনিল ভারত পাঁচালী। সকল আপদ তরে বাড়ে ঠাকুরালী॥ নিত্যানন্দঘোষ বলে শুন সর্ব্বজন। আগে এই অষ্টাদশ পর্ব্ব বিবরণ॥" এই মহাভারতখানি এক শত বৎসর পূর্ব্বে হস্ত লিখিত ও ইহার অধিকাংশ স্থল সঞ্জয় রচিত; ত্রিপুরা সদরের নিকটবর্ত্তী রাজপাড়া নামক গ্রামে এক ধোপার বাড়ীতে আমরা এই পুঁথি পাইয়াছিলাম। আমি ও এসিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত শ্রীমান্ বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ এই পুস্তকের জন্য ধোপাকে ২৫, টাকা দিতে সম্মত হইয়াছিলাম, কিন্তু সে পৈত্রিক পুঁথি দিতে স্বীকার করে নাই; দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার কিছুদিন পরেই গৃহদাহে এই পুঁথি নষ্ট হইয়া যায়। নজির লুপ্ত হওয়াতে, তাহা হইতে যে নোট সংগ্রহ করিয়াছিলাম, উহা আর আমি ব্যবহার করি নাই। পূর্ব্বোক্ত নিত্যানন্দ ঘোষ, গৌরীমঙ্গলে উল্লিখিত নিত্যানন্দ হইতে পারেন।* আমরা এই পুস্তকে যে সব প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে লোকনাথ দত্ত প্রণীত নৈষধ, অনন্তরাম প্রণীত ক্রিয়াযোগসার, দ্বিজ কংসারি প্রণীত পরীক্ষিৎ-সম্বাদ, রাজারাম দত্তের দণ্ডীপর্ব্ব, কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রণীত (পরাগলী) মহাভারত, জাতক-সম্বাদ, রামেশ্বর নন্দীর অসম্পূর্ণ মহাভারত, ইন্দ্রদ্যুম্ন-চরিত, কালিকাপুরাণ, প্রাচীন কৃত্তিবাসী রামায়ণ, সঞ্জয় কৃত মহাভারত, ষষ্ঠীবরের স্বর্গারোহণ পর্ব্ব, গোপীনাথ দত্তের দ্রোণপর্ব্ব, রাজেন্দ্র দাসের শকুন্তলা, গঙ্গাদাসের অশ্বমেধ পর্ব্ব, শ্রীকরণ নন্দী প্রণীত (ছুটিখাঁর আদেশে রচিত) অশ্বমেধ পর্ব্ব, প্রভৃতি পুস্তক বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, এই নিমিত্ত উৎসুক পাঠকবৃন্দের আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা উদ্ধৃত অংশের নিম্নে পত্র নির্দ্দেশ করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া গ্রন্থভাগে উল্লিখিত অপরাপর পুঁথির কতকগুলি আমার নিকট আছে, তদ্ব্যতীত অন্যগুলি কোথায় আছে, তাহা কেহ জানিতে চাহিলে আমরা বলিতে

* এবার নিত্যানন্দ ঘোষের প্রায় সমগ্র মহাভারত বাহির হইয়া পড়িয়াছে; আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, নিত্যানন্দের মহাভারতই কাশীদাসের মহাভারতের অন্যতম আদর্শ। ২য় সংস্করণ।

পারিব। পুস্তক মুদ্রিত না হইলে, হস্তলিখিত পুঁথি দৃষ্টে আলোচনা করা বড় কঠিন ব্যাপার, পাঠকেরও কৌতূহল নিবৃত্তির পথ নিতান্ত অসুবিধাজনক হয়। যে সব প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যাইতেছে, তাহার সমস্তই প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক, তন্মধ্যে কোন কোন পুস্তকের কবিত্ব সুন্দর, তাহা কীর্ত্তি স্বরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য ; কিন্তু প্রাচীন সমস্ত পুস্তকই ভাষা ও ইতিহাস পর্য্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় হইবে। এই বৃহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ও বিদ্যোৎসাহী জয়দেবপুরাধিপতির পক্ষে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ব্রতী হইয়াছেন ইহা সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে॥

পুস্তক রচনার সম্বন্ধে কতকটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। পুস্তক সমাধা করিয়া যন্ত্রস্থ করিতে পারি নাই ; কিছু কিছু করিয়া লিখিয়াছি ও ছাপাইতে দিয়াছি, এইজন্য ছাপা হইতে প্রায় ২ বৎসর লাগিয়াছে। পুস্তক লেখা শেষ না করিয়া ছাপাইতে দেওয়ায় কতকগুলি দোষ হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান এই পুস্তকের আদ্যন্ত সুশৃঙ্খল করিতে পারি নাই। প্রথম হইতে তৃতীয় অধ্যায় পর্য্যন্ত ভাষার উৎপত্তি, বিভক্তি ও ক্রিয়া প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছি, এই কয়েকটি অধ্যায় অতি ছোট ও পশ্চাতের অধ্যায়গুলি অতি বড় হইয়াছে। ভাষা সম্বন্ধীয় অধ্যায়গুলি উপক্রমণিকার অন্তর্বর্ত্তী করিলে বোধ হয় এই দোষ বর্জ্জিত হইতে পারিত। অন্যান্য যে দোষ ঘটিয়াছে, তাহা প্রথম সংস্করণে তাহা একরূপ অপরিহার্য্য। জগৎরাম রায়ের কাল সম্বন্ধে আমরা ৫০৬ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছি, তৎসম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। আমরা জগৎরামের কাব্য দেখি নাই, দাসীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বলরাম-বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধগুলি হইতে তদ্বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছি। বলরাম বাবুর নির্দ্দিষ্ট সময়ই আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু এই পুস্তক উক্ত কবির বিবরণ মুদ্রিত হওয়ার পরে ১৮৯৬ খৃঃ অব্দের মে মাসের দাসীতে শ্রীযুক্ত সত্যকুমার রায়, বলরাম বাবুর নির্দ্দিষ্টকাল সংশোধন করিয়াছেন, আমাদের মতে সেই সংশোধিত কালই গ্রহণীয় বলিয়া বোধ হইতেছে, তদনুসারে জগৎরাম রায় ১৬৯২ শকে (১৭৭০ খৃঃ অব্দে) দুর্গাপঞ্চরাত্রি এবং ১৭১২ শকে (১৭৯০ খৃঃ অব্দে) রামায়ণ রচনা করেন। 'তাপর পুস্তক দুর্গাপঞ্চরাত্রি নাম' অর্থ তারপর দুর্গাপঞ্চরাত্রি নামক গ্রন্থ বিরচিত হইল, নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে রামায়ণের পরে দুর্গাপঞ্চরাত্রি রচিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হয়, এইজন্য ১৭১২ শককে সম্বৎ নির্দ্দেশ করিয়া কাল নির্ণয় করা হইয়াছিল। কিন্তু সত্যবাবু দেখাইয়াছেন, 'তাপর পুস্তক দুর্গাপঞ্চরাত্রি নাম' অর্থে 'তাহার পর পুস্তকের নাম দুর্গাপঞ্চরাত্রি' সুতরাং দুর্গাপঞ্চরাত্রি রামায়ণের পরে রচিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট

হয় নাই। এতদ্ভিন্ন জ্যোতিষিক গণনা দ্বারা সত্যবাবু স্বীয় মত সুন্দররূপে সমর্থন করিয়াছেন।

১৬৮ পৃষ্ঠায় মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনার কাল উল্লিখিত হইয়াছে। ১৪৮০ খৃঃ অব্দে এই পুস্তক রচনা শেষ হয়, কিন্তু মুসলমান লেখকগণের নির্দ্দেশ অনুসারে ১৪৮৯ খৃঃ অব্দে হুসেন সাহ গৌড়ের সম্রাট হন, অথচ আমরা "গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজখান" পদের উল্লিখিত গৌড়েশ্বরকে হুসেন সাহ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং এসম্বন্ধে একটু ঐতিহাসিক গোল রহিয়া গেল। কিন্তু এবিষয়ে আমরা বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত মতই গ্রহণ করিয়াছি, এরূপ হইতে পারে পুস্তক সমাধার ৯।১০ বৎসর পরে কবি উপাধি প্রাপ্ত হইয়া গ্রন্থশেষে তাহা জুড়িয়া দিয়াছেন। যাহা হউক এই মত ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন হইলে আমরা ভবিষ্যতে তাহা সংশোধন করিব।

উপসংহারে বক্তব্য, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে এখনও শিক্ষিত সম্প্রদায় একরূপ উদাসীন আছেন। আর্যেম্বিক্ ও ট্রকেয়িক্ প্রভৃতি ছন্দের মনোহারিত্বে প্রীত যুবকগণ অবিরত পয়ার ও দীর্ঘছন্দে বিরক্ত হইয়া পড়েন, প্যারাডাইস লষ্ট কিম্বা টাস্কের অবতরণিকায় যাঁহারা কল্পনার স্তোত্র পড়িয়া সুখী, তাঁহারা প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের 'লম্বস্থূল কলেবর' ইত্যাদিরূপ গণেশ বন্দনা পড়িতে সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে পারেন না। তাঁহারা জুলিয়েট ও এণ্ড্রমেকি প্রভৃতি নামের পক্ষপাতী, কিন্তু বেহুলা, লহনা, কাণেড়া প্রভৃতি সেকেলে নাম শুনিয়া প্রীতি বোধ করেন না। প্রাচীন সাহিত্য পড়িতে কতকটা ধৈর্য্য ও ক্ষমা চাই; আমরা সাহস সহকারে বলিতে পারি, পয়ারছন্দ ও গণেশবন্দনা উত্তীর্ণ হইয়া যাঁহারা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে না; অন্ততঃ বাঙ্গালী পাঠক তাহাতে বিশেষরূপ উপভোগের সামগ্রী পাইবেন, কারণ বাঙ্গালীর মন যে উপাদানে গঠিত, সেই উপাদানে কাব্যগুলিও গঠিত। আমরা এই স্থলে মোক্ষমূলরের এই কয়েকটি বহুমূল্য বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ভূমিকার পরিসমাপ্তি করিতেছি, "যে দেশের লোকবৃন্দ স্বীয় প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্য স্মরণ করিয়া গৌরবান্বিত না হয়, তাহারা জাতীয় চরিত্রের প্রধান অবলম্বন শূন্য হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে। যখন জার্ম্মেনী রাজ্য রাজনৈতিক অবনতির নিম্নতম গহ্বরে পতিত হইয়াছিল, তখন তদ্দেশীয় লোকবৃন্দ স্বদেশের প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন; এবং প্রাচীন সাহিত্যপাঠে ইঁহাদের হৃদয়ে ভাবী উন্নতির নূতন আশা সঞ্চারিত হইয়াছিল।"

কুমিল্লা,
১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৬।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই আমি উৎকট শিরো-রোগে আক্রান্ত হই। প্রায় দুই বৎসর কাল উত্থান-শক্তি-রহিত ও শয্যাশায়ী হইয়া এখন কিঞ্চিৎ সুস্থতালাভ করিয়াছি। এখনও মাঝে মাঝে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং তজ্জন্য আমাকে অনেক দিনের জন্য শয্যাগত থাকিতে হয়। ফলে এ জীবনে আর কখনও যে, স্বাস্থ্যলাভ করিয়া কাজের যোগ্য হইব, এরূপ আশা করি না।

পাঁচ বৎসর কাল আমি এইরূপ অকর্ম্মণ্য ও জীবিকা অর্জ্জনে সম্পূর্ণ অশক্ত হইয়া যার পর নাই আর্থিক অভাবে পতিত হইয়াছি। প্রকৃত পক্ষে সময়ে সময়ে আমার অন্না-ভাবের আশঙ্কা ঘটিয়াছে। এই দুঃসময়ে যাঁহারা আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিতেছেন, কি বলিয়া তাঁহাদিগের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিব, তাহা খুঁজিয়া পাই না। বঙ্গভাষার জন্য আমি যে সামান্য শ্রম স্বীকার করিয়াছি, তাহার ফলে আমার আপৎকালে আমি সহানুভূতি ও সৌহার্দ্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়।

আমার এই নিরন্ন ও নিঃসম্বল অবস্থায় আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ মহামতি ছোটলাট বাহাদুর শ্রীযুক্ত উডবারণ ও রাজপ্রতিনিধি মহামান্য লর্ড কুর্জ্জন আমার প্রতি অনুকম্পা-পরবশ হইয়া আমার জীবনোপায় নির্দ্ধারণ করিয়া আমাকে অন্নাভাব হইতে রক্ষা করিয়া-ছেন। গভর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তিই বর্ত্তমান কালে আমার প্রধান সম্বল ও জীবনযাত্রার উপায়। গভর্ণমেণ্টের এই সহৃদয় করুণা প্রকাশের জন্য আমার গভীর কৃতজ্ঞতা ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে।

পরম পণ্ডিত সহৃদয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার গ্রীয়ারসন্ সাহেবের কৃপার কথা আমার হৃদয়ে চিরাঙ্কিত থাকিবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার আলোচনা দ্বারা তিনি পণ্ডিত সমাজে যশস্বী হইয়াছেন। বহুসংখ্যক ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষাকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়া অন্য কোন পণ্ডিত মহাত্মা গ্রীয়ারসনের মত অক্লান্ত অধ্যবসায়ে তদনুশীলনে জীবন উৎসর্গ করেন নাই। তাঁহার হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসের বিষয় সকলেই অবগত আছেন,

কিন্তু বঙ্গভাষার আদি সঙ্গীত মাণিকচান্দের গান ইনি প্রথমে সংগ্রহ করিয়া এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করেন। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে ইঁহার সংগ্রহ অসীম অধ্যবসায়ের ফল। সম্প্রতি ইনি ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষাতত্ত্ব সঙ্কলনে নিযুক্ত হইয়াছেন—সেই কার্য্য সমাহিত হইলে ইঁহার জীবনের অনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপিত হইবে। আমার আপৎকালে এই মহাত্মা যেরূপ সহৃদয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাহা আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার শ্রীযুক্ত স্ক্রাইন সাহেব আমার পুস্তকের প্রতি যে আদর ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। ঢাকাবিভাগের কমিশনার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত স্যাভেজ সাহেব আমার বৃত্তি-প্রাপ্তি সম্বন্ধে সাহায্য করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদোত্তম শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র সি, এস, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে, সি, এস, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি মহোদয়গণের নিকট আমি দুঃসময়ে বিবিধ আনুকূল্য পাইয়াছি। তজ্জন্য ইঁহাদের সকলেরই নিকট আমি চিরজীবন ঋণবদ্ধ রহিলাম। শ্রীযুক্ত ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস, শ্রীযুক্ত ডাক্তার নীলরতন সরকার এম, ডি, শ্রীযুক্ত কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন, কবিরাজ গুরুপ্রসন্ন সেন সরস্বতী, কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ সেন এম্, এ, মহাশয়েরা আমার পীড়ার সময়ে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান দ্বারা আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। এই অবসরে তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে ৬০০ পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় সরকারী বিদ্যালয় সমূহের জন্য ৭০ খানি গ্রহণ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করেন এবং পূর্ব্ববিভাগের ভূতপূর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টার স্বর্গীয় দীননাথ সেন মহাশয় তাঁহার অধীন বিদ্যালয় সমূহে এক এক খানি পুস্তক ক্রয়ের জন্য সার্কুলার প্রচার করেন। সেই সার্কুলারের ফলে প্রথম সংস্করণ অতি অল্প সময়ে প্রায় নিঃশেষ হইয়া যায়। বহুদিনমধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ আবশ্যক হয়, কিন্তু অর্থাভাবে আমি সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি নাই।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য সহৃদয় বন্ধুবর্গের যত্নে কতক টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা সামান্য। সেই টাকার কতকাংশ ছবি সংগ্রহে ও পুস্তক সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে ব্যয় হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে বর্দ্ধিত কলেবরে মুদ্রাঙ্কণের

এবং বিজ্ঞাপনাদি প্রচারের জন্য প্রায় দুই হাজার টাকার আবশ্যক হয়। অর্থ সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া আমি প্রকাশকের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হই। আমার বড় দুঃসময়ের সময় সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়েরা সান্যাল কোম্পানীর হস্তে এই ভার অর্পণ করিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত করিয়াছেন।

চারি বৎসরকাল অতীত হইল, বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের নিবাসী রাজকুমার দত্ত নামক এক ব্যক্তি আমার বাড়ীতে ভৃত্য নিযুক্ত হয়। আমার অভিপ্রায়ানুসারে এই ব্যক্তি বাঁকুড়া জেলা হইতে কতকগুলি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনে। এই ব্যক্তি পুস্তক সংগ্রহ-কার্য্যে বিশেষরূপ দক্ষ দেখিয়া আমি ইহাকে সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অধীনে পুঁথি সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিই। আমার যে অবস্থা, তাহাতে এই সকল পুঁথি কিনিবার শক্তি আমার নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। নগেন্দ্র বাবু ইতিপূর্ব্বেই অনেক প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রামকুমারকে নিযুক্ত করিয়া ইহার দ্বারা তিনি প্রায় ৫০০ শত পুঁথি সংগ্রহ করেন, এজন্য নগেন্দ্র বাবু যেরূপ মুক্তহস্তে রাজার ন্যায় ব্যয় করিয়াছেন, তজ্জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালীই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। তাঁহার পুস্তকাগারে প্রায় ১০০০ বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত আছে, ইহার জন্য তাঁহার শুধু অর্থব্যয় নহে, বিস্তর কষ্ট স্বীকার করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির এই অমূল্য পুস্তকাধারটি নগেন্দ্র বাবুর সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত থাকা আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি না। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণের লাইব্রেরীর পরিণাম স্মরণ করিয়া আমাদের ভীতি জন্মিয়াছে। এই পুঁথিগুলির অতি নগণ্য অংশও এখন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। বাঙ্গালাভাষার এই দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন নিদর্শনগুলি গভর্ণমেণ্টের লাইব্রেরী কিংবা কোন অর্থশালী সাধারণ পাঠাগারে সুরক্ষিত থাকা উচিত। অন্ততঃ এমন কোন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তির হস্তগত থাকিলেও চলিতে পারে, যে স্থল হইতে ইহাদের নিলামে বিক্রয় হইবার আশঙ্কা অল্প। এই পুঁথিগুলির একখানি নষ্ট হইলে তৎস্থল পূরণ হওয়া দুষ্কর। নগেন্দ্র বাবুকে ইহাদের অধিকারের লোভ ছাড়িয়া দিতে প্রবর্ত্তিত করা বাঞ্ছনীয়। আমরা সাহিত্যের উন্নতি কল্পে এই পুঁথিগুলিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিলাম, আশা করি সুহৃদ্বর তাহাতে বিরক্ত হইবেন না। এই পুস্তকগুলি হইতে আমি বর্ত্তমান সংস্করণে বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছি, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

যে সকল পুঁথি, আমার এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে, বর্ত্তমান সংস্করণে আমি তাহাদের অধিকাংশের ন্যূনাধিক বিবরণ প্রদান করিয়াছি।

গ্রন্থভাগে অনুলিখিত পুঁথিগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী পুস্তকশেষে প্রদত্ত হইল। এরূপ গ্রন্থে সমস্ত পুঁথিরই উল্লেখ তত আবশ্যক মনে করি নাই, এজন্য সামান্য সংখ্যক পুঁথির উল্লেখ করি নাই। এবার এই পুস্তকখানি পূর্ব্ব সংস্করণের আয়তনের অন্যূন একচতুর্থাংশ বাড়িয়া গেল। একটি বিস্তৃত বর্ণনানুযায়ী অনুক্রমণিকা সর্ব্বশেষে প্রদত্ত হইল। এই অনুক্রমণিকাটি এবং গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে সন্নিবিষ্ট সূচিপত্র আমার প্রিয় বন্ধু সুলেখক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেন, বি. এ., মহাশয় প্রস্তুত করিয়া আমার চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। অধ্যায়াংশগুলি পুস্তকের অনুবর্ত্তী ক্ষুদ্র সূচিকা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইল। এই সংশোধন, পরিবর্ত্তন, এবং পরিবর্দ্ধনাদি ব্যাপারে আমার যেরূপ গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাহা আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর হইয়াছে। তথাপি প্রাণান্ত পরিশ্রমে তাহা করিয়াছি। কখনও কখনও কিছু লিখিয়া এত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি যে ১০।১৫ দিন শয্যা হইতে উঠিতে সমর্থ হই নাই। ফরিদপুর থাকা কালে আমি নিজ হাতে লিখিতে একান্ত অক্ষম ছিলাম; আমি বলিয়া যাইতাম, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার নামক জনৈক বঙ্গভাষানুরাগী উৎসাহী যুবক স্নেহপরবশ হইয়া তাহা লিখিয়া দিতেন। তাঁহার নিকট আমি এজন্য একান্ত ঋণী।

আমার এরূপ সঙ্গতি নাই যে প্রুফ্ ইত্যাদি সংশোধনের ভাল বন্দোবস্ত করিতে পারি, সুতরাং প্রেস হইতেই পূজনীয় শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ সান্যাল মহাশয় তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তথাপি আমাকে প্রুফ্ দেখিবার জন্য বহু প্রকার কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। সময়ে সময়ে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি বন্ধুবর্গ প্রুফ্ সংশোধনে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু সকল সময়ে তাঁহাদের সাহায্য পাওয়ার সুবিধা ঘটে নাই, এ অবস্থায় ভুল থাকিবার নিতান্ত আশঙ্কা, কিন্তু পুস্তকখানি নির্ভুল করিয়া ছাপাইবার শক্তি এবং অর্থবল আমার নাই। আমার ন্যায় পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে যতদূর সম্ভব, আমি তদতিরিক্ত শ্রম করিয়া অনেক সময় পীড়া বৃদ্ধি করিয়াছি, এসম্বন্ধে আমি আর কি লিখিব, পাঠকবর্গের নিকট আমি বিচারাধীন রহিলাম।

অতঃপর চিত্রের কথা। ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে মহোদয়ের অনুরোধে বীরভূমের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এইচ, এম, প্যারিশ মহোদয় আমার পুস্তকের জন্য চণ্ডীদাসের ভিটি, বাশুলীদেবীর মন্দির এবং বাশুলীদেবীর ফটোগ্রাফ্ তুলিয়া পাঠাইয়াছেন। ভিটির দুইখানি ছবি, একখানি দক্ষিণ পূর্ব্ব এবং অপরখানি উত্তর পূর্ব্ব দিকের দৃশ্য। ভিটির পরিসর অতি বৃহৎ এবং উহার চতুর্দ্দিক্ ঘন তরুরাজি ও

গৃহসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত। * বাশুলীদেবীর মূর্ত্তির ফটোগ্রাফ তুলিতে সাহেব মহোদয়কে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। মন্দির-স্বত্বাধিকারিগণ অনেক অনুরোধের পর সন্ধ্যাকালে দেবীমূর্ত্তিটি বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। প্যারিশ সাহেব লিখিয়াছেন, তিনি এই মূর্ত্তির নিকটে যাইতে পারেন নাই, দূর হইতে ফটোগ্রাফটি তুলিতে হইয়াছে, মূর্ত্তিটিও অতি ক্ষুদ্র, এজন্য চিত্রখানি ছোট হইয়াছে। † দেবীর পূর্ব্বতন মন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তিন বৎসর হইল সেই স্থানে যে নূতন মন্দির উত্থিত হইয়াছে, এ ফটোগ্রাফখানি সেই নূতন মন্দিরের।

গৌরাঙ্গ সমাজ চৈতন্যপ্রভুর যে ছবি বিক্রয় করিতেছেন, তাহার মূল তৈলচিত্র মহারাজা নন্দকুমারের বংশধর রাজকুমারগণের বাড়ী বহরমপুর কুঞ্জঘাটায় সযত্নে রক্ষিত আছে। ইহা শ্রীনিবাসের বংশধর বৈষ্ণবকুলতিলক, পদামৃতসমুদ্র সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত রাধামোহন ঠাকুর মহারাজা নন্দকুমারকে প্রদান করেন। এই তৈলচিত্রখানি বড় সুন্দর এবং প্রায় ৪০০ বৎসরের প্রাচীন। আমি নিজে অর্থব্যয় করিয়া কুঞ্জঘাটা হইতে একখানি ফটোগ্রাফ তোলাইয়া আনিয়াছি। গৌরাঙ্গসমাজের ছবিতে চৈতন্যপ্রভুর কপালে এবং নাসাগ্রভাগে যে তিলক ও চক্ষুপ্রান্তে যে অশ্রুবিন্দু দৃষ্ট হয়, মৎসংগৃহীত নিগেটিভ্ এবং ফটোগ্রাফে তাহা পাই নাই, সুতরাং গৌরাঙ্গ সমাজের ছবির সঙ্গে আমার ছবির একটুকু পার্থক্য আছে। এই ফটোগ্রাফখানির প্রাপ্তি সম্বন্ধে ফরিদপুরের স্বনাম-প্রসিদ্ধ উকীল অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের অনুরোধে বহরমপুরের বিখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত অনারেবল বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় আমাকে সাহায্য করেন। এজন্য আমি উভয়ের নিকটেই কৃতজ্ঞ। 'দক্ষিণরায়' দেবের প্রতিমূর্ত্তি আমি বহু চেষ্টা করিয়া হাওড়া—খুরুট-পঞ্চাননতলার উক্তদেবের একটি প্রাচীন মন্দির হইতে উদ্ধার করিয়াছি, এতৎপক্ষে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ আঢ্য মহাশয়ের সাহায্য পাইয়াছি। এই সকল ছবির জন্য আমার অনেক অর্থ

---

* শ্রীযুক্ত প্যারিশ সাহেব লিখিয়াছেন—"The bhita I found difficult to photograph even with a wide angle lens as it is large and closely surrounded with houses or trees."

† "The image was brought outside for me to photograph very late in the evening and I had to take it without pre-arrangement. I was quite unprepared for such a very small image and could not get close enough to it for a larger picture or screen the wall behind it. A very strong wind too was blowing at the time. This negative could be cut down and enlarged."

ব্যয় হইয়াছে। বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর একখানি অতি প্রাচীন তৈলচিত্র আছে, এই সংবাদ জানিয়া বৃন্দাবনবাসী জনৈক মহাশয়ের নিকট, তাঁহার ইচ্ছানুক্রমে অর্থ প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ছবি পাওয়া দূরে থাক, অর্থ পর্য্যন্ত প্রত্যর্পিত হয় নাই। উদ্ধারণ দত্তের যে ছবি প্রদত্ত হইল, তাহা সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয়ের প্রেরিত ছবি হইতে গৃহীত হইয়াছে, সেই ছবিখানি সম্বন্ধে অচ্যুতবাবু লিখিয়াছেন—"হুগলীর অন্তর্গত বালিগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত বংশীয় ৺জগমোহন দত্ত মহাশয়ের শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে উদ্ধারণ দত্তের এক প্রাচীন দারুময়ী মূর্ত্তি আছে; প্রাচীন কালাবধি ইহার যথারীতি সেবা পূজা হয়, প্রেরিত ছবি সেই প্রাচীন দারুময়ী মূর্ত্তি হইতে গৃহীত।" জগদানন্দের হস্তলিপি আমি শ্রীযুক্ত কালিদাসনাথ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই। ইহা কবির খসড়ালেখার প্রতিলিপি। সেই খসড়ায় দেখা যায়, কবির কোন একটি পংক্তি মনোনীত না হওয়াতে সে পংক্তি সংশোধন করিয়া তিনি অপর এক ছত্র লিখিয়াছেন, সে ছত্রটিও ভাল না লাগাতে আর এক ছত্র দ্বারা উহা সংশোধন করিয়াছেন, এইরূপ উপর্য্যুপরি চেষ্টার পরে যে ছত্র সর্ব্ব শেষ মনোনীত হইয়াছে, তাহা সুকৌশলে স্বীয় পদরাশির অন্তর্ব্বর্ত্তী কোনও স্থানে সংযোজনা করিয়া দিয়াছেন। বনবিষ্ণুপুর হইতে সংগৃহীত বাং ১০৬৮ সালে লিখিত একখানি প্রাচীন চৈতন্য-ভাগবত পুঁথির মলাটে প্রাপ্ত সংকীর্ত্তনের যে তৈল চিত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হইল, তাহা সুহৃদোত্তম শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পুস্তকাগার হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় দাসী পত্রিকার একটি প্রবন্ধের মর্ম্মানুসারে গ্রন্থভাগে প্রদত্ত কবি জগৎরামরায়ের কাল সংশোধন-উদ্দেশ্যে যাহা লিখিয়াছিলাম, তৎপর সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ জন্মিয়াছে, আমরা এখনও এ সম্বন্ধে কোন মীমাংসা করিতে পারি নাই। সুতরাং পুস্তকের সে অংশটি পরিবর্ত্তন করিলাম না।

এবারও বৈষ্ণব কবিগণের জীবনী সম্বন্ধে আমি সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছে।

৩৭০ পৃষ্ঠার পাদ টীকায় আমরা লিখিয়াছি, স্বর্গীয় হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের মতে উমাপতি ধর স্বর্ণবণিক বংশীয়। সুলেখক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় এবং ভিষক্প্রবর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এম, এ, মহাশয়দ্বয় আমাকে কতকগুলি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা দৃষ্ট হয়, কবি উমাপতি ধর বৈদ্যবংশীয় ছিলেন, মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিককৃত রত্নপ্রভাগ্রন্থে ইহা স্পষ্টরূপ উল্লিখিত আছে এবং জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত পিঞ্জারী গ্রামে এখনও উমাপতিধরের বংশধরগণ বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই পিঞ্জারী গ্রাম অতি প্রাচীন, লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপ সেন এই গ্রামখানি জনৈক সুপণ্ডিত

ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া যে তাম্রফলক প্রচারিত করেন, তাহা কয়েক বৎসর হইল এসিয়াটিক সোসাইটির জ্যার্ন্যালে প্রকাশিত হইয়াছে। উমাপতিধর বাঙ্গালাভাষার কবি নহেন, সুতরাং এ প্রসঙ্গের অধিকতর চর্চ্চা আমাদের বিষয় বহির্ভূত।

পদ্মাপুরাণের প্রাচীন কবি নারায়ণদেবের কোন বিবরণ ইতিপূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি একখানি প্রাচীন পুঁথিতে নিম্নলিখিত বিকৃতপাঠ বিশিষ্ট কয়েকটি ছত্র পাওয়া গিয়াছে।

"নারায়ণ দেএ কহে জন্ম মগদ। মিশ্র শ্রীপতি নহে ভট্ট বিশারদ॥ মধুকুল্যগোত্র হইল গাই গুণাকর। শূদ্রকুলে জন্ম মোর সদা কাহেস্তের ঘর॥ নরহরি তনএ জে নরসিংহ পিতা। মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা॥ চোদ্দ বৎসরের কালে দেখিল স্বপন। মহাজন সহিত পথেত দরশন॥ শিশুরূপেতে গোঁসাই হাতেত করি বাঁশী। আলিঙ্গন দিয়া বলে যার মুখে হাঁসি॥ গোবিন্দের আসা মোর সেই সে কারণ। প্রণাম করিল মুঞি ভজিয়া চরণ॥ সকল সুজন প্রভু তোমার কারণে। কি করিতে পারি আমি তোমা বিদ্যমানে॥ গোবিন্দ নিকট আমি কি কহিতে জানি। কোকিলের নিকটে জেন কাক করে ধ্বনি। শঙ্খের নিকটে সামুকের কিবা শোভা। সুমেরু নিকটে যেরূপ উলুতোপার প্রভা॥ অমৃত নিকটে ইক্ষুকের কিবা কাজ। নক্ষত্র নিকটে যেন শোভে ধৃতরাজ॥ দুগ্ধের নিকটে ঘোলের কাজ নাই। ক্ষীরোদ নিকটে জেন শোভে গড়খাই॥ যদিবা অশুদ্ধ হয় আমার বচন। পণ্ডিতের মুখে তাহা করিবা শ্রবণ॥"

এই বিবরণটি সুকবি শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাড়ীর একখানি পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। এই পুঁথি খানিতে পদ্মাপুরাণের অপর লেখক দ্বিজবংশীদাসের পিতার নাম যাদবানন্দ বলিয়া উল্লিখিত দৃষ্ট হয়।

উপসংহার কালে আমি ত্রিপুরেশ্বর স্বর্গীয় বীরচন্দ্র মাণিক্য মহোদয়ের মৃত্যুতে গভীর পরিতাপ প্রকাশ না করিয়া পারিব না। তিনি এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের ব্যয় ভার বহন করিয়াছিলেন, আমার নানারূপ বিপদের মধ্যে ৪ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুও অন্যতম বলিয়া গণ্য করিয়াছি। তাঁহার মৃত্যুশয্যার এক প্রান্তে আমার এই সামান্য পুস্তকখানি পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি ইহা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইহাই আমার ঈষৎ আত্মতৃপ্তি ও সান্ত্বনার কারণ। এবার যাঁহাদের নিকট পারিবারিক অভাব মোচনার্থ এবং পুস্তকের জন্য অর্থ সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহাদের অধিকাংশের নিতান্ত অমত হওয়াতে, নাম প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের বর্ত্তমান ডিরেক্টার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পেড্‌লার সাহেব বঙ্গীয় বিদ্যালয় সমূহের জন্য এই নূতন সংস্করণের ৭০ কাপি গ্রহণ করিয়া আমার অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

কলিকাতা।
১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯০১। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

এই সংস্করণে পুস্তকখানির আমূল সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পর যে সমস্ত প্রাচীন পুস্তক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্বিবরণী এবার গ্রন্থভাগে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। প্রাচীন যাত্রা ও কবিওয়ালাগণের সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব এখনও সংগৃহীত হয় নাই ; আমরা তৎসংগ্রহ বিষয়ে চেষ্টিত আছি। যদি এই সংগ্রহ শেষ করিতে পারি তবে তাহা ভবিষ্যতে পুস্তকের অন্তর্গত করিব, আশা রহিল।

এই সংস্করণ যন্ত্রস্থ করিবার পরে পুস্তক সংশোধন ও পরিবর্ত্তনাদি বিষয়ে আমি আমার স্নেহাস্পদ প্রিয় সুহৃদ্ সাহিত্যক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, ও শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত, বি-এ, উভয়ের নিকট বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছি। 'বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক'-সম্পাদক আমার প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় এবার এই পুস্তকের অনুক্রমণিকাটী প্রস্তত করিয়াছেন। এজন্য আমি ইঁহাদের নিকট ঋণী রহিলাম।

দ্বিতীয় সংস্করণের অনুক্রমণিকাটী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সুকবি মন্মথ নাথ সেন, বি-এ, প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। অল্প বয়সে তিনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিয়া-ছেন। এই পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ দেখিবার জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। অদ্য তাঁহার স্নেহমধুর সুদর্শন তরুণ মূর্ত্তির স্মৃতি আমার চিত্তকে ব্যথিত করিতেছে।

১৯ কাঁটাপুকুর লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।
১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৮।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

সূচিপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গৌড়ীয় যুগ অথবা শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ব-সাহিত্য।

সপ্তম অধ্যায়।

(৩) পদাবলী সাহিত্য—(২৯০—৩২০ পৃঃ।)

(সপ্তম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট)—৩৮৫—৪১২।

অষ্টম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

নবম অধ্যায়।

কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ অথবা নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ।

(২) সাহিত্যে নূতন আদর্শ—(৫৬৩—৫৬৭ পৃঃ)।

(৩) কাব্য-শাখা—(৫৬৭—৬২১ পৃঃ)

সাঙ্কেতিক শব্দের অর্থ।

সাঙ্কেতিক শব্দ		অর্থ।
অঃ মঃ	... ...	ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল।
উঃ চঃ	... ...	উত্তর চরিত।
কবীন্দ্র	... ...	কবীন্দ্র পরমেশ্বরেরকৃত মহাভারতের অনুবাদ (পরাগলী মহাভারত)।
ক, ক, চ,	... ...	কবিকঙ্কণ চণ্ডী।
চঃ, কৌ,	... ...	চণ্ড কৌশিক।
[illegible] ,	... ...	চৈতন্য চরিতামৃত।
.চ, ভা,	... ...	চৈতন্য ভাগবত।
চৈ, ম,	... ...	চৈতন্য মঙ্গল।
প, ক, ত,	... ...	পদকল্পতরু।
বি সু	... ...	বিদ্যাসুন্দর।
বেঃ গঃ পুঁথি	... ...	বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট পুঁথি।
ভা, বি,	... ...	ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর।
মা, চ, গা,	... ...	মাণিক চাঁদের গান।
মা, গা	... ...	ঐ
মা, চ	... ...	মাধবাচার্য্যের চণ্ডী।
মৃঃ কঃ	... ...	মৃচ্ছকটিক।
মুঃ রাঃ	... ...	মুদ্রারাক্ষস।
রা, বি	... ...	রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর।
সঞ্জয়	... ...	সঞ্জয়কৃত মহাভারত।
শকুঃ	... ...	শকুন্তলা।
শূ, পু	... ...	শূন্যপুরাণ।
হঃ লিঃ	... ...	হস্তলিপি।

লিপি ও চিত্রসূচি।*

---

* এই চিত্রগুলি সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় বিবরণ দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় প্রদত্ত হইয়াছে।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

প্রথম অধ্যায়।

বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি।

বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপি ১০০০ বৎসরেরও অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী।

বঙ্গভাষা * কোন্ সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নিশ্চয়রূপে নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর নহে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যেমন কোন ধর্ম্মবীর কি কর্ম্মবীরের আবির্ভাব-সময় সম্বন্ধে অঙ্কপাত দৃষ্ট হয়, পাঠক-গণের মধ্যে হয় ত কেহ কেহ এই অধ্যায়-ভাগে সেইরূপ একটা খৃষ্টাব্দ

* শ্রীযুক্ত গ্রীয়ার্‌সন্ সাহেব ভারতবর্ষের প্রচলিত ভাষাসমূহের (লোকসংখ্যা-সমেত) নিম্নলিখিত তালিকা দিয়াছেন :—

ক। উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় শ্রেণী।
সিন্ধী (২,৫৯০,০০০)
কাশ্মীরী (৪,০৯০,০০০)
পশ্চিম পঞ্জাবী (২,০০০,০০০)।

খ। মধ্য ভারতীয় শ্রেণী।
(অ) পশ্চিমাংশ।
পূর্ব্ব পঞ্জাবী (১৪,৭২০,০০০)
গুজরাতী (১১,০৬০,০০০)
রাজপুত্নী (১২,১৫০,০০০)
হিন্দী (৩৫,৮২০,০০০)
(আ) উত্তরাংশ।
মধ্যবর্ত্তী (পাহাড়ী ১,১৫০,০০০)
নেপালী (৩,০২০,০০০)

গ। পূর্ব্ব ভারতীয় শ্রেণী।
(অ) পূর্ব্বমধ্য।
বৈশবারী (২০,০০০.০০০)
বিহারী (৩০,০০০,০০০)
(আ) দক্ষিণাংশ।
মহারাষ্ট্রী (১৮,৯৩০,০০০)
(ই) পূর্ব্বাংশ।
বাঙ্গালা (৪৯,৩৪০,০০০)
আসামী (১,৪৪০,০০০)
উড়িয়া (৯,০১০,০০০)

ভারতবর্ষীয় আর্য্যভাষাকথনশীল লোকের সংখ্যা সর্ব্বসমেত ২৯৯,৩২০,০০০।

—এসিয়াটিক্ সোসাইটির জার্ণ্যাল্ নং ৪, ১৮৯১।

কি শতাব্দের প্রত্যাশা করিতেছেন; কিন্তু ভাষার উৎপত্তিসম্বন্ধীয় প্রশ্নের তদ্রূপ সহজ উত্তর দেওয়া যায় না। কোন কোন লেখক এই শ্রেণীর পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনের জন্য বলিয়াছেন, '১০০০ বৎসর হইল, বঙ্গভাষা ও বঙ্গাক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে।' ললিতবিস্তরে দেখা যায়, বুদ্ধদেব বিশ্বামিত্র নামক অধ্যাপকের নিকট অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, ব্রাহ্মী, সৌরাষ্ট্রী ও মাগধলিপি শিখিতেছেন। ইহা ত খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বের কথা। বিশ্বকোষের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত ৯৩০ শকের হাতের লেখা একখানি কাশীখণ্ড আমরা দেখিয়াছি। উহার অক্ষর 'কুটিল' অক্ষরের লক্ষণাক্রান্ত প্রাচীন বঙ্গলিপি। সেন-রাজগণের তাম্রশাসনগুলিতে ঐরূপ অক্ষরের ব্যবহার দৃষ্ট হয়; উহা ন্যূনাধিক ৮০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই সকল লিপিমালার পূর্ণাবয়ব দেখিয়া তাহা যে বঙ্গাক্ষর উৎপত্তির অব্যবহিত পরেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত হইবে না। আমরা পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে ডাক ও খনার বচন সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পাঠক দেখিবেন, উহারা সম্ভবতঃ বৌদ্ধ-যুগের বঙ্গভাষার নিদর্শন। এতদ্দেশপ্রচলিত ডাকের বচন অপেক্ষাও প্রাচীনতর বঙ্গভাষায় বিরচিত উক্তরূপ বচনের নমুনা নেপালে পাওয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে বিরচিত কয়েকখানি প্রাচীন বাঙ্গালা-গ্রন্থ সম্প্রতি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বৌদ্ধপণ্ডিত কানুভট্ট-প্রণীত 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' দশম শতাব্দীর শেষভাগে বিরচিত হয়। উহা সহজিয়া ভাবের প্রেমগীতিসম্বলিত বাঙ্গালা-গ্রন্থ। এইরূপ আর একখানি গ্রন্থের নাম 'বোধিচর্য্যাবতার'। প্রাচীন বঙ্গভাষার এই দুই নিদর্শন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং লিখিত বাঙ্গালাই এক সহস্র বৎসরের অপেক্ষা সুপ্রাচীন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষীয় অক্ষরমালার উৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। প্রিন্সেপ্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, ভারতবর্ষীয় অক্ষর গ্রীক্‌দিগের অক্ষর হইতে উদ্ভূত।

ভারতীয় অক্ষর সম্বন্ধে বিভিন্ন মত।

সময়ের পৌর্ব্বাপর্য্য ও শাব্দিক সূত্রের বিচার করিলে, এই মত কোনরূপে সমর্থিত হইতে পারে না বলিয়া, অনেকেই উহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। স্যার্ উইলিয়ম্ জোন্স্ প্রভৃতি লেখকগণ অনুমান করেন, ভারতবর্ষীয় অক্ষর ফিনিসিয়ান্ অক্ষর হইতে গৃহীত। বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, অশোকলিপির সহিত ফিনিসিয়ান্ অক্ষরের বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই। টেলর্ প্রভৃতি কয়েক জন পণ্ডিত বলেন, ভারতবর্ষীয় লিপি সেবিয় (Sabian) লিপির অনুরূপ। কিন্তু এ পর্য্যন্ত শেষোক্ত লিপির যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটিই তাদৃশ প্রাচীন নহে; সুতরাং তাহা হইতে ভারতীয় লিপির উদ্ভব অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না। মোক্ষমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এ জন্য এই অনুমান অগ্রাহ্য করিয়াছেন। টেলর্ সাহেব স্বয়ং স্বীয় মতের সমর্থন করিতে অসমর্থ হইয়া কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; তিনি বলেন ভারতীয় লিপির আদি নিদর্শন হয় ত ওমান্, হাড্রাম্, অর্‌মা, সেবা কিংবা অন্য কোন অজ্ঞাত রাজ্য হইতে কালক্রমে আবিষ্কৃত হইতে পারে।

অধ্যাপক ডসন্, টমাস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে, ভারতবর্ষ স্বীয় অক্ষরমালার জন্য অন্য কোন দেশের নিকট ঋণী নহে। ডসন্ লিখিয়াছেন, "হিন্দুরা যে নিজেরাই স্বীয় অক্ষরের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। ভাষাতত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে হিন্দুগণ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা ব্যাকরণের যেরূপ উৎকর্ষসাধন করিয়াছিলেন এবং কণ্ঠস্বরের যেরূপ সূক্ষ্ম বিভিন্নতার উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাতে অক্ষরের উদ্ভাবন তাঁহাদের

নিশ্চয়ই আবশ্যক হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা অঙ্কশাস্ত্রে একটি উৎকৃষ্ট প্রণালীর উদ্ভাবন দ্বারা সংখ্যাবোধক-চিহ্ন-গঠনের যে প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।” ক্যানিংহাম্ সাহেবও এই মতাবলম্বী। তিনি অনুমান করেন, হিন্দুদের অক্ষর মিসর দেশীয় চিত্রাক্ষরের ন্যায় একই প্রণালীতে স্বাধীনভাবে উদ্ভূত হইয়াছে। তদনুসারে তিনি—

𑀔 ... (পালীর ‘খ’) ... খননের যন্ত্র (কোদাল) হইতে,
𑀬 ... (অন্তঃস্থ ‘য’) ... যব হইতে,
𑀤 ... (‘দ’) ... দন্ত হইতে,
𑀧* ... (‘প’) ... পাণিতল হইতে,
𑀩 ... (‘ব’) ... বীণা হইতে,
𑀮 ... (‘ল’) ... লাঙ্গল হইতে,
𑀳 ... (‘হ’) ... হস্ত হইতে,
𑀰 ... (‘শ’) ... শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে,

এই ভাবে সমস্ত অক্ষরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিংবা দ্রব্যবিশেষ হইতে অনুকৃত হইয়াছে, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই মতের ঐতিহাসিক মূল্য কি বলিতে পারি না, কিন্তু ইহাতে কিছু কবিত্ব আছে, সন্দেহ নাই।

ভারতীয় লিপির মৌলিকত্ব।

যাঁহারা বলেন, ভারতীয় লিপিমালা বিদেশ হইতে আনীত, তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই যে, এতদ্দেশের প্রাচীনতম লিপি (অশোকলিপি) এত সুন্দর ও সুগঠিত (১) যে, উহা যদি দেশীয় সামগ্রী হইত, তবে যে প্রণালীতে ভারতীয় আদিম লিপি ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া অবশেষে সুশৃঙ্খল অশোক-

(১) “The elaborate and beautiful alphabet employed in these records is unrivalled among the alphabets of the world for its

লিপিতে পরিণত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রকার নিদর্শন ভারতবর্ষের শৈলমালায় কিংবা কোন প্রাচীন প্রস্তরফলকে অবশ্যই রহিয়া যাইত; কারণ, আদিম লিপি পরিবর্ত্তিত হইয়া সুগঠিত অশোকলিপিতে পরিণত হইতে নিশ্চয়ই বহু শতাব্দীর প্রয়োজন হইয়াছিল। মিসর, চীন, জাপান প্রভৃতি যে যে স্থানে স্বাধীনভাবে অক্ষরের উদ্ভব হইয়াছিল, সেই সেই দেশে চিত্রাক্ষরের নানারূপ অসম্পূর্ণ গঠনের নিদর্শন প্রস্তরাদিতে সূচিত রহিয়াছে। সেই সকল দেশে দেখা যায়, আদিম অবস্থায় চিত্রাক্ষরগুলির সংখ্যা প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল, উহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া ভাষা-বিজ্ঞানের উপযোগী নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি লিপিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু অশোকলিপির প্রারম্ভ হইতেই উহা স্বরবিজ্ঞানের অনুযায়ী নির্দ্দিষ্টসংখ্যক অক্ষরে সীমাবদ্ধ। এই পূর্ব্বোক্ত পরিণতিপ্রাপ্তির আরম্ভসূচক নিদর্শন ভারতবর্ষে নাই; এই কারণে কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, ভারতবাসিগণ বিদেশ হইতে লিপিমালা গ্রহণ পূর্ব্বক উহা শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছিলেন। তাঁহারা আরও বলেন, অশোকলিপি নানা দূরবর্ত্তী প্রদেশে একই প্রকার দৃষ্ট হয়; প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে লিপিমালার প্রচলন থাকিলে, অশোকের অনুশাসন ভিন্ন ভিন্ন দেশ-প্রচলিত লিপিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ অক্ষরে উৎকীর্ণ হইত।

উক্ত যুক্তিগুলি সমীচীন বোধ হয় না। ভারতবর্ষের প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি

---

scientific excellence. Bold, simple, grand, complete—the characters are easy to remember, facile to read, and difficult to mistake, representing with absolute precision the graduated niceties of sound which the phonetic analysis of Sanskrit grammarians had discovered in that marvellous idiom. None of the artificial alphabets which have been proposed by modern phonologists excel it in delicacy, ingenuity, exactitude, and comprehensiveness."

Isaac Taylor's *The Alphabet*, Vol. II, p. 289.

এখন লুপ্তপ্রায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বারাণসী প্রভৃতি প্রাচীনতম স্থানে পুরাতন মন্দির প্রভৃতি নাই বলিলেও চলে। প্রাচীন কীর্ত্তির উপর এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচার আর কোন দেশে সংঘটিত হয় নাই। সহসা কোন রাষ্ট্রবিপ্লবে বা অত্যাচারীর আক্রমণে যে সমস্ত গৌরবচিহ্ন নষ্ট হয়, তাহাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর; অন্ততঃ সেরূপ আকস্মিক উৎ-পীড়নে দেশের সমস্ত কীর্ত্তি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটে না। কিন্তু ভারতবর্ষ ক্রমাগত শত শত বৎসর ধরিয়া যে অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে প্রাচীন কীর্ত্তির যে কিছু সামান্য নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। হিউনসাঙ্ যে সকল বিগ্রহ ও মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহার কয়টি এখন বর্ত্তমান? কাশীর ১০০ ফিট উচ্চ ধাতুনির্ম্মিত শিববিগ্রহ এখন কোথায়? এখন আমাদের তীর্থ-গুলির প্রাচীনতার প্রমাণ শুধু কিম্বদন্তী ও প্রাচীন গ্রন্থাদি। ভারতের সর্ব্বত্র শত শত ভগ্ন বিগ্রহে অশ্রুতপূর্ব্ব নীরব অত্যাচারের কাহিনী অব্যক্ত ভাষায় লিখিত রহিয়াছে। এ অবস্থায় প্রাচীনগ্রন্থোক্ত প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণ এদেশে স্বভাবতঃই বিরল হইবার কথা।

কিন্তু প্রমাণ বিরল হইলেও একেবারে দুষ্প্রাপ্য নহে। ভারতবর্ষের শৈলে ও গুহায় উৎকীর্ণ লিপি ও মন্দিরাদির এ পর্য্যন্ত অধিক অনুসন্ধান হয় নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন অক্ষরের অধিকতর নিদর্শন ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইতে পারে। মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারে নিরত ছিলেন, সুতরাং দেশে দেশে উৎকীর্ণ অনুশাসনের প্রচার দ্বারা ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এ ভাবে ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা এই সময়েই নূতন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতিগণ এই ভাবের অনুশাসনপ্রচার আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। এ দেশে যুধিষ্ঠিরের পর অশোকের ন্যায় রাজচক্রবর্ত্তী আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। সেই অশোকেরই

প্রস্তরানুশাসন ভিন্ন তদানীন্তন আর কোন লিপিচিহ্ন পাওয়া যাইতেছে না; এবং সেই চিহ্নগুলিও যে বহুসংখ্যক লুপ্ত গৌরবের মুষ্টিমেয় অবশেষ, তৎসম্বন্ধেও সন্দেহ নাই। কথিত আছে, মহারাজ প্রিয়দর্শী ৮৪,০০০ অনুশাসন প্রচারিত করিয়াছিলেন; বর্ত্তমান কালে তন্মধ্যে কেবল ৪০ খানি পাওয়া গিয়াছে। সেই ৪০ খানির মধ্যেও যে ধ্বংসক্রিয়া সূচিত হয় নাই, এ কথা বলা যায় না। দেখা যায়, এলাহাবাদের প্রস্তরানুশাসনের কতক অংশ কর্ত্তিত করিয়া ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর তন্মধ্যে স্বীয় মহিমাজ্ঞাপক এক প্রস্তরলিপি সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। এমন অবস্থায় যদি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদের কোন মুদ্রিত নিদর্শন পাওয়া না যায়, তাহা হইলে ভারতীয় লিপির মৌলিকতায় সন্দিহান হইবার কারণ নাই। কিছু নিদর্শন যে না পাওয়া গিয়াছে, এমনও নহে। পঞ্জাবে হরপ নামক স্থানের স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপি ইহার অন্যতর প্রমাণ। এখনও এই স্তম্ভস্থ প্রাচীন চিত্রলিপির পাঠোদ্ধার-পর্য্যন্ত হয় নাই; তথাচ ইহা যে অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ৫০০ বৎসরের লিপির নিদর্শন, তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। অধিক দিনের কথা নহে, আফগান-প্রান্ত হইতে পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ কতকগুলি অতি প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। য়ুরোপীয় প্রধান প্রধান প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই। কালে এই লিপিমালার পাঠোদ্ধার হইলে ভারতীয় লিপিতত্ত্বের আর এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। ভারতের প্রান্তসীমার কথা ছাড়িয়া দিতেছি। আমাদের এই বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির মধ্যেই মগধপতি জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজে 'জরাসন্ধ-কা-বৈঠকে'র নিকট পার্ব্বতীয় পথের উপর প্রাচীনতম লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তাহা যে কত প্রাচীন, তাহা কেহ এখনও স্থির করিয়া বলিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, 'ঐ লিপি মগধরাজ জরাসন্ধের সমসাময়িক হইলেও হইতে পারে; উহা চিত্রলিপি ও কীলরূপা শিল্পলিপির

মধ্যবর্ত্তী আকারের, অথচ তদপেক্ষা কোন প্রাচীনতম লিপি।' অল্প দিন হইল, বস্তী জেলায় প্রাচীন কপিলবাস্তুর অতি সান্নিধ্যে পিপড়াও গ্রামে মিঃ পেপী একটী স্তূপ হইতে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষবিশিষ্ট উৎকীর্ণ বিবরণযুক্ত প্রস্তরপাত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত উক্ত উপহার মহা সমারোহের সহিত শ্যামাধিপতি স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সাঁচীর স্তূপ হইতে বুদ্ধদেবের দুই শিষ্য সারিপুত্র ও মহামৌদ্গল্যায়নের দেহাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; তাহার সহিত উৎকীর্ণ-লিপি পাত্রেরও উদ্ধার হইয়াছে। এই উভয় লিপিই যে বুদ্ধ-নির্ব্বাণের প্রায় সমসাময়িক, তাহা বলা বাহুল্য।

অশোক-অনুশাসনে দুই প্রকার অক্ষর দৃষ্ট হয়; কপূরদি-গিরির অনুশাসনে যবনলিপি ব্যবহৃত হইয়াছে; উহার গতি দক্ষিণ দিক্ হইতে বাম দিকে। অপর সমস্ত দেশীয় অনুশাসনে অশোকের রাজসভার অক্ষরই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। রাজশিল্পিগণ কর্ত্তৃক খোদিত অক্ষরে রাজধানীর গৌরবরক্ষা কিছু অস্বাভাবিক হয় নাই; কেবল লোকের বোধসৌকর্য্যার্থ অনুশাসনের ভাসা দেশভেদে কিছু ভিন্ন করা হইয়াছে। অশোকের ন্যায় প্রতাপান্বিত রাজা রাজকার্য্যের সৌকর্য্যার্থ স্বীয় প্রদেশের অক্ষর যে অধীনস্থ জনপদসমূহে প্রচলিত করিবেন, ইহাও বিচিত্র নহে। নানারূপ প্রাদেশিক অক্ষর বর্ত্তমান থাকিলেও দেবনাগর এক সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। অতএব অশোকের অনুশাসনে নানাস্থানে একরূপ লিপি ব্যবহৃত হইয়াছিল দেখিয়া সেই সেই দেশে অন্য লিপি প্রচলিত ছিল না, এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ও বিদেশীয় ভ্রমণকারীদিগের ভ্রমণবৃত্তান্তে ভারতবর্ষীয় লিপির মৌলিকত্ব বিশেষরূপে প্রমাণিত হইতেছে। মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে জন্মপত্রিকা লিখিবার পদ্ধতি ও দূরত্বসূচক ক্রোশাঙ্কযুক্ত প্রস্তরখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন। আলেকসন্দারের

সেনাপতি নিয়ার্কস্ লিখিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষের লোকেরা তূলা দিয়া এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত করিয়া থাকে। ললিতবিস্তরে ভারতীয় নানা লিপিমালার বিষয় উল্লিখিত আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পাণিনি ব্যাকরণের অষ্টমাধ্যায়ে 'লিপি,' 'গ্রন্থ,' 'পুস্তক' প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়, এবং 'যবনানী' শব্দের উল্লেখ থাকায় স্বতন্ত্র আর্য্যলিপির সত্তাই প্রমাণিত হইতেছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থে 'কাণ্ড,' 'পটল' (যাহাদের অর্থ **পুস্ত**কাধ্যায়) শব্দ পাওয়া যাইতেছে। মহাভারত ও মনু-সংহিতায় এ দেশে লিপি প্রচলিত থাকার নানারূপ প্রমাণ রহিয়াছে। শতপথব্রাহ্মণ গ্রন্থে বেদের ১০,৮০০ পংক্তি দোষাবহ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এবং যজুর্ব্বেদে পরার্দ্ধ সংখ্যা পর্য্যন্ত গণনা পাওয়া যায়। লেখার পদ্ধতি না থাকিলে এরূপ জটিল গণনা সম্ভব হইত না। কবিতাই কণ্ঠস্থ করিয়া শিক্ষালাভ কতকটা স্বাভাবিক, কিন্তু বৈদিক গ্রন্থগুলিতে গদ্যরচনারও অভাব নাই। আমরা এই সকল কারণে আর্য্যলিপির মৌলিকতা সম্বন্ধে কোন ক্রমেই সন্দেহ করিতে পারি না। ভারতীয় লিপির মৌলিকতার প্রধান বিরোধী মোক্ষমূলর ১৮৯৯ খৃঃ নবেম্বর মাসের 'নাইনটিন্থ্ সেঞ্চুরী' নামক পত্রিকায় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ক্রোশাঙ্ক-চিহ্ন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর হিন্দুগণ নিজেরাই উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে; অথচ তাঁহারা সমস্ত অক্ষরমালার উদ্ভাবন করেন নাই! এ যুক্তি বড়ই অদ্ভুত বোধ হয়।

লিপিমালার পরিবর্ত্তন; প্রাচীন বঙ্গলিপি।

আর্য্যাবর্ত্তবাসীদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অক্ষর ব্রাহ্মীলিপি নামে অভিহিত। তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়ার সুবিধা নাই। অশোকের অনুশাসনে যে অক্ষর দৃষ্ট হয়,* খৃষ্ট জন্মিবার বহু পূর্ব্বে তাহা প্রচলিত ছিল। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে অশোকলিপি

---

* অশোক মৌর্য্যবংশীয় রাজা ছিলেন, এজন্য কোন কোন লেখক এই অক্ষরকে

পরিবর্ত্তিত হইয়া যে আকার ধারণ করিল, তাহা সচরাচর 'গুপ্তলিপি' আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। পাটলিপুত্রের গুপ্তবংশীয় সম্রাট্‌দিগের অনুশাসন এই অক্ষরে লিখিত। আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ স্থলে প্রধানতঃ এই অক্ষর প্রচলিত থাকিলেও, স্থানভেদে স্বভাবতঃই ইহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। গুপ্তবংশের অবনতির পর 'গুপ্তলিপি' হইতে 'সারদা,' 'শ্রীহর্ষ,' 'কুটিল' প্রভৃতি প্রাচ্য অক্ষরের উদ্ভব হইল। 'সারদা' উত্তর ও পশ্চিম ভারতে, 'শ্রীহর্ষ' আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যপ্রদেশে এবং 'কুটিল' ও তল্লক্ষণাক্রান্ত অপরাপর প্রাচ্য অক্ষর পূর্ব্ব-ভারতে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। 'সারদা' অক্ষর হইতে বর্ত্তমান 'কাশ্মীরী,' 'গুরুমুখী' ও 'সিন্ধী' অক্ষরের উৎপত্তি। বর্ত্তমান সময়েও কাঙ্গরা ও তন্নিকটবর্ত্তী উপত্যকার অধিবাসীরা যে অক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকে, গুপ্তলিপির সহিত তাহার অনেকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। 'শ্রীহর্ষ' অক্ষর অধিক কাল প্রচলিত ছিল না; ইহা হইতেই দেবনাগরী ও বিবিধ নাগরী অক্ষরের উৎপত্তি হয়। এখনও তিব্বত দেশে সংস্কৃত লিখিবার জন্য শ্রীহর্ষ-অক্ষরের অনুরূপ এক প্রকার অক্ষর ব্যবহৃত হয়। 'কুটিল' প্রভৃতি অক্ষর বৌদ্ধ পালরাজগণের অধিকার-কালে নেপাল হইতে কলিঙ্গ ও বারাণসী হইতে আসাম, এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বঙ্গাক্ষর কুটিল ও মাগধাদি লিপি, এক বংশেরই লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বাঁকুড়ার সুশুনিয়া পাহাড় হইতে মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মার একখানি শিলালিপির আবিষ্কার করিয়াছেন। এই লিপিখানি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর কোন সময়ে খোদিত হইয়াছিল। এই লিপির আকার মোটামুটি গুপ্তলিপির মত; তবে অনেক অক্ষরের ছাঁদ গুপ্ত-বংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই বোধ হয়। দেড় হাজার বর্ষেরও পূর্ব্বে

মৌর্য্যলিপি অভিধান দিয়া থাকেন। কানিংহাম্ ইহাকে 'ইন্দপালি' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

বাঙ্গালা দেশে কিরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহা চন্দ্রবর্ম্মার লিপি হইতে কতকটা জানা যায়।* আমরা উপক্রমেই বলিয়াছি যে খৃষ্ট জন্মিবার ৩০০ বর্ষ পূর্ব্বে, অর্থাৎ এখন হইতে ২২০০ বর্ষ পূর্ব্বেও, মগধলিপি, অঙ্গ-লিপি, বঙ্গলিপি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন লিপি প্রচলিত ছিল, তাহা ললিত-বিস্তর হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। তখনও নাগরী অক্ষরের উৎপত্তি হয় নাই, অথবা কোন অক্ষর নাগরী নামেও গণ্য হয় নাই।† সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে, নাগরী অক্ষর অপেক্ষা আমাদের বঙ্গাক্ষর প্রাচীন। বঙ্গলিপির রূপ অনেকটা চন্দ্রবর্ম্মার লিপিতে প্রতিফলিত হইয়াছে। সেই লিপিই ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া বর্ত্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উড়িয়া লিপি ও বঙ্গীয় লিপি অনেকটা একই প্রকারের। প্রভেদ এই যে, উড়িয়া অক্ষরগুলির মাত্রা গোলাকার। উৎকলবাসিগণ তাল-পত্রের উপর 'খুন্তি' নামক লৌহ-সূচী দ্বারা লিখিতেন; সূক্ষ্মাগ্র খুন্তির দ্বারা অক্ষরের শিরোভাগে সরল রেখার ন্যায় মাত্রা টানিতে গেলে তাল-পত্র ছিন্ন হইয়া যাইত, এই জন্য তাঁহারা গোলাকৃতি মাত্রা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গালা দেশে কঞ্চির কলমের অগ্রভাগ তির্য্যক্-ভাবে কাটা হইত; এই রূপ লেখনী দ্বারা প্রাচীন বর্ণমালার বৃত্তাকার অক্ষরগুলি অঙ্কিত করা সুকঠিন; কলমের টানে অক্ষরের কোণগুলি পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠে, এবং অতি সহজে ও অনায়াসে সরল রেখার মাত্রা টানা যায়; বলা বাহুল্য, কুটিলাক্ষরের শ্রেণীভুক্ত বঙ্গলিপির ইহাই বিশেষত্ব।

আসামী অক্ষর বঙ্গাক্ষরেরই প্রকারভেদমাত্র, ইহাতে কয়েকটি অপ্রচলিত পুরাতন বাঙ্গালা ও মৈথিল অক্ষর রহিয়াছে। প্রাচীন মৈথিল

---

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৩ সাল, ২৬৯ পৃষ্ঠা।

† সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০২ সাল, ৪৮১ পৃষ্ঠা।

ও প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের প্রভেদ অতি সামান্য ছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে লিখিত বাঙ্গালা ও মৈথিল পুঁথির হস্তাক্ষর দেখিয়া, সকলে উভয়ের পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমান মৈথিল অক্ষর বাঙ্গালা ও দেবনাগরীর মধ্যবর্ত্তী। নেপালীদিগের অক্ষরে এখনও প্রাচীন মৈথিল অক্ষরের ছাঁদ অনেকটা বিদ্যমান।

মহারাজা চন্দ্রবর্ম্মার লিপিই বঙ্গাক্ষরের প্রাচীনতম নিদর্শন। কাশী-খণ্ড পুঁথির বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; উহা ১০০৮ খৃষ্টাব্দের লেখা। শ্রীগয়াকর নামক এক ব্যক্তি বৌদ্ধতন্ত্রসম্বন্ধীয় কতকগুলি পুঁথি বঙ্গাক্ষরে (১১৯৮, ১১৯৯ ও ১২০০ খৃষ্টাব্দে) নকল করিয়াছিলেন; ইহাদের একখানিতে মগধের পালবংশের শেষ রাজা গোবিন্দপাল দেবের রাজ্যবিনাশের প্রসঙ্গ আছে; এই পুথিখানি নেপাল হইতে সংগৃহীত; এক্ষণে ইহা কেম্ব্রিজ নগরে রক্ষিত হইয়াছে। সংস্কৃত কলেজের লাই-ব্রেরীতে কতকগুলি বাঙ্গালা হস্তলিখিত পুঁথি আছে; সেগুলিও বঙ্গে মুসলমান রাজত্বের প্রথম শতাব্দীতে লিখিত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনের অনেক স্থলে ঠিক আধুনিক বাঙ্গালা লিপির মত অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং অপরা-পর স্থলের লিপিও বঙ্গাক্ষরেরই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন রূপ। উৎকলরাজ দ্বিতীয় নৃসিংহ দেবের ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহার অক্ষরের সহিত প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই।

১১৫৭ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ অশোকবল্ল মহারাজার শিলালিপি (বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত) এবং ১২৪৩ খৃষ্টাব্দে দামোদর রাজার প্রদত্ত তাম্রশাসনগুলিতেও আমাদের চিরপরিচিত বঙ্গাক্ষরের প্রাচীন রূপ বিদ্যমান। প্রাচীন লিপি-মালার প্রতিরূপ এই অধ্যায়শেষে সন্নিবিষ্ট হইল।

বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধ-প্রচারকগণ এসিয়ার নানা স্থানে ধর্ম্মপ্রচারের

জন্য পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এখনও জাপানের বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থসকল দশম কিংবা একাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত বঙ্গাক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে; এই অক্ষর তদ্দেশবাসী পুরোহিতগণের নিকট অতি পবিত্র। জাপানের হুরিয়ূজি মন্দিরে "উষ্ণীষবিজয়ধারিণী" নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থ রক্ষিত আছে। উহা সেই মন্দিরের পুরোহিতগণ পূজা করিয়া থাকেন। এই পুস্তকখানি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রচলিত বঙ্গাক্ষরে লিখিত, এবং ইহার একখানি প্রতিলিপি অক্স্‌ফোর্ড্‌ য়ুনিভার্সিটি সংগ্রহ করিয়া এনেক্‌ডোটা অক্সিনিয়েন্‌সিস্‌ (Anecdota Oxiniensis) গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছেন।

আর্য্যভাষার পরিবর্ত্তন।

বঙ্গাক্ষর যেরূপ বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া বর্ত্তমান আকার ধার করিয়াছে, বঙ্গভাষাও সেইরূপ সুদীর্ঘকাল হইতে নানারূপ পরিবর্ত্তন ও বিবিধ দেশজ ভাষার মিশ্রণজনিত রূপান্তর গ্রহণ করিয়া, বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। আর্য্যগণ যে সময়ে এ দেশে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই এই পরিবর্ত্তনের সূচনা; ক্রমশঃ বঙ্গবাসী আর্য্যগণের কথিত ভাষা গৌড়ীয় * অন্যান্য ভাষা হইতে পৃথক্‌ হইয়া দেশজ্ঞাপক স্বতন্ত্র আখ্যা গ্রহণ করিল। কিন্তু কোন্‌ সময়ে বঙ্গভাষার উৎপত্তি, কে বলিবে? আদি দেখিবার ঔৎসুক্য আমাদের নাই; প্রকৃতিও সৃষ্টির প্রথম কাহিনী যবনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন; আদি বৃত্তান্তের চিররহস্যভেদে বিজ্ঞান অসমর্থ। মনুষ্যজাতি যত প্রাচীন, ভাষাও তত প্রাচীন। মনুষ্যভাষার যে সর্ব্বপ্রাচীন অমর নিদর্শন রহিয়াছে, বঙ্গভাষার আদি রূপ অন্বেষণ করিতে গেলে সেই বেদকেই অবলম্বন করিতে হইবে।

---

* হরন্‌লি সাহেব নিম্নলিখিত ভাষাগুলিকে 'গৌড়ীয়-ভাষা',—এই সাধারণ সংজ্ঞা দিয়াছেন:—উড়িয়া, বাঙ্গালা, হিন্দী, নেপালী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাতী, সিন্ধী, পঞ্জাবী ও কাশ্মীরী। আমরাও এই সংজ্ঞাই ব্যবহার করিব।

আর্য্যজাতির প্রথম ভাষা বেদে, তাহার পর রামায়ণাদির ভাষা সংস্কৃত ; সংস্কৃতের পর বৌদ্ধদিগের পালি ও গাথা প্রভৃতি প্রাকৃত ; চতুর্থ স্তরে, বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি গৌড়ীয় ভাষাসমূহ। এস্থলে শুধু লিখিত ভাষার কথাই বলা হইয়াছে। বঙ্গভাষার উৎপত্তি কালের নির্দ্দেশ সুসাধ্য নহে ; আমরা ইহার লিখিত ভাষার পরিবর্ত্তনের কাল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। ভাষার আদি নির্ণয় করিবার ভার কল্পনাশীল কবি ও দার্শনিক-দিগের হস্তে অর্পণ করিয়া, ঐতিহাসিকগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।

বোধ হয়, যে ভাষায় আদিম হিন্দুগণ কথা কহিতেন, বেদে ঠিক সেইরূপ ভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিন্তু তৎ-

লিখিত ও কথিত ভাষা।

পরে ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনের চেষ্টা ও ব্যাকরণের সূত্রপাত হইতে কথিত ও লিখিত ভাষা স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই, রামায়ণের ভাষা ঠিক কথিত ভাষা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যখন কালিদাস 'বালেন্দুবক্র পলাশ-পর্ণে'র বর্ণনা করিতেছিলেন, অথবা জয়দেব 'মদন-মহীপতি'র 'কনক-দণ্ড-রুচি কেশরকুসুমে'র কথা লিখিতেছিলেন, তখন তাঁহারা সে ভাষায় কথা কহেন নাই। এখনও বঙ্গের কত কবি মুখে 'বিদ্যুৎ' কি 'মেঘের ডাক' বলিয়া, লেখনী দ্বারা 'ইরম্মদ' বা 'জীমূতমন্দ্রে'র সৃষ্টি করিতেছেন। তাই বলিতেছিলাম, লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে একটা প্রভেদ আছে এবং চিরদিনই থাকিবে।

লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষার মধ্যে একটা ব্যবধান বর্ত্তমান, কিন্তু সে ব্যবধানের একটা সীমা আছে ; তাহা অতিক্রম করিলে লিখিত ভাষা মৃত হইয়া পড়ে ও তৎস্থলে কথিত ভাষা একটু বিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষায় পরিণত হয়। লিখিত ভাষা উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। ক্রমশঃ বাক্য-পল্লবের প্রতি স্পৃহা ও শব্দের শ্রীবৃদ্ধি চেষ্টার ফলে লিখিত ভাষা জন-সাধারণের অনধিগম্য হইয়া পড়ে ;—তখন ভাষাবিপ্লবের প্রয়োজন হয়।

অশোকের সময় (২৫০ খৃঃ পূঃ) হইতে বঙ্গীয় বর্ণমালার ক্রম-বিকাশ।

অ আ ই

এ ও ঔ

উ

সকল

ক খ গ ঘ ঙ

চ ছ জ ঞ

ট ঠ ড ঢ ণ

ত থ দ ধ ন

প ফ ব ভ ম

য র ল ব

শ ষ স হ ক্ষ

সেন কুলকমল বিকাস ভাস্কর সোম বংশ।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বিশ্বরূপসেনের তাম্রফলক হইতে গৃহীত বঙ্গীয় অক্ষর-প্রতিলিপি।

যখন সংস্কৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার সেইরূপ প্রভেদ জন্মিল, তখন কথিত পালিভাষা কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষা হইয়া দাঁড়াইল; যখন পুনশ্চ প্রাকৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার প্রভেদ অধিক হইল, তখন বর্ত্তমান গৌড়ীয় ভাষাগুলি কিঞ্চিৎ পরিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষায় পরিণত হইল। ব্যাকরণ, শিশু ও অকৃতির বাকৃচেষ্টার শাসন করে; কিন্তু তাই বলিয়া উহা চির-প্রবাহশীল ভাষার গতি স্থির রাখিতে পারে না। ব্যাকরণকে অগ্রাহ্য করিয়া ভাষা রূপান্তর গ্রহণ করে। ব্যাকরণ যুগে যুগে ভাষার পদাঙ্কস্বরূপ পড়িয়া থাকে। ভাষা যে পথে বহিয়া যায়, ব্যাকরণ সেই পথের সাক্ষী মাত্র। বিলুপ্ত মাহেশ ব্যাকরণের পর পাণিনি, তৎপর বররুচি, পুরন্দর, যাস্ক; ইঁহাদের পর রূপসিদ্ধি, লঙ্কেশ্বর, শাকল্য, ভরত, কোহল, ভামহ, বসন্তরাজ, মার্কণ্ডেয়, ক্রমদীশ্বর, মৌদ্গল্যায়ন, শিলাবংশ—ইঁহারা ব্যাকরণ রচনা করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যাহা ভাষার দোষ বলিয়া কীর্ত্তিত, পরবর্ত্তী যুগের ব্যাকরণে তাহাই ভাষার নিয়ম বলিয়া স্বীকৃত। তাই পাণিনির নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়াও 'মহাবংশ' ও 'ললিতবিস্তর' শুদ্ধ বলিয়া গণ্য, এবং বররুচির নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়াও চাঁদ কবির গাথা কি 'চৈতন্যচরিতামৃত' নিন্দনীয় হয় নাই। সময় সম্বন্ধে যেরূপ প্রাতঃ, সন্ধ্যা, রাত্রি,—ভাষা সম্বন্ধেও তদ্রূপ—সংস্কৃত, প্রাকৃত, বাঙ্গালা বা হিন্দী;—পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার রূপান্তর।

বঙ্গভাষার ক্রমবিকাশ।

বঙ্গভাষা আমরা এখন যেরূপ বলি, তাহার মুখ্য চিহ্নগুলি কোন্ সময়ে গঠিত হইয়াছিল, তাহার নিরূপণ সহজ নহে। বঙ্গভাষা, জননীর গর্ভ হইতে শিশুর ন্যায়, কোন শুভ লগ্নে ভূমিষ্ঠ হয় নাই। বহুদিন হইতে ক্রমে ক্রমে ইহার বর্ত্তমান রূপ গঠিত হইতেছিল। কথিত ভাষা, ব্যাকরণশাসিত 'লিখিত' প্রাকৃত হইতে বহু দূরে আসিয়া পড়িল—কিন্তু এক দিনে নহে। হরন্‌লি সাহেবের মতে, ৮০০ খৃঃ হইতে ১২০০খৃঃ অব্দের মধ্যে প্রাকৃতের

যুগ লুপ্ত ও গৌড়ীয় ভাষাসমূহের যুগ উদ্ভূত হইয়াছিল। বৌদ্ধ-শক্তির পরাভবে, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে, হিন্দুজাতির নব চেষ্টার স্ফুরণে ও সংস্কৃতের নববিকাশে, সেই পরিবর্ত্তন এত দ্রুত হইল,—প্রাকৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার প্রভেদ এত বেশী হইল যে, প্রাচীন ভাষাকে বিদায় দিয়া, কথিত গৌড়ীয় ভাষাগুলিকে লিখিত ভাষার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইল। ইতিহাসেও বৌদ্ধাধিকারের লোপকাল ও হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থান-কাল ৮০০খৃঃ হইতে ১২০০খৃঃ অব্দের মধ্যে বলিয়া বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা।

ধর্ম্ম ও ভাষা।

ধর্ম্মবিপ্লবে প্রাচীন ভাব ও ভাষার সংস্কার এবং নব ভাব ও ভাষার প্রতিষ্ঠা হয়। রোমান্ যাজকদিগের প্রভুত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে, লাটিনের একাধিপত্য নষ্ট হয়। বুদ্ধদেব, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে, স্বীয় শিষ্যগণকে তাঁহার বাক্য ও কার্য্যাবলি পালিভাষায় লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দেন।* ভারতের ভাষার ইতিহাসে সেইদিন এক নবযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। যদিচ বৌদ্ধগণও মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতে পুস্তকাদি রচনা করিয়াছেন, তথাপি বুদ্ধের সেই অনুজ্ঞাপ্রচারের সময় হইতেই সংস্কৃতের অখণ্ড প্রভাব তিরোহিত হয়। দেবভাষা, দেব ও ঋষিগণের জন্য সেই দিন স্বর্গারোহণ করেন।

বৌদ্ধ প্রভাব।

বৌদ্ধাধিকারে প্রাচীন ভাষা ও ভাব দলিত হয়। ব্রাহ্মণগণ কৃষিকার্য্য আরম্ভ করেন, কখনও বা বৌদ্ধদিগের জীবে দয়া স্মরণ করিয়া হলকর্ষণ কার্য্যে নিবৃত্ত হইবার বিধি প্রণয়ন করেন, যথা,—

বৈশ্যবৃত্ত্যাপি জীবংস্তু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽপি বা। হিংসাপ্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং যত্নেন বর্জয়েৎ॥ কৃষিং সাধ্বিতি মন্যন্তে সা বৃত্তিঃ সদ্বিগর্হিতা। ভূমিং ভূমিশয়াং চৈব হন্তি কাষ্ঠময়োমুখম্॥" মনুসংহিতা, ১০ম অধ্যায়, ৮৪ শ্লোক।—এই অংশ বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক পরবর্ত্তী কালের যোজনা বলিয়া বোধ হয়। হল-চালনায়

---

* "আমার বাক্য সকল সংস্কৃতে অনুবাদ করিও না, তাহা হইলে বিশেষ অপরাধী হইবে। আমি যেমত প্রাকৃত ভাষায় উপদেশ দিতেছি, ঠিক সেইরূপ ভাষা গ্রন্থাদিতে ব্যবহার করিবে।" বুদ্ধবাক্য ত্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত হইয়াছিল, এবং ইহার টীকাকারও কহেন, বুদ্ধবাক্য সকল মকণিরুত্তি অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় রচিত।

পাছে কোন ক্ষুদ্র জীব নষ্ট হয়, সেই আশঙ্কায় এই নিষেধ। মুঞ্জশ্রী ব্রাহ্মণপণ্ডিত বলিয়া যেরূপ আদৃত ছিলেন, অপর দিকে বৌদ্ধগুরু বলিয়াও তেমনই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আদি চতুর্ব্বর্ণ হইতে নানাপ্রকার সঙ্করজাতির উদ্ভব হয়। সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ চারুদত্ত মৃচ্ছকটিকের শেষাঙ্কে বারবিলাসিনী বসন্তসেনাকে বিবাহ করিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মৃচ্ছকটিক বৌদ্ধাধিকারে রচিত। যদি সমাজে পূর্ব্বোক্ত ভাবের বিবাহপ্রথা বিশেষ নিন্দার্হ হইত, তাহা হইলে নাটকের প্রধান নায়ককে গ্রন্থকার কখনই এইরূপ পরিণয়পাশে আবদ্ধ করিতে সাহসী হইতেন না। যে ভাবে বৌদ্ধগণ রামায়ণ বিকৃত করিয়াছেন, তাহাতেই প্রতীত হয়, বৌদ্ধাধিকারে হিন্দুশাস্ত্রের দুর্গতির একশেষ হইয়াছিল। রাজা দশরথের দুই পুত্র, রাম ও লক্ষ্মণ এবং একমাত্র কন্যা, সীতা। রামায়ণের শেষে রাম সহোদরা সীতাকে বিবাহ করিলেন। * ইহা শুধু রামায়ণের বিকৃতি নহে, সমাজে বিবাহ-পদ্ধতি যে যথেচ্ছাচারে পরিণত হইয়াছিল, ইহা হইতে তাহারও আভাস পাওয়া যায়।

শুধু সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়াছিল, এরূপ নহে ;—ভাষাও বিশৃঙ্খল এবং শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। কথিত ভাষার উপর লিখিত ভাষার প্রভাব সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়। সংস্কৃতের আদর্শ লোক-চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইল ও তাহার স্থানে শিথিল প্রাকৃতভাষা রাজসভায় প্রচলিত হইল। কথিত ভাষাও পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদুভাব অবলম্বন করিল। যথা,—

১। "পণমহ জমস্স চলণে॥—মুদ্রারাক্ষস, ১ম অঙ্ক।

২। "শূপং বিক্কত্তে? পণ্ডবে শ্বেদকেদু? পুত্তে লাধাএ? লাবণে? ইন্দ উত্তে? আহো কুন্তীএ তেন লামেণ জাদে? অশ্বত্থামে? ধম্মপুত্তে? জাড়উ?"—মৃচ্ছকটিক, ১ম অঙ্ক।

৩। "পলিত্তাঅদু দাণীএ পুত্তে দালিদ্দচালুদত্তাকে তুমং॥"—মৃচ্ছকটিক, ৮ম অঙ্ক।

---

* অথ বারাণস্যাং দশরথ মহারাজ নাম অগাতি গমনমপহায় ধম্মেণ রাজাম-কোরসি। তস্স যোলসন্ন মইথি সহস্সনম জেঠঠিকা অগ্গমহেসি দ্ব পুত্ত একণ সধিরম বিজায়ি। জৈষ্ঠ পুত্তো রাম পণ্ডিতো অহোষি। দুতীয় লক্খণ কুমারোধিতা সীতাদেবী নাম॥" ইত্যাদি।—বৌদ্ধজাতকঃ।

সংস্কৃতজ্ঞমাত্রেই এইরূপ রচনা বহুবার পড়িয়াছেন। চারুদত্ত, রাম, রাবণ, দরিদ্র, চরণ প্রভৃতি শব্দ স্থলে চালুদত্ত, লাম, লাবণ, দলিদ্দ ও চলণ হইয়াছে। এখন ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে নিম্নশ্রেণীতে ক্বচিৎ ভাষার এরূপ শিথিল ভাব প্রচলিত থাকিতে পারে; কিন্তু কথিত ভাষাও এখন অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ হইয়াছে। ইহার কারণ, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিক্রিয়া। জৈমিনি ও ভট্টপাদ এই প্রতিক্রিয়ার কার্য্য আরম্ভ করেন। সাহসগ্রামের প্রস্তরলিপিতে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অশোকের যে অত্যাচার বর্ণিত আছে, রাজা সুধন্বা সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। যথা শঙ্করবিজয়ে,—

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিক্রিয়া।

"দুষ্টমতাবলম্বিনঃ বৌদ্ধান্ জৈনান্ অসংখ্যাতান্ রাজমুখ্যাননেকবিদ্যাপ্রসঙ্গভেদৈর্নির্জিত্য তেষাং শীর্ষাণি পরশুভিশ্ছিত্ত্বা বহুষু উদুখলেষু নিক্ষিপ্য কঠভ্রমণৈশ্চূর্ণীকৃত্য চৈবং দুষ্ট-মতধ্বংসামচরন্ নির্ভয়ো বর্ত্ততে॥" আদিশূর বৌদ্ধদিগকে পরাজিত করিয়া গৌড়রাজ্য স্থাপন করেন; যথা—"জিত্বা বুদ্ধাংশ্চকার স্বয়মপি পতি-গৌড়রাজ্যান্নিরস্তান্।" *

হিন্দুধর্ম্মের এই উত্থান কেবল উৎপীড়নেই পর্য্যবসিত হইল না; চতুর্দ্দিকে প্রাচীন শাস্ত্রের চর্চ্চা আরব্ধ হইল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আজমীরের রাজপুত্র সারঙ্গদেব বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন,—কিন্তু তদীয় পিতা রাজা বিশালদেব হিন্দুশাস্ত্র শুনাইয়া তাঁহার মতি-গতি পরিবর্ত্তিত করিলেন। চাঁদকবি তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।† পাঠক

* রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য।

† "অতি দুচিত ভয়ে সরাঙ্গ দেব। পিত প্রতি করৈ অবিহিতং সেব॥ বুধ ব্রহ্ম লিয়ে বাঁধে ন তেগ। সুনি স্রবণ রাজ মন ভৈ উদেগ॥ বুল্লাহ কুবংর সণমাণ কীন। কিহি কাজ তুমং ইহ ব্রহ্ম লীন॥ তুমং ছংড়ি সরম হম কহৈ বত। বণিক্ক পুত্র হন তেং দুচিত॥ ইহ নষ্ট জ্ঞান সুনিয়েণ কাণ। পুরষাতন ভজ্জে কিত্তী হান॥ তুম রাজবংশ রাজ নহ সংগ। মৃগয়া সর খেলো বন কুরংগ॥ পরমোধ ভজো বোধক পুরাণ। রামায়ণ সুনহ ভারত নিদান॥" ইত্যাদি।—চাঁদ গাথা।

দেখিবেন, রাজা বৌদ্ধধর্ম্মকে "নষ্ট জ্ঞান" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন।

সংস্কৃতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং দেশে উহার প্রভাব।

সংস্কৃতের আদর্শ ভাষাক্ষেত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে, লিখিত ও কথিত ভাষা উভয়ই উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ হইতে লাগিল। 'লাম' পুনরায় রাম হইলেন। রত্নাকর দস্যুর উচ্চারণ সংশোধন সম্বন্ধে লৌকিক বিশ্বাস কৃত্তিবাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"পাপে জড় জিহ্বা রাম বলিতে না পারে। কহিল আমার মুখে ও কথা না স্ফুরে॥ শুনিয়া ব্রহ্মার তবে চিন্তা হইল মনে। উচ্চারিবে রাম নাম এ মুখে কেমনে॥ মকার করিল অগ্রে রা করিল শেষে। তবে বা পাপীর মুখে রাম নাম আইসে॥ ব্রহ্মা বলিলেন তারে উপায় চিন্তিয়া। মানুষ মরিলে বাপু ডাক কি বলিয়া॥ শুনিয়া ব্রহ্মার কথা বলে রত্নাকর। মৃত মানুষেরে সবে মড়া বলে নর॥ মড়া নয় মরা বলি জপ অবিশ্রাম। তব মুখে তখনি স্ফুরিবে রাম নাম॥ শুষ্ক কাষ্ঠ দেখিলেন বৃক্ষের উপরে। অঙ্গুলি ঠারিয়া ব্রহ্মা দেখান তাঁহারে॥ বহুক্ষণে রত্নাকর করি অনুমান। বলিল অনেক কষ্টে মরা কাষ্ঠ থান॥ মরা মরা বলিতে আইল রাম-নাম। পাইল সকল পাপে মুনি পরিত্রাণ॥ তুলারাশি যেমন অগ্নিতে ভস্ম হয়। একবার রাম-নামে সর্ব্ব-পাপক্ষয়॥"—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড।

পরস্বহারক দস্যুর জিহ্বা পাপে জড়, তাহার মুখে রাম-নাম বিকৃত হয়। ইহাতে বৌদ্ধদিগের প্রতি একটু কটাক্ষ আছে। ব্রহ্মার (না ব্রাহ্মণের ?) এত দোহাই ও যত্নের সহিত এই নূতন উচ্চারণশিক্ষা দিবার পর আর কোন্ চাষা রামকে 'লাম' বলিতে সাহস করিবে? এই ভাবে লকারের প্রভাব লুপ্ত হইল, এবং চালুদত্ত, লাম, লাবণ, দলিদ্দ স্থলে চারুদত্ত, রাম, রাবণ, দরিদ্র পুনরায় কথিত ভাষায় ফিরিয়া আসিল। সংস্কৃতানুযায়ী বর্ণশোধন কার্য্য অদ্যাপি চলিতেছে। প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুস্তকগুলির ভাষা ক্রমশঃ পরিশুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। সেই

সব পুঁথিতে এমন অনেক শব্দ দৃষ্ট হয়, যাহা এখন আর লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। যথা,—

পখা—পক্ষ, কাতি—কার্ত্তিকমাস, নিমল—নির্ম্মল, নখ্‌তা—নক্ষত্র, মুরুখ—মূর্খ, বিভা—বিবাহ, পুনি—পুনঃ, শুকুল—শুক্ল, বগা—বক, দে—দেহ, সভাই—সবাই, বিনি—বিনা।*

বস্তুতঃ, বাঙ্গালার সঙ্গে কালে সংস্কৃতের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁড়াইল যে, প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতা স্থলে স্থলে সংস্কৃত কবিতা বলিয়াও গণ্য হইতে পারে। ভারতচন্দ্রের এই কবিতাটি দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইলে, কাশী বা পুণার পণ্ডিতগণ ঠিক বাঙ্গালীর মত তাহার রসাস্বাদ করিতে পারিবেন,—

"জয় শিবেশ শঙ্কর, বৃষধ্বজেশ্বর, মৃগাঙ্কশেখর, দিগম্বর। জয় শ্মশাননাটক, বিষাণবাদক, হুতাশভালক, মহত্তর॥ জয় সুরারিনাশন, বৃষেশবাহন, ভুজঙ্গভূষণ, জটাধর। জয় ত্রিলোককারক, ত্রিলোকপালক, ত্রিলোকনাশক, মহেশ্বর॥"

বিমস্ সাহেব মনে করেন, বঙ্গভাষা গৌড়ীয় অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতের অধিকতর সন্নিহিত; তিনি প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের মতানুসারে, হিন্দী, পঞ্জাবী ইত্যাদি ভাষাকে 'তৎসম' ও বাঙ্গালাকে 'তদ্ভব' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। † বিম্‌স্ নির্দ্দেশ করেন যে, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে মুসলমানগণের প্রভাববশতঃ ভাষা শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; বঙ্গভাষা সুদূর সীমান্তে নিরুপদ্রবে সংস্কৃতের ভাবে গঠিত হইবার অবকাশ পাইয়াছিল।

বঙ্গদেশে সংস্কৃতের প্রভাব কখনই লুপ্ত হয় নাই। যখন সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল, তখনও হিউনসাঙ্ সমতট ও বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থলে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি এই দেশের

---

* ইহার প্রায় সবগুলিই ডাক ও খনার বচনে পাওয়া যাইবে।

† Beame's *Comparative Grammar*, Vol. I., p. 29.

অধিবাসীদিগকে পরিশ্রমী ও শিক্ষাভিমানী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্গদেশে সংস্কৃতের গর্ব্ব চিরদিনই সুরক্ষিত। গৌড়ীয় রীতি বৃথা শব্দাড়ম্বরে পূর্ণ বলিয়া অলঙ্কারশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ অনাদর করিয়াছেন। বৈদর্ভী রীতির প্রসাদগুণ, মাধুর্য্য, সুকুমারত্ব এবং গৌড়ীয় রীতির সমাসবহুলত্ব, দণ্ডাচার্য্য উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যথা

বৈদর্ভী রীতি,—

মালতীমালা লোলালিকলিলা যথা।

গৌড়ীয় রীতি,—

"যথা নত্যর্জ্জুনাজন্ম সদৃক্ষাঙ্কো বলক্ষগুঃ॥"

কিন্তু এই সকল শ্রুতিকটু সমাসজটিল পদ দেখিয়া বোধ হয়, সংস্কৃত এই দেশে বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাই গৌড়ীয় ভাষাগুলির মধ্যে বঙ্গভাষা সংস্কৃতের অতিসন্নিহিত।

বঙ্গভাষা ও প্রাকৃত।

কেহ কেহ বলেন, প্রাকৃত হইতে বঙ্গভাষার উৎপত্তি হয় নাই; উহা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। গৌড়ীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাঙ্গালা সংস্কৃতের অতি-সন্নিহিত হইলেও, উক্ত মত কখনও সমর্থনযোগ্য নহে। দেখা যায়, ডাক ও খনার বচনের ভাষা ও পরাগলী মহাভারতের ভাষাই স্থলে স্থলে এত জটিল যে, তাহার অর্থপরিগ্রহ সহজ নহে। এই সকল রচনা হইতে ৫০০।৬০০ বৎসর পূর্ব্বের ভাষা যে সংস্কৃত ছিল না, তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়; কিন্তু বর্ত্তমান ভাষা হইতে তাহা এত দূরবর্ত্তী ছিল যে, তাহাকে বঙ্গভাষা আখ্যা প্রদান করাও সঙ্গত নহে। সুতরাং সে ভাষাকে প্রাকৃত না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে? হয় ত যে সকল প্রাকৃত রচনা আমরা পাইয়াছি, এতদ্দেশপ্রচলিত প্রাকৃত ঠিক সেরূপ ছিল না;—কিন্তু উহাও সাহিত্যদর্পণ-নির্দ্দিষ্ট অষ্টাদশ প্রকার প্রাকৃতিক ভেদের অন্তর্গত ছিল, এরূপ অনুমান বোধ করি অসঙ্গত ও অযৌক্তিক

নহে। দণ্ডাচার্য্য-বিরচিত কাব্যাদর্শে গৌড়দেশীয় প্রাকৃতের উল্লেখ আছে ;—

"শৌরসেনী চ গৌড়ী চ লাটী চান্যা চ তাদৃশী।
যাতি প্রাকৃতমিত্যেবং ব্যবহারেষু সন্নিধিম্॥"

বঙ্গভাষার ঠিক পূর্ব্বাবস্থা আমাদের পরিচিত প্রাকৃতগুলির কোনটীতেই দেখিতে পাই না, কিন্তু অনেকরূপ সাদৃশ্য পাই। নিম্নে শব্দগত সাদৃশ্য-প্রদর্শনের জন্য কতকগুলি উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে। যদিও এই সকল শব্দ বিবিধ পুস্তকেই দৃষ্ট হইবে, তথাপি আমি যে পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি, তাহা নিম্নের তালিকায় উল্লেখ করিলাম।

প্রাকৃত (সংস্কৃত)		বাঙ্গালা		যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।
লোণ*† (লবণম্)	...	লুন।		
পথর† (প্রস্তরঃ)	. .	পাথর।		
বিজ্জুলী (বিদ্যুৎ)	...	বিজলা	...	মৃঃ কঃ।
বাড়ী (বাটী)	...	বাড়ী	...	মৃঃ কঃ।
ঘর (গৃহম্)	...	ঘর	...	ঐ
দুয়ার (দ্বারম্)	...	দুয়ার	...	ঐ
ঠাণ (স্থানম্)	...	ঠাঁই	...	ঐ
বক্কল (বল্কলম্)	...	বাকল	...	শকুঃ।
ভত্ত† (ভক্তম্)	...	ভাত	...	

* 'লুন' শব্দ পূর্ব্বে 'লোণ' রূপেই ব্যবহৃত হইত ; যথা কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে,—
"বাহান্নপুরুষ যার লোণের ব্যাপার। সে বেটা আমার কাছে করে অহঙ্কার॥"

† এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট শব্দগুলি বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তকাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহার অধিকাংশই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাবে,' শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ কৃত 'বাঙ্গলা সাহিত্য সমালোচনাতে,' বিম্‌স্ সাহেবের *Comparative Grammar* ও রামদাস সেন মহাশয়ের প্রবন্ধগুলিতে পাওয়া যাইবে।

প্রাকৃত (সংস্কৃত)	বাঙ্গালা	যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।
লট্ঠী† (যষ্টিঃ)	... লাঠী	...
থম্ভ† (স্তম্ভঃ)	... থাম্বা	...
চক্ক† (চক্রং)	... চাকা	...
বহু* (বধূঃ)	... বউ	... মুঃ রাঃ।
ঘিঅ (ঘৃতম্)	... ঘি	... মৃঃ কঃ।
দহী (দধি)	... দই	... ঐ
দুধ্ধ† (দুগ্ধম্)	... দুধ	...
অন্ধআর (অন্ধকারঃ)	... আঁধার	... মৃঃ কঃ।
শিআল (শৃগালঃ)	... শিয়াল	... ঐ
হথী (হস্তী)	... হাতী	... ঐ
ঘোড়ও (ঘোটকঃ)	... ঘোড়া	... গাথা।
চন্দ (চন্দ্রঃ)	... চাঁদ	... মৃঃ কঃ।
সঞ্ঝা (সন্ধ্যা)	... সাঁঝ	... ঐ
হথ (হস্ত)	... হাত	... শকুঃ।
মথঅ (মস্তকং)	... মাথা	... মৃঃ কঃ।
কণ্ণ (কর্ণঃ)	... কাণ	... মৃঃ কঃ।
হিঅঅ (হৃদয়ং)	... হিয়া	... ঐ
অত্তা‡ (মাতা)	... আই	... মৃঃ কঃ।
রাও, রায় (রাজা)	... রায়	... চঃ কৌঃ ও পিঙ্গল।
চ্ছুরা† (ক্ষুরঃ)	... ছুরি	...

* প্রাকৃত 'বহু' প্রাচীন বঙ্গীয় অনেক পুস্তকে দৃষ্ট হয়। যথা,—
'যাহার বহু ঝি দূরে যান্তি। তাহার নিকটে বসে অসতী।' ডাকের বচন, বেণীমাধব দের সংস্করণ।

‡ বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে 'আতা'র ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যথা,—
'আছিল আমার আতা কিছুই না জানি। ভূতের [illegible]তে সেই হিন্দুয়ানি মানি'॥

প্রাকৃত (সংস্কৃত)	বাঙ্গালা	যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।
মসাণ† (শ্মশানম্) ...	মশান ...	
বহ্মণ (ব্রাহ্মণঃ) ...	বামুন ...	মৃঃ কঃ।
চেড়ী* (চেটী) ...	চেড়ী ...	ঐ
সহি (সখী) ...	সই ...	ঐ
জেট্‌ঠা† (জ্যেষ্ঠঃ) ...	জেঠা ...	
উবজ্‌ঝাঅ (উপাধ্যায়ঃ)	ওঝা ...	মৃঃ রাঃ।
কজ্জ† (কার্য্যম্) ...	কাজ ...	
কম্ম† (কর্ম্ম) ...	কাম ...	
বহিণী (ভগ্নী) ...	বোন, বহিন	মৃঃ কঃ।
রাই (রাধিকা) ...	রাই ...	অপভ্রংশ ভাষা।†
কাণু (কৃষ্ণঃ) ...	কানু ...	ঐ
গোয়াল (গোপঃ) ...	গোয়াল ...	ঐ
বর্ত্তা† (বার্ত্তা) ...	বাত ...	
অপ্পি (আত্মা) ...	আপন ...	মৃঃ রাঃ।
আহ্মি ‡ (অহং) ...	আমি ...	মৃঃ কঃ।
তুহ্মি (ত্বং) ...	তুমি ...	উঃ চঃ।
শে (সঃ) ...	সে ...	মৃঃ কঃ।
তুএ (ত্বয়া) ...	তুই ...	ঐ

* এই শব্দ পূর্ব্বে খুব প্রচলিত ছিল। কৃত্তিবাসী রামায়ণ দেখ।

† অপভ্রংশভাষামাহ আভীরাদিগিরঃ কাব্যেষপভ্রংশগিরঃ স্মৃতাঃ।

‡ বাঙ্গালা ও প্রাকৃতের সান্নিধ্য দেখাইবার জন্য এই 'আহ্মি,' 'তুহ্মি' বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত ১৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত হস্তলিখিত পুঁথিতেই 'আমি' ও 'তুমি' স্থলে সর্ব্বত্রই 'আহ্মি' ও 'তুহ্মি' দৃষ্ট হয়। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের পুস্তকাগারে পরাগলী মহাভারত, সঞ্জয়-রচিত মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তকেও এই প্রকারের প্রয়োগ দৃষ্ট হইবে।

প্রাকৃত	(সংস্কৃত)		বাঙ্গালা		যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।
তুহ	(তব)	...	তাহার	...	শকুঃ।
এহু	(এষঃ)	...	এই	...	ঐ
ইমিণ	(অনেন)	...	এমনে	...	মুঃ রাঃ।
অজ্জ	(অদ্য)	...	আজ	...	উঃ চঃ।
ণা	(ন)	...	না	...	গাথা।
অ	(চ)	...	ও	...	ঐ
দঢ়	(দৃঢ়ঃ)	...	দড়*	...	শকুঃ।
সচ্চ	(সত্যম্)	...	সাচা	...	মৃঃ কঃ।
অদ্ধ	(অর্দ্ধম্)	...	আধ	...	ঐ
বুড্ঢ	(বৃদ্ধঃ)	...	বুড়া	...	ঐ
দুঅ	(দ্বয়ং)	...	দুই	...	পিঙ্গল।
দুণা	(দ্বিগুণ)	...	দুনা	...	ঐ
তিণ্ণি	(ত্রি)	...	তিন	...	ঐ
চারি	(চতুর্)	...	চারি	...	ঐ
ছ	(ষষ্ঠ)	...	ছয়	...	
সত্ত	(সপ্ত)	...	সাত	...	পিঙ্গল।
অট্ঠ	(অষ্ট)	...	আট	...	মৃঃ কঃ।
বার	(দ্বাদশ)	...	বার	...	পিঙ্গল।
চোদ্দ	(চতুর্দ্দশ)	...	চৌদ্দ	...	ঐ
পণ্ণরহ	(পঞ্চদশ)	...	পনর	...	
সোলা	(ষোড়শ)	...	ষোল	...	ঐ

* এই 'দড়' শব্দ পূর্ব্বে দৃঢ় অর্থেই ব্যবহৃত হইত। যথা,—
"মনে ভাবে শ্রীধর উদ্ধত দ্বিজবর। কোন দিন আমারে কিলায় পাছে দড়॥"
চৈ, ভা; এই "দড়" শব্দের অর্থ এখন নিপুণ হইয়াছে।

প্রাকৃত	(সংস্কৃত)	বাঙ্গালা	যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।
বাইসা	(দ্বাবিংশ) ...	বাইশ ...	পিঙ্গল।
কেত্তক†	(কিয়ৎ) ...	কতক ...	
এত্তক†	(ইয়ৎ) ...	এতেক ...	
জেত্তক†	(যাবৎ) ...	যতেক ...	
জত্থ	(যত্র) ...	যথায় ...	উঃ চঃ।
এত্থ	(অত্র) ...	এথায় ...	মৃঃ কঃ।
পল্লাণ	(পলায়নম্) ...	পালান ...	
মিচ্ছা	(মিথ্যা) ...	মিছা ...	
অম্ব	(অম্র ...	আঁব, আম ...	
সরিস্	(সর্ষপঃ) ...	সরিষা ...	
আঅরিস্	(আদর্শ) ...	আরসি ...	
রূপ্পা	(রৌপ্যম্) ...	রূপা ...	
মচ্ছি	(মক্ষিকা) ...	মাছি ...	
কেথু	(কুত্র ...	কোথা ..	
ছিন্দ	(ছিন্ন) ...	ছেঁড়া ..	
হলদ্দা	(হরিদ্রা) ...	হলুদ ...	
পোত্থি	(পুস্তক) ...	পুঁথি ...	
ণঙ্গল	(লাঙ্গলম্) ...	লাঙ্গল ...	
মহু	(মধু) ...	মৌ ...	
তেল	(তৈলম্) ...	তেল ...	
শেজ	(শয্যা) ...	শেজ ...	

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিরচিত 'দেশী নামমালা' নামক পুস্তকে গ্রন্থকার আচার্য্য হেমচন্দ্র অনেকগুলি তৎকাল-প্রচলিত শব্দের তালিকা দিয়াছেন; ইহাদের সঙ্গে অনুরূপ বাঙ্গালা শব্দের সংস্রব অতি ঘনিষ্ঠ,

এবং ঐ সকল শব্দ যে প্রাকৃত শব্দ বলিয়াই গণ্য ছিল, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা নিম্নে অনুরূপ বাঙ্গালা শব্দসহ পূর্ব্বোক্ত শব্দের কতকগুলি উদ্ধৃত করিতেছি :—

দেশীপ্রাকৃত	...	...	চলিত বাঙ্গালা।
থড়ি	...	...	থুড়ি।
পেট্ট	...	...	পেট।
কোট্ট	...	...	কোট।
গোচ্ছা	...	...	গোচ্ছা, গোছা।
ছল্লী	...	...	ছলি, ছুলি।
বুক্কই	...	...	বুক্নি।
জড়িত	...	...	জড়িত।
ঝড়ী	...	...	ঝড়ী, ঝড়।
ঝাড়	..	...	ঝাড়।
অলট্ট পলট্ট	...	...	উলোট পালট, উল্টা পাল্টা।
ভল্ল্	...	...	ভালুক।
তগ্গ	...	...	তাগা।
টিপ্পি	...	...	টিপ।
চট্টু	...	...	চাটু।
পপ্পিঅ	...	...	পাপিয়া।
ফুক্কা	...	...	ফক্কা।
ঢংঢল্লে	...	...	ঢলঢলে।
উৎথল্লা	...	...	উতলা, উথলানো।
গঢ়ো	...	...	গড়।
থলী	...	...	খোল।
উৎথল্ল-পথল্ল	...	...	আথাল-পাথাল।

দেশীপ্রাকৃত	...	...	চলিত বাঙ্গালা।
ওড়নে	...	...	উড়ানী।
কোইলা	...	...	কয়লা।
ওইল্ল	...	...	ওলা।
ঘোড়ো	...	...	ঘোড়া।
ছিবই, ছিহই	...	...	ছোঁয়া।
ছিনাল	...	...	ছিনাল।
ছিনালী	...	...	ছিনালী।
ঘোলই	...	...	ঘোলা।
পলোট্টই	...	...	পালট, পালটানো।
ঝলংকিঅ	...	...	ঝলক।
ঝালিঅ	...	...	ঝালানো।
ঝলঝলিআ	...	...	ঝলমলে।
ঝলসিঅ	...	...	ঝলসানো।
ডালী	...	...	ডাইল, ডাল।
তড়ফড়িঅ	...	...	ধড়ফড়।
থরহরিঅ	...	...	থরহরি।
দোরা	...	...	ডোর।
পুপ্ফা	...	...	ফুপা, ফুফু।
ওসা	...	...	ওস।
কোলাহল	...	...	কোলাহল।
থড়	...	...	খড়।
চাউল	...	...	চাউল।
টিক্ক	...	...	টিকা।
ডুম্ব	...	...	ডোম।

দেশী প্রাকৃত	...	...	চলিত বাঙ্গালা।
টুংটো	...	...	ঠুঁটো।
পেল্লই	...	...	ফেলা।
কড়ংত	...	...	কাঁড়ানো।
খাইয়া	...	...	খাই।
ঘোলই	...	...	ঘোলা।
ডম্ব, ডাবো	...	...	ডেবরা।
ডলো	...	...	ডেলা, ঢিল।
ধন্ধা	...	...	ধান্দা, ধাঁধাঁ।
ডালো	...	...	ডুলি।
বোক্কড়	...	...	বোকা (পাঁঠা)।
হেলা	...	...	হেলা।
বল্লা	...	...	বল্লা, বোল্‌তা।
হড্‌ড	...	...	হাড়।
বিহান	...	...	বিহান।
রোল	...	...	রোল।
বট্টা	...	...	বাট।

বাঙ্গালা আর প্রাকৃতের ক্রিয়ার নৈকট্য অতি স্পষ্টই দেখা যায়। যে কোন প্রাকৃত রচনা হইতেই ঐ সকল ক্রিয়া খুঁজিয়া বাঙ্গালার সহিত তুলনা করিলেই পরস্পরের সম্বন্ধ অনায়াসে অনুমিত হইবে। প্রাকৃতের হোই, পড়ই, কিণই, করই, বোলই, ণচ্চই, ফুট, গাঅ, থাঅ, বুজ্ঝ, চিণ, জাণ, লগ্‌গ, পুচ্ছ, ইত্যাদি স্থলে আমরা বাঙ্গালা হয়, পড়ে, করে, বলে, নাচে, ফোটা, গাওয়া, থাকা, বোঝা, চেনা, জানা, লাগা, পোঁছা, ইত্যাদি পাইতেছি। প্রাকৃত—শুনিঅ, লভিঅ, লই, ভবিঅ, করিঅ, ইত্যাদি বাঙ্গালায় শুনিয়া, লভিয়া, লইয়া, হইয়া, করিয়া, ইত্যাদি রূপ হইয়াছে।

প্রাকৃত 'অচ্ছি'র সঙ্গে ভূ ধাতুর অসমাপিকা 'হইয়া'র মিলনে 'হইয়াছে' গঠিত। দেখিতেছে, করিতেছে ইত্যাদিও ঐরূপেই নিষ্পন্ন হইয়াছে। এখনও পূর্ব্ববঙ্গের কোনও কোনও স্থলে দুইটি শব্দ পৃথক্ ভাবে উচ্চারিত হয়; যথা—'দেখিতে-আছে,' 'করিতে-আছে'। অতীত কালের 'আসীৎ'-এর অপভ্রংশ 'আছিল' পূর্ব্বোক্তরূপে অন্যান্য ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। *

শব্দের রূপান্তরাবলম্বনের পদ্ধতি অতি বিচিত্র। শুধু অনুকরণপ্রিয়তা-বশতঃ সময়ে সময়ে কোনও ব্যাপক পদ্ধতি প্রচলিত হয়। 'চল,' 'খেল' ইত্যাদি ধাতুর 'ল' অন্যান্য ক্রিয়ায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যেখানে 'র'কারের সংস্রব আছে, সেখানে 'ল'-কারে পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক বলিয়া ধরা যাইতে পারে—'ডলয়োরভেদঃ'; কিন্তু তদ্ভিন্নও অনেক স্থলে 'ল' প্রচলিত আছে। চলিলাম (চলামঃ), খেলিলাম (খেলামঃ) প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে হাসিলাম, দেখিলাম ইত্যাদিতে 'ল' প্রযুক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত 'ক্রমঃ' স্থলে প্রাকৃত 'বোল্লাম' দৃষ্ট হয়ঃ—'ণ ভণামি এস গুচ্ছো নেহস্স রসেণ বোল্লামো'—মৃঃ কঃ, ৬ অঙ্ক।

করসি, খায়সি, করোন্তি, জানেন্তি, ইত্যাদি প্রাকৃতের অনুযায়ী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় পূর্ব্বে বিস্তরপরিমাণে প্রচলিত ছিল। শুধু কয়েকটিমাত্র উদাহরণ দিয়া দেখাইব। পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলির উদ্ধৃতাংশে সেইরূপ আরও অনেক শব্দ দৃষ্ট হইবে;—

(১) "ভিক্ষুকের কন্যা তুমি কহসি আমারে।
দেবযানি পলাইল কূপের ভিতরে॥"—সঞ্জয়; আদিপর্ব্ব।

(২) "সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।
নির্ভএ বোলেন্ত তবে সংগ্রাম ভিতর॥"—কবীন্দ্র; ভীষ্মপর্ব্ব।

(৩) "প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি॥"—চৈ, চ;—অন্ত্য।

(৪) "চতুর্দ্দিকে নরসিংহ অদ্ভুত শরীর।
হিরণ্যকশিপু মারি পিবন্তি রুধির॥"—শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

* ৺রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, ২২ পৃঃ।

(৫) "পরনাম করিআ হংস বলন্তি সেই কালে।
বার্ত্তা এক বলি পরভু তব পদতলে ॥
—(শূন্যপুরাণ, ৭ পৃষ্ঠা, সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ)।

'করোমি'র অপভ্রংশ 'করোম' ললিতবিস্তরে অনেক স্থলে পাওয়া যায়, এবং সর্ব্বত্রই ঐ শব্দ 'করিষ্যামি'র অর্থে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থলে এখনও 'করুম' ক্রিয়া কথায় ব্যবহৃত হয়। 'মৃগলব্ধ' পুঁথির ভূমিকায় এইরূপ আছে,—

"পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা বসুমতী। জন্মস্থান সুচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি ॥"

'করিমু' প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তকে অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। 'কুর্ব্বঃ' হইতে 'করিব'ও ঐরূপেই হওয়া সম্ভব। 'করিমু'র স্থলে কচিৎ 'করিবু' শব্দও প্রাচীন রচনায় দৃষ্ট হয়; যথা,—

"নিতি নিতি অপরাধ করে। বলে ডাক কি করিবু তারে ॥"—ডাক।*

"পৈরাগ মাধব নহি কি করিবু বিচার।"—শূন্যপুরাণ, ২ পৃঃ।

প্রাকৃত 'হউ' (সং, ভবতু), 'দেউ' (সং, দদাতু) স্থলে 'হউক,' 'দেউক' বাঙ্গালাতে প্রচলিত। এই 'ক' কোথা হইতে আসিল? বাঙ্গালা অনেক ক্রিয়ার পরই ঐরূপ 'ক' এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়; যথা,—করিবেক, খাইবেক, দেখুক, ইত্যাদি। গ্রীয়ার্‌সন্ সাহেব বলেন, এই 'ক' কিম্ শব্দ হইতে উৎপন্ন; যখন ক্রিয়া (কৃ, ভূ, দা, ইত্যাদি) কর্ম্ম অথবা ভাববাচ্যে প্রযুক্ত হয়, তখন তাহার উত্তর কর্ত্তৃসূচক 'ক' প্রত্যয় হইয়া ঐ সকল পদ (করিবেক, হউক, ইত্যাদি) নিষ্পন্ন হয়। (জার্‌ন্যাল্, এসিয়াটিক্ সোসাইটি, সংখ্যা ৬৪, পৃঃ ৩৩১।) উক্ত শব্দগুলির প্রাকৃতের মত (অর্থাৎ 'ক' ছাড়া) ব্যবহার প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থেও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়,—

"জয় জয় জগন্নাথপুত্র দ্বিজরাজ। জয় হউ তোর যত ভকতসমাজ ॥"
চৈ, ভা,—আদি।

"সর্ব্বলোকে শুনিয়া হইল হরষিত। সবে বলে জীউ জীউ এ হেন পণ্ডিত ॥"
চৈ, ভা,—আদি।

* বেণীমাধবের সংস্করণ।

সংস্কৃতের 'হি' (যথা 'জানীহি') বাঙ্গালায় শুধু 'হ'তে পরিণত। পূর্ব্বে 'করিহ', 'যাইওহ' রূপ বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। প্রাকৃতেও অনুজ্ঞা বুঝাইতে 'হ'র ব্যবহার দৃষ্ট হয় ;—

"আঅচ্ছ পুণো জুদংরমহ।" —মৃঃ কঃ, ২ অঙ্ক।

কোথাও 'হু' দৃষ্ট হয় ; যথা,—পিঙ্গলে, "মইন্দ করেহু।" এই হু (হুঁ) হিন্দী ভাষায় প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে বাঙ্গালায় প্রাকৃতের মতই 'য' স্থানে 'জ,' 'য়' স্থানে 'অ' বা 'এ' লিখিত হইত। প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মুদ্রিত অনেক পুস্তকেও ঐরূপ লেখার সংশোধন হয় নাই ; যথা,—

"উচিত বলিতে পাড়ে গালি। পোয়ে ঝিয়ে হয় বেআলি॥"—ডাক।
"পৌষে যার নাহিক ভাত। তার কভু নাহিক সোআথ॥"—ডাক।

হস্তলিখিত পুস্তকে যথা,—

"ভীষ্মক মারিতে জাএ দেব জগন্নাথে। নির্ভয়ে বোলেন্ত তবে সংগ্রাম ভিতর॥"
—কবীন্দ্র ;— বেঃ গঃ পুঁথি', ১০০ পত্র।

বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথিগুলির অনেক স্থলে তিনটি 'স'কার (শ, ষ, স), দুইটি জ (জ, য), এবং দুইটি ণ (ণ, ন), স্থলে মাত্র স, জ, ন দৃষ্ট হয় ; ইহা প্রাকৃতের অনুরূপ। কেবল 'ন' সম্বন্ধে আমাদের এই বক্তব্য যে, প্রাকৃতে সাধারণতঃ শুধু 'ণ' ব্যবহৃত হইলেও, পৈশাচিকী প্রাকৃতে 'ণ' স্থলে 'ন' এর ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে ; "পৈশাচিক্যাং রণয়োলনৌ" (পৈশাচিক্যাং রেফস্য লকারো ভবতি ণকারস্য নকার, চণ্ডপ্রাকৃত, ৩।৩৮)। অনেক প্রাচীন পুঁথিতে প্রাকৃতের মত 'দ' স্থানে 'ড' দৃষ্ট হয় ; যথা,— 'দাণ্ডাইয়া' স্থলে 'ডাণ্ডাঞা' (তবর্গস্য চ টবর্গো। যথা,—দণ্ডঃ ডণ্ডো চণ্ড-প্রাকৃত, ৩।১৬)।

পূর্ব্বকালে ভারতের কথিত ভাষামাত্রই বোধ হয় 'প্রাকৃত' সংজ্ঞায় অভিহিত হইত। বাঙ্গালা ভাষা যে পূর্ব্বকালে 'প্রাকৃত ভাষা' নামেই পরিচিত ছিল, তাহার বহুল প্রমাণ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বিদ্যমান আছে। সঞ্জয়-রচিত একখানি মহাভারতের ২০০ বৎসরের পুঁথিতে রাজেন্দ্রদাসের ভণিতাযুক্ত একটি পদে আমরা এই দুইটি ছত্র পাইয়াছি ;—"ভারতের পুণ্য কথা শ্রদ্ধা দূর নহে। পরাকৃত পদবন্ধে রাজেন্দ্রদাসে কহে॥" বিশ্বকোষ আফিসের (৩৪ নং পুঁথি) কৃষ্ণকর্ণামৃত পুস্তকে "তাহা অনুসারে লিখি প্রাকৃত কথনে।" যদুনন্দনদাস-কৃত গোবিন্দলীলামৃতের অনুবাদে "প্রাকৃত লিখিয়া বুঝি এই মোর সাধ।"—লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের মধ্য খণ্ডে —"ইহা বলি গীতার পড়িল এক শ্লোক। প্রাকৃত প্রবন্ধে কহি শুন সর্ব্বলোক।" এবং বিশ্বকোষ আফিসের (২৪৩ সংখ্যক পুঁথি) একখানি গীতগোবিন্দের বঙ্গীয় অনুবাদের দ্বাদশ সর্গের অন্তে এই কয়েকটি ছত্র দৃষ্ট হয় ;— "ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে প্রাকৃতভাষায়াং স্বাধীনভর্তৃকাবর্ণনে সুপ্রীতপীতাম্বর-নামঃ দ্বাদশঃ সর্গঃ।" এই কাব্যের অপর একখানি অনুবাদে (৪৩ সংখ্যক পুঁথি) "ভাঙ্গিয়া করিল আমি সংস্কৃত প্রাকৃতে।" এবং রামচন্দ্র খান প্রণীত অশ্বমেধ পর্ব্বে (২৯৪ সংখ্যক পুঁথি)—"সপ্তদশ পর্ব্ব কথা সংস্কৃত ছন্দ। মূর্খ বুঝিবার কৈল পরাকৃত ছন্দ॥" এইরূপ বহু স্থানে বাঙ্গালা ভাষা প্রাকৃত সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে।

বঙ্গভাষা পূর্ব্বকালে প্রাকৃত নামে অভিহিত হইত।

অপভ্রংশ ভাষার রচনা স্থানে স্থানে বাঙ্গালার সঙ্গে ছত্রে ছত্রে মিলিয়া যায় ; যথা,—

"রাই দোহারি পঠণ শুণি হাসিঅ কান্নু গোয়াল।"
(রাইএর দোহারি পাঠ শুনি হাসিয়া কানু গোয়াল।)

—ছন্দোমঞ্জরী, প্রথম স্তবক।

এখন দেখা যাইবে, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে তুলনায় সংস্কৃতের সম্বন্ধ অতি কৌতূহলজনক। প্রাকৃত বৌদ্ধ-

সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বঙ্গভাষা।

জগতে আধিপত্য লাভ করিয়াছিল; বৌদ্ধ-ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের অবাধ্য সন্তান; বৌদ্ধাধিকারে প্রচলিত প্রাকৃতও তদ্রূপ সংস্কৃতের অবাধ্য সন্তান। সংস্কৃতের বিরাট শব্দের ঐশ্বর্য্য প্রাকৃত উপেক্ষা করিয়াছে, কিন্তু গৌড়ীয় ভাষাগুলি তাহা গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্ম পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইলে পর, গৌড়ীয় ভাষাগুলি প্রাধান্য লাভ করে। সংস্কৃতের পুনরুদ্ধারহেতু তদীয় বৈভবে গৌড়ীয় ভাষাগুলি গৌরবান্বিত হইল। ক্রমে প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত হইয়াও ঐ সকল ভাষা প্রাকৃতের ঋণচিহ্ন স্খালন করিতে চেষ্টিত হইল। কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে। কেহ ভিন্নদেশীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিতে পারে, কিন্তু তাহার বর্ণ, কথা, ভাবভঙ্গী তাহাকে চিনাইয়া দেয়। পরিচ্ছদ দৃষ্টে ভ্রম অতি স্থূলচক্ষেরই হইয়া থাকে। সংস্কৃতের অধ্যাপকগণ গৌড়ীয় ভাষাগুলিকে পর্য্যাপ্ত সংস্কৃত শব্দে ধনী করিলেন। লাম, চন্দ, লাধা, লেখা দূরে থাকুক, এখন সাধারণতঃ তাহা আর কেহ মুখেও বলে না। তবে যে সকল শব্দ বৎসরে একবারমাত্র ব্যবহার করিলে চলে, সেখানে আচার্য্যের কথা মানিয়া লোকসাধারণের উচ্চারণ সংশোধন করা স্বাভাবিক; কিন্তু যাহা দিনে, দণ্ডে শতবার ব্যবহার করিতে হইবে, সেখানে আচার্য্যের অনুরোধ ও প্রয়াস ব্যর্থ। ক্রিয়াগুলি ও বিভক্তির চিহ্নগুলি সংস্কৃত হইতে অনেক ব্যবহিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার আর সংশোধন হইল না। প্রত্যেক ছত্রের গঠনে প্রাকৃতের ভাব মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা এখনও সেইরূপই রহিয়াছে। শুধু নামশব্দের পরিবর্ত্তন করিলে এ ঋণ হইতে অব্যাহতি লাভ অসম্ভব। গৌড়ীয় ভাষাগুলির ক্বচিদ্ব্যবহৃত শব্দের সঙ্গে অনেক স্থলেই সংস্কৃতের সাদৃশ্য প্রাকৃত অপেক্ষা অধিক; কিন্তু প্রত্যেক ছত্রের গঠনগত, ক্রিয়াগত,

বিভক্তিচিহ্নগত এবং নিত্যব্যবহৃত শব্দগত সাদৃশ্য প্রাকৃত অপেক্ষা অল্প। বলা বাহুল্য, বঙ্গভাষা যে প্রাকৃতের অধিকতর সন্নিহিত, ইহাই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

সংস্কৃত শব্দগুলি যে ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রথম প্রাকৃতে, তাহার পর গৌড়ীয় ভাষাগুলিতে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি নিয়মের ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। আমরা কেবল কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

সংস্কৃত-শব্দ পরিবর্ত্তনের নিয়ম।

আদ্য বর্ণের পরে সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে, সংযুক্ত বর্ণের আদ্যক্ষর লুপ্ত হয়, এবং আদ্য বর্ণে আকার যুক্ত হয় ;—যথা,—

হস্তি—হাতি ; হস্ত—হাত ; সপ্ত—সাত ; কক্ষ*—কাথ ; মল্ল—মাল ; লক্ষ—লাথ ; অম্র—আম ; বজ্র—বাজ ; পক্ষ—পাথ ; হট্ট—হাট ; অষ্ট—আট ; কর্ণ—কাণ ; কজ্জল—কাজল ; অক্ষি—আঁখি ; ভল্লুক—ভালুক। কখনও কখনও শেষ বর্ণের পরে আকার যুক্ত হয় ; যথা,—ছত্র—ছাতা ; চক্র—চাকা ; চন্দ্র—চান্দা।† পক্ক—পাকা ; পত্র—পাতা ; কর্ত্তা—কাতা।‡ কখনও বর্ণের শেষ আকার লুপ্ত হয় ; যথা,—লজ্জা—লাজ ; সজ্জা—সাজ ; ঢক্কা—ঢাক। আদ্য বর্ণের পরস্থিত সংযুক্ত বর্ণের আদ্যো

---

* কক্ষ, পক্ষ, লক্ষ ইত্যাদির 'ক্ষ'র উচ্চারণ 'খ্‌খ' এইরূপ ধরা হইয়াছে।

† প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তকে 'চাঁদার' প্রয়োগ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয় ; যথা,—

(১) "দেখিয়া বরের রূপ লেগে গেল ধাঁধা। কি ভাগ্য সাপের মাঝে আলো করে চাঁদা॥" ক, ক, চ।

(২) "জিনিয়া প্রভাত-রবি, সিন্দূর ফোটার ছবি, তার কোলে চন্দনের চান্দা॥" ক, ক, চ।

(৩) "তোমার বদন চান্দা, মোর মন মৃগ বাঁধা তিল অর্দ্ধ না দেখিলে মরি॥" ক, ক, চ।

(৪) "কাঁদিয়া আঁধার, কলঙ্ক চাঁদার, স্মরণ লইল আসি॥"—চণ্ডীদাস।

(৫) "লগন চাঁদা।"—খনা।

‡ "ধাতা কাতা বিধাতার কপালে দিয়াছি ছাই।"—চণ্ডীদাস।

ং কি 'ন'কার থাকিলে, তাহা চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়; যথা,—বংশ—বাঁশ; ষণ্ড—ষাঁড়; হংস—হাঁস; দন্ত—দাঁত; চন্দ্র—চাঁদ।

'অ' স্থানে 'আ' হইবার উদাহরণ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে; অনেক স্থলে স্বরবর্ণ অন্যান্যরূপেও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যথা,—

'অ' স্থানে 'এ';—বঙ্গন—বেগুন।

'আ' স্থানে 'ই';—পঞ্জর—পিঞ্জর; সজ্ঞান—সিয়ানা।

'অ' স্থানে উ;—ব্রাহ্মণ—বামুন।

দ্বিপ্রহর—দুপুর; ঔষধ—ওষুধ।

ইহা ব্যতীত অন্যান্য অনেকরূপ সূত্র সঙ্কলিত হইতে পারে। *

ট ও ড স্থানে স্থানে 'ড়'তে পরিণত হয়; যথা,—ঘোটক—ঘোড়া; ঘট—ঘড়া †; ষণ্ড—ষাঁড়; চণ্ডাল—চাঁড়াল; ভাণ্ড—ভাঁড়।

'ধ' অনেক স্থলে 'ঝ' বা 'য'তে পরিণত হইয়াছে; যথা,—উপাধ্যায়—ওঝা; বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঁড়ুয্যা।

স্থানে স্থানে বর্ণ পরিত্যক্ত হইতে দেখা যায়; যথা,—'ক'—সুবর্ণকার—সোণার; চর্ম্মকার—চামার; কুম্ভকার—কুমার; নৌকা—নাও, বা না; কোকিল—কোয়েল; নকুল—নেউল।

'খ'—মুখ—মু ‡।

'গ'—দ্বিগুণ—দুণা; ভগ্নী—বোন; সুগন্ধ—সোঁধা।

'চ'—সূচি—সূই।

'জ'—রাজা—রায়।

---

* Beam's *Comparative Grammar* দেখ।

† "মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি। ধন ঘড়া লয়ে পাছে পালায় পার্ব্বতী।"

ক, ক, চ।

‡ "নাহি রাঁধে নাহি বাড়ে নাহি দেয় ফু। পরের রাঁধন খেয়ে চাঁদপানা মু॥" ক, ক, চ।

'ত'—ভ্রাতা—ভাই ; মাতা—মা ; শত—শ ; ঘাত—ঘা।

'দ'—হৃদয়—হিয়া ; কদলী—কলা ; খাদন—খাওন।

'প'—কূপ—কূয়া ; প্রাপন—পাওন ; পিপাসা—পিয়াসা।

দীপশলাকা—দিয়াশলাই।

'ভ'—নাভি—নাই ; গাভী—গাই।

'ম'—গ্রাম—গাঁ।

কথিত ভাষা এইরূপে সর্ব্বদা সহজ আকারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

কথিত ও লিখিত ভাষার প্রভেদ।

বিম্‌স্‌ সাহেবের অভিপ্রায়, এই ভাষা লিখিত রচনাতেও প্রবর্ত্তিত হউক। তিনি বঙ্গদেশের সাধুভাষাপ্রয়োগশীল লেখকগণের প্রতি যেন কতকটা বিরক্ত। যাঁহাদের সহজ ভাষা মুখে না বলিলে চলে না, তাঁহারা লিখিতে বসিলেই সংস্কৃতের কথা স্মরণ করেন কেন? তখন 'খাওয়ার' স্থলে 'আহার করা,' 'ভাত' স্থলে "অন্ন' ও 'জল' স্থানে 'নীর' ব্যবহার না করিলে তাঁহাদের মনঃপূত হয় না। আমাদের মতে এই আড়ম্বরপ্রিয়তা সর্ব্ব স্থলে নিন্দনীয় নহে। বাঙ্গালা ভাষার কল্যাণ-সাধনহেতু সংস্কৃতের নিকট সততই শব্দ ভিক্ষা করিতে হইবে। যদি বিষয় গৌরবজনক হয়, তবে একটু আড়ম্বরে ভাষার সৌষ্ঠব-বৃদ্ধি ব্যতীত ক্ষতি নাই। বিশেষতঃ ঠিক কথিত ভাষা কখনই লিখিত ভাষায় পরিণত হইতে পারে না। দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের প্রচলিত ভাষার একীকরণ জন্য লিখিত ভাষার স্বাতন্ত্র্য আবশ্যক। যদি কলিকাতার কথিত 'গেলুম' লিখিত রচনায় স্থান পায়, তাহা হইলে শ্রীহট্টের 'গ্যাছলাম' কি 'যাইবাম' সেই অধিকারে বঞ্চিত হইবে কেন? স্বদেশ-বৎসলগণ তাহাও চালাইতে কৃতসংকল্প হইতে পারেন। বঙ্গভাষা তাহা হইলে দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, পৃথক্ ভাব অবলম্বন করিয়া বহুরূপী হইয়া দাঁড়াইবে। লিখিত ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষা সেই জন্য প্রয়োজনীয়।

ন্তু লেখনী লইয়া বসিলেই যে সাধারণ ভাব বুঝাইতেও ভাষার জ্ঝাটিকাপূর্ণ আভিধানিক ঘোর সমস্যা প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহাও স্তুনীয় নহে। মাইকেল তাঁহার সুহৃদ্ মনোমোহন বাবুর মাতার নিকট ত্রে লিখিয়াছিলেন,—

"আপনি পরম জ্ঞানবতী, সুতরাং ইহা কখনই আপনার নিকট অবিদিত নহে যে, রূপ তীক্ষ্ণ-শর-স্বরূপ শোক এ সংসারে সর্ব্বদাই মানবকুলের হৃদয় বিদ্ধন করে। পিতৃ-ন-দর্শন-সুখ প্রিয়বর যে পৃথিবীতে লাভ করিতে পারিবেন না, ইহাতে তিনি নিতান্ত ম্লমান।"

এই রচনাকে সহসা পাণ্ডিত্যাভিধান দিতে প্রবৃত্তি হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়।

পাশ্চাত্য মত,—বিভক্তি-চিহ্ন ও ছন্দ।

বঙ্গভাষা অনার্য্যভাষা-সম্ভূত নহে।

এই সকল গৌড়ীয় ভাষা সংস্কৃত কি প্রাকৃত হইতে আসে নাই, অপর কোন অনার্য্য ভাষা হইতে উহারা উদ্ভূত হইয়াছে, কয়েক জন পণ্ডিত এইরূপ মত প্রচার করিয়াছিলেন। ক্রফোর্ড্, ল্যাথাম্, এণ্ডারসন্, কে এবং কল্ড্ওয়েল্, এই মতাবলম্বী। ইঁহারা বলেন, বঙ্গীয়, হিন্দী, কি অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার আদিকালে সংস্কৃতের সহিত কোন সংস্রব ছিল না। বিভক্তি ও ছত্রগুলির গঠন দ্বারাই কোন ভাষার আদিনির্ণয় সঙ্গত; কেবল শব্দগত সাদৃশ্য দেখিয়া সহসা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নহে। তাঁহারা বলেন, আর্য্যজাতি ক্রমে দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবতরণ করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, কিন্তু বিজিত অনার্য্যদিগের সঙ্গে বাস হেতু, তাঁহাদের ভাষা পরিগ্রহ করিলেন। সংস্কৃতের প্রভাববিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল ভাষায় বহুলপরিমাণে সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ করিল। কিন্তু বিভক্তি-চিহ্ন ও বাক্যগঠনে উহাদের আদিম অনার্য্য সম্বন্ধ অদ্যাপি বর্ত্তমান। এতদনুসারে ডাক্তার কে বিবেচনা করেন যে, হিন্দীর "কো" (যথা 'হামকো') ও বাঙ্গালার "কে" (যথা 'রামকে') তাতার দেশীয় অন্ত্যবর্ণ "ক" হইতে আগত হইয়াছে। ডাক্তার কল্ড্ওয়েল্, দ্রাবিড় * ভাষার বিভক্তি-চিহ্ন "কু" হইতে হিন্দীর "কো" আসিয়াছে, এইরূপ

* দ্রাবিড়ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হয় নাই, অনেক পণ্ডিতই এই মতাবলম্বী। See *Comparative Grammar of the Dravidian Languages* by Bishop Caldwell, p. 46, Ed. 1875; also Hunter's *British Empire*, p. 32.

অনুমান করেন, এবং হিন্দী প্রভৃতি ভাষা দ্রাবিড়-ভাষা-সম্ভূত, এই মত প্রচার করেন। ডাক্তার হরন্‌লি ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই সব মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পাদটীকায় কল্ড্‌ওয়েলের যুক্তি ও তাহার বিরুদ্ধে হরন্‌লির খণ্ডনকারী যুক্তির সারাংশ সঙ্কলিত হইল।* গৌড়ীয় ভাষাগুলির বিভক্তি যে সমস্তই সংস্কৃত কি প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে, তাহা মিত্র মহোদয়, হরন্‌লি, দিট্যাছি ও জার্ম্মান পণ্ডিতগণ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গভাষার বিভক্তিগুলি সম্বন্ধে এখনও কেহ সম্পূর্ণরূপে স্থির সিদ্ধান্ত করেন নাই। আমরা এই অধ্যায়ে সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব।

ফরাসী ইত্যাদি ভাষার কবিতায় মিত্রাক্ষরযোজনরীতি বর্ব্বর ভাষা-বিশেষ হইতে অনুকৃত, এণ্ড্রেস্ এবং হুয়ে এই মত প্রচার করিয়াছিলেন।

---

* ডাক্তার কল্ড্‌ওয়েল্ বলেন, আর্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তদ্দেশপ্রচলিত অনার্য্যভাষা সংস্কৃত-শব্দৈশ্বর্য্য দ্বারা পুষ্টিলাভ করিতে লাগিল। এই জন্য ঐ সকল অনার্য্যভাষা সংস্কৃতজাত বলিয়া সহসা ভ্রম জন্মিতে পারে। কিন্তু সংস্কৃতের প্রভাব যতই প্রবল হউক না কেন, ঐ সকল ভাষার ব্যাকরণ তদ্দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। তাহার উত্তরে ডাক্তার হরন্‌লি বলেন, আর্য্যগণ বহুকাল আর্য্যাবর্ত্তে বাস করিয়া সহসা ঘৃণিত অনার্য্যগণের ভাষা গ্রহণ করিবেন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে; তাহারা যে সুদীর্ঘকাল সংস্কৃতজাতীয় পালি ও প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে; এবং নাটকাদির প্রাকৃত দ্বারা ইহাও দৃষ্ট হয় যে, বিজিত অনার্য্যগণও তাহাদিগের প্রভুগণের ভাষাই পরিগ্রহ করিয়াছিল; এতাবৎ কাল হিন্দুগণ স্বীয় ভাষা ও ব্যাকরণ অনার্য্যগণের মধ্যেও প্রচলিত রাখিয়া কেনই বা শেষে ঘৃণিত অনার্য্য ব্যাকরণের শরণাপন্ন হইবেন? আর গৌড়ীয় ভাষাগুলির উৎপত্তির সময়ে—আর্য্যভাষার সুদীর্ঘকালব্যাপী অখণ্ড রাজত্বের পরে যে বিজিত অনার্য্যগণের ভাষা এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। ইতিহাসে অবশ্য মধ্যে মধ্যে এরূপও দেখা গিয়াছে যে, বিজেতৃ জাতিগণ বিজিতগণের ব্যাকরণ গ্রহণ করিয়াছেন; যথা,—নর্ম্মানগণ ইংলণ্ডে, আরব ও তুর্কীজাতিরা আর্য্যাবর্ত্তে, এবং ফরাসীগণ গলে; কিন্তু এই সব স্থলে বিজেতৃগণ বিজিতগণ অপেক্ষা অল্পশিক্ষিত ছিলেন, এবং উপনিবেশস্থাপনের প্রারম্ভকাল হইতেই বিজিতগণের ভাষাপরিগ্রহের সূত্রপাত হইয়াছিল। বহুকাল বিজয়ী জাতি স্বীয় ভাষা ও স্বাতন্ত্র্য-গৌরব রক্ষা করিয়া অসভ্যজাতিগণের নিকট শেষে তাহা বিসর্জ্জন দিয়াছেন, ইতিহাসে কোথাও এরূপ দৃষ্ট হয় না।

J. A. S., 1872, Part I., No. II., p. 122.

এই মত এখন সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইয়াছে। গৌড়ীয় ভাষাগুলিও কোন অনার্য্য ভাষা হইতে নিঃসৃত হইয়া সংস্কৃত অভিধানের সাহায্যে পুষ্ট হইয়াছে, এই মতও এখন সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত। এই সব অদ্ভুত মত-প্রচারকদিগের যুক্তি—সেক্সপীয়র ও বেকন এক ব্যক্তি, বুদ্ধ কোন লোকবিশেষের নাম নহে, কাশ্মীরাধিপ মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস একই ব্যক্তি,—প্রভৃতি মতবাদীদিগের যুক্তির সহিত এক প্রকোষ্ঠে রক্ষিত হইবে। দুই এক জন গ্রন্থকীট দৈবাৎ কোন প্রাচীন আলমারীর পুঁথিতে তাঁহাদের বিচিত্র যুক্তিকুহক ও তর্কশক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্ময়াপন্ন হইবেন, কিন্তু শিক্ষিতজগৎ সেই সকল মত আর গ্রহণ করিবেন না; সেই সব প্রাচীন যুক্তির শব চিরদিনের জন্য ভূপ্রোথিত হইয়াছে।

বাঙ্গালা বিভক্তি।

বাঙ্গালা প্রথমা বিভক্তি সংস্কৃতের মত; অনুস্বার কি বিসর্গবর্জ্জিত হয় এই প্রভেদ। কিন্তু তথাপি উহা যে প্রাকৃতের অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। প্রথমার একবচনে প্রাকৃতে কোথাও 'এ' সংযুক্ত দেখা যায়; যথা, 'শু অনেহু, ভিচ্চাণকপ্পকে শামীএ নিদ্ধণকেবি শোহেদি।' মৃঃ কঃ, ৩ অঙ্ক। কর্ত্তৃবাচক তৃতীয়াতেও প্রাকৃতে ঐরূপ 'এ' অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়। এই 'এ' বাঙ্গালা কর্ত্তৃকারকে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত। যথা,—

(১) "শুনিয়া রাজা এ বোলে হইয়া কৌতুক।
সুগন্ধা অপছরা কেন হৈল মৃগরূপ॥"—সঞ্জয়; আদি।

(২) "কদাচিৎ না দেখিছ হেনরূপ ঠান।
কোন মতে বিধাতাএ করিছে নির্ম্মাণ॥"
—রামেশ্বরী মহাভারত; বেঃ গঃ পুঁথি; ৮৬ পত্র।

প্রথমার দ্বিবচন ও বহুবচনের প্রভেদ, প্রাকৃতে রক্ষিত হয় নাই। অনেক স্থলেই প্রাকৃতে দ্বিবচন কি বহুবচনে কেবল আকারযুক্ত প্রয়োগ দেখা যায়; যথা,—'ভব অদি তমসে অঅং দাব পরিসো জাদো দেউণ ণ আণামি কুশলবা।' —উঃ চঃ, ৩য় অঙ্ক। 'কহিংমে পুত্তআ'—উঃ চঃ, ৭ম অঙ্ক।

প্রাচীন বাঙ্গালায় বহুবচনবোধক নামশব্দে অনেক স্থলে ঐরূপ আকার দেখা যায়। যথা,—

"নরা, গজা বিশে সয়, তার অর্দ্ধেক বাঁচে হয়। বাইশ বলদা, তের ছাগলা"।—খনা।

ট্রম্প অনুমান করেন, বাঙ্গালা কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারকের 'কে' সংস্কৃতের সপ্তমীতে প্রযুক্ত 'কৃতে' শব্দ হইতে আগত।* এই 'কৃতের' নিমিত্তার্থ প্রয়োগের উদাহরণ স্থলে স্থলে পাওয়া যায়। যথা,—

"বালিশো বত কামাত্মা রাজা দশরথো ভৃশং।
প্রস্থাপয়ামাস বনং স্ত্রীকৃতে যঃ প্রিয়ং সুতম্॥"
—রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড।

মোক্ষমূলর বলেন, সংস্কৃতের স্বার্থে 'ক' হইতে বাঙ্গালা 'কে' আসিয়াছে। শেষ সময়ের সংস্কৃতে স্বার্থে 'ক'এর বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আমরা মোক্ষমূলরের মতই সম্পূর্ণ সমীচীন মনে করি। বাঙ্গালা প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির আলোচনা করিলে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই 'ক' (যথা বৃক্ষক, চারুদত্তক, পুত্রক) প্রাকৃতে অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। † গাথা ভাষায় এই 'ক'এর প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ; যথা, ললিতবিস্তরের একবিংশাধ্যায়ে,—

"সুবসন্তকে ঋতুবরে আগতকে।
রতিমো প্রিয়া ফুল্লিত পাদপকে॥
বশবর্ত্তি সুলক্ষণ কোবিচিত্রতকো।
তবরূপ সুরূপ সুশোভনকো॥
বয়ংজাত সুজাত সুসংস্থিতিকাঃ।
সুখ কারণ দেব নারায়ণ বসন্ততিকাঃ॥

---

* এই 'কৃত' শব্দ প্রাকৃতে 'কিতে,' 'কিও' এবং 'কো,' এই তিন রূপেই ব্যবহৃত হইত। ট্রম্প্ অনুমান করেন, শেষোক্ত 'কো'র সঙ্গে হিন্দীর 'কো' ও বাঙ্গালা 'কে'র সাদৃশ্য আছে।

† "তাম্রশাসনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাতে স্বার্থে 'ক'এর, ব্যবহার কিছু বেশী। 'দূত' স্থানে 'দূতক', 'হট্ট' স্থানে 'হট্টিকা', 'বাট' স্থানে 'বাটক', 'লিখিত' স্থানে 'লিখিতক' এইরূপ শব্দপ্রয়োগ কেবল উদ্ধৃত অংশ মধ্যেই দেখা যায়। সমুদয় শাসনে আরো অনেক দেখা যাইবে।"—শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল কৃত,—"ধর্ম্মপালের তাম্র-শাসন;" সাহিত্য; মাঘ; ১৩০১; ৬৫৩ পৃং।

উত্থি লঘু পরিভুঞ্জ সুযৌবনকং।
দুর্ল্লভ বোধি নিবর্ত্তয় মানসকম্॥" ইত্যাদি।

বাঙ্গালায় পূর্ব্বে এই 'ক' সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মতই ছিল। পূর্ব্ববঙ্গে ২০০ বৎসরের পূর্ব্বের পুঁথিগুলিতে এই 'ক' এর প্রয়োগ অসংখ্য। আমরা এই স্থলে কয়েকটিমাত্র ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

(১) "রথ হৈতে ফাল (লাফ) দিয়া চক্র লৈয়া হাতে।
ভীষ্মক মারিতে যায়, দেব জগন্নাথে॥"—কবীন্দ্র; বেঃ গঃ, ১০৬ পত্র।

(২) "ভীষ্মক-ভয়ে যত সৈন্য যায় পলাইয়া।" ঐ

(৩) "সে যে ভার্য্যা অনুক্ষণ পতিক সেবয়।"—সঞ্জয়।

(৪) "শিখণ্ডীক দেখিয়া পাইবা অনুতাপ।"—কবীন্দ্র; বেঃ গঃ, ৭৫ পত্র।

(৫) "পঞ্চ ভাই দ্রৌপদীক কুশল জানাইব।" ঐ; ৭৭ পত্র।

এই ভাবে কর্ত্তা এবং কর্ম্ম উভয় স্থলে 'ক' থাকিলে কোন্‌টী কর্ত্তা, কোন্‌টী কর্ম্ম, পরিচয় পাওয়া কঠিন। "সৌরন্ধ্রীক কীচক বোলয়ে তত্ক্ষণ"*— ছত্রে কে কাহাকে বলিল, নির্ণয় করা সহজ নহে। সেই জন্য কর্ম্ম ও সম্প্রদানে বাঙ্গালায় 'ক'র ব্যবহার পরে প্রচলিত হইল। গাথা ভাষায় ও প্রাকৃতে মধ্যে মধ্যে 'কে'র প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যথা প্রাকৃতে,—

"পালি ও আত্থদাসী এ পুত্তে দলিদ্দ চারুদত্তাকে তুমং।"—মৃঃ কঃ, ৮ম।

কোন কোন স্থলে বাঙ্গালা কর্ম্মকারকে কোন বিভক্তি-চিহ্নই প্রযুক্ত হয় না। যথা,—রাম গাছ কাটিয়াছে। এইরূপ ব্যবহার ও পূর্ব্বোক্ত 'ক'-যুক্ত ব্যবহারের সহিত পূর্ব্বে কোন পার্থক্যই ছিল না। কারণ 'ক' পূর্ব্বে বিভক্তিবোধক চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত ছিল না, উহা শব্দের অন্ত্যবর্ণ মাত্র ছিল। এই জন্য প্রাচীন কালে কর্ম্ম ও সম্প্রদান ব্যতীত অন্যান্য বিভক্তিতেও 'কে' ব্যবহৃত হইত। যথা,—

"মথুরাকে পাঠাইল রূপ সনাতন।" (চৈ, চ; আদি, ৮ম পং)

---

*কবীন্দ্র; বেঃ গঃ। ৬০ পত্র।

বহুবচন বুঝাইবার জন্য পূর্ব্বে শব্দের সঙ্গে শুধু "সব", "সকল" প্রভৃতি শব্দ সংযুক্ত হইত। যথা,—

"তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার।
কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সবার॥" চৈ, ভা; আদি।

ক্রমে "আদি" সংযোগে বহুবচনের পদ সৃষ্ট হইতে লাগিল। যথা, নরোত্তমবিলাসে,—

শ্রীচৈতন্যদাস আদি যথা উত্তরিলা।
শ্রীনৃসিংহ কবিরাজে তথা নিয়োজিলা॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি পণ্ডিতাদি বাসা ঘরে।
করিলেন নিযুক্ত শ্রীব্যাস আচার্য্যেরে॥
আকাই হাটের কৃষ্ণদাসাদি বাসায়।
হইলা নিযুক্ত শ্রীবল্লভীকান্ত তায়॥

এইরূপে, "রামাদি", "জীবাদি", হইতে ষষ্ঠীর 'র' সংযোগে 'রামদের', 'জীবদের' উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়।

আদি শব্দের উত্তর স্বার্থে 'ক' যুক্ত হইয়া 'বৃক্ষাদিক', 'জীবাদিক' শব্দের সৃষ্টি স্বাভাবিক। ফলতঃ, উদাহরণেও তাহাই পাওয়া যায়। যথা, নরোত্তমবিলাসে,—

"রামচন্দ্রাদিক যৈছে গেলা বৃন্দাবনে।
কবিরাজ খ্যাতি তার হইল যেমনে॥"

এই 'ক'এর 'গ'এ পরিণতিও সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। সুতরাং 'বৃক্ষাদিগ' (বৃক্ষদিগ) 'জীবাদিগ' (জীবদিগ) শব্দ পাওয়া যাইতেছে। এখন ষষ্ঠীর 'র'-সংযোগে 'দিগের' এবং কর্ম্মের ও সম্প্রদানের চিহ্নে পরিণত 'কে'র সংযোগে 'দিগকে' পদ উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ বলা যাইতে পারে।* কাহারও কাহারও মতে পার্শী 'দিগর' শব্দ হইতে বাঙ্গালা 'দিগের' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

---

* এই বিভক্তি-চিহ্ন প্রাকৃত হইতে আগত হয় নাই। ইহা সংস্কৃতের অভ্যুদয়ের পরে

আদি শব্দের সংযোগ ব্যতীত 'ক' বর্ণকে 'গ'এ পরিণত করিয়া পূর্ব্বাঞ্চলবাসিগণ 'আমাগো', 'রামগো' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করেন। ঐ কথাগুলি দ্বারা 'অস্মাকং', 'রামকঃ' প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে প্রচলিত বাক্যের নিকট সম্বন্ধ প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মতে, প্রাকৃত 'কেরউ' হইতে বাঙ্গালা 'গুলো' শব্দের জন্ম। হিন্দী 'ঘোড়াকের', নেপালী 'ঘোড়াহেরু', বাঙ্গালা 'ঘোড়াগুলো' একই অর্থবাচক ও একই ভাবে উদ্ভূত; * কিন্তু 'বালকটি', 'একটি', 'দুইটি'—ইত্যাদি ভাবের 'টি' স্পষ্টতই 'গুটি' শব্দ হইতে আসিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তকে ঐ ভাবে 'গুটি' শব্দের প্রয়োগ অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। যথা,—"দুইখো দুই কুটুম্ব আবার আন নাই। দন্দবাদ না করিবি দুই গুটি ভাই।" (দুয়ের দুই আত্মীয়, আর অন্য কেহ নাই, দুই ভাই দ্বন্দ্ব করিও না)—অনন্ত-রামায়ণ।

করণ কারকের পৃথক্ চিহ্ন বাঙ্গালায় নাই বলিলেও হয়। সংস্কৃত 'রামেণ' স্থলে প্রাকৃতে 'রামএ' ব্যবহৃত হইত। ইহা হইতে বাঙ্গালায় পূর্ব্বে "রামে ডাকিয়াছে", "রাজায় (এ) বলিয়াছে" ইত্যাদি রূপ প্রয়োগ প্রচলিত ছিল। এখনও "কুড়ালে পা কাটিয়াছে", "নৌকায় বাড়ী গিয়াছে" প্রভৃতি দৃষ্টান্তে প্রাকৃতের সঙ্গে বাঙ্গালার নৈকট্য দৃষ্ট হয়। 'দ্বারা' শব্দ সংস্কৃত 'দ্বার' শব্দ হইতে আগত। উহা কথিত ভাষায় 'দিয়া'তে পরিণত। সম্প্রদান সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে; বাঙ্গালায় কর্ম্মকারকের সঙ্গে সম্প্রদানকারকের কোন প্রভেদ নাই। প্রাকৃতে 'হিংতো' শব্দ † পঞ্চমীর বহুবচনে ব্যবহৃত হইত। এই 'হিংতো' হইতে

গঠিত হইয়াছে, তাই সংস্কৃতের সঙ্গে অধিক সংশ্লিষ্ট। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন পুস্তকগুলিতে এইরূপ প্রয়োগ আদৌ নাই। 'দিগকে,' 'দিগের' এখনও পূর্ব্ববঙ্গে কথায় প্রচলিত হয় নাই।

* ভারতী, ১৩০৫;—জ্যৈষ্ঠ।

† "ভাসো হিংতো সুংতো।"—ইতি বররুচিঃ।

বাঙ্গালা ‘হইতে’ আসিয়াছে। এই ‘হিংতো’ পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ‘হন্তে’ রূপে প্রচলিত ছিল। যথা,—

"কা'কে ক'ল্ল নির্বলী কাহাকে বলী আর।
হাড় হন্তে নির্ম্মিয়া করয় পুনি হাড়॥"

আলওয়াল কৃত পদ্মাবতী; ২ পৃষ্ঠা।

এই ‘হিংতো’র অপর রূপ ‘হনে’ও পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন পুঁথিগুলিতে অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। যথা,—

"তাকে দেখি মোহ পাইলু, না দেখিলু পুনি।
সেই হনে প্রাণ মোর আছে বা না জানি॥"—সঞ্জয়, আদি।

প্রাকৃত ষষ্ঠীর চিহ্ন ‘ণ’ * বাঙ্গালা ‘র’কারে পরিণত হয়। প্রাকৃত ‘অগ্গীণ’ স্থলে আমরা বাঙ্গালায় ‘অগ্নির’ পাইতেছি। ‘ণ’ সচরাচরই ‘র’ বা ‘ড়’তে পরিণত হয়। এই পরিণতি সম্বন্ধে যদি কেহ বিশেষ প্রমাণ চান, তবে উড়িষ্যা দেশ ঘুরিয়া আসিলেই তাঁহার প্রতীতি জন্মিবে। কিন্তু ষষ্ঠীর সম্বন্ধে মতান্তর আছে। বপ্ অনুমান করেন, হিন্দীর ‘কা’ এবং বাঙ্গালা ষষ্ঠীর চিহ্ন সংস্কৃত ষষ্ঠীর বহুবচনের ‘অস্মাকম্’, ‘যুষ্মাকম্’ ইত্যাদির ‘ক’ হইতে আসিয়াছে।† কিন্তু হরনলি সাহেব, বপের অনুমানের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন; এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।‡ তাঁহার মতে, সংস্কৃত ‘কৃতে’র প্রাকৃত রূপান্তর হইতেই বাঙ্গালা এবং হিন্দীর ষষ্ঠীর চিহ্ন আসিয়াছে। ‘কৃতে’ হইতে প্রাকৃত ‘কেরক’ উৎপন্ন হইয়াছে। এই ‘কেরকে’র অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। সেই সেই স্থলে

---

* টামোর্ণঃ। অতোহনন্তরং টামোস্তৃতীয়ৈকবচনষষ্ঠীবহুবচনয়োর্ণকারো ভবতীতি।
—বররুচিঃ।

† Bopp's *Comparative Grammar*, para 340, Note.

‡ Journal Asiatic Society, 1872, No. II., p. 125.

'কেরকে'র কোন স্বকীয় অর্থ দৃষ্ট হয় না, উহা শুধু ষষ্ঠীর চিহ্নস্বরূপই ব্যবহৃত হয়। যথা,—

"তুমং পি অপ্পণো কেরিকং জাদিং সুমরেসি।"—মৃঃ কঃ, ৬ষ্ঠ অঙ্ক।
"কস্য কেরকং এদং পবণম্॥

এই 'কেরক' (বা 'কেরিক') হইতে হিন্দী 'কর', 'কের', 'কেরি' আসিয়াছে। যথা,—

তুলসীদাসের রামায়ণে— 'ক্ষত্রজাতিকের রোষ'—লঙ্কাকাণ্ড। 'বন্দোং পদসরোজ সবকেরে'—বালকাণ্ড। এই 'কেরক' হইতে যেরূপ হিন্দীর 'কের' ইত্যাদি আসিয়াছে, সেইরূপ অন্য দিকে বাঙ্গালা ও উড়িয়া ষষ্ঠীর চিহ্ন 'এর' ও 'র' উদ্ভূত।* রাজা রাজেন্দ্রলাল অনুমান করেন, বাঙ্গলা ষষ্ঠীর 'র' সংস্কৃত 'স্য' হইতে আগত। এই মতের সাপক্ষে বলা যাইতে পারে যে, 'স' এবং 'র' উভয়ই বিসর্গে পরিণত হয়। অনেক স্থলে (যথা, বহির্গত) স, রেফ অর্থাৎ রকারে পরিণত হয়। সপ্তমীর 'তে' সংস্কৃত 'তসিল' হইতে উৎপন্ন। সংস্কৃতের একার—যথা গহনে, কাননে,—প্রাকৃত এবং বাঙ্গালায় ঠিক তদ্রূপই আছে। কিন্তু বাঙ্গালার সপ্তমী একেবারে প্রাকৃত-চিহ্ন-বর্জ্জিত নহে। সংস্কৃত শালায়াং, বেলায়াং, ভূম্যাং এর স্থলে প্রাকৃত শালাএ, বেলাএ, ভূমিএ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন

---

* In using কের in composition with the word in the genitive case, the initial 'ক' of the former is elided regularly. Thus we arrive at এর. Take for instance the genitive of সন্তান, a child. It would be সন্তানকেরকো; this would change to সন্তানকের and this to সন্তান এর—সন্তানের which is the present genitive in Bengali. By analogy the other Bengali genitive post-position র which it shares with the Oriya, is probably a curtailment of the genitive case 'কর' —as ঘোড়াকর, ঘোড়াঅর,—ঘোড়ার। Journal Asiatic Society, 1872, No. II., p. 132—133.

হস্ত-লিখিত বাঙ্গালা পুস্তকেও ঐ সব শব্দ প্রাকৃতের মতই পাওয়া যায়। আধুনিক 'শালায়', 'বেলায়' 'এ', 'য়' হইয়াছে, এইমাত্র প্রভেদ।

বঙ্গভাষার ইতিহাসে বিভক্তির অধ্যায় অতি প্রয়োজনীয়। আমরা তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় এ বিষয়ে একেবারেই হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন,—"কিন্তু এই সকল বিভক্তি-চিহ্ন যে কোথা হইতে আসিল, তাহা ঠিক বলা যায় না।" * আমরাও হয়ত তাহা ঠিক বলিতে পারিলাম না।

অসভ্যগণের ভাষার কথঞ্চিৎ মিশ্রণ।

বাঙ্গালার আদিম অসভ্যদিগের ভাষার সঙ্গে, আর্য্যদিগের কথিত ভাষা কতক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে। কোন্ গুলি অনার্য্য-শব্দ, তাহার নির্ণয় সহজ নহে। এই বাঙ্গালাভাষার সঙ্গে অনেক শব্দ মিশ্রিত আছে, যাহা পার্শী, আরবী, কি উর্দ্দুতে নাই;—সংস্কৃত কি প্রাকৃত হইতেও তাহাদের উদ্ভবের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় উদাহরণ দিয়াছেন, যথা,—কুলা, ঢেঁকি, ধুচনি; এই 'ধুচনি' শব্দ সংস্কৃত 'ধৌত' শব্দ হইতে আগত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গীয় অভিধানে অনেক শব্দ 'দেশজ' সংজ্ঞায় আখ্যাত হইয়াছে। প্রকৃতিবাদ অভিধানের সমগ্র শব্দসংখ্যা প্রায় সপ্তবিংশ সহস্র হইবে, তন্মধ্যে অন্যূন অষ্টশত শব্দ 'দেশজ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।† এই 'দেশজ'-সংজ্ঞা-বিশিষ্ট শব্দগুলির ভালরূপ পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাদের অধিকাংশেই সংস্কৃতের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—আজ, হুল, ওছা, পাণ্ডা, ফাঁপা, পোণে ইত্যাদি শব্দ 'দেশজ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, ইহারা বোধ হয় অদ্য, শূল, উচ্ছিষ্ট, পণ্ডিত, স্ফীত, পাদোন ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে কোন না কোনরূপে সংশ্লিষ্ট। দেশজ-আখ্যা-বিশিষ্ট শব্দগুলির কতক

---

* ৺রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব'—পৃঃ ২০।
† প্রকৃতিবাদ অভিধান; দ্বিতীয় সংস্করণ, সংবৎ ১৯৩৩।

অনার্য্য ভাষা হইতে গৃহীত, ইহা অসম্ভব নয়, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই সংস্কৃত বা প্রাকৃতের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। কোন্ শব্দ বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হইয়া কি আকার ধারণ করে, তাহা অনেক সময় বুঝিয়া উঠা দুষ্কর; ইংরাজীতে মারগ্রেট্ হইতে 'পেগ্', এলিজাবেথ্ হইতে 'বেস্' যে দুর্জ্ঞেয় নিয়মে উৎপন্ন তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। এই প্রাকৃত-সম্ভূত বঙ্গভাষায় পার্শী, ইংরেজী, আরবী, পর্ত্তুগিজ, মগী প্রভৃতি নানা ভাষার শব্দ আছে। তবে অনুকৃতি দ্বারাও অনেক শব্দ আপনা-আপনি গঠিত হয়; যথা,—ময়ূরের 'কেকা', বানরের 'কিচ্‌মিচ্।' কিঞ্চিৎ অনার্য্য শব্দের মিশ্রণ গ্রীকে আছে, লাটিনে আছে, সংস্কৃতে আছে, বাঙ্গালায়ও আছে; সে জন্য বাঙ্গালা ভাষার জাতি যায় নাই।

ছন্দ।

এখন বাঙ্গালা ভাষার ছন্দ পর্য্যালোচনা করা যাউক। 'পয়ার' শব্দটি 'পাদ' (চরণ) হইতে আসিয়াছে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই মত গ্রহণীয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় বাঙ্গালা পয়ার কোথা হইতে আসিল, এই প্রশ্ন লইয়া একটু গোলে পড়িয়াছেন, এবং "করিমা ব্যবকসায় বর্‌হালেমা" ইত্যাদি পার্শীর বয়েৎ তুলিয়া গবেষণা করিয়াছেন।

অতি প্রথমে ভাটগণ বিবাহাদির উপলক্ষে পাত্র-পাত্রীর গৃহে যশোগান করিত। পাল-রাজগণের স্তুতি-ব্যঞ্জক কবিতা বাঙ্গালা ভাষার অতি প্রাচীন গীতি। তাহা ভাটগণের দ্বারাই প্রথম প্রচারিত হয়। এইরূপ গীতির প্রথা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন।* প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য খুঁজিলেও অনেক স্থলেই এই ভাটগীতির উল্লেখ পাওয়া যায়।†

---

* "The institution of Bhats is as old as Indo-Aryan civilization."—Indo-Aryans, Vol. II., P. 293.

† "পহিলে শুনিনু অপরূপ ধ্বনি কদম্বকানন হৈতে।
তার পর দিন ভাটের বর্ণনা শুনি চমকিত চিতে॥"

শুধু ভাট-সংগীত নহে, পূর্ব্বে বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণব-দিগের গীতি সমস্তই গায়কেরা সুরসংযোগে গান করিত। চৈতন্য-ভাগবতের পূর্ব্ব নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল। রামমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, মনসা-মঙ্গল—এ সমস্তই গানের পালা। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ত্রিপদী স্থলে 'লাচাড়ী' (সম্ভবতঃ লহরী শব্দের অপভ্রংশ), 'দীঘছন্দ' বা কোন রাগ রাগিণীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। লেখকগণও স্ব স্ব ভণিতায় "রামায়ণ গান দ্বিজ মন অভিলাষে" কি "পয়ার প্রবন্ধে গাহে কাশীরাম দাস" ইত্যাদি ভাবে পাদ পূরণ করিয়াছেন। এই সব গান এক জনে গাহিয়া যাইত ও তাহার সঙ্গিগণ গীতির একভাগ সমাপ্ত হইলে সমবেত কণ্ঠে ধুয়া গাহিত। প্রাচীন বাঙ্গালা যে-কোন গ্রন্থে ঐরূপ ধুয়া অনেক পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের ধুয়াগুলি ভাষার মাধুর্য্যে অতুলনীয়, কিন্তু অন্যান্য প্রাচীন পুস্তকেও ধুয়া-গুলি বড় মধুর, যথা,—

"দান দিয়া যাও মোরে বিনোদিনী রাই।
বারে বারে ভাঁড়িয়াছ নাগর কানাই।"

নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণ;—হস্তলিখিত পুঁথি।

"রাম-নামের মহিমা কে জানে,
নাম সুধাময় অতি, গঙ্গা ভাগীরথী
উৎপত্তি ও রাঙ্গা চরণে।"

কৃত্তিবাসী রামায়ণ; উত্তরকাণ্ড (হস্তলিখিত পুঁথি)।

গানে অক্ষর লইয়া কোন বাঁধাবাঁধি থাকে না, মাত্রার দিকেই অধিক দৃষ্টি থাকে। তাই পূর্ব্বকালের পয়ারে কোন শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয় না।

"আর একদিন মোর প্রাণসখী কহিলে যাহার নাম।
গুণিগণ-গানে শুনিনু শ্রবণে তাঁহার নাম॥" প, ক, ত, ৩৩ নং।
"যাঁহার মুরলীধ্বনি শুনি
সেই বটে এই রসিকমণি।
ভাটমুখে যাঁর গুণ গাঁথা
দূতী মুখে শুনি যাঁর কথা॥" প, ক, ত, ৩৬ নং।

আমরা বাঙ্গালা পদ্যের প্রাচীনতম যে নিদর্শন পাইয়াছি, তাহাতে কোন ছন্দ বা প্রণালী দৃষ্ট হয় না। ডাক ও খনার বচন ছন্দোবদ্ধ কবিতা বলিয়া বোধ হয় না। উহাতে মিলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি নাই। মাণিক-চাঁদের গানে * অক্ষর, যতি বা মিলের কিছুমাত্র নিয়ম দৃষ্ট হয় না। ভাব প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, অক্ষর-সংখ্যা ২৪, ২৫, এমন কি ২৬ও অতিক্রম করিয়াছে; আবার স্থলবিশেষে তাহা সংক্ষিপ্ত হইয়া ১২ কি ১০এ অবতরণ করিয়াছে, এরূপও দৃষ্ট হয়। মিলের প্রতি কথঞ্চিৎ দৃষ্টি আছে, কিন্তু অনেক স্থলেই নিয়ম লঙ্ঘিত হইয়াছে। সুতরাং মিল নিয়মাধীন ছিল বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব;—

(১) পরিধানের সাড়ী অর্দ্ধখান ময়নামতী দিল জলত বিছায়া।
যোগ আসন ধরিল ময়না ধরম সরণ করিয়া ॥

(২) সাত দিয়া সাত জনা গর্জ্জিয়া সোন্দাইল ॥
চামের দড়া দিয়া বাঁধিল ॥

(৩) তোর মাইয়া পাইয়াছে গোরকনাথের বর।
নাগাইল পাইলে ময়না না করে কুসল ॥

(৪) তোমার বুদ্ধি নয় বধু সকলের চক্র।
যত বুদ্ধি শিখিয়ে দেয় নিরাসী সকল ॥

কিন্তু এই গীতি, রামাই পণ্ডিতের ‘শূন্যপুরাণ’, কানুভট্টের ‘চর্য্যাচর্য্যা-বিনিশ্চয়,’ ও ডাকের বচন প্রভৃতি ছাড়িয়া দিলে পরবর্ত্তী যে কবিতা দৃষ্ট হয়, তাহাতেও ত্রিপদী এবং পয়ারাখ্য কবিতার চরণ বর্ত্তমানরূপ সীমাবদ্ধ দৃষ্ট হয় না। চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি দুই একখানি পুস্তকে পয়ার অনেকটা নিয়মিত দেখা যায়। অন্য সমস্ত পুস্তকেই ঐরূপ নিয়মের ব্যতিক্রমই অধিকাংশ স্থলে দৃষ্ট হয়। হস্তলিখিত পুঁথি যত প্রাচীন, যতি ও অক্ষরের ব্যতিক্রম তত অধিক। ত্রিপদীর ন্যায় পয়ারও ভিন্ন ভিন্ন রাগ রাগিণী সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে,—তাহার অনেক উদাহরণ দেখা যায়। নিম্ন-লিখিত পয়ার ‘গান্ধার রাগ’ অভিধান প্রাপ্ত হইয়াছে।

* Journal Asiatic Society, Bengal, 1878.—Part I., No. 3, P. 149.

রাগ শ্রীগান্ধার।

"যুদ্ধেত মরা হৈলে হয় স্বর্গগতি।
পলাইলে অযশ হয় নরকে বসতি॥
এ বুলিয়া বৃহন্নলা ধরিবারে জাএ।
অন্তরে থাকিয়া সব কুরুবলে চাএ॥
নড়এ মাথার বেণী নপুংশক বেশে।
দশপদ অন্তরে ধরিল গিয়া কেশে॥
কাকুতি করএ তবে উত্তর কুমার।
না কর না কর মোর প্রাণের সংহার॥
সুণ বৃহন্নলা মুই করম নিবেদন।
রথ বাহুড়াই আমার রাখহ জীবন॥
একশত স্ববর্ণ দিমু শুদ্ধ সুগঠিত।
অষ্টশত মণি দিমু কাঞ্চন ভূষিত॥
বৈদূর্য্য বিচিত্র দিমু মণি মনোহর।
দশ হস্তি দিমু তোক পরম সুন্দর॥" কবীন্দ্র—বেঃ, গঃ পুঁথি, ৬৫ পত্র।*

এই পয়ার,—গান্ধাররাগে গীত হইলে কেমন শুনাইবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না :

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, গানে চৌদ্দ অক্ষরের নিয়মপালনের প্রয়োজন ছিল না, উপরি-উদ্ধৃত অংশটি আমরা অক্ষর-নিয়ম-ভঙ্গের উদাহরণ স্বরূপ বাছিয়া উঠাই নাই, তথাপি উহার ১৪ চরণের মধ্যে ৫টি চরণে পয়ার নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। প্রাচীন বাঙ্গালা যে কোন পুঁথি খুঁজিলেই ১১ হইতে ২০ অক্ষরের পয়ার বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইবে। আমরা

* আমরা উদ্ধৃত অংশের অনেক স্থলেই বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিব না। প্রথমতঃ, প্রাকৃতের সঙ্গে বঙ্গভাষার নৈকট্য দেখাইতে মূল হাতের লেখা অবিকৃত রাখা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, উদ্ধৃতকারীর প্রাচীন রচনা সংস্কার করিবার অধিকার আছে কি না, তাহা সন্দেহস্থল। যাহা আমরা ভ্রম বিবেচনা করিয়া সংশোধন করিতে প্রয়াসী, তাহাই হয়ত ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিবার একমাত্র পন্থা,—শুদ্ধ করিতে গেলে সেই পথ রুদ্ধ হয়।

কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি; পাঠক সেগুলিতে অমিল পদ ও অক্ষরের ব্যতিক্রম উভয়েরই দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন।

(১) সম্মুখে রাখিয়া করে বসনের বা। (১৩)
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥ (১৩) চণ্ডীদাস।

(২) ভৈরব স্থত গজপতি বড় ঠাকুরাল। (১৪)
বারাণসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি ঘোষয়ে যাহার॥ (১৪)

রামায়ণ; হস্তলিখিত পুঁথি।

(৩) যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম। (১৫)
তাঁহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥ (১৪) চৈঃ, চঃ, ১৬ পঃ।

(৪) খই কদলক আর তৈল হরিদ্রা। (১৩)
প্রত্যেকে সবারে দিল শচী স্থচরিতা॥ (১৪) চৈ, ম, আদি।

(৫) ক্ষৌণি-কল্পতরু শ্রীমান দীন দুর্গতি বারণ। (১৭)
পুণ্য-কীর্ত্তি গুণাস্বাদী পরাগল খান॥ (১৪)

কবীন্দ্র; বেঃ, গঃ পুঁথি। ৪৫ পত্র।

(৬) নারায়ণ নাম ফল কহিব একে একে। (১৫)
অজামিল মুক্তিপদ পাইল যেমতে॥ (১৪) শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।

(৭) চৈতন্যচন্দ্রের পুণ্য বচন চরিত্র। (১৪)
ভক্ত প্রসাদে স্ফুরে জানিহ নিশ্চিত॥ (১৩) চৈ, ভা।

(৮) আজ্ঞা নাহি দেয় রাজা করি মায়া মো। (১৩)
শ্রীমন্তের নাহি রহে লোচনের লো॥ (১৩) ক, ক, চ।

(৯) প্রতি দ্বারে শোভে অতি বিচিত্র কপাট। (১৪)
প্রতি গলি নৃত্য গীত আনন্দিত প্রতি ঘরে বেদপাঠ॥ (২০)

জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল।

এইরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ত্রিপদীর (লাচাড়ীর) অবস্থা ইহা হইতেও শোচনীয় ছিল। কবীন্দ্র-রচিত ভারত হইতে নিম্নে ত্রিপদীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ইহা কি প্রকারের পদ্য

এবং কি রীতিতে সে কালের কাব্যাস্বাদিগণ ইহা পড়িয়া সুখী হইতেন, নিরূপণ করা সুকঠিন।

দীর্ঘছন্দ।

শিশু হোতে পুত্র, দেব গুরু পুজন্ত,
নাহিক যে পরম্পর ভেদ।
বিপ্র তর্পন্ত, সতত করেন্ত,
অভ্যাস করেন্ত ধনুর্ব্বেদ॥
সতত সত্য ছাড়ি, অসত্য না বোলন্ত।
প্রতিবর্গের, প্রাণ সমসর,
বিচিত্র যোদ্ধা মহাবীর।
মাদ্রী গর্ভে হৈল, মোহর প্রিয় পুত্র,
নকুল কোমল শরীর॥
বহু শত্রু ক্ষয়, করিল পুত্র মোর,
পুনি কি দেখিমু নয়নে।
কহত গোবিন্দ, হাহা শিশু পুত্র,
নকুল চলিয়া গেল বনে॥

কবীন্দ্র; বেঃ, গঃ, পুঁথি, ৭৯ পত্র।

এইরূপ দৃষ্টান্ত অল্প নহে, অনেক পাওয়া যায়। যে সময় অবধি গান আর কবিতার অধিকার পৃথক্ হইয়াছে, সেই সময় হইতে কবিতায় যতি ও অক্ষরের নিয়ম এত বাঁধাবাঁধি হইয়াছে।

এই সমস্ত ছন্দই যে সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের অনুকরণে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। যদি আদি হইতেই বাঙ্গালা পয়ারে চতুর্দ্দশ অক্ষর থাকিত, তবেও কি ইহার আদি খুঁজিতে আমাদের পার্শীর বয়েৎ খুঁজিতে হইত! এক হইতে ২৭ অক্ষর পর্য্যন্ত পদ সংস্কৃতে বহুল পরিমাণে রহিয়াছে; সুতরাং বাঙ্গালা ছন্দের কাঙ্গাল নহে। নিম্নোদ্ধৃত চতুর্দ্দশ-অক্ষরযুক্ত সংস্কৃত কবিতার দুটি যতিও বাঙ্গালার মত।

"ফুল্লং বসন্ততিলকং তিলকং বনাল্যা
লীলাপরং পিককুলং কলমত্র রৌতি।
বাত্যেষ পুষ্প সুরভির্মলয়াদ্রিবাতো
যাতো হরিঃ স মথুরাং বিধিনা হতাংস্ম।" ছন্দোমঞ্জরী ; দ্বিতীয় স্তবক।

পদান্ত মিলাইতে বাঙ্গালী কোথায় শিখিল, এই প্রশ্নের উত্তর জন্য বহুদূর খুঁজিতে হইবে না। বোধ হয় যমক অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যবশতঃ শেষ সময়ের সংস্কৃতে মিলের দিকে একটুকু বেশী দৃষ্টি পড়িয়াছিল। ল্যাটিনও ঐরূপ কারণেই মিত্রাক্ষরবিশিষ্ট হইয়াছিল।* শঙ্করের 'অর্থমনর্থং' ও জয়দেবের ,—

"বসতি বিপিন বিতানে, ত্যজতি ললিতধাম।
লুঠতি ধরণীতলে বহু বিলপতি তব নাম॥"

প্রভৃতি রাশি রাশি মিত্রাক্ষরযুক্ত কবিতা হইতে বঙ্গীয় মিত্রাক্ষর কবিতার প্রথা সূচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। প্রাকৃত কবিতায়ও মিল দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাকৃত "চরণগণবিপ্প, পঢম লইথপ্প" বা "সত্তা দীহা জাণেহী, কণ্ণা তিণ্ণা মাণেহী"† ও জয়দেবের "রতিসুখ সারে গতমভিসারে" প্রভৃতি পদগুলির অনুকরণে বঙ্গীয় ত্রিপদী গঠিত হইয়া থাকিবে। লঘু ত্রিপদী, লঘু চৌপদী ইত্যাদি প্রকার ভেদে নূতন ছন্দ উদ্ভাবনের কৌশল কিছুই নাই, কেবল সংস্কৃতের অনুযায়ী পদবিন্যাসের কৌশল দৃষ্ট হয়। সংস্কৃতের ছন্দ অনন্ত প্রকারের ও উক্ত ভাষার অসীম ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক, বাঙ্গালী ঝিনুকে সেঁচিয়া এক লহরী আনিয়াছে মাত্র।

* "But the Latin language abounds so much in consonances, that those who have been accustomed to write verses in it, well know the difficulty of avoiding them, as much as an ear formed on classical model demands ; and as this jingle is certainly pleasing in itself, it is not wonderful that the less fastidious vulgar should adopt it in their rythmical songs." Hallam's History of the European Literature, Vol. I., P. 32.

† পিঙ্গল।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৌদ্ধ-যুগ।

(১) মাণিকচাঁদের গান, (২) গোবিন্দচন্দ্রের গান, (৩) ডাক ও খনার বচন।

৮০০ খৃঃ হইতে ১২০০ খৃঃ।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিলোপ।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ভারতবর্ষের ত্রিসীমা হইতে তাড়িত হইয়াছে। যে অধ্যায়ে আমরা অশোক, শীলভদ্র ও দীপঙ্করকে পাইয়াছিলাম, উহা ভারত-ইতিহাসের এক স্বতন্ত্র অধ্যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুকরণে কত শত বাঙ্গালা পদ বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার উদার বুদ্ধ-দেব-স্তোত্র বঙ্গীয় কবিতায় কোনো উৎসাহের উদ্রেক করে নাই। বাঙ্গালায় হিন্দু-গ্রন্থগুলির মধ্যে সেই স্তোত্রাংশ বিচ্ছিন্ন ভাবে পড়িয়া আছে। দু একজন কবি ভগবানের দশ অবতার বর্ণনার সময়ে জয়দেবের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা অতি সংক্ষেপে, যেন অনিচ্ছাক্রমে। প্রাচীন সাহিত্যে গণেশ, রামচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া মনসাদেবী ও দক্ষিণরায়ের বন্দনাসূচক স্তোত্র অনেক গ্রন্থেই পাওয়া যায়, কিন্তু যাঁহার লোকমধুর চরিত্র-কাহিনীতে এক অপূর্ব্ব উন্নত আদর্শ প্রতিফলিত, যাঁহার পবিত্র নিবৃত্তি ও আত্ম-সংযম প্রকৃতই মহাকাব্যের বিষয়, সেই বুদ্ধ-দেবের একটি সামান্য বন্দনাও প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে,

হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থানই বঙ্গভাষা ও গৌড়ীয় অন্যান্য ভাষার শ্রীবৃদ্ধির কারণ; এই জন্যই সেই সকল ভাষার সাহিত্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতি এই অবজ্ঞা দৃষ্ট হয়। ভগবান্ বিষ্ণু বুদ্ধরূপ গ্রহণ করিয়া বেদ নিন্দা করিয়াছেন, সেই ক্রোধে এক লেখক বিষ্ণুবিগ্রহপূজা ও তুলসীপত্র স্পর্শকরাও নিষেধ করিয়াছেন।* শ্রীচৈতন্যদেব কাশীতে বৌদ্ধদিগের শেষ শক্তি নির্ম্মূল করিয়াছিলেন, চৈতন্য-চরিতামৃত এই জয়ের ভেরী-বাদন উপলক্ষে বৌদ্ধগণের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভাবের অবজ্ঞাসূচক উল্লেখ বৈষ্ণব সাহিত্যের স্থানে স্থানে আরও পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশ যে এক সময় বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত ছিল, তৎপ্রসঙ্গের অবতারণা আমরা নিম্নে করিতেছি। এই বৌদ্ধপ্রভাবের আধিক্য দর্শনে মনু একদা বঙ্গদেশে আগমন প্রায়শ্চিত্তের বিষয়ীভূত বলিয়া বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এমন কি পালী ও প্রাকৃতের দ্বারা বিশেষরূপ প্রভাবান্বিত দেখিয়া খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণপণ্ডিত তদীয় 'প্রাকৃত চন্দ্রিকায়' বঙ্গভাষাকে পৈশাচিক প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধপ্রভাবের আধিক্য নিবন্ধনই এই দেশ এবং এই দেশের ভাষা হিন্দু সম্প্রদায়ের উপেক্ষাই ছিল। কালের কুটিল গতি। যে দেশের সমেত-শেখরে তেইশ জন জৈন তীর্থঙ্কর মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্ব প্রধান তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী যে দেশে অষ্টাদশ বর্ষব্যাপী প্রচারকার্য্যে নিরত ছিলেন, যে দেশের প্রিয়পুত্র বৌদ্ধাচার্য্য শান্ত রক্ষিত নালন্দাবিহারের শ্রেষ্ঠতম অধ্যাপকের আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমস্ত বৌদ্ধ জগতে অনন্যসাধারণ বঙ্গীয় প্রতিভার গৌরব প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, সেই দেশ হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে বৌদ্ধ

---

* "বেদবিনিন্দিতা যস্মাৎ বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা।
ন স্পৃশেৎ তুলসী-পত্রং শালগ্রামঞ্চ নার্চ্চয়েৎ॥"

কুলার্ণবতন্ত্র।

এবং জৈন ধর্ম্মের প্রতি এতাদৃশ প্রতিকূলতা অবলম্বন করিল যে, তাহার সাহিত্যে উক্ত ধর্ম্মপ্রসঙ্গের জন্য কণিকামাত্র স্থানও ছাড়িয়া দিতে কুণ্ঠিত হইল।

কিন্তু উহার গুপ্ত অস্তিত্ব, ধর্ম্মপূজা।

এই বঙ্গদেশে এক সময় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রবল পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিতেছিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে হিউ-এনসাঙ্ মুঙ্গের এবং সমুদ্রের অন্তর্বর্ত্তী প্রদেশ সমূহে ১১৫০০ বৌদ্ধ পুরোহিত দেখিয়া গিয়াছিলেন। উক্ত সংখ্যক পুরোহিতের অন্যূন এক কোটী শিষ্য থাকিবার কথা। এই অসংখ্য লোকবর্গের অবলম্বিত ধর্ম্ম চিহ্নমাত্র না রাখিয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। পালরাজগণের সময়েও বৌদ্ধধর্ম্ম বঙ্গদেশে প্রবল ছিল। মগধের রাজধানী ওদন্ত-পুরীতে মুসলমানগণ বহুসংখ্যক বৌদ্ধভিক্ষুর প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন, উহা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঘটিয়াছিল। এই সময়ের পরেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিলয়োন্মুখ নিদর্শন বঙ্গদেশ হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ১৬০৮ খৃঃ অব্দে তিব্বত দেশীয় পণ্ডিত বুদ্ধগুপ্তনাথ এতদ্দেশে উক্ত ধর্ম্মের কথঞ্চিৎ প্রাদুর্ভাব দেখিয়াছিলেন। মগধের জনৈক কায়স্থ ১৪৪৬ খৃঃ অব্দে একখানি বৌদ্ধপুঁথি নকল করিয়াছিলেন; উহা কেম্ব্রিজ নগরে রক্ষিত আছে। এইরূপ অনেক-গুলি বৌদ্ধ-ধর্ম্মসংক্রান্ত পুঁথি বঙ্গদেশীয় লেখকগণ ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে লিখিয়াছিলেন, সেগুলি নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে। চূড়ামণি দাস, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব লেখকগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজের ন্যায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন-উপলক্ষে প্রসঙ্গক্রমে বৌদ্ধগণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্যের সময়ে সপ্তগ্রামনিবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ সুবর্ণ বণিক বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে এই আপত্তি উত্থাপন করেন যে, যখন সমস্ত জগৎ দুঃখসাগরে মগ্ন,

তখন তিনি নিজে উদ্ধার কামনা করিতে পারেন না। একথা বৌদ্ধদিগের। প্রচলিত 'কৃত্তিবাসী' রামায়ণে বৌদ্ধপ্রভাবের পরিচয় আছে। *

কিন্তু ভগ্ন 'স্তূপ'রাশি, গলিত পুঁথি-পত্র এবং জয়দেবের স্তোত্র ব্যতীত কি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধর্ম্মের এদেশে আর কোন পরিচয় নাই? চট্টগ্রামের সুদূর প্রান্তে এখনও সে ধর্ম্ম কথঞ্চিৎ জীবন রক্ষা করিতেছে, সমগ্র বঙ্গদেশ হইতে কি সত্য সত্যই তাহা তিরোহিত হইয়াছে? মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অল্পদিন হইল এক নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন; তিনি স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের বহু সংখ্যক ডোম, পোদ ও হাড়ি প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে যে 'ধর্ম্মপূজা' প্রচলিত আছে, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃতি এবং এক প্রকার রূপান্তর। এই ধর্ম্মের পুরোহিতগণও নিম্নশ্রেণীর। ধর্ম্মের মন্ত্রের এক চরণ এইরূপ "ভক্তানাং কামপূরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্ত্তিং"—এই 'শূন্য মূর্ত্তি' শব্দ হিন্দুদেবদেবীর প্রতি প্রযোজ্য নহে, উহা বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত 'শূন্য' এবং 'মহাশূন্য' শব্দের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বঙ্গের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে 'ধর্ম্মপূজার' প্রধান পাণ্ডা রামাই ডোম পণ্ডিত-জাতীয় ছিলেন; ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে দৃষ্ট হয়, রামাই পণ্ডিত মহারাজ ধর্ম্মপালের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। রামাইপণ্ডিতকৃত ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি পাওয়া গিয়াছে; ইহা 'শূন্যপুরাণ' নামে পরিচিত। তন্মধ্যে অনেক কথায়ই বৌদ্ধধর্ম্মের পরিষ্কার আভাস আছে, যথা:—"ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে" (নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহশ্রুতিজাতং); "শ্রীধর্ম্মদেবতা সিংহলে বহুত সম্মান।" এতদ্ব্যতীত রামাই পণ্ডিতোক্ত শূন্যবাদও বৌদ্ধধর্ম্মেরই কথা। পরবর্ত্তী

* রঘুরাজা এক ব্যাপারোপলক্ষে "ব্রাহ্মণেরে দিলেন যতেক ধন॥ অদ্য ভক্ষ্য রঘুরাজা নাহি রাখে ঘরে। মৃত্তিকার পাত্রে রাজা জল পান করে॥"—এই ভাবের দানশীলতা, আমাদিগকে মহারাজ কনিষ্ক প্রভৃতি বৌদ্ধ রাজন্যগণের "ভিক্ষু" হওয়ার প্রসঙ্গ মনে করাইয়া দেয়। বাল্মীকির রামায়ণে এ সকল কথা নাই।

কতকগুলি ধর্ম্মমঙ্গলে মাননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি কয়েকজন বৌদ্ধ মহান্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মপূজাপদ্ধতিতে সৃষ্টি-রহস্যে নাগের বিষয় বিশেষরূপে উল্লিখিত আছে, ইহাও শেষ সময়ের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থগুলিতে অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মপূজার মন্দিরেও বৌদ্ধধর্ম্মের নানারূপ লক্ষণ এখনও বিকৃত ভাবে বর্ত্তমান আছে! ধর্ম্মমন্দিরগুলিতে শীতলা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রায়শঃই দেখা যায়, ইহা বৌদ্ধমন্দিরের হারিতী দেবীর কথা স্পষ্টই উদ্রেক করে; বৌদ্ধপূজার এক উপকরণ চূণ, ইহা কখনও হিন্দু দেবদেবীর ভোগ্য নহে; ধর্ম্ম-পূজায়ও এই চূণ উপহার প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থগুলিতে আমরা ক্রমশঃ বৌদ্ধপ্রভাবের বিলয় এবং চণ্ডীর মাহাত্ম্যের কীর্ত্তন দেখিতে পাই, সুতরাং সেই সকল পুস্তক আমরা এই অধ্যায়ের অন্তর্বর্ত্তী করিতে পারিলাম না। ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধশাস্ত্রীয় হইলেও উহার পূজকসম্প্রদায় ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে এবং আপনা-দিগকে বৌদ্ধ বলিয়া অবগত নহে ও উক্ত নামে অভিহিত হইতে স্বীকৃত হইবে না। পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গলগুলি ব্রাহ্মণগণ রচনা করিয়াছেন, সুতরাং তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাব প্রদর্শন চেষ্টা কিছু বিচিত্র হয় নাই। এস্থলে বলা উচিত যে, বৌদ্ধধর্ম্মের নানা কথাই অলক্ষিত ভাবে হিন্দু শাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, ইহা অনিবার্য্য। বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদ শুধু রামাই পণ্ডিতের পুঁথিতে নহে, অপরাপর বাঙ্গালা পুঁথিতেও দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় একখানি প্রাচীন বিদ্যাসুন্দরের হস্তলিখিত পুঁথি হইতেও সম্প্রতি ঐরূপ শূন্য-বাদের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বোক্ত পরিচয় ছাড়া আরও কিছু নিদর্শন আছে, সেগুলি আমরা একেবারে উপেক্ষা করিতে পারি না। সম্ভবতঃ হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব বিস্তারের পূর্ব্বেই বঙ্গভাষায় কতকগুলি নীতিসূত্র ও স্তুতি-গীতি রচিত হইয়াছিল।

চৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত আছে—"যোগীপাল গোপীপাল মহীপাল গীত। ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত।" কোন রাজার তিরোধানের অব্যবহিত পরেই তদুদ্দেশ্যে লৌকিক স্তুতিব্যঞ্জক গীতি রচিত হওয়া স্বাভাবিক। উক্ত রাজন্যবর্গ মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে এতদ্দেশে রাজত্ব করিতেছিলেন,—এবং খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী ও তাহার পূর্ব্ব সময় হইতে যে প্রাগুক্ত প্রশংসা-গীতি সকল বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।*

বৌদ্ধযুগের অপরাপর নিদর্শন।

(১) শূন্য পুরাণ।

এই পুস্তকের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা রামাই পণ্ডিত-বিরচিত। সংপ্রতি সাহিত্যপরিষদ্ পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়াছেন। বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই পুস্তক সম্পাদন করিয়াছেন। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ময়নাপুর গ্রামে যাত্রাসিদ্ধি রায় নামক যে ধর্ম্মঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন রামই পণ্ডিতের বংশধরগণ এখনও সেই দেব-মন্দিরের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট হইতে রামাই পণ্ডিতের পরিচয় সম্বলিত একটী কবিতা পাওয়া গিয়াছে। রামাই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহাই প্রতিপাদন করা প্রধানতঃ এই কবিতার উদ্দেশ্য। যদিও শূন্য পুরাণে অনেক স্থলে রামাই পণ্ডিতের ভণিতায় দ্বিজ শব্দ উল্লিখিত দৃষ্ট হয় এবং যদিও সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু এই পরিচয়ে আস্থাবান্ হইয়াছেন, তথাপি আমাদের নিকট উক্ত বিবরণটী নিতান্তই অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। এই বিবরণের মধ্যে মধ্যে এরূপ

* মদনপালের তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে যে, দ্বিতীয় মহীপালের কীর্ত্তিগাথা সর্ব্বত্র গীত হইত। 'ধান ভানতে মহীপালের গান'—এই প্রবাদ বাক্যও অনুশাসনোক্ত কথার সমর্থন করিতেছে।

অনেক কথা আছে যাহাতে লেখক তাঁহার প্রতিপাদ্যবিষয়টীকে স্বয়ংই সন্দেহার্হ করিয়াছেন। ধর্ম্মঠাকুর অতি সামান্য অপরাধে রামাইকে এই শাপ প্রদান করিলেন যে, তাঁহার জল সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিরা স্পর্শ করিবেন না। রামাই পণ্ডিত তাঁহার পুত্র ধর্ম্মদাসকে সেই ভাবে আর একটী অভিশাপ দিলেন যে, তাঁহার বংশধরগণ ডোমপণ্ডিত হইবে। কবিতালেখক নিজেই স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেছেন,—

"ডোমেতে পণ্ডিতে প্রভেদ আছয়ে নিশ্চয়।"

কিন্তু নিশ্চয়ই যে প্রভেদ আছে, এ সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিগ্ধ; এ সম্বন্ধে লেখকের আগ্রহাতিশয়ই তাঁহার যুক্তিগুলিকে হতবল করিতেছে।

যাহা হৌক, রামাই পণ্ডিত মহারাজ দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিকৃতরূপ—ধর্ম্মপূজার যে একজন প্রধান পাণ্ডা ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই শূন্য পুরাণে এবং ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যসমূহে ইহাকেই ধর্ম্মপূজার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পুরোহিতরূপে বর্ণিত হইতে দেখা যায়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিযুগে ধর্ম্মপূজার চারিটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাণ্ডা বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। সত্যযুগে শেতাই পণ্ডিত, গতি সংখ্যা ৪০০; দ্বাপরে কংসাই পণ্ডিত, গতি সংখ্যা ১২০০; এবং কলিযুগে রামাই পণ্ডিত, গতি সংখ্যা ১৬০০। রামাই পণ্ডিত হাকন্দ নামক স্থানে মোক্ষলাভ করেন; উহা চাঁপাতলা ও ময়নাপুরের মধ্যে অবস্থিত। ব্রাহ্মণাদি জাতির পক্ষে উপবীত ধারণ যেরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য, ধর্ম্মঠাকুরের পূজক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাম্রধারণও তদ্রূপ। রামাই পণ্ডিতের বংশধরগণ এই তাম্রদীক্ষার প্রধান পুরোহিত। তাঁহারা ছত্রিশ জাতিকে তাম্রদীক্ষা প্রদানের অধিকারী। রামাই পণ্ডিত ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মদাসের চারিপুত্র—মাধব,

সনাতন, শ্রীধর ও সুলোচন। ইঁহাদের বংশধরগণ নানাস্থানে বিদ্যমান আছেন; এবং তাঁহাদের ধর্ম্মসেবক সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিপত্তি।

শূন্য পুরাণে একান্নটী অধ্যায় আছে; তন্মধ্যে পাঁচটী সৃষ্টি-পত্তন সম্বন্ধে। এই সৃষ্টি-পত্তন সম্বন্ধে রামাই পণ্ডিতের মত অনেকটা মহাযান সম্প্রদায়ী বৌদ্ধগণের পথাবলম্বী। তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জলপাবন, টাকা পাবন, অধিবাস, ধূনা-জ্বালা, সন্ধ্যাপাবন, ঢেঁকিমঙ্গলা, গাম্ভারীমঙ্গলা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে এই পদ্ধতি পরিপূর্ণ। যদিও রামাই পণ্ডিতের রচনার উপরে পরবর্ত্তী অনেক লেখক কারুকার্য্য করিতে ছাড়েন নাই, তথাপি স্থানে স্থানে যে আদি-কবির রচনা অবিকৃত আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"জত দূর ধর্ম্মর ওঁকার জান।
গারস্তের মহাপাপ তুরত পলান।"

কিংবা,

"হে মধুসূদন বায় ভাই বার আদিত্ত হাথ পাতি লেহ সেবকর অর্ঘপুষ্পপানি সেবক হব সুখি ধামাৎ কন্নি গুরুপণ্ডিত দেউলা দান পতি মাংস্যর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন তুআরি তুআরপাল ভাণ্ডারি ভাণ্ডার পাল রাজদূত কোমি কোটাল পাব স্বগ মুকতি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার।"

প্রভৃতি রচনা অতি প্রাচীন; এবং খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের দ্বিধা হয় না। এইরূপ বহু স্থান আছে। স্বয়ং নগেন্দ্রবাবু দুর্ব্বোধ বলিয়া সেই সকল রচনার অর্থ ব্যাখ্যা করার অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের ত্রিরত্ন—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ। কালক্রমে হিন্দুস্থানে বৌদ্ধ শব্দ অর্থদুষ্ট হইয়া পড়ে। বৌদ্ধ এবং নাস্তিক এই দেশে একার্থ-বাচক হইয়াছিল। এই জন্যই কিংবা অন্য কোন কারণে এ দেশের বৌদ্ধ-সম্প্রদায় আপনাদিগকে ত্রিরত্নের দ্বিতীয় অর্থাৎ ধর্ম্ম শব্দের রূপান্তর দ্বারা পরিচিত করিতেন। তাঁহারা আপনাদিগকে সৎধর্ম্মী বলিতেন।

বুদ্ধ শব্দের পরিবর্ত্তে তাঁহারা ধর্ম্ম শব্দের দ্বারা আপনাদের উপাস্য দেবতাকে অভিহিত করিতেন। প্রাচীন উপনিষদের ব্রহ্মের সঙ্গে আধুনিক কালের পৌরাণিক দেবদেবীর যে সম্বন্ধ, জগৎপূজ্য বুদ্ধদেবের সঙ্গে এই কল্পিত ধর্ম্মঠাকুরের সম্বন্ধ তাহা হইতে অধিক নহে। তথাপি যেরূপ হিন্দুধর্ম্ম বলিতে বেদ ও উপনিষদের ধর্ম্ম এবং পৌরাণিক ধর্ম্ম সমস্তই বুঝায়, তদ্রূপ সৎধর্ম্ম বা বৌদ্ধ ধর্ম্ম বলিতে অশোকের সময়ের বিশুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর ধর্ম্মপূজা—ইহা সমস্তই বুঝাইতেছে। ত্রিরত্নের তৃতীয়—সঙ্ঘ শঙ্খ নামে বিকৃত হইয়া ধর্ম্মপূজায় স্থান পাইয়াছে। শূন্য পুরাণের ৮৩ পৃষ্ঠায় এই "সংখ" সম্বন্ধে বিস্তৃত পূজাপদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শূন্য-পুরাণে পুপ্প (পুষ্প), পসন্ন (প্রসন্ন), ছীফল (শ্রীফল), বজ্জ (বজ্র) প্রভৃতি প্রাকৃত ভাবাপন্ন শব্দের অবধি নাই। যাঁহারা এই পুস্তক যত্নের সহিত পাঠ করিবেন, তাঁহারা আমাদের প্রাচীন সমাজ ও ভাষার বিচিত্র প্রকারের নিদর্শন প্রাপ্ত হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। "নিরঞ্জনের রুষ্মা" শীর্ষক অধ্যায়টী পরবর্ত্তী যোজনা। শূন্য পুরাণের প্রাপ্ত তিনখানি পুঁথির মধ্যে মাত্র একখানিতে উহা পাওয়া গিয়াছে। উহা এরূপ অদ্ভুত যে, আমরা উহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা।

জাজপুর পুরবাদি সোলসঅ ঘর বেদি
বেদি লয় কল্লয় যুন।
দখিন্যা মাগিতে জাঅ জার ঘরে নাহি পাঅ
সাঁপ দিআ পুড়ায় ভুবন॥১

মালদহে লাগে কর দিলঅ কম্ম যুন।
দখিন্যা মাগিাত জাঅ জার ঘরে নাঞি পায়
সাঁপ দিয়া পুড়াএ ভুবন॥২

মালদহে মাগে কর না চিনে আপন পর
জালের নাঞ্রিক দিসপাস।
বলিষ্ট হইল বড় দসবিস হয়্যা জড়
সদ্ধর্ম্মিরে করএ বিনাস ॥৩

বেদ করে উচ্চারন বেরয়্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিআ সবাই কম্পমান।
মনেতে পাইয়া মর্ম্ম সভে বোলে রাখ ধর্ম্ম
তোমা বিনা কে করে পরিত্তান ॥৪

এইরূপে দ্বিজগন করে সৃষ্টি সংহারন
ই বড় হোইল অবিচার।
বৈকণ্ঠে ডাকিয়া ধর্ম্ম মনেতে পাইআ মর্ম্ম
মায়াতে হোইল অন্ধকার ॥৫

ধর্ম্ম হৈল্যা জবনরূপি মাথা এত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিরূচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম ॥৬

নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেত বলেত দম্বদার।
যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দেত পরিল ইজার ॥৭

ব্রহ্মা হৈল মহাম্মদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল সুলপানি।
গনেশ হইআ গাজী কার্ত্তিক হৈল কাজি
ফকির হইল্যা জত মুনি ॥৮

তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা সেক
পুরন্দর হইল মলনা।
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে
সভে মিলি বাজায় বাজনা ॥৯

আপুনি চণ্ডিকা দেবি তিহুঁ হৈল্যা হায়াবিবি
পদ্মাবতী হল্যা বিবি নূর।
জতেক দেবতাগণ হয়্যা সভে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥১০

দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা কিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায় রামাঞিপণ্ডিত গায়
ই বড় বিসম গণ্ডগোল ॥১১

কোন্ ঐতিহাসিক মুসলমান উপদ্রবকে লক্ষ্য করিয়া এই কবিতা রচিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না; কিন্তু ব্রাহ্মণগণকৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ মনে করিয়া সদ্ধর্ম্মীরা (বৌদ্ধগণ) যে হিন্দু দেবমন্দির প্রভৃতির উপর উৎপাত দর্শনে হৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে।

(২) কানুভট্টরচিত চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়।

নেপাল হইতে সংপ্রতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিয়াছেন। কানুভট্ট বৌদ্ধাচার্য্য-গণের অগ্রণী ছিলেন। তদ্বিরচিত অনেক সংস্কৃত পুস্তক নেপালে এখনও প্রচলিত আছে; এবং তদ্বিবরণী কেম্ব্রিজ য়ুনুভার্সিটীর জার্ণ্যালে মুদ্রিত হইয়াছে। কানুভট্ট দশম শতাব্দীর শেষভাগে এবং একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন। এই অধ্যায়শীর্ষে যে পুস্তকের নাম উল্লিখিত হইল, তাহাতে কানুভট্টের রচিত অনেকগুলি বাঙ্গালা পদ পাওয়া গিয়াছে। কানুভট্ট স্বয়ং বাঙ্গালী ছিলেন। যে ভাষায় তিনি পদ রচনা করিয়াছেন তাহা অতিপ্রাচীন বাঙ্গালার নমুনা। এই সমস্ত কবিতা প্রেমসম্বন্ধীয়। ইহাতে বামাচারী বৌদ্ধগণের নারীপূজার ভাব

বিদ্যমান আছে। বর্ত্তমানকালে সহজিয়া বলিয়া যে মত বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত আছে, এবং চণ্ডীদাসকে যে মতের প্রবর্ত্তক বলিয়া আমরা জানিতাম, তাহা এখন বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের উদ্ভাবিত বলিয়া জানা যাইতেছে। বৈষ্ণবীগণ মস্তক মুণ্ডন করে না; সুতরাং 'নেড়ানেড়ি' বলিয়া যে কথা প্রচলিত আছে, তাহা বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীদিগের প্রতি প্রথম প্রযুক্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের প্রভাব দূর হইলেও তাঁহাদের অবলম্বিত এই মতটী বৈষ্ণব সমাজের অধস্তনস্তর গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু মহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্শ্বদগণ জানিতেন, এই নারী-সাধনা দ্বারা এরূপ ব্যভিচারের উৎপত্তি হইতে পারে, যাহাতে বৈষ্ণব সমাজ একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। এই জন্যই তাঁহারা রমণী-সংসর্গ সর্ব্বদা নিন্দিত বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাস রজকিনীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গুপ্তসাধন তন্ত্রে যে সকল জাতীয় স্ত্রীলোকদিগকে তান্ত্রিক কার্য্যের বিশেষরূপ উপযোগিনী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, তন্মধ্যে রজকিনী অন্যতম। সুতরাং এই প্রেম সাধনার পথ বলিয়াই তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' ছাড়া এই ভাবের আর একখানি অসম্পূর্ণ পুঁথি নেপাল হইতে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাহার নাম 'বোধিচর্য্যাবতার।'

(৩) মাণিকচাঁদের গান।

বিজ্ঞবর গ্রীয়ারসন্ সাহেব এসিয়াটিক্ সোসাইটির জারণ্যালে* মাণিকচাঁদের গীতিশীর্ষক একটি কাব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সেই প্রবন্ধে অনুমান করিয়াছিলেন, মাণিকচাঁদ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন; এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে আমরা যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলাম যে,

সময়-নিরূপণ

* Journal, Asiatic Society of Bengal, 1878, Part I, No. 3, Page 181.

মাণিকচাঁদ দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেছিলেন। অপরাপর প্রমাণের মধ্যে বিশেষ এই যে, মাণিকচন্দ্র রাজার গীতে কড়ি দ্বারা রাজকর আদায়ের কথা লিখিত আছে। এইরূপ কড়ি দ্বারা রাজকর আদায়ের প্রথা হিন্দুশাসনকালে প্রচলিত ছিল। এই পুস্তক পাঠ করিয়া মান্যবর গ্রীয়ারসন্ সাহেব আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন * যে, এখন তিনি মাণিকচন্দ্র রাজার গান মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। সুখের বিষয়, শুধু অনুমানের উপর নির্ভর না করিয়া এ সম্বন্ধে আমরা এবার নিশ্চিতরূপ প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারিব। মাণিকচন্দ্র রাজার পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের গীতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে পরে লিখিত হইবে। তিরুমলয়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠে জানা যায়, মহারাজ রাজেন্দ্র চোল বাঙ্গালা দেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজয় করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র চোল ১০৬৩ হইতে ১১১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন; গোবিন্দচন্দ্র তাহার সমসাময়িক এবং মাণিকচন্দ্র তৎপূর্ব্বে রাজত্ব করেন। মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তৎসম্বন্ধীয় গীতি রচিত হইবার কথা। অবশ্য এ কথা বলা সঙ্গত নহে যে, মাণিকচন্দ্রের বর্ত্তমান গানটি কিম্বা পরবর্ত্তী গোবিন্দচন্দ্র সম্বন্ধীয় গীতির আদ্যন্ত খৃষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। দুর্ল্লভমল্লিককৃত গোবিন্দচন্দ্রের গানটি স্পষ্টতই একটি প্রাচীন গীতি ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া রচনা করা হইয়াছে,—উহার ভাবগুলি শুধু বজায় আছে, ভাষা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মাণিকচন্দ্র

---

* ১৮৯৮ সনের ২৪শে জুলাইর পত্রে মান্যবর গ্রীয়ারসন্ সাহেব লিখিয়াছেন :—

"I think that in my former letter I have omitted to thank you for the corrections which you have made to my edition of the *Manik Chandra Rajar Gan*, which appeared in 1878. I now quite agree with you that its origin must be referred to Buddhist influence."

রাজার গানটি প্রাচীন বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু উহারও যে অনেক স্থলে প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিয়া গানটি কতক পরিমাণে আধুনিক করিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই গীতে শিব, যম প্রভৃতি দেববৃন্দ হইতে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের পর্য্যন্ত নাম পাওয়া যাইতেছে। গ্রীয়ারসন সাহেব বলেন, ইহার মধ্যে অনেক নাম, ঘটনা, ও যাবনিক শব্দ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি অপেক্ষাকৃত পয়ারের নিয়মে নিয়মিত ও সহজ বাঙ্গালায় রচিত দেখা যায়; গীতির প্রারম্ভ বৈষ্ণব-কবির লেখনী-চিহ্নিত, তাহা গোপন করা যায় না*।

"ভাবিও রামের নাম চিন্তিও একমনে।
লইলে রামের নাম কি করিবে যমে॥
অধমে না লৈল নাম জিভের আলিসে।
অমৃতের ভাণ্ড তনু গরাসিল বিষে॥
হেঁটে যাইতে যে জন রামের নাম লয়।
ধনুক বাণ লৈয়ে রাম ভকত সঙ্গে যায়॥
রামনামের নৌকা খান শ্রীগুরুকাণ্ডারী।
দুই বাহু পসারিয়া ডাকে আস পার করি॥"

এই রচনার পরেই,—

"থুইয়া রামের গুণ সিদ্ধার গুণ গাই।
যাকে বন্দিলেই সিদ্ধি পাই॥
মাণিকচাঁদ রাজা বঙ্গে বড় সতি।
হাল খানায় মাসড়া সাধে দেড় বুড়ি কড়ি॥
দেড় বুড়ি কড়ি লোকে খাজনা যোগায়।
তার বদলী ছয় মাস পাল খায়॥
এত মাণিকচন্দ্র রাজা সরুয়া নলের বেড়া।
একতন যেকতন করি যে খাইছে তার দুয়ারত ঘোড়া।
বিনে বান্দি নাহি পিন্দে পটের পাছড়া।"

সুতরাং প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি প্রাচীন জটিল রচনার কাণ্ড কি শাখায়

* উদ্ধৃত অংশগুলিতে যে সব কঠিন ও অপ্রচলিত শব্দ পাওয়া যাইবে, তাহার অ[র্থ] পরে দেওয়া গেল। পাঠক তাহার সাহায্যে উহা বুঝিতে পারিবেন।

বটবৃক্ষ-সংলগ্ন ভিন্ন উদ্ভিদের ন্যায় জড়িত হইয়া আছে। তাহারা যে স্বতন্ত্র বস্তু, সে বিষয়ে দৃষ্টিমাত্রই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এই গীতির ভাব বৌদ্ধ জগতের। অনেক স্থলেই বৌদ্ধগণের উপাস্য ধর্ম্মের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ময়নামতী "ধরম শরণ করিয়া" গঙ্গাতীরে "ধর্ম্মের থান" (ধর্ম্মের স্থান) প্রস্তুত করিতেছেন। (৩২ শ্লোক)। রায়তদিগকে শিবঠাকুর "জীউ জীউ রায়ত ধর্ম্ম দিউক বর" (২৩ শ্লোক) বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। আধুনিক হিন্দুগণের পূর্ব্বপুরুষগণই অনেকে বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস ও ধর্ম্মভেদ হেতু তাঁহারা আমাদিগের সহানুভূতি ও ধর্ম্মসংস্কার হইতে, চীন ও জাপানবাসী-দিগের ন্যায় সম্পূর্ণ দূরবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছেন। তাই মাণিকচাঁদের গান সলিলে সলিল-বিন্দুর ন্যায় প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া এক হইয়া যায় নাই, সলিলে তৈলবিন্দুর ন্যায় স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়া আছে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য খুঁজিলেই পক্ক-বিম্ব, দাড়িম্ব, কদম্ব, পদ্ম-পলাশ, খগরাজ, তিলফুল প্রভৃতি উপমার বস্তু দেখিতে পাই। গ্রাম্যগীতগুলিও এই উপমা হইতে মুক্ত নহে, রূপবর্ণনার সহিত ইহারা প্রাচীন সাহিত্যে অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত। এস্থলে সত্যের অনুরোধে বলা উচিত, সর্ব্বত্রই এই যোগ মণিকাঞ্চনযোগের ন্যায় উৎকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু মাণিক-চাঁদের গীতের রূপবর্ণনায় বৃদ্ধ ব্যাস, বাল্মীকি কি কবি কালিদাসের কোন হাত নাই। সেগুলি সংস্কৃতের প্রভাবশূন্য; এবং সংস্কৃতের প্রভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রীর দশনপংক্তি অতি শুভ্র, গোপীচাঁদ সোলার সঙ্গে তাহার উপমা দিতেছেন, সংস্কৃতের অজ্ঞতা হেতু দাড়িম্ববীজ কি মুক্তাপংক্তির কথা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। স্থলে স্থলে দু'এককথায় ছবিটি সুন্দর আঁকা হইয়াছে, রূপের একখানি প্রতি-বিম্ব ভাসিয়া উঠিয়াছে, অথচ দাড়িম্ব-কদম্বাত্মক রূপবর্ণনা হইতে তাহা

মাণিকচাঁদের গানে বৌদ্ধ প্রভাব।

সম্পূর্ণ ভিন্ন। হীরার দাসী রাজপুত্রকে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া হীরাকে জানাইল ;—

"যেমন রূপ আছে রাজার চরণের উপর।
তেমন রূপ নাই তোমার মুখের উপর ।।"

স্ত্রীর বাক্যে পুত্র স্নেহময়ী মাতাকে উত্তপ্ত ৮০ মণ তৈলপূর্ণ সুবৃহৎ লৌহকটাহে নিক্ষেপ করিতেছেন এবং নয় দিন ধরিয়া অগ্নিকুণ্ডের উপর মাতৃদেহবিশিষ্ট উক্ত কটাহ সংস্থাপিত রাখিতেছেন। যে হিন্দুর গৃহে গৃহে রামায়ণী ও মহাভারতীয় নীতি, সেই হিন্দুর চক্ষে এই ঘটনা বিজাতীয়,—ইহা হিন্দুজগতের বলিয়া বোধ হয় না।

রাণী ময়নামতীর ভয়ে কৈলাসে শিব কম্পিত, যমপুরে যম লুক্কায়িত। ময়নামতী দেব বৃন্দকে দারুণ লাঞ্ছনা করিতেছেন, গোদা যম ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতেছে,—এসকল কথায় কেমন একটা বিজাতীয় ঘ্রাণ আছে; উহা হিন্দুর ঘরের কথার মত বোধ হয় না। ইতিহাসে পাওয়া যায় প্রসিদ্ধ অতীশ* (দীপঙ্কর) একাদশ শতাব্দীতে তন্ত্র মন্ত্রাদির চর্চ্চায় নিযুক্ত ছিলেন,—বৌদ্ধগণ শেষ সময়ে তান্ত্রিক অনুষ্ঠান অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই তন্ত্র-মন্ত্রের প্রভাব মাণিকচাঁদের ও গোবিন্দচন্দ্রের গানে বিশেষ দৃষ্ট হইবে। হাড়িসিদ্ধা ইন্দ্রকে ডাকিয়া পথ প্রস্তুত করিতেছেন, অপ্সরাদিগকে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে আদেশ দিতেছেন, অথচ তিনি জাতিতে চণ্ডাল। বস্তুতঃ এই গীতে নানারূপ ভীষণ, অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ঘটনার বর্ণনা আছে, তাহা আমরা আরব্যোপন্যাসের গল্পের ন্যায় পাঠ করিয়াছি। অনুবাদ-গ্রন্থগুলি ছাড়িয়া দিলেও কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতে ভারতের

---

* "In 1042. The famous Atish, native of Bengal, came to Tibbet. He wrote a great number of works which may be found in the Bstanhgyur and translated many others relating principally to Tantrik theories and practices."

Rockhill's *Life of Buddha*, P. 227.

অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা কোন্ গ্রন্থে অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা নাই? সেই সব ঘটনা হইতে মাণিকচাঁদের গীতে বর্ণিত ঘটনা ভিন্নরূপ। সেগুলির পশ্চাতে দেবশক্তি, তাই সেগুলি হিন্দুর নিজস্ব বলিয়া পরিচিত, আর ইহার পশ্চাতে শুধু মন্ত্রশক্তি। গ্রীয়ার্‌সন্ সাহেবের মতে হাড়ি সিদ্ধার ইষ্টদেবতা গোরকনাথও জনৈক নেপালী বৌদ্ধ-সাধু। বৌদ্ধ জগতের এই সংগীত বোধ হয় এতদিনে লুপ্ত হইয়া যাইত, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত অংশ-গুলিতে দেবদেবীর কথা সংযোজিত হওয়াতে ঐ গীতি ঈষৎ পরিমাণে হিন্দুত্বের আভা ধারণ করিয়াছে, এবং সেই হিন্দুত্বের আভাটুকুই বোধ হয় এই গানের পরমায়ু বৃদ্ধির কারণ।

এই গীতে বাঙ্গালীহৃদয়ের একটি কথা আছে, শুধু সেই স্থানে আমরা জাতীয় ভাবের তত্ত্ব খুঁজিয়া পাই।

কবিত্বের নমুনা।

বাঙ্গালী কবির রচনায় আত্মনির্ভরের ভাব ও বিক্রমপ্রকাশ কোন কালেই বেশী প্রশংসনীয় হয় নাই। যেখানে বাঙ্গালী কবি বীরত্ব বর্ণনা করিতে গিয়াছেন, সেখানে বাঙ্গালার ব্যঙ্গ-কবি ভারতউদ্ধার কাব্যের ন্যায় তীক্ষ্ণ শ্লেষ দ্বারা বঙ্গবীরের যুদ্ধাস্ত্রগুলিকে একটি পটকার ধূম্রে পর্য্যবসিত করিবার সুবিধা পাইয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালী যে প্রেমিক, প্রত্যেক কাব্যেই তাহার আভাস আছে। গোপীচাঁদ সন্ন্যাসী হইতে উদ্যত, তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে নিষেধ করিতেছেন, ভাষা জটিল ও গ্রাম্য হইলেও, সেইস্থলে একটুকু স্বাভাবিকত্ব আছে। গ্রীয়ার্‌সন্ সাহেব সেই স্থলের কবিত্বের প্রশংসা করিয়াছেন।

"না যাইও না যাইও রাজা দূর দেশান্তর।
কারে লাগিয়া বান্দিলাম সীতল মন্দীর ঘর॥
বান্দিলাম বাঙ্গলা ঘর নাই পাড় কালী।
এমন বয়সে ছাড়ি যাও আমার বৃথা গাবুরাণী॥
নিন্দের স্বপনে রাজা হব দরিসন।
পালঙ্গে ফেলাইব হস্তনাই প্রাণের ধন॥

দস গিরির মাও বইন রবে স্বামি লইবে কোলে।
আমি নারী রোদন করিব খালী ঘর মন্দিরে॥
খালীঘর জোড়া টাটি মারে লাঠির ঘা।
বয়স কালে যুবতী রাড়ী নিতে কলঙ্ক রাও।
আমাক সঙ্গে করি লইয়া যাও॥
জীয়ব জীবন ধন আমি কন্যা সঙ্গে গেলে;
রাঁধিয়া দিমু অন্ন ক্ষুধার কালে॥
পিপাসার কালে দিমু পানী।
হাসিয়া খেলিয়া পোহামু রজনী
আইল পাতার দেখিলে কথা কহিয়া যামু॥
গিরি লোকের বাড়ী গেলে গুরু স্বাম বলিমু।
সিতল পাটি বিছাইয়া দিমু বালীসে হেলান পাও।
হাউস রঙ্গে যাতিমু হস্ত পাও॥
হাত খানি দুঃখ হইলে পাও খানি যাতিমু।
এ রঙ্গর কৌতুকর বেলা সুতি ভুঞ্জিমু এসুতি ভুঞ্জাইমু॥
গ্রীসকালে বদনত দিমু দণ্ডপাখার বাও।
মাঘ মাসি সিতে ঘেসিয়া রমু গাও॥"

গোপীচাঁদ বনের বাঘের ভয় দেখাইতেছেন, স্ত্রী উত্তরে বলিতেছে,

"কে কয় এগুলা কথা কে আর পইতায়।
পুরুসর সঙ্গে গেলে কি স্ত্রাক বাঘে ধরে খায়।
ওগুলা কথা ঝুটমুট পালাবার উপায়॥
খায় না কেনে বনের বাঘ তাক নাই ডর।
নিত কলঙ্কে মরণ হউক স্বামির পদতল॥
তুমি হবু বট বৃক্ষ আমি তোমার লতা।
রাঙ্গা চরণ বেড়িয়া লমু পালাইয়া যাবু কোথা॥
যখন আছিনু আমি মা বাপের ঘরে।
তখন কেন ধর্ম্মি রাজা না গেলেন সন্ন্যাসি হইয়ে॥
এখন হইনু রূপর নারী তোরে যোগ্যমান।
মোক ছাড়িয়া হবু সন্ন্যাস মুই তেজিম পরাণ।"

(৪) গোবিন্দচন্দ্র রাজার গান।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গোবিন্দচন্দ্রের গানটি দুর্ল্লভমল্লিক নামক জনৈক গ্রাম্য কবির রচিত, রচনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহা যে প্রাচীন একটি গানের শুদ্ধ সংস্করণ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। এই গীতি হইতে কয়েকটি ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারা যায়। দুইটি ছত্র এইরূপ পাওয়া গিয়াছে;—"সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা ধাড়িচন্দ্র পিতা। তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা॥"—এই মাণিকচন্দ্রের স্ত্রীর নাম ময়নামতী ও পুত্রের নাম গোবিন্দচন্দ্র এবং ইঁহাদের রাজধানী পাটীকা নগর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্য যোল দণ্ডের পথ পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, ইহা হইতে তাঁহার রাজবৈভবের ইয়ত্তা করা যাইতে পারে. সেকালে কয়েক গ্রাম অন্তরই এক একটি রাজ-চক্রবর্ত্তী মিলিত। দুর্ল্লভমল্লিক-কৃত এই গানটি যদিও নবভাবে সংস্কৃত হইয়াছে, তথাপি ইহার আদ্যন্ত বৌদ্ধ-ভাবচিহ্নিত, সুতরাং ভাষা ভিন্ন ইহাতে আর কিছু পরিবর্ত্তিত হয় নাই, স্বীকার করিতে হইবে।

এই গীতে বৌদ্ধ-প্রভাব।

প্রথমেই 'ধর্ম্ম' বন্দনা করিয়া গীতিটির সূচনা করা হইয়াছে, তৎ-পরেই হাড়িপা, কালুপা প্রভৃতি "জ্ঞানীবৃন্দের" বন্দনা করা হইয়াছে। ইহারা ডোম জাতীয় বৌদ্ধাচার্য্য। এতদ্ব্যতীত গোরক্ষনাথ, মীননাথ, শিশুপা প্রভৃতি বৌদ্ধ-পুরোহিতগণেরও উল্লেখ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হইবে। হাড়িপা ডোম হইলেও ময়নামতীর আদেশে রাজা গোবিন্দচন্দ্র তাহাকে গুরুস্বরূপ বরণ করিতে বাধ্য হইতেছেন,—গীতিনিহিত ধর্ম্মকথা ও উপদেশগুলিও বৌদ্ধভাবপূর্ণ। ময়নামতী যোগিবেশধারী রাজা গোবিন্দ-চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ঃ—

"কোথায় উৎপত্তি হইল পৃথিবী সংসার।
কোথায় রহিল পুনঃ কহ সমাচার॥

মরণ কিবা হেতু জীবন কিরূপ।
ইহার উত্তর যোগী কহিবা স্বরূপ॥"

হাড়িপার প্রসাদে রাজা উত্তরে বলিতেছেন ঃ—

"শূন্য হইতে আসিয়াছি পৃথিবীতে স্থিতি।
আপনি জল স্থল আপনি আকাশ।
আপনি চন্দ্র সূর্য্য জগত প্রকাশ॥"

বৌদ্ধধর্ম্মের শূন্যবাদ ও নাস্তিকতা যে প্রাচীন গ্রাম্য-কবির অমার্জ্জিত গীতি হইতে আবিষ্কৃত হইবে, তাহা বোধ হয় সাহিত্যসেবিগণের আশাতীত ছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রিকৃত বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের আবিষ্কার-তত্ত্ব প্রাচীন গাথাগুলির দ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইতেছে। রাজা গোবিন্দচন্দ্র হাড়িপাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—প্রকৃত ধর্ম্ম কি?—হাড়িপার উত্তরচিরপরিচিত বৌদ্ধনীতির পুনরাবৃত্তি মাত্র;—

"রাজা বলে কোন্ ধর্ম্মে সবলোক তরে
ইহার উত্তর গুরু আজ্ঞা কর মোরে।
হাড়িপা কহেন বাছা শুন গোবিন্দাই॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম যার পর নাই॥"

এই গীতিতে বিশেষ কোন কবিত্বের পরিচয় নাই, মাণিকচন্দ্র রাজার গানের ন্যায় ইহাতেও মন্ত্র-শক্তির যথেষ্ট পরিচয় আছে। এই অদ্ভুত গানে ডোমবর্গ ব্রাহ্মণগণ হইতে বেশী সম্মান লাভ করিতেছেন, ও অধিকতর ক্ষমতা দেখাইয়া রাজচক্রবর্ত্তীর মুকুটালঙ্কৃত শিরে পদধূলি প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিতেছেন, কবিত্বের হিসাবে না হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মের লুপ্তাবশেষ বলিয়া ইহা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

প্রেম-কথা।

সন্ন্যাস গ্রহণ কালে গোপীচাঁদের স্ত্রী তাঁহাকে সঙ্গিনী করিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন, সে স্থানটি উদ্ধৃত হইয়াছে; সন্ন্যাসী গোবিন্দচন্দ্রের রাণীও তদ্রূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমরা সে স্থলটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম দুর্ল্লভ মল্লিকের গান অপেক্ষাকৃত পরিশুদ্ধ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী গাথাটির সঙ্গে

তুলনা করিলে,—ইহার ভাষা অনেক আধুনিক,—উদ্ধৃত দুইটি স্থান পাশাপাশি রাখিলেই পাঠক ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ভালবাসা-রূপ মহাবীণাযন্ত্রের তন্ত্রীতে করস্পর্শ করিতে যে বঙ্গের অশিক্ষিত গ্রাম্য-কবিও সুদক্ষ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—

"অভাগী উদুনারে রাজা সঙ্গে করি লহ।
দেশান্তরে যাব আমি কর অনুগ্রহ॥
তুমি যোগী হবে আমি হইব যোগিনী।
রান্ধিয়া বিদেশে যোগাইব অন্ন পানি॥
বসিয়া থাকিহ তুমি বনের ভিতরে।
আনিব মাগিয়া ভিক্ষা আমি ঘরে ঘরে॥

* * * *

নগরে নগরে ভ্রমি বসিবে যখন।
তৃষ্ণা হলে জল আনি কে দিবে তখন॥
বনে বনে কাঁটা ভাঙ্গি জ্বালিব আগুনি।
সুখেতে বঞ্চিব নিশি যোগীয়া যোগিনী॥
সর্ব্ব দুঃখ পাশরয়ে নারী যার পাশে।
আমারে করিয়া সঙ্গে চল দেশে দেশে॥

* * * *

না ছাড়া না ছাড়া মোরে বঙ্গের গোসাঞি
তোমা বিনে উদুনা থাকিবে কোন্ ঠাঞি॥
নারী পুরুষ দুই হয় এক অঙ্গ।
শিব বটে যোগীয়া ভবানী তার সঙ্গ॥

* * * *

রাজা বলে উদুনা আমার হইল কাল।
যাইব গুরুর সঙ্গে না কর জঞ্জাল॥

* * * *

হায় হায় কর্য়া রাণী ধুলায়ে লুটায়।
উদুনার রোদনে পাষাণ গল্যা যায়॥

কান্দয়ে নগরবাসী রাজা পানে চ্যায়া।
বাল বৃদ্ধ যুবা কান্দে আর শিশু ম্যায়া॥
রাণীর ক্রন্দনে নদী উথলে সাগর।
পাইসালে কান্দে অশ্ব যতেক কুঞ্জর॥
সারি শুয়া পক্ষী কান্দে না করে আহার।
দাসীগণ কান্দে রাজার করি হাহাকার॥
* * * *
খসাইয়া পেলে হার কেয়ূর কঙ্কণ।
অভিমানে দূর করে যত আভরণ॥
পুঁছিয়া ফেলিল সব সিঁথার সিন্দূর।
নাকের বেসর পেলে পায়ের নূপুর॥
রাজার চরণে পড়ে জড়ায়ে কুন্তল।
মোরা সঙ্গে যাব রাজা দেশান্তরে চল॥"

এই দুইটি গীতি ছাড়া আমরা আরও কিছু রচনা এই অধ্যায়ের অন্তর্গত করিব।

(৫) ডাক ও খনার বচন।

এই সকল বচন রচনার সময় বুদ্ধের প্রভাব বঙ্গদেশ হইতে উৎপাটিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে পুষ্করিণীখনন, বর্ত্ম নির্ম্মাণ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি সাধারণের উপকারজনক ধর্ম্ম যে অবশ্যপালনীয়, তাহা অনেকবার নির্দ্ধারিত হইয়াছে; * কিন্তু একটিবারও হরি কি অন্য

* "ধর্ম্ম করিতে যবে জানি।
পোখরি দিয়া রাখিব পানী॥
গাছ রুইলে বড় কর্ম্ম।
মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম্ম॥"
"যে দেয় ভাত শালা পানী শালী।
সে না যায় যমের বাড়ী॥
স্বর্ণ ভূমি কন্যা দান।
বলে ডাক স্বর্গে স্থান॥"

দেবতার নাম লইবার সূত্রে গৃহস্থকে পালন করিতে আহ্বান করা হয় নাই। ভাষার জটিলতায় এই সব বচন মাণিকচাঁদের গান হইতেও অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। খনার বচনের প্রচলন অত্যন্ত অধিক, এই জন্য কালক্রমে তাহাদের ভাষা ক্রমশঃ সহজ হইয়া গিয়াছে. কিন্তু ডাকের বচন ততদূর প্রচারিত হয় নাই, এই জন্য সেগুলি ভাষার প্রাচীনতা অনেকাংশে রক্ষা করিয়াছে। নিম্নলিখিত বচনগুলির ভাষা খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।*

(১) বুন্দা বুঝিয়া এড়িব লুণ্ড।
আগল হৈলে নিবারিব তুণ্ড॥

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অবনতির সময় উহা নাস্তিকতায় পরিণত হইয়াছিল। অনেক গ্রন্থে বৌদ্ধ ও নাস্তিক একার্থবাচকরূপে ব্যবহৃত দেখা যায়। 'বিদ্যোন্মাদতরঙ্গিণী' নামক সংস্কৃত পুস্তকে বৌদ্ধগণের যে সকল যুক্তি অবতারিত হইয়াছে তাহা চার্ব্বাকের মতাবলম্বী। ডাকের বচনে তদ্রূপ সূত্রও প্রচারিত দেখা যায়,—

"ভাল দ্রব্য যখন পাব।
কালিকারে তুলিয়া না থোব॥
দধি দুগ্ধ করিয়া ভোগ।
ঔষধ দিয়া খণ্ডাব রোগ॥
বলে ডাক এই সংসার।
আপনা মইলে কিসের আর॥"

ঈশ্বর-প্রসঙ্গে যে "ঈশ্বরের স্ত্রী সনে করে পরিহাস" তাহার নিন্দা ডাক করিয়াছেন। ঈশ্বরের স্ত্রী কে? গুরুপত্নী নন্ ত? 'ঈশ্বর' শিবের এক নাম, সুতরং ঈশ্বরের স্ত্রী 'ভবানী'কে বুঝাইতে পারে।

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পরে জানা গিয়াছে, নেপালে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণদ্বারা সুরক্ষিত, সংস্কৃত টিপ্পনীসংযুক্ত 'ডাকার্ণব' পুস্তকে বঙ্গীয় ডাকের বচনসমূহ উদ্ধৃত আছে। বঙ্গদেশে প্রচলিত ডাকের বচনের ভাষাপেক্ষা সেগুলির ভাষা জটিল। এই পুস্তক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দেখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মতে 'ডাক' শব্দ ডাকিনী শব্দের পুংলিঙ্গ ও একার্থবাচক; যেরূপ ডাকিনী মন্ত্রাদি দৃষ্ট হয়, ডাকের বচনও সেই শ্রেণীর। বৌদ্ধদিগের দ্বারা এই পুস্তক সযত্নে রক্ষিত হইতেছে, সুতরং ঐ সমস্ত বচন যে বৌদ্ধযুগীয় তাহা এখন নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

* বেণীমাধব দের সংস্করণ, ১২৯৫ সাল।

(২) আদি অন্ত ভুজসি।
ইষ্ট দেবতা যেহ পুজসি॥
মরণের যদি ডর বাসসি।
অসম্ভব কভু না থারসি॥
(৩) ডাঙ্গা লিড়ান বান্ধন আলি।
তাতে দিও নানা শালি॥
(৪) ভাষা বোল পাতে লেখি।
বাটাহুব বোল পড়ি সাখি॥
মধ্যস্থে যবে সমাধে ন্যায়।
বলে ডাক বড় সুখ পায়॥
মধ্যস্থে যাবে হেমাতি বুঝে।
বলে ডাক নরকে পচে॥

ডাক ও খনার বচন সম্বন্ধে মন্তব্য।

ডাক নামক জনৈক গোপ 'ডাকের বচন' প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে। যে বংশে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার হইয়াছিল, সেই বংশে বঙ্গের সক্রেতিস্—ডাকের জন্ম কল্পনা করা কিছু অনুচিত হয় নাই, তবে মিহিরের পত্নী উজ্জয়িনীর ভাষা ছাড়িয়া বাঙ্গালায় নীতি ও জ্যোতিষতত্ত্ব সঙ্কলন করিতেছেন, এ কল্পনার দৌড় আর একটুকু বেশী। ডাক ও খনা দুর্ভেদ্য অন্ধকার-জাল হইতে জ্ঞান-রশ্মি বিকিরণ করিতেছেন। তাঁহাদের জীবনের উদয় অস্ত, পর্ব্বতপ্রমাণ কুসংস্কারের দ্বারা আবৃত; আমরা সেগুলির কিছুই প্রত্যয় করিতে পারিলাম না। কল্পনা-প্রিয় পাঠকগণ বটতলার সারসংগ্রহ হইতে তাঁহাদের সন্তোষার্থ বিবিধ সদনুষ্ঠানের আয়োজন খুঁজিয়া বাহির করিবেন।

বোধ হয় বঙ্গভাষা স্ফুরণের এইগুলি প্রাক্-চেষ্টা। ভাষা ও ভাব দৃষ্টে বোধ হয়, ৮০০—১২০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে এই সকল বচন রচিত হইয়াছিল, যুগে যুগে ভাষার সংস্কার হওয়াতে সেগুলি বর্ত্তমান সহজাকারে

পরিণত হইয়াছে। উহারা একজাতির সম্পত্তি; হয় ত প্রাচীন-কালে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিই অজ্ঞাতসারে উহাদের রচনার সাহায্য করিয়াছে। কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা এ সমস্ত বচন রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। * কালিদাস ও গোপালভাঁড় যেমন বঙ্গীয় রসিকতা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন, বঙ্গদেশের জ্ঞানেও সেইরূপ সেকালে ডাক ও খনা নামধেয় প্রকৃত কিম্বা কল্পিত ব্যক্তিদ্বয় একাধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই সব বচনে কবিত্ব কিছুই নাই, উহারা কঙ্কাল-সার সত্য, ভাষা উহাদিগকে সাজাইয়া বাহির করে নাই, সুতরাং সাহিত্য-সেবীদিগের প্রীতিকর হইবে কি না জানি না। অনাড়ম্বরে অতি সংক্ষেপে কথাগুলি প্রচারিত হইয়াছে। বহু পুস্তক খুঁজিলে যে জ্ঞান লাভ হয়, ঐ সব বচনের ছ'ছত্রে তাহা আছে;—উহারা এতদূর সত্য যে, রেখা গণিত কি অঙ্ক-গণিতের প্রশ্নের মত কষিয়া দেখ,—ফলে মিলিয়া যাইবে।

খনা ও ডাকের বচনে প্রভেদ।

খনা ও ডাকের বচন দুইরূপ সামগ্রী। খনা কৃষক ও গ্রহাচার্য্যের নজির। ডাকের বচনে জ্যোতিষ ও ক্ষেত্র-তত্ত্বের কথা আছে সত্য, কিন্তু তাহাতে মানব-চরিত্রের ব্যাখ্যা বেশী। আমরা নিম্নে কতকটি উদ্ধৃত করিতেছি; বাঙ্গালী পাঠক, আপনারা হামাগুড়ির সঙ্গে যে পাঠ অভ্যাস করিয়াছিলেন, এগুলি তাহার পুনরাবৃত্তিমাত্র, কিছুই নূতন নহে।

(১) খাটে খাটায় লাভের গাঁতি।
তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি॥
ঘরে ব'সে পুছে বাত।
তার ভাগ্যে হাভাত॥† খনা।

---

* ডাক অর্থ প্রচলিত বাক্যও হইতে পারে। "এখনও ডাকের কথায় বলে" প্রভৃতি কথার কোন কোন স্থানে ডাক অর্থ প্রচলিত বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

† "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" তুলনা করুন।

(২) খনা ডেকে বোলে যান।
রোদে ধান ছায়ায় পান॥

(৩) দাতার নারিকেল, বখিলের বাঁশ।
কমে না বাড়ে না বারমাস॥ খনা।

(৪) দিনে রোদ, রাতে জল।
তাতে বাড়ে ধানের বল॥
কাতিকের উনজলে।
খনা বলে দুন ফলে॥

(৫) ঘরে আখা বাইরে রাঁধে।
অল্প কেশ ফুলাইয়া বাঁধে॥
ঘন ঘন চায় উলটি ঘাড়।
ডাক বলে এ নারী ঘর উজার॥

(৬) নিয়র পোখরি দূরে যায়।
পথিক দেখিয়ে আউড়ে চায়॥
পর সম্ভাষে বাটে থিকে।
ডাক বলে এ নারী ঘরে না টিঁকে॥

(৭) রাঁধে বাড়ে গায় না লাগে কাতি।
অতিথি দেখিয়া মরে লাজে।
তবু তার পূজার সাজে॥
সুশীলা শুদ্ধ বংশে উৎপত্তি।
মিঠা বোল স্বামীতে ভকতি॥
রৌদ্রে কাঁটা কুঁটায় রাঁধে।
খড়কাট বর্ষাকে বাঁধে॥
কাথে কলসী পানীকে যায়।
হেট মুণ্ডে কাকহো না চায়॥
যেন যায় তেন আইসে।
বলে ডাক গৃহিণী সেই সে॥

বঙ্গভাষার মুখবন্ধেই এইরূপ সারগর্ভ কথার সূচনা হইয়াছিল, ইহা

আমাদের সৌভাগ্যের কথা। ঘরের বউ ও কৃষকগণ এই সব চরণ কণ্ঠস্থ করিয়াছে বলিয়া উহাদিগকে অবজ্ঞা করিও না। প্রতি বনে বন-কুসুম, প্রতি মেঘে তারাপংক্তি, তাহারা ত কত সুলভ! কিন্তু তাহাদের মত সুন্দর কি?

বচনগুলিতে গৃহস্থালী-জ্ঞান।

এই সব বচন পড়িতে পড়িতে আমাদের আর একটি কথা মনে হয়। এখন আমাদের ভিক্ষা করিতে হইলেও বিলাত হইতে ঝুলি কিনিয়া আনিতে হইবে। কিন্তু যখন ঐ সব বচন রচিত হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালী ভালরূপ গৃহস্থালী জানিত ও পরমুখাপেক্ষী ছিল না। কৃষক সারা জীবন পরিশ্রম করিয়া, রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করিয়া যে সত্যের আভাস পাইয়াছিল সেই জ্ঞান এ সব বচনে প্রচুর আছে। কৃষক জানিত, জ্যৈষ্ঠে খরা ও আষাঢ়ে ধারা হইলে শস্য ধরায় আঁটে না। আষাঢ় মাস ভরিয়া দক্ষিণা বাতাস বহিলে সে বৎসর বন্যা হয়। ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হইলে চিনা কাওন দ্বিগুণ হয়। "ধান্যের থোর জন্মিলে এক মাস, ফুলিলে অর্থাৎ গর্ভে শীষ জন্মিলে ২০ দিন, ঘোড়ামুখো অর্থাৎ শীষভরে অবনত হইলে ১৩ দিন মাত্র পরেই কাটিবার উপযুক্ত হয়। অগ্রহায়ণে কাটিলে পূর্ণ ফসল হয়, পৌষে কাটিলে স্থানে স্থানে ফসল, মাঘে কাটিলে অল্পমাত্র ফসল এবং ফাল্গুনে কাটিলে কৃষকের কোনরূপ ফসল হয় না।"* এগুলি তাহাদের পুস্তক শিক্ষার ফল নহে, তাহারা হাল কাঁধে করিয়া প্রকৃতির নিকট এই শিক্ষা পাইয়াছিল। বড় বড় অধ্যাপকও ইহার অতিরিক্ত তাহাদিগকে কিছু শিখাইতে পারিতেন না। এখনও বঙ্গের কৃষক এই সব তত্ত্ব জানে, কিন্তু পূর্ব্বে ঘরে ঘরে সকলেই ইহা জানিত। আমরা শুধু জুলিয়েটের বিরহ ও ওথেলোর সন্দেহবিষয়ে প্রাজ্ঞ হইতেছি ও পোপোকেটিপেটল্ কোথায় তাহা মানচিত্রে দেখাইতে শিখিয়াছি, কিন্তু আমরা এতদূর

---

* খনার বচন, জ্যোতিষরত্নাকর।

স্বাবলম্বনশূন্য হইয়া পড়িয়াছি যে ভূমি এবং তদুৎপন্ন শস্যাদি সংক্রান্ত অতি সাধারণ কথাগুলি শিক্ষা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি এবং গৃহস্থালীর বুদ্ধিটুকু একবারে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এই দুর্দ্দিনে তাই এই সব বচনগুলি বড় প্রিয় বোধ হয়।

জ্যোতিষে অচলা ভক্তি।

কিন্তু এই সব বচনের অপর একটা দিক্ দেখিবার আছে। দৃষ্ট হইবে, বাঙ্গালা গৃহস্থালী করিতেছিল সত্য, কিন্তু টিক্‌টিকির ভয়ে, হাঁচির ভয়ে, আকার ভয়ে, বাঁকার ভয়ে, কুঁজোর ভয়ে স্বীয় কুটীরে থাকিয়া জড়সড় হইয়াছিল। পা বাড়াইতে, হাঁ করিতে বঙ্গীয় বীর পাঁজির দোহাই দিত; তাহারা কাক-মুখে জ্যোতিষের বার্ত্তা শুনিয়া কার্য্যের ফলাফল নিরূপণ করিত। এই অপূর্ব্ব শব্দার্থের কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল।

শব্দ	ফল
ক ক	কল্যাণলাভ।
কঃ কঃ	রাজোপদ্রব।
করকং করকং	বন্ধুজনের সহিত সাক্ষাৎ।
কেতংকেতং	রত্ন হানি।
করকো করকো	কলহ।
কোলো কোলো	নিষ্ফল বা ক্ষতি।
কোয়ং কোয়ং	রাজা বা প্রভু বিনাশ।
ক্রেং ক্রেং ক্রেং	দ্রব্যলাভ।
কঃকুকুং কঃকুকুং	শবদর্শন ইত্যাদি।

জ্যোতিষরত্নাকর, ৪৪৫ পৃঃ।

জ্যোতিষ শাস্ত্র বিজ্ঞানরূপে অধীত হইতেছিল না,—সংসারক্লিষ্টের হস্তে পড়িয়া এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। যে জাতি এরূপ ভীরু তাহাদের জীবনে স্বাধীন চিন্তার স্ফূর্ত্তি কিরূপে থাকিবে? এইরূপ জ্যোতিষে ভক্তি জাতীয় প্রতিভা-বিকাশের প্রতিবন্ধক। তাই ঐ সব বচনে একদিকে বাঙ্গালীর অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া সুখী হই, অন্যদিকে তাহা-দিগের জড়তা দেখিয়া দুঃখিত হই।

কিন্তু শঙ্কর-প্রণোদিত হিন্দুধর্ম্মের ঢেউ বঙ্গে প্রবেশ করিল—অনড় টলিল; যাহা নড়ে না, তাহা নড়িতে শিখিলে দৌড়ায়। যে বঙ্গদেশের প্রতিভা কুসংস্কারে ও জড়তায় মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল, তাহা

কয়েক শতাব্দীর মধ্যে খাঁড়া ধরিয়া বহুযুগ-সঞ্চিত কুসংস্কারের স্তূপচ্ছেদন করিতে দাঁড়াইল। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে সেই প্রতিভার ক্রমিক বিকাশ দেখাইব।

অপ্রচলিত শব্দার্থ।

আমরা 'বৌদ্ধ-যুগের' রচনায় যে সব অপ্রচলিত শব্দ পাইয়াছি, নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম। *

শব্দ	অর্থ	পুস্তকের নাম।
অঘ্র ...	অর্ঘ্য ...	শূ, পু।
অকইবের ...	পণ্ডিতের ...	ঐ
অন্যান্য অন্তিক্ষ	অনন্যচিত্ত ...	ঐ
অস্ম ...	অশ্ব ...	ঐ

* এই সব শব্দের সকল অর্থই যে ঠিক হইল তাহা বলিতে পারি না। কোন কোন শব্দ কেবল স্থলবিশেষে একবার পাইয়াছি, সেই স্থলে যে অর্থে তাহা ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া ধারণা হইয়াছে, তাহাই দিয়াছি। একই শব্দের ব্যবহার অনেক স্থলে না লক্ষ্য করিলে তাহার প্রকৃত অর্থ বোধ হয় না। ইহার কোন কোন শব্দ সম্পূর্ণ প্রাদেশিক, তাহা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের শব্দার্থ-বোধ-সৌকর্য্যার্থ কোন অভিধান রচিত হয় নাই, কিন্তু তাহার রচনা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় বাঙ্গালা চলিত ও অপ্রচলিত শব্দের অভিধান প্রণয়ন বিষয়ে জনৈক কৃতবিদ্য সাহেবই সর্ব্বপ্রথম হস্তক্ষেপ করেন। স্যার্ গ্রেভস্, সি, হফ্‌টন্ মহোদয়ের বাঙ্গালা অভিধান ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়, এই পুস্তক নিতান্ত অসম্পূর্ণ হইলেও এই শ্রেণীর অভিধান বাঙ্গালায় আর বিরচিত হয় নাই। আমি এই পুস্তকে সেই বিষয়ের কথঞ্চিৎ অবতারণা করিলাম মাত্র। এস্থলে বলা উচিত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'পঁহু' ও 'নিছনি' শব্দের অর্থ লইয়া 'সাধনা' পত্রিকায় এবং শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রাচীন অপ্রচলিত শব্দার্থের কিঞ্চিৎ চর্চ্চা করিয়াছেন। ৺জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় তৎকৃত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সংস্করণে কতকগুলি হিন্দী শব্দার্থের তালিকা দিয়াছিলেন, ও তাহাই মুলতঃ অবলম্বন করিয়া ৺রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বিদ্যাপতির পদসমূহের দুরূহ শব্দের একটি বিস্তৃত অর্থ-তালিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তৎসম্পাদিত চৈতন্য ভাগবতের টীকায় এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তৎসম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের টীকায় এ সম্বন্ধে কিছু শ্রম স্বীকার করিয়াছেন।

শব্দ		অর্থ		পুস্তকের নাম।
অহন্নেক	...	অনেক	...	শূ, পু।
অনুহিত	...	অনুষ্ঠিত	...	ঐ
আইদ্	...	আদি	...	ঐ
আকুড়ি	...	আকড়্সী	...	ঐ
তাঁড়ুল	...	তণ্ডুল	...	ঐ
আপাবন	...	বিশেষ পবিত্র	...	ঐ
আফুলা	...	অপক্ক	...	ঐ
আরসা	...	রসহীন	...	ঐ
আমলো	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
আলম্ব	...	নিশান	...	ঐ
আসারে	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
আসআঙ্গ	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
উজুরোলা	...	উচ্চ শব্দ	...	ঐ
উড়াসালী	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
ককচি	...	ধান্যভেদ		ঐ
কনকচুর	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
কম্নি	...	লেখক	...	ঐ
কাঁগুদ	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
কামদ	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
কামিনা / কামিন্যা	...	কর্ম্মকার	...	ঐ
কালাকাত্তিক	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
কিআলা	...	কেয়াফুল	...	ঐ
কিলেস	...	ক্লেশ	...	ঐ

শব্দ		অর্থ		পুস্তকের নাম
কিসান	...	কৃষাণ	..	শূ, পু।
কুসুমমালী	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
কেওদা	...	কেঁদো	...	ঐ
খচড়া	...	শূন্যগামী	...	ঐ
খীরকম্বা	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
খুদ্দ	...	ক্ষুদ্র	...	ঐ
খেজুরছড়ি	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
খেমরাজ	...	ধান্যভেদ	..	ঐ
খোঁটা	...	কীলক	...	ঐ
গতি	...	সেবক	...	ঐ
গামারি	...	গাম্ভারী বৃক্ষ	...	ঐ
গারস্তর	...	গৃহস্থের	...	ঐ
গিরিধর	...	গিরিস্থল	...	ঐ
গুজুরা	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
গোঁতমপলাল	...	ধান্যভেদ	..	ঐ
গোপালভোগ	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
চন্দ্রহাস	...	অস্ত্রভেদ	...	ঐ
চানক	...	চাঁদোয়া	...	ঐ
ছিছরা	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
ছিহথ	...	শ্রীহস্ত	...	ঐ
জগদাল	...	জগদ্দল, ভারী পাথর		ঐ
জিন্তা	...	জিহ্বা	..	ঐ
জোলি	...	নিভাঁজ ধান্য	...	ঐ
ঝিঙ্গাশাল	...	ধান্যভেদ	...	ঐ

শব্দ		অর্থ		পুস্তকের নাম।
ঝিসিকানি	...	বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি	...	শূ, পু।
ডকবুস	...	ডাঙ্গশ	...	ঐ
ডহর	...	জলাভূমি	...	ঐ
ডাড়ুকা	...	শৃঙ্খলবিশেষ	...	ঐ
তরাজু	...	পাল্লা	...	ঐ
তাঁউল	...	তণ্ডুল	...	ঐ
তামাক	...	তাম্রনির্ম্মিত পুষ্পপাত্র		ঐ
তেঠঙ্গা	...	ত্রিভঙ্গ	...	ঐ
ত্রিরূচ	...	ত্রিমুখ	...	ঐ
তোজনা	...	ধান্যবিশেষ	...	ঐ
দম্বদার	...	দোম্‌মাদার	...	ঐ
দাইআ	...	দা দিয়া কর্ত্তন করিয়া		ঐ
দুআপর	...	দ্বাপর	...	ঐ
দুদুরাজ	...	দুধরাজ	...	ঐ
দেউল্যা *	...	পূজাকারক	...	ঐ
দেহারা	...	মঠ	...	ঐ
ধিরকালি	...	বাদ্যবিশেষ	...	ঐ
ধুন্ধুকার	...	শূন্যাকার	...	ঐ
নিছনি	...	ঝাড়ন	...	ঐ
নেতর	...	ছিন্নবস্ত্র	...	ঐ
পর্ব্বতজিরা	...	ধান্যবিশেষ	...	ঐ
পাকানা	...	জড়িত	...	ঐ

* বর্ত্তমান 'দেউলিয়া' শব্দ এই শব্দ হইতে উদ্ভূত। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সম্ভবতঃ লোকে দেব-মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিত।

শব্দ	অর্থ	পুস্তকের নাম।
পাটএ ...	মঞ্চে ...	শূ, পু।
পাটসালে ...	রাজসভায় ...	ঐ
পাড়ন ...	পাটাতন ...	ঐ
ফেফেরি ...	ধান্যবিশেষ ...	ঐ
বারমতি ...	„ ...	ঐ
বিহরাম ...	বিশ্রাম ...	ঐ
বিহানে ...	প্রাতঃকালে ...	ঐ
ভাদোলী ...	ধান্যভেদ ...	ঐ
বেসাতি ...	হাটে বিক্রয়ের দ্রব্যাদি	ঐ
বেলাল ...	বিল্ব ...	ঐ
ভেক ...	বেশ ...	ঐ
মইপাল ...	মহীপাল, ধান্যভেদ	ঐ
মনুহর ...	মনোহর ...	ঐ
মহীপাল ...	ধান্যভেদ ...	ঐ
সালুক ...	কুমুদকন্দ ...	ঐ
সাঁঝা ...	সন্ধ্যায় আলোকদান	ঐ
সনাখড়কি ...	ধান্যভেদ ...	ঐ
সালছাটি ...	ধান্যভেদ ...	ঐ
সীতাসালী ...	ধান্যভেদ ...	ঐ
সীফল ...	শ্রীফল ...	ঐ
হাতিপাঞ্জর ...	ধান্যভেদ ...	ঐ
হুকুলি ...	ধান্যভেদ ...	ঐ
হুতার ...	অগ্নির ...	ঐ
মুক্তাহার ...	ধান্যবিশেষ ...	ঐ

শব্দ		অর্থ		পুস্তকের নাম।
মোথ	...	মোক্ষ	...	শূ, পু।
মৌকলস	...	ধান্যবিশেষ	...	ঐ
লাউসালী	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
লালকামিনী	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
লিঙ্গা	...	বাদ্যযন্ত্র বিশেষ	...	ঐ
বম্ভগাঁঠি	...	ব্রহ্মগ্রন্থি	...	ঐ
বরঙ্গ	...	বাদ্যযন্ত্র বিশেষ	...	ঐ
বাঅন	...	বেগুন	...	ঐ
বাঁঝা	...	বন্ধ্যা	...	ঐ
বিকৃথ	...	বৃক্ষ	...	ঐ
বাম্ভন	...	ব্রাহ্মণ	...	ঐ
বাঁসমতী	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
বোআলি	...	ধান্যবিশেষ	...	ঐ
সইতর	...	সঙ্গের	...	ঐ
অক	...	উহাকে	...	মা, চ, গা।
অগড়	...	অগুরু চন্দন	...	শূ, পু।
অচুম্বিতের	...	আশ্চর্য্যের	...	মা, চ, গা।
অফিল্লা	...	যাহা উৎপাটিত হয় নাই		ঐ
অবুধ	...	বুদ্ধিশূন্য	...	ডাক।
আউটাউ	...	হাবুডুবু	...	মা, চ, গা।
আউ	...	জানু	...	ঐ
আউল	...	সিদ্ধ ব্যক্তি	...	ঐ
আউড়ে	...	বক্রভাবে	...	ঐ
আও	...	রব	...	ঐ

শব্দ		অর্থ		পুস্তকের নাম।
আধার *	...	খাদ্য	...	ডাক।
আপহর	...	পাহারা	...	ঐ
আপ্ত	...	আপন	...	মা, চ, গা।
আছিল	...	উপস্থিত	...	ঐ
আইল পাতার	...	বৃহৎক্ষেত্র	...	ঐ
আরিব্বল	...	আয়ু	...	ঐ
আসা নুড়ি	...	হাতের লাঠি	...	ঐ
একতন যেকতন	..	যে কোন প্রকারে		ঐ
একলা	...	এক	...	ঐ
এলায়	...	এখন	...	ঐ
উকা	...	অগ্নি	...	ঐ
উলী	...	কুশল	...	ডাক।
কা	...	কাক	...	খনা।
কাউ	...	কাক	...	ঐ
কাউশিবার	...	তাগাদা করিতে	...	মা, চ, গা।
কাতি	...	কালী ; কার্ত্তিক মাসে		ঐ
কাঞ্জী	...	ছোট	...	ঐ
কোনটি	...	কোথায়	...	ঐ
কোটেকার	...	কোথাকার	...	ঐ
কুশলানী	...	মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী	...	ডাক।
কৈতর †	...	পায়রা	...	মা, চ, গা।
খপরা	...	কুটীর	...	ঐ

* আধার শব্দ পূর্ব্বে মনুষ্যের খাদ্যও বুঝাইত ; এখন ইহার অর্থ সীমাবদ্ধ হইয় শুধু পক্ষীর খাদ্য মাত্র বুঝায়।

† এখনও পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত।

শব্দ		অর্থ		পুস্তকের নাম।
খোচা	...	তৃণ পল্লব	...	মা, চ, গা।
গাভূর *	...	যুবক, বলশালী	...	ডাক।
গাবুরাণী †	...	যৌবন	...	মা, চ, গা।
গিরি	...	গৃহ	...	ঐ
গোবিন	...	গভীর	...	ঐ
গোঁধলা	...	গোময়	...	ডাক।
ঘরজুয়ান	...	চিরযৌবন	...	মা, চ, গা।
চতুরা	...	চতুর্দ্ধার	...	ঐ
চাম্বর	...	চামর	...	ঐ
চরিচর	...	চরির উপায়	...	ঐ
ছামুর	...	সম্মুখের	...	ঐ
ছুছু	...	শূন্য	...	ডাক।
জীউ	...	জীবন	...	মা, চ, গা।
জ্ঞাস্তা	...	জ্ঞাতি	...	ঐ
ঝোলাঙ্গা	...	ঝুলি	...	ঐ

* বিক্রমপুর অঞ্চলে এখনও চলিত।

† গ্রীয়ার্‌সন্ 'গাবুরাণী' অর্থ করিয়াছেন "bride-hood"—এসিয়াটিক্ সোসাইটির জার্ণ্যাল্, ১৮৭৮, প্রথম সংখ্যা, ৩য় খণ্ড, ২১৩ পৃঃ দেখ। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে কোন কোন স্থলে গাভুর, গাভূরাণী, এই উভয়বিধ রূপই প্রচলিত আছে ও ইহার অর্থ যৌবন বুঝায়। পাঠক এই পুস্তকের ৭৩ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত স্থলে গাবুরাণী শব্দ দেখিবেন, তাহাতে যৌবন অর্থই সঙ্গত দৃষ্ট হইবে। এই শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গ্রীয়ার্‌সন্ সাহেব আমাকে লিখিয়াছেন,—With reference to the word "Gaburani" about which I wrote to you the other day, I have since found out that the word "Gabur" is very common in Chittagong. It means "young", also "a boy", hence "a servant". The word "Gaburani", therefore, means "youthfulness," and has the same meaning as "yauvana." It has nothing to do with the Sanskrit "Garva."

শব্দ	অর্থ	পুস্তকের নাম।
ডাঙ্গ * ...	কাটি ...	মা, চ, গা।
ডারিয়া ...	বাঁধিয়া ...	ঐ
ডাঙ্গাইবার ...	প্রহার করিতে ...	ঐ
ডাম্বাডোল ...	বহুজনতার শব্দ ...	ঐ
ঢেবা ডোরা ...	ঢোলের দ্বারা ঘোষণা	ঐ
ঢলমল ...	ঝলমল ...	ঐ
তেতকে ..	তত ...	ঐ
তৈল পাঠের খাড়া	পাঁঠা কাটার ছুরি	ঐ
দায় † ...	ডাক ...	ঐ
দোয়াদস ...	করঙ্গ ...	ঐ
দামরা ...	ঢোল ...	ঐ
দোন ...	দুই ...	ঐ
থবীরা ...	স্থবির ...	ডাক।
ধরেক ...	ধরিও ...	ঐ
ধওল ...	ধবল ..	মা, চ, গা।
নঠ ...	নষ্ট ...	ডাক।
নিন্দ ...	নিদ্রা ...	মা, চ, গা।

* হফ্‌টন কৃত অভিধানে, ডাঙ্গ শব্দ সংস্কৃত দণ্ড শব্দ হইতে উদ্ভূত, এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে।

† এই 'দায়' শব্দ পূর্ব্বে নানা অর্থে ব্যবহৃত হইত। মাণিকচাঁদের গানে আছে,—

"যেন মতে কলাই বেচি রাজাকে দেখিল,
ঘরর শ্যামক আইল বাপ দায় দিয়া।"

রাজার রূপে মুগ্ধ হইয়া ঘরের স্বামীকে বাপ বলিয়া আসিল। অনেক পরে চৈতন্য ভাগবতে পাইতেছি, "অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন", অর্থাৎ অন্যের কথা দূরে থাকুক ইত্যাদি।

শব্দ		অর্থ		পুস্তকের নাম।
নিতে	...	বিনা	...	মা, চ, গা।
নেওয়া	..	প্রলেপ	..	ঐ
নেয়াই	...	ন্যায়	...	ঐ
পইতায়	...	প্রত্যয় করে	...	ঐ
পোথরি	...	পুষ্করিণী	...	খনা।
পাহাড়	...	পার	...	ডাক।
পাকেয়া	...	ঘুরাইয়া	...	মা, চ, গা।
বাবন	...	ব্রাহ্মণ	...	ঐ
বারুণ	...	ঝাঁটা	...	ঐ
বাদে	...	জন্য	...	ঐ
বেন্নামুখ	...	মুখ ফিরাইয়া	...	ঐ
বুন্দা	...	বৃষ্টি-বিন্দু	...	ঐ
ভুসঙ্গ	...	ভস্ম	...	ঐ
বেআলি	...	অনৈক্য	...	ডাক।
মাও	...	মাতা	...	মা, চ, গা।
মধুকর *	...	নৌকা বিশেষ	...	ঐ
মাল্লি	...	পথ্য	...	ঐ
মাড়াল	...	পথ	...	ঐ
মিঠ	...	মিষ্ট	...	ডাক।
মুচ্ছর্ল	...	বাদ্য-যন্ত্র বিশেষ	..	মা, চ, গা।

* "মধুকর" নৌকা বিশেষের নাম। পদ্মাপুরাণে নৌকার অনেকগুলি নাম দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে 'মধুকর' নৌকাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়; স্বয়ং সদাগর 'মধুকরে' যাইতেন। বিক্রমপুরবাসীদের মুখে শুনিয়াছি, এখনও 'মধুকর' অর্থে একরূপ নৌকাকে বুঝায়।

শব্দ		অর্থ		পুস্তকের নাম।
যেটে	...	যে স্থানে	...	মা, চ, গা।
যেত্কে	...	যত	...	ঐ
যোগ্যবান	...	যোগ্য	...	ঐ
যেনমত	...	যখন মাত্র	...	ঐ
লহড় (লড়)	...	দৌড়	...	ঐ
সয়ল *	...	সকল	...	রা, প।
সমাধে	...	বোঝে	...	ডাক।
সাধে	...	সংগ্রহ করে লয়	...	মা, চ, গা।
সানে	...	ইঙ্গিত	...	ঐ
সরুয়া	...	সরু	...	ঐ
সাঁও	...	সাপ	...	ঐ
সেঁওয়ালী	...	সন্ধ্যাকালীয়	...	ঐ
হীন	...	শূন্য, বিয়োগ	...	খনা।

সংস্কৃতের প্রভাব-হীনতা।

এই সময়ের ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব একবারেই দৃষ্ট হয় না, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। মাণিকচাঁদের গানে রাজা ভাল হইলে তাঁহাকে 'সতী' এবং দুষ্ট হইলে তাঁহাকে 'অসতী' বলা হইয়াছে। খনা শনিকে 'ভানুতনুজা' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বহু-পূর্ব্ব-রচিত মেয়েলী ছড়ায় 'গুণবতী ভাই' শুনিয়াছিলাম, সেও বুঝি এই যুগের রচনা হইবে। মাণিকচাঁদের গানে ক্রিয়ার গুরু লঘু ভাব এখনকার প্রচলিত ভাব হইতে স্বতন্ত্ররূপ ছিল। 'যাইস্ না ধর্ম্মি রাজা পরদেশক লাগিয়া।' (মা, চ, গা, ২৯২ শ্লোক) প্রভৃতি পদে সম্মানীয় পাত্রে লঘু ক্রিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে; অথচ ভৃত্য

---

* "একল রামাই পণ্ডিত সয়ল অবধান॥"

নেঙ্গাকে রাণী বলিতেছেন, 'কেন! কেন নেঙ্গা আইলেন কি কারণ' (৪৯ শ্লোক) মাণিকচাঁদরাজা তাঁহার প্রহারক যমদূতের প্রতি জিজ্ঞাসু হইয়াছেন, 'কে মারেন আমারে বিস্তর করিয়া' (৭২ শ্লোক)। কোন স্থানে আধুনিকমতে নিতান্ত বিরুদ্ধভাবাপন্ন 'তুমি চাইলেন দুধ' (৩০০ শ্লোক) প্রভৃতি রচনা দৃষ্ট হয়।

সামাজিক অবস্থা।

এই সময়ে রাজারা সোণার খাটে বসিয়া রূপার খাটে পদ স্থাপন (৩০৭ শ্লোক) ও স্বর্ণ থালে ৫০ ব্যঞ্জনসহ অন্ন আহার (৪৬৭ শ্লোক) করিলেও নিত্য জীবন-যাত্রা-ঘটিত দ্রব্যে খুব উচ্চ অঙ্গের বিলাসের ভাব প্রদর্শন করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। 'ইন্দ্রকম্বল' (৫৫৫ শ্লোক) 'দণ্ডপাথা' (২৫৪ শ্লোক) ও 'পাটের সাড়ী' (৫৮০ শ্লোক) বিলাসের দ্রব্য মধ্যে গণ্য ছিল। পর-বর্ত্তী এক অধ্যায়ে দৃষ্ট হইবে কৃত্তিবাস পণ্ডিত গৌড়েশ্বরের নিকট একখানা 'পাটের পাছড়া' পাইয়াই ধন্য হইতেছেন। কিন্তু কবিকঙ্কণ 'মেঘ ডম্বুর কাপড়' ও 'জগন্নাথী থান' নামক একরূপ বস্ত্রের কথা গর্ব্বের সহিত উল্লেখ করিতেছেন।* চৈতন্য প্রভুর সময় তিন টাকা মূল্যের ভোট কম্বলই মহার্ঘ বলিয়া গণ্য হইতেছে (চৈ, চ মধ্যমখণ্ড, ২০ প)। সে সব এ সময়েরও অনেক পরে। খাদ্যের মধ্যে "ইন্দ্রমিঠা" (২২৫ শ্লোক মা, চ, গা) নামক একরূপ মিষ্ট দ্রব্য উপাদেয় ছিল ও 'বংশহরির গুয়া' (২৫৭ শ্লোক) খাইয়া মুখ শুদ্ধি করা হইত। 'বংশহরির গুয়া খাইয়া' দন্ত শুভ্র হইয়াছে বলিয়া গোপীচাঁদ স্ত্রীর মুখের প্রশংসা করিতেছেন।

মাণিকচাঁদের গানে এবং ডাক ও খনার বচনে দৃষ্ট হয়, ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক-গণও কৃষি-ব্যবসা করিতেন এবং স্ত্রীলোকগণ পর্য্যন্ত অক্ষক্রীড়াসক্ত ছিলেন। স্ত্রীলোকগণের অক্ষক্রীড়াসক্তি কবিকঙ্কণের সময়েও বিদ্যমান ছিল।

---

* রাজার জন্য সাধু "নিল জগন্নাথী থান দশ জোড়া।" ক, ক, চ।
সাধুর স্ত্রী "বাছিয়া পরিল মেঘডম্বুর কাপড়।" ঐ

সন্তান জন্মিলে সাতদিন পরে 'সাদিনা', দশদিন পরে 'দশা', এবং ত্রিশদিন পরে 'ত্রিশা' নামক উৎসব করা হইত।

শূন্যপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তকে দৃষ্ট হয়, এই শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি নানা প্রকার ধান্যের ভাণ্ডারস্বরূপ ছিল। কৃষকগণ তাহাদিগকে আদর করিয়া নানাবিধ প্রিয় নামে অভিহিত করিত। সেই "মহীপাল", "লালকামিনী", "মোকলস", "খেজুরছড়া", "রাজগড়", "মুক্তা-হার", "মাধবলতা", "সোনাখড়কি", প্রভৃতি অসংখ্য নামধেয় ধান্যের কথা এখন আর আমরা জানি না। বঙ্গের আদরের সামগ্রী মহীপাল-ধান্য, এখন মহী-পালন করিবার ভার ছাড়িয়া দিয়াছে!

পঞ্চম অধ্যায়।

১। ধর্ম্মকলহে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি।

২। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ।

ধর্ম্মকলহ।

বঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের উত্থানে নানা মতাবলম্বী অধ্যাপকগণ স্বীয় স্বীয় মত প্রচারে নিয়োজিত হইলেন। ইঁহাদের তর্ক-যুদ্ধ অতীব কৌতূহল-উদ্দীপক। গৌড়বাসী প্রাচীন পণ্ডিত চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য এই কলহ ব্যাপারের একখানা চিত্রপট রাখিয়া গিয়াছেন; সে চিত্রখানি সর্ব্বাঙ্গস্থুন্দর হইয়াছে—তাহার নাম "বিদ্যোন্মাদতরঙ্গিণী"। *

বঙ্গসাহিত্যে শিব, পদ্মা, চণ্ডী ও শীতলা।

হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থানকালে বোধ হয় শৈবধর্ম্মই সর্ব্বপ্রথম মস্তক উত্তোলন করে। শৈবধর্ম্ম-কীর্ত্তনোপলক্ষে ভাষায় কোন বৃহৎ কাব্য রচিত না হইলেও "ধান ভান্‌তে শিবের গীত" প্রভৃতি প্রবাদ বাক্যের দ্বারা অনুমান হয়, শৈবমতের অধ্যাপকগণ সে বিষয়ে একবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। চট্টগ্রামের প্রাচীন 'মৃগলুব্ধ' পুঁথিতে† শিবমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে; এইরূপ দুএকখানা প্রাচীন পুঁথিই শৈবধর্ম্মের

---

* প্রায় ৬০ বৎসর অতীত হইল শোভাবাজারের স্বর্গীয় রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর নিজকৃত একটি ইংরাজী অনুবাদসহ এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

† ১৫০ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে গ্রন্থকার রতিদেব সম্বন্ধে এই বিবরণ পাওয়া যায়।

"পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা বসুমতী।
জন্মস্থান সুচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি॥
জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা বন্দম রাম নারায়ণ।
ধরণী লোটায়ে বন্দম যত গুরুজন॥
অন্নপূর্ণা শাশুড়ী যে শ্বশুর শঙ্কর।
মন্ত্রদাতা দয়াশীল মোক্ষদা ঠাকুর॥

ভগ্নকীর্ত্তিস্বরূপ বর্ত্তমান আছে। উহারা ক্ষুদ্র-কলেবর হইলেও সেগুলি জঙ্গলে কুড়াইয়া পাইয়া আমরা আদরে রক্ষা করিয়াছি।

শূন্যপুরাণ এবং রামেশ্বর ও কবিচন্দ্র প্রণীত শিবায়ন গ্রন্থে শিব সম্বন্ধে এক একটী এরূপ অধ্যায় আছে যে, তাহা প্রাচীনতম শিবগীতের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করি নাই। তাহাতে শিব বৃদ্ধ কৃষকবেশে কুবেরের নিকট কিছু ধান্য মূলধন গ্রহণ করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গী ভীম-ভৃত্য তাঁহার নিদেশে হলকর্ষণ করিয়া ক্ষেত্র চৌরস করিয়া চষিতেছে। শিবঠাকুর ক্ষেত্রের মশা এবং জোঁক ধ্বংস করিবার জন্য বিবিধ অনুষ্ঠান করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে কৃষিতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা প্রকার তত্ত্ব অবতারিত হইয়াছে। 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত'—এই প্রচলিত কথার সার্থকতা এই অধ্যায়ে পাওয়া যায়। শিবের সঙ্গে বাগ্দিনী-রূপিণী ভগবতীর শ্লীলতাহীন রসসন্দর্ভও প্রাচীন শিবগীতের অংশ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। পৌরাণিক শিবের সঙ্গে এই কৃষকরূপী কামিনীলুব্ধ শিবের কোন সম্বন্ধ নাই।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধনে পদ্মাবতী ও চণ্ডীই বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছেন। সংস্কৃতের বচন স্পর্শমণি-তুল্য, তাহার প্রভাবে লোষ্ট্রও দেবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে; এই জন্য ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে মনসা-মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্ত্তিত হইয়া এবং বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে* কালকেতু ও শাল-বাহন প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারা বঙ্গীয় পদ্মপুরাণ ও চণ্ডী কাব্যের ভিত্তি দৃঢ় করা হইয়াছিল।

লৌকিক দেবতাদের প্রভাব, শৈবধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ।

গোপীনাথ দেব সুত রতিদেব গায়।
মৃগলুব্ধ পুঁথি এহি হর গৌরীর পায়॥"

এই পুস্তকে শিবচতুর্দ্দশীব্রতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন উপলক্ষে এক ব্যাধের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

* "ত্বং কালকেতুবরদা ছলগোধিকাসি।
যা ত্বং শুভাভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা॥" ইত্যাদি।

শৈবধর্ম্মের উপর এই সব পৌরাণিক ও লৌকিক ধর্ম্মতরঙ্গ উপর্য্যুপরি আঘাত করিয়াছে। শিবোপাসক ধনপতি সদাগর 'ডাকিনী দেবতা' চণ্ডীর ঘট পদ-প্রহারে ভগ্ন করিয়া 'মেয়ে দেব'-সেবিকা খুল্লনাকে ভৎর্সনা করিয়াছিলেন, * বিষহরিদেবীকে শিবোপাসক চাঁদ সদাগর শুধু রক্ত চক্ষু দেখাইয়া ক্ষান্ত হন নাই, হেঁতালের বাড়ি দিয়া কক্ষদেশ ভগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন। † শিবোপাসক চন্দ্রকেতু রাজাও শীতলাদেবীর প্রতি সেই-রূপ তীব্র অবজ্ঞাসূচক উদ্ধত ভাব দেখাইয়াছিলেন। ‡ কিন্তু বঙ্গীয় কাব্য-গুলিতে চণ্ডী ও মনসাকে স্বীয় স্বীয় উপাসকভক্তগণের জন্য যেরূপ কার্য্য-তৎপর দর্শন করি, সে তুলনায় শিবঠাকুরকে নিতান্তই নিশ্চেষ্ট বলিয়া মনে হয়। খুল্লনার বিপদে, শ্রীমন্তের খেদে, লাউসেনের দুঃখে চণ্ডীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। স্বীয় পূজা প্রচারের জন্য চণ্ডী ও বিষহরির দিনে শান্তি ও রাত্রে নিদ্রা ঘটে নাই। সুন্দর দেবীর প্রসাদে কাব্য অপেক্ষা চৌর্য্যেও কম কৃতিত্ব লাভ করেন নাই। বিষহরিদেবীকে পূজা করিয়া বিপুলা (বেহুলা) কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, কে না জানে? ভক্তের স্মরণমাত্র ইঁহারা কখনও সাশ্রুনেত্র, কখনও খড়্গহস্ত। কিন্তু প্রায়শঃ ইঁহারা সামান্য মানবীর ন্যায় রাগ, হিংসা ও দুঃখের পরিচয় দিয়াছেন। দু'এক স্থলে শুধু বর্ণনাগুণে চণ্ডীদেবী মহত্তর প্রভাব দেখাইয়াছেন। মুকুন্দরাম ক্রুদ্ধ চণ্ডীর যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহা গাম্ভীর্য্যে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর একখানি সমুন্নত প্রতিলিপি। সমস্ত দেবগণের তেজোরাশিসমুদ্ভূতা চণ্ডীকে বরুণ পাশ, যম কালদণ্ড, ইন্দ্র বজ্র, শিব

* ধনপতির সিংহলযাত্রা, ক, ক, চ।

† "হেঁতালের বাড়ি দিলগো আগো তাতে ব্যথা পাইলাম বড়।
জালুয়া মণ্টপে গিয়া কাঁকালী কৈলাম দড়॥" বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ।

‡ "জন্মেও না ছাড়ি মহেশ ঠাকুর।
শুন রে অজ্ঞান বুড়ি এথা হৈতে দূর॥"

তৎপর শীতলাদেবী যখন তাঁহার রাজ্যে মহামারী উপস্থিত করিলেন, তখনও নির্ভীক চন্দ্রকেতু বলিয়াছিলেন—

শূল, ব্রহ্মা কমণ্ডলু, বিষ্ণু চক্র, সূর্য্য রশ্মি ও লোকপালগণ তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় প্রহরণ দিয়া প্রণত হইতেছেন। ত্রিলোকের এই ভীতিকর শক্তি-পুঞ্জ একত্র সংগ্রহ করিয়া সংহার-রূপিণী সিংহের উপর দাঁড়াইলেন। ইজিপ্টের পিরামিড কি ব্যাবিলনের প্রস্তর-গৃহ যাঁহারা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভিন্ন এ বিগ্রহ গঠন করিবে কে?

শিবের নিশ্চেষ্টতা।

কিন্তু চণ্ডী ও পদ্মাবতীর উদ্যমশীলতা মহাদেবে দৃষ্ট হয় না। চাঁদ-সদাগরের সাতখানা 'মধুকর ডিঙ্গা' খান খান হইয়া সমুদ্রে পড়িল। চাঁদবেণে 'শিব শিব' বলিয়া সপ্তবার ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল,* কিন্তু শিবঠাকুর নিশ্চেষ্ট, নির্ম্মম। ধনপতির অশ্রু মোচন করিতেও তিনি হস্ত উত্তোলন করেন নাই। সুতরাং বিষহরিদেবী ও চণ্ডীর প্রতিপত্তি যে বঙ্গদেশে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? চৈতন্যভাগবতে দেখা যায়, উক্ত দেবতাদ্বয়ের পূজা বিশেষ অর্থকরী ও সম্মানিত ব্যবসায় ছিল।†

শৈবধর্ম্মের শেষ কথা "শিবোঽহং।" জীব মাত্রই পাশমুক্ত হইলে শিব হইতে পারেন। শিব গুণাতীত, আনন্দস্বরূপ। ইঁহার নিকট কামনা করা বৃথা। ভগবানের পৃথক সত্তা এবং সগুণ ভাব উন্নত শৈব-গণ দ্বৈতবাদীদের ন্যায় প্রত্যক্ষ করেন না; সুতরাং লৌকিক কাব্যসমূহে শিবের এই নিশ্চেষ্টতা কেন হইল, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। এদিকে জনসাধারণ "শিবোঽহং" বাক্য উচ্চারণ করিতে কথনও

"রাজা বলে শীতলা করেছে যদি বাদ।
কদাচিত আমি তার না লব প্রসাদ॥"
দৈবকীনন্দনের শীতলামঙ্গল। সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা, ১৩০৫ সন, ১ম সংখ্যা, ৩৯ পৃঃ।

* "ভেলায় চাপিয়া সাধু পাইল গিয়া তট।
শিব শিব বলি সাতবার করে গড়॥" কেতকাদাস।
পুনশ্চ,— "যা করেন শিব শূল, এবার পাইলে কুল,
মনসায় বধিব পরাণে।" কেতকাদাস।

† "দেখ এই চণ্ডী বিষহরিরে পূজিয়া।
কেনা ঘরে খায় পরে বসন পরিয়া॥ চৈ, ভা, আদি।

সাহস করে নাই। ভগবানকে পিতৃরূপে এবং মাতৃরূপে তাহারা প্রত্যক্ষ করিতে চায়। বোধ হয়, শক্তি-আরাধনা এই জন্য তাহাদিগকে অধিকতর আকর্ষণ করিয়াছিল। ভগবতী মাতৃরূপে শ্রীমন্তকে বা সুন্দরকে মশানে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বসিয়াছেন, কিংবা বিষহরিদেবী বেহুলাকে তাঁহার মৃত স্বামী ফিরাইয়া দিতেছেন,—এই সচেষ্ট দয়ার ভাব এবং সগুণ-সত্তার পরিচয় তাঁহাদিগকে নববলসম্পন্ন করিয়াছিল। বিশেষতঃ, যখন মুসলমান-গণ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরে জ্বলন্ত বিশ্বাসের পরিচয় দিতেছিল, তখন তাহারা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা লইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে নাই। মুসলমান-বিজয়ের পর এই জন্য শাক্ত এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম বিশেষরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।

পরবর্ত্তী সাহিত্যে বিভিন্ন মতের একতা।

এস্থলে বলা উচিত, ভারতচন্দ্র শৈব ও শাক্তের যে কলহ বর্ণনা করিয়াছেন ও দাশরথি যাহার আভাস দিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের সময়ের সামগ্রী নহে; তাঁহারা অতীত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা অঙ্কিত করিয়াছেন মাত্র। ভারতচন্দ্র উক্ত কলহ বর্ণনা করিতে যাইয়া নানা মতের সামঞ্জস্যে রচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; তদ্দ্বারাই দৃষ্ট হয়, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায় সে সময় পরস্পরের বিরোধ ভুলিয়া সকলেই যে এক পথের পথিক, এই সত্য ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিল; সুতরাং তাহারা ধর্ম্ম-বিদ্বেষের সীমা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিল।

সাম্প্রদায়িক বিরোধে ভাষার পুষ্টি ও শাস্ত্রচর্চ্চার বহুল বিস্তার।

শৈব শাক্তের কলহ ভিন্ন এক সম্প্রদায়েও নানারূপ মতভেদ ও তজ্জনিত বিদ্বেষ বর্ত্তমান ছিল। এখনও এক এক সম্প্রদায় হইতে কতরূপ বিরুদ্ধ-সূত্র প্রচারিত হইয়া ধর্ম্মবিশ্বাসের ইতিহাস জটিল করিতেছে। বিদ্যোন্মোদতরঙ্গিণীতে রামোপাসক ও শ্যামোপাসকের দ্বন্দ্ব বর্ণিত আছে, বটতলার কৃত্তিবাসী রামায়ণে সেইরূপ একটি কলহের অল্প মাত্রায় আভাস আছে,—

"এতেক মন্ত্রণা করি বিনতানন্দন।
পাখাতে করিল ঘর অদ্ভুত রচন॥
ভকতবৎসল রাম তাহার ভিতরে।
দাণ্ডাইলা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ ধরে॥
ধনুক ত্যজিয়া বাঁশী ধরিলেন করে।
হনূমান দেখে তবে ভাবিছে অন্তরে॥
হনূ বলে প্রাণপণে করি প্রভু হিত।
পক্ষীর সঙ্গেতে এত কিসের পীরিত॥
দেখিলেন হনূমান মহাযোগে বসি।
ধনু খসাইয়া পক্ষী করে দিল বাঁশী॥
হনূমান বলে পক্ষী এত অহঙ্কার।
ধনু খসাইয়া বাঁশী দিল আরবার॥
যদি ভৃত্য হই মন থাকে শ্রীচরণে।
লইব ইহার শোধ তোর বিদ্যমানে॥
বাঁশী খসাইয়া দিব ধনুঃশর করে।
লইব ইহার শোধ কৃষ্ণ অবতারে॥"

কৃত্তিবাসী রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড।

শ্রীচৈতন্যদেব এক রামোপাসককে শ্যামোপাসনায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

"ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তারে প্রশ্ন কৈল।
কহ বিপ্র এই তোমার কোন্ দশা হৈল॥
পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর লৈতে রামনাম।
এবে কেন নিরন্তর লও কৃষ্ণনাম॥
বিপ্র বলে এই তোমার দর্শনপ্রভাবে।
তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম স্বভাবে॥
বাল্যাবধি রামনাম গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল এইবার॥
সেই হতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাগ্রে বসিল।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে রামনাম দূরে গেল॥"

চৈ, চ, মধ্যমখণ্ড, ৯ম পঃ।

'এইরূপ বিভিন্ন উপাসকগণ তাঁহাদের মতানুযায়ী শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ও অনুরূপ গ্রন্থ ভাষায় বিরচিত করিয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে ধর্ম্মতত্ত্ব পৌঁছাইতে যত্নপর হইয়াছিলেন। আমরা অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ, কালিকাপুরাণ, গাড়ুরপুরাণ, এইরূপ প্রায় তাবৎ পুরাণেরই অতি প্রাচীন বঙ্গানুবাদ দেখিয়াছি। ধর্ম্মভিন্ন কোন জাতি বড় হয় নাই, ধর্ম্মভিন্ন কোন সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই।

প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম লইয়া দেশময় ভাবের বন্যা ছুটিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে জীব-হনন ব্যাপার একান্তরূপে নিষিদ্ধ হওয়াতে ভারতবর্ষে যুদ্ধস্পৃহা ক্রমে হ্রাস পাইতে লাগিল; হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বৌদ্ধভাব হিন্দুধর্ম্মের একাঙ্গীভূত হইয়া হিন্দুসমাজকে সাংসারিক উন্নতিবিষয়ে নিশ্চেষ্ট ও জিঘাংসাবৃত্তিবিরোধী করিয়া তুলিল। মায়াবাদে একান্তরূপে আশ্রয়পরায়ণ, বিষয়বিমুখ হিন্দুর শিথিল মুষ্টি হইতে পার্থিবসুখসম্ভোগে ব্রতী রণপটু মুসলমানগণ অতি সহজে তাঁহাদের দেশ অধিকার করিয়া লইতে সমর্থ হইল। অবশ্য শেষ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম* যে আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা উন্মূলিত হওয়াতে ভারতবর্ষকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই, সেই ধর্ম্ম ও ভারতের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু গৃহে গৃহে, প্রতি গৃহীর হৃদয়ে হৃদয়ে শ্রীরামচন্দ্র, সীতা ও সাবিত্রী-মূর্ত্তি অঙ্কিত হইল—আমাদের এই লাভ। কৃষ্ণভক্তিতে দেশ ডুবিয়া গেল। বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানে নরহৃদয়ে নবভাব অঙ্কুরিত হইল, তাই আমরা শ্রীচৈতন্যদেবকে পাইয়াছি। আমরা ধর্ম্মজগতে ক্ষতিগ্রস্ত নহি। ভারতবর্ষ অন্যদিকে লাভালাভের গণনা করে না। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে শাস্ত্রের দোহাই ভিন্ন অন্য কথা নাই। পুরুষদিগের ত কথাই নাই, স্ত্রীলোকগণও প্রতি কথায় শাস্ত্রের

* বৌদ্ধধর্ম্ম শেষ সময়ে নাস্তিকতাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যোন্মাদতরঙ্গিণীতে তাহাদের যুক্তি এই প্রকার বর্ণিত আছে ;—

নজির দেখাইতেন। ফুল্লরা ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছেন (ক, ক, চ), লহনা দ্বেষপরবশ হইয়া খুল্লনাকে স্বামীর গৃহে যাইতে নিষেধ করিলে, খুল্লনা কতকগুলি শাস্ত্রের নজির দেখাইয়া সপত্নীর তর্ককুহক দূর করিতেছে (ক, ক, চ), বিপুলাকে যখন তাঁহার ভ্রাতা স্বামীর শবত্যাগ করিতে বলিতেছে, তখন বিপুলা তদ্‌বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় নজিরসহ অকাট্য প্রমাণ দেখাইতেছে (হস্তলিখিত পদ্মপুরাণ), কর্ণসেন যখন রঞ্জাদেবীকে সন্তান না হওয়ার কষ্ট বিস্মৃত হইতে অনুনয় করিতেছেন, তখন স্ত্রী শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধরণে পরাঙ্মুখ হয় নাই (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, ৪র্থ সর্গ)।

এইরূপ অসংখ্য স্থলে দেখা যাইবে, শাস্ত্রচর্চ্চা সমাজের নিম্নতম স্তর, এমন কি, মহিলাগণের মধ্যেও প্রসারিত হইয়াছিল। নিরক্ষর কালকেতু ব্যাধ কংসনদীর জল পান করিয়া দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভাগবতের কথা

---

(১) "ন স্বর্গো নৈব জন্মান্তদপি ন নরকো নাপ্যধর্ম্মো ন ধর্ম্মঃ, কর্ত্তা নৈবাস্য কশ্চিৎ প্রভবতি জগতো নৈব ভর্ত্তা ন হর্ত্তা। প্রত্যক্ষান্যন্নমানং ন সকলফলভুগ্ দেহভিন্নোঽস্তি কশ্চিন্মিথ্যাভূতে সমস্তেঽপ্যনুভবতি জনঃ সর্ব্বমেতদ্বিমোহাৎ।"

অর্থ,—স্বর্গ নাই, জন্মান্তর নাই, নরক নাই, অধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম নাই, এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই, সংহারকর্ত্তা নাই, প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই। দেহ ভিন্ন পাপ পুণ্যাদি সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগী কোনও আত্মাদি নাই। এই মিথ্যাভূত অখিল সংসারে জীবগণ মোহবশতঃ এই সকল অনুভব করিয়া আসিতেছে।

(২) "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ পাপমাত্মপ্রপীড়নম্।
অপরাধীনতা মুক্তিঃ স্বর্গোঽভিলষিতাশনম্॥
স্বদারপরদারেষু যথেচ্ছং বিহরেৎ সদা।
গুরুশিষ্যপ্রণালীঞ্চ ত্যজেৎ স্বহিতমাচরন্॥"

অর্থ,—অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, আত্মপীড়নই পাপ, পরাধীন না হওয়াই মুক্তি, অভিলষিত দ্রব্য ভোজনই স্বর্গ। নিজ পত্নীতে ও পরদারে সততই যথেচ্ছ বিহার করিবে; আপনার হিতজনক আচরণ করিয়া গুরুশিষ্যপ্রণালী ত্যাগ করিবে।

(৩) "কা সৃষ্টৌ পরিদেবনা যদি পুনঃ পিত্রোরপত্যোদ্ভবঃ।
কুম্ভাদ্যাঃ প্রভবন্তি সন্ততমমী তত্তৎকুলালাদিতঃ॥"

অর্থ,—যখন মাতা পিতা হইতে পুত্র উৎপন্ন হইতেছে, আর সেই সেই কুম্ভকারাদি কর্ত্তৃক যখন নিরন্তর ঘটাদি উৎপাদিত হইতেছে, তখন সৃষ্টির জন্য ভাবনা কি আছে?

উল্লেখ করিতেছে, উহা কবির অস্বাভাবিক বর্ণনা হয় নাই। প্রাচীন সামাজিক জীবনের ভিত্তিভূমি শাস্ত্র, এবং প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ভিত্তিভূমি সংস্কৃত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

পুনরুত্থানে ব্রাহ্মণেতর জাতির উন্নতি।

কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণকে শীর্ষস্থানে স্থাপন করিয়া উত্থিত হয় নাই। যদিও ভাষাগ্রন্থ-গুলিতে অজস্র ব্রাহ্মণ-স্তব দৃষ্ট হয়, * যাঁহারা নব হিন্দুধর্ম্মের নেতা হইলেন, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন না। কবীর জোলাতাঁতি, রাইদাস চর্ম্মকার, দাদুপন্থীপ্রবর্ত্তক প্রসিদ্ধ দাদু ধুনরী, পীপা রাজপুত, ধনা জাট এবং সেন-পন্থীপ্রবর্ত্তক সেন † নাপিত ও তুকারাম শূদ্র ছিলেন। চৈতন্য সম্প্র-দায়ের অধিকাংশই ব্রাহ্মণেতর এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ নিকৃষ্ট জাতীয় ছিলেন। ‡ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মনিষ্ঠা সমস্ত হিন্দুজাতি হরণ করিয়া লইয়াছিল,

---

* "যাঁর ক্রোধে যদুকুল হইল নির্ব্বংশ।
যাঁর ক্রোধে নষ্ট হয় সগরের বংশ॥
যাঁর ক্রোধে কলঙ্কী হইল কলানিধি।
যাঁর ক্রোধে লবণ হইল সলিলধি॥
যাঁর ক্রোধে অনল হইল সর্ব্বভক্ষ।
যাঁর ক্রোধে ভগাঙ্গ হইল সহস্রাক্ষ॥" কাশীদাস।

ব্রাহ্মণের ক্রোধ এইরূপ!
পরীক্ষিৎ রাজা বলিতেছেন :—
"এই পোকা তক্ষক হউক এইক্ষণ।
দংশুক আমারে রহুক ব্রাহ্মণ বচন॥"
ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি এতদূর।

† সেন পূর্ব্বে বন্ধগড়ের (গন্দোয়ানার অন্তঃপাতী) রাজাদিগের কুলনাপিত ছিলেন। শেষে ধর্ম্মজগতে তাঁহার প্রতিপত্তি এতদূর বৃদ্ধি হয় যে, তিনি ও তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদি সন্তানেরা উক্ত রাজবংশের কুলগুরু হইয়া অতিশয় খ্যাতি ও প্রভুত্ব লাভ করিয়া-ছিলেন।—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, দ্বিতীয় ভাগ, ৬৫ সংখ্যা, ১৭৭০ শক, ১৭৯ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ প্রসিদ্ধ 'কড়চা' লেখক (পদকর্ত্তা নহেন) গোবিন্দ দাস কামার ছিলেন।
"বর্দ্ধমান কাঞ্চননগরে মোর ধাম।
শ্যামদাস পিতৃনাম, গোবিন্দ মোর নাম॥

তাই চর্ম্মকারও ধর্ম্ম-নেতা বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। মিস্ প্যারিঙ্গ্‌টন্ যেরূপ স্বীয় কুটীরের দিকে আটলাণ্টিক মহাসাগরকে অগ্রসর দেখিয়া সম্মার্জ্জনী হস্তে তাহার গতি রোধ করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইরূপ সমাজের গোঁড়াগণও এই ধর্ম্মপ্রবাহে সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞানবিস্তারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহারা শাস্ত্রানুবাদকারীদিগকে গালি দিয়া বলিয়াছিলেন,—"কৃত্তিবেসে, কাশীদেসে, আর বামুন ঘেঁষে, এই তিন সর্ব্বনেশে", * এবং সংস্কৃতে এই ভাবসূচক শ্লোক রচনা করিয়া ভাষা-সাহিত্য অঙ্কুরে নষ্ট করিতে চেষ্টিত ছিলেন, "অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।" কিন্তু তথাপি এই শাস্ত্রানুবাদ ও শিক্ষার স্রোত প্রতিরুদ্ধ হয় নাই।

রাজসভায় বঙ্গভাষার আদর।

পূর্ব্বে এক অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, এই সমস্ত প্রাচীন কাব্যের প্রায় সমস্তই গানের পালা ছিল। বঙ্গের বৈভবশালী ব্যক্তিগণ এই সব গানের আদর করিতেন; প্রত্যেক রাজসভাতেই সভা-কবি নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি স্বীয় পৃষ্ঠপোষক উৎসাহ-দাতার ধর্ম্মবিশ্বাসানুকূল্যে কাব্য রচনা করিতেন। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেখাইতে চেষ্টা করিব, গৌড়েশ্বরগণ বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনার্থ অনুবাদ-গ্রন্থগুলি প্রণয়নে শাস্ত্রজ্ঞ কবিদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। চণ্ডীকাব্য, অন্নদামঙ্গল ও শিবসংকীর্ত্তন-রচকগণও উৎসাহ লাভ করিয়াই কাব্যরচনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

অস্ত্র হাতা বেড়ি গড়ি জাতিতে কামার।
মাধবী নামেতে হয় জননী আমার॥"—কড়চা।

* Mahámahopádhyáya Hara Prasad Shastri's pamphlet on Old Bengali Literature, p. 13.

কিন্তু স্ববিক্রমে যাহা দাঁড়ায়, তাহার তুলনা নাই। বিষহরি ও চণ্ডীপূজার ন্যায় বৈষ্ণবগণের কীর্ত্তন ও ভজন অর্থপ্রদ কি সম্মানাস্পদ ছিল না।* নিম্ন শ্রেণীর সমাজই নবভাবের প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র। যে ভট্টাচার্য্যের দল রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ চৈতন্যপ্রভুর প্রবর্ত্তিত নবধর্ম্মের প্রতিকূলে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। চণ্ডীদাস জীবনে সৌভাগ্যশালী ছিলেন না ঢক্কানাদে তাঁহার কলঙ্ক প্রচারিত হইয়াছিল এবং তিনি সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন।† মহাপ্রভুর অনুচরগণও নানারূপ উৎপীড়ন ও নিন্দা সহ্য করিয়াছিলেন,‡ তথাপি তাঁহারাই প্রকৃতরূপে বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। সংস্কৃতের দাসত্ব হেতু বঙ্গসাহিত্য মুকুল-অবস্থায়ই শুষ্ক হইত, ইহার

বৈষ্ণবগণের কৃতকার্য্যতা।

---

* চৈতন্যপ্রভু শ্রীধরকে বলিতেছেন,—

"লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেন তুমি।
অন্ন বস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি॥"

এবং লাভজনক বিষহরি ও চণ্ডীপূজা অবলম্বনের উপদেশ দিতেছেন।—চৈ, ভা, আদি।

† "দুঃখের কথা কৈতে গেলে প্রাণ কাঁদি উঠে।
মুখ ফুটে বলতে নারি মরি বুক ফেটে॥
ঢাক পিটিয়ে অপবাদ গ্রামে গ্রামে দেয় হে।
চক্ষে না দেখিয়ে মিছে কলঙ্ক রটায় হে॥"

বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা, ৪০৬ গৌরাঙ্গাব্দ, ১৬ই মাঘ।

‡ "কেহ বলে এগুলার হইল কি বাই।
কেহ বলে রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই॥
কেহ বলে গোসাঞি রুষিবে এই ডাকে।
এগুলার সর্ব্বনাশ হৈবে এই পাকে॥
কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।
পরম ঔদ্ধত্যপানা কোন ব্যবহার॥
মনে মনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হয়।
বড় করি ডাকিলে কি পুণ্য উপজয়॥"—চৈ, ভা, মধ্যমখণ্ড।

ভট্টাচার্য্যগণ সর্ব্বদাই চৈতন্যপ্রভুকে বিদ্বেষ করিতেন; তাঁহারা পণ্ডিত হইয়াও প্রভুর মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন নাই, বৃন্দাবন দাস তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন;—

"মুরারি গুপ্তের দাস যে প্রসাদ পাইল।
সেই নদীয়ার ভট্টাচার্য্য না দেখিল॥—"চৈ, ভা, মধ্যমখণ্ড।

পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিত না; কিন্তু বৈষ্ণবগণ ইহার ভিত্তি দৃঢ় করিয়া সজীব করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত বঙ্গভাষা শিক্ষাভিমানীর উপেক্ষার বস্তু ছিল। কিন্তু যে দিন (১৫৩৭ শকে) সংস্কৃতভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত, অশীতিপর বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বহুবৎসরের চেষ্টায় চৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় অপূর্ব্ব দর্শনাত্মক ইতিহাস রচনা করেন, সেই দিন বঙ্গভাষার এক যুগ। আবার যে দিন শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর বাঙ্গালা 'পদামৃতসমুদ্রের' সংস্কৃতের টীকা প্রণয়ন করেন, বঙ্গভাষার সেই আর-এক যুগ। দেবভাষা বঙ্গভাষার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন, ইহা হইতে সেই যুগে এভাষার আর অধিক গৌরবের কথা কি হইতে পারিত?

চৈতন্যপ্রভুকে শাস্ত্রের বচন দ্বারা পরাভূত করিবার আশায়, এই মহাত্মাগণ তন্ত্ররত্না-করে কতকগুলি শ্লোক যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে আছে "বটুক ভৈরব একদা ভগবান্ গণদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ত্রিপুরাসুর হত হইলে, তাহার অসুর-তেজ নষ্ট হইয়াছিল, কি কোন রূপে বিদ্যমান ছিল?"

গণদেব উত্তর করিলেন,—

"স এষ ত্রিপুরোদৈত্যো নিহতঃ শূলপাণিনা।
রুষয়া পরয়াবিষ্ট আত্মানমকরোত্রিধা॥
শিবধর্ম্মবিনাশায় লোকানাং মোহহেতবে।
হিংসার্থং শিবভক্তানামুপায়ান সৃজদ্বহূন্॥
অংশেনাদ্যেন গৌরাখ্যঃ শচীগর্ভে বভূব সঃ।
নিত্যানন্দোদ্বিতীয়েন প্রাদুরাসীন্মহাবলঃ॥
অদ্বৈতাখ্যস্তৃতীয়েন ভাগেন দনুজাধিপঃ।
প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে বিজহার মহীতলে॥
ততো দুরাত্মা ত্রিপুরঃ শরীরৈস্ত্রিভিরাসুরৈঃ।
উপপ্লবায় লোকানাং নারীভাবমুপাদিশৎ॥"

ইহার সারার্থ এই, "ত্রিপুরাসুর মহাদেবের দ্বারা নিহত হইয়া শিবধর্ম্মনাশের জন্য গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত এই তিনরূপে আবির্ভূত হইলে, পরে নারীভাবে ভজনের উপদেশ দিয়া লোকসমূহকে মোহভাবে বশীভূত করিলেন।" ইহার পর এই ভাবের আরও অনেক নিন্দাবাদ আছে।

২। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ।

ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাহিত্য।

যাঁহারা টেন্, ডাউডন পড়িয়া বঙ্গভাষার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা একটি বিষয় মনে রাখিবেন; বিলাতী লিলি আর দেশী পদ্মে, জেসিমাইন আর জুঁইএ একটা প্রভেদ আছে; ইংরেজী ও বাঙ্গালী চরিত্রে সেইরূপ একটা প্রভেদ আছে; জাতীয় সাহিত্যেও সেই প্রভেদের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।

ইংরেজ কবির স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা।

ইংরেজী কবি চসার যে গীতি গাহিয়াছেন, স্পেন্সার তাহা স্পর্শ করেন নাই; আবার ক্যাণ্টারবারিটেল্স্ কি ফেয়ারিকুইনের সৌন্দর্য্যের ছায়াপাত প্যারাডাইস্‌লষ্টে লক্ষিত হয় না। এইরূপে জন ওয়েবষ্টার, ফোর্ড, বেনজনসন, চ্যাটারটন্, স্কট, শেলি প্রভৃতি কবিগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আদর্শে কাব্য রচনা করিয়াছেন; একজনের চিহ্নিত পথ অপর কবি অনুসরণ করেন নাই। এক জনের রাগিণীর সঙ্গে অন্যের রাগিণী জড়িত হইয়া যায় নাই। উদীয়মান স্বাধীন জাতির ব্যক্তি-গত স্বাবলম্বন একটি বিশেষ লক্ষণ।

বাঙ্গালী কবির অনুকরণ-প্রিয়তা ও তদ্দৃষ্টান্ত।

কিন্তু বাঙ্গালী কবিগণ পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবির পথ না দেখিয়া প্রায়ই অগ্রসর হয়েন নাই। অনুবাদ-গ্রন্থের আদি লেখক কৃত্তিবাস, সঞ্জয় কি মালাধর বসু হইতে পারেন, কিন্তু মৌলিক গ্রন্থগুলির তাবৎই পূর্ব্ববর্ত্তী কবির চেষ্টার পরে পুনশ্চ সেই চেষ্টার বিকাশ। আদি-কবি বলিয়া কাহাকেও নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত করা যায় না; এক কবির পূর্ব্বে আর এক কবি, তৎপূর্ব্বে অন্য এক জন, এই ভাবে একই কাব্যের রচনায় যুগ-ব্যাপী চেষ্টার বিকাশ দেখা যায়। আদি-কবি একজন মানিয়া লইলেও তিনি কল্পনাবলে গল্পের উৎপত্তি করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, সম্ভবতঃ তিনি লোক-পরম্পরা-শ্রুত আখ্যানটি

গীতে পরিণত করিয়াছেন। চণ্ডীকাব্যের আদি-লেখক কে, আমরা জানি না। চৈতন্যভাগবতকার মঙ্গলচণ্ডীর গীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন; আমরা দ্বিজ জনার্দ্দন নামক কবির অতি প্রাচীন এবং সংক্ষিপ্ত চণ্ডীর উপাখ্যান পাইয়াছি। বোধ হয় এইরূপ কোন মাল মসলা লইয়া মাধবাচার্য্য কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, মাধবাচার্য্যের উদ্যম মুকুন্দরাম পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের তপস্যার বলে নিজে অমর, বর লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের যশঃ হরণ করিয়াছেন। কবিকঙ্কণের পর লালা জয়নারায়ণ আবার সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। আমরা কাণা হরিদত্ত, নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া একুনে ৩১টি মনসাদেবীর গীতি-লেখক পাইয়াছি। কৃষ্ণরাম বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, পরে রামপ্রসাদ এবং তাঁহার পরে ভারতচন্দ্র সেই উপাখ্যানটি উৎকৃষ্ট কাব্যে পরিণত করেন। ভারতচন্দ্রের পর, পাগল প্রাণরাম তাঁহার দৃঢ় যশের দুর্গ বিজয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিমা গড়িতে পারেন নাই, ভেক গড়িয়াছিলেন।

দক্ষিণরায়ের উপাখ্যানের প্রথম কবি মাধবাচার্য্য, দ্বিতীয় কবি নিমতানিবাসী কৃষ্ণরাম। মৃগলুব্ধ রতিদেব দ্বারা বিরচিত হওয়ার পর, পুনশ্চ রঘুরাম রায় কবি সেই প্রসঙ্গে কাব্য রচনা করেন। ধর্ম্মমঙ্গলের কবি অনেক পাওয়া যাইতেছে, যথা,— রামাই পণ্ডিত, মানিক গাঙ্গুলী, সহদেব চক্রবর্ত্তী, মথুর ভট্ট, খেলারাম, রূপরাম, ঘনরাম প্রভৃতি। অনুবাদ গ্রন্থগুলিতেও এইরূপ বিবিধ হস্তের ক্রিয়া দৃষ্ট হয়; সঞ্জয়ের পর কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকরনন্দী, নিত্যানন্দ ঘোষ ও পরে কাশীদাস প্রভৃতি আরও বিবিধ কবি মহাভারতের অনুবাদ প্রণয়ন করেন। রামায়ণের কবি অসংখ্য, কিন্তু কৃত্তিবাসের আদি-গৌরব কেহই বিনষ্ট করিতে পারেন নাই। গুণরাজ খাঁর পথ অনুসরণ করিয়া মাধবাচার্য্য ও লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস প্রভৃতি অনেক কবিই ভাগবতের অনুবাদ রচনা করেন।

এইরূপ সমস্ত কবির নাম উল্লেখ করিতে গেলে বঙ্গীয় প্রায় সমুদায় প্রাচীন কবির কথাই বলিতে হয়। পরবর্ত্তী কবি প্রায় সব স্থলেই পূর্ব্ব-বর্ত্তী কবির রচনার খুঁৎ বাহির করিয়া কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। আমরা 'ভেলুয়া সুন্দরী' কাব্য ও কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গলের' ভূমিকা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া উদাহরণ দেখাইতেছি;—

"পুস্তকের কথা এই কর অবগতি।
যেরূপে রচিল এই ভেলুয়ার পুঁথি॥

ভগ্নীসুত নাম এক তজম্মুল আলি।
আছিল আমার জেন সবাকারে বলি॥

অল্পবুদ্ধি শিশু-মতি ছিল শিশুজ্ঞান।
না ছিল পণ্ডিত গুণী না ছিল বিদ্বান॥

লোকমুখে ভেলুয়ার গীত কথা শুনি।
রচিল পুস্তক প্রায় সেই সে কাহিনী॥

আপনার শিশুবুদ্ধি শক্তি যত ছিল।
অল্পমাত্র সেইরূপে পুস্তক রচিল॥

না ছিল পুস্তকে সেই পদের মিলন।
ভাটের কাহিনীরূপে আছিল গাঁথন॥

... ...

একদিন আছি আমি বসি নিজ স্থান।
হেনকালে বন্ধুগণ আসি বিদ্যমান॥

কহিল আমাকে সবে করিয়া মান্যতা।
ভেলুয়ার খণ্ডকাব্য রচিবার কথা॥

আদি অন্ত ভেলুয়ার যতেক কাহিনী।
বিরচিয়া কহ মিত্র আমি সব শুনি॥

গীতরূপে গায় সবে শুনিতে দুষ্কর।
না হয় সংযুক্ত কথা না মিলে অক্ষর॥

ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণরায়ের প্রতিমূর্ত্তি।

আর যে রচিল খণ্ড অল্প বাক্য তার।
স্পষ্টরূপে নাই স্থানে সমস্ত প্রচার॥
. . . . . .
অলভ্য সব বাক্য ধরি আমি শিরে,
'ভেলুয়া' নামেতে এই রচিল পুস্তক।"—

হামিদুল্লা প্রণীত "ভেলুয়া সুন্দরী।

"শুনহ সকল লোক অপূর্ব্ব কথন।
যেমতে হইল এই কবিতা রচন॥
খাসপুর পরগণা নাম মনোহর।
বড়িস্তা তথায় একতলা বিস্তর॥
তথায় গেলাম ভাদ্রমাস সোমবারে
নিশাকালে শুইলাম গোয়ালের গোলাঘরে॥
রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বাঘ পিঠে আরোহণ এক মহাজন॥
[illegible]র চারু [illegible] মহাকায়।
পরিচয় দিল মোরে ফকিরের [illegible]।
পাঁচালী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার।
আঠার ভাটীর মধ্যে হইবে প্রচার॥
পূর্ব্বেতে করিল গীত মাধব আচার্য্য।
না লাগে আমার মনে, তাহে নাহি কার্য্য॥
চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা।
মসান নাহিক তাহে, সাধু খেলে পাশা॥"—

কৃষ্ণরাম প্রণীত 'রায় মঙ্গল'।

এই পুচ্ছগ্রাহিতা বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের সূত্র। নূতন পথে লেখনী প্রবর্ত্তিত করিবার অধিকার আছে, প্রাচীন কবিগণ, বোধ হয়, একথা স্বীকার করিতেন না। তাই তাঁহারা কল্পনার পুষ্পকরথারোহী হইয়া মেঘ হইতে নূতন নূতন হ্যাডি কি ডোনাঞ্জলিয়া সংগ্রহ করিয়া

বেড়ান নাই। ধর্ম্মের বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধগতি কল্পনা অন্য জগতের পুষ্পপল্লব লক্ষ্যে ধাবিত হইতে পারে নাই। একথা প্রশংসনীয় হউক, কিন্তু যখন বিদ্যাসুন্দরের মত কাব্যকেও বিল্বপত্র এবং তুলসীদল দ্বারা শোধন করিয়া লওয়ার চেষ্টা দেখিতে পাই, তখন ধর্ম্মের গণ্ডী অনেকদূর প্রসারিত হইয়াছিল, একথা অবশ্যই মানিতে হইবে।

বাঙ্গালা প্রাচীন কাব্যের এখনও ভালরূপ খোঁজ হয় নাই। আমরা যাঁহাদিগকে আদিকবির যশোমাল্য দিতেছি, তাঁহারাই আদি কি না, ঠিক বলা যায় না, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের দ্বারা এই প্রাচীন ক্ষেত্রের আবাদ হইলে, তাঁহাদের চেষ্টা ও গবেষণার হলাগ্রভাগে নূতন কবির কঙ্কাল প্রকাশ পাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র লইবে না।

কাব্যের অংশ রচনায় অনুকরণ-বাহুল্য।

বড় নদীতে যে নিয়ম, ক্ষুদ্র জল-রেখায়ও তাহাই; সৌর-জগতে যে নিয়ম, গৃহশীর্ষস্থ অলাবুলতার চক্রেও সেই নিয়ম দৃষ্ট হয়। কেবল বড় বড় কাব্যগুলিতে নহে, কাব্যের অংশগুলিতেও সেই অনুকরণ-বৃত্তির পরিচয় লক্ষিত হয়। একটি উৎকৃষ্ট ভাব পাইয়া কবিকে প্রশংসা করার পথ নাই; কোন্ কবি সেই ভাবের আদিপ্রণেতা, সে প্রশ্ন সহজে মীমাংসিত হইবার নহে। আমরা প্রতি চণ্ডীকাব্যেই ফুল্লরা ও খুল্লনার 'বারমাস্যা' পাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত বিজয়গুপ্তের 'পদ্মপুরাণে' পদ্মাবতীর 'বারমাস্যা', পদকল্পতরুতে বিষ্ণুপ্রিয়ার 'বারমাস্যা' (১৭৮৩ পদ), বিদ্যা-সুন্দরগুলিতে বিদ্যার 'বারমাস্যা', সৈয়দ আলওয়াল কবির পদ্মাবতীতে নাগমতীর 'বারমাস্যা', "মুরারি ওঝার নাতি" শ্রীধর প্রণীত রাধার 'বারমাস্যা', সেক কমরালী বিরচিত রাধার 'বারমাস্যা', সেক জালাল প্রণীত সখীর 'বারমাস্যা' * এইরূপ রাশি রাশি 'বারমাস্যার' সঙ্গে প্রাচীন

* শেষোক্ত তিনটি "বারমাস্যা" চট্টগ্রামের স্কুলমাষ্টার, 'আলো' প্রভৃতি পত্রিকার লেখক শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহেবের নিকট সংগৃহীত আছে।

বঙ্গসাহিত্যের ঘাটে পথে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। যেখানে একটী সুন্দর ভাব পাওয়া গিয়াছে, তৎপরেই উহা উপর্য্যুপরি কবিগণের চেষ্টায় তন্তুসার হইয়াছে। বিদ্যাপতির,—"না পুড়িও মোর অঙ্গ না ভাসাও জলে। মরিলে রাখিও বাঁধি তমালের ডালে॥ কবহুঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে। পরাণ পায়ব হাম পিয়া দরশনে॥" এই কবিতার ভাবটি রাধামোহন ঠাকুর,—"এ সখি কর তহুঁ পর উপকার। ইহ বৃন্দাবনে দেহ উপেখব, মৃত তনু রাখবি হামার॥ কবহুঁ শ্যাম তনু পরিমল পাওব, তবহুঁ মনোরথ পুর।" (পদকল্পতরু, ৪৬ পদ) যতুনন্দন দাস— "উত্তর কালে এক করিহ সহায়। এই বৃন্দাবনে যেন মোর তনু রয়॥ তমালের কাঁধে মোর ভুজ-লতা দিয়া। নিশ্চয় করিয়া তুমি রাখিহ বাঁধিয়া॥ কৃষ্ণ কভু দেখিলেই পূরিবেক আশ।" (পদকল্পতরু ১৮৬ পদ). নরহরি (ঘনশ্যাম),—"করিহ উত্তরকালে ক্রিয়া। রাখিহ তমালে তনু যতনে বাঁধিয়া॥ লেহ এ ললিতা মণিহার। অনুখণ গলায় পরিহ আপনার॥ রূপিনু মল্লিকা নিজ করে। গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইহ তারে॥ তোমরা কুশলে সব রৈয়ো। এই বনে বারেক আসিতে তারে কৈয়ো॥ নরহরি কৈরো এই কাম। সে সময়ে কাণে শুনাইও তাঁর নাম।" (সাহিত্যপত্রিকা, ৩য় ভাগ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১২৯৯) কৃষ্ণকমল,—"দেহ দাহন ক'র না দহন দাহে। ভাসা'ও না তাহা যমুনা প্রবাহে। আমার শ্যামবিরহে পোড়া তনু, আমার শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসের দেহ—সব সহচরী, দুটি বাহু ধরি, বাঁধিও তামালের ডালে। যদি এই বৃন্দাবন স্মরণ করি, আসে গো আমার প্রাণের হরি, বঁধুর শ্রীঅঙ্গসমীর পরশে শরীর জুড়াইব সেই কালে।" কবিশেখর,—"কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে, একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে। নিকুঞ্জে রাখিনু এই মোর হিয়ার হার, পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার।" (প, ক, ত, ১৬৭৯ পদ, সতীশ বাবুর সংস্করণ, ১২১৪ পৃষ্ঠা।) অজ্ঞাত আর একজন কবি,— "সখি প্রাণ যদি দেহ ছাড়ে, না দহ বহ্নিতে মোরে, ভাসায়ো না যমুনা সলিলে। তুলসীদাম বিছাইয়ে, চন্দন তাহে লেপিয়ে, লিখিয়ো তাহায় হরির নাম, বাঁধিয়া রেখো সখি তমালের ডালে" ("সাহিত্য", মাঘ, ১৩০২, ৬৫৬ পৃষ্ঠা।) এবং ত্রিপুরার প্রাচীন এক কবি—"আমি ম'লে এই করিও, না পোড়ায়ো না ভাসায়ো" ইত্যাদি পদে নকল করিয়াছেন। জয়দেবের,—"হৃদি বিসলতা হারো নায়ং ভুজঙ্গম নায়কঃ।" ইত্যাদি শ্লোক হইতে বিদ্যাপতি,—"হাম নহ শঙ্কর হুঁ বরনারী," ও রামবসু "হর নই হে

আমি যুবতী। কেনে জ্বালাতে এলে রতিপতি॥ করো না আমার দুর্গতি। বিচ্ছেদে লাবণ্য, হয়েছে বিবর্ণ, ধরেছি শঙ্করের আকৃতি॥ ক্ষীণ দেখে অঙ্গ, আজ অনঙ্গ, একি রঙ্গ হে তোমার। হর ভ্রমে শরাঘাত, কেন করিতেছ বার বার॥ ছিন্ন ভিন্ন বেশ, দেখে কও মহেশ চেননা পুরুষ প্রকৃতি। কণ্ঠে কালকূট নহে, দেখ পরেছি নীল রতন। অরুণ লোচন, ক'রে পতি বিরহে রোদন। এ অঙ্গ আমার, ধুলায় ধূসর, মাখি নাই বিভূতি।" (বিদ্যাপতি, ৮ জগদ্বন্ধু ভদ্রের সংস্করণ, ১৫৫— ১৫৬ পৃঃ।) গানের ভাব চুরি করিয়াছেন। অপর একটি সংস্কৃত শ্লোক হইতে কবি-শেখর, "নিজ কর পল্লব দেহ না পরশই শঙ্কর পঙ্কজ ভানে। মুকুরতলে নিজ মুখ হেরি সুন্দরী শশি বলি হেরই গগনে॥" (পদকল্পতরু, ১৮৭১ পদ) চুরি করিয়াছেন ; চোরের উপর বাটপাড় কৃষ্ণকমল উহা হইতে "প্যারী হেরি নিজ করে, নখর নিকরে, ভেবে শশী করে আবরণ করে" (দিব্যোন্মাদ) ইত্যাদি গানটি প্রস্তুত করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের—"এখন কোকিল আসিয়া করুক গান, ভ্রমর ধরুক তাহার তান, মলয় পবন বহুক মন্দ, গগনে উদয় হউক চন্দ।" (রমণীমোহন মল্লিকের সংস্করণ, ২২২ পৃষ্ঠা।) পরে বিদ্যাপতির "সোহি কোকিল অব লাখ ডাকউ, লাখ উদয় করু চন্দা। পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হউ, মলয় পবন বহু মন্দা। এবং পরে মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে—"আজি মোর মন্দিরে আওবে কালা, কি করিবে চাঁদ পবন অলি কোকিলা। (মা, চ, ২৪৬ পৃঃ) প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে। ইহা ইংরেজীর Parallel passage অর্থাৎ অনুরূপ-রচনা নহে, ইহা সাহিত্যের ঘরে দিনে-দুপরে ডাকাতি।

আমরা এই প্রবন্ধাংশে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, কতকগুলি ধর্ম্ম-প্রসঙ্গের সীমা-বন্ধনীতে বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিভা আবদ্ধ ছিল। যে পর্য্যন্ত কোন একখানি কাব্যের সম্পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন যুগের কবিগণ ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করিয়া তাহা প্রস্ফুট করিয়াছেন। সম্পূর্ণ কাব্য এবং কাব্যান্তর্গত বিচ্ছিন্ন ভাবরাশি উভয়ই এইরূপ ক্রমে ক্রমে বিকাশ পাইয়াছে। কিন্তু বিকাশই সর্ব্বত্র প্রকৃতির নিয়ম নহে। উদ্যানের কতকগুলি ফুল ফোটে, আবার কোন কোনটি কোরকেই শুষ্ক হয়। সেইরূপ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কেতকা দাস ও ক্ষেমানন্দের মনসার

ভাসান, ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি সম্পূর্ণ কাব্যগুলির পার্শ্বে সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শনির পাঁচালী, ধান্যপূর্ণিমা ব্রত-গীতি প্রভৃতি অসংখ্য খণ্ডকাব্য দৃষ্ট হয়, সে গুলিতে উদ্গম আছে, বিকাশ নাই। আকরে খাঁটি স্বর্ণের পার্শ্বে, ঈষৎস্বর্ণে পরিণত লোষ্ট্রখণ্ড যেরূপ দেখায়, চণ্ডীকাব্য, পদ্মপুরাণ প্রভৃতির পার্শ্বে এইগুলি সেইরূপ দেখায়।

অনুকরণের দোষ ও গুণ।

কাব্যগুলির সম্পর্কে এই অনুকরণবৃত্তি নিন্দনীয় কি প্রশংসনীয় ঠিক বলিতে পারি না। তবে বোধ হয় ক্রমে ক্রমে গঠিত প্রাচীন বঙ্গীয় প্রত্যেক কাব্যেই নিপুণতা ও অভিনিবেশযুক্ত সৌন্দর্য্য অধিক লক্ষিত হয়। দোষ এই, এই সব কাব্যে স্বাধীনতার বায়ু বহে নাই, কল্পনার উন্মাদকর স্বপ্ন কিম্বা উদ্দাম ও সহজ স্ফূর্ত্তিময়ী চিন্তার আবেশ নাই। কাব্যগুলির প্রায় সমস্ত পুরুষ-চরিত্রই সমাজের কঠিন নিয়মের বশবর্ত্তী, বিপদের সময় স্বীয় চেষ্টা ব্যবহারে অনিচ্ছুক—অলৌকিক দৈব শক্তির উপর অনুচিত বিশ্বাস-পরায়ণ। যে জাতির শাসনে দাসত্ব, চিন্তায় দাসত্ব, সমাজে দাসত্ব, তাহাদের সাহিত্যে অন্যরূপ হইবে কেন? আমরা যাহা, তাহা ভুলিব কিরূপে? স্বপ্রকৃতি হইতে তাহা মুছিয়া ফেলিব কিরূপে?

বৈষ্ণবগীতির স্বাধীনভাব

কিন্তু সদ্যঃ প্রস্ফুটিত পুষ্পবাসের ন্যায় বৈষ্ণবীয় গীতি-রাশি, একটি স্বাধীন মুগ্ধকর ভাব-জাত। সেই ভাবের নাম প্রেম। 'লম্বোদর', 'নাভি সুগভীর', ও 'আজানুলম্বিতবাহু'র ন্যায় রাশি রাশি সংস্কৃতের আবর্জ্জনা বঙ্গসাহিত্য কলুষিত করিয়াছিল। সদ্যোজাত এই ভাবটি অপ্রকৃত উপমা রাশির স্থলে "শীতের ওঢ়নী পিয়া, গিরিষীর বা, বরষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না॥" (বিদ্যাপতি) প্রভৃতি প্রকৃত কথা জাগাইয়া দিল। জয়দেব শ্রীহরিকে দিয়া যে দিন "দেহি পদপল্লবমুদারং" গাওয়াইয়াছিলেন, সেদিন সমাজ-সংস্কারে প্রাণ-হারা যন্ত্র-প্রায় মানুষ দাঁতে জিভ কাটিয়া একটি দৈবঘটনা দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা

করিয়াছিল ; কিন্তু জ্ঞানদাস যে দিন "নিদঁ যায় চাঁদবদন শ্যাম-অঙ্গে দিয়া পা" (পদকল্পতরু ১১০০ পদ)" ও কৃষ্ণকমল "অতুল রাতুল কিবা চরণ দুখানি, আল্‌তা পরাত বঁধু কতই বাথানি" (দিব্যোন্মাদ) রচনা করিয়াছিলেন, সেদিন আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না। জাতীয় জীবনে প্রেম ফিরিয়া আসিয়াছিল ; তাই বলিতেছিলাম, এই অধীনত্ব-গন্ধী প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণবীয় পদে স্বাধীনতার বায়ু খেলা করিতেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—*++*—

গৌড়ীয় যুগ।

অথবা

শ্রীচৈতন্য-পূর্ব্ব সাহিত্য।

১। 'পঞ্চগৌড়'।

২। অনুবাদ-শাখা।

৩। লৌকিক ধর্ম্ম-শাখা।

৪। পদাবলী-শাখা।

৫। কাব্যেতিহাসের সূত্রপাত-শাখা।

পঞ্চগৌড়।

মুসলমান-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বপর্য্যন্ত ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তর-বর্ত্তী ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের পশ্চিম-স্থিত বৃহৎ ভূভাগ—সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল এই পঞ্চ ভাগে বিভক্ত ছিল; এই পঞ্চবিভাগের সাধারণ নাম ছিল, 'পঞ্চগৌড়'। এই নাম গৌড়দেশেরই প্রভাব-ব্যঞ্জক, বস্তুতঃ গৌড়-দেশ অতি প্রাচীন রাজ্য।* পূর্ব্বোক্ত পঞ্চরাজ্য ভিন্ন ভিন্ন রাজাদিগের

---

* গৌড়ের রাজধানী ৭৩০ খৃঃ পূঃ অব্দে স্থাপিত হয়। ইহাকেই বোধ হয় টলেমি 'গঙ্গারিজিয়া' সংজ্ঞায় বাচ্য করিয়াছেন। উক্ত সময়ে এই দেশ করতোয়া ও গঙ্গা দ্বারা বিভক্ত হইয়া পশ্চিমাংশ গৌড় ও পূর্ব্বাংশ বঙ্গদেশ বলিয়া খ্যাত ছিল। একরাজার শাসনাধীন থাকা হেতু এই দুই অংশ কালে 'গৌড়দেশ'—এই সাধারণ নামে অভিহিত হইত। মোগল রাজাদিগের সময় গৌড় ও বঙ্গদেশ 'বাঙ্গালা' নাম গ্রহণ করে। Major Rennel's Map of Hindoostan দেখ।

শাসনাধীন ছিল, কিন্তু সমধিক পরাক্রান্ত রাজা, সেকসনদিগের 'বৃটওয়াল্ডার' ন্যায় গর্ব্ব-পূর্ণ 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ করিতেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউনসাঙ্ শিলাদিত্য মহারাজকে এই 'পঞ্চ গৌড়েশ্বর' উপাধিবিশিষ্ট দর্শন করিয়া যান। * গৌড়দেশীয় রাজগণ অনেকবার এই গর্ব্বিত উপাধি লাভ করিয়াছিলেন; খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে কিরণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্কগুপ্ত কান্যকুব্জাধিপতি রাজ্যবর্দ্ধনকে যুদ্ধে জয় করিয়া নিহত করেন। বৌদ্ধরাজাদিগের মধ্যে গোপাল, দেবপাল ও জয়পাল সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত জয় করেন। ইঁহারা এতদূর ক্ষমতাশালী ছিলেন যে, পঞ্জিকায় কলি-যুগের রাজচক্রবর্ত্তীদিগের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের নামও উল্লিখিত দেখা যায়। বলা বাহুল্য ইঁহারাই 'পঞ্চ গৌড়েশ্বর' উপাধির প্রকৃত রূপে বাচ্য ছিলেন। এই গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহই বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির প্রথম কারণ। বঙ্গভাষার প্রাচীন গীতি-সমূহে 'পঞ্চ গৌড়েশ্বর' সংজ্ঞা অনেক স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু বোধ হয়, কালক্রমে কবি ও স্তুতি-জীবিগণের দ্বারা এই উপাধির অর্থচ্যুতি ঘটিয়াছিল।

কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ব্রাহ্মণগণ প্রথমতঃ ভাষা-গ্রন্থ প্রচারের বিরোধী ছিলেন। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে ইঁহারা 'সর্ব্বনেশে' উপাধিপ্রদান করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ পুরাণ অনুবাদকগণের জন্য ইঁহারা রৌরব নামক নরকে স্থান নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। এদিকে গৌড়েশ্বর-গণের সভায় সংস্কৃত পুরাণ পাঠ ও 'ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমল মলয়সমীর'-এর ন্যায় পদাবলী প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইত। সেখানে 'তৈলাধার পাত্র' কিংবা 'পাত্রাধার তৈল' প্রভৃতি ন্যায়ের কূট মীমাংসিত হইত; এবং নৈষধাদি কাব্যের অলঙ্কাররহস্য ও দর্শনের সূক্ষ্মগ্রন্থি

* বিল (Beal) সাহেব-কৃত হিউনসাঙের ভ্রমণবৃত্তান্তের অনুবাদে 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' শব্দের স্থলে "Lord of the Five Indies" দৃষ্ট হয়।

মোচনের জন্য বুদ্ধিজীবিগণ সর্ব্বদা তৎপর থাকিতেন। এই সমৃদ্ধ সভাগৃহে বঙ্গভাষা কি প্রকারে প্রবেশ লাভ করিল? ব্রাহ্মণগণ ইহাকে কিরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা কি কারণে এই ভাষার প্রতি সদয় হইয়া উঠিলেন?

আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মুসলমানগণ ইরাণ, তুরাণ প্রভৃতি যে স্থান হইতেই আসুন্ না কেন, এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা হিন্দু-প্রজামণ্ডলী পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মসজিদের পার্শ্বে দেবমন্দিরের ঘণ্টা বাজিতে লাগিল; মহরম, ঈদ, সবেবরাৎ প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাস, দোলোৎসব প্রভৃতি চলিতে লাগিল। রামায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব্ব প্রভাব মুসলমান সম্রাটগণ লক্ষ্য করিলেন। এদিকে দীর্ঘকাল এদেশে বাসনিবন্ধন বাঙ্গালা তাঁহাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িল। হিন্দুদিগের ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি জানিবার জন্য তাঁহাদের পরম কৌতূহল হইল।

গৌড়ের সম্রাটগণের প্রবর্ত্তনায় হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হইল। গৌড়েশ্বর নসির খাঁ ১৩২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; তাঁহার রাজ্যকাল ৪০ বৎসর ব্যাপক ছিল। এই মহাত্মা মহাভারতের একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন। সেই মহাভারতখানি এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই; কিন্তু পরাগল খাঁর আদেশে অনূদিত পরবর্ত্তী মহাভারতে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।* কবি বিদ্যাপতিও এই

---

* "শ্রীযুক্ত নায়ক সে যে নসরত খান।
রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান"—কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

নসিরা শাহ * এবং গৌড়েশ্বর 'প্রভু গয়সউদ্দিন সুলতানে'র প্রশংসা করিয়াছেন। নসির খাঁ যে প্রেমবিষয়ক সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন, বিদ্যাপতির পদে তাহার আভাস আছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ গৌড়েশ্বরের আদেশে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই গৌড়েশ্বর সম্ভবতঃ রাজা গণেশ ছিলেন; কিন্তু ভাষায় শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ করিবার যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা মুসলমান সম্রাটগণের দৃষ্টান্তানুযায়ী। কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভা বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষরূপে মুসলমান-প্রভাব-চিহ্নিত ছিল; অমাত্যের খাঁ উপাধিতেই তাহা দৃষ্ট হয়। হুসেন শাহ কুলীন-গ্রামবাসী মালাধর বসুকে ভাগবতের অনুবাদ রচনায় নিযুক্ত করেন, এবং উক্ত কবি ভাগবতের দশম ও একাদশ অধ্যায় সুচারুরূপে অনুবাদ করিলে তাঁহাকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি প্রদান করেন। সম্রাট হুসেন সাহের প্রশংসা-সূচক অনেক কবিতা বাঙ্গালা প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের কাব্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়।† হুসেন শাহের প্রধান সেনাপতি পরাগল খাঁ পূর্ব্ববঙ্গ বিজয় করিতে প্রেরিত হন। ইনি চট্টগ্রামে আসিয়া মগদিগকে দমন করেন এবং নোয়াখালি জেলায় একখানি গ্রাম পত্তন করিয়া তাহাতে বসবাস করেন। এই গ্রামের নাম পরাগলপুর। পরাগলপুরে খাঁ সাহেবের বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান আছেন। পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক কবি স্ত্রী-পর্ব্ব পর্য্যন্ত সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ রচনা করেন। পরাগল খাঁর

---

* "সে যে নসিরা সাহ জানে। যারে হানিল মদন বাণে॥
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে।"

† (১) কবীন্দ্র পরমেশ্বর ইঁহাকে 'কৃষ্ণের অবতার' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লিখিত আছে, ইনি চৈতন্যের একজন ভক্ত হইয়াছিলেন।

(৩) "সনাতন হুসেন সাহ নৃপতি তিলক"—বিজয়গুপ্ত।

(৪) 'সাহ হুসন, জগতভূষণ, সেহ এহি রস জানে। পঞ্চ গৌড়েশ্বর, ভোগ পুরন্দর, ভণে যশোরাজ খানে॥'

পুত্র ছুটিখাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী নামক জনৈক কবি অশ্বমেধ-পর্ব্বের অনুবাদ সঙ্কলন করেন। এই পুস্তকে ছুটিখাঁর প্রতাপ সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"ত্রিপুর নৃপতি যার ভয়ে এড়ে দেশ।
পর্ব্বতে গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ॥"

এই সকল অনুবাদপুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রাজকার্য্যাবসানে মুসলমান সম্রাটগণ পাত্র-মিত্র পরিবেষ্টিত হইয়া হিন্দুশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কবি আলওয়াল আরাকান-রাজের প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের আদেশে তাঁহার বিখ্যাত পদ্মাবতী কাব্যের অনুবাদ রচনা করেন। মাগন ঠাকুর নাম দেখিয়া জাতি ভুল করিবার আশঙ্কা আছে, সুতরাং বলা উচিত, মাগন ঠাকুর মুসলমান ছিলেন। সোলেমান নামক অপর জনৈক মুসলমান বড়লোকের আদেশে একখানি পার্শী গল্পপুস্তকের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করেন; দৌলত কাজি নামক অপর একজন কবি পূর্ব্বোক্তভাবের আশ্রয় লাভ করিয়া 'লোর চন্দ্রাণি' নামক কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

সুতরাং মুসলমান সম্রাট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যই রাজদ্বারে দীনাহীনা বঙ্গভাষার প্রথম আহ্বান পড়িয়াছিল। গৌড়েশ্বরগণ যে ভাষাকে উৎসাহ প্রদান করিলেন হিন্দুরাজগণ তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। সম্রাটগণের দৃষ্টান্ত পল্লীর জমিদারগণ পর্য্যন্ত অনুসরণ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালাভাষা এইভাবে হিন্দুরাজসভায় প্রতিপত্তি লাভ করিল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ অনন্যগতি হইয়া ইহার পরিচর্য্যায় লাগিয়া গেলেন।

সুতরাং আমরা জগদানন্দের সঙ্গে কবি ষষ্ঠীবরের, * রঘুনাথদেবের

---

* "অমৃত লহরী ছন্দ, পুণ্য ভারতের বন্ধ, কৃষ্ণের চরিত্র শেষ পর্ব্বে।
শ্রীযুত জগদানন্দে, অহর্নিশ হরি বন্দে, কবি ষষ্ঠীবর কহে সর্ব্বে॥"—
সঞ্জয় বে, গ, পুঁথি, ৭৮৯ পত্র।

সঙ্গে মুকুন্দরামের, যশোমন্ত সিংহের সঙ্গে শিবসংকীর্ত্তন-লেখক রামেশ্বরের*, বিশারদের সঙ্গে অনন্তরামের†, কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের, মাগনঠাকুরের সঙ্গে কবি আলওয়ালের‡ ও রাজা জয়চন্দ্রের সঙ্গে ভবানী দাসের§ অন্যান্য বহুসংখ্যক কবি ও তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম একত্র পাইয়াছি। রাজমালায় দৃষ্ট হয়, ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ (২য়) ধর্ম্মমাণিক্য মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়াছিলেন। গজদন্ত সুবর্ণজড়িত হইলে যে শোভা হয়, ধন ও জ্ঞান-মর্য্যাদার এই যোগ তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

আমরা আশা করি, পাঠকগণ এখন বুঝিতে পারিলেন, আমরা কেন এই অধ্যায় 'গৌড়ীয় যুগ' সংজ্ঞায় অভিহিত করিলাম। পঞ্চগৌড় এবং পঞ্চগৌড়েশ্বরের উল্লেখ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। মালাধর বসু ভাগবতের অনুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—নির্গুণ অধম মুঞি, নাহি কোন গ্রাম। গৌড়েশ্বর দিল নাম গুণরাজ খান॥' পরাগলী মহাভারতে—'নৃপতি হুসেন সাহ হয় মহামতি। পঞ্চ গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥' (কবীন্দ্র বে, গ, পুঁথি, ১ম পত্র)। উক্ত মহাভারতে—'প্রিয়পাত্র তাহান বিখ্যাত ছুটি খান। পঞ্চম গৌড়েতে যার নামের বাখান॥' (কবীন্দ্র বে, গ, ২২৭ পত্র)। মাধবাচার্য্যের চণ্ডীকাব্যে—'পঞ্চগৌড় নামে দেশ পৃথিবীর সার। একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥' (মাধবাচার্য্যের চণ্ডী, চট্টগ্রামের সংস্করণ, ৮ পৃষ্ঠা) ও অন্যান্য নানা পুস্তকে

---

* "যশোমন্ত, সবগুণবন্ত, তস্য পোষ্য রামেশ্বর, তদাশ্রয়ে করি ঘর, বিরচিল শিবসংকীর্ত্তন।"—রামেশ্বরের শিবসংকীর্ত্তন।

† "বিশারদ পদে সেই রেণু অভিপ্রায়। পদবন্ধে রচিলেক প্রথম অধ্যায়॥"—
অনন্তরামকৃত ক্রিয়াযোগসার, হস্তলিখিত পুঁথি।

‡ বিরহ মত্তমাতঙ্গ, বহুল বাহিনী সঙ্গ, হরি দরশনে, অঙ্গ পরশনে, সসৈন্য হইল ভঙ্গ। অতি রসিক সুজন, রূপ জিনি পঞ্চবাণ, শ্রীযুত মাগন, আরতি কারণ, হীন আলাওলে ভণে।—পদ্মাবতী, ২০৪ পৃঃ।

§ "কহেন ভবানী দাস, শ্রীরামের পদে আশ, জয়চন্দ্র রাজার বচনে।" লক্ষ্মণদিগ্বিজয়, রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্করণ, (২৮৫ নং অপার চিৎপুর রোড) ১২২ পৃঃ।

পঞ্চ গৌড়ের গৌরব কীর্ত্তিত দেখিতে পাইতেছি। কৃত্তিবাস আত্মবিবরণে লিখিয়াছেন,—'পঞ্চ গৌড় চাপিয়া যে গৌড়েশ্বর রাজা। গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥' গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহে যে ভাষার মুখবন্ধ হইয়াছিল, তাহা 'গৌড়ীয় সাধু-ভাষা' আখ্যায় পরিচিত হইয়াছিল।

২। অনুবাদ-শাখা—(ক) কৃত্তিবাস।

ভাষার ভিত্তি দৃঢ় করিতে প্রথমতঃ অনুবাদ গ্রন্থেরই আবশ্যক। গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহে বঙ্গভাষার আদিকালে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত গ্রন্থের অনুবাদ রচিত হইয়াছিল। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর আরও কতকগুলি প্রাচীন পুঁথিতে তাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে,—সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত একখানি পুঁথিতেও আমরা এই বিবরণটি পাইয়াছি। এস্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত বলা উচিত যে, স্বর্গীয় হারাধন দত্ত মহাশয়ই আমার বিশেষ আগ্রহ নিবন্ধন তাঁহার স্বীয় কৃত্তিবাসী রামায়ণের একখানি প্রাচীন পুঁথি খুঁজিয়া এই আত্মবিবরণ আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে উহা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম,—ইহার রচনা ও ভাব অতি সুন্দর, স্বভাবের প্রতিবিম্বের ন্যায়; ইহা যিনি একবার পড়িবেন তাঁহাকেই বিশ্বাস করিতে হইবে, এটি একখণ্ড খাঁটি ঐতিহাসিক স্বর্ণ। এই আত্মবিবরণে যে বেদানুজ রাজার বিষয় উল্লিখিত দৃষ্ট হয়, তিনি কে তৎসম্বন্ধে কিছু জানা যায় নাই, তবে কৃত্তিবাসের পূর্ব্বপুরুষ উল্লিখিত নৃসিংহ ওঝার পিতামহ উধো দনৌজামাধব রাজার সভাসদ ছিলেন, তাহা কুলজীগ্রন্থে পাওয়া যায়, দনৌজামাধব ১২৮০—১৩৮০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন, কৃত্তিবাস উধো হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ, সুতরাং ১২৮০ হইতে ২০০ শত বৎসর পরে কৃত্তিবাসের প্রৌঢ়াবস্থা

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ আলোচনা।

ধরা যাইতে পারে। ১৪০৭ শকে রচিত ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী গ্রন্থে "কৃত্তিবাসঃ কবির্ধীমান্ সাম্যো শান্তিজনপ্রিয়ঃ।" এই ভাবের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র মালাধর খানকে লইয়া ১৪৮০ খৃঃ অব্দে মালাধরী মেল প্রবর্ত্তিত হয়, এই সময়ে কৃত্তিবাসের বিদ্যমান থাকা সম্ভব; কৃত্তিবাস যে রাজার সভায় উপস্থিত ছিলেন, ইনি তাহিরপুরের প্রসিদ্ধ রাজা কংসনারায়ণ,—ইনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিতেছিলেন। নিম্ন বিবরণোল্লিখিত জগদানন্দ ইঁহার ভাগিনেয়, তাঁহার পিতা শ্রীকৃষ্ণ এই রাজার মহাপাত্র ছিলেন এবং তৎসভায় যে মুকুন্দ "পণ্ডিত প্রধান" বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, তিনি সম্ভবতঃ উক্ত শ্রীকৃষ্ণের পিতা মুকুন্দ ভাতুড়ী হইবেন। ইঁহারা সকলেই বারেন্দ্রকুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। নৃসিংহ ওঝা যে রাষ্ট্রবিপ্লবে পড়িয়া স্বীয় আবাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফুলিয়াতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হন, উহা সম্ভবতঃ ফকরুদ্দিন কর্ত্তৃক সুবর্ণগ্রাম অধিকারকালে (১৩৪৮ খৃঃ অব্দে) সংঘটিত হইয়াছিল। ১৪৮০ খৃঃ অব্দে কৃত্তিবাসের প্রৌঢ়াবস্থা প্রমাণিত হইলে, ইহার ৪০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জন্মকাল অবধারিত করা অন্যায় হইবে না। তাহা হইলে ১৪৪০ কিম্বা তৎসন্নিহিত কোন সময়ে ফুলিয়া গ্রামে, মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর দিন রবিবার তিনি জন্মগ্রহণ করেন।*

কৃত্তিবাস মূর্খ ছিলেন, তিনি কথকদিগের মুখে রামায়ণের আখ্যান শুনিয়া তাহা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, প্রভৃতি মিথ্যা সংস্কার এখন দূরীভূত হইয়াছে, তিনি প্রসিদ্ধ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং বিদ্যার গৌরবে অর্থস্পৃহা পরিহার করিতে সমর্থ ছিলেন। "পাত্র মিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে। যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ

* সংপ্রতি জ্যোতিষিক গণনা দ্বারা নিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, কৃত্তিবাস ১৪৩২ খৃষ্টাব্দে (৩০শে মাঘ) জন্মগ্রহণ করেন। 'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস।' এই ছত্র দ্বারাই এই গণনা সিদ্ধ হইয়াছে।

মহারাজে॥ কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার। যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥"
এই অর্থাকাঙ্ক্ষাবিরহিত জ্ঞানগর্ব্বিত ব্রাহ্মণের চিত্র, পতিত হিন্দুসমাজে এখন আর সুলভ নহে, উদ্ধৃত স্থানটি পড়িয়া স্বভাবতঃই আমাদের দুঃখের সহিত এ কথাটি মনে হয়।

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ।

পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তাঁহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা॥*
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর॥
সুখভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকুলে।
বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে॥
গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিগে চায়।
রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথায়॥
পুহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি॥
কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিকে চায়।
হেনকালে আকাশ-বাণী শুনিবারে পায়॥
মালীজাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চ এথানা।
ফুলিয়া† বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা॥
গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী॥
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি।
ধন ধান্যে পুত্র পৌত্রে বাড়য় সন্ততি॥

---

* নৃসিংহ ওঝা আয়িত হইতে অধস্তন ৪র্থ পুরুষ। ইঁহার পরবর্ত্তী যে সমস্ত নাম পাওয়া যায়, তাহার সকল গুলিরই কুলজী গ্রন্থের সঙ্গে ঐক্য দৃষ্ট হয়।

† নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে ফুলিয়াগ্রাম অবস্থিত।

গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয়।
মুরারি, সূর্য্য, গোবিন্দ, তাহার তনয়॥
জ্ঞানেতে কুলেতেঁ ছিল মুরারি ভূষিত।
সাত পুত্র হৈল তার সংসারে বিদিত॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব॥
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ধর্ম্মচর্চ্চায় রত মহান্ত যে মানী॥
মদ-রহিত ওঝা সুন্দর মুরতি।
মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি।
সুশীল ভগবান তথি বনমালী।
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী॥
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঞি প্রসাদে।
মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়য়ে সম্পদে॥
মাতার পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী॥
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে ষড় উপবাস॥
সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুষি।
শ্রীধর* ভাই তার নিত্য উপবাসী॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।
আর এক বহিন হৈল সতাই উদর॥
মালিনী নামেতে মাতা, বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী॥

---

* মুরারি ওঝার নাতি শ্রীধরকৃত রাধার 'বারমাস্যা,' নামক একটি কবিতা সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। ১১৪ পৃষ্ঠায় তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে।

আপনার জন্মকথা কহিব যে পাছে।
মুখটি বংশের কথা আরো কৈতে আছে॥
সূর্য্য পণ্ডিতের পুত্র হৈলা নাম বিভাকর।
সর্ব্বত্র জিনিয়া পণ্ডিত বাপের সোসর॥
সূর্য্যপুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল।
সহস্র সংখ্যক লোক দ্বারেতে যাহার॥
রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোঁড়া।
পাত্র মিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া॥
গোবিন্দ, জয়, আদিত্য ঠাকুর বসুন্ধর।
বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা তাঁহার কোঙর॥
ভৈরব সুত গজপতি বড় ঠাকুরাল।
বারাণসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি ঘোষয়ে যাঁহার॥
মুখটি বংশের পদ্ম, শাস্ত্রে অবতার।
ব্রাহ্মণ সজ্জনে শিখে যাঁহার আচার॥
কুলে, শীলে, ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্য গুণে।
মুখটি বংশের যশ জগতে বাখানে॥
আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥
শুভক্ষণে গর্ভ হৈতে পড়িনু ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আমা লৈল কোলে॥
দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ॥
এগার নিবড়ে * যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ॥
বৃহস্পতিবারের ঊষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গাপার॥ †

---

* নিবড়ে,—অতীত হইলে।

† বড়গঙ্গা যশোহরে; "পূর্ব্ব সীমা ধুল্যাপুর বড়গঙ্গাপার"—অন্নদামঙ্গল।

তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার ॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে ॥
বিদ্যা সাঙ্গ করিতে প্রথমে হৈল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন ॥
ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যা সমাপন ॥
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উস্মাকার। *
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যার উদ্ধার ॥
গুরু স্থানে মেলানি † লইলাম মঙ্গলবার দিবসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে ॥
রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম ‡ রাজা গৌড়েশ্বরে ॥
দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম ॥
সপ্তঘটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাটি।
শীঘ্র ধাই আইল দ্বারী হাতে স্থবর্ণ লাঠি ॥
কার নাম ফুলিয়ার মুখটি কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ ॥
নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসনপরে ॥
রাজার ডাহিণে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ স্থনন্দ ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিণে নারায়ণ।
পাত্র মিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন ॥

---

* উস্মাকার—তেজস্বী।
† মেলানি—বিদায়।
‡ ভেট (উপহার) দিলাম, পাঠাইলাম।

গন্ধর্ব্ব রায় বসে আছে গন্ধর্ব্ব অবতার।
রাজসভা পূজিত তিঁহ গৌরব অপার॥
তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজার পাশে।
পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে॥
ডাহিণে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস্য আদি ধর্ম্মাধিকারিণী॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহা পাত্রের কোঙর॥
রাজার সভাখান যেন দেব অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার॥
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
অনেক লোক দাণ্ডাইয়া রাজার সম্মুখে॥
চারিদিকে নাট্যগীত সর্ব্বলোক হাসে।
চারিদিগে ধাওয়াধাই রাজার আওাসে॥*
আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি।
তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি॥
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘমাসে খরা † পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর॥
দাণ্ডাইনু গিয়া আমি রাজ বিদ্যমানে।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাত সানে ‡॥
রাজ আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
রাজার সম্মুখে আমি গেলাম সত্বরে॥
রাজার ঠাঁই দাঁড়াইলাম হাত চারি অন্তরে।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে॥

---

* আওাস—গৃহ, অনেক স্থলেই এই অর্থে ব্যবহৃত হইত, যথা, "তার মধ্যে দেখ পদ্মাবতীর আওাস। সীমার সঞ্চার নাহি পক্ষীর প্রকাশ॥"—আলওয়াল-কৃত পদ্মাবতী।

† খরা,—রৌদ্র, যথা,—খনা,—"জ্যৈষ্ঠে খরা, আষাঢ়ে ধারা, শস্তের ভার না সহে ধরা।"

‡ সানে,—সঙ্কেত, 'সখীসব দেখাইয়া অঙ্গুলীর সানে,'—রাজেন্দ্রদাসের শকুন্তলা।

পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী-প্রসাদে শ্লোক মুখ হৈতে স্ফুরে॥
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায়॥
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুষি হৈয়া মহারাজ দিলা পুষ্পমাল॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া॥ *
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্র মিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান॥
পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥
পাত্র মিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে॥
কারো কিছু নাই লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ॥
প্রসাদ পাইয়া বারি হইলাম সত্বরে।
অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
সব বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত॥

---

* পাটের পাছড়া পট্টবস্ত্র। 'পাটের পাছড়া' শব্দ প্রাচীন সাহিত্যে অনেক স্থলেই পাওয়া যায়,—"বিনে বান্দি নাহি পিন্দে পাটের পাছড়া"—মা, চ, গা, ১০ শ্লোক।

"পাটের পাছড়া পৃষ্ঠে ঘন উড়ে যায়।
ধড়ার আঁচল লুটি পাএ পড়ি যায়॥"—শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী॥
বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদে, গুরু আজ্ঞা দান।
রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাণ্ড গান॥
সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥
রঘুবংশের কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে॥"

সেই সময়ের কবির বিদ্যামর্য্যাদার চিত্র কেমন সরল ও জীবন্ত! গুণগ্রাহী গৌড়েশ্বরের উৎসাহে কবির গর্ব্বিত-মস্তক নক্ষত্র-লোক স্পর্শ করিয়াছিল। কবি যে দিন রামায়ণ রচনার ভার হস্তে লইলেন, সেই দিন বঙ্গভাষার শুভদিন, তাঁহার নিজের শুভদিন; সে দিন তাঁহার শরীরে দিব্য লাবণ্যের জ্যোতিঃ বাহির হইয়াছিল, তাই লোকবৃন্দ 'চন্দনচর্চ্চিত' প্রতিভাপূর্ণ 'ফুলিয়ার পণ্ডিতকে' দেখিয়া 'অপূর্ব্ব জ্ঞানে' ধন্য ধন্য বলিয়াছিল। এই বর্ণনাটি সরল ভাষায় অঙ্কিত প্রফুল্লতার একখানি ছবি বিশেষ!

কবির চিত্র।

কিন্তু যে রচনা আমরা কৃত্তিবাসী রচনা বলিয়া পাঠ করি, তাহাতে কৃত্তিবাস কতদূর বিদ্যমান, ইহা একটি যুগের সমস্যা; পরিষৎ ইহার কিরূপ মীমাংসা করিতে পারিবেন, বলিতে পারি না; কিন্তু আমার নিকট কৃত্তিবাস-নামধেয় কবি বর্ত্তমান ছিলেন, এ কথা যেরূপ সত্য বলিয়া বোধ হয়, তাঁহার রচনার সম্পূর্ণ উদ্ধার করা অসম্ভব, এই কথাও তেমনি আর একটি সত্য বলিয়া বোধ হয়। কৃত্তিবাস শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি রামায়ণ অনুবাদ করিতে যাইয়া বাল্মীকির গণ্ডী কেন অতিক্রম করিবেন, একথার উত্তর দেওয়া সহজ নহে। ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থান হইতে যে সমস্ত 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' পাইতেছি, তাহাতে বীরবাহু, তরণীসেন প্রভৃতির যুদ্ধ, রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রে

খাঁটি কৃত্তিবাসী রামায়ণ দুর্লভ।

শ্রীরামচন্দ্রের স্তব, ও শ্রীরামের চণ্ডীপূজা, এই সমস্ত মূলগ্রন্থবহির্ভূত বিষয় দৃষ্ট হয় না। সে অনুবাদগুলি কতকাংশে বাল্মীকির প্রতিভা-বজ্রবিদ্ধ পথে বঙ্গীয় কবির সূত্রে নিষ্ক্রমণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে। ইহাদের কোন্‌গুলি বিশ্বাসযোগ্য ? কৃত্তিবাসী রামায়ণ যে পূর্ব্ববঙ্গে পৌঁছিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বটতলার রামায়ণের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে প্রাপ্ত পুঁথির ভাব ও ভাষা অনেক স্থলে ছত্রে ছত্রে ঐক্য হইতেছে ; আমরা 'ভূমিতে পড়িয়া রাজা করে ছটফট। শীঘ্র করি রঘুনাথ গেলেন নিকট।' (পরিষদের পুঁথি*) ও "বরিষা গোয়াই গেল শরৎ প্রবেশ। রাম বোলেন না হইল সীতার উদ্দেশ॥" (পরিষদের পুঁথি, ৯৬ পত্র) প্রভৃতি অনেক স্থলেই বহু ছত্র পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া দেখিয়াছি, সেই সব পুঁথিতে ও বটতলার মুদ্রিত রামায়ণে একই কবির হস্তচিহ্ন অনুভব করা যায়। "খুল্লতাত পড়িল দুই তিন সহোদর। রুষিল অতিকা বীর যমের দোসর॥" (পরিষদের পুঁথি, ২২৭ পত্র) এই দুই ছত্রও প্রায় একরূপ। কিন্তু বটতলার পুস্তকে এই দুই ছত্রের পরে "চিন্তা করি মনে মনে বলিছে তখন। শ্রীচরণে স্থান দেও কৌশল্যানন্দন॥ রাবণ-সন্তান বলি দয়া না করিবে। দয়াময় রামনামে কলঙ্ক রহিবে॥" আছে, এইরূপ রাক্ষসী বৈষ্ণবী ভক্তির খোঁজ পূর্ব্ববঙ্গের হস্তলিখিত পুস্তকে পাওয়া যায় না। এরূপ হইল কেন ? সুমধুর তরণীসেনের বধোপাখ্যান, রাম 'কমল-আঁখির' কমলাক্ষ দ্বারা হারানো নীলোৎপলের স্থল পূর্ণ করিয়া চণ্ডী পূজার উদ্যোগ প্রভৃতি সুন্দর কাহিনী পূর্ব্ববঙ্গের পুঁথিগুলিতে পরিত্যক্ত হইল কেন ?

রামায়ণে শাক্ত ও বৈষ্ণবের প্রভাব।

আমার মনে একটি গভীর সন্দেহ আছে। শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব

---

* পরিষদের জন্য আমি যে পুস্তক ত্রিপুরা হইতে খরিদ করিয়া দিয়াছি, সে রামায়ণ-খানা খুব প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না ; উহা নিম্ন-শ্রেণীর লোকের হাতের লেখা ; ও অনেক স্থল পাঠবিকৃতিপূর্ণ। কিন্তু এস্থলে যে সব মত লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহা শুধু পরিষদের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া নহে, পূর্ব্ব বঙ্গে যে ১২।১৪ খানা রামায়ণের হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি পাইয়াছি, তাহার সমস্তই আমার লক্ষ্য। আলোচনার সুবিধার জন্য পরিষদের পুঁথির উল্লেখ করিলাম।

বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধনে নানারূপে সাহায্য করিয়াছে। বৈষ্ণবগণ রাক্ষস-দিগের দ্বারা শ্রীরামের স্তবগান করাইয়াছেন, খেদ মিটাইতে শাক্তগণ শ্রীরামকে দিয়া চণ্ডীপূজা করাইয়াছেন; এই দুই দলের চেষ্টায় মূল অনুবাদ বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। ইহাকে ঠিক বিকৃতি বলা যায় না। বীরবাহুর সম্বন্ধে—"ধরণী লুটায়ে রহে যুড়ি দুই কর। অকিঞ্চনে কর দয়া রাম রঘুবর।" এইরূপ উক্তি পড়িয়া ভূপতিত কৌপীনসার শিখাযুক্ত বৈষ্ণবের কথাই মনে পড়ে, নতুবা যাকে বলে রাক্ষস, তাহার এ দৈন্য কল্পনা করিবার কোন সুযোগ কবিগুরু বাল্মীকি দেন নাই; শুধু রামলক্ষ্মণের প্রতি এই ভক্তি নহে, বীরবাহু "প্রণমিল ভক্তবৃন্দ যত কপিগণে।" এই কপিগণ যে চৈতন্য-প্রভুর পারিষদবর্গের ন্যায় স্পষ্টরূপে গুণচূড়া, ললিতা, রূপমঞ্জরী প্রভৃতির অবতার বলিয়া অঙ্গীকৃত হন নাই, ইহাই যথেষ্ট। তৎপর রাবণের মুখে "জন্মিয়া ভারতভূমে আমি দুরাচার। করেছি পাতক বহু সংখ্যা নাহি তার॥ অপরাধ মার্জ্জনা করহ দয়াময়। কুড়ি হস্ত যুড়ি রাবণ একদৃষ্টে রয়॥" রামের নিকট এই মিনতি পড়িলে অনুতপ্ত জগাই, মাধাই এবং নরোজী, চৈতন্য-প্রভুর নিকট যে স্তুতি পাঠ করিয়াছিল, তাহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক; লেখক সেই অভ্যস্ত বৈষ্ণবোচিত বিনয় রাবণের মুখে প্রচার করিতে যাইয়া এতদূর বিস্মৃত হইয়াছেন যে, রাবণের লঙ্কা ভুলিয়া তাহাকে ভারত-ভূমে জন্মগ্রহণ করাইয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু বোধ হয়, তরণীসেনের উপরই বৈষ্ণবপ্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পড়িয়াছে, তিনি রীতিমত বৈরাগী সাজিয়া যুদ্ধে গমন করিতেছেন, গঙ্গা-মৃত্তিকার হরেকৃষ্ণ ছাপ ঈষৎ রূপা-ন্তরিত হইয়া তাঁহার অঙ্গ-শোভা সম্পাদন করিয়াছে, "অঙ্গে লেখা রামনাম রথের চারি পাশে। তরণীর ভক্তি দেখি কপিগণ হাসে॥" হাসিবার ত কথাই, এবম্বিধ হরি-সংকীর্ত্তনের যাত্রী পথ ভুলিয়া খোলের পরিবর্ত্তে ধনুক ধরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে কেন আসিলেন, তাহাতে কপিগণ কেন হাস্যসম্বরণ করিতে পারিবেন? তৎপর তরণীর রাম-শরীরে বিশ্বরূপ দর্শন; এইখানেই বঙ্গীয় রামায়ণ ভাগবতের আকার ধারণ করিয়াছে। এই রামায়ণে রাম লক্ষ্মণ ত

নিত্যানন্দ ও চৈতন্য প্রভু সাজিয়া কেবল ভক্তের অশ্রুজল লক্ষ্য করিতেছেন এবং সেই উচ্ছ্বাসে নিজেরাও কাঁদিয়া বিভোর হইতেছেন ; কখনও সমাগত যুদ্ধার্থীর ভক্তি দেখিয়া বলিতেছেন,—"রাম বলেন ভক্ত যদি জানহ নিশ্চয়। আশীর্ব্বাদ করি যেন বাঞ্ছা পূর্ণ হয়॥" কিন্তু ভক্ত ছাড়িবার পাত্র নহেন, —"ক্ষুদ্র পুরী লঙ্কা দিয়া ভাণ্ডিবে আমারে। না পারিবে কদাচন এই দুরাচারে॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গোঁসাই তোমার শরীরে।" বলিয়া ভক্ত প্রবল ভক্তির উচ্ছ্বাসে গোস্বামীমহাশয়ের বর প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। এই সব পড়িয়া রাম ও রাবণের ভীষণ যুদ্ধস্থলকে গৈরিক-রেণু-রঞ্জিত সংকীর্ত্তন-ভূমি বলিয়া ভুল হয় এবং তথাকার দামামা-রোল খোল-বাদ্যের মৃদুতা গ্রহণ করে। যাহা হউক, রামায়ণ এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া বাঙ্গালীর ঘরের উপযোগী হইয়াছিল সন্দেহ নাই—সেই ঘরে মরিচাধরা তলোয়ার অপেক্ষা নয়নাশ্রুই বেশী প্রভাবশীল অস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, চক্ষুজল এতদ্দেশের একটি প্রধান শক্তি, বাঙ্গালীর যুদ্ধক্ষেত্রে সেই শক্তির প্রয়োগ দেখিয়া উপহাস করিবার কোন কারণ নাই। রামায়ণ উক্তরূপে পরিবর্ত্তিত হইলেও ইহা ঠিক বিকৃতি বলিয়া আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। যদিও রাক্ষস বীরবাহুর শ্রীরামচন্দ্রকে "রাক্ষস বিনাশকারী ভুবনমোহন" বলাতে রাক্ষসী বীর্য্যবত্তার বিরুদ্ধভাব দৃষ্ট হয়, তথাপি বোধ হয় এই রচনা তাৎকালিক বঙ্গীয় জীবনের মূল নীতি উল্লঙ্ঘন করে নাই। বৈষ্ণবী-নীতি বঙ্গের সমাজের অভ্যন্তরে কার্য্যকরী হইয়াছিল ; এই বৈষ্ণবী-নীতি দ্বারাই রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ সম্পূর্ণরূপে শাসিত। এ সমস্ত রচনা পরবর্ত্তী যোজনা কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা বঙ্গীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধ হয় নাই, বরং সম্পূর্ণ অনুকূল হইয়াছে, এই জন্য যোজনা হইলেও উহা বিকৃতি নহে। ত্রিপুরা, নোয়াখালি ইত্যাদি স্থানের লোকগণ যে মূলগ্রন্থ জাল করিয়াছে, বোধ হয় না। সে সব দেশে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, চৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে

বিশেষ কোনরূপ বিকৃতি দৃষ্ট হয় না; শুধু 'লাফ' স্থলে 'ফাল', 'মা' স্থলে 'মাও' প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের শব্দগুলির দিকে অনুকূলতা দৃষ্ট হয়; পরিবর্ত্তন শুধু শব্দের, কিন্তু বিষয়গত পরিবর্ত্তন ত দেখা যায় না। তবে এক কৃত্তিবাস পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দুই রূপে উপস্থিত হইলেন কেন? যদি প্রকৃত পক্ষেই পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যানগুলি প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তবে কি সে অংশগুলি এখন রামায়ণ হইতে কর্ত্তন করিতে পারি? তরণীর কাটামুণ্ড 'রাম রাম' বলিয়া শ্রীরামের পদস্পর্শ করিয়াছিল, এই ভক্তির কথাই আমাদের প্রিয়; আমরা রাক্ষসী বিভীষিকা হইতে রাক্ষসী বৈষ্ণবভাবেরই বেশী পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি, সেগুলি ছাড়িয়া দিলে বঙ্গীয় রামায়ণে কি পড়িব? আমরা একখানি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে এইরূপ সূচনা পাইয়াছি,—

"বাল্মীকি বলিলা গোসাঞি তুমি অন্তর্য্যামি।
তোমা ঠাঞি কিছু কথা জিজ্ঞাসিব আমি॥
কোন মহাপুরুষ হয় সংসারের সার।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্ম অবতার॥
সংসারের সাধু প্রিয় জগতের হিত।
যার ক্রোধে দেবগণ শতেক বেভিত॥
সর্ব্ব সুলক্ষণ যার হয় অধিষ্ঠান।
হিংসার ঈষৎ নাই, চন্দ্র সূর্য্যের সমান॥
ইন্দ্র যম বায়ু বরুণ সেই বলবান্।
ত্রিভুবনে নাই কেহ তাহার সমান॥"

ইত্যাদি,—বে, গ, পুঁথি, ৪ পত্র।

কৃত্তিবাস এবং বাল্মীকি।

বিক্রমপুর হইতে প্রাপ্ত একখানা প্রাচীন পুঁথির ভূমিকাও এইরূপ দৃষ্ট হয়, ইহা অনেকটা মূলের অনুযায়ী। যাহা হউক, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থলের কতিপয় হস্তলিখিত পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া আমরা রামায়ণসম্বন্ধে জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতে সাহসী নহি। ঐ সব উপাখ্যান বাদ দিলে

অবশিষ্ট যে অংশ থাকে, তাহাও রামায়ণের ঠিক অনুবাদ বলা যায় না। ফটোগ্রাফে যেমন প্রকৃতির চিত্রালেখ্য স্বল্লায়তনে অথচ যথার্থরূপে প্রতিবিম্বিত হয়, কৃত্তিবাসী-মুকুরে বাল্মীকির রামায়ণ সেইরূপ প্রতিবিম্বিত হয় নাই; মূল পাঠ করিলে দেখা যায়, শ্রীরামচন্দ্র দেবতা নহেন,—দেবোপম; মানুষী শক্তি ও বীর্য্যবত্তার আতিশয্যে তাঁহাকে ক্ষণে ক্ষণে দেব বলিয়া ভ্রম হয়, এই মাত্র। কৃত্তিবাসী রামায়ণের রাম ভক্তের আরাধ্য অবতার, তুলসীচন্দনে লিপ্ত বিগ্রহ। তিনি কোমল করপল্লবের ইঙ্গিতে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার করিতে পারেন, তিনি বংশীধারীর ভ্রাতা, প্রেমাশ্রু-পূর্ণ-চক্ষু; ভক্তের চক্ষে জল দেখিলে যোজিত শরটি তূণীরে রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলেন। মূলে আছে, কৌশল্যা বনগত পুত্রকে স্মরণ করিয়া সুমন্ত্রের নিকট বলিতেছেন,—'রাম পুষ্পবৎ কোমল উপাধানে শির রক্ষা করিয়া নিদ্রা সুখ উপভোগ করিত, এখন স্বীয় বজ্রবৎ কঠিন ভুজে শির রক্ষা করিয়া কিরূপে শয়ন করিবে?' রামের চিত্র পাছে কঠোর হয় এই ভয়ে কৃত্তিবাস বজ্রবৎ কঠিন ভুজের কথা উল্লেখ করেন নাই। কি ভীরু! প্রকৃতই যদি রামের ভুজ কেবল কিশলয়োপম হইত, ও "চাঁপা নাগেশ্বর দিয়া রামের চূড়া বাঁধা"* থাকিত, তবে কি রাবণবধ হইত, না এখনকার ঐতিহাসিকদিগের মতানু-সারে, আর্য্য-ভুজবলে দাক্ষিণাত্য বিজয় হইত! শৌর্য্যই পুরুষের সৌন্দর্য্য, কমনীয়তা নহে। মূল রামায়ণে রামের ভয়াবহ মূর্ত্তি দেখিয়া মারীচ রাক্ষস বলিয়াছেন,—"বৃক্ষে বৃক্ষে আমি করাল রামমূর্ত্তি দর্শন করি, ধনুষ্পাণি রামমূর্ত্তি ছায়ার ন্যায় কাননের সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া নির্জ্জনে চমকিত হই।" যখন গদ্গদনাদী গোদাবরী-তীরে কদম্ব, অশোক, কর্ণিকার বৃক্ষকে শোকরক্তেক্ষণ বিরহী শ্রীরামচন্দ্র বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পান নাই, পথে রক্তবিন্দু ও রাক্ষসের পদাঙ্ক দর্শন করিয়া রাক্ষস কর্ত্তৃক সীতাবধ আশঙ্কা করিলেন, তখন বিরাট ধনুতে জ্যা আরোপণ করিয়া জরা, ব্যাধি কি মৃত্যুর ন্যায় করাল বেশে

* লঙ্কাকাণ্ড, বিদ্যুৎজিহ্বা কর্ত্তৃক মায়ামুণ্ড নির্ম্মাণ দেখ।

প্রকৃতিকে সংহার করিতে সমুদ্যত হইলেন, ত্রিপুরান্তক হরের ন্যায় কিংবা যুগান্তকারী কালের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রের সেই চিত্র অতি ভীষণ। সে সব কথা প্রলাপ হউক, কিন্তু কি ভয়ানক ও সুন্দর! সেই ক্রোধে ভাবী রাক্ষস-সংহারের ছায়া পড়িয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই সব ছবির যথাযথ প্রতিকৃতি উঠে নাই। যে আনন্দে প্রকৃতির মাধুরী মূলে প্রতিবিম্বিত, পদ্মসম্পীড়িত পম্পাবারি, কান্তোপভুক্তা অলস-গামিনী প্রভাতকালীয় রমণীর ন্যায় বর্ষাক্ষয়ে নদীর ধীর মন্থরগতি, শৃঙ্গধারী ককুদ্মানের ন্যায় বালেন্দুশীর্ষ মেঘের পট, হস্তিকর্তৃক পদ্মবনে উপগীত শ্লোক, এই নানাবিধ প্রফুল্লতার উন্মাদকর ছবি, কৃত্তিবাসী অনুবাদে প্রতিবিম্বিত হয় নাই। কিন্তু রাম ও লক্ষ্মণের সৌহার্দ্দ্য, কৌশল্যার শোক, সীতার (ক্ষাত্রেয় তেজ ও ব্রহ্মচর্য্য নহে) গৃহস্থবধূর ন্যায় ব্রীড়াবনত মাধুরী,—বোধ হয় মূলাপেক্ষা অনুবাদে আরও সুন্দর হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত যদি পশ্চিম-বঙ্গ-প্রচলিত রামায়ণের পাঠই ঠিক হইয়া থাকে তবে একটি অভিনব বস্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাই,—তাহা রামচন্দ্রের বৈষ্ণবীয় কোমলতা—ভক্তের জন্য করুণা। ইহার ছায়া রামায়ণে, কিন্তু পূর্ণতা বৈষ্ণবীয় পদাবলীতে।

বাঙ্গালীর নিজ ভাব দ্বারা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত ও নবরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে 'রামায়ণ' বঙ্গীয় গৃহস্থের এত আদরের বস্তু হইয়াছে। মিত-ব্যয়ী বণিক্ ক্ষুদ্র দীপাধার অকাতরে তৈল-পূর্ণ করিয়া যে গীতি অর্দ্ধরাত্র জাগিয়া পাঠ করে, তাহা এখনও আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়া কোমল করে; সেই গীতি আমাদের শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। উহার অপরিস্ফুট মাধুর্য্য শুধু শৈশবের কথা নহে, কত যুগ যুগান্তরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

পাঠ-বিকৃতির সম্বন্ধে আলোচনা।

ইদানীং কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠবিকৃতির দোষে দোষী সাব্যস্ত করিয়া জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের শ্মশানের উপর উৎপীড়ন হইতেছে। কিন্তু যাঁহারা উক্ত তর্কালঙ্কারের বিরোধী, তাঁহাদের নিকট এই বক্তব্য, যদি তাঁহারা

প্রাচীন বঙ্গীয় পুঁথির আলোচনা করিয়া থাকেন, তবে দেখিবেন পুস্তকের হস্তলিপি যত প্রাচীন, ভাষাও সেই অনুসারে জটিল ও প্রাচীন; পরবর্ত্তী পুঁথিগুলির ভাষা ক্রমশঃ সহজ দৃষ্ট হয়। * এক জয়গোপালের উপর ক্রুদ্ধ হইলে কি হইবে? কত জয়গোপাল বঙ্গীয় রামায়ণের বিকৃতিসাধনে সহায়তা করিয়াছেন, তাহার অবধি নাই। প্রাচীন অপ্রচলিতশব্দবহুল একখানি পুঁথি উদ্ধার করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিলে দেশীয় আপামর সাধারণ পড়িবে কি? প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রীতি অর্থকরী নহে।

আমার বিবেচনায় বঙ্গীয় পুঁথিগুলির এইরূপ পরিবর্ত্তন সর্ব্বাংশেই পরিতাপের বিষয় হয় নাই। এইরূপ যুগে যুগে সময়-উপযোগী ভাবে ভাষার একটু একটু সংস্কার হওয়াতেই ৫০০ বৎসরের অধিক কালের রচিত রামায়ণ এখন পর্য্যন্তও এদেশে এতদূর প্রচলিত আছে। ইংরেজী চসারের গীতি কয় জনে পড়ে?

কিন্তু মূল রামায়ণ নানা কারণেই উদ্ধার করা আবশ্যক। আধুনিক শব্দের মনোহারিত্বে অভ্যস্ত বহুসংখ্যক লোকের শ্রুতি মূল-রামায়ণ শ্রবণে সুখী হইবে কি না বলা যায় না। তথাপি আমাদের সাহিত্যের আদি-গৌরব কৃত্তিবাসকে সমুচিতরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার বাসনা কাহার না হয়?

আমরা যে সব রচনা কৃত্তিবাসের লিখিত বলিয়া প্রাচীন কবির কবিত্ব-গৌরবের বড়াই করিয়া থাকি, সেই প্রশংসার পুষ্প ও বিল্বপত্র হয়ত এই জয়গোপাল কি পূর্ব্ববর্ত্তী কোন জয়গোপালের মস্তকে পড়িতেছে,

* "Every one who has gone into the work of editing ancient songs in Bengali has felt this difficulty, later MSS. always giving a smoothed-down-version of the ancient dialects."—Mahámahopádhyáya Hara Prashad Shástri's Pamphlet on Old Bengali Literature, P. 3.

কৃত্তিবাস হয়ত তাহা পাইলেন না। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যাইতে পারে,—সুবিখ্যাত নিম্নলিখিত পদগুলি আমরা কোনও হস্তলিখিত পুঁথিতে পাই নাই,—

"গোদাবরী নীরে আছে কমল কানন।
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ॥
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিলা কি গ্রাস॥
রাজ্যচ্যুত যদ্যপি হয়েছি আমি বটে।
রাজলক্ষ্মী আমার ছিলেন সন্নিকটে॥
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারালাম বনে।
কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে॥"

কবির অন্যান্য রচনা।

রামায়ণ ভিন্ন 'যোগাত্মার বন্দনা,' 'শিবরামের যুদ্ধ,' 'রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশী' প্রভৃতি অপর কয়েকখানি ক্ষুদ্র পুঁথিতে কৃত্তিবাসের ভণিতা দৃষ্ট হয়।

(খ) অনন্ত-রামায়ণ।

কৃত্তিবাসের পরে যাঁহারা রামায়ণ রচনা করেন তন্মধ্যে 'অনন্ত-রামায়ণ' খানিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। শ্রীযুক্ত করুণানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিয়াছেন; ইহা বল্কলে লিখিত, অবস্থা অতি জীর্ণ শীর্ণ, পশ্চাতের কয়েকখানি পত্র নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং সময় নির্দ্ধারণের উপায় নাই; বল্কলে লিখিত ও "দেখিতে অতি প্রাচীন" ইহাই এই পুস্তকের প্রাচীনত্বের প্রমাণ, ইহা ছাড়া আর একটি বিশেষ প্রমাণ ভাষা। শেষোক্ত বিষয়ে অনুমান বড় নিরাপদ নহে, অন্য প্রমাণাভাবেই গ্রন্থের ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সময় নিরূপণের চেষ্টা দেখিতে হয়, কিন্তু নিতান্ত মফঃস্বলের

ভাষা এখনও প্রাচীন শব্দপরম্পরায় এরূপ জটিল রহিয়া গিয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়েও যদি বঙ্গের কোন সীমান্ত পল্লীর প্রচলিত ভাষা লিখিত আকারে উপস্থিত হয়, তবে অদ্ভুত গবেষণার সাহায্যে আমরা তাহা প্রাকৃতিক যুগে কি বৌদ্ধাধিকারে লইয়া পৌঁছাইতে পারি। তবে অন্যান্য প্রমাণের অভাব হইলে ভাষা-পরীক্ষা ভিন্ন সময় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে গত্যন্তর নাই; অনন্তরামায়ণের ভাষা অত্যন্ত জটিল ও প্রাচীন, ইহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে, কত প্রাচীন, সে সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, এই পর্য্যন্ত; আমরা ইহা ন্যূন পক্ষে ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করি। গ্রন্থকারের বাসস্থান কি তৎসংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়ের বিবরণই অবলম্বিত পুঁথিখানিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কতকগুলি শব্দ দৃষ্টে একবার বোধ হয়, গ্রন্থকার শ্রীহট্ট কিম্বা তৎসন্নিহিত কোন জনপদের অধিবাসী; 'চ' স্থলে 'ছ' ব্যবহারের জন্য আমরা চিরকাল শ্রীহট্টবাসী বন্ধুগণের সহিত আমোদ করিয়া আসিয়াছি, এই পুঁথিতে 'চরণ' স্থলে 'ছরণ' 'বচন' স্থলে 'বছন,' 'চাস' (চাহিস) স্থলে 'ছাষ', প্রভৃতি-রূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, অন্যান্য শব্দও শ্রীহট্টপ্রচলিত ভাষার সহিত সান্নিকট্যের পরিচয় দেয়; তবে এ কথাও একবার মনে উদয় হয়, যে কবি না হইয়া গ্রন্থলেখকও শব্দের এবম্বিধ রূপান্তর করিয়া থাকিতে পারেন;—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে তদ্রূপ বিকৃতির উদাহরণও আমরা বিলক্ষণ পাইয়াছি।

এদিকে হিন্দী শব্দের সঙ্গেও এই পুঁথির ভাষার বিলক্ষণ নৈকট্য দৃষ্ট হয়, সুতরাং শ্রীহট্ট না হইয়া বঙ্গের পশ্চিমোত্তর প্রান্ত হইতে এই কবির উদ্ভব হওয়া বিচিত্র হইবে না।—আমরা এই পুস্তকের প্রণেতাকে বঙ্গের পূর্ব্বোত্তর কি পশ্চিমোত্তর সীমান্ত-স্থিত কোন পল্লীর অধিবাসী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত

করুণানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পুঁথি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা একেবারে উল্লেখ করেন নাই।*

অনন্তরামায়ণের ভাষা জটিল ও বন্ধুর, শুধু কাব্যামোদী পাঠক দু এক পৃষ্ঠা পাঠান্তেই ক্লান্ত হইয়া সুললিত বটতলার কৃত্তিবাসী আশ্রয় করিয়া নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ গ্রহণ করিবেন, "এই বুলি মকমকি কান্দে রঘু রাই"—(রঘুরায় ইহা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন) প্রভৃতি-রূপ রামবিলাপ পড়িতে ভেকের মকমকি স্মরণে পাঠক হাস্য না করিলেই করুণ রসের মর্য্যাদা অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইবে। তবে, বন্ধুর ও দুরারোহ স্থল ভ্রমণেরও একরূপ আকর্ষণ আছে, তাহা না হইলে আগ্রার তাজমহল ও কলিকাতার ইডেন গার্ডেনের সুন্দর সুপ্রশস্ত পথ থাকিতে গোমুখীর উৎপত্তিস্থল দেখিবার জন্য বৈজ্ঞানিক পরিব্রাজকগণ কষ্ট স্বীকার করেন কেন এবং আর্কটিক

---

* সম্প্রতি শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, এই অনন্ত আসাম-বাসী। ইনি অনন্ত কন্দলী নামে আসামবাসিগণের নিকট পরিচিত। ইঁহার রচিত রামায়ণের অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তকে উদ্ধৃত আছে। সুতরাং 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' হইতে ইঁহাকে বাদ দেওয়ার জন্য আমাদিগের নিকট অনুরোধ আসিয়াছে। কিন্তু যে যুগের ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস আমি লিখিতেছি, তখন আসামীভাষা বাঙ্গালাভাষা হইতে পৃথক ছিল না। আজ যদি ত্রিপুরায় কিংবা শ্রীহট্টে তদ্দেশীয় প্রাদেশিক ভাষার আধিপত্য হয়, তবে সঞ্জয়, শ্রীকরনন্দী প্রভৃতি লেখকগণকে আমরা কখনই কি বঙ্গসাহিত্য হইতে বাদ দিতে পারি? অথচ, প্রাদেশিকত্ব ধরিলে তাঁহাদের রচনাও অনন্তরামায়ণ হইতে কম দুরূহ নহে। আসামের প্রাচীন কবিগণের বিষয় আমরা সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহি। তাঁহাদের বিবরণ পাইলে আমরা এ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। আসামে অতি অল্প দিন হইল বঙ্গাক্ষর এবং বঙ্গভাষার গৌরব নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আসামের ভাষাকে আমরা বঙ্গভাষার প্রাদেশিকভেদ ভিন্ন স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া স্বীকার করি না।

কবি অনন্তের অপর নাম রাম-সরস্বতী; ইনি কামরূপবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন।

সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া বরফের রাজ্য খুঁজিবার জন্য এ্যান্ড্রির মত লোক ক্ষিপ্তবৎ প্রাণ উৎসর্গ করিতে চান কেন? সেইরূপ প্রাণান্ত উদ্যমের একটা স্থায়ী পুরস্কার, ও তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট একটি সুবিমল আত্মতৃপ্তি আছে; এই সব প্রাচীন পুঁথি পাঠের উৎকট ধৈর্য্যেরও তদ্রূপ এক আকর্ষণ আছে এবং এ পথেও লোক জীবনোৎসর্গ না করিতেছে, এমন নয়।

অনন্ত নামক কোন কবি এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়া স্বাক্ষর (ভণিতা) দেওয়ার সময় নিজকে "মূর্খ"—"মহামূঢ়" প্রভৃতিরূপে বর্ণনা দ্বারা সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। একটি স্থলে শঙ্কর নামক কবির কথাও ভণিতার পূর্ব্বে দৃষ্ট হয়, যথা "জয় জয় শ্রীমন্ত শঙ্কর পূর্ণকাম। কীর্ত্তনের ছন্দে বিরচিল গুণ নাম।"—যে স্থলে অপরাপর পুঁথিতে 'ধুয়া' শব্দ প্রযুক্ত দৃষ্ট হয়, সে স্থলে, অনন্ত "ঘোষা" শব্দ ও শ্রোতৃবর্গের স্থলে 'সভাসদ্' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

অনন্তরামায়ণ মূলতঃ বাল্মীকির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রচিত হইলেও ইহাতে অধ্যাত্মরামায়ণ ও মহানাটকেরও ছায়া পড়িয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে, এবং কবি যতই কেন নিজের অবনতি-সূচক ব্যাখ্যা দ্বারা মূর্খত্বের ভাণ করুন না, আমরা বলিতে বাধ্য, তিনি নিজে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। কোন অনর্থক বাগাড়ম্বরে তৎকৃত রামায়ণ স্ফীত হইয়া উঠে নাই, রূপ-বর্ণনার আতিশয্য দ্বারা তিনি চরিত্রগুলিকে নিবিড় করিয়া তুলেন নাই। অনুবাদ মূলানুযায়ী হইয়াছে, তবে মূল কতকটা সংক্ষিপ্ত হইয়াছে; সংস্কৃতের বহ্বায়তনত্ব হইতে অব্যাহতি দিয়া তিনি অনুবাদটি সরস রাখিয়াছেন, ইহা তাঁহার বাহাদুরী বটে।—অনন্তরামায়ণ জটিল, দুরূহশব্দবহুল, কিন্তু সংক্ষিপ্ত ও কবিত্বপূর্ণ। ভাষার বন্ধুরতাহেতু সে কবিত্ব সহসা আবিষ্কৃত না হইলেও একটু ভাবিয়া পড়িলে

পুঁথিখানি বেশ ভাল বোধ হইবে। অনন্ত রামায়ণের অদ্ভুত ভাষাময়ী কাহিনীর একটু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"কাহার ঝিয়ারি তুমি কাহার ঘরণী। কিবা নাম তোমার কহিবে সুলক্ষণি॥ জনকনন্দিনি মঁঞি নাম মোর সিতা। দশরথপুত্র শ্রীরামবিবাহিতা॥ পিতৃবাক্য পালি রাম বনে আসিলন্ত। লক্ষ্মণে সহিতে মৃগ মারিবে গৈচন্ত॥ আসি লভ ফুল জলে পুজিবা ছরণ। ক্ষণেক বিলম্ব করিয়োঁক মহাজন॥ উদবিগ্ন মনে সিতা বোলে থর করি। তপসি নহিকো মঁঞি জানিবা সুন্দরি॥ জগত রাবণ জাক সুনি আছ কর্ণে। যাহার সদৃষ বড়া নাহি তৃভুবনে॥ হেনয় রাবণ আসি ভৈলোঁ তবু পাষ। রামক তেজিয়া বান্ধে কর মোতে আষ॥ যত পাটেস্বরি মোর সব তোর দাসি। জোহি খোজ সেহি দিবো থাকিবো উপাসি॥ মানুষ রামকে বান্ধে দূরে পরিহর। মঁঞি সমে যুগে যুগে রাজ্য ভোগ কর॥ হেন সুনি ক্রোধে সিতা বুলিলন্ত বাণি। দুর গুচা পাপিষ্ঠ অধম লঘুপ্রাণি॥ নিকোঁট গোটর তোর এত মান সাষ। ছুকর ডাকুলি হুঁয়া গঙ্গা স্নানে জাষ। রাঘবর ভার্যাত তোঁহোর ভৈল মন। তিথাল খান্তাত জিহ্বা ঘষস দুর্যন॥ হাতে তুলি কালকুট গিলিবাক ছাস। সপুত্র বান্ধবে পাপি হৈবি সর্ব্বনাষ॥ আনো বঁহুতর বাক্য বুলিলত আই। সংক্ষেপ পদত ধিক দিবেনু জুআই॥" আরণ্যকাণ্ড।

কবি যখন নিজেই বলিতেছেন রামায়ণ সংক্ষেপে অনুবাদিত হইল তখন উদ্ধৃত অংশে "তীব্রাংশুঃ শিশিরাংশ্চ ভয়াৎ সম্পদ্যতে দিবি। নিষ্কম্প স্তরবো নদ্যশ্চ স্তিমিতোদকাঃ॥" প্রভৃতি রাবণোক্ত তেজঃপুঞ্জ কথাগুলি না পাইয়া আমাদের দুঃখিত হইবার কারণ নাই,—"কালকূটবিষং পীত্বা স্বস্তিমান গন্তমিচ্ছসি," ও "জিহ্বয়া লেঢ়ি চ ক্ষুরম" প্রভৃতি অংশ কবির গ্রাম্যভাষায় সংস্কৃতের ছন্দলালিত্য ও শব্দঝঙ্কারচ্যুত হইয়া স্থান পাইয়াছে, কবি সংক্ষেপ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বাল্মীকি ও বশিষ্ঠের পথেই চলিয়াছেন। অনন্তরামায়ণ, পরাগলী মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ আমাদের চক্ষে ধন্য। এই সকল কবিই বাঙ্গালা ভাষার গঠন করিয়াছেন। কৃষকগণের প্রাকৃতকে সংস্কৃত শব্দের সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিবার প্রথম চেষ্টা ইঁহারাই করিয়াছেন। ইঁহাদের রচনার দৈন্য আমাদের চক্ষে প্রবল ভাষানুরাগের ঐশ্বর্য্য উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে। ইঁহারা বন্ধুর ক্ষেত্রকে হলকর্ষণে সমতল করিয়াছিলেন,

এজন্যই আজ এই ক্ষেত্র নবশষ্প ও পুষ্পে হরিৎপ্রভা-মণ্ডিত হইয়াছে।

অনুবাদশাখা (গ)।

সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, এবং শ্রীকরনন্দী।

মহাভারতের অনুবাদ-রচকগণ।

৪৫০ শত বৎসরের অধিক হইল রামায়ণের প্রথম অনুবাদ রচিত হইয়াছিল, আর ৩০০ বৎসরের কিছু অধিক হইল কাশীদাস মহাভারত অনুবাদ করেন, মধ্যবর্ত্তী দেড় শত বৎসরের মধ্যে অন্য কেহ মহাভারত প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করেন নাই, এরূপ অনুমান করা বোধ হয় সঙ্গত নহে, এই বিশ্বাসে মহাভারতের লুপ্ত অনুবাদ উদ্ধার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হই। সুখের বিষয়, পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে অনেকগুলি প্রাচীন মহাভারতের পুঁথি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই আবিষ্কারের গুরুত্ব পাঠকগণ নির্ণয় করিবেন; শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহা এখন সম্যক্‌রূপ প্রমাণিত দেখিয়া আমাদের যে তৃপ্তিলাভ হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বহুসংখ্যক অনুবাদ-রচকগণের মধ্যে সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, নিত্যানন্দ ঘোষ, রামেশ্বর নন্দী প্রভৃতি কবির রচিত মহাভারতগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে। নক্ষত্ররাজির ন্যায় অসংখ্য মহাভারতের অংশরচকগণের নাম এস্থলে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অনুমান ও কল্পনার দূরবীক্ষণযোগে এই সকল কবি-নক্ষত্রগণ এ সময় হইতে কত দূরে অবস্থিত, সে প্রশ্নেরও এস্থলে উত্তর দিতে চেষ্টা করিব না।

বিবিধ অনুবাদের সাদৃশ্য।

কবীন্দ্র রচিত মহাভারত হুসেন সাহার সময় লিখিত হয়, সুতরাং ৪০০ বৎসর পূর্ব্বের অনুবাদ পাওয়া গেল। এই মহাভারতের বিবরণ পরে দেওয়া হইবে। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁহার মহাভারতে উল্লেখ করিয়াছেন;—"শ্রীযুত নায়ক

সে যে নসরত খান। রচাইল পঞ্চালী যে গুণের নিদান।" বে, গ, পুঁথি, ৮৮ পত্র।
সুতরাং কবীন্দ্র রচিত মহাভারতাপেক্ষাও প্রাচীন লুপ্ত মহাভারতের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি "বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত" নামক যে গ্রন্থখানি সাহিত্যপরিষৎ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কবীন্দ্ররচিত মহাভারতের সঙ্গে এত বেশী মিলিয়া যাইতেছে যে, কবীন্দ্রের গ্রন্থের আলোচনার পর তাহার পৃথক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 'বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত'-অভিধেয় গ্রন্থখানির ব্যাপার ছাড়া ও সঞ্জয়রচিত মহাভারত, নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত, কাশীদাসী মহাভারত প্রভৃতি অনেকগুলি মহাভারতের বহু স্থানে ভাষাগত আশ্চর্য্য প্রকারের সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, একখানি আদর্শ প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী ভারতানুবাদগুলি রচিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ভারতানুবাদক কবি কে? কোন আধ্যাত্মিক শক্তিসঞ্চারে মৃত কবিগণের প্রেতাত্মাদিগকে উপস্থিত করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে এ প্রশ্নের উত্তর জানা ভিন্ন এ বিষয়ের খাঁটি সত্য অবধারণের দ্বিতীয় পন্থা নাই; তবে আর একটি অনুমানও আমাদের নিকট অত্যন্ত সমীচীন বোধ হয়, মাগধ ভাটগণ প্রাচীনকাল হইতে রাজন্যবর্গের স্তুতিপ্রসঙ্গে পুরাণোক্ত উপাখ্যানগুলি গাহিয়া ফিরিতেন, এখনও শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলের ভাটগণ সাময়িক প্রসঙ্গগুলির সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি গাহিয়া থাকেন, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যেও মাগধ ভাটের কথা অনেক স্থলেই উল্লিখিত আছে। ইহাঁরা রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন দেশে গাহিয়া বেড়াইতেন, যাঁহারা মহাভারতের অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ প্রচলিত উপাখ্যানগুলি হইতে বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্যই ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিরচিত ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কবিগণের রচিত অনুবাদে ভাষাগত এইরূপ আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হইতেছে।

কবীন্দ্র-রচিত মহাভারত হইতে আর একখানি অতি প্রাচীন মহাভারত পাওয়া গিয়াছে, তাহা সঞ্জয়-রচিত। ইহার ঐতিহাসিক কোন তত্ত্ব পাওয়া গেল না; কিন্তু এই পুস্তক নানা কারণে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হইতেছে। কবীন্দ্র-রচিত প্রাচীন পুঁথি যেথানেই পাওয়া যাইতেছে, তৎসঙ্গে মূল-পুঁথির হস্তলিপি অপেক্ষা প্রাচীন হস্তাক্ষরযুক্ত দুই চারিখানা সঞ্জয় ভারতের পৃষ্ঠাও সংলগ্ন দেখা গিয়াছে, সুতরাং সঞ্জয়ের মহাভারতের পরে কবীন্দ্রের অনুবাদ প্রচলিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কবীন্দ্র-রচিত ভারতের প্রচার অপেক্ষা সঞ্জয়ের ভারতের প্রচার অনেক বেশী; সঞ্জয়-রচিত মহাভারত বিক্রমপুর, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, রাজসাহী প্রভৃতি সর্ব্বস্থলেই পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং এই গ্রন্থের প্রচার একরূপ সমস্ত পূর্ব্ব-বঙ্গময় বলা যাইতে পারে। সঞ্জয়-রচিত ভারতের ভাব ও ভাষার বিকাশ কবীন্দ্রের ভারতে দৃষ্ট হয়; যযাতি ও দেবযানির মিলন-বর্ণনা আমরা উভয় কবির কাব্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া ইহা প্রতিপন্ন করিব;—

সঞ্জয়-কৃত মহাভারত।

"ফলিত পুষ্পিত বন বসন্ত সময়।
সদাএ সুগন্ধী বায়ু মন্দ মন্দ বয়॥
বিচিত্র যে অলঙ্কার বিচিত্র ভূষণে।
কন্যা সব নানা রঙ্গ করে সেই বনে॥
কেহ মিষ্ট ফল খাএ, কেহ মধু পিএ।
শর্ম্মিষ্ঠা যে দেবযানি চরণ সেবএ॥"

—সঞ্জয়, বে, গ, ১১ পত্র।*

---

* বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের জন্য যে হস্তলিখিত সঞ্জয়ের পুঁথি খরিদ করা হইয়াছে, তাহার শেষ পত্র এইরূপ;—

"এই অষ্টাদশ ভারত পুস্তক শ্রীগোবিন্দরাম রায়ের একোন পত্র অঙ্ক সাতশত উননব্বই সমাপ্ত হইয়াছে। স্বঅক্ষরমিদং শ্রীঅনন্তরাম শর্ম্মণঃর ইহার দক্ষিণা জন্মাবধি সামান্যতাক্রমে অন্নপত্রে প্রতিঁপাল্য হৈয়া সশ্রদ্ধাহ হইয়া পুস্তক লিখিয়া দিলাম। নগদ দক্ষিণাহ পাইলাম তার পর রোজকারহ বৎসর ব্যাপিয়া পাইবারহ আজ্ঞা হইল। শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৩৬ সন ১১২৪ তারিখ ২৫শে কার্ত্তিক রোজ বৃহস্পতিবার দিবা দ্বিতীয় প্রহর গতে সমাপ্ত। মোকাম শ্রীস্থলগ্রাম লেখকের নিজগ্রাম।"

"একদিন দেবযানি, হৃদয়ে হরিষ গুণি,
শর্ম্মিষ্ঠা লইয়া রাজ-সুতা।
ঋতুরাজ মধুমাস, ক্রীড়াখণ্ডে অভিলাষ,
চলি আইল পুষ্পবন যথা॥
নানা পুষ্প বিকাশিত, গন্ধে বন আমোদিত,
কুসুমে নমিত হৈছে ডাল।
কোকিলের মধুর ধ্বনি, শুনিতে বিদরে প্রাণী,
ভ্রমর করয়ে কোলাহল॥
সানন্দিত বন দেখি, মিলয়া সকল সখি,
ক্রীড়া তাতে করয় হরিষে।
মলয় সুধীর বাও, ধীরে ধীরে বহে যাও,
প্রাণ মোহিত পুষ্পবাসে॥
হেন সময় যযাতি, বিধাতা নির্ব্বন্ধ গতি,
মৃগয়া কারণে সেই বনে।
ভ্রমিয়া কাননে চাএ, মৃগ কোথা নাহি পাএ,
কন্যা সব দেখি বিদ্যমানে॥
তার মধ্যে এই কন্যা, রূপে গুণে অতি ধন্যা,
জিনি রূপে রম্ভা উর্ব্বশী।
অধরে বাঁধুলি জ্যোতি, দশন মুকুতা পাতি,
বদন জ্বলয়ে যেন শশী॥
নয়ন কটাক্ষ শরে, মুনি জন মন হরে,
ভ্রূযুগে কাম ধনু ধারা।
চারিভিতে সহচরী, বসি আছে সারি সারি
রোহিণী বেষ্টিত যেন তারা॥
শয়ন করিয়া আছে, রতিকাম অভিলাষে,
বিচিত্র পাতিয়া নানা ফুল।
শর্ম্মিষ্ঠা চাপে পাও, কোন সখি করে বাও,
কোন সখী যোগায় তাম্বুল॥"

—কবীন্দ্র, হস্তলিখিত পুঁথি।

এইরূপ অনেক স্থলেই কবীন্দ্র সঞ্জয়ের তুলি ধরিয়া চিত্রগুলি বিকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীহরি যে স্থলে স্বপ্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া রোষক্ষিপ্ত গজেন্দ্রবৎ ভীষ্মকে বধ করিতে সমরক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন,—কবীন্দ্রের বর্ণনা সে স্থলে বড় সুন্দর, কিন্তু সঞ্জয়-ভারতে এই প্রসঙ্গ এবং অন্যান্য সুন্দর আখ্যানের একবারে উদয় হয় নাই। সঞ্জয়-রচিত ভারতের বনপর্ব্ব ১৪ পত্রে, অনুশাসন পর্ব্ব ৩ পত্রে, মহাপ্রস্থানিক পর্ব্ব ৩ পত্রে ও সৌপ্তিক পর্ব্ব ৫ পত্রে সম্পূর্ণ; সুতরাং প্রায় স্থলেই বৃত্তান্ত অতি সংক্ষিপ্ত। মহাভারত-প্রসঙ্গ যখন দেশে নূতন সামগ্রী ছিল, এইরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সেই সময়েরই উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। খাঁটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের ন্যায় খাঁটি সঞ্জয়ের মহাভারত অতি দুর্লভ। আমি একখানি মাত্র শ্রীযুক্ত বাবু অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট দেখিয়াছি।

সঞ্জয়-রচিত মহাভারত কাব্যের স্কন্ধে কত কবি শাখা-কাব্যের উৎপত্তি করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। শকুন্তলা-উপাখ্যানটি রাজেন্দ্রদাস কবি উৎকৃষ্ট খণ্ড-কাব্যে পরিণত করিয়া সঞ্জয় ভারতের অন্তর্বর্ত্তী করিয়া দিয়াছেন; গঙ্গাদাস সেন অশ্বমেধপর্ব্বটি সংযুক্ত করিয়াছেন; গোপীনাথকবি দ্রোণপর্ব্ব সংলগ্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের বাক্য-বিন্যাস উৎকৃষ্ট, রচনার নিপুণতা উৎকৃষ্ট, ভাব নব-যুগের প্রভা-ধারী; কিন্তু সঞ্জয়ের রচনা অনাড়ম্বর, সংক্ষিপ্ত ও সরল। অথচ এই সমস্ত উপকরণরাশি গ্রাস করিয়া সঞ্জয়-কৃত মহাভারত 'তালের বড়ার' ন্যায় নামমাত্র তালের কীর্ত্তিই ঘোষণা করিতেছে। কোন কোন পুঁথির অধিকাংশই অপরাপর কবির লিখিত, অথচ গ্রন্থের নাম 'সঞ্জয়কৃত' মহাভারত। নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের অবস্থাও এইরূপ।

এই সংক্ষিপ্ত সরল বর্ণনাযুক্ত মহাভারতটির প্রতিপত্তি এত বেশী হইল কেন? কবি ষষ্ঠীবরের, তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেনের, এবং রাজচন্দ্র দাসের

উজ্জ্বল পংক্তি নিচয়ের যশঃ সঞ্জয়-নামের আড়ালে পড়িল কেন? বোধ হয় ইহা প্রাচীনতম কীর্ত্তি, এই জন্য।

আমরা সঞ্জয়-রচিত ভারতের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ প্রমাণ দেখিতেছি,—যে স্থলেই সঞ্জয়ের ভণিতা, সেই স্থলেই লোক বুঝাইতে সঞ্জয় ভারত অনুবাদ করিয়াছেন একথা লিখিত হইয়াছে। মহাভারত অতি কঠিন, সঞ্জয় লোকহিতসংকল্পে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করিতেছেন, প্রতিপত্রে এই কথা দৃষ্ট হয়; * "অতি অন্ধকার যে মহাভারত সাগর। পাঞ্চালী সঞ্জয় তাক করিল উজ্জ্বল।" (বে, গ, পুঁথি, ৪৬২ পত্র) প্রভৃতি কথা পাঠ করিলে মনে হয়, মহাভারতরূপ মহাভাণ্ডার বহুকাল পর্য্যন্ত সংস্কৃতানভিজ্ঞের নিকট অনধিগম্য ছিল, সঞ্জয়ই প্রথম অনুবাদ দ্বারা তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত করেন।

কৃত্তিবাস ভিন্ন অন্য কোন কবির ভণিতায় বারংবার এইরূপ কথা দৃষ্ট হয় না। মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী অনুবাদ থাকিলে এরূপ লেখা স্বাভাবিক হইত না।

সঞ্জয়ের পরিচয়।

এই সঞ্জয় কে? তাঁহার কোন বিশেষ পরিচয় নাই। একবার ভাবিয়াছিলাম বিদুর-পুত্র সঞ্জয়কেই কি আমরা কাব্যপ্রণেতা বলিয়া ভুল করিতেছি? ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সঞ্জয় যুদ্ধ বর্ণনা করিতেছেন, সুতরাং যুদ্ধপর্ব্বগুলিতে সঞ্জয় কহিতেছেন, এ কথা মহাভারত মাত্রেই থাকিবেক। এই সঞ্জয় কি সেই সঞ্জয়? এই ভ্রম পাছে পাঠকের হয়, এই জন্য সঞ্জয় কবি নিজেই সতর্ক হইয়াছেন,—তিনি লিখিয়াছেন,—

"ভারতের পুণ্য কথা নানা রসময়।
সঞ্জয় কহিল কথা রচিল সঞ্জয়॥"

—বে, গ, পুঁথি, ৫৭৭ পত্র।

---

* বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের পুঁথির, ১৫৯, ১৭০, ১৮২, ৪৪৬, ৫০২, ৫০৫, ৫২৫ প্রভৃতি পত্র দেখুন।

"সঞ্জয় কহিল কথা, রচিল সঞ্জয় ॥" ৫৮৭ পত্র।

"সঞ্জয়ের কথা শুনি, সঞ্জয়ের কথা পুনি,

শুনিলে আপদ হৈলে তরি।" ৫৩৬ পৃঃ।

"প্রথম দিনের রণ ভীষ্মপর্ব্বে পোঁথা।

সঞ্জয় রচিয়া কহে সঞ্জয়ের কথা ॥" ২৩৩ পৃঃ।

সুতরাং সঞ্জয় পৌরাণিক ভূত নহেন, একালেরই মানুষ; তাঁহার পরিচয়স্থলে বেঙ্গল-গবর্ণমেণ্ট-লাইব্রেরীর জন্য আমি যে পুঁথি খরিদ করিয়াছি, তন্মধ্যে এই দুটি ছত্র পাওয়া যায়,—"ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম। সঞ্জয়ে ভারত কথা কহিলেক মর্ম্ম ॥" ৪৩৬ পত্র। যে বংশে শ্রীহর্ষ, কৃত্তিবাস ও ভারতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, সঞ্জয় কি স্বভাবজাত কবিত্ব-সম্পন্ন সেই প্রসিদ্ধ বংশের একজন?

সঞ্জয়ের কবিত্ব।

সঞ্জয় কৃত মহাভারতের প্রাচীন রচনায় লিপিনৈপুণ্য সুলভ নহে। গ্রাম্য ভাষা ও প্রাচীন বিভক্তির জটিলতা অনেক স্থলেই বিরক্তিকর, তাহা আদ্যন্ত পাঠ করিবার ধৈর্য্য শুধু অসামান্য সহিষ্ণু পাঠকেরই থাকিতে পারে, কিন্তু সেই ভাষা পড়িতে পড়িতে কতকটা অভ্যস্ত হইয়া গেলে পাঠক কাব্যের প্রকৃত রসাস্বাদ করিতে পারিবেন; গ্রাম্য সরল সৌন্দর্য্যে অনুবাদটি উপাদেয় হইয়াছে, বাঙ্গালী তখনও একান্ত মৃদু ও কুসুম-সুকুমার হইয়া পড়েন নাই, তাই বীরত্বের কাহিনীগুলিতেও মূলের উদ্দীপনার যথাযথ প্রতিধ্বনি জাগিয়াছে, অমার্জ্জিত ভাষার মধ্যেও সংক্ষুব্ধ চিত্তের ক্রোধ অপমান প্রভৃতি রসের প্রবাহ কতকটা বাধ বাধ হইয়াও যেন কবির উত্তেজনার প্রখরতার পরিচয় দিতেছে। আমরা নিম্নে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

দ্রৌপদীর অপমান।

"রাজার আদেশ পাই, দুঃশাসন গেল ধাই,

সভাতে আনিল একেশ্বরী।

একবস্ত্র রজস্বলা, দ্রুপদ নন্দিনী বালা,
রাহুএ যেন চন্দ্র নিল হরি ॥
মন্দ বোলে সভাজন, ধর্ম্মশাস্ত্র অকারণ,
উচিত না বোলে কোন জনা।
কাঁদয়ে সুন্দরী রামা, রূপ গুণে অনুপমা,
নয়নে বহয়ে জলধারা ॥
আপনে হারিল পতি, মোহোর যে কোন গতি,
উত্তর না দেও সভাজন।
দ্রৌপদীর বাক্য শুনি, সভাসদে কাণাকাণি,
অন্যে অন্যে মুখ নিরীক্ষণ ॥

তাহা দেখি কম্পয়ে যে বীর বৃকোদর।
বজ্রসম গদা হস্তে কম্পে থর থর ॥
থাউক সেবিয়া ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির রাজা।
কুরুবল মারি আজি যমে কঁরো পূজা ॥
কোথায় আছয়ে ধর্ম্ম কেবা তাহা জানে।
কোন ধর্ম্ম সেবি রাজ্য পাইল দুর্য্যোধনে ॥
কিবা যে অধর্ম্মে আমি হারি পাশা খেরি।
কিবা অধর্ম্মে আনে দ্রৌপদীর কেশ ধরি ॥
কোন অধর্ম্মে বিবস্ত্রা করয়ে রজস্বলা।
কোন অধর্ম্মে সভাতে কাঁদয়ে সুন্দরী বালা ॥
এই দুঃখে ভীমসেন কম্পয়ে দ্বিগুণ।
অন্তরেতে মহাকোপ কম্পয়ে অর্জ্জুন ॥
নকুল সহদেব কম্পয়ে শরীর।
হাতে ধরি নিবারণ করে যুধিষ্ঠির ॥
যত অপরাধ মোর ক্ষম ভ্রাতৃ সব।
আপন অধর্ম্ম হইতে মজিবে কৌরব ॥
চক্ষু পাকায় ভীম যেন কাল যম।
বন্ধনে থাকিয়া যেন সর্পের বিক্রম ॥"

—সঞ্জয় বে, গ, পুঁথি, ১১৫ পত্র।

কর্ণের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন।

" তবে কর্ণ কটকের রঙ্গ বাড়াইতে।
একে একে সমাইরে লাগিল পুছিতে॥
কে আজি অর্জ্জুনে দেখাইতে পারে।
রত্নের শকট ভরি দিমু আজি তারে॥
বৎসের সহিত দিমু ধেনু একশত।
যে আজি অর্জ্জুনে দেখাইয়া দিব মোত॥
লেজ কালা ধোপ ঘোড়া বহে যেই রথ।
তাক দেই অর্জ্জুনেরে যে দেখায় মোত॥
ছএ হস্তি দিমু শকট ভরিয়া সোণা।
তাক দিমু অর্জ্জুনক দেখায় যেই জনা॥
শ্যাম তরুণী গীত বাদ্যে যে পণ্ডিতা।
একশত সুন্দরী সুবর্ণ অলঙ্কৃতা॥
তাক দেই যেই মোকে দেখায় অর্জ্জুন।
শতে শতে ঘোড়া রথ হস্তি যে সুবর্ণ॥
সবৎসা তরুণী ধেনু সুবর্ণ ভূষণ।
তাক দেঁহো যে আমারে দেখায় অর্জ্জুন॥
শুভ্র ঘোড়া পঞ্চশত, গ্রাম একশত।
তাহা দেঁহো যেই অর্জ্জুন দেখাএ মোত॥
কাম্বোজিয়া ঘোড়া বহে সোণার রথখান।
তাক দেই অর্জ্জুন দেখাএ আগুয়ান॥
ছএ শত হস্তি যে সুবর্ণ বিভূষিত।
সাগর তীরেতে জন্ম বীর্য্যে সুসারিত॥
চৌদ্দগ্রাম দেই তাক অতি সুচরিত।
নিকটে জীবন যেই নির্ভয় সতত॥
এক রাজা এক গ্রাম জুয়াএ ভুঞ্জিতে।
মগধের এক শত দাসী দেই তাতে॥"*

---

* এই অংশ পড়িয়া এ্যাকিলিসের ক্রোধ নিবৃত্তির জন্য এগাম্যামননের চেষ্টা মনে পড়ে,—

" Ten weighty talents of the purest gold,
And twice ten vases of refulgent mould;
Seven sacred tripods whose unsullied frame,
Yet knows no office nor has felt the flame;

শল্যের উত্তর।

"কোপ বাড়িবার শল্য বলে আর বার।
ফুটিলে অর্জ্জুন বাণ না গর্জ্জিবে আর॥
সুহৃদ নাহিক কর্ণ তোমা কেহ দেখে।
অগ্নিতে পতঙ্গ মরে তারে কেবা রাখে॥
অজ্ঞান মায়ের কোলে থাকিতে ছাওয়ালে।
চন্দ্র ধরিবারে হাত বাড়াএ কুতূহলে॥
সেইমত কর্ণ তুমি বোলরে দারুণ।
রথ হৈতে পড়িবারে চাহসি অর্জ্জুন॥
চোঁকা ধার ত্রিশূলেতে ঘষ কেন গাও।
হরিণের ছায়ে যেন সিংহের বোলাও॥
মৃত মাংস খাইয়া শৃগাল বড় স্থূল।
সিংহেরে ডাকএ সেই হইতে নির্ম্মূল॥
সূতপুত্র হৈয়া রাজপুত্রে ডাক কেনে।
মশা হৈয়া মত্ত হস্তি ডাক যুদ্ধে যেনে॥
গর্ত্তের কাল সাপ ঝোকাও কাটি দিয়া।
সিংহকে ডাকহ তুমি শৃগাল হইয়া॥
সর্প যেন ধাইয়া যায় মারিতে গরুড়ক।
সেইমত চাহ তুমি মারিতে অর্জ্জুনক॥
চন্দ্র উদয় যেন সাগর অন্তর।
বিনি নৌকাএ পার হৈতে চাহসি বর্ব্বর॥
সেইমত কর্ণ তোমার বুঝিল যে মন।
মেঘ মধ্যে শুনি যেন ভেকের গর্জ্জন॥"

—সঞ্জয়, বে, গ, পুঁথি, ৪৭৭ পত্র।

Twelve steeds unmatched in fleetness and in force,
And still victorious in the dusty course;
Seven lovely captives of the Sesbian line,
Skilled in each art, unmatched in form divine,
All these, to buy his friendship, shall be paid &c."

—Iliad, Book IX. (Pope's Translation.)

কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী।

সম্রাট্ হুসেন সাহ।

১৪৯৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫২৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সম্রাট্ হুসেন সাহ গৌড়দেশ শাসন করেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লিখিত আছে, হুসেন সাহ প্রথমে সুবুদ্ধি রায় নামক জনৈক হিন্দু জমিদারের ভৃত্য ছিলেন। একদা পুষ্করিণী-খনন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কর্ত্তব্যে অমনোযোগী হওয়াতে সুবুদ্ধি রায় তাঁহাকে বেত্রাঘাত করেন। হুসেন সাহ উচ্চবংশজাত ছিলেন, তিনি রাজ-সরকারে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে উজিরী পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং শেষে ১৪৯৪ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ মুজাফির সাহ নিহত হইলে গৌড়ের সম্রাট্রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। মুসলমানী ইতিহাসে এ কথা বিস্তারিত ভাবে লেখা নাই বলিয়া কেহ কেহ এ বৃত্তান্ত অমূলক মনে করেন। বৈষ্ণব গ্রন্থকার সেই সময়ের লোক, তিনি কল্পনা হইতে এই গল্পের উদ্ভব করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না; বরং ইতিহাস আলোচনায় এ কথা প্রামাণিক বলিয়াই বোধ হয়।*

যদিও প্রথমতঃ হুসেন সাহ উড়িষ্যার দেব দেবী ভগ্ন করিয়াছিলেন, † তিনি পরে হিন্দুগণের প্রতি বিশেষ সদয় ও উদার ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয়, তিনি চৈতন্য-প্রভুকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন; এ কথা অনেকটা বাদ দিয়া বিশ্বাস করিতে গেলেও মানিতে হইবে, তিনি চৈতন্য-প্রভুকে শ্রদ্ধা করিতেন। হুসেন সাহের সময় কামরূপ বিজিত হয়,

* "It is however certain, that on his first arrival in Bengal, he was for some time in a very humble position."

—Stewart's History of Bengal, p. 71.

† "যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িষ্যার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউলবিশেষে॥"—চৈ, ভা, অন্ত্য খণ্ড।

চট্টগ্রামে মগগণ পরাস্ত হয়, ত্রিপুরেশ্বরও মুসলমান-ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পৃথিবীর যে কোন সম্রাট্ বহু রাজ্য জয় করিয়া দীর্ঘ-কাল শান্তিতে রাজত্ব উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারই অসিবল হইতে প্রীতিবল বেশী প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। যে গুণে আকবর ভারত-ইতিহাসের কণ্ঠে কণ্ঠহার হইয়া রহিয়াছেন, সেই গুণে হুসেনসাহ বঙ্গের ইতিহাসের উজ্জ্বল রত্ন বলিয়া গণ্য হইবেন। একাব্বরী মোহরের ন্যায় হুসেনী মোহরও লোকপ্রীতির কল্পিত মূল্যে মূল্যবান্। রাজকৃষ্ণ বাবু বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন,—

"হুসেন সাহার রাজত্বকালে এতদ্দেশীয় ধনিগণ স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন, এবং যিনি নিমন্ত্রিত সভায় যত স্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন, তিনি তত মর্য্যাদা পাইতেন। গৌড় বা পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে যে সকল সম্পূর্ণ বা ভগ্ন অট্টালিকা পরিলক্ষিত হয়, তদ্দ্বারাও বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্যের ও তাৎকালিক শিল্প-নৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়; বাস্তবিক তখন এদেশে স্থাপত্যবিদ্যার আশ্চর্য্যরূপ উন্নতি হইয়াছিল, এবং গৌড়ে যেখানে সেখানে মৃত্তিকা খনন করিলে যেরূপ রাশি রাশি ইষ্টক দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমান হয় যে, নগরবাসী বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহে বাস করিত, দেশে অনেক হিন্দু ভূম্যধিকারী ছিলেন এবং তাঁহাদের ক্ষমতাও বিস্তর ছিল।"

হুসেন সাহ বঙ্গ-সাহিত্যের উৎসাহ-বর্দ্ধক ছিলেন; যে সভায় রূপ, সনাতন ও পুরন্দর খাঁ সভাসদ্ ছিলেন, সে সভায় হিন্দু মুসলমান একত্র হইয়া হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন; মালাধর বসুকে হুসেন সাহ "গুণরাজ খাঁ" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে হুসেন সাহের প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে, পদাবলীতেও হুসেন সাহের নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—শ্রীযুত হুসন, জগত ভূষণ, সোহ এরস জান। পঞ্চ গৌড়েশ্বর, ভোগ পুরন্দর, ভণে যশরাজ খান।"* পরাগলী মহাভারত ও ছুটি খাঁর অশ্বমেধ-পর্ব্বে পত্রে পত্রে হুসেন সাহের প্রশংসা ও গুণবর্ণনা দৃষ্ট হয়।

---

* সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৬ সন, ১ম সংখ্যা, ৮ পৃঃ।

পরাগল খাঁ।

এই রাজসভা হইতে দুইজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা মগীরাজার সৈন্যদিগকে চট্টগ্রাম হইতে দূর করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন; একজন স্বয়ং রাজকুমার—ভাবী সম্রাট্‌ নসরত্‌ সাহ, অপর—সেনাপতি পরাগল খাঁ।

ফণী নদীর (আধুনিক ফেণী) তীরে চট্টগ্রাম জোরওয়ারগঞ্জ থানার অধীন 'পরাগলপুর' এখনও বর্ত্তমান, 'পরাগলী দীঘি' অতি বৃহৎ; এখনও তাহার জল ব্যবহৃত হয়। পরাগল খাঁর প্রাসাদাবলী এখন রাশীকৃত ভগ্ন ইষ্টক-স্তূপে পরিণত। ইহারা কেহই সেই মগী-সৈন্য-জয়ী সেনাপতির কাহিনী লোকস্মৃতিতে আনিতে পারে নাই, কিন্তু একখানি তুলট কাগজে লিখিত কীটদংষ্ট্রাবিদ্ধ লূতাতন্তুজড়িত প্রাচীন পুঁথি লুপ্ত-স্মৃতির উদ্ধার করিয়াছে; সে পুঁথিখানি—

'পরাগলী ভারত।'

অথবা

কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিরচিত

মহাভারত।*

তাহার ভূমিকা এইরূপ;—

"নৃপতি হুসেন সাহ হএ মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥
অস্ত্র শস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হৈব যেন কৃষ্ণ অবতার॥
নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান হক্‌ সেনাপতি হওন্ত লস্কর॥

* কবীন্দ্র-রচিত ভারতের ১৬৪৬ শকের হাতের লেখা পুঁথি খরিদ করিয়া বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের লাইব্রেরীতে দিয়াছি। তাহা ছাড়া আরও দুইখানি পুঁথি পাইয়াছি, তাহার এক খানি ২০০ শত, আর একখানি প্রায় ২৫০ বৎসরের প্রাচীন।

লস্কর পরাগল খান মহামতি।
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি॥
লস্করী বিষয় পাই আইবন্ত চলিয়া।
চাটিগ্রামে চলি গেল হরষিত হৈয়া॥
পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নীতি হরষিত মতি॥"
—কবীন্দ্র বে, গ, পুঁথি, ১ পত্র।

পরাগল খাঁর পিতার নাম রাস্তি খাঁ ও পুত্রের নাম ছুটি খাঁ, এই পুঁথিতেই তাঁহাদের উল্লেখ আছে। কবীন্দ্র স্বীয় অনুগ্রাহক খাঁ মহাশয়ের গুণ প্রতি পত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, সময়ে সময়ে উচ্ছলিত কৃতজ্ঞতা-রসে পয়ারের বাঁধ ছুটিয়া গিয়াছে, পদ কোথায় দাঁড়াইয়াছে দেখুন;—

"ক্ষৌণী কল্পতরু শ্রীমান্ দীন দুর্গতি বারণ।
পুণ্যকীর্ত্তি গুণাস্বাদী পরাগল খান॥" বে, গ, পুঁথি, ৮৮ পত্র॥

কোন কোন স্থলে "শ্রীযুত পরাগল পদ্মিনী-ভাস্কর।" এইরূপ পদ দৃষ্ট হয়।

পরাগলী ভারত।

পরাগলী মহাভারত প্রায় ১৭০০০ শ্লোকে পূর্ণ। এ পুস্তকখানা উদ্ধার করা একান্ত আবশ্যক; শুনিয়াছি, পরাগল খাঁর বংশ এখনও বর্ত্তমান এবং তাঁহারা অবস্থাপন্ন লোক; ইহা প্রথমতঃ তাঁহাদেরই কার্য্য।

চট্টগ্রামের প্রাচীন ভাষা স্থলে স্থলে এত জটিল যে, অর্থ পরিগ্রহ করা যায় না; সহজ স্থল বাছিয়া কবীন্দ্রের কবিত্বের নমুনা দেখাইতেছি।

দ্রৌপদীর বিরাট নগরে আগমন।

"তার পাছে দ্রৌপদী সৈরন্ধ্রীরূপ ধরি।
অধিক মলিন বস্ত্রে গেলা একেশ্বরী॥
দূর হৈতে যায় যেন ত্রাসিত হরিণী।
নগরের নারী সব পুছন্ত কাহিনী॥

দ্রৌপদী বোলেন্ত সৈরন্ধ্রী মোর নাম।
দ্রৌপদীর পরিচর্য্যা কৈলুঁ অনুপাম॥
অন্তঃপুর নারী যত উত্তর না পাইল।
সুদেষ্ণা দেবীএ তাকে সাদরে পুঁছিল॥
সত্য কহ আহ্মাতে (*) কপট পরিহরি।
কি নাম তোহ্মার কহ কাহার বরনারী॥
দুই উরু গুরু তোর অতি সুবলিত।
নাভি গভীর তোমার বাক্য সুললিত॥
দশন ডালিম্ব বিজ্জুলি নয়ন।
রাজার মহিষী যেন সব সুলক্ষণ॥
কিবা গন্ধর্ব্বের তুহ্মি হয়সি বনিতা।
নাগকন্যা তুহ্মি কিবা নগরদেবতা॥
বিদ্যাধরী কিবা তুহ্মি কিন্নরী রোহিণী।
অনুসূয়া কিবা তুহ্মি উর্ব্বশী মানিনী॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা বরুণের নারী।
তোমারূপ দেখি আহ্মি লইতে না পারি॥
সুদেষ্ণার বচন যে শুনিআ তৎপর।
সেইখানে দ্রৌপদীএ দিলেন্ত উত্তর॥
আহ্মি দেবকন্যা নহি গন্ধর্ব্বের নারী।
সহজে সৈরন্ধ্রী আহ্মি কেশকর্ম্ম করি॥
মালিনী মোহোর নাম দ্রৌপদী ধরিল।
তোহ্মাকে সেবিতে মোর হৃদয় বাঞ্ছিল॥
তেকারণে আইলুঁ হেথা বিরাট নগর।
সত্য কথা কৈল এহি তোহ্মার গোচর॥
সুদেষ্ণাএ বোলেন্ত শুনহ বরনারী।
মাথে করি তোহ্মারে রাখিতে আহ্মি পারি॥

---

* 'আমি' স্থানে 'আহ্মি'ও 'তুমি' স্থানে 'তুহ্মি' পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন সমস্ত পুঁথিতেই দৃষ্ট হয়। সঞ্জয়-রচিত ভারতের প্রাচীন পুঁথিগুলিতেও তাহাই দৃষ্ট হয়। শুধু বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের কাপিতে 'আমি' 'তুমি' রূপ পাইয়াছি।

নারী সব তোহ্মা দেখি পাসরিতে নারে।
কেমত পুরুষ আছে ধৈর্য্য রাখিবারে ।।
রাজাএ দেখিলে তোহ্মা মজিবেক মন।
বল করি ধরিতে রাখিবে কোন জন ।।
আপন কণ্টক আহ্মি আপনে রোপিব।
মৃত্যুএ ধরিলে যেন বৃক্ষ আরোহিব ।।
কর্কটীর গর্ভ যেন মৃত্যুর কারণ।
তেনমত দেখি আহ্মি তোহ্মারে ধারণ ।।"*

—কবীন্দ্র, বে, গ, পুঁথি, ৫৭ পত্র।

---

* কবীন্দ্র সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি স্থানে স্থানে মূলের অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করিয়াছেন। সেকালের অনুবাদ-গ্রন্থের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। স্থানাভাবে সংস্কৃত উদ্ধৃত করিয়া বিশেষরূপে তুলনা করিতে পারিব না। দ্রৌপদীর বিরাট নগরে আগমনের অল্প কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা জৈমিনি ভারত হইতে নহে, মূল ব্যাসের মহাভারত হইতে উদ্ধৃত হইল, পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন।—

সুদেষ্ণোবাচ।

"মূর্দ্ধ্নি ত্বাং বাসয়েয়ং বৈ সংশয়ো মে ন বিদ্যতে।
ন চেদিচ্ছতি রাজা ত্বাং গচ্ছেৎ সর্ব্বেণ চেতসা ।।
স্ত্রিয়ো রাজকুলে যাশ্চ যাশ্চেমা মম বেশ্মনি।
প্রসক্তাস্ত্বাং নিরীক্ষন্তে পুমাংসং কং ন মোহয়েঃ ।।
বৃক্ষাংশ্চাবস্থিতান্ পশ্য যইমে মম বেশ্মনি।
তেঽপি ত্বাং স সন্নমন্তীব পুমাং সং কং ন মোহয়েঃ ।।
রাজা বিরাটঃ সুশ্রোণি দৃষ্ট্বা বপুরমানুষম্।
বিহায় মাং বরারোহে ত্বাং গচ্ছেৎ সর্ব্বেণ চেতসা ।।
অধ্যারোহেদ্ যথা বৃক্ষানবধায়েবাত্মনো নরঃ।
রাজবেশ্মনি তে শুভে অহিতাং স্যাত্তথা মম ।।
যথাচকর্কটকী গর্ভমাধত্তে মৃত্যুমাত্মনঃ।
তথা বিধমহং মন্যে বাসন্তব শুচিস্মিতে ।।"

শ্রীহরির রূপ বর্ণন।

"পরিধান পীতবর্ণ কুসুম বসন।
নবমেঘ শ্যাম অঙ্গ কমললোচন॥
মেঘের বিদ্যুত তুল্য হসিত মুখেত।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম এ চারি করেত॥
শিরেতে বান্ধিছে চূড়া মালতী মালাএ।
দেখিয়া মোহন বেশ পাপ দূরে যাএ॥"—৪৪ পত্র।

ভীষ্ম পর্ব্বে—যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ।

"দেখহ সাত্যকি মুঞি চক্র লইনু হাতে।
ভীষ্ম দ্রোণ কাটিয়া পাড়িমু রথ হৈতে॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র সব করিমু সংহার।
যুধিষ্ঠির নৃপতিক দিমু রাজ্যভার॥
এ বলিয়া সাত্যকীরে করি সম্বোধন।
হস্তেত লইল চক্র দেব জনার্দ্দন॥
সূর্য্যের সমান জ্যোতি সহস্র বজ্রসম।
চারিপাশে ক্ষুর তেজ যেন কাল যম॥
রথ হৈতে লাফ দিয়া চক্র লৈয়া হাতে।
ভীষ্মক মারিতে জাএ দেব জগন্নাথে॥
কৃষ্ণ অঙ্গে পীতবাস শোভিছে তখন।
বিদ্যুত সহিত যেন আকাশে শোভে ঘন॥
দেখিয়া সকল লোক বলিল তখন।
কৌরবের ক্ষয় আজি দেখিএ লক্ষণ॥
পদভরে কৃষ্ণের কম্পিত বসুমতী।
গজেন্দ্র ধরিতে যেন জাএ মৃগপতি॥
সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।
নির্ভএ বোলেন্ত তবে সংগ্রাম ভিতর॥
শ্রীযুত পরাগল খান পদ্মিনী-ভাস্কর।
কবীন্দ্র কহন্ত কথা শুনন্ত লস্কর॥"—১০৫ পত্র।

পরাগল খাঁর মৃত্যুর পরে তৎপুত্র ছুটি খাঁকে সম্রাট্ হুসেন সাহ সেনাপতির পদে বরণ করেন। ছুটি খাঁর গৌরব বর্ণনা করিয়া কবীন্দ্র লিখিয়াছেন,—

ছুটি খাঁ।

"তনয় যে ছুটি খান পরম উজ্জ্বল।
কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিল সকল॥"—বে, গ, পুঁথি, ৮৮ পত্র।

ছুটি খাঁও পিতার দৃষ্টান্তানুসারে শ্রীকরণ নন্দীকে অশ্বমেধপর্ব্বের অনুবাদ করিতে আদেশ করেন; এই কবির কল্পনা বৃক্ষবাহিনী লতার ন্যায় আকাশ ছুঁইতে ইচ্ছুক। ইনি স্বীয় প্রভুর মনস্তুষ্টি কিরূপে করিতে হয়, বিশেষরূপে জানিতেন। কল্পনার তৈলাধার মুক্ত করিয়া ইনি ছুটি খাঁর পদ সেবা করিয়াছেন। আমরা সাহিত্যপত্রিকায় * যাহা উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, সেই অংশ পুনঃ এস্থলেও উদ্ধৃত করিতেছি,—

"নসরত সাহ তাত † অতি মহারাজা।
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা॥
নৃপতি হুসেন সাহ হএ ক্ষিতিপতি।
সামদানদণ্ডভেদে পালে বসুমতী॥
তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটি খান।
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান॥
চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে।
চন্দ্রশেখর পর্ব্বত কন্দরে॥
চারলোল গিরি তার পৈত্রিক বসতি।
বিধিএ নির্ম্মিল তাঁক কি কহিব অতি॥
চারিবর্ণ বসে লোক সেনা সন্নিহিত।
নানাগুণে প্রজা সব বসয়ে তথাত॥
ফণী নামে নদীএ বেষ্টিত চারিধার।
পুর্ব্বদিগে মহাগিরি পার নাহি তাঁর॥

---

* সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩০১।

† নসরত সাহ চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন, তাই তাঁহার পিতা অপেক্ষা তিনি সে দেশে বেশী পরিচিত ছিলেন এবং সেই জন্য কবি পুত্রের নামে পিতার পরিচয় দিতেছেন। নসরত সাহ বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহবর্দ্ধক ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে; আমরা বৈষ্ণব পদাবলীতেও নসরত সাহের উল্লেখ দেখিতে পাই—"সে যে নসিরা সাহ জানে, যারে হানিল মদন বাণে।" (সাধনা, শ্রাবণ ১৩০০, ২৭২ পৃঃ)।

লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভএ ছুটি খান মহাশয়॥
আজানুলম্বিত বাহু কমল লোচন।
বিলাস হৃদয়ে মত্ত গজেন্দ্র-গমন॥
চতুঃষষ্টি কলা বসতি গুণের নিধি।
পৃথিবী বিখ্যাত সে যে নির্ম্মাইল বিধি॥
দাতা বলি কর্ণ সম অপার মহিমা।
শৌর্য্যে বীর্য্যে গাম্ভীর্য্যে নাহিক উপমা॥
তাহান যত গুণ শুনিয়া নৃপতি।
সম্বাদিয়া আনিলেক কুতূহল মতি॥
নৃপতি অগ্রেত তার বহুল সম্মান।
ঘোটক প্রসাদ পাইল ছুটি খাঁন॥
লস্করী বিষয় পাইয়া মহামতি।
সামদানদণ্ডভেদে পালে বসুমতী॥
ত্রিপুর নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ।
পর্ব্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ॥
গজ বাজি কর দিয়া করিল সম্মান।
মহাবন মধ্যে তাঁর পুরীর নির্ম্মাণ॥
অদ্যাপি ভয় না দিল মহামতি।
তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুর নৃপতি॥
আপনে নৃপতি সম্ভপিয়া বিশেষে।
সুখে বসে লস্কর আপনার দেশে॥
দিনে দিনে বাড়ে তার রাজসম্মান।
যাবত পৃথিবী থাকে সম্ভতি তাহান॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে সভাখণ্ড মহামতি।
একদিন বসিলেক বান্ধব সংহতি॥
শুনন্ত ভারত তবে অতি পুণ্য কথা।
মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা॥
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়॥
দেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চারৌক কীর্ত্তি মোর জগত সংসার॥
তাহান আদেশ মাল্য মস্তকে ধরিয়া।
শ্রীকর নন্দী কহিলেক পয়ার রচিয়া॥"

ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, সে গুলি ছুটি খাঁর পদে পুষ্পবিল্বদলে অর্চ্চনা। ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিবেন, এগুলা

ঝুঁটা ফুলের অঙ্গুলি ; সে সময়ে ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধন্যমাণিক্য ও তাঁহার সেনাপতি মহাবীর চয়চাগ রণক্ষেত্রে মুসলমানগণকে দেখাইয়াছিলেন,—ত্রিপুরপাহাড়ের তীব্র বায়ু তাহারা সহ্য করিতে অশক্ত। তথাপি আমরা কবির কল্পনাকে ধন্যবাদ দিব ; সত্য হইতে মিথ্যার ছবিই কবির তুলিতে সুন্দর হয়. চার্ল্‌স্ সেকেণ্ডের নিকট একবার এক কবি এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শ্রীকরণ নন্দীর কবিত্ব।

নন্দী কবির কবিত্ব একটুকু ব্যঙ্গ মিশ্রিত হইয়া মধ্যে মধ্যে বড়ই মনোরম হইয়াছে, আমরা ভীম ও কৃষ্ণের উত্তর-প্রত্যুত্তর উদ্ধৃত করিতেছি।—ভীম যুবনাশ্বের পুরী হইতে অশ্ব আনয়নের জন্য মনোনীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই। অনেকগুলি যুক্তির মধ্যে এই একটি,—

"বহু ভক্ষ হএ ভীম স্থূল কলেবর।
হিড়িম্বা রাক্ষসী ভার্য্যা যাহার সহচর॥"

ভীমের উত্তর।

"কৃষ্ণের বচনে ভীম রুষিয়া বলিল।
মোকে মন্দ বল কৃষ্ণ নিজ না দেখিল॥
তোহ্মার উদরে যত বসে ত্রিভুবন।
আহ্মার উদরে কত অন্ন ব্যঞ্জন॥
সংসার উপালম্ভ সব খাইলা তুহ্মি।
তাহা হৈতে বহু ভয়ংকর বোলে আহ্মি॥
ভল্লুক কুমারী তোমার ঘরে জাম্বুবতী।
তাহা হৈতে অধিক বোল হিড়িম্বা যুবতী॥
তুহ্মি নারীজিৎ না হও আহ্মি নারীজিৎ।
আপন না দেখিয়া মোক বল বিপরীত॥"

ভাষার জটিলতা হেতু উদ্ধৃত ছত্রগুলিতে তোত্‌লার রাগ মনে পড়ে। কাশীদাস এস্থল মসৃণ করিয়াছেন, কিন্তু ব্যঙ্গের তীক্ষ্নত্ব হ্রাস হইয়াছে।

একখানা প্রাচীন পরাগলী ভারতে আমরা একস্থলে এইরূপ ভণিতা পাইয়াছি।—

"কহে কবি গঙ্গানন্দী, লেখক শ্রীকরণ নন্দী।" এই গঙ্গানন্দী আবার কে? শ্রীকরণ নন্দীই বা এস্থলে কবির আসন হইতে লেখকের আসনে নামিলেন কেন? হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির আলোচনায় নানারূপ জটিল প্রশ্নের উদয় হয়, অতীতের অন্ধকারে কল্পনার আলেয়া ভিন্ন অনেক সময়েই পথ আবিষ্কারের অন্য উপায় দেখা যায় না।

জৈমিনি-ভারত।

সঞ্জয়, কবীন্দ্র, শ্রীকরণ নন্দী ও পরবর্ত্তী অনুবাদকারিগণের প্রায় সকলেই জৈমিনি-সংহিতা * দৃষ্টে অনুবাদ সঙ্কলন করিয়াছেন, এরূপ লিখিয়াছেন। ব্যাসের সঙ্গে ইঁহাদের সম্পর্ক অতি অল্প, মধ্যে মধ্যে দোহাই আছে এই পর্য্যন্ত। বঙ্গের মৃদু-সমীর-স্পর্শ-সুখে কি ব্যাস ঋষি নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন? জৈমিনির প্রতি সকলের লক্ষ্য হইল কেন?

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানকারী, জৈমিনি তাঁহাদের অগ্রণী; তাঁহারই শিষ্য ভট্টপাদ, রাজা সুধন্বার সভায় বৌদ্ধকুল বিজয় করেন। শঙ্কর ইঁহাদের পরবর্ত্তী। জৈমিনি ভারত-গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করেন; মহাভারত শাস্ত্রকারদিগের মতে দুস্তর ভব-সাগর পার হইবার একমাত্র সেতু, কিন্তু ব্যাসকৃত সেতুবন্ধ প্রায় ভবসমুদ্রের ন্যায়ই বিরাট; তাই জৈমিনি সহজ পথের আবিষ্কার করিয়া ভবার্ণবের বিপন্ন পথিকদিগকে ত্রাণ করিলেন। জৈমিনি-ভারত দেশময় প্রচলিত হইয়াছিল; অনেক বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথিতে জৈমিনি-ভারতের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা চণ্ডীকাব্যে শ্রীমন্তের বিদ্যারম্ভে,—

* জৈমিনি ভারতের কেবল অশ্বমেধ পর্ব্ব পাওয়া গিয়াছে, এখনকার ঐতিহাসিকগণের মতে জৈমিনি শুধু অশ্বমেধ পর্ব্বেরই অনুবাদ করিয়াছিলেন। ভারতীয় প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান শেষ না হইলে এই মত অকাট্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

"জৈমিনি-ভারত. স্তুত, তবে পড়ে মেঘদূত,
নৈষধে কুমারসম্ভবে।"

অনুবাদ-শাখা—(গ) মালাধর বসু।

কুলীনগ্রামের বসুবংশ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। গ্রামখানি দুর্গ-সংরক্ষিত ছিল; এই পথের যাত্রিগণ বসু মহাশয়দিগের নিকট হইতে 'ডুরি' প্রাপ্ত না হইলে জগন্নাথ-তীর্থে যাইতে পারিতেন না। মালাধর বসু ও হুসেন সাহেব মন্ত্রী গোপীনাথ বসু (উপাধি পুরন্দর খাঁ) এক সময়ের লোক। * বসু পরিবার বৈষ্ণব-ধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন; মালাধর বসুর পৌত্র বসুরামানন্দের নাম বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত।

মালাধর বসু।

মালাধর বসু আদি বসু হইতে অধস্তন ২৪শ পুরুষ; ইঁহার পিতার নাম ভগীরথ বসু ও মাতার নাম ইন্দুমতী দাসী।

মালাধর বসু হুসেন সাহ হইতে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সেকালের উপাধিগুলি কিছু অদ্ভুত রকমের

---

* মালাধর বসু গোপীনাথ বসুর জ্ঞাতি-ভ্রাতা ছিলেন। পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী' নামক পুস্তকের একটি পদ দৃষ্টে কেহ কেহ অনুমান করেন, গোপীনাথ বসু 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। ভণিতার অংশটি এইরূপ:—"শ্রীযুত হুসন, জগত-ভূষণ, সোহ এ রস জান। পঞ্চ গৌড়েশ্বর, ভোগ পুরন্দর, ভণে যশরাজ খান।" প্রাচীন তাম্রফলক ইত্যাদিতে ভোগ শব্দ সচিব অর্থে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা হইলেও পুরন্দর এবং যশরাজ খান যে এক ব্যক্তি তাহা প্রমাণিত হইতেছে না; অপিচ পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগে ইন্দ্রতুল্য, এরূপ অর্থ করিলে 'পুরন্দর' শব্দকে আর মনুষ্যবিশেষের সংজ্ঞারূপে গণ্য না করিলেও চলে। যাহা হউক সামান্য একটি পদের সন্দেহাত্মক ভণিতার উপর নির্ভর করিয়া আমরা এ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিতে পারিলাম না। মালাধর বসু আদিশূর-আনীত দশরথ বসু-বংশীয়। বংশাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১। দশরথবংশীয় কৃষ্ণ বসু (বল্লালসেনের সমসাময়িক), ২। ভবনাথ, ৩। হংস, ৪। মুক্তি, ৫। দামোদর, ৬। অনন্ত, ৭। গুণাকর, ৮। শ্রীপতি, ৯। যজ্ঞেশ্বর, ১০। ভগীরথ, ১১। মালাধর বসু (গুণরাজ খাঁ)। মালাধরের ঊর্দ্ধতন ৫ম পুরুষ গুণাকরের জ্যেষ্ঠপুত্র লক্ষ্মণ হইতে পুরন্দর খাঁ অধস্তন পঞ্চম স্থানীয়।

ছিল; 'পুরন্দর খাঁ,' 'গুণরাজ খাঁ' এই সব রাজ-দত্ত খেতাব। আমরা একখানি প্রাচীন কৃত্তিবাসী রামায়ণে কৃত্তিবাসকে 'কবিত্ব-ভূষণ' উপাধি-বিশিষ্ট দেখিয়াছি। এই 'কবিত্ব-ভূষণ' রাজ-দত্ত উপাধি অথবা পুঁথি-লেখকের জাল প্রশংসাপত্র, স্থির করিতে পারিলাম না; যাহা হউক, 'গুণরাজ' উপাধি দেশে প্রচলিত ছিল; আমরা ষষ্ঠীবর কবিকেও 'গুণরাজ' উপাধিযুক্ত পাইয়াছি। অধ্যাপকগণ দক্ষিণাপ্রাপ্ত হইয়া কাণাকেও 'কমলাক্ষ' নাম দিতে পারেন, কিন্তু গৌড়ের সম্রাট্ নির্গুণকে 'গুণরাজ' উপাধি দেন নাই; বৈষ্ণবোচিত বিনয় সহকারে মালাধর নিজকে 'নির্গুণ' 'অধম' প্রভৃতি সংজ্ঞায় জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

১৩৯৫ শকে (১৪৭৩ খৃঃ) মালাধর বসু ভাগবতের বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হন ও ৭ বৎসরে দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ সমাধা করেন। * এই অনুবাদ-গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়,' কোন কোন প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে 'গোবিন্দ-বিজয়' নাম দৃষ্ট হয়; শেষ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে, এইজন্যই বোধ হয় 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' নাম দেওয়া হইয়াছে, প্রাচীনকালে 'মৃত্যু,' বা 'যাত্রা' এই দুই অর্থে 'বিজয়' শব্দ ব্যবহৃত হইত। ভগবতী যে দিন পৃথিবী হইতে কৈলাস গমন করেন সেই দিন 'বিজয়ার দিন' নামে পরিচিত।

মূল ও অনুবাদ।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের কবি সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মূল গ্রন্থের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় মিলাইয়া দেখিলে অনুমিত হইবে, মালাধর বসু শুধু কথকদিগের মুখে শুনিয়া ভাগবতপ্রণয়ন করেন নাই, তিনি স্বয়ং ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। সেকালে ঠিক অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া অনুবাদ করার পদ্ধতি প্রচলিত

---

* "তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥"—শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।

ছিল না; 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়'ও সেরূপ অনুবাদ নহে, তবে মূলের সঙ্গে কতকটা ভাষাগত সংস্রব না আছে এমন নহে; নিম্নে উদাহরণরূপে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

মূল হইতে অনুবাদিতঃ—

(১) "কোন সময় বনেতে প্রথম ভোজন করিবার মানসে প্রত্যুষে হরি গাত্রোত্থান করিলেন, এবং বৎসপালক বয়স্যদিগকে প্রবোধিত করিয়া মনোহর শৃঙ্গ-ধ্বনি করিতে করিতে বৎস সকলকে অগ্রে করিয়া নির্গত হইলেন।

কতিপয় বালক বংশী-বাদ্য করিতে করিতে, কতকগুলি শৃঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে, কতিপয় অর্ভক ভৃঙ্গসহ গান করিতে করিতে, অন্য বালকেরা কোকিল-সঙ্গে কলরব করিতে করিতে খেলা করিতে লাগিল। অপর শিশুরা পক্ষীদিগের ছায়ায় ধাবন, হংসদিগের সহিত গমন, বক-সঙ্গে উপবেশন, ও ময়ূর-সহ নৃত্যে প্রবৃত্ত হইল। আর কোন কোন বালক বানরশিশুদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।"—শ্রীমদ্ভাগবত। ১০ম স্কন্ধ, ১২শ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় *ঃ—

"প্রভাতে ভোজন করি শিঙ্গা বাজাইয়া।
পিছে পিছে চলে যত বাছুর চালাইয়া॥
একত্র হইল সব যমুনার তীরে।
নানামতে ক্রীড়া করি যায় দামোদরে॥
কথাতে কোকিল পক্ষিগণে নাদ করে।
তার সঙ্গে নাদ করে দেব গদাধরে॥
কথাতে মর্কটশিশু লাফ দেহি রঙ্গে।
সেই মতে যায় কৃষ্ণ বালকের সঙ্গে॥
কথাতে ময়ূর পক্ষী মধু নাদ করে।
সেই মত নৃত্য করে দেব দামোদরে॥
কথা কথা পক্ষীএ আকাশে উড়ি যাই।
তার ছায়া সঙ্গে নাচে রামকাহ্নাই॥

---

* মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় আমার নিকট আপাততঃ নাই। পূর্ব্ববঙ্গে প্রাপ্ত প্রায় ২০০ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি হইতে এই অংশ এবং পরবর্ত্তী অংশগুলি উদ্ধৃত।

কথা বা সুগন্ধি পুষ্প তুলিয়া মুরারি।
কত হৃদে মস্তকে শ্রবণে কেশে পরি॥"

মূল [illegible] অনুবাদিত :—

(২) "কোন কোন গোপাঙ্গনা গো দোহন করিতেছিল, তাহারা দোহন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সমুৎসুক হইয়া গমন করিল। অন্যান্য গোপী অন্ন পাকানন্তর মহানসে রাখিয়া স্থালীস্থ জল নিস্সারণ করিতেছিল, সমুদায় ক্বাথ-নির্গম প্রতীক্ষা করিতে পারিল না। অপরা গোপী গোধূম কণান্ন রন্ধন করিতেছিল, পক্ক অন্ন না নাবাইয়াই চলিল। কোন কোন গোপী গৃহে অন্নাদি পরিবেশন করিতেছিল, কেহ কেহ শিশুদিগকে দুগ্ধ পান করাইতেছিল, অন্য কয়েক জন পতিশুশ্রূষায় রত ছিল, তাহারা তত্তৎ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গেল। অন্য গোপাঙ্গনাগণ ভোজন করিতেছিল, গীত শুনিবামাত্র আহার ত্যাগ করিয়া চলিল।" ১০ম স্কন্ধ, ২৯ অঃ।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে,—

"সবার হৃদয়ে কানু প্রবেশ করিয়া।
বেণুদ্বারে গোপীচিত্ত আনিল হরিয়া॥
ছাওয়ালের স্তন পান করে কোন জন।
নিজপতি সঙ্গে কেহ করেছে শয়ন॥
গাভী দোহায়েন্ত কেহ দুগ্ধ আবর্ত্তনে।
গুরুজন সমাধান করে কোহ্ন জনে॥
ভোজন করএ কেহ করে আচমন।
রন্ধনের উদ্যোগ করয়ে কোহ্ন জন॥
কার্য্য হেতু কেহ কারে ডাকিবার যায়।
তৈল দেহি কোহ্নজন গুরুজন পাএ॥
কেহ কেহ পরিবার জনেরে প্রবোধে।
কেহ ছিল কার কার্য্য অনুরোধে॥
হেনহি সময়ে বেণু শুনিল শ্রবণে।
চলিল গোপিকা সব যে ছিল যেমনে॥"

এই সকল অংশ আমরা বাছিয়া উঠাই নাই; মূলের সঙ্গে ইহার মোটামুটি বেশ ঐক্য আছে, কেবল রাধিকার প্রসঙ্গ ভাগবত-বহির্ভূত।

শ্রীমতী রাধা প্রথমতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও আর কয়েকখানি সংস্কৃত-গ্রন্থ আশ্রয় করিয়া শুভ দিনে আর্য্যাবর্ত্তের দেব-মণ্ডপে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন; চির-শ্রদ্ধেয় দেবদেবীগণ প্রকৃতির এই [illegible]-হীনা নগ্ন-সৌন্দর্য্যময়ীর অন্তরালে পড়িয়া গেলেন; সদ্যঃ-চ্যুত অনাঘ্রাত মালতী-পুষ্পের ন্যায় এই দেবীকে পাইয়া কবি ও ভক্ত আনন্দিত হইল; চিরারাধ্যা দুর্গা ও কালীর উদ্দেশে আহৃত পুষ্পমালা শ্রীরাধিকার কণ্ঠে দোলাইয়া দিল। বঙ্গদেশে কুসুম-সিংহাসনে, ফুল্ল পঙ্কজ ও চন্দনার্দ্র তুলসী-দলে সজ্জিত হইয়া শ্রীরাধিকা অধিষ্ঠিত হইলেন; প্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্যের সার সৌন্দর্য্য তাঁহারই চরণকমলের সুগন্ধি। রাই কানু নাম বঙ্গ-সাহিত্য হইতে বাদ দিলে, এই দেশের অতীত ও ভাবী শত সহস্র উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার শিরে বজ্রাঘাত করা হয়; এই দেশে সেই সব সঙ্গীতের তুল্য মনোহারী কিছু হয় নাই।

দানলীলা অধ্যায়ে কবি মালাধর বসু এই নূতন সৌন্দর্য্যের রেখাপাত করিয়াছেন। ভাগবতের গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেবতা ভাবিয়া পূজা করিতেছে, তাঁহাদের প্রেম শ্রীকৃষ্ণের দেবশক্তিতে বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত, সুতরাং তাহা কতকাংশে বিস্ময়েরই উচ্ছ্বাস; কিন্তু তুল্য জ্ঞান না হইলে বাহু জড়াইয়া আলিঙ্গন করা যায় না, হাত বাড়াইয়া ফুল্ল ফুলটি পদে রাখিয়া আসা যায় মাত্র। ভক্তের মত ভক্ত হইলে, দেবতা ও ভক্তের আসন একস্থানে, কারণ ভক্ত ভিন্ন দেবতা কাষ্ঠ-পুত্তলি মাত্র, চকোর এবং চন্দ্রে প্রকৃত প্রেম হয় না; চণ্ডীদাস বলিয়াছিলেন—

"কি ছার চকোর চাঁদ,—দুহুঁ সম নহে।"

ভাগবতের অসম্পূর্ণ অংশ মালাধর বসু এই স্থলে পূরণ করিয়াছেন। দানলীলা ও পার-খণ্ডে, রাধিকা ও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কৌতুক করিতে ও তাঁহাকে মানভরে গালি দিতে শিখিয়াছে; এখানে শ্রীকৃষ্ণ পীতধড়া-পরিহিত বংশীধারী প্রস্তরমূর্ত্তি নহেন; তিনি প্রেমিকশিরোমণি,

চতুরচূড়ামণি। ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে প্রেমদান করিয়া অনুগৃহীত করেন; শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের নায়ক প্রেম দিয়া যেরূপ অনুগৃহীত করেন, প্রেম পাইয়াও সেইরূপ অনুগৃহীত হন।

দক্ষিণা পবনে নৌকা টলমল করিতেছে, তখন—

"কি হৈল কি হৈল কাঁদে গোপনারী।"

এবং "কাঁধে কেরৈবাল করি হাসয়ে মুরারি॥"—শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।

ইহার পরে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে বলিতেছেন; এবং তজ্জন্য যে সকল উৎকোচ দিবেন তাহার ফর্দ্দ এইরূপ:—

"কেহ বলে পরাইমু পীত বসন।
চরণে নূপুর দিমু বলে কোহ্ন জন॥
কেহ বলে বনমালা গাঁথি দিমু গলে।
মণিময় হার দিমু কোহ্ন সখী বলে॥
কটিতে কঙ্কণ দিমু বলে কোহ্ন জন।
কেহ বলে পরাইমু অমূল্য রতন॥
শীতল বাতাস করিমু অঙ্গ জুড়ায়।
কেহ বলে সুগন্ধি চন্দন দিমু গাএ॥
কেহ বলে চূড়া বানায়িমু নানা ফুলে।
মকর কুণ্ডল পরাইমু শ্রুতিমূলে॥
কেহ বলে রসিক সুজন বড় কাণ।
কর্পূর তাম্বুল সমে জোগাইব পান॥"—শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এ সব কিছুই চান না। গোপীগণের ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও আশা উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে—তিনি বলিলেন—"প্রথম মাগিএ আমি যৌবনের দান।" রাধিকা ক্রুদ্ধা, তিনি এ প্রস্তাবে নিজকে বড় অপমানিত মনে করিলেন, তখন হাসিয়া হাসিয়া,—

"কানু বলে সত্য কহি বিনোদিনী রাই।
নবীন কাণ্ডারী আমি নৌকা নাহি বাই॥"—শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।

এই খানে প্রাণের খেলা,—মাধুর্য্যের এক নব বিকাশ-চেষ্টা, যাহা পদকর্ত্তৃগণ সম্পূর্ণ বিকাশ করিয়াছেন ভালবাসার মাহাত্ম্যে আরাধ্য ও আরাধকের এই গূঢ় চিত্তসংযোগ—শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে অভিনব বস্তু। তাই কাব্যের এই স্থানের মৌলিক রসধারায় অনুবাদের কৃত্রিমতা নাই; ভালবাসার শাস্ত্র ভাগবতের পর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে আর একটুকু অগ্রসর হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যদেব যে সমস্ত ভাষাগ্রন্থ পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া সুখী হইতেন, শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় তাহার অন্যতম।

---

(৩) লৌকিক ধর্ম্ম-শাখা।

(ক)—লৌকিক ধর্ম্মের উৎপত্তি।

(খ)—শিবের ছড়া।

(গ)—চাঁদ সদাগর, বেহুলা ও মনসা।

(ঘ)—কাণা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও কবি জনার্দ্দন প্রভৃতি।

লৌকিক ধর্ম্মের দেবতা।

মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্ঠী, সত্যনারায়ণ, দক্ষিণের রায়—ইঁহারা বাঙ্গালীর ঘরের দেবতা। ইঁহাদের শাস্ত্র বঙ্গভাষাতেই লিখিত; বঙ্গীয় গৃহস্থবধূগণই ইঁহাদের পূজার উৎকৃষ্ট পুরোহিত, ইঁহাদের ছড়া-পাঁচালী মুখস্থ করা গৃহস্থবধূগণের অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণিত ছিল; ইঁহারা কেহ সপ্তাহান্তে, কেহ মাসান্তে খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরে এখনও পূজা পাইয়া থাকেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সব দেবতার ছড়া-পাঁচালী প্রথমে নগণ্যভাবে গ্রথিত হইয়া কাল-

ছড়া ও পাঁচালী।

সহকারে যুগে যুগে কবিগণের হস্তস্পর্শে বিশাল কাব্যরূপে বিকাশ পাইয়াছে; ক্ষমতাপন্ন শেষ কবি যশের ভাগটা নিজেই সমস্ত একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। এই সব

ছড়া-পাঁচালী শিশুর ক্রীড়নকের ন্যায় নগণ্য, কিন্তু এই উপকরণরাশির আয়তন বর্দ্ধিত করিয়া কবিগণ কিরূপে উৎকৃষ্ট কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন, মানব-মন কিরূপে যুগব্যাপী চেষ্টায় অতি সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে অতি বিশাল সৌন্দর্য্যের পট আয়ত্ত করিয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া কেবল কাব্যামোদীর পরিতৃপ্তি হইবে না, মনোবিজ্ঞানের পাঠকও মানসিক গতিবিধির একটি আশ্চর্য্য ক্রম-বিকাশ লক্ষ্য করিয়া নব শিক্ষা লাভ করিবেন।

লৌকিক দেবতা-পূজার উৎপত্তি।

লৌকিক-দেবতাগণের পূজাপ্রচলনের কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। যেখানে আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ি, সেইখানেই একটি দুর্ব্বলের সহায় দেবতার আবশ্যক হয়। শিশুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য চিন্তিতা মাতা, কি মাতামহীর দুর্ব্বলতাসূত্রে ষষ্ঠী কল্পিত হইলেন। চণ্ডিকা ও হরি চির-প্রসিদ্ধ দেবতা; কিন্তু বিপদ্‌নিবারণার্থ ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি-কল্পে এই দুই দেবতা ঈষৎ নাম ও ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া দুর্ব্বলের সহায়রূপে উপনীত হইলেন; একজনের নাম হইল, মঙ্গলচণ্ডী; আর একজনের নাম হইল, সত্যনারায়ণ। এ চণ্ডী শুধু বিপদ-ত্রাণ-কারিণী; ইনি বসন্তকালে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যে মধু-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, কিম্বা যে বেশে বৎসরান্তে পিত্রালয়ে আগমন করেন, এখানে সে বেশে আসেন নাই—এখানে ইনি শুধু বিপদ-বারিণী। সত্যনারায়ণ ননীচোর গোপাল হইতে পৃথক দেবতা; ইনি অর্থসম্পদদাতা, কুবের স্থানীয়।

সাহিত্যে ব্যাঘ্র ও সর্প।

বঙ্গদেশে যখন নীল সমুদ্র-গর্ভে বিচ্ছিন্ন দ্বীপপুঞ্জের সমষ্টি ছিল এবং আর্য্যগণ যখন এই রাজ্যে প্রথম বসতি স্থাপন করেন, তখন সর্প ও ব্যাঘ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের এই বনপ্রদেশ অধিকার করিতে হইয়াছিল। সিংহবাহুর জন্ম-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কৌতুকাবহ গল্প ইতিহাসের পাঠক অবগত আছেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ব্যাঘ্রাদির সঙ্গে যুদ্ধ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। কালকেতু

ও লাউসেনের সঙ্গে ব্যাঘ্রযুদ্ধ চণ্ডীকাব্য ও শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে পাইয়াছি, কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গলে মোল্লাদিগের সঙ্গে একটি ভীষণ ব্যাঘ্রযুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই সব উপাখ্যান-বর্ণিত ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশুর সঙ্গে মনুষ্যের আলাপ ব্যবহার বর্ণনায় কবি-কল্পনা অনেক দূর গড়াইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অসির সঙ্গে শৃঙ্গ ও নখরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঠিক কল্পনার কথা নহে; এই প্রতিযোগিতায় অসি-অগ্রভাগে শৃঙ্গ ও নখর ভগ্ন হইয়াছিল, এবং অসিধারীকে শৃঙ্গী ও নখিগণ স্বরাজ্য ছাড়িয়া দিয়াছিল। সভ্যতার দ্বিতীয় পর্য্যায়ে গুলির নিকট অসি হটিয়াছে; হায়, কবে প্রীতির নিকট অসি, গুলি, নখ, শৃঙ্গ সকল অস্ত্রই পরাজয় স্বীকার করিবে!

সুন্দরবনের জগৎপ্রসিদ্ধ ব্যাঘ্রাচার্য্যদের সঙ্গে বিরোধ করাও মনুষ্যের পক্ষে বরং সহজ; অন্ততঃ উভয় পক্ষেরই তুল্য সুবিধাজনক ক্ষেত্রে যুদ্ধ চলিতে পারে; কিন্তু কেউটার দন্ত অলক্ষ্যে দংশন করে। বিশেষতঃ ব্যাঘ্র শুধু বনবাসী শত্রু, সর্প গৃহস্থের গৃহ-শত্রু; কোন্ ছিদ্র হইতে বিষ উদ্গিরণ করিবে, নিশ্চয় নাই; এইজন্য ব্যাঘ্রের দেবতা 'দক্ষিণের রায়' অপেক্ষা সর্পের দেবতা 'মনসাদেবী'র প্রতিপত্তি বেশী হইয়াছিল। ইহা ছাড়া বৌদ্ধগণের হারিতীদেবীও স্কন্দপুরাণ এবং পিচ্ছিলাতন্ত্রোক্ত কয়েকটি শ্লোক হইতে নব শক্তি লাভ করিয়া এই বিস্ফোটক-জ্বর-পীড়িত বঙ্গদেশে সহজেই পূজামণ্ডপে স্থান পাইলেন। ডোমাচার্য্যগণের পূজিত সিন্দূর-মণ্ডিত ব্রণচিহ্নাঙ্কিত ধাতুময় মুখবিশিষ্ট অবয়ব ত্যাগ করিয়া ইনি হিন্দু ব্রাহ্মণের হস্তে মৃণাল-তন্তু সদৃশী, মার্জ্জনী-কলসোপেতা, সূর্পালঙ্কৃতমস্তকা শীতলা দেবী হইয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার পূজাপ্রচারার্থও কয়েকখানি নাতিবৃহৎ কাব্য বাঙ্গালা-ভাষায় রচিত হইয়াছিল।

(খ) শিবের ছড়া।

অধ্যায়-ভাগে আমরা যে সকল দেবতার নাম করিলাম, তন্মধ্যে শিব

ঠাকুরের নাম উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু শিবঠাকুরও তাঁহার বেদোক্ত রুদ্রমূর্ত্তি ও পুরাণোক্ত সামা-সমাধি-মূর্ত্তি—উভয় ভাবই ত্যাগ করিয়া বঙ্গীয় কৃষকের নিকট কৃষাণ দেবতারূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আমরা পূর্ব্বে তাহা একবার উল্লেখ করিয়াছি। স্ত্রীলোকগণ ধান ভানিবার সময় এই শিবের ছড়াই গান করিত। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই শিবের ছড়ায় শিবঠাকুর ক্ষেতের মশা ও জোঁক তাড়াইবার উপদেশ দিতেছেন। আমরা দেখিতে পাই, বঙ্গীয় পঞ্জিকায় শিব কৈলাস পর্ব্বতে সমাসীন হইয়া গৌরীর নিকট গ্রহতত্ত্ব বর্ণনা করিতেছেন। বামাচারীদের তন্ত্রে ইনি গৌরীর নিকট বশীকরণের উপায় বর্ণনা করিতেছেন। সুতরাং এরূপ কল্পতরুকে বঙ্গের কৃষাণগণ কেনইবা অব্যাহতি দিবে! তাহারা ইহাকে দিয়া নানা প্রকার ধান্য, তূলা, মূলা, কাপাস সকলই বুনাইয়া লইতেছে! বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ সময়ে ঠাকুর দেবতারা গ্রাম্য ছড়ায় কাস্তে হাতে হাটু গাড়িয়া ক্ষেতের কার্য্যে নিবিষ্ট হইয়াছেন। ইহার পর পৌরাণিক যুগের প্রভায় তাঁহারা বেশ-সংস্কার করিয়া উজ্জ্বল ভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সে কথা পরে উল্লিখিত হইবে। শূন্যপুরাণে আমরা শিবকে যেরূপ দেখিতে পাইয়াছি, রামেশ্বরের কবিতায়ও তাঁহার সেই ভাব কতকটা রক্ষিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ রামেশ্বর কোন প্রাচীন কবির রচনার এই অংশ বিশেষ পরিবর্ত্তন না করিয়া স্বীয় গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন। আমরা সেই অংশ হইতে অল্পমাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

"ক্ষেতে বসি কৃষাণে ঈষাণ বলে ভাল।
চারিদণ্ডে চৌদিগ চৌরস করে চাল॥
আড়ি তুলে ধারে ধারে ধরাইল ধান।
হাটু গাড়ি ঈশানেতে আরম্ভে নিড়ান॥
বারটি বারঠে চেকুড়াব ঝড়াউড়ি।
গুলামুখি পাতি মারে পুত্তে যার মুড়ি॥
দল দুর্ব্বা সোলা শ্যামা ত্রিশিরা কেস্থর।
গড় গড় নানা খড় উপাড়ে প্রচুর॥

খর খর খুজিয়া খড়ের ভঙ্গে বাড়।
কুলি করি ধাইল ধান্যের ধরে ঝাড়॥
কিতাযুড়ে ভিতা বেড়ে মাঝে গিয়া রয়।
উলট পালট করে বার পাঁচ ছয়॥
এইরূপে সেই কিতা সারে চট পট।
কিতা নিড়াইয়া ভীম চলে সট সট॥
বাদ নাহি বাঘ যেন বসি থাকে বুড়া।
সার্দ্ধ যামে সারে উঠে শত শত কুড়া॥"

উদ্ধৃত অংশের সঙ্গে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে লিখিত শূন্যপুরাণের নিম্নোদ্ধৃত অংশটী মিলাইয়া পাঠ করুন :—

"জখন আছেন গোসাঞি হআ দিগম্বর।
ঘরে ঘরে ভিখা মাগিআ বুলেন ঈসর॥
রজনী পরভাতে ভিক্খার লাগি জাই।
কুথাএ পাই কুথাএ ন পাই॥
হত্তুকী বএড়া তাহে করি দিনপাত।
কত হরস গোসাঞি ভিক্খাএ ভাত॥
আহ্মর বচনে গোসাঞি তুহ্মি চসবাস।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস॥
পুখরী কাঁদাএ লইব ভুম খানি।
আরসা হইলে জেন ছিচএ দিব পানি॥
আর সব কিসাণ কাঁদিব মাথে হাত দিআ।
পরম ইচ্ছাএ ধান্ন আনিব দাইআ॥
ঘরে ধান্ন থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুখ পাব॥
কাপাস চসহ পরভু পরিব কাপড়।
কতনা পরিব গোঁসাই কেওদা বাঘর ছড়॥
তিল সরিসা চাস কর গোঁসাই বলি তব পাএ।
কত না মাখিব গোসাঞি বিভুতিগুলা গাএ॥

মুগ বাটলা আর চসিহ ইখু চাস।
তবে হবেক গোঁসাই পঞ্চামর্তর আস॥
সকল চাস চস পরভু আর রুইও কলা।
সকল দব্ব পাই জেন ধম্ম পূজার বেলা॥
এতেক সুবিধা হর মনেতে ভাবিল।
মন পবন দুই হেলএ সিজন করিল॥
সুনার জে লাঙ্গল কৈল রূপার জে ফাল।
আগে পিছু লাঙ্গলেত এ তিন গোজাল॥
আস জোতি পাস জোতি আওদর বড় চিন্তা।
দুদিগে দুসলি দিআ জুআলে কৈল বিন্ধ॥
সকল সাজ হৈল পরভুর আর সাজ চাই।
গটা দস কুআ দিআ সাজাইল মই॥
তাবর দুভিতে চাই দুগাছি সলি দড়ি।
চাস চসিতে চাই সুনার পাচন বাড়ি॥
মাঘ মাসে গোঁসাই পিথিবি মঙ্গলিল।
জতগুলি ভুম পরভু সকলি চসিল॥"

বাগ্দিনীর পালা নামক যে অমার্জ্জিত প্রেমচিত্র পরবর্ত্তী শিবায়ণ সমূহে স্থান পাইয়াছে, তাহাও আমরা সুপ্রাচীন শিবের গানের অংশ বলিয়া মনে করি।

লৌকিক ধর্ম্মশাখা।

(গ) চাঁদ সদাগর ও বেহুলা।

চাঁদের চরিত্র।

মনসা পূজা উপলক্ষে চাঁদ সদাগরের চরিত্র বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যে পুরুষকারের জীবন্ত আদর্শ। মনসার ক্রোধে ছয় পুত্র বিনষ্ট হইল, 'মহাজ্ঞান' লুপ্ত হইল, 'সপ্তডিঙ্গা মধুকর' অমূল্য সম্পত্তি লইয়া জলমগ্ন হইল, এই

উপর্য্যুপরি বিপদরাশি দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াও চাঁদ সদাগর ভ্রূক্ষেপহীন। পুত্রশোকোন্মত্তা সনকার মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে তাঁহার গৃহের পাষাণ প্রাচীরগুলিও বুঝি দ্বিধা হইতেছিল, কিন্তু সদাগরের বজ্রাদপি সুকঠিন পণ ভঙ্গ হয় নাই। মনসাদেবীর ক্রোধে তাহার গৃহ অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু ভ্রূকুটিকুটিল ললাটে চাঁদ শত উৎপীড়ন ও কষ্ট নীরবে সহ্য করিয়াছে, পরাজয় বা আত্মসমর্পণের কথা মনেও স্থান দেয় নাই। তাহার দুঃখবজ্র-খিন্ন বীরোচিত উন্নত মস্তকে ক্ষাত্রতেজ আগ্নেয় লিপিতে অঙ্কিত রহিয়াছে, উহা প্যারাডাইস্ লষ্টের দেবদ্রোহীর কথা মনে উদ্রেক করে, এ ধনুর্ভঙ্গ পণের উদাহরণ জগতের ইতিহাসে বিরল। চাঁদের নৌকা সমুদ্রবক্ষে ঝটিকা তাড়িত, জলমগ্ন হইতে উদ্যত; বিপদের মূল মনসাদেবী। এই শক্র তর্জ্জনী দ্বারা মেঘ হইতে তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছেন; চাঁদ এ বিপদেও হেঁতালের লাঠিগাছি ছাড়ে নাই :—

"এত যদি বলে পদ্মা রথে করি ভর।
হেঁতালের বাড়ি স্কন্ধে কাঁপে থর থর॥
মনেতে ভাবিছ কাণি অন্তরীক্ষে রৈয়া।
সাহস যদ্যপি থাকে কহ আগু হৈয়া॥
মোর মন্দ করি যদি সারিবার পার।
তবে কেন কাণা আঁখির ঔষধ না কর॥"

বিজয় গুপ্ত।

পদ্মাবতী নামের সংস্রব ত্যাজ্য।

চাঁদ সমুদ্রে পড়িল, লোণাজলে প্রায় সংজ্ঞাহীন, এই অবস্থায় পদ্মা কয়েকটি পদ্ম-ফুল ফেলাইয়া দিলেন; তাঁহাকে মারিতে পদ্মার ইচ্ছা নাই, চাঁদ মরিলে পূজা প্রচলিত হয় না। চাঁদ সেই অন্ধকার রাত্রির ঈষৎ বিদ্যুতালোকে মুমূর্ষু অবস্থায় পদ্মফুলের স্তূপ দেখিয়া আশ্রয় বোধে হাত বাড়াইল; কিন্তু পদ্ম-স্পর্শে পদ্মাবতীর নাম-সংস্রব স্মরণ করিয়া ঘৃণায় হাত ফিরাইল, লোণা জলে মরিতে ডুব দিল।

অনাহারে বিড়ম্বনা।

তিন দিন উপবাসের পর চাঁদ বন্ধুগৃহে খাইতে বসিয়াছে; নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রীর সঙ্গে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত; ক্ষুধার্ত্ত চাঁদ গণ্ডূষ করিয়া খাওয়া আরম্ভ করিবে, এমন সময় বন্ধু চাঁদকে মনসার সহিত বাদে ক্ষান্ত দিতে উপদেশ দিলেন। "বর্ব্বর ভাঁড়ায়ে খাও কাণি" বলিয়া ক্রোধোন্মত্ত চাঁদ অন্ন ব্যঞ্জনে পদাঘাত করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল ও নদীর পারে বসিয়া কদলীর পরিত্যক্ত ছোবড়া খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল।

লখীন্দরের মৃত্যুজনিত শোক।

ছয় পুত্রের শোকে জর্জ্জরিত চাঁদ শেষ-পুত্র লখীন্দরকে লাভ করিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল, কিন্তু লৌহের বাসরে মনসাদেবীর সর্প লখীন্দরকে দংশন করিল। বিবাহ-শয্যা মৃত্যু-শয্যায় পরিণত হইল। সনকা শোকে ক্ষিপ্ত, গভীর ক্রোধে ও বিষাদে চাঁদের ললাটে মেঘবৎ ছায়া পড়িয়াছে; তবুও চাঁদ কাঁদিল না, মনসাকে বধ করিতে হেঁতাল কাঁধে তুলিয়া লইল।

চাঁদের পরাভব।

কিন্তু পদ্মা-পুরাণের শেষ অঙ্কে পরাভব। সে পরাভবও চাঁদের ন্যায় বীরের উপযুক্ত। মনসা ইতিপূর্ব্বে কতবার ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন, একবার এক মুষ্টি ফুল তাঁহার পদে ফেলিয়া দিলেই তিনি পুত্রগুলি বাঁচাইয়া দিবেন, 'সপ্ত ডিঙ্গা মধুকর' জল হইতে তুলিয়া দিবেন, কিন্তু চাঁদ-বীর লুব্ধ হইয়া অবনতি স্বীকার করে নাই। এই শাল্মলী তরু কিসে নত হইল? বেহুলার স্নেহ চাঁদবেগে রোধ করিতে পারিল না; সনকার মর্ম্মভেদী ক্রন্দন সে উপেক্ষা করিয়াছে, কিন্তু বেহুলা রমণী হইয়াও তাহারই মত এক জন। সে ছয় মাস স্বামীর গলিত শব বক্ষে করিয়া ভেলায় ভাসিয়াছে; সে কত প্রলোভন দলন করিয়া, স্থলকুম্ভীর ও জলকুম্ভীরের লেলিহান জিহ্বা ও মুক্ত দশন হইতে একাগ্রতার বলে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া কঠোর তপস্যায় স্বগণবর্গকে বাঁচাইয়া আনিয়াছে; চাঁদ কোন্ প্রাণে এমন

পুত্রবধূকে বহু-কৃচ্ছ্র-অর্জ্জিত স্বগণসহ মৃত্যুর দ্বারে ফিরিয়া যাইতে বলিবে ?

এখানে বিধাতা নীলোৎপলপত্রে শমীতরুচ্ছেদন করিলেন,—স্নেহে বশীভূত, ততোধিক গুণে চমৎকৃত চাঁদ পদ্মাপুরাণের শেস অঙ্কে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বাম হস্তে বিষহরির পদে অঞ্জলি দিলেন। যে হস্ত শিবের পদে অঞ্জলি দানে নিযুক্ত, 'চেঙ্গমুড়ি কাণী' সে হস্তের অঞ্জলি প্রত্যাশা করিতে পারেন নাই ; এ অঞ্জলি বিষহরির পদসেবা নহে, ইহা তাঁহার হৃদয়ের দুর্ব্বলতাজ্ঞাপক নহে ; ইহা পতিব্রতা সতী সাধ্বী পুত্রবধূর শিরে আশীর্ব্বাদ ; ইহা গুণীর নিকট গুণীর অবনতি ; গুণশীলা পুত্রবধূকে চাঁদবেণে কষ্ট দিতে পারেন নাই। মনসাদেবী যখন চাঁদ সদাগরের হাতে হেঁতালের লাঠিগাছি দেখিয়া পূজামণ্ডপে নামিতে সাহসী হন নাই, তখন বেহুলা বিনয় করিয়া শ্বশুরের হাত হইতে লাঠিগাছি ফেলিয়া দিলেন। বেহুলার সেই বিনয়-মধুর গঞ্জনা কোকিলকূজনের ন্যায় মিষ্ট ;—

বেহুলার জয়।

"যদি মোর পূজা করিবে চাঁদ বেণে।
হেঁতালের বাড়িগাছি আগে ফেল টেনে॥
একথা শুনিয়া হৈল চাঁদবেণের হাস।
হেঁতালের বাড়িতে আর নাহি কর ত্রাস॥
বেহুলা বিনয় করে আসিয়া শ্বশুরে।
হেঁতালের বাড়ি তুমি টেনে ফেল দূরে॥"
ক্ষেমানন্দ।

বেহুলা।

এস্থলে আমরা সংক্ষেপে বেহুলা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। বেহুলা রূপে গুণে অতুল্যা ; তথাপি ভাগ্য-দোষে বেহুলা বিবাহের রাত্রেই স্বামি-হীনা হইল ; স্বামী রাত্রে ক্ষুধায় অন্ন চাহিয়াছিলেন, সতী নেতের আঁচল চিরিয়া অগ্নি

বেহুলা বাসর-গৃহে।

জ্বালিয়া, নারিকেল দ্বারা উনন প্রস্তুত করিয়া ভাত রাঁধিয়াছিল; একটি একটি করিয়া কৌশলক্রমে তিনটি সাপকে বন্দী করিয়াছিল; কিন্তু বিধিলিপি নির্ম্মম, অখণ্ডনীয়; ঈষৎ নিদ্রাবেশে বেহুলার চক্ষুপুট মুদিত হইয়া আসিয়াছে, কালসর্প এমন সময় লখীন্দরকে দংশন করিল; লখীন্দর ডাকিয়া বলিল,—

"জাগ ওহে বেহুলা সায়বেণের ঝি।
তোরে পাইল কাল নিদ্রা মোরে খাইল কি?"

কেতকা দাস।

নিরপরাধিনীর অপরাধ।

বেহুলার কালনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, চমকিত হইয়া যখন স্বামিধন খুঁজিতে হাত বাড়াইল, তখন আর স্বামী জীবিত নাই, শবস্পর্শে শিহরিত হইয়া বেহুলা কাঁদিয়া উঠিল; সেই ক্রন্দনে শাশুড়ী সনকা ছুটিয়া আসিল ও বেহুলার ক্রোড়ে মৃত পুত্রকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বেহুলাকে গালি দিয়া বলিল,—

"সনকা কাঁদিয়া দেয় বেহুলাকে গালি।
সিঁতার সিন্দূরে তোর না পড়িল কালী॥
পরিধান বস্ত্রে তোর না পড়িল মলি।
পায়ের আলতা তোর না পড়িল ধূলি॥
খণ্ড কপালিনী বেহুলা চিরুণী দাঁতী।
বিবাহ দিনে খাইলি পতি না পোহাতে রাতি॥"

ক্ষেমানন্দ।

স্বামীর শব ক্রোড়ে বেহুলাসতী।

কিন্তু বেহুলা সে গালি শুনে নাই, স্বামী রাত্রে আলিঙ্গন চাহিয়াছিলেন, লজ্জিতা নববধূ লজ্জায় তাহাতে স্বীকৃতা হয় নাই; সেই কথা স্মরণ করিয়া তাহার বক্ষঃ বিদীর্ণ ও নয়ন অশ্রুপ্লাবিত হইতেছিল। তারপর আর এক দৃশ্য। বেহুলা কলার মান্দাসে স্বামীর শব ক্রোড়ে করিয়া ভাসিতেছে;

বেহুলা এই স্থলে নিরুপমা সুন্দরী! যে শাশুড়ী গালি দিয়াছিলেন, তিনি সাধিতেছেন,—

"সনকা কাঁদিয়া বলে আলো অভাগিনী।
এ তিন ভুবন মাঝে কোথাও না শুনি॥
বালিকা যুবতী বৃদ্ধা যার পতি মরে।
বিধবা হইয়া সেই থাকে নিজ ঘরে॥
কিসের কারণে তুমি জলেতে ভাসিবে।
প্রতীত কাহার বোলে কান্তে জিয়াইবে॥"

কেতকা দাস।

তাহার ভ্রাতৃগণ কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিতেছেন,—

"হরি সাধু বলে ভগ্নি মোর বাক্য ধর।
সমুদ্রের কূলে তুমি লখিন্দরে পোড়॥
এই ক্ষণে চল বেহুলা মুক্ত সাহের বাড়ী।
খনি বদলে দিব কাঁচা পাটের শাড়ী॥
শঙ্খ বদলে দিব সুবর্ণের চুড়ি।
সিন্দূর বদলে দিব ফাউগের গুড়ি॥"

বিজয় গুপ্ত।

কিন্তু বেহুলা স্বামীর প্রার্থিত আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়াছে, সে আর এ আলিঙ্গন ছাড়িবে না; শব ক্রমে গলিত হইল,—

"দেখিয়া বেহুলা কাঁদে পায়ে বড় শোক।
ধরিয়া মড়ার গায় হানে এক জোঁক॥
ছাড়াইতে নাহি ছাড়ে মাংসেতে লুকায়।
মরি হরি বেহুলার কি হবে উপায়॥
*   *   *   *
অবিরত নেত্র জল নিবারিতে নারি।
নোয়াদার ঘাটে ভাসে বেহুলা সুন্দরী॥"

কেতকা দাস।

এই দুঃখের অবস্থায় একদিকে জলজন্তুগণ শব কাড়িয়া খাইতে আসিয়াছে, অপরদিকে,—

"পথের পথিক যত পথ বৈয়া যায়।
বেহুলার রূপ দেখি ঘন ঘন চায়॥
ত্রিজগৎমোহিনী কেন মরা লৈয়ে কোলে।
কলার মান্দাসে ভাসে ঢেউর হিল্লোলে॥"
কেতকা দাস॥

বেহুলার সতীত্ব।

কত লোকে তাঁহাকে লাভ করিতে হাত বাড়াইতেছে, সতীত্বের জোরে, কপালের সিন্দূরের জোরে বেহুলা চলিতেছেন, তাঁহাকে কে স্পর্শ করিবে? একজন বৈদ্য অশিষ্টপ্রস্তাব করিয়া শব বাঁচাইয়া দিবে বলিয়া আশা দিয়াছিল, বেহুলা তাহার মুখে ছাই দিয়া ভেলা ভাসাইয়া চলিয়া গেলেন। গোদা, ধনা, মনা তাঁহার লোভে সাঁতার দিয়াছিল, বেহুলা দৈববরে তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন; কিন্তু জলমগ্ন লম্পটত্রয়ের জন্য করুণার অশ্রুবিন্দু রাখিয়া গেলেন। সুখে দুঃখে বেহুলার চরিত্রে কখনও স্নেহ, মমতা, দয়া প্রভৃতি উৎকৃষ্টভাব লুপ্ত হয় নাই, সর্ব্বদা আরও প্রস্ফুট হইয়াছে। শবের পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নৈশ আঁধারে সতী-লক্ষ্মী ভাসিয়া যাইতেছেন; মেঘপুঞ্জ ঘিরিয়া আসিয়াছে, আশার ক্ষীণ আলো নিবু-নিবু, এ সময়ে শৃগালের বিকট ধ্বনি,—

"যতেক শৃগাল, হয়ে এক পাল,
একত্রে বেহুলারে ডাকে।
মড়া ফেলাইয়া, যাহ না ফিরিয়া,
প্রাণ পাই তোর পাকে॥" কেতকা দাস।

কিন্তু শৃগালগুলিকে সতী প্রবোধ দিয়া যাইতেছেন, এ তাঁহার জীবন

অপেক্ষা প্রিয় স্বামীর শব, ইহা তিনি দিতে পারেন না, ইহাতে তিনি জীবন প্রতিষ্ঠা করিবেন, নতুবা প্রাণ দিবেন, তখন,—

"এত কথা শুনি, যত শৃগালিনী,
এ পড়ে উহার গায়।
অপূর্ব্ব কাহিনী কভু নাহি শুনি,
মড়া নাকি প্রাণ পায়॥"
কেতকা দাস।

কিন্তু,—

"শৃগাল কথনে, বেহুলার মনে,
কিছু নাই অভিমান।"

আঁধারে ব্যাঘ্র গলিত শব খাইতে মুখ ব্যাদান করিল, বেহুলা বলিলেন ;—"অভাগিনী বেহুলার সহায় কেবা আছে। আগেতে আমারে খাও, প্রভুরে খেও পাছে ।।" বিজয় গুপ্ত।

নৃত্যগীতে অনুরাগ পদ্মিনী রমণীর লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত আছে।

কৌতুকে করুণরস।

ছোটবেলা বেহুলা নাচিতে গাহিতে শিখিয়াছিল, তাহার নৃত্য দেখিয়া তাহার মাতা অমলা মোহ যাইত। পুনরায় এই দুঃখের সময় হাস্যমুখে বেহুলা দেবসভায় নাচিয়া গাহিয়া স্বামীর ও তাহার ভ্রাতৃগণের জীবন পুরস্কার লইয়া ফিরিয়া আসিল। এই দীর্ঘ দুঃখ-কথার অবসানে কবিগণ বেহুলার যে কৌতূহলদীপ্ত সুপ্রফুল্ল চিত্রখানি আঁকিয়াছেন, তাহার মাধুর্য্যের মধ্যেও দুঃখমিশ্র একটু সকরুণ ভাব জড়িত আছে ; সেই মলিন অথচ মধুর সৌন্দর্য্য আমাদিগের মর্ম্ম স্পর্শ করে। বেহুলা স্বামীকে লইয়া ডোম সাজিয়া পিত্রালয়ে গেলেন ; সেখানে রঙ্গচ্ছলে যে করুণ কান্না ও পুনর্মিলনের শোক-মন্দ আনন্দধারা প্রবাহিত হইল, তাহা সেই রঙ্গ ও কৌতুকখেলার মধ্যে ও সাধ্বীর কষ্টসহিষ্ণু দৈন্য এবং পরিম্লান মাধুরীতে এক অপরূপ আত্মসমর্পণের শোকগাথা চির-অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে।

কবি স্বচক্ষে সতী দেখিয়া সতী আঁকিয়াছেন, স্বামিবিয়োগের পর সাধ্বী হিন্দু-মহিলা উচ্ছ্বলিত অশ্রু নিরোধ করিয়াছেন, ললাটের সিন্দুরবিন্দু মুছিয়া ফেলেন নাই, সতীত্বের প্রতিমা স্বামীর সঙ্গে পুড়িয়া ছাই হইয়াছেন; এই আগুনে কষিত সতীত্ব যিনি প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে বেহুলাচিত্র অঙ্কন করা অসম্ভব। প্রেম ও সৌন্দর্য্য রমণী-চরিত্রের শ্রেষ্ঠ ভূষণ, যুগে যুগে নানা দেশীয় কবিগণ তদ্দ্বারা আদর্শ-রমণী-সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু যেখানে প্রেমের অর্থ আত্মসমর্পণ ও স্বীয় সত্ত্বার সম্পূর্ণ বিলয় এবং সৌন্দর্য্যের অর্থ চরিত্রমাহাত্ম্য, সেই স্থানেই আদর্শ সর্ব্বকালের উপযোগী হয়; তদ্রূপ রমণী-চরিত্র সাহিত্যে বড় বিরল। বেহুলা-চরিত্র আঁকিতে কোন কবিগুরু বাল্মীকি লেখনী ধারণ করেন নাই। গ্রাম্য কবিগণ বংশদণ্ডাগ্রে, ব্লটিং কাগজের অভাবে বালুকা দ্বারা শোষিত তুলট কাগজের উপর বেহুলা সতীর রেখাপাত করিয়াছেন; তথাপি উহা একটি আদর্শ সাধ্বীর চিত্র হইয়াছে। আমাদের দেশে রমণীগণের কষ্টের সীমা নাই, দৈনন্দিন গার্হস্থ্য জীবনে পরার্থ আত্মোৎসর্গ, উপবাস ব্রতাদির কঠোরতা ও স্বামীর জন্য প্রাণত্যাগ—এই নানাবিধ সৎকর্ম্মের প্রতিভা যেন আপনা আপনি সমাজ হইতে সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া বেহুলার ন্যায় আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাতে কবিগণের সাহিত্যদর্পণ পড়িতে হয় নাই। সাহিত্যদর্পণের সূত্র এরূপ উচ্চ রমণীচরিত্র আয়ত্ত করিতে পারে নাই; আর লেখাপড়ার হিসাবে নিতান্ত নগণ্য গ্রাম্য কবিকে পণ্ডিতের ব্যবস্থা শুনিয়া লিখিতে হইলে তাহার আর লেখা চলিত না। অকৃত্রিমতাই এই সকল কবির প্রতিভা, স্বভাব ইহাদের হাতে খড়ি দিয়া তাহাদের নিজ গৃহ দেখাইয়াছিলেন, তাহারা নিজ বাড়ীর কথা লিখিতে যাইয়া অজ্ঞাতসারে এক অমর কাব্যকথা গাহিয়া ফেলিয়াছে। বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির পয়ার ও

বেহুলা, ঘরের ছবি।

লাচাড়ীছন্দরূপ কয়লার খনিতে অনেকগুলি মাণিক আমরা খুঁজিয়া পাইয়াছি। সাহিত্যিক আবর্জ্জনা ঘুচাইয়া বাহিরে আনিতে পারিলে উহারা জগতের আদর-দৃষ্টিতে পড়িয়া স্বীয় মূল্য লাভ করিবার সুবিধা পাইবে। *

(ঘ)—কাণা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও কবি জনার্দ্দন প্রভৃতি।

কাণা হরিদত্ত ও বিজয়গুপ্ত।

মনসাদেবীর গীত প্রথমতঃ কাণা হরিদত্ত নামক জনৈক কবি রচনা করেন; কিন্তু দেবী তাহাতে সন্তুষ্ট হন নাই, তাই তিনি বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামনিবাসী বিজয় গুপ্তকে স্বপ্নে কাব্য রচনা করিতে নিযুক্ত করেন—

"মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ত॥
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হৈল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল॥"

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ।

---

* বেহুলার চরিত্র সম্বন্ধে ৺ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন;—

"স্ফীত গলিত কীটাকুলিত পূতিগন্ধি মৃতপতিকে ক্রোড়ে লইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে ও নির্ভয় মনে বেহুলার মান্দাসে যাত্রা ভাবিতে গেলে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সতীগণের পতিনিমিত্তক সেই সেই ক্লেশ-ভোগও সামান্য বলিয়া বোধ হয় এবং বেহুলাকে পতিব্রতার পতাকা বলিয়া গণ্য করিতে ইচ্ছা হয়।"

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ১১৮ পৃঃ।

বিজয়গুপ্ত লিখিয়াছেন, কাণা হরিদত্তের গীত তাঁহার সময়ে একরূপ লুপ্ত হইয়াছিল। বিজয়গুপ্ত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হুসেনসাহার রাজত্ব কালে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার সময়ে যে গীতি বহুকাল প্রচলিত থাকিয়া লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা অন্ততঃ দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং কাণা হরিদত্ত মুসলমান-কর্ত্তৃক বঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার মনসা-মঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, আমরা এরূপ অনুমান করিতে পারি। সংপ্রতি মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত দিঘপাইৎ গ্রামে একখানি প্রাচীন মনসা-মঙ্গল কাব্য হইতে হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত একটী কবিতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই হরিদত্ত পূর্ব্ববঙ্গের কবি ছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা। সুলেখক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার কর্ত্তৃক হরিদত্তের এই কবিতাটীর উদ্ধার হইয়াছে। আমরা নিম্নে ঐ কবিতাটী উদ্ধৃত করিলাম।

"পদ্মার সর্প সজ্জা।"

"দুই হাতের সঙ্খ হইল গরল সঙ্খিনী।
কেশের জাত কৈল এ কালনাগিনী॥
সুতলিয়া নাগে কৈল গলার সুতলি।
দেবি বিচিত্র নাগে কৈল হৃিদয়ে কাঁচুলী॥
সিন্দুরিয়া নাগে কৈল সিত্যের সিন্দুর।
কাজুলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর॥
পদ্মনাগে কৈল দেবির সুন্দর কিংকিণী।
বেতনাগে দিয়া কৈলা কাকালি কাঁচুলী॥
কণক নাগে কৈল কর্ণের চাকি বলি।
বিঘতিয়া নাগে দেবির পায়ের পাশুলি॥
হেমন্ত বসন্ত নাগে পৃষ্ঠের থোপনা।
সর্ব্বাঙ্গে নিকলে জার অগ্নি কণা কণা॥
অমৃত নয়ান এড়ি বিষনয়ানে চায়।
চন্দ্রসূর্য্য দুই তারা আড়ে লুকায়॥"

হরিদত্তের গীতি মনসাদেবীর মনঃপূত হয় নাই। বিজয়গুপ্তের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত পড়িয়া আমরা ইহা জানিতে পারিয়াছি।

এতদবস্থায় বিজয়গুপ্তকে দেবীর অনুরোধে পড়িয়া এ কার্য্যে ব্রতী হইতে হইয়াছিল; আমরা বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে গ্রন্থ-রচনার সময় উল্লিখিত পাইয়াছি। বিজয়গুপ্ত সম্বন্ধে যে কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্ব সুলভ, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিনিচয়ের অন্তর্গত আছে,—

"হেনমতে স্বপ্ন কথা কহি উপদেশ।
নাগরথে চড়ি দেবী গেল নিজ দেশ॥
স্বপ্ন দেখি বিজয়গুপ্তের দূরে গেল নিদ্রে।
হরি হরি নারায়ণে স্মরিয়া গোবিন্দে॥
প্রভাত সময়ে কাক প্রকাশে দশ দিশা।
স্নান করি বিজয়গুপ্ত পূজিল মনসা॥
হরি নারায়ণ স্মরি নির্ম্মল কৈল চিত।
রচিতে আরম্ভ কৈল মনসার গীত॥
যেইমতে পদ্মাবতী করিল সম্বিধান।
সেইমতে করে সব গীতের নির্ম্মাণ॥
ছায়া শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সনাতন হুসেন সাহ নৃপতি তিলক॥
উত্তরে অর্জ্জুন রাজা প্রতাপেতে যম।
মুল্লুক ফতেজাবাদ বাঙ্গ রোড়াতক সীম॥
পশ্চিমে ঘাঘরা নদী পূর্ব্বে ঘণ্টেশ্বর।*
মধ্যে ফুলশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর॥

---

* এই ঘাঘর নদীটী বর্ত্তমানে ফরিদপুর জেলার অধীন কোটালীপাড়া গ্রামের পশ্চিম-দক্ষিণ-সীমান্তে স্বল্পকায়া স্রোতস্বিনীর আকারে বর্ত্তমান আছে। কোটালীপাড়া ফুল্লশ্রী হইতে প্রায় ১২ মাইল পশ্চিমে। ঘণ্টেশ্বর নদীটী অধুনা গৌরনদী থানার পূর্ব্বদিকে ভিন্ন নামে পরিচিত। বিজয়গুপ্তের জন্মভূমি ফুল্লশ্রী গ্রামের পরিসর পূর্ব্বে প্রায় সাড়ে চারি বর্গ

চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্যজাতি বৈসে তথা শাস্ত্রেতে কুশল॥
কায়স্থ জাতি বৈসে তথা লিখিতে প্রচুর।
আর যত জাতি নিজ শাস্ত্রেতে চতুর॥
স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুলশ্রী গ্রামে নিবসে বিজয়॥"*

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ।

অন্য এক স্থলে—

"সনাতন তনয় রুক্মিণী গর্ভজাত।
সেই বিজয়গুপ্তে রাখ তব পদ সাত॥"

প্রথমাংশ বিজয়গুপ্তের নিজের রচনা কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে, কারণ ঐ অংশের অব্যবহিত পরেই এই দুই পংক্তি পাওয়া যায়,—

"গায়ক হৈয়া তাল ধরে জন্মে নানা জাতি।
বিজয়গুপ্তে বন্দিয়া ভাই গীতে দেও মতি॥"

প্রক্ষিপ্ত রচনা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন কবিগণের স্বরূপ আবিষ্কার করা সহজ কর্ম্ম নহে। বিজয়গুপ্তের ছদ্মবেশে 'জয়গোপালগণ' ঐতিহাসিক মরীচিকা উৎপাদন করিতেছেন, এই গাঢ়-ভ্রম-সমুদ্র হইতে রত্ন উঠাইতে যাইয়া অনেক সময় শঙ্খ লইয়া ফিরিতে হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যগুলির ন্যায় বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণও নানা হস্তস্পর্শে, নানা তুলির বর্ণক্ষেপে পরিশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ডুবন্ত দিবালোক ও উদিত নক্ষত্রালোক যেরূপ সান্ধ্যগগনে মিশিয়া যায়, প্রাচীনকালের ভিন্ন ভিন্ন যুগের কবিগণের

মাইল ছিল। ইদানীং এই গ্রাম গৈলাগ্রামের অন্তর্গত ক্ষুদ্র পল্লীস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিজয়গুপ্তের বাসভূমি ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মনসাদেবীর মন্দির ও দীঘি অদ্যাপি ফুল্লশ্রীগ্রামে বর্ত্তমান আছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মনসা জাগ্রত দেবতারূপে স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের নিকট এখনও বিশেষভাবে অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছেন।

* বিজয়গুপ্ত স্বীয় জন্মভূমির পরিচয়-প্রসঙ্গে যে সব কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য।

লেখাও সেইরূপ মিশিয়া গিয়াছে; বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে প্রকাশুভাবে অন্যান্য কবির ভণিতারও অভাব নাই।

বিজয় কবির রসিকতা।

বিজয়গুপ্তের কবিতা কথায় কথায় ব্যঙ্গের দিকে ধাবিত হয়, সেই ব্যঙ্গেই তাঁহার কবিতা বেশ ফুটিয়া উঠে। এই নগ্নপদ, উত্তরীয়-সার, ঔষধের-পুটলি-কক্ষ 'বেজ মহাশয়' সেকালের একজন বিশিষ্ট রসিক লোক ছিলেন, সন্দেহ নাই। সেকালের রসিকতা এখন ভাঁড়ামি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু বিজয়গুপ্ত ভাঁড় ছিলেন না। নিম্নে তাঁহার রচনার কিছু নমুনা দিতেছি,—

পদ্মার বিবাহ সম্বন্ধে শিব দুর্গার আলাপ।

"জামাই এনেছি পুণ্যবান, কন্যা করিব দান,
বিবাহের সজ্জা কর ঘরে।
এনেছি মুনির সুত, রূপে গুণে অদ্ভুত,
কন্যা সমর্পিব তার তরে॥
হাসি বলে চণ্ডি আই, তোমার মুখে লজ্জা নাই
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।
এয়ো এসে মঙ্গল গাইতে, তারা চাবে পান খাইতে,
আর চাবে তৈল সিন্দূরে॥
হাসি বলে শূলপাণি, এয়ো ভাণ্ডাইতে জানি,
মধ্যে দাঁড়াব নেংটা হয়ে।
দেখিয়া আমার ঠান, এয়োর উড়িবে প্রাণ,
লাজে সবে যাবে পলাইয়ে॥
আছুক পানের কাজ, এয়োগণ পাবে লাজ,
পান গুয়া দিবে কোন জনে।
বিজয়গুপ্তেতে কয়, এরূপ উচিত নয়,
ঘরে গিয়ে কর সন্বিধানে॥"

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ।

শিবের অদর্শনে চণ্ডিকার রাগ।

"ভাল ভাঁড়াইয়া শিব পলাইয়া গেল দূর।
এবার তোমার লাগ পাইলে দর্প করিতাম চূর ॥
আঁচলে আঁচলে গিট বাঁধি এক ঠাঁই।
রাখিতে নারিনু তবু পাগল শিবাই ॥
কপট চরিত্র তোমার খলের সঙ্গে ঢঙ্গ।
যাবার কালে লাগ পাইলে দেখাইতাম রঙ্গ ॥
পাপ কপাল ফলে স্বামী পাইলাম ভাল।
ভাঙ্গ ধুতুরা খায় পরিধান ব্যাঘ্রছাল ॥
প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।
সবে বলে পাগল পাগল কত সৈতে পারি ॥
নিন্দে ভাবিতে প্রাণে বড় লাজ লাগে।
চড়ে বেড়ায় দুষ্ট বলদে তারে খাউক বাঘে ॥
আগুন লাগুক কান্ধের ঝুলি ত্রিশূল লউক চোরে।
গলার সাপ গরুড়ে খাউক যেমন ভাণ্ডাল মোরে ॥
ছিঁড়িয়া পড়ুক হাড়ের মালা, প'ড়ে ভাঙ্গুক লাউ।
কপালের তিলক চন্দ্র তারে গিলুক রাহু ॥"

বিজয়গুপ্ত।

বঙ্গীয় প্রাচীন কাব্যগুলির কয়েকটীর নির্দ্দিষ্ট ভাব কিরূপে এক কাব্য হইতে অন্য কাব্যে অপহৃত হইয়া বিকাশ পাইয়াছে, তাহা বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে লক্ষিত হইবে; আমরা ভারতচন্দ্রের—

"জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া ॥
হরিষে অবশ অলস অঙ্গে।
নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে ॥"

ইত্যাদি পড়িয়া ভারতচন্দ্রের কতই সুখ্যাতি করিয়াছি। [illegible] ছন্দে ভারতচন্দ্রের বহু পূর্ব্বে কবি বিজয়গুপ্ত শিবনৃত্য বর্ণনা করিয়াছিলেন,—

"জগত মোহন শিবের দাস।
সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ॥
রঙ্গে নেহারিয়া গৌরীর মুখ।
নাচেরে মহাদেব মনেতে কৌতুক॥
হাসিতে খেলিতে রঙ্গে।
নন্দী মহাকাল বাজায় মৃদঙ্গে॥
বিশাই নাচেরে হাতেতে বাদ্য বাজে।
হাতেতে তালি দিয়ারে মুখেতে গীত গাহে॥
বিকট দশনে ভ্রুকুটি ভাল সাজে।
ডুম ডুম বলিয়া শিবের ডম্বুর বাজে॥
বিজয়গুপ্ত মধুস্বরে সরস গায়।
পদ্মার চরিত্রে সবে ধন্দ হয়॥"

হ্যামিল্টনের বাড়ীর মুক্তার মালা ছড়া হাতে লইয়া উক্ত কোম্পানীকে কতই প্রশংসা করিয়া থাকি, কিন্তু যে ডুবারি প্রাণের আশা ছাড়িয়া মুক্তার লোভে অতলে ডুব দিয়াছিল, তাহার কথাটা কাহার মনে উদয় হয়? বহু চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, যে উদ্ভাবন করে তাহার অপেক্ষা যে পারিপাট্য সাধন করে, এই পৃথিবীতে তাহারই সম্মান অধিক।

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে আরও অনেক স্থল আছে, যাহা পড়িতে পড়িতে পরবর্ত্তী প্রাচীন বড় বড় কবিগণকে মনে হইয়াছে; সে সব কবিগণ যাঁহাদের কথা লইয়া বড় হইয়াছেন, তাঁহারা অতীতের বিরাট ছায়ার পাছে পড়িয়া রহিয়াছেন, কে তাঁহাদিগের খোঁজ করে? প্রশংসা, সম্পদ, যশঃ সমস্তই ভাগ্যাধীন; সংসারক্ষেত্রের ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রতিভা অপেক্ষা ভাগ্যেরই মাহাত্ম্যজ্ঞাপক, পরে এই কথা আরও পরিস্ফুট হইবে।

নারায়ণদেব।

নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ।

সম্ভবতঃ বিজয় গুপ্তের সমকালেই নারায়ণদেব তাঁহার পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। ইনি ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের সংযোগস্থলে জোয়ানসাহী পরগণায় কায়স্থ-কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। দয়ালচন্দ্র ঘোষ নামক জনৈক শিক্ষিত

লেখক ইঁহার জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতেছিলেন ও 'ভারতী' পত্রিকায় (১২৯০ সন, কার্ত্তিক) তাহা প্রকাশ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু সহসা তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তিনি এ কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি নারায়ণদেবকে পদ্মাপুরাণের আদি লেখক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত কথা।

এই কবির ২০০ শত বৎসরের প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথি আমার নিকট আছে—কিছু মাত্র সংশোধন না করিয়া যেরূপ পাইলাম, সেইরূপই একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি—

বেহুলা ও তাহার ভ্রাতা নারায়ণীর কথোপকথন।

"নারায়ণী শুনি বোলে বিপুলা বচন।
কি কারণে কৈলা ভইন (১) অশক্য কথন॥
বিষম সায়স (২) ভইন কৈলা কি কারণ।
দেবতা মনিষ্য কোথা হইছে দরশন॥
আজ্ঞা দেহ ভইন মরা পুড়িবারে।
একেশ্বর কেমনে যাইবা দেবঘরে॥
কেমতে ছাড়িআ দিমু সাগর ভিতর।
কথাতে পাইবা তুমি দেবর নগর॥
অগোরি (৩) চন্দন কাট্টে (৪) লখাই পুড়িমু।
লক্ষিন্দর কর্ম্ম (৫) ভইন এইখানে করিমু॥
নেউটিআ চল ভইন আপনার ঘরে।
একেশ্বর কেমতে যাইব দেবঘরে॥
মৎস্য মাংস এড়ি ভইন যত উপহার।
সর্ব্ব দর্ব্ব দিমু আমি তুমি খাইবার॥

(১) ভইন—ভগিনী। (২) সায়স—সাহস। (৩) অগোরি—অগুরু। (৪) কাট্টে—কাষ্ঠে। (৫) কর্ম্ম—শবদাহাদি।

সংখ সিন্দূর মাত্র না পড়িবা তুমি।
নানা অলংকার তোমা দিমু আমি॥
মাএ জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর।
বিপুলা রাখিআ আইলা জলের উপর॥
বিপুলা রাখিতে সাধু করএ ক্রন্দন।
বিপুলাএ বোলে কিছু প্রবোধ বচন॥
জীআইতে আইল প্রভু যাইমু পলাইআ।
কেমতে মুখেত জন্ত দিবাম তুলিয়া॥
অসতী হইব মনিষ্য লোকেত প্রচার।
কি কারণে এতেক জে রাখিমু খাথার॥
গোত্র জ্ঞাতি আছে চম্পক নগর।
তারা কি বলিব আমি কি দিব উত্তর॥
বিপুলা সুনিআ বাক্য নিষ্ঠুর বচন।
সকরুণ ভাসে সাধু করএ ক্রন্দন॥
সুকবি নারায়ণদেবের সরস পাঁচালী।
নারায়ণি করুণা সুন একটি লাচাড়ি॥
কাঁদে নারায়ণি সাধু কহএ বিপুলা চাইআ।
প্রাণে না সয় দুঃখ না দিমু এড়িয়া॥
অবুদ্ধিয়া সদাগর বুদ্ধি অতি ছার।
জীয়তা ভাসাইআ দিছে সইতে মরার॥
বিষম সাগরে ঢেউ তোলপার করে।
জলেত পড়িলে খাইব মৎস্য মকরে॥
মাএ জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর।
কি কথা কহিব আমি উজানী নগর॥
বিপুলা রাখিতে সাধু করএ ক্রন্দন।
নারায়ণদেবে কহে মনসা চরণ॥
বিস্তর যতন করি রাখিতে না পারিয়া।
চিত্তে ক্ষেমা দিয়া যায় ভেরুআ ভাসাইআ॥
ভাইত বিদায় করি বিপুলা সুন্দরী।
ছাড়াইয়া জাএ তবে ভুরাখান মেলি॥
নৈক্ষত্র সঞ্চারে যেন ভুরার চলন।
সম্মুখে বাঘের বাঁকে দিলা দরশন॥"

এই পুস্তকের হস্তলিপিতে সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় নাই, লেখক যে ভাবে কথা কহিতেন, সেই ভাবেই শব্দগুলি লিখিয়া গিয়াছেন—ইহাতে বিদ্যা না থাকিলেও স্বাভাবিকত্ব আছে। বিজয়গুপ্তের লেখা অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত দেখিয়া নারায়ণদেবকে অগ্রবর্ত্তী কবি মনে করা সঙ্গত হইবে না। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের বটতলার ছাপা দেখিয়া অংশগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, আর নারায়ণদেবের পুঁথিখানা গত ২০৯ বৎসর যাবৎ কোনও রূপ হাওয়ায় বাহির হয় নাই ;—এই সময়ের মধ্যে কীটগণ অবশ্যই কিছু নষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু 'জয়গোপালগণ' সেরূপ সুবিধা পান নাই।*

নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্ত।

মনসার গীতি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া উপসংহার করিব। ত্রিপুরা জেলায় একটি চম্পকনগর আছে, পূর্ব্বাঞ্চলের লোকের বিশ্বাস, সেই স্থলেই লখীন্দরের কাণ্ডকারখানাটা হইয়াছিল। লখীন্দরের লোহার বাসরের ভিটাও তথায় দুষ্প্রাপ্য নহে। এদিকে বর্দ্ধমানের ১৬ ক্রোশ পশ্চিমে চম্পক নগর ও তন্নিকটে বেহুলা নদী প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আসাম-ভ্রমণ-প্রণেতা উদাসীন সত্যশ্রবা নির্দ্দেশ করেন, ধুবড়ীই চাঁদসদাগরের নিবাসভূমি। উত্তর বঙ্গের লোকেরা বলেন, বগুড়ার নিকটবর্ত্তী মহাস্থানে চাঁদ সদাগর ও লখীন্দরের বাড়ী ছিল। কেহ কেহ দার্জিলিংএর নিকটবর্ত্তী রনিৎ নদীর তীরে চাঁদ সদাগরের বাড়ী নির্দ্দেশ করেন।

চাঁদসদাগরের নিবাসভূমি।

---

* ২৮৫ নং অপার চিৎপুর রোড, বেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানির ছাপা নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ দ্বিজ বংশীদাস ও কবি বল্লভের দ্বারা সম্পূর্ণরূপ নূতন ভাবে রচিত বলিয়া বোধ হয়। উহার সঙ্গে মূল গ্রন্থের ঐক্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। উহার পত্রে পত্রে ভণিতা এইরূপ,—

(১) "দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার চরণ।
ভবসিন্ধু তরিবারে বোলে নারায়ণ॥"

(৩) "নারায়ণদেবে কয়, সুকবি বল্লভে হয়," ইত্যাদি।

আবার দিনাজপুর জেলায় কান্তনগরের নিকটবর্ত্তী সনকা গ্রামে চাঁদ-সদাগরের বাড়ীর ভগ্নস্তূপ কেহ কেহ দেখিয়াছেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন। ভূগোলবিৎ পণ্ডিতমহাশয়ের একটু গোলে পড়িবারই কথা। চাঁদবেণে এখন বঙ্গসাহিত্যের একটি সজীব ছবি; ইনি চণ্ডীকাব্যে ধনপতি সদাগরের বাড়ীতে পুষ্পমাল্য পাইতেছেন, জয়নারায়ণের চণ্ডীতে ইঁহার সহিত জনৈক কাব্যোক্ত নায়কের দীর্ঘকালব্যাপী আলাপ বর্ণিত আছে ও ত্রিবেণীর পারে তাঁহার বাটীর একটা জমকালো বর্ণনা আছে; বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে তিনি মনসার গীতি ছাড়িয়াও এদিক সেদিক হইতে উঁকি মারিতেছেন; সুতরাং চাঁদসদাগরের ন্যায় প্রয়োজনীয় ব্যক্তির নিবাস-ভূমি জানা পাঠকের নিতান্ত আবশ্যক।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের বিশ্বাস চাঁদবেণের গল্পটি আগাগোড়া কল্পনামূলক। পাঠক শনির পাঁচালী কি সত্যনারায়ণের পাঁচালী দেখিয়াছেন, চাঁদবেণের কথার আরম্ভও ঠিক সেইরূপ ছিল। এক এক জন করিয়া কবিগণ ঘটনা ও কাব্য-বর্ণিত চরিত্র বাড়াইয়াছেন, এবং মিথ্যাকে এমনই সত্যের পোষাক পরাইয়াছেন,—চাঁদ সদাগর কল্পনার লাল পাগড়ি মাথায় বাঁধিয়া সত্যসত্যই আমাদের ভয় জন্মাই-তেছে। কাব্যবর্ণিত ঘটনাগুলি অনুধাবন করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না। মনসার সঙ্গে বাদে চাঁদসদাগরের দুর্গতিগুলিতে কিছু-মাত্র সত্য থাকিতে পারে না। স্বর্গে যাইয়া নাচিয়া গাহিয়া স্বামীর জীবন লাভ করার কথাও পৃথিবীবাসিগণ না দেখিয়া বিশ্বাস করিবে কিরূপে? উপাখ্যানের ভিত্তিস্বরূপ দুইটি মূল ঘটনাই কল্পনার ইষ্টকে গাঁথিয়া উঠান হইয়াছে। সত্যের উপর মধ্যে মধ্যে কল্পনার একটুকু প্রলেপ দিয়া কাব্য প্রস্তুত হয়; যথা,—পলাশীর যুদ্ধ কাব্য। কিন্তু এ কাব্য তাহা নহে। তবে যদি চাঁদসদাগরের উপাখ্যানের এইটুকু সত্যমূলক হয় যে, যাঁহারা শৈবধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া লৌকিক

ধর্ম্মপ্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, চাঁদসদাগর তাঁহাদের এক দলের নেতা ছিলেন ও শেষে তিনি মনসাদেবীর পূজা অনুমোদন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তবে সে সম্বন্ধে আমাদের বেশী কিছু বলিবার নাই।

মনসার সেবকের সংখ্যা যতই বাড়িতে লাগিল, ততই চাঁদ সদাগর ও বেহুলার প্রতিবিম্ব গাঢ়তর হইয়া সজীব চিত্রের ন্যায় সুস্পষ্ট ভাবে দাঁড়াইল। এই বঙ্গদেশে প্রাচীন ভগ্ন কীর্ত্তির অভাব নাই, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থলের ইষ্টকস্তূপবিশেষে চাঁদবেণের ভূতের সুবৃহৎ বাসাবাড়ী নির্দ্ধারিত হইল; বর্দ্ধমান ও ত্রিপুরার চম্পকনগরদ্বয়, নেতাধোপানীর ঘাট প্রভৃতি নাম এখন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বসিয়াছে। চাঁদের এই সৌভাগ্য সত্যনারায়ণের পাঁচালীর নায়কের হইতে পারে নাই।

কবি জনার্দ্দন প্রভৃতি।

মঙ্গলচণ্ডীর ক্ষুদ্র ছড়াও ক্রমে বড় কাব্য হইয়া পড়িয়াছে; মাধবাচার্য্যের চণ্ডীর (১৫৭৯ খৃঃ) পূর্ব্বেও মঙ্গলচণ্ডীর গীতি ছিল; চৈতন্যপ্রভুর পূর্ব্বেও মঙ্গলচণ্ডীর ছড়া গাহিয়া গায়কগণ রাত্রি জাগরণ করিত।

> "মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
> দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে॥" চৈ, ভা, আদি।

সেই গীতি কিরূপ ছিল, ঠিক জানি না। আমরা দ্বিজ জনার্দ্দনের একটি চণ্ডী পাইয়াছি—উহা কাব্য নহে, ব্রত কথা। হস্তলিপি প্রায় ২৫০ শত বৎসরের প্রাচীন। এইরূপ কোন চণ্ডীর গীতিকে অবলম্বন করিয়া মাধবাচার্য্য তাঁহার কাব্য গঠন ও চরিত্রগুলির রেখাপাত করিয়াছিলেন

জনার্দ্দনের চণ্ডী।

সন্দেহ নাই। ছোট ছোট ঢেউ কিরূপে বড় বড় তরঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়—অস্পষ্ট রেখার ক্ষীণ ছবি কিরূপে ক্রমে সম্যক্ বিকশিত, বড় ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে—জনার্দ্দন, মাধবাচার্য্য ও কবিকঙ্কণের চণ্ডী ক্রমান্বয়ে তুলনা করিলে তাহা অনুমিত হইবে। কাব্য-জগতের এই ক্রমিক বিকাশের দৃশ্য, ছায়াবাজির ছায়াগুলির ক্রমশঃ বিশাল, সুস্পষ্ট ও বিচিত্র-বর্ণ-বিশিষ্ট অবয়বে পরিণতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। জনার্দ্দন কবির কালকেতু ও শ্রীমন্তের উপাখ্যান হইতে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম,—

১ম অংশ।

"নিত্য নিত্য সেই ব্যাধ আনন্দিত হইয়া।
পরিবার পালে সে যে মৃগাদি মারিয়া॥
ধনুকে যুড়িয়া বাণ লগুড় কাঁধেতে।
সর্ব্ব মৃগ ধাইয়া গেল বিন্ধ্যগিরিতে॥
ব্যাধ দেখি মৃগ পলাইল ত্রাসে।
পাছে ধাএ ব্যাধ মৃগ মারিবার আশে॥
বৃদ্ধ বরাহক আদি যত মৃগগণ।
মঙ্গলচণ্ডীর পদে লইল শরণ॥
ব্যাধেরে দেখিয়া দেবী উপায় চিন্তিল।
দুর্গতি-নাশিনী দেবী সদয় হইল॥
সুবর্ণগোধিকারূপ ধরিয়া পার্ব্বতী।
ব্যাধ-পথ জুড়িয়া রহিল ভগবতী॥
মৃগয়া না পাইয়া ব্যাধ হইল চিন্তিত।
সুবর্ণগোধিকা পথে দেখে আচম্বিত॥
সুবর্ণগোধিকা পাইয়া হরষিত মনে।
ধনুর অগ্রে তুলি লইল তখনে॥
মনে মনে ভাবি ব্যাধ ধীরে ধীরে হাঁটে।
সত্বর গমনে গেল বাড়ীর নিকটে॥
হরষিত মনে ব্যাধ গদ গদ বাণী।
উচ্চস্বরে পুনঃ পুনঃ ডাকিল গেহিনী॥

যেন মতে গৃহে নিয়া থুইল গোধিকা।
পরম সুন্দরী রূপ ধরিল চণ্ডিকা॥
দিব্যরূপ দেখি তান ব্যাধ কালকেতু।
গৃহিণীর মুখ চাহি বোলে কোন হেতু॥
মঙ্গলচণ্ডিকা বোলে শুন ব্যাধবর।
তুষ্ট হয়ে দেখা দিল তোমার গোচর॥
সম্প্রতি হইল ব্যাধ তোমার শুভযোগ।
পঞ্চশত স্বর্ণাঙ্গুরী কর উপভোগ॥
আজু হোতে ব্যাধ তুমি না যাইবা বন।
মৃগ না মারিবা এহি শুনহ বচন॥
অল্প দ্রব্য অঙ্গুরী দিলা যে আমারে।
ইহা খাইয়া কি করিব বল তার পরে॥
মঙ্গলচণ্ডিকা দেবী হইলা সদয়।
স্বর্ণ ভাণ্ডদ্বয় তাকে দিলেক নিশ্চয়॥
চণ্ডিকা প্রসাদে ব্যাধ কৃতার্থ হইল।
তার পর ভগবতী অন্তর্দ্ধান হৈল॥
ধন পাইছে হেন রাজাএ শুনিয়া।
শীঘ্র করি কালকেতু বন্দী কৈল নিয়া॥
বন্ধনে পীড়িত হৈয়া ব্যাধ মহাজন।
কাঁদিয়া মঙ্গলচণ্ডী করিলা স্মরণ॥" ইত্যাদি।

এস্থলে গুজরাট যাইয়া রাজ্যাদি স্থাপনের কথা ও কলিঙ্গাধিপতির সহিত যুদ্ধ-বর্ণনা নাই; ক্ষুদ্র গীতিটি কাব্যে পরিণত করিবার সময় কবিগণ নিজ হস্তে একটি মানচিত্র আঁকিয়া লইয়াছেন; পদ্মা-পুরাণের ঘটনার কেন্দ্রভূমিও এইরূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে; ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানের উপর বিদ্যাসুন্দরের কেলেঙ্কারী চাপাইয়া তাঁহার প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন; মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন;—

"বর্দ্ধমান-রাজ যে ভারতচন্দ্রের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সে কথা লোকে ভুলিয়া

গিয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা যে নিশ্চয়ই বৰ্দ্ধমানে ঘটিয়াছিল, এ ধারণা অনেকেরই আছে এবং এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া পূজ্যপাদ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় মালিনীর বাটী অন্বেষণার্থ বৰ্দ্ধমান সহরে অনেক দিন ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেই সুড়ঙ্গ দিয়া এখনও রাজবাটী যাওয়া যায় কি না, দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।" *

২য় অংশ।

"অনুগত জনে দয়া করে গিরিসুতা।
চলহ খুল্লনা গৃহে সাধুর দুহিতা॥
ব্রতের বিধান সর্ব্ব ব্রতী এ কহিল।
প্রণাম করিয়া তবে খুল্লনা চলিল॥
হারাইয়াছিল ছাগল পথে পাইল তারে।
গৃহে আসি খুল্লনা যে বিবিধ প্রকারে।
চণ্ডিকার পূজা করে ভক্তি অনুসারে॥
মঙ্গলচণ্ডীর বরে বাড়িল উন্নতি।
ব্রত হতে সুখী হৈল খুল্লনা যুবতী॥
দিব্য বস্ত্র অলংকারে সাধুএ তুষিল।
কতকাল পরে কন্যা গর্ভবতী হৈল॥
খুল্লনার গর্ভ ছয়মাস হৈল যবে।
বাণিজ্যেরে চলে ধনপতি সাধু তবে॥
স্বামীর অগ্রেত গিয়া করিল ভকতি।
বাণিজ্য করিতে সাধু হইলেক মতি॥
ছয়মাস গর্ভ মোর জানাইল তোমারে।
জানিবার পত্রে হর্ষে দিলেক কুমারে॥
হীরা মণি মাণিক্য আর নানা দ্রব্য যতে।
হরষিত ভরে ডিঙ্গা যত লয় চিতে॥
ডিঙ্গাতে অর্থ ভরি সাধুর নন্দনে।
খুল্লনা আসিতে আজ্ঞা করিল তখনে॥
মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতে কারণ।
অর্ঘ্য আনিতে বিলম্ব হইল তখন॥

* সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০ সন।

বিলম্ব দেখিয়া তবে সাধু মহাজন।
চণ্ডিকার ঘটে পদ ক্ষেপিল তখন॥
* * * * *
মঙ্গলচণ্ডীর বরে খুল্লনা যুবতী।
পুত্র প্রসবিল তথা নাম শ্রীপতি॥
দিনে দিনে বাড়ে কুমার চন্দ্রের সমান।
শুভক্ষণ করিয়া কাঠি কৈল দান॥
লিখিতে কহিল কুমার ছাত্র সব স্থান।
আমারে লিখায়ে দেহ এই খড়ি খান॥
হাসিয়া সকল ছাত্র বুলিলেক বাণী।
জারজ কুমার তুমি কে দিবে কাঠিনী॥
অসন্তোষ ভাবি তবে সাধুর কুমার।
হেঁট মাথা করি গৃহে গেল আপনার॥
বিষাদ ভাবিয়া তবে সাধুর নন্দন।
মাথাএ বসন দিয়া করিল শয়ন॥
অন্ন জল না খাইল সাধুর নন্দন।
ম্লান হৈয়া নিশ্বাস ছাড়য়ে ঘন ঘন॥
মাতা বিমাতায় বুঝি পুত্রের লক্ষণ।
সাধু দিছে যেই পত্র দিলেক তখন॥"

শেষ শ্লোকের ক্ষুদ্র 'বিমাতা' শব্দটি হইতে লহনা-চরিত্রের সূত্রপাত; শ্রীমন্তের বিদ্যালয়ে মর্ম্মাহত হইবার কথাটি এখানে যেরূপ আছে, মাধবাচার্য্যও প্রায় সেইরূপই রাখিয়াছেন, কবিকঙ্কণ সে স্থানটি ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছেন।

রতিদেব ও অপরাপর কবি।

রতিদেবকৃত মৃগলব্ধ পুঁথির কথা একবার উল্লেখ করিয়াছি * —উহা শৈব ধর্ম্মের ভগ্ন ধ্বজা। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বঙ্গসাহিত্যে শিব কোন স্থলেই বড় উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। যেখানেই তিনি

* ৯৭ পৃষ্ঠা দেখ।

দেখা দিয়াছেন, সেইখানেই ভবানীর ভ্রূকুটি-ভঙ্গীতে অতি কৃপাযোগ্যভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতেছেন।

'মৃগলুব্ধ' গীতি শৈব ধর্ম্মের প্রাবল্য সময়ে লিখিত; উক্ত ধর্ম্ম শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের আড়ালে পড়িয়া যাওয়াতে শিব-গীতির আর বিকাশ হইতে পারে নাই।

শনির পাঁচালী, ষষ্ঠীর পাঁচালী, সূর্য্যের পাঁচালী, লক্ষ্মীর পাঁচালী প্রভৃতি অতি আদিসময়েও বিদ্যমান ছিল। আমরা উহাদের কিছু কিছু নিদর্শন পাইয়াছি।

শীতলা-মঙ্গল।

শীতলা পূজার আদি খুঁজিতেও আমরা শাস্ত্রের সাহায্য অবলম্বন করিতে পারি। প্রাচীন শাস্ত্রের কোনও স্থলে যে যে দেবতার সামান্য মাত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়, লৌকিক ভীতি ও দুঃখবিমোচনের অনুরোধে পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণগণ সেই সামান্য উল্লেখকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া দেশীয় সংস্কারোপযোগী দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অথর্ব্ববেদের "তক্মন্" শব্দের অর্থ "শীতলা" বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, অপর কোন লেখক বৈদিক শাস্ত্রোক্ত, "অপ্‌দেবী"কে শীতলাদেবীর আদি মূর্ত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেদের এই আভাস পুরাণকারদের হস্তে ক্রমে বিকাশ পাইয়া শীতলাদেবীর বর্ত্তমান রূপ কল্পিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণ ও পিচ্ছিলা-তন্ত্রে শীতলার বিবরণ আছে এবং কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর শীতলা দেবীর একখানি প্রাচীন মন্দির এখনও দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান সময়ে শীতলা-দেবীর পুরোহিতগণ অনেক স্থলেই ডোমজাতীয় দেখা যায়। ইহাতে আর একটি অনুমান করিবার অনুকূল যুক্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে হারিতীদেবীর পূজার ব্যবস্থা আছে। এতদ্দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যের সময় ডোমপুরোহিতগণ হারিতী পূজা করিতেন, এই

হারিতী ও শীতলা উভয়েই ব্রণনাশিনী দেবী। হিন্দুশাস্ত্রে শীতলাদেবীর যে সুন্দর মূর্ত্তি বর্ণিত আছে, শীতলাপণ্ডিত ডোমবর্গের প্রদর্শিত মূর্ত্তি সেরূপ নহে। এ সম্বন্ধে সুলেখক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় বলেন, "শীতলা পণ্ডিতগণের শীতলা করচরণহীন, সিন্দূরলিপ্তাঙ্গী, শঙ্খ বা ধাতুখচিত-ব্রণচিহ্নাঙ্কিতা মুখমণ্ডলমাত্রাবশিষ্টা প্রতিমা মাত্র। ইহাকে বরং বৌদ্ধভাবের দেবতা বলা যায়। এই শীতলার মুখে যে ধাতু বা শঙ্খনির্ম্মিত রুইতনের ফোঁটার ন্যায় বা পেরেকের মাথার ন্যায় টোপতোলা বসন্তচিহ্ন লাগান থাকে, তাহার সহিত শাস্ত্রী মহাশয়ের উল্লিখিত ধর্ম্মঠাকুরের গাত্রে প্রোথিত পিতলের টোপতোলা পেরেক-চিহ্নের যেন সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়।" ডোমপুরোহিতের পূজার অধিকারই এ সম্বন্ধে বৌদ্ধ সংস্রবের অকাট্য প্রমাণ।

এই শীতলাদেবী সম্বন্ধেও অনেকগুলি পালা প্রাচীনকালে বঙ্গভাষায় রচিত হইয়াছিল। সেই সব গীতির নিতান্ত প্রাচীন নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী, * দৈবকীনন্দন কবিবল্লভ, † কৃষ্ণনাথ, রামপ্রসাদ, শঙ্করাচার্য্য ও রঘুনাথ দত্ত যে সকল পালা লিখিয়াছিলেন তাহার অনেকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

---

* নিত্যানন্দ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাশীযোড়ার জমিদার রাজনারায়ণের সভাসদ্ ছিলেন।

† ইঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম পুরুষোত্তম, প্রপিতামহের নাম শ্রীচৈতন্য, পিতামহের নাম শ্যাম এবং পিতার নাম গোপাল। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ প্রথমতঃ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত হস্তিনা নগরে (হাতিনা), তৎপরে কিছুদিন মান্দারণে এবং অবশেষে বৈদ্যপুরে আসিয়া বাস করেন। দৈবকী নন্দন দেবীর রূপ-বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

"বাম হাতে হেল্যা মুণ্ডু উলুকবাহন।"

এবং ইহা ছাড়া সৃষ্টি প্রকরণের তিনি যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার সঙ্গে শূন্য পুরাণের ব্যাখ্যার নানা প্রকার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

বিবিধ।

এই সকল পুস্তক ছাড়া অন্যান্য দেবতাদের যে সব পাঁচালী পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটী তেমন প্রাচীন নহে। তবে তাহারা যে তত্তৎবিষয়ের প্রাচীনতর কবিতা অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ১৬৮৭ খৃঃ অঃ নিমতানিবাসী কৃষ্ণরাম 'ষষ্ঠী-মঙ্গল' রচনা করেন। ইহাতে একটী উপাখ্যান অবলম্বনে যথারীতি ষষ্ঠীদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারিত করা হইয়াছে। এই পুস্তকের এক স্থানে সপ্তগ্রামের তদানীন্তন প্রভাব সম্বন্ধে এই কয়েকটী ছত্র পাওয়া গিয়াছে,—

'রাঢ় গৌড় দেখিলাম কলিঙ্গ কপাল।
গয়া পৈইরাগ কাশী নিষধ নেপাল॥
একে একে ভ্রমণ করিলাম দেশ দেশ।
দেখিলুঁ দেবীর পূজা অশেষ বিশেষ॥
সপ্তগ্রাম ধরণীতে নাহি তার তুল।
চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরথীর কূল॥
নিরবধি যজ্ঞদান পুণ্যবান লোক।
অকাল মরণ নাই নাহি দুঃখ শোক॥
শত্রুজিৎ রাজার নাম তার অধিকারে।
বেভারে এ জত গুণ কে কহিতে পারে॥"

কমলামঙ্গল বা লক্ষ্মীচরিত্র।

লক্ষ্মীদেবী স্থানবিশেষে গজলক্ষ্মী নামে পূজিতা। অতি প্রাচীন-কালের লক্ষ্মীর যে সমস্ত বিগ্রহ এবং প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তরে অঙ্কিত দেখা যায়, তন্মধ্যে দুই পার্শ্বে দুটী হস্তি-সমম্বিতা হইয়া শুণ্ডধৃত কুম্ভজলে তিনি অভিষিক্তা হইতেছেন, এইরূপ দৃষ্ট হয়। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে লক্ষ্মীর এই প্রকার স্বর্ণময়ী মূর্ত্তির বর্ণনা আছে। গজশুণ্ডধৃত কুম্ভজলে অভিষিক্ত হওয়ার দরুণই বোধ হয় এই গজ লক্ষ্মী নাম হইয়া থাকিবে। শিবানন্দকর-রচিত 'লক্ষ্মীচরিত্র'ই এতৎসম্বন্ধে প্রাপ্ত কাব্যাবলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই কবির উপাধি গুণরাজ খাঁ ছিল। ইহা

ছাড়া মাধবাচার্য্য এবং পরশুরাম কৃত “লক্ষ্মীচরিত্র” প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কবি জগমোহন-কৃত “লক্ষ্মীমঙ্গল”ই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ইহাতে দুর্ব্বাসার শাপে ইন্দ্রের লক্ষ্মীভ্রষ্ট হওয়ার বিবরণ এবং অপরাপর প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভাব ও ভাষা কবিত্বময়। জগমোহনের পর রঞ্জিৎরামদাস ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে একখানি “কমলাচরিত্র” প্রকাশ করেন।

গঙ্গামঙ্গল।

মাধবাচার্য্যের “গঙ্গামঙ্গল”ই প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত দ্বিজ গৌরাঙ্গ, দ্বিজ কমলাকান্ত প্রভৃতি অনেক কবির “গঙ্গামঙ্গল” প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

সূর্য্যের পাঁচালী।

সূর্য্যের পাঁচালীকারদিগের মধ্যে দ্বিজ কালিদাস ও দ্বিজ রামজীবন বিদ্যাভূষণ—এই দুই জনের গ্রন্থই অধিকতর প্রচলিত। রামজীবন ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার আদিত্য চরিত বা সূর্য্যের পাঁচালী রচনা করেন। এই পাঁচালীতে হাড়ি জাতির প্রতি যে নিগ্রহের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সৌর উপাসক ও বৌদ্ধগণের সঙ্গে সংঘর্ষ অনেকে কল্পনা করিয়া থাকেন।

(৪) পদাবলী শাখা।

ক। পদাবলী সাহিত্য।
খ। চণ্ডীদাস এবং রামী।
গ। বিদ্যাপতি।

ক। পদাবলী সাহিত্য।

পদাবলী সাহিত্য।

বঙ্গদেশে প্রেমের অবতার হইয়াছিল, বাঙ্গালী কবি প্রেম-বর্ণনায় অদ্বিতীয়। বৈষ্ণব কবিগণ প্রেমের যে নিষ্কাম মাধুর্য্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে পবিত্রতার সুধাধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে।

পদাবলী সাহিত্য প্রেমের রাজ্য, নয়নজলের রাজ্য। পূর্ব্বরাগ, উক্তি, প্রত্যুক্তি, প্রথম মিলন, সম্ভোগ, অভিসার, কারণমান, নির্হেতু মান, প্রেম-বৈচিত্র, দানলীলা, নৌকাবিলাস, বাসন্তীলীলা, বিরহ, পুনর্মিলন, প্রেমের এই বহুবিভাগের পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে কেবল কোমল অশ্রুর উৎস; ইহাতে স্বার্থের আহুতি, অধিকারের বিলোপ; বাঞ্ছিতের দেহ স্পর্শ করিতে, দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতে, তজ্জাত অপূর্ব্ব পরিমল আঘ্রাণ করিতে, মধুগন্ধে অন্ধ অলির ন্যায় স্বর্গীয় প্রেমিক কবিগণ কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন, পদাবলী সাহিত্য তাঁহাদের অশ্রুর ইতিহাস।

আধ্যাত্মিকত্ব।

বৈষ্ণব পদাবলীর কেন্দ্রীভূত এক স্বর্গীয় উপাদান আছে, উহা মানবীয় প্রেমগীতি গাহিতে গাহিতে যেন সহসা সুর চড়াইয়া কি এক অজ্ঞাত সুন্দর রাগিণী ধরিয়াছে, তাহা ভক্ত ও সাধকের কর্ণে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছে।

সহৃদয় ভিন্নদেশীয় লেখকগণও পদাবলী পড়িতে পড়িতে তদন্তর্নিহিত মধুময় আধ্যাত্মিকতত্ত্ব উপভোগ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। পণ্ডিত গ্রীয়ার্‌সন্ মহোদয় বিদ্যাপতির কবিতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"কিন্তু মৈথিল ভাষায় অতুল্য পদাবলী রচনার জন্যই তাঁহার শ্রেষ্ঠ গৌরব; সে সমস্ত পদে শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ-প্রেমবর্ণনার রূপক দ্বারা পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার ভালবাসা সম্বন্ধই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।"* ঈশ্বরের প্রতি প্রেমপ্রদর্শন জন্য রাধার রূপক অবলম্বনীয় হইল কেন, এ জটিল সমস্যার উত্তর দিতে আমরা সমর্থ নহি। তবে বোধ হয় পাঠকগণ পদাবলীবর্ণিত রাধিকার ভাবগুলির সঙ্গে চৈতন্যলীলার অতি নিকট সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন, এবং তদ্দ্বারা

---

* "But his (Bidyapaty's) chief glory consists in his matchless sonnets (Pada) in the Maithili dialect dealing allegorically with the relations of the soul to God under the form of love which Rádhá bore to Krishna. These were adopted and recited enthusiastically by the celebrated reformer Chaitanya."

Modern Vernacular Literature of Hindustan by Grierson.

পদাবলী যে ধর্ম্ম-সাহিত্যের অন্তর্গত করিতে পারা যায়, তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। ধর্ম্মের এই রূপক সম্বন্ধে আমরা পণ্ডিত নিউ-ম্যান সাহেবের এইরূপ বিষয়ে একটি মতের উল্লেখ করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব ;—"যদি তোমার আত্মা উচ্চ ধর্ম্মরাজ্যের পবিত্রতায় প্রবেশ করিতে অভিলাষী হয়, তবে তাহাকে রমণী-বেশে যাইতে হইবে। মনুষ্য সমাজে তোমার যতই পুরুষকারের গর্ব্ব থাকুক না কেন, এস্থলে আত্মার রমণী সাজা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।" *

খ। চণ্ডীদাস এবং রামী।

চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে † নান্নুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেন্দুবিল্ব ও বিসপী হইতে নান্নুর শ্রেষ্ঠ তীর্থ ; চণ্ডীদাসের নিবাস-ভূমি পবিত্র নান্নুর-পল্লী এখনও আছে,—পাগল চণ্ডীর স্বর্গীয় অশ্রুসিক্ত পবিত্র বাশুলীদেবীর মন্দির এখনও আছে। সেই ক্ষুদ্র পল্লীতে প্রেমের যে অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি ও প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছিল, এজগতে তাহার তুলনা নাই ; প্রেমিকের নিকট নান্নুর-পল্লী দ্বিতীয় বৃন্দাবন তুল্য সুদৃশ্য। কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতি-লেখকের স্মৃতি বহন করিতে সেই স্থানে কোন সমাধিস্তম্ভ নাই—এ আক্ষেপ আমাদের ইংরেজী শিক্ষার দরুণ হয় ; নতুবা আমাদের দেশের লোকে অন্যরূপে স্মৃতি রক্ষা করিতে অভ্যস্ত ছিল,—সমাধি-স্তম্ভ এদেশের সামগ্রী নহে ; তাহারা ঘরে ঘরে মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিত, প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া পুণ্যশ্লোক

চণ্ডীদাসের নান্নুর।

---

* "If thy soul is to go on into higher spiritual blessedness, it must become a *woman* ; yes. howover manly thou may be among men."—Newman.

† "বিধুর নিকট নেত্র পক্ষ পঞ্চবাণ। নবহু নবহু রস, ইহ পরিমাণ।"
এই পদটি যদি কালবাচক বলিয়া গণ্য হয়, তবে ১৩২৫ শকে (১৪০৩ খৃঃ) চণ্ডীদাস তাঁহার পদাবলী সংগৃহীত করিয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে।
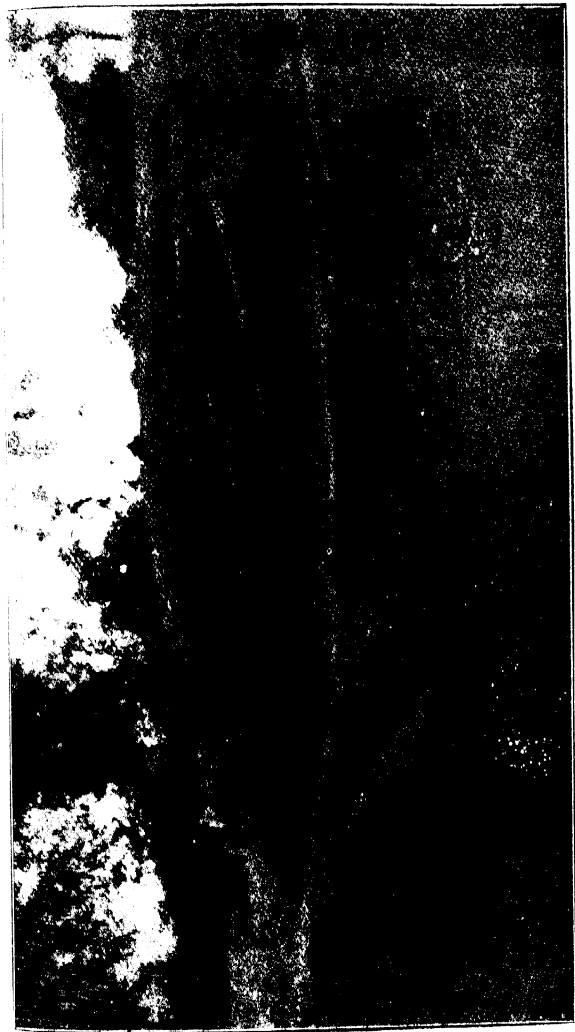
চণ্ডীদাসের ভিটা। (উত্তর-পূর্ব্ব দৃশ্য।)

মহাজনগণের নাম ভক্তিভরে উচ্চারণ করিত ও শিশুগণকে বলিতে শিখাইত।

পাঠক ক্ষমা করিবেন, চণ্ডীদাসের কবিতা আমার আশৈশব সুখ, দুঃখ ও বহু অশ্রুর উৎস স্বরূপ, হৃদয়ের প্রগাঢ় উচ্ছ্বাসে তাঁহার কবিতার যথাযথ আলোচনা সম্ভবপর হইবে কি না বুঝিতে পারি না; আর একটি বক্তব্য এই,—চণ্ডীদাসের কবিতার মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট না হইলে আমি প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য আলোচনা করিতাম না; সুতরাং তাঁহার কথা লিখিতে হৃদয়ের আবেগ-জনিত নানা কথা আসিয়া পড়িবার কথা।

নান্নুর বীরভূম জেলার অন্তর্গত—শাকুলিপুর থানার অধীন, সিউড়ী হইতে পূর্ব্বাংশে ১২ ক্রোশ। বীরভূম জেলায় অনেকগুলি মুনির তপোবন আছে; বক্রেশ্বর আদি উষ্ণ প্রস্রবণ, ময়ূরাক্ষী, অজয়, সাল, হিংলা, দ্বারিকা প্রভৃতি নদ নদী পাহাড়ের সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। বীরভূমের বেলফুল বড় মনোজ্ঞ, বসোরার গোলাপও তাহাদের সৌন্দর্য্য, অবয়ব ও সুরভির নিকট লজ্জা পাইবে। স্বভাবের সুরম্য নিকেতন বীরভূম—জয়দেব ও চণ্ডীদাসের জন্মভূমি। তাঁহাদের হৃদয়ও সেই বেলফুলগুলির ন্যায় সুন্দর ছিল, তাঁহাদের কাব্যে সেই সুন্দর হৃদয়ের অমর প্রতিবিম্ব রহিয়া গিয়াছে।

চণ্ডীদাসের জীবনী।

চণ্ডীদাসের পিতা 'বিশালাক্ষীদেবী'র পূজক ছিলেন,* তজ্জন্যই বোধ হয় পুত্রের নাম 'চণ্ডীদাস' রাখা হইয়াছিল। এখনও নান্নুর গ্রামে বাশুলীদেবী অধিষ্ঠিত আছেন ও তাঁহার পূজা নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

---

* ১২৮০ সালের ১০ই পৌষের 'সোমপ্রকাশে' জনৈক পত্র-প্রেরক লিখিয়াছিলেন—"চণ্ডীদাসের ১৩৩৯ শকে জন্ম ও ১৩৯৯ শকে মৃত্যু হয়, ইহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগ্‌চি, ইহাঁরা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন।" একথা কতদূর প্রামাণিক বলা যায় না।

চণ্ডীদাসের পিতার মৃত্যুর পর তিনিও উক্ত দেবীর পূজক নিযুক্ত হন। উক্ত দেব-মন্দিরের সেবিকা রামমণি (নরহরির মতে তারা ধুবনী) * কবির হৃদয়ে অপূর্ব্ব প্রেম জাগাইয়া দিয়াছিল। এই সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প আছে। যাহা ঐতিহাসিক ভিত্তিতে দাঁড়াইতে না পারিবে, এরূপ অসার গল্প লিখিয়া পাঠকগণের মধ্যে এল্যানাস্কারের ন্যায় ভাবুক শ্রেণীর মনোরঞ্জন করিতে ইচ্ছা নাই। বিদ্যাপতির সম্বন্ধেও এইরূপ অনেক গল্প পাঠ করা গিয়াছে।

সম্প্রতি চণ্ডীদাসের কতকগুলি নূতন কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে, † তাহাতে তাঁহার নিজ বিবরণ কিছু পাওয়া গিয়াছে। রজকিনীর কলঙ্কহেতু চণ্ডীদাস সমাজচ্যুত অবস্থায় ছিলেন; একদা তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাকে বলিলেন, "সুন সুন চণ্ডীদাস। তোমার লাগিয়া আমরা সকল ক্রিয়াকাণ্ডে সর্ব্বনাস।। তোমার পিরীতে আমরা পতিত, নকুল ডাকিয়া বলে। ঘরে ঘরে সব কুটুম্ব ভোজন করিঞা উঠাব কুলে।।" কবির এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল না, তবে তাঁহার ভ্রাতা (?) নকুল নিতান্ত ইচ্ছুক ও অগ্রসর হইয়া কবিকে জাতিতে তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নকুল ঠাকুরের গ্রামে খুব বেশী প্রতিপত্তি ছিল; তিনি ব্রাহ্মণগণের দ্বারে দ্বারে চণ্ডীদাসের জন্য বিনয় অনুনয় করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ গ্রামবাসিগণ চণ্ডীদাসকে "নীচপ্রেমে উন্মাদ" বলিয়া এবং "পুত্র পরিবার, আছয়ে সংসার, তাহারা সম্মতি নহে।"—ইত্যাদি রূপ আপত্তি করিয়া আহারের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিলেন, কিন্তু তাঁহারা শেষে নকুল ঠাকুরের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া "তুমি একজন বট মহাজন, সকল করিতে পার" ইত্যাদি আদরবাক্যে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া নিমন্ত্রণ-গ্রহণ-সূচক পাণ দান করিলেন।

* ৺জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের সংস্করণে চণ্ডীদাসের যে জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে ইহার নাম "রামতারা" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (৪৫ পৃঃ)। এই নামই বোধ হয় ঠিক, তাহা হইলে নরহরির 'তারা ধুবনী, বুঝিতে কোনও গোল হয় না।

† সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ৫ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা ১৭৩ পৃঃ (১৩০৫ সন)।

চণ্ডীদাসের ভিটি দক্ষিণ-পূর্ব্ব দৃশ্য।

এ দিকে এ কথা শুনিয়া স্বামী—"নয়নের জলে, কান্দিয়া বিকল, মনে বোধ দিতে নারে।" এবং "গৃহকে রাইঞা, পালঙ্ক পাড়িয়া, সয়ন করিল তায়। কান্দিয়া মুছিছে, নিশ্বাস রাখিছে, পৃথিবী ভিজিয়া যায়।" কিন্তু তাহাতেও শান্তি নাই, আবার উঠিয়া রামী বকুলতলায় দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন হইয়াছে। 'সীতামিশ্রী', 'আলফা' প্রভৃতি নানারূপ মিষ্ট দ্রব্য যখন ভোজনস্থলে আনীত এবং ব্রাহ্মণগণ গণ্ডূষ করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন রজকিনী সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং যখন "দ্বিজগণ ডাকে, ব্যঞ্জন আনিতে, ধোবিনী তখন ধায়।" এই বর্ণনা দ্বারা যে অনর্থোৎপাত স্থচিত হইয়াছিল, তাহার শেষাঙ্ক আর জানা গেল না, ইহার পরে পুঁথির অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে একটি অলৌকিক গল্পের প্রবাদ আছে, তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

চণ্ডীদাসের রাধিকা।

চণ্ডীদাসের বর্ণিত রাধিকাকে প্রথম যখন তিনি দেখাইতেছেন, তখনই উন্মাদিনীর বেশ; প্রেমের মলয় সমীরণে তিনি ফুটিয়া রহিয়াছেন। স্বীয় নিবিড়কৃষ্ণকুন্তল আহ্লাদে একবার খুলিতেছেন, একবার দেখিতেছেন,—তাহার মধ্যে কৃষ্ণরূপের মাধুরীটি আছে; করজোড়ে মেঘপানে তাকাইতেছেন, নয়নের তারা চলিতেছে না,—মেঘের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া পড়িতেছে,—কারণ কৃষ্ণের বর্ণ মেঘের স্থায়; একদৃষ্টে তিনি ময়ুর ময়ূরীর কণ্ঠ দেখিতেছেন, সেখানেও চক্ষু কৃষ্ণরূপের অনুসন্ধান করিতেছে,—নব পরিচয় এইরূপ। তাহার পর প্রেমের বিহ্বলতা, কত বিনয়, কত অনুনয়, মধুমাখা ক্রোধ, সেই ক্রোধে কাঠিন্যমাত্র নাই, ফুলদলে সেই ক্রোধের সৃষ্টি,—মানের পরই মানভঙ্গ, গালি দিয়া,—আঘাত করিবার চেষ্টা করিয়া নিজে আঘাত পাইয়া আসা,—কত কাতর অশ্রুর সম্পাত, কত দুঃখের নিবেদন, কত কাতরোক্তি; প্রেম করিয়া লোক কত দুঃখী হয়,—বন্দরে যাইয়া যেন ডিঙ্গা মিলে না, সুরধুনী-তীর হইতে

যেন শুষ্ককণ্ঠে ফিরিয়া আসিতে হয়,—সেই দুঃখ চণ্ডীদাসের কবিতায় ছত্রে ছত্রে। তথাপি সেই কষ্টের মধ্যেই কষ্ট বহন করিবার যোগ্য উপকরণ আছে,—কষ্টের মধ্যেই কষ্টের ঔষধ সুখ আছে।

"যথা তথা যাই আমি যতদূর পাই।
চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই॥"

সেই চাঁদ মুখের কথা বলা যায় না। বলিতে গেলে সুখে দুঃখে, সুধা বিষে, হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তাঁহার অশ্রুতে সুখ দুঃখ জড়িত,—প্রভাত-পদ্মের ন্যায় দুটি চক্ষু আলো পাইয়া উন্মীলিত হয়, কিন্তু নৈশ-শিশির-ভারাক্রান্ত হইয়া মলিন হইয়া পড়ে,—কোন্‌টি পুলকাশ্রু, কোন্‌টি শোকাশ্রু, কোন্‌টি প্রাতঃশিশির, কোন্‌টি নৈশ-হিম-কণা—তাহা নিশ্চয় বলা যায় না।

"গুরুজন আগে, দাঁড়াইতে নারি,
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল, দিক নেহারিতে,
সব শ্যামময় দেখি॥
দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পুরয় তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥"

তাঁহার প্রসঙ্গেই কাঁদিয়া ফেলেন, বড় সুখ হয়,—সে নাম শুনিতে বড় সুখ হয়, চক্ষে আপনিই জল পড়ে; আবার এই সুখ পাছে অপর কেহ দেখে,—পৃথিবী ত সুখের বাদী, গভীর সুখ পৃথিবী বুঝে না,—তাই নানাপ্রকারে সেই পুলক ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াও তাহা রোধ করা যায় না। এই সুখের মধ্যেও বিষাদের ছায়া আছে, না হইলে সুখ অপূর্ব্ব-সুখ হইত না; না ভাঙ্গাইতেই ভাঙ্গাইবার ভয়;—

"এ হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥"

বাশুলী দেবী।

ভালবাসার দুঃখের প্রতিশোধ—অভিমান ; কিন্তু তাহা আত্মবঞ্চনা-মাত্র—

"এক কর্ণ বলে আমি কৃষ্ণনাম শুনব।
আর এক কর্ণ বলে আমি বধির হইয়া রব—ও নাম শুনব না॥"

ইহাই চূড়ান্ত সীমা। চণ্ডীদাসের মান করিবারও সাধ্য নাই ; দশ ইন্দ্রিয় মুগ্ধ, মন মান করিবে কিরূপে? স্বীয় শরাসন মন্ত্রমুগ্ধ, শর নিক্ষেপ করা অসাধ্য,—

"যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায়।
আন পথে ধাই তবু কানু পথে যায়॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম।
যাঁর নাম নাহি লব লয় তাঁর নাম॥
এ ছার নাসিকা মুঞি কত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ॥
সে কথা না শুনিব করি অনুমান।
পর সঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কাণ॥
ধিক রহুঁ এ ছার ইন্দ্রিয় আদি সব।
সদা যে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥"

ইহা অপূর্ব্ব তন্ময়ত্ব।

আমরা চণ্ডীদাসের কবিতা বেশী উঠাইব না। যে পাঠক প্রেমিক, তিনি হৃদয়-নিভৃতে সেই পদ-কুসুমগুলি তুলিয়া অশ্রুসিক্ত করিয়া সুখী হউন। মিষ্ট দ্রব্যের যেরূপ স্বাদ ভিন্ন অন্য প্রমাণ নাই, এই গীতিগুলির উৎকর্ষেরও পাঠ ভিন্ন অন্য প্রমাণ হইতে পারে না।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি।

আর একটি কথা। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাপতির যশে চণ্ডী-দাসের যশ কিছু ঢাকা পড়িয়াছে। তাহা হওয়া বিচিত্র নহে। কালিদাসের যশে ভবভূতি ঢাকা পড়িয়াছেন, ভারতচন্দ্রের যশে কবিকঙ্কণ ঢাকা

পড়িয়াছেন, কতক দিনের জন্য পোপের যশে সেক্ষপীয়র ঢাকা পড়িয়াছিলেন। চারু-চিত্রপটখানা দেখিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হয়,—কিন্তু মানস-সৌন্দর্য্য ও গরিমা সেরূপ সহজে আয়ত্ত হইবার বিষয় নহে।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ন্যায় শিক্ষিত ছিলেন না,—ইহাই সাধারণ মত। লেখা পড়া পুষ্পের ন্যায়, ফল জন্মিলে পুষ্পের বিলয় হয়; শাস্ত্র ভাব কি ভক্তির নিকট পৌঁছাইতে চেষ্টা করে; যিনি নিজে ভাবুক বা ভক্ত, তিনি শাস্ত্রের মুকুরে প্রতিবিম্বিত প্রকৃতির মূর্ত্তির প্রতি কেনই বা লক্ষ্য করিবেন;—প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ন্যায় উপমা প্রয়োগ করেন নাই,—সুন্দরের স্বভাব ভঙ্গীই অলঙ্কার হইতে বেশী আকর্ষক; উপমা কবির একটি শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া বর্ণিত আছে সত্য,—কিন্তু যিনি ভাবটি নিজের তুলিতে আঁকিতে পারেন না, তিনি উপমার অঙ্গুলী-সঙ্কেতে গৌণবস্তু দ্বারা মুখ্যবস্তুর আভাস দিতে চেষ্টা করেন। তাই উপমার রূপ বর্ণনা অপেক্ষা জীবন আঁকিয়া রূপ বর্ণনা উৎকৃষ্ট। এই অংশে কালিদাস হইতে সেক্ষপীয়র শ্রেষ্ঠ,—বিদ্যাপতি হইতে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ।

চণ্ডীদাসের আধ্যাত্মিক ভাব।

চণ্ডীদাসের গীতিসমূহের ভিতর একটু আধ্যাত্মিকতা আছে, তাহা এত স্পষ্ট যে অস্বীকার করা যায় না; সাধারণ প্রেম দ্বারা উহার সর্ব্বত্র ব্যাখ্যা করা সুকঠিন হয়; পূর্ব্বরাগের প্রথমই কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য-প্রচার—নাম মধুময়, তাহা "বদন ছাড়িতে নাহি পারে।" নাম শুনিয়া অনুরাগের দৃষ্টান্ত মানুষী ভালবাসার সাহিত্যে বিরল, কিন্তু "জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো।" এই নামজপের দৃষ্টান্ত সাধারণ সাহিত্যে একেবারে দুষ্প্রাপ্য,—মনে হয় যেন ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে ভক্তচিত্ত আপনা ভুলিয়া যায়, এই দৈহিক বন্ধন যেন তখন থাকিয়াও থাকে না,—ইন্দ্রিয়প্রশমিত মনে—নামের মধুভরা মোহ সর্ব্বাঙ্গ শিথিল ও অবসন্ন করিয়া ফেলে। এই পূর্ব্বরাগ

বাশুলীর মন্দির

সাধারণ প্রেমের পূর্ব্বরাগের উন্নততম আদর্শ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে, কিন্তু ইহা ঐশ্বরীয় প্রেমের স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করা সহজ হয়। তার পর শ্রীমতী রাধিকার "বিরতি আহারে, রাঙ্গাবাস পরে, যেমন যোগিনী পারা।" নীল নিচোলপরিহিতা রাধিকা-মূর্ত্তিই বৈষ্ণব সাহিত্যে সুলভ, কিন্তু রাঙ্গাবাস-(গেরুয়া) পরা রাধিকা এখানে সন্ন্যাসিনীর মত, তাহার পরিধান গেরুয়া এবং আহারে বিরতি (উপবাস আচরণ) ও মেঘ দেখিলেই কৃষ্ণভ্রমে করজোড়ে সকাতর অনুনয়, একদৃষ্টে ময়ূর ময়ূরীর কণ্ঠ দেখিয়া বর্ণমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পড়া, এ সকল বৈষ্ণব সাধুভক্তগণের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। "যে করে কানুর নাম তার ধরে পায়। পায় ধরি কান্দে সে চিকুর গড়ি যায়। সোণার পুত্তলি যেন ভূতলে লুটায়॥" এই স্বর্ণ-পুত্তলি প্রেমিকের নয়ন-পুত্তলি কোন সুন্দরীর ছবি বলিয়া মনে করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। যিনি ধূলিময় প্রাঙ্গণভূমিতে ইতর জাতির মুখেও হরিনাম শুনিলে অবলুণ্ঠিত হইয়া তাহার পদে পড়িতেন, সেই স্বর্ণ-পুত্তলি গৌরহরির ছবিরই পূর্ব্বাভাষ যেন এই পদে সূচিত হইতেছে। "সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভাল মন্দ নাহি জানি। কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য মম, তোমার চরণখানি॥" পদটি "ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"—প্রভৃতির ন্যায় উদার অহঙ্কার-বর্জ্জিত আত্মসমর্পণের ভাব ইঙ্গিতে জ্ঞাপন করে।

চণ্ডীদাসের মানুষী প্রেম, ক্ষণে ক্ষণে এক উন্নত অমানুষিক প্রেম-রাজ্যের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উপন্যাস কি কাব্যের সাধারণ আদানপ্রদানময় প্রেমভাব তত ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। রামীর কথা কহিতে যাইয়াও চণ্ডীদাস মানুষী-প্রেমের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া আশ্চর্য্যরূপে পবিত্রতার সহিত ধর্ম্মজগতের কথা কহিয়াছেন ; "কামগন্ধ নাহি তায়"—কথা বহু পরিচিত ; তাহা ছাড়া "তুমি হও পিতৃ মাতৃ", "তুমি বেদমাতা গায়ত্রী," "তুমি সে মন্ত্র, তুমি সে তন্ত্র, তুমি উপাসনা রস" এসব কথা ধর্ম্মবেদী হইতে উচ্চারিত স্তোত্রের মত শুনায়। ধোপানীর

পায় যে পুষ্পাঞ্জলি—যে আদর ও শ্রদ্ধা পড়িয়াছে, তাহা যেন কোন অজানিত স্বর্গলোকে অলক্ষিতভাবে পৌঁছিয়া চিরপবিত্র হইয়া রহিয়াছে। চণ্ডীদাসের সরল কথাগুলি সর্ব্বত্রই মর্ম্মস্পর্শী। "বদন থাকিতে না পারি বলিতে, তেঞি সে অবলা নাম"—পদে তিনি ব্যাকরণকে তুচ্ছ করিয়া তীক্ষ্ণ অন্তশ্চক্ষুবলে 'অবলা' শব্দের এক সুন্দর ও নূতন অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। চণ্ডীদাস সহজ বক্তা, সরল বক্তা ও সুন্দর বক্তা। বিদ্যাপতির পূর্ব্বরাগের "ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণে অনুসরই। ক্ষণে ক্ষণে বসন-ধুলি তনু ভরই॥" প্রভৃতি বর্ণনায় ঈষদুদ্ভিন্নযৌবনা রাধিকার রূপ যেন উছলিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সেই পূর্ব্বরাগের অবস্থা চিত্রিত করিয়া চণ্ডীদাস যে ধ্যানপরায়ণা রাধিকার মূর্ত্তিটি দেখাইয়াছেন, তাহার সাশ্রুনেত্র আমাদিগকে স্বর্গীয় প্রেমের স্বপ্ন দেখাইয়া অনুসরণ করে, এবং চৈতন্য প্রভুর দুটি সজল চক্ষুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেই মূর্ত্তি ভাষার পুষ্প-পল্লবের বহু ঊর্দ্ধে নির্ম্মল আধ্যাত্মরাজ্য স্পর্শ করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছে। সে স্থানে সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য বিরল, কিন্তু তাহা প্রেমের নিজের স্থান। এখানে শব্দের ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা শব্দের অল্পতাই ইঙ্গিতে বেশী কার্য্যকরী হয়। প্রকৃত প্রেমিক বড় স্বল্পভাষী, এখানে উচ্চ ভাবের শোভা অবগতির জন্যই যেন ভাষার শোভা তনুত্যাগ করে এবং সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যের বাহুল্য না থাকিলেও হৃদয়ের অন্তঃপুর-শোভী চির বসন্তের চারু চিত্র-পটে চক্ষু মুগ্ধ হইয়া যায়। চণ্ডীদাসের প্রেম-গীতিতে 'নায়িকা রাধিকা' অপেক্ষা 'রাধাভাবে'রই উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

ভাব-সম্মিলন।

চণ্ডীদাসের ভাব-সম্মিলনের পদাবলী স্তোত্ররূপে পাঠ করা যায়। ততোধিক প্রশংসা করিলেও বোধ হয় অন্যায় হইবে না, সেগুলির মত প্রেমের সুগভীর মন্ত্র ধর্ম্মপুস্তকেও বিরল। "বঁধু কি আর বলিব আমি"—প্রভৃতি গান শুধু

বৈষ্ণবের কণ্ঠে নহে, ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া সুশ্রাব্য মনোহরসাহী রাগিণীতে ব্রাহ্মগায়কের কণ্ঠেও ধ্বনিত হইয়া থাকে। আমরা আর একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গ শেষ করিব ঃ—

"বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি, তোঁহারে সঁপেছি, কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া, যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা, না জানি ভজন পূজন॥
পিরীতি রসেতে, ঢালি তনু মন, দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর গতি, তুমি মোর পতি, মন নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক দুখ।
বঁধু তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার, গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য মম, তোমার চরণখানি॥"

চণ্ডীদাস মূর্খ ছিলেন না।

চণ্ডীদাস মূর্খ ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না, নকুলঠাকুর কর্ত্তৃক তিনি 'বিদ্যাতে বিদ্যাভিরাম' ও 'বিজ্ঞ' বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন, দেখা যায়। চণ্ডীদাসের দুই একটি গানে ভাগবত পড়ার আভাস আছে;—"কেহ বা আছিলা দুগ্ধ আবর্ত্তনে, চুলাতে রাখিয়া বেসালী" পদটি দেখুন।

রামীর পদ।

প্রাচীন একখানি পদসংগ্রহ-পুস্তকে চণ্ডীদাসের প্রীতি ও কবিত্বের মূল প্রস্রবণস্বরূপ রজকিনী রামীর পদপ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। রামীর ভণিতাযুক্ত পদ আমরা চণ্ডীদাস-রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত দুইটি পদের সারল্য ও সরসতা চণ্ডীদাস কবিরই যোগ্য বটে।

(১) "কোথা যাও ওহে, প্রাণ-বঁধু মোর, দাসীরে উপেক্ষা করি।
না দেখিয়া মুখ, ফাটে মোর বুক, ধৈরজ ধরিতে নারি॥

বাল্যকাল হতে, এ দেহ সঁপিনু, মনে আন নাহি জানি।
কি দোষ পাইয়া, মথুরা যাইবে, বল হে সে কথা শুনি॥
তোমার এ সারথি, ক্রুর অতিশয়, বোধ বিচার নাই।
বোধ থাকিলে, দুঃখ-সিন্ধু-নীরে, অবলা ভাসাইতে নাই॥
পিরীতি জ্বালিয়া, যদিবা যাইবা, কবে বা আসিবে নাথ।
রামীর বচন, করহ শ্রবণ, দাসীরে করহ সাথ॥"

(২) "তুমি দিবাভাগে, লীলা অনুরাগে, ভ্রম সদা বনে বনে।
তাহে তব মুখ, না দেখিয়া দুঃখ, পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে॥
ত্রুটি সমকাল, মানি সুজঞ্জাল, যুগ তুল্য হয় জ্ঞান।
তোমার বিরহে, মন স্থির নহে, ব্যাকুলিত হয় প্রাণ॥
কুটিল কুন্তল, কত সুনির্ম্মল, শ্রীমুখমণ্ডলশোভা।
হেরি হয় মনে, এ দুই নয়নে, নিমেষ দিয়াছে কেবা॥
যাহে সর্ব্বক্ষণ, হয় দরশন, নিবারণ সেহ করে।
ওহে প্রাণাধিক, কি কব অধিক, দোষ দিয়ে বিধাতারে॥
তুমি সে আমার, আমি সে তোমার, সুহৃৎ কে আছে আর।
খেদে রামী কয়, চণ্ডীদাস বিনা, জগৎ দেখি আঁধার॥"

রামীর পদ দুইটীর মধ্যে আমরা একটুকু আধ্যাত্মিকত্ব খুঁজিয়া বাহির করিব,—প্রথম পদে "মথুরা যাইবে" পদটির অর্থ 'সমাজে উঠা' ও "তোমার সারথি ক্রূর অতিশয়" পদে অক্রূরের নামে নকুলঠাকুরের হৃদয়হীনতার উপর রোষ প্রকাশ পাইয়াছে। দিবাভাগে রামী চণ্ডীদাসের প্রীতি-প্রফুল্ল মুখখানি দেখিবার সুবিধা পাইতেন না, দ্বিতীয় পদটিতে তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই দুইটি পদ রামীর বিরচিত কি না, সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। দ্বিতীয় পদটীতে উক্ত চক্ষুর নিমেষ থাকার সম্বন্ধে যে আক্ষেপ করা হইয়াছে, তাহা চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বিবিধ পুস্তকে অনিমেষ নেত্রের সম্বন্ধে বিবিধ আক্ষেপ-উক্তির একটী প্রতিধ্বনির মত শুনায়। সুতরাং এই রচনা চণ্ডীদাসের বহু পরবর্ত্তী বলিয়াই মনে হয়। রামী ধোপানীকে

বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রথম স্ত্রীকবি বলিয়া গ্রহণ করার পূর্ব্বে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন।

গ। বিদ্যাপতিঠাকুর।

মৈথিল কবি বিদ্যাপতিঠাকুর ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন। ইঁহাদের গাঞি 'বিষয়িবারবিস্ফী', সুতরাং বিদ্যাপতিঠাকুরের পূর্ণ নামটি একটুকু অদ্ভুত ও জাঁকালো রকমের—'বিষয়ীবারবিস্ফী বিদ্যাপতিঠাকুর' মহারাজ শিবসিংহের সভাসৎ পণ্ডিত এবং চণ্ডীদাস ঠাকুরের সমসাময়িক কবি ছিলেন। শুভ বসন্তকালে গঙ্গাতীরে এই দুই কবির সম্মিলন হইয়াছিল, তদুপলক্ষে অনেক বৈষ্ণব কবি পদ লিখিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাপতির পরিচয়।

মহারাজ শিবসিংহ বিদ্যাপতিঠাকুরকে 'বিস্ফী' নামক গ্রামখানি প্রদান করিয়াছিলেন। এই গ্রাম মিথিলা সীতামারি মহকুমার অধীন জারৈল পরগণার মধ্যে কমলা নদীর তীরে অবস্থিত। এখন আর তদ্বংশীয়েরা কেহ সেখানে নাই, চারি পুরুষ ধরিয়া তাঁহারা সৌরাট নামক অপর একখানি গ্রামে বাস করিতেছেন। কবির বংশধর বনমালী ও বদরীনাথ এখন বিদ্যমান আছেন।

বিদ্যাপতির পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই বিদ্বান্ ও যশস্বী ছিলেন। মহারাজ গণেশ্বরের পরম সুহৃৎ গণপতিঠাকুর তৎপ্রণীত প্রশংসিত গ্রন্থ "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী"র ফল মৃত সুহৃদের পারত্রিক মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করেন। এই গণপতিঠাকুর * বিদ্যাপতির পিতা। কবির পিতামহ জয়দত্ত সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, এজন্য তিনি 'যোগীশ্বর' আখ্যা

পূর্ব্বপুরুষগণের খ্যাতি।

---

* "জনমদাতা মোর, গণপতি ঠাকুর,
মৈথলী দেশে করু' বাস।
পঞ্চ গৌড়াধিপ, শিবসিংহ ভূপ,
কৃপা করি লেউ নিজ পাশ॥

প্রাপ্ত হন। জয়দত্তের পিতা বীরেশ্বর স্বীয় পাণ্ডিত্যগুণে মিথিলারাজ কামেশ্বরের নিকট হইতে বিশেষ বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই বীরেশ্বর-প্রণীত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বীরেশ্বরপদ্ধতি' অনুসারে মিথিলার ব্রাহ্মণেরা আজিও তাঁহাদের 'দশকর্ম্ম' করিয়া থাকেন। বিদ্যাপতির খুল্লপিতামহ চণ্ডেশ্বর মহারাজ হরিসিংহদেবের মন্ত্রী ছিলেন। চণ্ডেশ্বর ধর্ম্মশাস্ত্রে সাতখানি রত্নাকর-কর্ত্তা এবং তাঁহার উপাধি ছিল "মহামত্তক সান্ধিবিগ্রহিক"। এই বংশের আর একটি গৌরব এই যে, বিদ্যাপতির ঊর্দ্ধতন ৬ষ্ঠ স্থানীয় পূর্ব্বপুরুষ ধর্ম্মাদিত্য (কাব্যবিশারদ মহাশয়ের মতে কর্ম্মাদিত্য) হইতে সকলকেই রাজমন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়।

কবির গ্রন্থাবলী।

মহারাজ শিবসিংহের আদেশে বিদ্যাপতি সংস্কৃতে 'পুরুষ-পরীক্ষা' নামক পুস্তক রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি শিবসিংহকে পরমশৈব এবং কৃষ্ণবর্ণ দেহ-বিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহার পূর্ণ নাম 'রূপনারায়ণপদাঙ্কিত মহারাজা শিবসিংহ।' রাজ্ঞী বিশ্বাসদেবীর আজ্ঞাক্রমে তিনি 'শৈব-সর্ব্বস্বহার' ও 'গঙ্গাবাক্যাবলী' নামক দুইখানি সংস্কৃত পুস্তক রচনা করেন। মহারাজ কীর্ত্তিসিংহের আদেশে তৎকর্ত্তৃক 'কীর্ত্তিলতা' গ্রন্থ বিরচিত হয়; তাঁহার সর্ব্বশেষ সংস্কৃত গ্রন্থ 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' ভৈরবসিংহ মহারাজের (হরিনারায়ণ) রাজত্বসময়ে যুবরাজ রামভদ্রের (রূপনারায়ণ) উৎসাহে বিরচিত হয়। * পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া তিনি

বিসফি গ্রাম, দান করল মুঝে,
রহতহি রাজ সন্নিধান।
লছিমা চরণ ধ্যানে, কবিতা নিকশয়ে,
বিদ্যাপতি ইহ ভণে॥"

পদসমুদ্র।

* দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর ভূমিকায় "স্বস্তি" স্থলে "অস্তি" পাঠ ধরিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, উক্ত পুস্তক নরসিংহদেবের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল।

'দানবাক্যাবলী' ও 'বিভাগসার' নামক দুইখানি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ মহারাজ শিবসিংহ হইতে বিদ্যাপতি 'কবিকণ্ঠহার' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। *

কাল সম্বন্ধে তর্ক।

এখন বিদ্যাপতির বিস্ফী গ্রাম প্রাপ্তিজ্ঞাপক তাম্রলিপি ও মিথিলার রাজপঞ্জীর তারিখ সমন্বয় করিতে গেলে নানারূপ গোলযোগে পড়িতে হয়। ভূমিদানপত্রের কাল ১৪০০ খৃঃ (২৯৩ ল-সং)। রাজপঞ্জী হিসাবে শিবসিংহের সিংহাসন প্রাপ্তির সময় ১৪৪৬ খৃঃ। সুতরাং শিবসিংহকে রাজা হওয়ার ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে ভূমিদান করিতে হয়, অথচ ভূমিদানপত্রে তিনি 'দিগ্বিজয়ী মহারাজাধিরাজ' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ভূমিদানকালে বিদ্যাপতির বয়স ২০ বৎসর মাত্র কল্পনা করিতে হয়,—তদূর্দ্ধ বয়স স্থির করিলে বিদ্যাপতির জীবনী ১২৩ বৎসরেরও অনেক বেশী হইয়া পড়ে। ২০ বৎসর বয়স্ক বালক, ভূমিদান-পত্রে 'মহাপণ্ডিত' এবং 'নবজয়দেব' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, দেখা যায়। এরূপ নবযুবককে বিশিষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া মহারাজ শিবসিংহ তাঁহাকে একখানি বড় গ্রাম দান করিবেন—ইহাও একটি অদ্ভুত অনুমান। ২০ বৎসর বয়সে (১৪০০ খৃঃ) কবি বিদ্যাপতি 'মহাপণ্ডিত' উপাধি এবং বিস্ফী গ্রাম দান পাইয়াছিলেন, মানিয়া লইলেও ১২৭ বৎসর বয়ঃক্রমে (ভৈরব সিংহের রাজত্ব ১৫০৬-১৫২০ খৃঃ) তাঁহাকে 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' লিখিতে হয়। আর কাব্যবিশারদ মহাশয়ের মতানুসারে ঐ পুস্তক নরসিংহদেবের রাজত্বকালে

---

* "ভণহি বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার।
কোটি হুঁন ঘটয় দিবস অভিসার॥"

Grierson's Maithil Songs, A. S. J. Extra No. 193.

কেহ কেহ বলেন তাঁহার উপাধি 'কবিরঞ্জন' ছিল,—"চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলল" ও "পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে" প্রভৃতি পদ দৃষ্টে সেরূপও বোধ হয়।

লিখিত হইয়াছিল, স্বীকার করিলেও কবিকে অন্যূন ৯৬ বৎসর বয়সে 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' প্রণয়ন করিতে হয়। এরূপ বৃদ্ধ বয়সে কাব্য লিখিবার সামর্থ্য ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়; বিস্ফী গ্রাম দান কালে কবির অন্যূন ২০ বৎসর বয়স এবং 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' রচনার সময়ে তাঁহার অন্যূন ৯৬ বৎসর বয়স—দুই কষ্টকল্পিত "অন্যূনের" সাহায্যেও এই জটিল প্রশ্নের বিশ্বাসযোগ্য উত্তর প্রাপ্ত হওয়া গেল না।

ভূমিদানপত্রের সঙ্গে রাজসভার পঞ্জীর ঐক্য স্থাপন করিতে ইচ্ছুক লেখকগণ ইতিহাসের ছিন্নপৃষ্ঠায় এইরূপ কয়েকটি বড় রকমের তালি দিয়াছেন।

এখন ভূমিদানপত্র ও রাজপঞ্জী ইহাদের কোনটি কিংবা উভয়ই অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে। ভূমিদানপত্র সম্বন্ধে বহুদিন

ভূমিদানপত্রের সত্যতা।

হইল শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখিয়াছিলেন :—

"এই সনন্দে যে কেবল লক্ষ্মণাব্দের উল্লেখ আছে এমন নহে, সনন্দের অন্তভাগে আরও ৩টী অব্দ লিখিত হইয়াছে, যথা—সন (হিজরি) ৮০০॥ সম্বৎ ১৪৫৫॥ শাকে ১৩২১॥ আমরা প্রাচীন হিন্দু রাজাগণের অনেকগুলি সনন্দ দর্শন করিয়াছি। কিন্তু এরূপ ৪টী অব্দ কোনও সনন্দে ব্যবহৃত দেখি নাই। প্রাচীন নির্ম্মল হিন্দুহৃদয় এতদূর সতর্ক ছিল না। সনন্দের সময়াবধারণ কালে কতদূর কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা পুরাতত্ত্ববিৎ পাঠকগণ বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন। কারণ কোনও সনন্দে একাধিক অব্দ লিখিত হয় নাই এবং সেই অব্দ যে কোন্ রাজার প্রচলিত তাহা প্রায় স্থিররূপে লেখা হয় নাই, কিন্তু এ সনন্দে স্পষ্টাক্ষরে লক্ষ্মণাব্দ, হিজরি সন, বিক্রমসম্বৎ, শালিবাহন শকাব্দ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। এবম্প্রকার নানা কারণে এই সনন্দের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ হইয়াছে।" *

অল্পদিন দিন গত হইল শ্রীযুক্ত গ্রিয়ার্সন্ সাহেব ভূমিদানপত্রখানি জাল প্রতিপন্ন করিয়া এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন, তাঁহার যুক্তি অকাট্য বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন, এই ভূমিদানপত্রে যে হিজরি সন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আকবর এতদ্দেশে প্রচলিত

* ভারতী ১২৮৯, আশ্বিন।

করেন। আইনআকবরী প্রভৃতি পুস্তকে তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে এবং এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। ভূমিদান পত্রের তারিখ আকবরের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী, অথচ তাহাতে সেই হিজরি অব্দ প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাতে এই তাম্রলিপির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ দৃঢ়বদ্ধ হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ তাম্রলিপির অক্ষর;—উহা দেবনাগর, কিন্তু তৎসাময়িক বহুবিধ পুস্তক ও তাম্রশাসনে যে অক্ষর ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়াছে, তাহা মৈথিল। সে সময়ের লিপি-মালার প্রতি অভিনিবেশ করিলে, তাম্রলিপিব্যবহৃত অক্ষর যে সে সময়ের নহে, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ-শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে তাম্রশাসনখানি জাল, কিন্তু উহা এক হিসাবে জাল নহে। আকবরের সময় সমস্ত রাজ্যের জরিপ হয়; রাজা টোডর-মল্লই তাহার অনুষ্ঠাতা, উহা সকলেই অবগত আছেন। বিদ্যাপতির বংশধরগণ যে ভূমিদান পত্রের বলে বিস্ফী গ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা হয়ত কালক্রমে হারাইয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের নিকট যে একটি নকল ছিল সেই নকল দৃষ্টে নূতন তাম্রলিপি প্রস্তুত করা হইয়া থাকিবে এবং হিজরি সনটি তন্মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিস্ফী গ্রাম তিনি পাইয়াছিলেন, ইহা তৎকৃত পদেই জানা গিয়াছে,—শুধু রাজকর্ম্ম-চারিগণের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য বিদ্যাপতির বংশধর-গণ মূলের নকল হইতে একটি কৃত্রিম তাম্রশাসন প্রস্তুত করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন। ইহাও একটি অনুমান মাত্র, তবে আমাদের নিকট এ অনুমানটি সঙ্গত বোধ হইতেছে।

রাজপঞ্জী।

রাজপঞ্জীতে শিবসিংহের সিংহাসন আরোহণ-কাল ১৪৪৬ খৃঃ অব্দ, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু বিদ্যা-পতির নিজকৃত একটি মৈথিল পদ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে, তদ্দৃষ্টে দেখা যায় শিবসিংহ ১৪০০ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন;—

"অনলরন্ধ্র কর লক্খণ গরবই সক্ক সমুদ্দ কর অগিনি সসী।
চৈতকারি ছঠি জেঠা মিলিআে বার বেহপ্পই জাউলসী॥
দেবসিংহ জং পুহমী ছড্ডই অদ্ধাসন সুরয়াঅ সরু।
দুহু সুরতান নিদৈ অব সোঅউ তপনহীন জগ ভরু॥
দেখহুও পৃথিমীকে রাজা পৌরুস মাঁঝ পুন্ন বলিও।
সতবলৈ গঙ্গা মিলিতকলেবর দেবসিংহ সুরপুর চলিও॥
একদিস জবন সকল দল চলিও একদিস সৌ জমরাঅ চরু
দুহুএ দলটি মনোরথ পূরও গরুএ দাপ সিবসিংহ করু॥
সুরতরুকুসুম ঘালি দিস পুরেও দুন্দুহি সুন্দর সাদ ধরু।
বীরছত্র দেখনকো কারণ সুরগণ সোভৈঁ গগন ভরু॥
আরম্ভী অথন্তেট্টি মহামখ রাজসুঅ অশ্বমেধ জহাঁ।
পণ্ডিত ঘর আচার বখানিঅ যাচককাঁ ঘরদান কহাঁ॥
বিজ্জাবই কইবর এহু গাবএ মানত মন আনন্দ ভও।
সিংহাসন সিবসিংহ বইট্ঠো উছবৈ বিসরি গও॥"*

হে নগরবাসিগণ! তোমাদের পূর্ব্ব রাজা দেবসিংহ এই ২৯৩ লাক্ষ্মণাব্দে চৈত্র মাসে কৃষ্ণপক্ষে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে স্বর্গে দেবরাজের সিংহাসনার্দ্ধভাগী হইয়াছেন। রাজ্য রাজশূন্য হয় নাই; তাঁহার পুত্র শিবসিংহ রাজা হইয়াছেন; শিবসিংহ বাহুবলে বলীয়ান্। তিনি সম্মুখাগত যবনদিগকে তৃণের মত তুচ্ছ ভাবিয়া জননী জাহ্নবীর অমৃতধাম অঙ্কে পিতার দেহ ভস্মীভূত করিয়া কটাক্ষমাত্রে যবনরাজ-সৈন্যগণকে পরাভূত করিয়াছেন। তাহার পর যবনরাজ, তাঁহার সঙ্গে অগণিত সৈন্য; তোমাদের নূতন রাজা অকুতোভয়; ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তোমরা অনুপস্থিত ছিলে; দেখ নাই; আকাশে সারি গাঁথিয়া দেবতাগণ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে যবনরাজ পলায়ন করিল। স্বর্গে কতই না দুন্দুভি বাজিল। শিবসিংহের মাথার উপর কতই না সুরতরুকুসুম পড়িতে লাগিল। বিদ্যাপতি কবি কহিতেছেন, সেই শিবসিংহ এখন তোমাদের রাজা হইয়াছেন; তোমরা নির্ভয়ে বাস কর।

রাজপঞ্জীর নির্দ্দিষ্ট কাল গ্রহণ করা সম্বন্ধে আমাদের আরও নানারূপ আপত্তি আছে।

---

* পরিষৎপত্রিকা, ১৩০৭, ১ম সংখ্যা, ৩২ পৃঃ।

এখন বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আর দুইটি প্রমাণ বাকী। মিথিলার তদানীন্তন রাজধানী গজরথপুরে শিবসিংহের সভাসদ্ বিদ্যাপতি ঠাকুরের আদেশে এক খানি সংস্কৃতপুঁথি (কাব্যপ্রকাশের টীকা) দেবশর্ম্মা নামক জনৈক বিপ্র নকল করিয়াছিলেন, তাহার উপসংহার এইরূপ :—

আর দুইটি প্রমাণ।

"সমস্তবিরুদাবলীবিরাজমান মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎশিবসিংহদেব সম্ভুজ্যমানতীরভুক্তৌ শ্রীগজরথপুরনগরে সপ্রক্রিয় সদুপাধ্যায় ঠক্কুর শ্রীবিদ্যাপতীনামাজ্ঞয়া গৌয়ালসং শ্রীদেবশর্ম্ম বলিয়াসসং শ্রীপ্রভাকরাভ্যাং লিখিতৈষা পুস্তীতি। ল-সং ২৯১ কার্ত্তিক বদি ১০।"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাপতির কালসমস্যায় একটি নূতন আলো প্রদান করিয়াছেন। এই পুঁথি ১৩৯৮ খৃঃ অব্দে লিখিত হয়। দ্বিতীয় প্রমাণ, বিদ্যাপতির নিজের লেখা—ভাগবত গ্রন্থ। এই পুঁথির কালবাচক লেখাটির পাঠোদ্ধার হয় নাই, এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য নিরূপণার্থ প্রেরিত দুই জন পণ্ডিতের মতদ্বৈধ জন্মিয়াছে, সুতরাং আমরা আলোচনা করিতে বিরত রহিলাম। বিদ্যাপতি ঠাকুর দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ আমরা যথাযথ ভাবে নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁহার জীবন শেষ হয়, এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

খাস মিথিলায়ও বিদ্যাপতির খাঁটি রচনা উদ্ধার করা অসম্ভব।* মিথিলার পাঠ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও বিকৃত, বঙ্গদেশের প্রচলিত পাঠও বিকৃত, সুতরাং কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাপতির উপর বাঙ্গালী ও মৈথিলদিগের দাওয়া

কবির উপর বাঙ্গালীর দাবী।

* সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে বিদ্যাপতির পদাবলীর যে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে অবিকৃত বলিয়া বোধ হয়। ঐ পুঁথি সাহিত্য-পরিষদ্ প্রকাশ করিতেছেন।

তুল্যরূপ। মিথিলা বাঙ্গালার পঞ্চ বিভাগের এক বিভাগ ছিল এবং মিথিলার রাজসভায় লক্ষ্মণাব্দ প্রচলিত ছিল ইত্যাদি বলিয়া কোন কোন লেখক আবার বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালী কবি বলিয়াই স্থির করিতে চাহেন। পাঠ-বিকৃতি সমস্ত প্রাচীন কবির রচনাতেই দৃষ্ট হয় এবং এক দেশ অন্য দেশের অধীন থাকিতে পারে, এজন্য কবির স্বদেশবাসীদিগকে বঞ্চনা করিতে যাওয়া অনুচিত। বিদ্যাপতির সমাধিস্তম্ভ উঠিতে বিস্ফীতেই উঠিবে, মৈথিলগণই তাঁহাকে লইয়া গর্ব্ব করিবেন। তবে আমাদের একটা ভাল-বাসার আধিপত্য আছে; বঙ্গদেশের বহুদিনের অশ্রু, সুখ ও প্রেমের কথার সঙ্গে তাঁহার পদাবলী জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে আমরা বাঙ্গালীর ধুতি চাদর পরাইয়া মিথিলার বড় পাগড়ি খুলিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে আমাদের করিয়া দেখিয়াছি, সেইরূপে তিনি আমাদেরই থাকিবেন। আমরা আসলের পার্শ্বে একটি নকল বিদ্যাপতি খাড়া করিয়াছি; জগতে এই প্রথমবার নকলটি আসলের মতই সুন্দর হইয়াছে। আমরা পদকল্প-তরু প্রভৃতি পুস্তক হইতে তাঁহাকে আর বাদ দিতে পারি না। এ শুধু ভাল বাসার বলপ্রয়োগ; ঐতিহাসিক এ আব্দার নাও মান্য করিতে পারেন।

আমাদের অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর কবি বিদ্যাপতির শিষ্য।

মিথিলার ঋণ।

মিথিলার শিষ্যত্ব আমাদের নূতন কথা নহে। মিথিলার রাজর্ষি জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, গার্গী, মৈত্রেয়ী, গৌতম, কপিল—সমস্ত ভারতবর্ষের গুরুস্থানীয়। মিথিলা-রাজ ইক্ষ্বাকুর চারি পুত্র বিমাতার চক্রান্তে তাড়িত হইয়া কপিলবস্তুতে নবরাজ্য স্থাপন করেন, বুদ্ধদেব সেই বংশোদ্ভব। নবদ্বীপের অজেয় টোল মিথিলার শিষ্য কাণাশিরোমণি দ্বারা অধিষ্ঠিত। 'বৃজ্জি' নামক মিথিলার ক্ষত্রিয়বংশের ভাষা—ব্রজবুলি বঙ্গ সাহিত্যের বহুপৃষ্ঠা জুড়িয়া আছে। মিথিলার পণ্ডিতগণ "এক বাংগালী, দোসর তোতরাহ" *

* বিদ্যাপতি, কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সংস্করণ, উপক্রমণিকা ৷৶০।

বলিয়া যদি আমাদিগকে একটু গালি দেন, তাহা সহ্য করা আমাদের অনুচিত হইবে না।

আমরা ঈশাননাগরকৃত অদ্বৈতপ্রকাশে দেখিতে পাই, বিদ্যাপতি এবং অদ্বৈতপ্রভুর দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন বিদ্যাপতি বয়োবৃদ্ধ ছিলেন সন্দেহ নাই।

বিদ্যাপতি ও অদ্বৈতাচার্য্য।

অদ্বৈত ১৪৩৪ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং বর্ণিত সাক্ষাৎকারের সময় তাঁহার বয়স ২৪।২৫ বৎসর ছিল, সুতরাং ১৪৫৮ কিম্বা তৎসন্নিহিত কোন সময়েএই দেখা শুনা হইয়াছিল। উক্ত বিবরণে জানা যায়, বিদ্যাপতি অতি সুশ্রী পুরুষ ছিলেন, ও তাঁহার পদরচনার সঙ্গে গান করিবার শক্তি ও রাগরাগিণ্যাদির উৎকৃষ্ট জ্ঞান ছিল।

বিদ্যাপতির ধর্ম্ম বিশ্বাস কি ছিল, জানা যায় নাই। তিনি 'দুর্গা-ভক্তি-তরঙ্গিণী' লিখিয়াছিলেন ও শৈবধর্ম্মাবলম্বী শিবসিংহ রাজার প্রিয় সভাসদ্ ছিলেন। বিস্ফীতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিব এখনও আছেন। কিন্তু তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত ভাগবতখানি তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রীতির সাক্ষী,—তাঁহার রাধাকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় পদাবলী ভক্তির সরস উৎস। একটি শিব-বন্দনায় তিনি লিখিয়াছেন, "হরি উৎকৃষ্ট চাঁপা-ফুলের অঞ্জলি গ্রহণ করেন, শিব তুমি সামান্য ধূতুরা-ফুলেই প্রীত হও।" তিনি বাহিরে যাহাই থাকুন, তাঁহার হৃদয়টি বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুকূলে ছিল, একথা বোধ হয় বলা যাইতে পারে।

বিদ্যাপতির কবিত্ব-শক্তি ঈশ্বরপ্রদত্ত। তিনি ভগবৎকৃপার সঙ্গে স্বীয় পাণ্ডিত্য ও শিক্ষার যোগ করিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য স্বভাব-দত্ত তীক্ষ্ণ চক্ষু ও অলঙ্কারশাস্ত্রের জ্ঞান উভয়ই ব্যবহার করিতেন। একটি সুন্দর চিত্র দেখিলে পৃথিবীর নানা রূপের ছবি স্পষ্ট ভাবে মনে উদয় হইত—তাই তাঁহার উপমাগুলি এত সুন্দর। নায়িকার সুন্দর চোখ দুটি তিনি

বিদ্যাপতির উপমা

কত উপমায় ব্যক্ত করিয়াছেন—দেখুন,—কজ্জল শোভিত সলিলার্দ্র চক্ষু ঈষদ্ রক্তাভ হইয়াছে,—পদ্মদলে যেন ঈষদ্ সিন্দূরের লেপ পড়িয়াছে (১), চক্ষুর তারা যেন স্থির ভৃঙ্গের ন্যায়—মধুতে বিভোর হইয়া উড়িতে পারিতেছে না (২), কজ্জলযুক্ত চোখের বঙ্কিম চাহনিতে কৃষ্ণতারকা এক কোণে সরিয়া পড়িয়াছে, যেন মধুমত্ত ভ্রমরকে পবন ইন্দীবর হইতে ঠেলিয়া ফেলিতেছে (৩)।

এইরূপে উপমার সংখ্যা নাই; উপমা ভিন্ন কথা নাই। পৃথিবীর সুন্দর পদার্থগুলি পৃথক্ হইলেও তাহাদের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। চাঁপাফুলের ঘ্রাণেও বেহাগ-রাগিণীর কথা মনে পড়িতে পারে। এই সম্বন্ধ নির্ণয় করা বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত, কিন্তু কবি তাহা ধরিয়া ফেলেন, জগতের এই লতাপুষ্পপল্লব ও নরনারীচিত্র এক তুলির আলেখ্য সেই একত্বের গন্ধ অনুভব করিতে মনের একটা শক্তি আছে, চক্ষু কর্ণের ন্যায় তাহার নাম নাই, সেই শক্তি উপমাযোজনায় ব্যক্ত হয়। বিদ্যাপতির এই ইন্দ্রিয় অতি তীক্ষ্ণ ছিল। বৈদ্য যেরূপ সতত উপেক্ষিত তৃণপল্লব হইতে উৎকৃষ্ট ঔষধ আবিষ্কার করেন, বিদ্যাপতিও সেইরূপ এই পৃথিবীর অতি সচরাচর দৃশ্য হইতে উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। উপমার যশে ভারতবর্ষে মাত্র কালিদাসেরই একাধিপত্য, যদি দ্বিতীয় একজনকে কিছু ভাগ দিতে আপত্তি না থাকে, তবে বোধ হয় বিদ্যাপতির নাম করা অসঙ্গত হইবে না। বিদ্যাপতির দ্বিতীয় শক্তি—সৌন্দর্য্যের একটী

---

(১) "নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দূরে মণ্ডিত জানু পঙ্কজপাতা॥"

(২) "লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার॥"

(৩) "চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনি
অঞ্জন শোভন তায়।
জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলল
অলি ভরে উলটায়॥"

পরিষ্কার চিত্র আঁকিয়া দেওয়া। বিদ্যাপতির বর্ণিত রাধিকা,—কতকগুলি চিত্রপটের সমষ্টি। বয়ঃসন্ধির ছবিখানি এইরূপ,—

রাধা কখনও (বালিকা-সুলভ) উচ্চহাস্য হাসিয়া ফেলেন, কখনও (নবাগত যৌবনের ভাবে) তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসি খেলা করে। কখনও চমকিত হইয়া পাদ-বিক্ষেপ করেন, কখনও তাঁহার গতি (যুবতীর ন্যায়) মৃদুমন্দ ; ফুলধনুর পাঠশালায় ইনি নূতন শিক্ষার্থী ; নিজের শরীরে আনত দৃষ্টি করিয়া কখনও বিভোর হইয়া তাহাই দেখেন, কখনও বা তাহা বস্ত্রে ঢাকিয়া রাখেন। প্রেম-বিহারের কথা শুনিলে চক্ষু মৃত্তিকার দিকে নত করিয়া একাগ্র কর্ণে তাহাই শুনিতে থাকেন ; কেহ তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রচার করিলে কান্না ও হাসি মিশাইয়া গালি দেন। মুকুর সম্মুখে রাখিয়া কেশ-বিন্যাসাদির সময় সখীগণকে চুপে চুপে প্রেম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন এবং হৃদয়ে প্রেমের ভাব উপস্থিত হইলে চক্ষু মুদিত করেন। রসের কথা শুনিলে সঙ্গীতমুগ্ধা হরিণীর ন্যায় সেই দিকে আকৃষ্ট হন। *

আর একখানি ছবি লজ্জার :—

একদিন একখানা ছোট কাপড় পরিয়া আলুথালু ভাবে বসিয়া আছি। অলক্ষ্যে

---

* "ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস।
ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে করু বাস॥
চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে, ক্ষণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥"
"হৃদয়জ মুকুলি হেরি থোর থোর।
ক্ষণে আঁচর দেই ক্ষণে হোয় ভোর॥"
"কেলি রভস যব শুনে।
আনত হেরি ততহি দেই কাণে॥
ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি।
কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি॥"
"মুকুর লেই অব করত সিঙ্গার।
সখিরে পুছই কৈছে...বিহার॥"
"শুনিতে রসের কথা থাপয়ে চিত
যৈসে কুরঙ্গিণী শুনই সঙ্গীত॥"

(কমলনয়ন) কৃষ্ণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। শরীর একদিক্ ঢাকিতে অন্যদিক্ মুক্ত হইয়া পড়ে। লজ্জায় ইচ্ছা হইল, ধরণী ফাটিয়া যাউক, তাহাতে প্রবিষ্ট হই, * * * কি বলিব সখি, আমার জীবন যৌবনে ধিক, আজ আমার মুক্ত অঙ্গ শ্রীহরি দেখিলেন। *

এই লেখাগুলি তুলিতে আঁকা ছবির মত। সুন্দরীর নানা ভঙ্গীর ছবি দেখিয়া কবি ফটো তুলিয়াছেন। তুলি দ্বারা ফলিত বর্ণ মুছিয়া যায়, কিন্তু লেখনীর আঁকা ছবি মোছে না; তাই ৫০০ শত বৎসর পরেও এই নারী চিত্রগুলি সদ্যঃ-প্রস্ফুট মালতীর ন্যায় স্পষ্ট রহিয়াছে। এই রাধা জয়দেবের রাধার ন্যায়—শরীরের ভাগ অধিক, হৃদয়ের ভাগ অল্প। কিন্তু বিরহে পৌঁছিয়া কবি ভক্তি ও প্রেমের গীতি গাহিয়াছেন, তথা হইতে কবি অলঙ্কারশাস্ত্রের সহিত সম্বন্ধবিচ্যুত হইয়া পরমভাগবত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ফ্রেমে-বাঁধা বিলাসকলাময়ী নায়িকার চিত্রপটখানা সহসা সজীব রাধিকা হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার উপমা ও কবিতার সৌন্দর্য্য চক্ষের জলে ভিজিয়া নবলাবণ্য ধারণ করিল। বিরহ ও বিরহানন্তর মিলন-বর্ণনায় বিদ্যাপতি বৈষ্ণব-কবিদিগের অগ্রগণ্য। কেহ কেহ বলেন, চণ্ডীদাসের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তাঁহার কবিতায় এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল।

বিরহ।

---

* "একলি আছিনু ঘরে হীন পরিধান
অলখিতে আওল কমল-নয়ান॥
এদিকে ঝাপিতে তনু ওদিকে উদাস।
ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ॥
* * * *
ধিক যাউক জীবন যৌবন লাজ।
আজু মোর অঙ্গ দেখল ব্রজরাজ॥"

রুচির অনুরোধে আমরা অনুবাদের অনেক স্থল একটু একটু কোমল করিয়াছি। তজ্জন্য আমরা পাঠক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা চাই। নিখুঁত সুরুচিসম্পন্ন রচনা বিদ্যাপতির পূর্ব্বরাগ, সম্ভোগ-মিলন, মান, প্রেম-বৈচিত্র্য প্রভৃতি অধ্যায়ে একরূপ দুষ্প্রাপ্য।

শ্রীহরি মথুরায় যাইবেন শুনিয়া রাধা জ্ঞান-হীনা, কৃষ্ণ আসিলে তাঁহার হাত দুখানি সযত্নে মস্তকে ধারণ করিয়া যেন রাধা নীরবে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন—"আমার মস্তকে হাত দিয়া বল, যাইবে না।" কৃষ্ণ সেইরূপ শপথই করিলেন, রাধা তাহাই বেদবাক্যের মত বিশ্বাস করিলেন। বিদ্যাপতি-বর্ণিত রাধিকা বড় সরলা, বড় অনভিজ্ঞা। কৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন, শুষ্ক ও শীর্ণ কুসুমকান্তি ভূতলে লুটাইতেছে, সখীগণ কৃষ্ণ আসিবেন বলিয়া আশ্বাস দিতেছে, মুমূর্ষু রাধিকা কাতরে বলিতেছেন,—

চন্দ্রকরে নলিনীলতা শুকাইয়া গেল, বসন্ত ঋতু আসিলেই বা কি হইবে? তপনতাপে অঙ্কুর জ্বলিয়া গেলে, বর্ষার জলে কি করিবে? হরি হরি, একি দৈব দুঃখ! সিন্ধুতীরে যদি কণ্ঠ শুকায়, তবে আর পিপাসা কে দূর করিবে? আমার কর্ম্মদোষ ভিন্ন চন্দনতরু সৌরভ-বিচ্যুত হইবে কেন, চন্দ্রকর হইতে অগ্নিকণা লাভ করিব কেন এবং চিন্তামণি স্বগুণহারা হইবে কেন? আমি শ্রাবণ মাসের মেঘ হইতে জলকণা পাইলাম না, এবং কল্পতরু আমার পক্ষে বন্ধ্য হইল। *

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত প্রেমৈশ্বর্য্যের প্রতি চিরবিশ্বাসময়ী মুগ্ধার মৃত্যু-যাতনাও

---

* "হিম-কর-কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করবি মাধবী-মাসে॥
অঙ্কুর, তপন- তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ-মেহে।"
"হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে, যদি কণ্ঠ সুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা॥
চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি॥
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব
সুরতরু বাঁঝকি ছান্দে।"

আমাদিগকে মোহিত করে, সে বিরহ-কথা মর্ম্মান্তিক হইলেও তাহা এক স্বপ্নময় সৌন্দর্য্যগুণে চিত্ত আকর্ষণ করে, "শ্রবণহুঁ শ্যামনাম করু গান। জপইতে নিকসউ কঠিন পরাণ॥" প্রভৃতি কেমন মিষ্ট! সেই চিরশ্রুত "নারায়ণং তনু-ত্যাগে" চরণার্দ্ধ মুমূর্ষু ভক্তের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে, ইহাও কি তাঁহারই কবিত্বময় রূপান্তর নহে?

এই দুঃখের পরিসমাপ্তি সুখে। বিরহের দুঃখের পর, মিলনের সুখ বর্ণনায় বিদ্যাপতির গীতির ন্যায় গাঢ় প্রেমের উক্তি পদ্য-সাহিত্যে অল্পই আছে। রাধিকা চন্দ্রকিরণে কোকিলের কুহুস্বরে পাগলিনী হইয়াছিলেন,—এখন বলিতেছেন,—সেই কোকিল এখন লক্ষ ডাক ডাকুক, লক্ষ চাঁদ উদিত হউক, পাঁচটি ফুলবাণের স্থলে লক্ষ ফুলবাণ নিক্ষিপ্ত হউক। *

কৃষ্ণ আসিবেন—প্রাণবঁধুকে প্রণাম করিবেন, রাধা এই সুখের আশায় মুগ্ধা।

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥"

প্রভৃতি পদ আবৃত্তি করিয়া মহাপ্রভু উন্মত্তবৎ এক প্রহর কাল নৃত্য করিয়াছিলেন। "জনম অবধি" পদ বহুবার উদ্ধৃত হইয়াছে, এখানে আর উঠাইব না। ছবি-অঙ্কন-নিপুণ, প্রেমাহ্লাদ বর্ণনায় কৃতার্থ, উপমা ও পরিহাস রসিকতায় সিদ্ধহস্ত বিদ্যাপতি অনেকগুলি স্বাভাবিক গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণ পাঠক তাঁহার মনোমুগ্ধকর উপমা দৃষ্টে প্রীত হইবেন, তদপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর পাঠক তাঁহার প্রেমের বিহ্বলতা ও গাঢ়তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রেমিক ও ভক্ত বলিয়া

---

* "সোহি কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥"

প্রণাম করিবেন। কিন্তু আমরা বিদ্যাপতি হইতে শ্রেষ্ঠ, খাঁটি প্রেমিক, আড়ম্বর-হীন আর একটি কবির প্রসঙ্গ ইতিপূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি,—বঙ্গদেশের গীতি-সাহিত্যে চণ্ডীদাসের অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ঠত্ব। তাঁহার কতিপয় অশ্রুসিক্ত পদ কুসুমের সুরভির ন্যায় প্রকৃতি আপনা আপনি দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া প্রচার করিতেছে—শিক্ষার কর্ষণ আবশ্যক হয় নাই;—তদীয় গীতি-কবিতার সরস অক্ষরে কণ্টকাকীর্ণ কুসুমের ন্যায় সুধা ও বিষ-মিশ্রিত প্রেমের কথা একত্র গ্রথিত রহিয়াছে—কাব্যক্ষেত্রে চণ্ডীদাসপ্রভু কর্ম্মক্ষেত্রে চৈতন্যপ্রভুর ন্যায় অন্য এক প্রেমাবতার। বিদ্যাপতির কবিতা টীকা-টিপ্পনী দিয়া ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু চণ্ডীদাসের পদ যিনি নিজে আস্বাদ করিতে না পারিবেন, তাঁহার নিকট অপরাপর বৈষ্ণবীয় পদের সঙ্গে সেগুলি একই মূল্যে বিকাইবে, তাদৃশ পাঠক সম্বন্ধে বিদ্যাপতির কথায় বলা যাইতে পারে,—

চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব।

"কাচ কাঞ্চন না জানয়ে মূল।
গুঞ্জা রতন করই সমতুল॥
যো কিছু কভু নাহি কলা রস জান।
নীর ক্ষীর দুহুঁ করই সমান॥"

৫। সামাজিক ইতিহাস বা কুলজী-সাহিত্য।

বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের যত্নে বঙ্গীয় বিবিধ সমাজের বহুসংখ্যক কুলজীগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশের সামাজিক জীবনের আখ্যায়িকা এই সকল পুস্তকে বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা বঙ্গীয় সমাজের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের নিকট এই উপকরণরাশি বিশেষরূপে মূল্যবান।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অবনতির সময় এদেশে স্বেচ্ছাচারিতা ও ব্যভিচার প্রভৃতি দ্বারা সমাজ একান্তরূপে শিথিল ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। বামাচারী বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ যে সমস্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা নীতি ও ধর্ম্মবিধ্বংসী। এই সময় ভৈরবীচক্র প্রভৃতি দ্বারা পুরুষ ও রমণীগণ নৈতিক আদর্শ হইতে একান্তরূপ স্খলিত হইয়াছিলেন। অপর পক্ষে তান্ত্রিকগণের খাদ্যাখাদ্যের কিছুমাত্র বিচার ছিল না। তাহারা গলিত শবের মাংস, মলমূত্রাদি পর্য্যন্ত কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া ভক্ষণ করিত। বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে এই প্রকার তান্ত্রিক দীক্ষা প্রচারিত হইয়া সমাজকে বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে সর্ব্ববিষয়ে এতদ্রূপ স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। ব্যভিচারের সংশোধনার্থ যে সংস্কারকার্য্য আরব্ধ হইল, তাহাতে আচারই শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিল। হিন্দুসমাজে এখন খাদ্যাখাদ্যের যে আঁটা-আঁটি ও নিত্য-নৈমিত্তিক নিয়মের প্রতি যে একাগ্রনিষ্ঠা দৃষ্ট হয়, তাহা বৌদ্ধ-যুগের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিক্রিয়া। এখন আচার অনেকটা প্রাণশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এক সময়ে শিথিল সমাজে শৃঙ্খলা-স্থাপন জন্য আচার বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যা, যশঃ, ধর্ম্ম প্রভৃতি সর্ব্ববিধ গুণের অগ্রে বল্লাল সেন এই আচারের স্থান দিয়াছিলেন। কৌলীন্যের ইহাই প্রথম গুণ। লক্ষ্মণ সেনের সময় কৌলীন্য বংশগত হইল। বংশমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কুলীনগণ যেরূপ স্বার্থত্যাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বীরোচিত। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদক রূপনারায়ণ ঘোষের পূর্ব্বপুরুষ জগন্নাথ ও বাণীনাথ নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে মাণিকগঞ্জের অন্তঃপাতী আমডালা নিবাসী করবংশীয় কোন জমিদার কায়স্থ পদ্মার গর্ভে লইয়া গিয়া তাঁহাদিগের নিকট তাঁহার দুই কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করেন; এবং তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হইলে তাঁহাদিগকে পদ্মাগর্ভে নিক্ষেপ করিবেন, এই অভিপ্রায়

প্রকাশ করেন। জ্যেষ্ঠ বাণীনাথ পদ্মাগর্ভে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বীয় কৌলীন্য-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন। জগন্নাথ প্রাণের ভয়ে জমিদারকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হ'ন। কোন এক পরাক্রান্ত জমিদারের কন্যাকে বিবাহ করার দরুণ মনের কষ্টে একটী কুলীন বৈদ্য প্রাণত্যাগ করেন, এরূপ কুলজীগ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অথচ, পূর্ব্বোক্ত প্রকারের বিবাহ বন্ধন দ্বারা কোনও কুলীন ব্যক্তির জাতিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা ছিল না। কুলগৌরবের সামান্য হানি হইত, এবং তাহাতেই বরং প্রাণত্যাগ করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত ছিলেন না; অথচ উক্তরূপ বিবাহে সম্মত হইতেন না। বৈদ্য গণবংশীয় এক ব্যক্তি চৌষট্টিখানা গ্রাম উপঢৌকন পাইয়া দাসড়ার দত্তকন্যার পাণিগ্রহণে সম্মত হ'ন। এবং সেনহাটী নিবাসী অপর এক কুলীন বৈদ্য সম্বন্ধে এরূপ উল্লিখিত আছে যে, একটী জমিদার তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে বহুবৎসর দরবার করিয়াছিলেন। কথিত আছে, উক্ত জমিদার এই উদ্দেশ্যে যখন প্রথম সেনহাটীতে পদার্পণ করেন, তখন কতকগুলি অশ্বথ গাছের চারা রোপণ করিয়াছিলেন। সেইগুলি সুবৃহৎ হইয়া যে সময়ের মধ্যে বহু লোককে ছায়া ও আশ্রয় দেওয়ার যোগ্য হইয়াছিল, তত দিনের চেষ্টায় কুলীন বৈদ্য ঐ জমিদারের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে নিকষ কুলীনগণ যেরূপ উপেক্ষা করিয়া কুলগৌরব অটুট রাখিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। অথচ, কুলীনগণ সাধারণতঃ অর্থ-সম্পদশূন্য ছিলেন। নানা প্রকার কষ্ট ও দারিদ্র্য-যাতনা সহ্য করিয়াও তাঁহারা যে ত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন, তাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। আদর্শ যতই সামান্য হউক না, যাহা মনুষ্য-চরিত্রকে ত্যাগের গৌরবে মহিমান্বিত করিয়া তুলিতে পারে, তাহাই সম্মানার্হ। এই হিসাবে বংশগত কৌলীন্য একান্তপক্ষে নিষ্ফল হয় নাই। মুসলমানদিগের

বিলাস-লোলুপ দৃষ্টি হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু নেতৃগণকে বিশেষ ব্যস্ত হইতে হইয়াছে। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের কুলজীগ্রন্থে সেই সব বিপদের আভাস আছে। পারিবারিক কলঙ্ক অত্যন্ত ঘৃণ্য মনে করিয়াও হিন্দুসমাজ কিরূপ উদারভাবে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিসমূহকে উপেক্ষা-পূর্ব্বক সমাজবন্ধনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় পাইলে আমাদিগের লজ্জিত হওয়ার কোন কারণই থাকিবে না। কুলজীগ্রন্থের কতক কতক বল্লাল সেনের সময় হইতেই রচিত হইতে আরব্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গীয় কুলজীগ্রন্থের অনেকগুলি গত ৪০০ হইতে ১৫০ বৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—সময়ের মধ্যে রচিত হইয়াছে। অসংখ্য কুলজী পুস্তকের মধ্যে আমরা নিম্নে কতকগুলির নাম দিতেছি ঃ—

(১) দেবীবর ঘটককৃত মেলবন্ধ।
(২) ঐ কৃত প্রকৃতিপটল নির্ণয়।
(৩) বাচস্পতি মিশ্র-প্রণীত কুলার্ণব।
(৪) দনুজারি মিশ্রকৃত মেলরহস্য।
(৫) পরিহর কবীন্দ্র-রচিত দশতন্ত্র প্রকাশ।
(৬) মেলপ্রকৃতি নির্ণয়।
(৭) মেলমালা।
(৮) মেলচন্দ্রিকা।
(৯) মেলপ্রকাশ।
(১০) দোষাবলী।
(১১) কুলতত্ত্ব প্রকাশিকা।
(১২) কুলসার।
(১৩) নীলকণ্ঠ ভট্টকৃত পিরালীকারিকা।
(১৪) নলুপঞ্চানন-কৃত গোষ্ঠী কথা।
(১৫) ঐ কৃত কারিকা।
(১৬) রাঢ়ী ও সমাজ নির্ণয়।
(১৭) রামদেব আচায্য-কত কুলপঞ্জী।

(১৮) কুলানন্দকৃত রাঢ়ী ও গ্রহবিপ্রকারিকা।
(১৯) ঐ কৃত গ্রহবিপ্রবিচার।
(২০) শুকদেব-কৃত ঢাকুড়।
(২১) ঘটকবিশারদ কান্তিরাম-প্রণীত কুলপঞ্জী।
(২২) মালাধর ঘটকরচিত দক্ষিণরাঢ়ীয় কারিকা।
(২৩) ঘটককেশরী-বিরচিত কারিকা।
(২৪) ঘটকচূড়ামনি-কৃত কারিকা।
(২৫) ঘটকবাচস্পতি-প্রণীত কুলপঞ্জিকা
(২৬) সর্ব্বভৌম-কৃত ঢাকুড়ি।
(২৭) শম্ভু বিদ্যানিধি-প্রণীত ঢাকুড়ি
(২৮) কাশীনাথ বসু-কৃত ঢাকুড়ি।
(২৯) মাধব ঘটক-বিরচিত ঢাকুড়ি।
(৩০) নন্দরাম মিশ্র-কৃত ঢাকুড়ি।
(৩১) রাধামোহন সরস্বতী-কৃত ঢাকুড়ি
(৩২) দ্বিজ রামানন্দ-রচিত মল্লিক-বংশ কারিকা
(৩৩) দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলসর্ব্বস্ব।
(৩৪) একজাই কারিকা।
(৩৫) বঙ্গজকুলজী সারসংগ্রহ।
(৩৬) দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজকুলজী।
(৩৭) দ্বিজ রামানন্দ-কৃত বঙ্গজ ঢাকুড়ি।
(৩৮) রামনারায়ণ বসু-প্রণীত মৌলিক ঢাকুড়ি
(৩৯) কাশীরাম দাস-কৃত বারেন্দ্র কায়স্থ ঢাকুড়ি।
(৪০) যদুনন্দনের বারেন্দ্র ঢাকুড়।
(৪১) তিলকরাম-বিরচিত গন্ধবণিক কুলজী।
(৪২) পরশুরাম-কৃত গন্ধবণিক কুলজী।
(৪৩) দ্বিজ পরশুরাম-রচিত তাম্বুল বণিকের কুলজী।
(৪৪) মাধব-কৃত তন্তুবায় কুলজী।
(৪৫) কিঙ্করদাস-প্রণীত সদ্ধর্ম্মাচার কথা।
(৪৬) মণিমাধব-কৃত সদ্‌গোপ কুলাচার।

(৪৭) রামেশ্বর দত্তের তিলি পঞ্জিকা।

(৪৮) মঙ্গল-কৃত সুবর্ণ-বণিক কারিকা।

(৪৯) শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর-প্রণীত ত্রিপুরারাজমালা।

এই সব কুলজী পুস্তক নানা তত্ত্বপূর্ণ। ইহাতে শুধু সামাজিক কথা নহে, প্রসঙ্গক্রমে নানা ঐতিহাসিক রহস্যেরও ভেদ করা হইয়াছে। আমরা কুলজীপ্রসঙ্গ ইহার পরে আর উল্লেখ করিব না। সুবিখ্যাত কুলাচার্য্য নলুপঞ্চানন বঙ্গীয় সেন-রাজাদিগের জাতি-তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। সেন-রাজাদিগের তাম্র-শাসনে তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এতদ্‌সম্বন্ধে নলুপঞ্চাননের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইলে পাঠক ঐতিহাসিক সত্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এই অংশটী শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের সম্বন্ধ-নির্ণয় নামক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত হইল।

"এক দিন রাজা জিজ্ঞাসিল পঞ্চগোত্রীয়ে।
মহাবংশ কুলীন আর সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ে॥
কহ সভাসদ আছ যতেক পণ্ডিত।
কি হেতু ত্যজিলে বৈদ্যে ছিলে পুরোহিত॥
উত্তরিল মহেশাদি যতেক সুকৃতী।
নিজ যাজে রত নহি নৈমিত্তিকে ব্রতী॥
অজ্ঞ হল দশকর্ম্মা শ্রাদ্ধে পিণ্ডভোজী।
দ্বিজের স্থণ্ডিলে ঋত্বিক নহি শূদ্রযাজী॥
আদিশূর রাজা বৈদ্য, বৈশ্যে তার জাতি।
এক ছত্রী রাজা ছিল ক্ষত্রবৎ ভাতি॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন বৌদ্ধ রাজা জগন্নাথে কীর্ত্তি।
সাম্যবাদী তবু বলায় ক্ষত্রিয় বৃত্তি॥
রাজা হলে রাজন্য সে না ভাবে অন্যথা।
পতিত কাম্বোজাদি গৌড়ে ক্ষত্র যথা॥

ভূপাল অনঙ্গপাল আর মহীপাল।
জাতিভ্রষ্ট ক্ষত্র নহে রাজন্য প্রবল॥
তারাও বিভা করিত তিন জাতির মেয়ে।
ব্রাহ্মণ পুরোধা সাত শতী দেখ চেয়ে॥
তাই তারা ক্রিয়াকাণ্ডে বেদজ্ঞান হীন।
যাজক পিণ্ডভোজী প্রথাত অপ্রাচীন॥
বল্লাল কয় যবে পদ্মিনী জাতিহীনা।
লক্ষ্মণ কহে দ্বিজে এ প্রথাত দেখি না॥
তাই বল্লাল ত্যজে কুপুত্র বলি সুতে।
লক্ষ্মণ ত্যজে পৈতা বৈদ্যকুল রক্ষিতে॥
ইথে উভয় পক্ষের বৈদ্য পতিত ব্রাত্য।
ক্রমশঃ বৃষলে গণ্য অত্রত্য তত্রত্য॥

* * * *

ভূমিপ হইলে সবার ইচ্ছা হয় ক্ষত্র।
গৌরব-হেতু "রাজন্য" বলায় যত্র তত্র॥
সবারি অভিলাষ সে উচ্চ হয় নিজে।
দেবত্ব পেলেও ইচ্ছা ব্রহ্মত্বে বিরাজে॥

* * * *

বৈদ্যরাজা আদিশূর ক্ষত্রিয় আচার।
বেদে ব্রহ্মবৎ কার্য্যে মাতৃ ব্যবহার॥"

(৫৮—৮৯ পৃঃ)

উপরের তালিকায় আমরা 'রাজমালা'র নাম উল্লেখ করিয়াছি। ত্রিপুরার মহারাজা ধর্ম্মমাণিক্যের সময় (১৪০৭-১৪৩৯ খৃঃ) রাজমালা বঙ্গীয় পদ্যে লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। ত্রিপুরার মহারাজগণ বঙ্গভাষার কিরূপ উৎসাহবর্দ্ধক ছিলেন ইহা দ্বারাই প্রতীয়মান হইবে যে, প্রায় ৫০০ বৎসর গত হইল রাজসভায় বঙ্গভাষা গৃহীত হইয়াছিল। এসিয়াটিক্ সোসাইটির জারন্যালে একবার এই রাজমালার সারাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল। বাঙ্গালা রাজমালা

শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর।

অনেক দিন পর্য্যন্ত একেবারে লুপ্ত করিবার চেষ্টা চলিয়াছিল, সম্প্রতি আমরা একখানি প্রাচীন রাজমালা পুঁথি দেখিতে পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের ত্রিপুরার ইতিবৃত্তে উক্ত পুঁথি হইতে অনেক স্থল উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণটী নিম্নে প্রদান করিলাম :—

"শ্রীধর্ম্মমাণিক্য দেব ত্রৈপুর সন্ততি।
রাজ্যবংশ বিস্তারিছে রাজমালা পুথী॥
পুস্তক শুনিলে ভূপে পূর্ব্ব রাজকথা।
ততঃপর নৃপচর্য্যা না হইয়াছে গাথা॥
অতএব কহি আমি শুন সেনাপতি।
পয়ারে লিখাহ তুমি রাজমালা পুথী॥
শুন শুন বলি বাণ চতুর নারায়ণ।
রাজবংশের কথা কিছু কহত অথন॥
প্রজাকে পালন করে পুত্রের সমান।
ভেদ দণ্ড সাম দান নীতিতে প্রধান॥
সভাসদ আছে যত ব্রাহ্মণ কুমার।
বাণেশ্বর শুক্রেশ্বর বিদ্যাতে অপার॥
ইন্দ্রের সভাতে যেন বৃহস্পতি গণি।
সেইমত দ্বিজগণ হয় মহামানী॥
দুর্লভেন্দ্র নামে ছিল চণ্ডাই প্রধান।
পূর্ব্বকথা জানে সেই অতি সাবধান॥
রাজার সভাতে হয় শাস্ত্রের কথন।
নানা শাস্ত্র আলাপন করে দ্বিজগণ॥
সিংহাসনে একদিন বসিয়া নৃপতি।
বংশ কথা জিজ্ঞাসিল সভাসদ্ প্রতি॥
শুক্রেশ্বর বাণেশ্বর দুই দ্বিজবর।
চণ্ডাই সহিত করি দিলেন উত্তর॥
নানা তন্ত্র প্রমাণ করিয়া তিন জন।
রাজারে কহিল তিনে বংশের কথন॥

রাজমালিকা আর যোগিনীমালিকা।
বারুণ্য কালির্ণয় আর লক্ষ্মণমালিকা॥
হরগৌরীসম্বাদ আছিল ভস্মাচলে।
নবখণ্ড পৃথিবী কহিছে কুতূহলে॥
এ চারি তন্ত্রেতে আছে রাজার নির্ণয়।
রাজাতে কহিল কথা তিন মহাশয়॥”

ইতি দুর্য্যখণ্ড, প্রথম অধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত রাজমালা।

বঙ্গদেশের অন্যান্য রাজগণও যদি এই পথ অনুসরণ করিয়া স্বীয় বংশের ইতিহাস সঙ্কলনে যত্নপর হইতেন, তবে বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের কল্পনার একটি বৃহৎ ক্রীড়াকাননে পরিণত হইত না। যে সময় রাজমালা রচিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময় বংশাবলী স্বল্পায়তনে দেখাইবার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত রাজমালাও প্রস্তুত হইয়াছিল—আমরা তাহা হইতেও কিছু উদ্ধৃত করিতেছি,—

“যযাতি রাজার পুত্র দুর্য্য নাম যার।
তান বংশে দৈত্য রাজা চন্দ্র বংশ সার॥
তাহান তনয় রাজা ত্রিপুর নাম ধর্ম্মে।
তস্য পত্নী গর্ভে ত্রিলোচন রাজা জন্মে॥
তাহান তনয় হৈল দক্ষিণ ভূপতি।
তস্য পুত্র তৈদক্ষিণ রাজা চারুমতি॥
তস্য পুত্র সুদক্ষিণ ছিল মহীপাল।
তান পুত্র হয় দক্ষিণ নৃপতি বিশাল॥
তস্য পুত্র ধর্ম্মতর রাজ-নীতি অতি।
তান পুত্র ধর্ম্মপাল হৈল নরপতি॥
তস্য পুত্র সুধর্ম্ম ছিলেন মহারাজা।
তান সুত তরঙ্গ সুখে পালে প্রজা॥

তস্য পুত্র দেবাঙ্গদ হইল মতিমান।
তান পুত্র নরাঙ্গিত নৃপতি আখ্যান॥"

আমরা যে কবিগণকে গৌড়ীয় যুগ অথবা শ্রীচৈতন্য-পূর্ব্ব-সাহিত্যের অন্তর্গত করিলাম, তাঁহাদের কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যের সমকালিক হইয়া পড়িলেন। চৈতন্য প্রভুর পূর্ব্বে সাহিত্যের যে নানাবিধ উদ্যম হইতেছিল, আমরা এই অধ্যায়ে তাহার আরম্ভ ও ক্রম-বিকাশ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

কবি-তালিকা।

আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত কবিগণ সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। এ স্থলে তাঁহাদের আনুমানিক কাল ও গ্রন্থাবলীর সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি—

	নাম	সময়	রচিত গ্রন্থের নাম।
১।	রমাই পণ্ডিত—	রাজা ধর্ম্মপালের সময়। খৃঃ একাদশ শতাব্দী।	পদ্ধতি।
২।	চণ্ডীদাস—	খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত।	পদাবলী।
৩।	বিদ্যাপতি—	ঐ	১। পদাবলী। ২। পুরুষ-পরীক্ষা। ৩। শৈবসর্ব্বস্ব-সার। ৪। দান-বাক্যাবলী। ৫। বিবাদ সার। ৬। গয়া-পত্তন। ৭। গঙ্গাবাক্যাবলী ৮। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী। ৯। কীর্ত্তিলতা। পদাবলী ব্যতীত সব পুস্তক গুলিই সংস্কৃতে রচিত।
।	কৃত্তিবাস—	জন্ম ১৪৩২ খৃষ্টাব্দ। ('কংস-নারায়ণের কাল)	১। রামায়ণ। ২। শিব-রামের যুদ্ধ। ৩। যোগা-দ্যার বন্দনা। ৪। রুক্মাঙ্গদ-রাজার একাদশী।
।	সঞ্জয়—	সম্ভবতঃ কৃত্তিবাসের সমকালে।	মহাভারত।
।	মালাধর বসু— (গুণরাজ খাঁ)	হুসেনসাহের সময়।	১। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়। ২। লক্ষ্মী-চরিত্র।
।।	কাণা হরিদত্ত—	সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী।	মনসার ভাসান।

	নাম	সময়	রচিত গ্রন্থের নাম।
৮।	বিজয় গুপ্ত—	হুসেন সাহের সময়।	পদ্মাপুরাণ।
৯।	নারায়ণ দেব—	সম্ভবতঃ ঐ সময়ে।	ঐ
১০।	দ্বিজ জনার্দ্দন—	ঐ	মঙ্গলচণ্ডীর উপাখ্যান।
১১।	রতিদেব—	ঐ	মৃগলুব্ধ।
১২।	শুক্রেশ্বর এবং বাণেশ্বর পণ্ডিত—	১৪০৭—১৪৩৯ খৃঃ।	রাজমালা।
১৩।	কবীন্দ্র পরমেশ্বর—	হুসেন সাহের সময়।	মহাভারত।
১৪।	শ্রীকরণ-নন্দী—	ঐ	অশ্বমেধ পর্ব্ব।
১৫।	দ্বিজ অনন্ত—	সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে।	রামায়ণ।
১৬।	———	পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ।	কুলজীগ্রন্থ সমূহ।

হুসেনী সাহিত্য।

এই কবিগণের মধ্যে কবীন্দ্রপরমেশ্বর ও শ্রীকরণ-নন্দীর অনুবাদিত মহাভারত পরোক্ষভাবে সম্রাট্ হুসেন সাহেরই উৎসাহের ফল। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ ও বহুসংখ্যক বৈষ্ণবগ্রন্থে হুসেনসাহের যশঃ ও কীর্ত্তি বর্ণিত আছে। তিনি অন্যধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও হিন্দুদিগের প্রতি অত্যন্ত উদার ও বঙ্গ-ভাষার উৎসাহবর্দ্ধক বলিয়া গণ্য ছিলেন। এই সম্রাটের নামানুসারে গৌড়ীয় যুগের মধ্যে এক খণ্ডযুগ চিহ্নিত করিয়া তাহাকে "হুসেনী সাহিত্যের কাল" আখ্যা দান করা অনুচিত হইবে না। উপরে উদ্ধৃত ১৫ জন কবির মধ্যে বিদ্যাপতি মিথিলাস্থ বিস্ফীর, চণ্ডীদাস বীরভূমান্তর্গত নান্নুরের, ও মালাধর বসু কুলীনগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। অবশিষ্ট কবিগণের অধিকাংশ পূর্ব্ববঙ্গের কবি। ইঁহাদের মধ্যে বিজয়গুপ্ত বরিশাল, ফুল্লশ্রীগ্রামের, নারায়ণদেব ময়মনসিংহের, রাজমালালেখকদ্বয় ত্রিপুরার

কবিগণের বাসস্থান।

এবং কবীন্দ্র-পরমেশ্বর, শ্রীকরণ-নন্দী ও রতিদেব চট্টগ্রামের অধিবাসী। বঙ্গদেশের প্রত্যেক স্থলেই ভাষাকাব্য রচিত হইয়াছিল, কোন প্রদেশই একেবারে প্রতিভা-শূন্য মরু ছিল না। আরণ্যকুসুম ও গ্রাম্যকবিতা সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া

যায়। এই সম্বন্ধে যথাযথ অনুসন্ধান হয় নাই, হইলে বহুকালের আবদ্ধ ধূসরবর্ণ তুলট কাগজের সমাধিক্ষেত্র হইতে আমরা প্রাচীন কবিগণের আর কতগুলি কঙ্কাল উত্তোলন করিতে পারিব, কে বলিতে পারে?

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্মের উত্থানের নানাবিধ চেষ্টাই বঙ্গভাষা বিকাশের প্রথম এবং প্রধান কারণ। যে সে পুস্তক লিখিলেই তাহা সাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইত না। কেবল পুস্তকের বিষয় ধর্ম্মপ্রসঙ্গীয় হওয়া আবশ্যক ছিল এমন নহে, প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত লেখক না হইলে কেহ শুধু প্রতিভা কি স্বকীয় মনস্বিতার বলে দাঁড়াইতে পারিতেন না। এইজন্য প্রাচীন বঙ্গীয় লেখকগণের অনেককেই প্রত্যাদেশের ভাণ করিয়া কাব্য লিখিতে হইত। দেবাদেশে কাব্যরচনায় হাত দিয়াছেন, একথা ঘোষণা করা সাহিত্যের ব্যবসাদারী ছিল। সমাজের শাসনে প্রতিভা স্বীয় শক্তিতে দাঁড়াইতে সাহসী হইত না। কৃত্তিবাস লিখিয়াছিলেন,—"কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে"—তাঁহার সঙ্গে দল বাঁধিয়া অসংখ্য লেখক 'স্বপ্ন' কি 'বরের' দোহাই দিয়া কাব্যের মুখপাত আরম্ভ করিয়াছেন। 'কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস। স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস॥'—মালাধর বসু লিখিয়াছেন। 'বিজয় গুপ্ত রচে গীত মনসার বরে।'—ইঁহার স্বপ্নের কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। 'পাঁচালী সঞ্জয় রচিল দেববলে।'—(বে, গ, পুঁথি ৪৫১ পত্র) সঞ্জয় লিখিয়াছেন। পরবর্ত্তী সময়ে কবি-কঙ্কণের "চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে" পদ সকলেই জানেন। কবি কৃষ্ণরাম স্বপ্নে ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণের রায়ের মারফৎ যে আদেশ পাইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইঁহার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিলে পাঠকের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিত হয় ও বাধ্য হইয়া কাব্যখানিকে ভাল বলিতে হয়। স্বপ্নে কবির নিকট আদেশ এই,—

"তোমার কবিতা যার মনে নাহি লাগে। সবংশে তাহারে তবে সংহারিবে বাঘে॥"

কিন্তু এই স্বপ্নময় কবিতাকাননে ভারতচন্দ্রের স্থান সকলের উপরে। ভগবতী মজুমদারের নিকট ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী কহিতেছেন,—

"জ্ঞানবান হবে সেই আমার কৃপায়।
এই গীতি রচিবার স্বপ্ন কব তায়॥
কৃষ্ণচন্দ্র আমার আজ্ঞার অনুসারে।
রায়গুণাকর নাম দিবেক তাহারে॥
সেই এই অষ্টমঙ্গলার অনুসারে।
অষ্টাহ মঙ্গল প্রকাশিবেক সংসারে॥
ডিউসাঁই নীলমণি কণ্ঠআভরণ।
এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন॥"

দেবীর অপার লীলাগুণে কাব্যের উৎপত্তি, বিকাশ ও গায়েন কর্তৃক তৎপাঠ,—সমস্তই স্বপ্ননিয়ন্ত্রিত।

পূর্ব্বোক্ত কবিগণের মধ্যে হয়ত কেহ প্রকৃতই স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু তঞ্চকের দলে পড়িয়া সত্যভাষী সারসপক্ষীটিকেও যেরূপ কুসঙ্গহেতু বন্দী হইয়া শাস্তি পাইতে হইয়াছিল, ইঁহাদের মধ্যে সত্যবাদী কবির উপরও সেরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে।

বৈষ্ণব কবিগণের সততা।

বঙ্গের বড় বড় কবিগণও স্বপ্ন কি দেবাদেশের কথা না বলিয়া কাব্য লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু বৈষ্ণবগণ প্রাচীন সংস্কারগুলি দলন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতিভা সত্যের সরল পথ আবিষ্কার করিয়া স্বাধীনতার মুক্ত-রাজ্যে বিহার করিয়াছিল। তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিনয়মাখা; প্রত্যাদেশের ঝুঁটা গিল্টি তাঁহারা দেখান নাই। ঐ সব আদেশগর্ব্বিত লেখকগণের সঙ্গে সাক্ষাতের পর নরোত্তম দাসের,—'শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ হৃদয়েতে ধরি। চৈতন্যের হাটে নিত্য ঝাড়ুগিরি করি॥' বৃন্দাবন দাসের,—'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥' কিংবা কৃষ্ণদাস কবি-রাজের,—'মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়লালস। বৈষ্ণবাজ্ঞা বলি করি এতেক সাহস॥' প্রভৃতি পড়িয়া দেখুন। সরল ও বিনম্র কথাগুলি পুষ্পমালার ন্যায় আপনিই সুরভিময়।

পঞ্চগৌড়ের বিষয় ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে এই পঞ্চগৌড়ের মধ্যে মিথিলাই বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। মিথিলার ভাষা 'ব্রজবুলি' বাঙ্গালা-সাহিত্যের একটি অধ্যায় অধিকার করিয়া আছে ; মিথিলার সংস্কৃত-টোল নবদ্বীপের শিক্ষাগুরু ;—এসব ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। মৈথিল অক্ষর (তিরুটে-অক্ষর) বঙ্গদেশে গৃহীত হইয়াছিল।* মিথিলার পরে কান্যকুব্জ বঙ্গদেশের শিক্ষা-প্রদানে সহায়তা করিয়াছে। কনোজ বঙ্গদেশকে পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থরূপ সুবর্ণমুষ্টি দান করেন ; কিন্তু এইখানেই এ ঋণের শেষ নহে। 'পঞ্চালী' নামক গীত পঞ্চালেই (কনোজে) উদ্ভূত হওয়া সম্ভব ; এই 'পঞ্চালী'-গীতের আদর্শ লইয়া বঙ্গভাষার প্রথম গীতগুলি রচিত হইয়াছিল। সারস্বত প্রদেশের শকাব্দা বঙ্গদেশে গৃহীত হয়। এইরূপে দেখা যায়, আর্য্যজাতির এই পঞ্চশাখা পূর্ব্বে পরস্পরের সন্নিকটবর্ত্তী ছিল। ইহাদের সমস্তটির ইতিহাস না জানিলে একশাখার উৎকৃষ্ট ইতিহাস লেখা সম্ভব নহে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলে হিন্দুস্থানী, মৈথিলী, ও উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার অনেক শব্দের সঙ্গে বাঙ্গালা শব্দের ঐক্য দৃষ্ট হয়। এই প্রাদেশিক ভাষাগুলির একটি অপরটি হইতে উদ্ভূত হয় নাই—কিন্তু একজাতির ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চ শাখা, সে সময়ে পরস্পরের অধিকতর নিকটবর্ত্তী ছিল, এইজন্য এই সাদৃশ্য। আমি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের 'ব্রজ-বুলি'-চিহ্নিত অধ্যায়ের কথা বলিতেছি না ; 'ব্রজ-বুলি' মৈথিলভাষা ও বাঙ্গালার মিশ্রণে এক নূতন সৃষ্ট ভাষা—উহা মনুষ্যের উক্তি নহে, লেখনীর উক্তি। বঙ্গসাহিত্যের ব্রজবুলিচিহ্নিত অংশ বাদ দিলেও

পঞ্চগৌড় ও বঙ্গদেশ।

পঞ্চশাখার ঘনিষ্ঠতা।

---

* ত্রিহুতের অক্ষরের একটী বিশেষ ভাব এই যে, 'ব'এর নীচে সর্ব্বত্রই শূন্য আছে, (See Griersen's Maithil Grammar, J. A. S., Extra No. 1880)। আমরা প্রাচীন অনেকগুলি হস্তলিখিত পুঁথিতে 'ব'এর নীচে শূন্য এবং পেটকাটা 'র' পাইয়াছি।

খাঁটি বাঙ্গালা যে সব পুস্তক আছে, তাহাতে হিন্দী, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে সেকেলে বাঙ্গালার অধিকতর নৈকট্য দৃষ্ট হয়। নিম্নে কতকগুলি শব্দের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে ঃ—

বঙ্গভাষার সঙ্গে হিন্দী ও মৈথিলের মিশ্রণ।

যেত্‌কে, তেত্‌কে, তুম্বা, বড়ুয়া (বড়), পইতায় (প্রত্যয় করে) সুবোধিয়া, সরুয়া, পোখেরি, বাবন (ব্রাহ্মণ), দোন, ডাবিয়া, (মা, চ, গা,); সাসিয়াল, বাউরী, সতাই, শিবাই, বড়ি (বড়), টুট, পাকনা, ফাপ্ত, সোয়াস্তি (বিজয়গুপ্ত) ; বহিন; শুতিল, এড়া (কৃত্তিবাস) আবর—(আওর), আর, করিলোহুঁ—করিলাম, ভৈল—হইল, বড়া—বড়, হুঁয়া—হ'য়ে, বহুঁতর—অনেক, হুয়োক- হউক, আবে—এখন, হুইনুই—হই কি না, পালটায়—ফিরে, কিসক—কেন, ভাহাই—ভাই, ন জীঁবো—বাচিব না, পিন্ধই—পরিধান করে। (অনন্ত রামায়ণ) ; কঁরো, কৈঁলু, দোঁহা, আইলু, শকুনিয়া, করিলেন্ত, যায়, পড়িলেন্ত, আইবেন্ত ইত্যাদি, মোহর (আমার), চাহসি, কহসি, করসি ইত্যাদি, নিয়ড়ে, কাহা (কোথায়), তুমি সব, বাও (বাতাস), বোলাও, এহি, বিহা, চিহ্নি (চেনা), নিঁদ, কেহ্নে, পাকায় (সঞ্জয়, কবীন্দ্র, শ্রীকরণ-নন্দী প্রভৃতি); ইহা ছাড়া 'পরদেশক লাগিয়া', 'জলক লাগিয়া, (মা, চ, গা,) ; 'ঘরকে গমন' (কৃত্তিবাস) ; 'কাঁধে কেরবাল' (শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়) 'করে বীর বেগেরে জোহার' (ক, ক, চ,) প্রভৃতি পদেও হিন্দীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।*

পরিচ্ছদে সাদৃশ্য।

শুধু ভাষার ঐক্য নহে, পরিচ্ছদাদিতেও উত্তর পশ্চিমের ভ্রাতাদের সঙ্গে তখন অধিকতর নৈকট্য ছিল। বিজয়গুপ্তের বর্ণিত সিংহলরাজ চাঁদসদাগরের নিকট পট্টবস্ত্র পাইয়া তাহা বাঙ্গালীভাবে পরিতে শিখিতেছেন,—"একখান কাচিয়া

---

* উদ্ধৃত শব্দগুলির মধ্যে 'শুতিল' শব্দ এখনও মৈথিল ভাষায় প্রচলিত আছে (See Grierson's Maithil Grammar, J. A. S., Extra No. 1880)। করন্ত, বোলেন্ত প্রভৃতি উড়িয়া ভাষায় ব্যবহৃত হয় ; 'শকুনিয়া', প্রভৃতি শব্দ হিন্দীর অনুরূপ ; এস্থলে বলা যাইতে পারে সম্ভবতঃ খোট্টার মুখে বঙ্গাধিপের নাম 'লক্ষ্মণিয়া' শুনিয়া আবুল ফাজেল যে নাম লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে 'লাক্ষ্মণেয়' নাম ব্যাকরণের সাহায্যে সৃষ্ট হইয়া বঙ্গ-ইতিহাসে প্রচলিত হইয়াছে। "আবে" শব্দ হিন্দী 'অব' শব্দের মত। এখনও

পিন্ধে, আর একখান মাথায় বান্ধে, আর একখান দিল সর্ব্বগায়।" মা মরিয়াছেন, খেতুরি রাজাকে বলিতেছে, 'কার জন্যে পাগড়ি রাখিছ মস্তকের উপর'—মাণিক-চাঁদের গান (৩৫২ শ্লোক)। এই সকল বর্ণনায় মালকোঁচামারা পাগড়ি মাথায় ঠিক খোট্টার ছবিটি জাগিয়া উঠিতেছে। 'লম্বোদর', 'নাভি সুগভীর' প্রভৃতি বর্ণনায় বোধ হয় খোট্টাদের মত বাঙ্গালীরাও উন্মুক্ত উদর ও নাভি দেখাইয়া প্রশংসিত হইতেন। এইরূপ বস্ত্রপরিহিত স্বামীর পার্শ্বে কাঁচলিআঁটা রমণীই শোভা পায়, প্রত্যুত বাঙ্গালী নারীর পরিচ্ছদও খোট্টার দোকানে ক্রীত।—স্ত্রীলোকের কাঁচুলি পরার রীতি কৃত্তিবাস, গুণরাজ খাঁ, বিজয়গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাস হইতে আরম্ভ করিয়া কবিকঙ্কণ প্রভৃতি অনেক কবিই বর্ণন করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজার সময়ও এই রীতি একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই ;—"রাজ্ঞী ও রাজবধূ এবং রাজকন্যারা কার্পাস বা কৌষেয়শাটী পরিতেন, কিন্তু প্রায় সমস্ত শুভ কর্ম্মোপলক্ষে পশ্চিমোত্তর দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের ন্যায় কাঁচুলি, ঘাগরা ও ওড়না পরিধান করিতেন।" (ক্ষিতীশবংশা-বলীচরিত, ৩৫ পৃঃ)। আমরা বৈষ্ণব কবির পদেও পাইয়াছি—"নীল ওড়নার মাঝে মুখ শোভা করে। সোণার কমল বলি দংশিবে ভ্রমরে॥" (প, ক, ত, ১৩৭৭ পদ)। এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে,—"কটিতটে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ভাল সাজে। রতন মঞ্জরী রাঙ্গা চরণেতে রাজে॥" নীবিবন্ধনের উল্লেখও অনেক প্রাচীন কাব্যেই পাওয়া যায়। এই সব নরনারীগণ যে দুএকটি হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিবেন কিম্বা ব্রজবুলির ন্যায় অদ্ভুত পদার্থের সৃষ্টি করিয়া পদ্য লিখিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে ?

উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ, এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন দেশের অধিবাসীর ন্যায় বাঙ্গালী পুরুষগণও পূর্ব্বে দীর্ঘকেশ রক্ষা করিতেন। তাঁহারা দীর্ঘকেশ বাঁধিয়া রাখিতেন এবং কখনও তদ্দ্বারা বেণী গ্রথিত

পূর্ব্ববঙ্গের নিম্নশ্রেণীর লোকগণ কোন কোন স্থানে 'এ্যাবে' (এখন) শব্দ ব্যবহার করে। আমরা উদ্ধৃত শব্দসংগ্রহে চণ্ডীদাস কি অন্য কোন 'ব্রজবুলি'-অধিকৃত লেখকের সাহায্য গ্রহণ করি নাই।

করিতেন; রাধার সখীগণ শ্যামচাঁদকে বলিতেছেন,—"আজি কেন পিঠে দোলে বেণী।" (চণ্ডীদাস)। শ্রীচৈতন্যদেবের কেশমুণ্ডনের সময় শিষ্যগণ বিলাপ করিতেছে,—"কেহ বলে না দেখিয়া সে কেশ বন্ধন। কিমতে রহিবে এই পাপিষ্ঠ জীবন॥ কেহ বলে সে সুন্দর কেশে আরবার। আমলকী দিয়া কিবা করিব সংস্কার॥ "(চৈ, ভা, মধ্যখণ্ড)। "পলায় রামের সৈন্য নাহি বাঁধে কেশ।" (কৃত্তিবাস)। "পরম সুন্দর লখাইর দীর্ঘ মাথার চুল। জ্ঞাতিগণ ধরি নিল গাঙ্গুড়ির কূল॥" (বিজয়গুপ্ত)।

আহারে ব্যবহারে ঐক্য।

শুধু ভাষা ও পরিচ্ছদাদিতে নহে, আহারে ব্যবহারেও সেই নিকট-সম্বন্ধ প্রতীয়মান হইবে। ভারতচন্দ্র মহাদেবের মুখে প্রচার করিয়াছেন,—"দুধ কুসুম্ভায় আজি হয়েছে বাসনা।" বঙ্গবাসীর সংস্করণের বিস্তৃত টীকায় এই 'কুসুম্ভা'র অর্থ লেখা হইয়াছে, 'একরূপ সামগ্রী'। এখন বাঙ্গালীর 'কুসুম্ভা' অর্থ জ্ঞাত হওয়ার সুবিধা নাই, কিন্তু রাজপুতনা এবং তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে এই 'কুসুম্ভা' ভক্ষণ এখনও একটি বিশেষ আমোদজনক ব্যাপার; উহা অহিফেনের দ্বারা প্রস্তুত হয় এবং কুসুম্ভাভক্ষণের জন্য নিমন্ত্রণ একটি উৎসবরূপে গণ্য হয়। এইরূপ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের নানা দিক্ হইতে উত্তরপশ্চিমদেশবাসীদিগের সঙ্গে আমাদের নিকট-সম্বন্ধের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। খোট্টা, মৈথিল, উড়িয়া, বাঙ্গালী—এক বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখা, ক্রমে শাখাগুলি ব্যবধান হইয়া পড়িয়াছে। ভাষা ও সাহিত্যের মানচিত্রে এই ক্রমদূরবর্ত্তিতার চিত্র চিত্রিত আছে, তদ্দৃষ্টে লুপ্তপ্রায় সম্বন্ধের স্মৃতি জাগরিত হয় এবং মনে অপূর্ব্ব আনন্দ বোধ হয়।

পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ক্রিয়াপদ।

বঙ্গদেশে সমাগত আর্য্যজাতির শাখা আবার দুই উপশাখায় বিভক্ত হইল। পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা এখন যত দূরবর্ত্তী, পূর্ব্বে ততদূর ছিল না। পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, 'করিমু' ও 'করিবু', এই দুইরূপ ক্রিয়ার ব্যবহারই প্রাচীন সাহিত্যে দৃষ্ট হয়; ডাকের বচনে

'করিবু' ক্রিয়া পাওয়া গিয়াছে; মাণিক চাঁদের গানেও সেরূপ ক্রিয়া অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়,—"ফুল গোঠেঁকে দেখিয়া ফুল না পাড়িবু। পাখী গোঠেঁক দেখিয়া ডিমা না মারিবু। পরের স্ত্রী দেখিয়া হাস্য না করিবু॥" (৫৬৩ শ্লোক)। "তুমি হবু বটবৃক্ষ আমি তোমার লতা। রাঙ্গা চরণ বেড়িয়া লবু পলায়ে যাবু কোথা॥" (১৭৩ শ্লোক)। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে 'করিমু' প্রভৃতি ক্রিয়ার বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়,—

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তয়িমু নাম সংকীর্ত্তন। ভক্তি দিয়া নাচায়িমু ভুবন॥ আপনি করিমু ভক্তি অঙ্গীকার। আপনি আচারি ভক্তি শিখামু সবার॥" চৈ, চ, আদি: ৩য় পরিচ্ছেদ।

চণ্ডীদাস এবং গুণরাজ খাঁও এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এই দুইরূপ ক্রিয়াই পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল, কিন্তু বোধ হয়, কালে 'করিমু' হইতে 'করিবু' ক্রিয়ার পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের রুচি অধিকতর অনুকূল হইল, 'করিব' (কর্ত্ত) 'খাব', 'যাব', ইত্যাদির প্রচলন হইল। পূর্ব্ববঙ্গে 'করিমু,' 'করুম' ইত্যাদি রূপ গৃহীত হইয়া প্রচলিত হইল; কিন্তু উক্ত প্রদেশের নিতান্ত মফস্বলে 'করিবাম', 'খাইবাম' ইত্যাদিরূপও লক্ষিত হয়। নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের উদ্ধৃতাংশে সেইরূপ ক্রিয়ার প্রয়োগ দৃষ্ট হইবে। পশ্চিম বঙ্গেও যে এককালে সেইরূপ ক্রিয়ার ব্যবহার ছিল, তাহার আভাস আছে। 'করিবাঙ', 'যাইবাঙ,' 'বলিবাঙ' প্রভৃতি শব্দ চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি পুস্তকে প্রায়ই দৃষ্ট হয়। কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের লেখক বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন; উক্ত গ্রন্থকারকৃত 'মনসার ভাসান' হইতে দুইটি ছত্র উঠাইতেছি,—

"মনসা বলেন আমি দিবাম এই বর। সাত ডিঙ্গার ধন হবে চৌদ্দ ডিঙ্গা ভর॥" কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের ভাসান, অপার চিৎপুর রোড্, ২৮৫ সংখ্যক ভবনে বিদ্যারত্নযন্ত্রে মুদ্রিত; পৃঃ ৪৫।

পূর্ব্ববঙ্গপ্রচলিত 'আছিল' শব্দ পশ্চিম বঙ্গের অনেক পুঁথিতেই পাওয়া যায়। সুতরাং এইসব ক্রিয়াপদগুলি পূর্ব্বকালে বঙ্গের দুই অংশেই কতক পরিমাণে প্রচলিত ছিল; কালক্রমে কিছু কিছু রূপান্তরিত হইয়া শব্দগুলি এক এক আকারে এক এক দেশে বদ্ধমূল হইয়াছে।

করসি, করেন্ত, বোলেন্ত, ইত্যাদি ক্রিয়া পূর্ব্ববঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যে অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়; পশ্চিম বঙ্গের প্রাচীন পুঁথিগুলিতেও সেরূপ ক্রিয়া একেবারে দুষ্প্রাপ্য নহে। আমরা শ্রীকৃষ্ণবিজয় হইতে 'পিবন্তি,' চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে 'যান্তি' ও ডাকের বচন হইতে 'খায়সি,' 'পুজসি' প্রভৃতি ক্রিয়ার উদাহরণ দিয়াছি। (৩১, ৮০ পৃষ্ঠা)। অন্যান্য শব্দের আলোচনা করিলে দেখা যায়, পূর্ব্ববঙ্গের বহুসংখ্যক শব্দই কতক পরিমাণে প্রাচীনরূপ রক্ষা করিয়াছে। প্রাকৃতের 'ও'—(ও)-প্রিয়তা পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন পুঁথিগুলিতে দৃষ্ট হয়; যথা ঃ—

শব্দ ...	পূর্ব্ববঙ্গের পুঁথিতে প্রাপ্ত রূপ।		শব্দ ...	পূর্ব্ববঙ্গের পুঁথিতে পাপ্ত রূপ।	
মা	(মাতা)	মাও।	গাঁ ...	(গ্রাম) ...	গাঁও।
পা	(পদ)	পাও।	ছা ...	(ছানা) ...	ছাও।
ঘা	(ঘাত)	ঘাও।	দা ...	... ...	দাও।
না	(নৌকা)	নাও।	ভাব ...	... ...	ভাও।
রা	(রব)	রাও।	বা ...	(বাত) ...	বাও।
গা	(গাত্র)	গাও।	তা ...	(তাপ) ...	তাও।

এই সব শব্দের কোন কোনটি পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন পুঁথিতেও পাওয়া যায়, যথা—'নাট গীত সুখে যায়, রূপার দোলায় ফেলায় পাও।' (খনা)।

কালে পৃথক জাতিতে পরিণতির সম্ভাবনা।

প্রাচীন সাহিত্যপাঠে বঙ্গবাসী আর্য্যগণের সঙ্গে উত্তরপশ্চিমের শাখাগুলির এবং পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের—এই দুই উপশাখার বর্ত্তমান সময়াপেক্ষা অধিকতর নিকট-সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই ক্রমিক দূরবর্ত্তিতা যদি আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে কালে আমরা সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতির ন্যায় হইয়া দাঁড়াইতে পারি। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে বিবাহবন্ধনাদি দ্বারা একজাতীয়তা ও একভাষা রক্ষিত থাকা সম্ভব, কিন্তু অন্যান্য দেশের সঙ্গে সেরূপ সামাজিক বন্ধন রহিত হইয়া যাওয়াতে আশঙ্কার কারণ না আছে, এমত নহে। এই বিচ্ছিন্নতাগ্রস্ত জাতীয়

জীবনের একমাত্র আশা—সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন। সেই শাস্ত্র হস্তে লইয়া উড়িয়া, খোট্টা, মৈথিল,—পঞ্চগৌড় ছাড়িয়া—পঞ্চদ্রাবিড়ের সঙ্গেও আমরা একতা-সূত্রে বদ্ধ হইতে পারি। পূর্ব্ব-পুরুষদিগের প্রসঙ্গে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন জাগরিত হয়,—বহু এক হইয়া যায়।

বৌদ্ধ-যুগান্তে ক্রমে সংস্কৃত-প্রভাবের বিস্তৃতি।

'বৌদ্ধ যুগ'—অধ্যায়ের রচনায় সংস্কৃতের প্রভাবচিহ্ন নাই। এই অধ্যায়ের সাহিত্য অনেকটা মার্জ্জিত ও সংস্কৃতানুযায়ী বিশুদ্ধতা লাভে প্রয়াসী। মাণিকচাঁদের গানে বর্ণিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের যে কয়েকটি নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই সংস্কৃতের সংস্রব-রহিত, যথা—অদুনা, পদুনা, খেতুরি, নেঙ্গা, ময়নামতি। চণ্ডীদাস—শ্যামলা, বিমলা, মঙ্গলা, ও অবলা, শ্রীরাধার প্রতিবেশিনী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এ সকল নাম সংস্কৃতের মত। কিন্তু বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে সংস্কৃত ও অসংস্কৃত নাম উভয়ই পাওয়া যায়,—লখীন্দরের বিবাহবাসরে এয়োগণের কতকগুলি নাম সংস্কৃত-ভাবাপন্ন, যথা—কমলা, বিমলা, ভানুমতী, রোহিণী, রমণী, তারাবতী, সুনন্দা, সুভদ্রা, রতি, তিলোত্তমা, সরস্বতী, চন্দ্ররেখা, কৌশল্যা, কুমারী, বামা, চন্দ্রপ্রভা, দুর্লভা, অনুপমা, রত্নমালা, জাহ্নবী, চন্দ্রকলা, রঙ্গিণী, মলয়মালা, জয়মালা, বিজয়া, ভবানী, শিবানী, মাধবী, মালতী, বগলা, সরলা। কিন্তু তখনও সংস্কৃতের প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই ; অন্যান্য এয়োগণের নাম ও গুণরাশি উভয়ই হাস্যোদ্দীপক—উদ্ধৃতাংশের মধ্যে মধ্যে দুই একটী সংস্কৃত নাম আছে,—"একজন এয়ো আইল তার নাম রাধা। ঘরে আছে স্বামী তার যেন পোষা গাধা॥ আর এক এয়ো আইল তার নাম রূই। মস্তকে আছয়ে তার চুল গাছ দুই॥ আর এক এয়ো আইল তার নাম সরু। গোয়াল ঘরে ধোঁয়া দিতে খোঁপা খাইল গোরু॥ আর এয়ো আইল তার নাম কুই। দুই গালে ধরে তার ক্ষুদ মণ দুই॥ আর আর এক এয়ো আইল তার নাম শশী। মুখে নাই দন্ত গোটা ওষ্ঠে দিছে মিশি॥ আর এক এয়ো আইল তার নাম আই। দুই গাল চওড়া চওড়া নাকের উদ্দেশ নাই॥ আর এক এয়ো আইল তার নাম চুয়া। ঘর হৈতে বাহিরিতে শিরে ধরে টুয়া"॥ (বিজয়গুপ্ত)। বেহুলা, লখাই, নেড়া, সমাইওঝা, সায়বেণে, ফুল্লরা, খুল্লনা—এসব নামও সংস্কৃতের

মত নহে। 'বেহুলা' বিপুলার অপভ্রংশ হইতে পারে, কারণ প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে বেহুলার স্থলে 'বিপুলা' পাওয়া যায়; কিন্তু অন্য নামগুলি সংস্কৃতভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয় না; পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ফুল্লরা, খুল্লনা প্রভৃতি শব্দও সংস্কৃতের সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। * পাণ্ডিত্য বলে অপরাজিতাকেও পারিজাত ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে—এই ভাবের ব্যাখ্যায় কল্পনাসুন্দরীকে একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, সন্দেহ নাই। কুলজীগ্রন্থগুলি অনুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হইবে, ১৯।২০ পুরুষ পূর্ব্বে অধিকাংশ নামই অসংস্কৃত ছিল। এখনও বহুসংখ্যক প্রাচীন গ্রামের নামের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের অনুমাত্রও সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। সেগুলি বৌদ্ধাধিকার ও প্রাকৃতিক যুগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই অধ্যায়বর্ণিত সাহিত্যে সংস্কৃতের দিকে ক্রমশঃ রুচির অনুকূলতা লক্ষিত হয়। অনুবাদগ্রন্থ ও সংস্কৃতের অনুশীলন দ্বারা প্রাকৃতের আবর্জ্জনা মার্জ্জিত হওয়ার চেষ্টা আরম্ভ হইল; কিন্তু তখনও বঙ্গগৃহের মনোমোহিনীগণের নাম 'ভুই', 'রূই', 'কুই', 'আই', প্রদত্ত হইত। এখন সংস্কৃতের পূর্ণ আধিপত্যের কালে কোনও ললনার এবম্বিধ নামকরণ হইলে, তাহার বিবাহ হওয়া ও বিবাহান্তে সুরুচিসম্পন্ন স্বামীর নিকট তাহার পত্র লেখা উভয়ই অসুবিধাজনক হইবে। কবিকঙ্কণের সময় ভাষা অনেক পরিমাণে মার্জ্জিত হইয়াছে, এয়োগণের নাম সমস্তই সংস্কৃতাত্মক—এবং বৈষ্ণবাধিকারের প্রভাবব্যঞ্জক; যথা,—বিমলা, চাঁপা, কমলা, ভারতী, পার্ব্বতী, সুবর্ণরেখা, লক্ষ্মী, পদ্মাবতী, বল্লভা, দুল্লভা, রম্ভা, সুভদ্রা, যমুনা, চরিত্রা, তুলসী, শচী, রাণী, সুলোচনা, হীরা, তারা, সরস্বতী, মদন-মঞ্জরী, চিত্ররেখা, সুধা, রাধা, দয়া, মন্দোদরী, কৌশল্যা, বিজয়া, গৌরী, সুমিত্রা, যশোদা, রোহিণী, কাদম্বরী।

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ১০৭ পৃঃ।

এই অধ্যায়ের আলোচিত পুস্তকগুলিতে আমরা নানারূপ শব্দ পাইয়াছি, তাহাদের কতকগুলি প্রচলিত নাই, কতকগুলি ভিন্নার্থ পরিগ্রহ করিয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়োক্ত শব্দগুলিরও কতক এই যুগের সাহিত্যে পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি বাদ দিয়া অপরাপর দুরূহ শব্দার্থের তালিকা দেওয়া যাইতেছে।*

প্রচলিত শব্দার্থ।

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে—ভোল—বিভোর (অতিকামে হৈয়া ভোল। শ্রীফল গাছ দিল কোল।); আসোয়াস্থ—অসুস্থ; অগল—দক্ষ, অগ্রসর; শাসিয়াল—তেজস্বী (শাসিয়াল ঘর তুমি বিবাদে আগল); চোপা—মুখ; উদাসিনী—অনাথা (শিবের কুমারী আমি উদাসিনী নহি); নবগুণ—নগুণ, উপবীত; (দন্ত-ভ্রূকুটী করে, নবগুণ তুলি ধরে); সম্বিধান—অবধান, মনোযোগ; খিটে—খুঁটিয়া তোলা; ছামনিতে—সম্মুখে; বড়ি—বড়; ধাই—মাতা; মাই—মাতা; অথান্তর—চেষ্টা, শ্রম, বিপদ (বহু অথান্তর সেই পুষ্পের কারণ); মেলানি—বিদায়; গোহারি—কাতর প্রার্থনা; বাহুড়িয়া— ফিরিয়া; পাকনা—পক্ক; পাঁচে—চিন্তা করে; আচাভুয়া—নির্ব্বোধ; ঠান—ভাব; সহিলা ও সইলা—সখীত্ব;† ভাণ্ডালে—ভাঁড়ালে; পরিপাটী—কারিগরী (কার সাধ্য বুঝিতে পারে দেবের পরিপাটী); টনক—শক্ত (টনক করি ধরি মুখে দিল এক মুঠ); সোসর—তুল্য; তেলেঙ্গা—হৃষ্টপুষ্ট; অবস্থা—কষ্ট; সম্ভাবনা—সম্পত্তি (সম্ভাবনা কেবল বলদ); সুশ্রীত—শ্রীযুত; সানে—ইঙ্গিতে (হাত-সানে বলে সবে মিনিটেক রও); তিতা—আর্দ্র।‡ কৃত্তিবাসী রামায়ণে,—সন্তোক—যৌতুক, নিবড়ে—অতীতে, ভোকে—ক্ষুধায়, লোহ—অশ্রু, ওর—সীমা, রড়—দৌড়, কোঙর—পুত্র। সঞ্জয়-কৃত মহাভারতে,—আহ্মি—আমি, তুহ্মি—তুমি, মোহর—আমার, সমাইরে—সকলকে, আগুয়ান—অগ্রসর, সুসারিত—শ্রেষ্ঠ, যুয়ায়—যোগ্য

---

* আমরা উদ্ধৃত শব্দের অধিকাংশই ষষ্ঠ অধ্যায়-বর্ণিত অনেক কাব্যেই পাইয়াছি, একাধিকবার তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন হেতু কেবল এক কবির নাম নির্দ্দেশ করিলাম।

† বোধ হয় এই সহিলা ও সইলা হইতে 'সল্লা' (পরামর্শ) শব্দ আসিয়াছে।

‡ চৈতন্য ভাগবতেও 'তিতা' শব্দ আর্দ্র-অর্থে ব্যবহৃত পাইয়াছি, যথা, স্নানান্তে "তিতা বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন।" (মধ্যম খণ্ড)। আরও কয়েক স্থলে এরূপ পাওয়া গিয়াছে। এই "তিতা"র ক্রিয়া—'তিতিল' (সিক্ত হইল) সচরাচরই দৃষ্ট হয়। সুতরাং 'তিতা' শব্দের সঙ্গে 'তিক্ত' শব্দের সংস্রব লক্ষিত হয় না, উহা 'সিক্ত' শব্দের অপভ্রংশের ন্যায় বোধ হয়। কিন্তু চণ্ডীদাসের "তিতা কৈল দেহ মোর ননদীবচনে"—পদে 'তিতা' শব্দ তিক্তের অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

হয়, কেনি—কেন, পুনি—পুন, বিনি—বিনে, খেরি—খেলা, হনে—হইতে, আপু—আপন। **অনন্ত রামায়ণে**— তয়ূঁ—তোমার, থৈলা—রাখিল, আবর (হিন্দী—আওর)—আর, আবে—এখন, জাঁঞ—যাব, পুতাই—পুত্র, পোরে—পুত্রে ("গলাগলি করি কাঁদে তিন বাপে পোরে"), অশক্ত—দুষ্ট, এতিক্ষণে—এতক্ষণে, বুঢ়া—প্রাচীন (দ্রব্যাদি-বোধক, যথা, "বুঢ়া ধনু ভাঙ্গিলেক"), তেবে—তখন, তঁতো—তার পর, তেতিক্ষণে—তখন, করিল হোঁ—করিলাম, পুনু—পুনঃ, কাটিবো হোঁ—কাটিব, কাটয়োক—কাট, মিলি—হয়ে ("বড় দুঃখ মিলি গেল"), তাইক—তাহাকে, সোমাইল—প্রবেশ করিল, বিহুড়াইল—বিগড়াইল, ওকাইলা—হাঁকাইল, লগতে—সঙ্গে, উলটাইল—ফিরাইল ("রাজাক গৃহে লাগে উলটাইল"), কন্দিয়োক লৈলা—কাঁদিতে লাগিল, তেহু—তেমন ("তঞি হাক আশাকর মঞি তেহু নোহোঁ"), ছুকর—শূকর, আই—নারী, গেড়ি পারন্ত—ডাকিতে লাগিল, হুই নুই—হয় নয়, এতিখন—এখন, নাহা—নাথ, ("হাহা রাম রমণ মোহর নিজ নাহা"), নবণু—ননীর, স্থগ্রিঞো—সুগ্রীব, মক্‌মকি—উচ্চস্বরে, ("এহি বুলি মকমকি কাঁদে রঘুরাই"), রাই—রায়, পিম্পরা—পিপীলিকা, পিন্ধই—পরিধান করে, ভষহিল—জানাইল। **কবীন্দ্র ও শ্রীকরণ-নন্দীর অনুবাদে**—সম্ভ্রম—ভয়। **এই সম্ভ্রম ও সম্ভ্রান্ত শব্দ মর্য্যাদা-ব্যঞ্জক হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে ইহাদের অর্থ "ভয়" ছিল; (যথা**—"সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর")—**সংস্কৃত রামায়ণেও সম্ভ্রান্ত শব্দ ভীত অর্থে প্রযুক্ত দৃষ্ট হয়, যথা,**—"সম্ভ্রান্ত হৃদয়ো রামঃ" ইত্যাদি (বঙ্গবাসীর সংস্করণ, আরণ্য কাণ্ডম্ ৯৫ পৃঃ), সম্বিধান—মনোযোগ, সমে—সহিত ("গুণ সমে কাটি পড়ে হাতের কোদণ্ড"—শ্রীকর নন্দী), পাড়িমু—ফেলাইব ("ভীষ্ম দ্রোণ কাটিয়া পাড়িমু রথ হৈতে"—কবীন্দ্র), উপালন্ত—উপর। **নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে,**—খাথার—অপযশ, একেশ্বর—একাকী, কথা—কোথায়, এড়িয়া—ত্যাগ করিয়া। **চণ্ডীদাসের পদাবলীতে,**—* চেট্যোনেট্যো—অল্প বয়স্ক বউগণ, টীট †—ধূর্ত্ত, অখলা—সরলা, উতরোল

---

* এস্থলে হিন্দী ভাবাপন্ন শব্দ উদ্ধৃত হইল না।

† এই 'টীট' শব্দ গোবিন্দদাসের পদে (প, ক, ত,—৬২৫ নং), বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে, বিদ্যাপতির পদাবলীতে (জগদ্বন্ধু বাবুর সংস্করণ, ৭৭ পৃঃ), কবি আলওয়ালকৃত পদ্মাবতীতে ("কোথাতে নাহিক দেখি হেন যোগী টিট"—৯৬ পৃঃ) ও অন্যান্য পুস্তকে পাইয়াছি; বোধ হয় এই শব্দ হইতে 'টীটকারি', 'টিটপনা', ও 'টেটন' প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে, কিন্তু বটতলার পদকল্পতরুতে কোন কোন স্থলে 'ট' এর টান ভুলক্রমে পড়িয়া যাওয়াতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কোন কোন নূতন সংস্করণে 'টীট' শব্দ স্থলে 'ঢীট' প্রদত্ত হইয়াছে।

—উৎকণ্ঠিত, ভালে—ভাগ্যে ("ভালে সে নাগরী, হয়েছে পাগলী"), আরদ্র—হরিদ্রা, বড়ু—ব্রাহ্মণপুত্র, (কিন্তু বটু শব্দের অপভ্রংশ হইলে ছাত্র), দে—দেহ, টাগ—জঙ্ঘা, আকুতে—আগ্রহে, লেহ--স্নেহ, ওদন—অন্ন, গতাগতি—যাতায়াত, পরিবাদ—নিন্দা। "চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে" প্রভৃতি শব্দের "ফুরিছে" (স্ফুরিছে হইতে উদ্ভূত) শব্দ হইতে ফুলিছে শব্দ আসিয়াছে। রাঢ়দেশপ্রচলিত শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় রেড়ো-শব্দ-বহুল ; ক্ষীরোদ বাবু সাহিত্য-পত্রিকায় যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন (সাহিত্য ; ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা), তাহাতে সছ (বোধ হয় আরোগ্য), রাকাড়ে—শব্দে, আউদর—এলোথেলো, পোকান—পুত্র,—প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায় ; সম্ভবতঃ এগুলি কবি নিজে ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের হস্তলিখিত ২৫০ বৎসরের প্রাচীন শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের পুঁথিতে ঐ সব শব্দ নাই। পশ্চিম বঙ্গের প্রাচীন লেখকগণকে পূর্ব্ববঙ্গের লোকগণ নিজেদের সুবিধার জন্য কতকটা বাঙ্গাল করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু মিথিলার বিদ্যাপতি বঙ্গদেশে যতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন, উঁহারা ততদূর হন নাই।

পূর্ব্বোক্ত শব্দগুলি ছাড়া,—কাঠিনী—খড়ি, সমাধান—সেবা, বুলে—অনুসন্ধান করে, সাবহিতে—সাবধানে, সারি—নিন্দাবাদ—প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। বিজয়-গুপ্তের পদ্মাপুরাণে 'বাপু' শব্দ সর্ব্বত্রই সন্তান কর্ত্তৃক পিতার প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে ; যথা, (শিবের প্রতি পদ্মা)—"পদ্মা বলে বাপু তুমি সংসারের সার। ঝির অপমান বাপু না দেখ একবার॥" ধন্বন্তরির প্রতি শিষ্যগণ,—"শিষ্যসব বলে বাপু এ কোন বিধান। কার হাতে পাইলা বাপু হেন অপমান॥" বেহুলা পিতার প্রতি— "বেহুলা বলেন বাপু শুন নিবেদন। স্বপ্ন দেখিয়া আমি করেছি রোদন।" এখনকার রাজনৈতিক উপহাসের লক্ষ্য 'বাবু' বোধ হয় এই 'বাপু' শব্দেরই অপভ্রংশ হইবে। ত্রিপুরা জেলার উজানচর নামক স্থানে 'মা'—কে 'মাইঞা' বলিয়া থাকে, আমরা এই অধ্যায়ে 'মাই' শব্দ পাইয়াছি ; এই 'মাই' ও 'মাইঞা' হইতে বোধ হয় কন্যা-বোধক 'মেয়ে' শব্দ আগত হইয়াছে। 'বাপু' ও 'মেয়ে' শব্দ একই কারণে অপত্যার্থে পরিণত হইয়াছে ; পূর্ব্বে

উহারা পিতৃমাতৃবোধক ছিল। 'লোকগুটি', 'বানগোটা' প্রভৃতি ভাবে 'গুটি' ও 'গোটা' অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়,—লোকটি', 'বানটা' বোধ হয় এই ভাবে উৎপন্ন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

বিভক্তি।

বিভক্তিসম্বন্ধে এই প্রাচীন সাহিত্যের অরণ্য হইতে সাধারণ নিয়মের মত কোন পরিষ্কার সূত্র উদ্ধার করা বড়ই দুরূহ। এখনও বঙ্গদেশের নানা প্রদেশে নানারূপ বিভক্তি কথায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু রচনার জন্য একমাত্র নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য সময়ে প্রাদেশিক বিভিন্নতা লোপ ও ভাষার একীকরণ জন্য কোন সাধারণ সূত্র নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। নানারূপ অসম উপাদান হইতে সাধারণ সূত্র সঙ্কলন করা ব্যাকরণের কাজ,—বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ইংরেজাধিকারে সঙ্কলিত হইয়াছে। সুতরাং এই সময়ের বহুপরেও বিভিন্নরূপ বিভক্তি ও ক্রিয়া প্রচলিত ছিল। আমরা এই অধ্যায়ে,—

"আমি" স্থলে,—আহ্মি, মুঞি, মুই, আমিহ, মো; "তুমি" স্থলে,—তুহ্মি, তুহুঁ, তঁঞি; "আমার" স্থলে,—আহ্মা, আহ্মার, মোহোর, মোহর, মোর; "তোমার" স্থলে—তোহ্ম, তোহ্মার, তযু, তোহার, তোঁহর, তোর; "আমাকে" স্থলে,—আহ্মাতে, মোত, আমাক, আহ্মারে, মোহারে, মোরে; "তোমাকে" স্থলে,—তোমাক, তোহ্মারে, তোহ্মা, তোত, তোঁহারে, তোরে; "সে" বা "তিনি" স্থলে—তিঁহ; "তাহাকে" স্থলে,—তাক, তাতে, তায়, তাইক; "তাহার" স্থলে—তাঙ্ক, তান, তাহান, তার; "তাহা" স্থলে—তেহু; "কাহাকেও" স্থলে—কাকহো, প্রভৃতিরূপ সর্ব্বনামের প্রয়োগ পাইয়াছি—এই সমস্ত জটিল রূপের মধ্যে মধ্যে আধুনিক ভাবের কোন কোন প্রয়োগ না আছে, এমন নহে। কোন কোন প্রাচীন পুঁথিতে আধুনিক ভাবের ব্যবহারও সমধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বিভক্তি সম্বন্ধে সর্ব্বনামের পূর্ব্বোক্ত রূপান্তর ভিন্ন, পুষ্করিণী হনে (ও হন্তে)—পুষ্করিণী হইতে, বিষ্ণুক উদ্দেশে—বিষ্ণুর উদ্দেশে, ভক্তিএ—ভক্তি সহ, তীরক পাইলা,—তীর পাইলা, প্রাণত (প্রাণাৎ)—প্রাণাপেক্ষা, পিতৃতো মাতৃতো—পিতামাতা হইতে ("পিতৃতো মাতৃতো করি তোত অনুরাগ"—অনন্ত

রামায়ণ), কালিকারে—কালিকার জন্য, বর্ষাকে—বর্ষার জন্য, দ্রোণক চাহিয়া—দ্রোণেরদিকে চাহিয়া, বিধিএ নির্ম্মিল—বিধি নির্ম্মাণ করিল, প্রণাম করিল মেনকাতে—মেনকাকে প্রণাম করিল, ভূমিএ—ভূমিতে, বাণিজ্যেরে চলে—বাণিজ্যে চলে, এই ভাবের প্রয়োগ পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন পুঁথিগুলিতে পাইয়াছি ; 'কে' স্থলে 'ক' সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়, যথা—"সর্প যেন ধাইয়া যায় মারিতে গরুড়ক। সেই মত চাহ তুমি মারিতে অর্জ্জুনক ॥"

বহুবচন 'সব', 'গণ' ও 'আদি' শব্দ দ্বারা গঠিত হইত—তুমি সব, আমি সব, রাক্ষসেরগণ, মৃগাদি প্রভৃতি বহুবচন-বোধক-শব্দ ও তাহাদের পরবর্ত্তী রূপান্তরের বিষয় পূর্ব্ব এক অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। পশ্চিম বঙ্গের পুস্তকগুলিতে,—ঘরকে গমন, পাণিকে ধায়. জলকে গেনু, কাঁধে কেরবাল, শুনে গৌড়েশ্বরে (শুনে গৌড়েশ্বর), প্রভৃতিরূপ পাওয়া যায়।

ক্রিয়া।

ক্রিয়া সম্বন্ধে উত্তম পুরুষে দেঁহো, কঁরো, তেজিম, নোহোঁ (নই), দেখঞঁ, লভিলো, বন্দম, করম, করিবু, পাইলুঁ, দিমু, করিনু,—মধ্যম পুরুষে, কহসি, দিয়োঁক, করিয়োঁক, আসিয়োঁক, করিহ,—এবং প্রথম পুরুষের পরে—হব ("নিঁদের স্বপনে রাজা হব (হবে) দরশন," মা, চ, গা)। পইতায়, আইবন্ত, ভৈলন্ত, করেন্ত ইত্যাদি রূপ অনেক প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায়। ক্রিয়ার কর্ত্তা নির্দ্ধারণ করিতে শুধু অর্থই পথপ্রদর্শক। এই অধ্যায়ের উদ্ধৃত রচনা হইতে পাঠক নমুনা খুঁজিয়া লইবেন। কোন কোন পুস্তকে নিতান্ত প্রাকৃত-ক্রিয়াও দৃষ্ট হয় ; যথা,—'মনে হয় চাঁদের ছয় পুত্র খাম'—(বিজয়গুপ্ত)। তৎপর করসি, খায়ন্তি, পিবন্তিও উভয় প্রদেশের রচনায় অনেক পাওয়া গিয়াছে ও তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে একবার লিখিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় 'হের' ক্রিয়া এখন দেখা অর্থেই ব্যবহৃত হয় ; কিন্তু পূর্ব্বকালে বোধ হয় হের অর্থ ছিল—'এখানে' ; 'হের দেখ' এই দুই শব্দ অনেক স্থলেই একত্র ব্যবহৃত হইতে দৃষ্ট হয়। ত্রিপুরার নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখে "এ্যার" অর্থ "এইখানে" শুনিয়াছি ; এই দুই শব্দ 'অত্র' শব্দের সঙ্গে কোনও রূপে সংশ্লিষ্ট

হইতে পারে। বঙ্গভাষার প্রাচীন সাহিত্যের ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন করা গুরুতর ব্যাপার, ক্ষুদ্রশক্তি অনুসারে আমি ইতস্ততঃ কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত দ্বারা সাহায্য করিতে সমর্থ হইলেই নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

এই অধ্যায়-বর্ণিত পুস্তকগুলি গীত হইত। মনসার ভাসান, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি পুস্তকের অষ্টাহ ব্যাপক গান হইত। অষ্টমঙ্গলা অর্থাৎ শেষপালায় গ্রন্থকার আত্ম-বিবরণ প্রদান করিতেন। এই পুস্তকগুলির সমস্তটিতেই বিবিধ রাগ রাগিণীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ ইংরেজী সাহিত্যবেত্তা, সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ৺ উমাচরণ দাস মহাশয়ের সাহায্যে শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সর্ব্বপ্রথম যে সংস্করণ প্রণয়ন করেন, তাহাতে উক্ত দুই কবির গানগুলির রাগ রাগিণী উৎকৃষ্ট ভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে "উভয়ের (বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের) রাগ রাগিণীর সংখ্যা (সাধারণ-গুলি একবার মাত্র ধরিয়া) মোট ৪০টি দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ৩১টি বিশুদ্ধ, ৯টি বিমিশ্র।" (৮৩ পৃঃ)। ৺ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় লিখিয়াছেন,—"পদা-বলীর সুরতাল সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। একজন যে পদ 'ধানশ্রী' তে গেয় লিখিয়া-ছেন আর একজন সেই পদই 'বসন্ত রাগে' গেয় স্থির করিয়াছেন। আবার অন্য পুঁথিতে সেই পদেই 'কল্যাণী রাগ' নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।"* এই সকল গান সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, পূর্ব্বকালে 'ধানশ্রী', 'শ্রীরাগ', 'নটনারায়ণ', 'গুর্জ্জরী' প্রভৃতি ওস্তাদি ধরণের রাগরাগিণীতে সঙ্গীতের অনুশীলন হইত; এখন জাতীয় রুচি মৃদুতার অনুকূলে—ভৈরবী, ঝিঁঝিঁট প্রভৃতি মধুর রাগিণীর দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়েও পূর্ব্বে উত্তর-পশ্চিমের লোকের সঙ্গে আমাদের বেশী নৈকট্য ছিল।

কাব্য গীত হইত।

চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত রাধা ও কৃষ্ণের লীলাবর্ণনার কয়েক পত্র আমরা প্রাচীন হস্তলিখিত বহির স্তূপ হইতে পাইয়াছিলাম। দুর্ভাগ্য বশতঃ দুই দিন পরেই তাহা হারাইয়া যায়। চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' নামক পুস্তকের কথা

পয়ারের ব্যতিক্রম।

* বিদ্যাপতি, কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সংস্করণ, পৃঃ ১৮০।

শুনিয়াছি, তাহা পাই নাই। এই অধ্যায়ের রচনা পয়ারের নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আমরা—'ক্ষৌণী কল্পতরু শ্রীমান্ দীন দুর্গতি বারণ।' (কবীন্দ্র) এবং "তথাপিহ বেদনা না জানিয়া। সত্বরে গিয়া পার্থেরে ধরিল দুই করে সাপটিয়া" (শ্রীকরণ-নন্দীর অশ্বমেধ) এইরূপ পদ অনেক স্থলেই পাইয়াছি।

ব্রজবুলি।

চণ্ডীদাসের রচনার অনেক স্থলেই ব্রজবুলির মিশ্রণ দৃষ্ট হয়। এই 'ব্রজবুলি' পবিত্র ব্রজভূমির ভাষা নহে। এ সম্বন্ধে এখনও অনেকের ভুল ধারণা আছে। 'ব্রজবুলি' মৈথিল ভাষার অনুকরণ। চণ্ডীদাসের রচনায় 'ব্রজবুলির' অনুকরণে শব্দসম্প্রসারণক্রিয়া অনেক স্থলে লক্ষিত হয়, যথা—ধরম, করম, পরকার, পরসঙ্গ, স্বতন্তর, পরতাপ, ভরমে, সিনান, বজর, সরবস।

রমণীগণের পরিচ্ছদাদি।

পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের রমণীগণের পরিচ্ছদ একরূপ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কণ্ঠে সুবর্ণের হার, কর্ণে কুণ্ডল, নাসায় গজমতি, হস্তে বলয়, কঙ্কণ, কটিতটে ক্ষুদ্রঘণ্টী, পদে মঞ্জীর প্রভৃতি কতক পরিমাণে পরিচিত অলঙ্কারের উল্লেখ দেখিতে পাই। চণ্ডীদাস মল্লতাড়ল (খোট্টা রমণীরা এখনও পদে পরিয়া থাকেন) নামক একরূপ ভূষণের নাম করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের লেখক বিজয় গুপ্ত, হস্তে সুবর্ণ বাউটি, সুবর্ণ ঘাগরা ও শিলমণি কাচ, কণ্ঠে হাসলী, কর্ণে সোণার মদন কড়ি, পিতলের খাড়ু ও লোটন খোঁপা নামক একরূপ খোঁপার উল্লেখ করিয়াছেন। সদয় অভিভাবকগণ বালবিধবাদিগকে পট্টবস্ত্র ও (শঙ্খস্থলে) সুবর্ণের চুড়ি পরিতে দিতেন, কোন কোন বালবিধবা সিন্দূরের পরিবর্ত্তে আবিরের ফোঁটা কপালে পরিতেন।

সামাজিক আদিম অবস্থার নিদর্শন।

ভাষা ও সামাজিক জীবনের আদিস্তর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হয় না; ইতিহাস কতকদূর লইয়া যাইয়া অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বিদায় হয়। কিন্তু প্রকৃতি হইতে এই গুপ্ততত্ত্ব খুঁজিয়া বাহির করা

যায়। প্রকৃতিতে বটবৃক্ষ ও বটবীজ উভয়ই সুলভ। পাহাড়ের পাষাণ-বক্ষস্থ ক্ষীণ যজ্ঞসূত্রের ন্যায় স্বচ্ছ জলরেখা ও শ্যামল তটান্তবাহী স্ফীত গঙ্গাধারা, উভয় দৃশ্যই প্রকৃতির মানচিত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রকৃতি আদি, উদ্যম ও বিকাশ দেখাইয়া থাকেন। বাঙ্গালা ভাষা ও সমাজের আদি খুঁজিতে বঙ্গের নিতান্ত মফঃস্বলে পল্লীগ্রামের ছবিখানি দেখিয়া আসুন। মদনকড়ি, মল্লতাড়ল প্রভৃতি যে সকল গহনা আমরা নামে মাত্র অবগত আছি, যে সকল দুরূহ অপ্রচলিত শব্দ লইয়া আমরা নানা মত প্রকাশ করিতেছি, কোন অজ্ঞাত পল্লীর কৃষকবধূ হয়ত এখনও সেই গহনাগুলি পরিয়া, সেই সকল দুরূহ শব্দ-পরম্পরায় মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছে; আমরা আঁধারে তীরক্ষেপ করিয়া বিদ্যাবুদ্ধি দেখাইতেছি মাত্র।

বাঙ্গালীর সমুদ্র-যাত্রা।

পূর্ব্বকালে বাঙ্গালীরা ডিঙ্গা সাজাইয়া সমুদ্রে যাতায়াত করিত। কোন দীর্ঘ যাত্রার প্রাক্কালে স্ত্রীর সন্তান হওয়ার সূচনা লক্ষ্য করিলে তাহাকে একখানি মঞ্জুরীপত্র দিয়া যাইত। সমুদ্রে গমনাগমনের জন্য, বোধ হয়, পূর্ব্ববঙ্গের নাবিকগণ সমুদ্রপথে বিশেষ দক্ষ ছিল। কবিকঙ্কণ, কেতকদাস ক্ষেমানন্দ ইঁহারা সকলেই সমুদ্রের পথে 'বাঙ্গাল মাঝি'-দিগকে লক্ষ্য করিয়া পরিহাস করিয়াছেন। এখনও এদেশের জাহাজের সারেং ও খালাসীগণের অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গের লোক। মাঝিদিগের তত্ত্বাবধায়ক 'গাবুর' নিযুক্ত থাকিত; ইহারা 'সারি' গাহিয়া মাঝিদিগকে কার্য্যে আকৃষ্ট রাখিত ও মাঝিরা কার্য্যে শ্লথ হইলে তাহাদিগকে 'ডাঙ্গা' দিয়া প্রহার করিত। ডিঙ্গাগুলির মধ্যে বাণিজ্যের উপযুক্ত নানাবিধ দ্রব্য থাকিত ও কোন কোন খানিতে হাট মিলিত। ("তার পিছে চলে ডিঙ্গা নাম চন্দ্রপাট। যাহার উপরে চাঁদ মিলায়েছে হাট॥"—বিজয় গুপ্ত)। এই বাণিজ্য-ব্যাপারে বিলক্ষণ লাভ ছিল;—"মুলার বদলে দিল গজদন্ত।" (বিজয় গুপ্ত); কিম্বা "শুক্তার বদলে মুক্তা দিল, ভেড়ার বদলে ঘোড়া॥" (ক, ক, চ)—প্রভৃতির মধ্যে কবি-কল্পনার অতি-রঞ্জন থাকিলেও সমুদ্র বাহিয়া ভিন্ন দেশে বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইতে

পারিলে বিলক্ষণ উপার্জ্জন হইত। আশঙ্কা,—নৌকা জলমগ্ন হওয়ার। সমুদ্রে ঢেউ উঠিলে নাবিকগণ তৈল নিক্ষেপ করিয়া ঢেউ নিবারণ করিত; ঝাঁকে ঝাঁকে জোঁক উঠিয়া ডিঙ্গা আক্রমণ করিলে, তাহারা "ক্ষারচূর্ণ" ছড়াইয়া ফেলিত; শঙ্খ উঠিয়া ডিঙ্গার গতি প্রতিরোধ করিলে মৎস্য-মাংস কাটিয়া দিত, গন্ধে শঙ্খগুলি পলাইয়া যাইত। এই সব বর্ণনায় কতদূর সত্য আছে, তাহার বিচারক আমরা নহি। তবে বোধ হয়, গল্প শুনিয়া, কবি অনেক কথা লিখিয়াছিলেন;—যে ইংলণ্ড বাণিজ্যের জন্য এত প্রসিদ্ধ, ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে সেই ইংলণ্ডের অনেক শিক্ষিত লোকেরাও সমুদ্রের অপরপারে কবন্ধাকার মনুষ্য ও এণ্থ্রিয়োপাগী নামক জীবের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিত, সেই সময়ে ইংরেজদিগের শ্রেষ্ঠ কবি এ কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

বাণিজ্যজাত দ্রব্য লইয়া কবিগণ অনেক আমোদ-জনক ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন। সিংহলের রাজা নারিকেল দেখিয়া ভয় পাইতেছেন, ও সেবককে তাহা প্রথম খাইতে আদেশ করায় সে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া স্ত্রী পুত্রের নিকট বিদায় লইতেছে। তাম্বুলরঞ্জিত অধর দৃষ্টে সিংহলীগণ অনুমান করিতেছে,—"কোতয়ালের মুখ দেখি বলে সর্ব্ব লোকে। অন্য ঠাঁই এড়ি তোমার মুখ ধরে জোঁকে॥" (বিজয় গুপ্ত)।

সরিষাতে যাঁহারা তালফলের অবয়ব দেখাইতে পারেন, সেই সব কবিগণের কল্পনার অনুবীক্ষণে প্রতিবিম্বিত চিত্রপট হইতে আমরা সমুদ্রবাহী ডিঙ্গাগুলির অবয়ব ও অন্যান্য তথ্য উদ্ধার করিতে পারিলাম না।

শিল্প-জাত দ্রব্যাদি।

এই সময়ে বঙ্গে শিল্প-জাত দ্রব্যের উন্নতি খুব বেশী হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। উৎকৃষ্ট 'ঢাকাই'—এই সময়ের আরও ২০০ বৎসর পরের সামগ্রী। 'পাটের পাছড়া' সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে পাটের পাছড়াকে

পাটের 'খনি' বলিত ; গায়েন একখানা পাটের 'খনি' পাইলেই কৃতার্থ হইতেন।—"বিজয় গুপ্ত বলে গায়েন গুণমণি। মনসা জন্মিলরে গায়েনে দেও খনি।" এই খনির মধ্যে বিশেষ নিপুণতা কিছুই ছিল না, ইহার একমাত্র গৌরব, খুব শক্ত হইত। সিংহল-রাজ বঙ্গদেশের 'খনি' হস্তে লইয়া প্রশংসা করিতেছেন,—"মোর দেশে এক জাতি, জন কত আছে তাঁতি, বুনিতে অনেক দিন লাগে। কেবল ধীরের কাম, বস্ত্র বড় অনুপম, প্রাণ শক্তি টানিলে না ভাঙ্গে।" বিজয় গুপ্ত। স্ত্রীলোকগণের কাঁচুলী নির্ম্মাণে অপেক্ষাকৃত অধিকতর শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শিত হইত। কাঁচুলীতে সমস্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি সূতায় আঁকিয়া উঠান হইত। এই অধ্যায়-বর্ণিত পুস্তকগুলিতে এবং পরবর্ত্তী সময়ে কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আমরা কাঁচুলীর সুদীর্ঘ বর্ণনা পড়িয়াছি।

ভাস্কর ও স্থপতি বিদ্যার অবনতি।

ভাস্কর ও স্থপতিবিদ্যার অবনতি হইতেছিল, তাহার প্রমাণ এই, যাহা কিছু সুন্দররূপে গঠিত ও সুচারুরূপে অঙ্কিত তাহাতেই বিশ্বকর্ম্মার কর্ত্তৃত্ব কল্পিত হইত, সুতরাং মনুষ্য-সমাজে তাহার অনুশীলন হইতেছিল বলিয়া বোধ হয় না। লখীন্দরের লৌহের বাসর, ধনপতির নৌকা ইত্যাদি সমস্তই বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা গঠিত।

বিনিময় ও মুদ্রা।

এই সময়ের কাব্যাদিতে বদল দ্বারা বাণিজ্য নির্ব্বাহ হওয়ার প্রথা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সাধারণতঃ বাজারে বট, বুড়ি, কাহন প্রভৃতি সংখ্যাক কড়ি দ্বারা দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় হইত। মাটি কাটা ও কোন দ্রব্য ওজন করিবার জন্য 'পুরুষ' * এক রূপ মাপ ছিল, উহা এখনকার গজ কাটির ন্যায় হইবে। যাহা সেকালে কড়ি দ্বারা হইয়াছে, এখন তাহা তাম্র ও রজত ভিন্ন পাওয়া যায় না। রৌপ্যের স্থলে স্বর্ণ প্রবর্ত্তিত হইলে কড়ির জিনিষ আমরা সোণা দিয়া কিনিব ;—আমরা যে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে ধাবিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

* "মাটি খানি কাটি ফেলে এক যে পুরুষ"—বিজয় গুপ্ত।
"পুরুষ সাতেক মোর হারালো কাসন্দ।"—ক, ক, চ।

আমরা এখন বঙ্গ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়ের সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছি। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা চাঁদের চরিত্রে ক্ষত্রিয়োচিত দৃঢ়তা দেখাইয়াছি, কিন্তু বঙ্গদেশের মৃদু আবহাওয়ায় শালতরুর বীজ বপন করিলে তাহাতে কুসুমলতার উৎপত্তি না হইলেই সৌভাগ্য! এই চাঁদের চরিত্র বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি প্রাচীন লেখকগণের তুলিতে যেরূপ অঙ্কিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী কবিগণ তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের হস্তে চাঁদবেণে একটি হাস্যরসের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার দৃঢ়তার মহত্ত্ব কবিগণ অনুভব করেন নাই, কষ্টে ফেলিয়া বালকের ন্যায় হাতে তালি দিয়া তামাসা দেখিয়াছেন। কালকেতুকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম ভীমের ন্যায় শারীরিক শক্তিসম্পন্ন কল্পনা করিয়াও বীরত্বের জগতে একটি মোমের পুতুলের ন্যায় সুকোমল করিয়া ফেলিয়াছেন। বীরত্বের উপকরণ এই ক্ষেত্রে আশানুরূপ সুফল উৎপত্তি করে না। বাঙ্গালী উত্তরপশ্চিম হইতে আর্য্যতেজ অবশ্যই আনিয়াছিল। পঞ্চগৌড়েশ্বরগণের মহিমান্বিত রাজশ্রী ও সিংহলবিজয় প্রভৃতি অস্বীকার করিবার বিষয় নহে; কিন্তু সেই বিক্রম ক্রমে সুকুমার ভাবে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল,—মালকোঁচা, ফুলকোঁচা এবং শূল—ফুল হইয়া গিয়াছিল;—ইহা এদেশের গুণ; ফোর্ট উইলিয়মের এদেশে থাকা নিরাপদ নহে, কালে কুঞ্জ-কুটীরত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে! বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারতে সীতা-বিলাপ, তরণী ও সুধন্বার ভক্তি-কাহিনী অভাবনীয় সুধা ঢালিয়া দিয়াছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীব পুষ্পমালায় আবৃত হইয়া পড়িয়াছে।

বাঙ্গালীর বীরত্বের অভাব।

মাণিকচাঁদের গান হইতে দৃষ্ট হয়, প্রেমের কথা বঙ্গদেশে ব্যর্থ হয় নাই। চণ্ডীদাসের গীতি প্রেমের সরস এবং নির্ভীক উক্তি। যে সমাজে ব্রাহ্মণ ও তদিতর-বর্ণের অধিকার স্বর্ণ ও লৌহের ভিন্ন ভিন্ন রেখায় নির্দ্দেশিত, সেই সমাজের

বাঙ্গালী প্রেমিক।

ক্ষুদ্র একজন পূজক ব্রাহ্মণ—"শুন রজকিনী রামি। ও দুটি চরণ, শীতল দেখিয়া, শরণ লইলাম আমি॥ তুমি রজকিনী, আমার রমণী, তুমি হও পিতৃ মাতৃ। ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমার ভজন, তুমি বেদ মাতা গায়ত্রী॥"—এইরূপ বন্দনাদ্বারা আশ্চর্য্য নির্ভীকতা দেখাইয়াছেন; একথা লিখিতে তিনি সমাজের ভয় পান নাই; কারণ প্রেমের বলে পিপীলিকা মত্ত হস্তীকে দলন করিতে পারে। এ কথা লিখিতে তিনি লজ্জিত হন নাই,—কারণ এ প্রেমে 'কামগন্ধ নাই'—ইহা তাঁহার "উপাসনারস",—ইন্দ্রিয় লিপ্সার ঊর্দ্ধে; ইহা স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণ গৌরবান্বিত হইয়াছেন.—তিনি লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া পড়েন নাই।

এই প্রেম তুলনা ও উপমা রাজ্যের উপরে। চণ্ডীদাস পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের উপমাগুলির গিল্টি দেখিয়া ভুলেন নাই,—"ভানু কমলে বলি সেহ হেন নহে। হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে॥ চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা। সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥ কুসুমে মধুপে কহি সেহ নহে তুল। না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥ কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে। ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥" উপমায় ইহা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ইহার তুল্য আছে, স্বীকার করিতে হয়।

এই প্রেমের পটখানি উজ্জ্বল করা জাতীয় জীবনের ব্রত হইয়া উঠিল। যাহা চণ্ডীদাসের ভাষায় অত্যন্ত গভীরভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা সাধনার ধন করিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত করিতে শত শত বৈষ্ণব অগ্রসর হইলেন। প্রাতঃ-শিশির-সিক্ত প্রকৃতির সজল-পট ভানুকরে যেরূপ শুষ্ক হইয়া স্থায়ী প্রভা প্রাপ্ত হয়, এই অশ্রুসিক্ত পদাবলী অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আরও গাঢ় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। যাঁহার জীবন্ত লীলায় এই সব গীতি সার্থক হইয়াছে,—তিনি নরহরি, বাসুদেব প্রভৃতি কবিগণের বন্দনার পুষ্প-পল্লব-যুক্ত স্বর্ণ ফ্রেমে বাঁধা একখানি দেবমূর্ত্তির ন্যায় আমাদের নিকট উদিত হইয়াছেন; উৎকৃষ্ট তুলিকর-অঙ্কিত ধ্রুব, প্রহ্লাদ হইতে আমরা সেই ভক্তির ছবিখানি ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছি। বঙ্গভাষায় রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত অনুবাদিত হইয়াছিল, তথাপি ভাষা-গ্রন্থ-লেখকগণ নিজেরাও

ইহাকে অগ্রাহ্য করিতেন,—"সহজে পাঁচালী গীত নানা দোষময়"—বিজয়গুপ্ত লিখিয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ কবীন্দ্র তাঁহার অনুবাদ-পুস্তকে দেন নাই, কারণ—"পাঁচালীতে উপযুক্ত নহে যোগ্য বাদ।"

কিন্তু পরবর্ত্তী অধ্যায়ের সাহিত্য শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভায় মহিমান্বিত ; পাঁচালী-গীত তখন শাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য বা নবদ্বীপের ১ম যুগ।

১। শ্রীচৈতন্যদেব ও এই যুগের সাহিত্য।

২। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী।

৩। পদাবলী-শাখা।

৪। চরিত-শাখা।

(১)

চণ্ডীদাসের দুইটি গীতি এইরূপ ;—

(ক) আজু কেগো মুরলী বাজায়।
এত কভু নহে শ্যাম রায়॥
ইঁহার গৌর বরণে করে আলো।
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল॥
* * * *
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন্ দেশে॥

(খ) কাল কুসুম করে, পরশ না করি ডরে,
এ বড় মনের মনোব্যথা।
যেখানে সেখান যাই, সকল লোকের ঠাঁই,
কাণাকাণি শুনি এই কথা॥
* * * *
সই লোকে বলে কালা পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম, জলদে না হেরি গো,
ত্যজিয়াছি কাজলের সাধ॥

চণ্ডীদাস ইথে কহে, সদাই অনন্ত দহে,
পাশরিলে না যায় পাশরা।
দেখিতে দেখিতে হরে, তনু মন চুরি করে,
না চিনিয়ে কালা কিম্বা গোরা॥

প্রথম পদটি পদকল্পলতিকায় বড় সুন্দরভাবে নিবিষ্ট হইয়াছে। রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের পীতবস্ত্র পরিয়া বাঁশী হস্তে দাঁড়াইয়াছেন, চণ্ডীদাস রাধিকার গৌরবরণের কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু প্রথম গীতির— "এরূপ হইবে কোন্ দেশে?" ও দ্বিতীয় গীতির—"না চিনি যে কাল কিম্বা গোরা"— এই দুইটি ছত্র পড়িয়া স্বপ্নের কথার ন্যায় একটা অলীক ভাব মনে হইয়াছিল,—যেন, ভাবী ঘটনা যেরূপ সম্মুখে ছায়াপাত করে, পরম সুন্দর চৈতন্য-দেবও তেমনি তাঁহার রূপের ছায়া প্রায় শতাব্দী পূর্ব্বে প্রেমিককবির মনে প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই রূপের পূর্ব্বাভাষ পাইয়া আহ্লাদে চণ্ডীদাস ঊষার প্রাক্কালে পক্ষীর ন্যায় অস্পষ্ট কাকলি দ্বারা তাঁহার আগমনী গান করিয়াছিলেন।

প্রেমের অবতার চৈতন্য।

"এরূপ হইবে কোন্ দেশে?"—প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বঙ্গদেশে; তখন চণ্ডীদাস জীবিত ছিলেন না। চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতির মিলন হইয়াছিল, চৈতন্য-প্রভু আর রামানন্দরায়ের মিলন হইয়াছিল, কিন্তু চণ্ডীদাস আর চৈতন্য-প্রভুর মিলন হইলে তাহা তদপেক্ষা অপূর্ব্ব হইত। গীতির প্রেমোন্মাদ ও জীবনের প্রেমোন্মাদ— গোলাপের সুঘ্রাণ ও পদ্মের সুঘ্রাণ মিশিয়া যাইত। চণ্ডীদাসের বর্ণিত পূর্ব্বরাগ, রাধিকার ব্যাকুল বিরহ, মধুর প্রেম ও দিব্যোন্মাদ—গৌরহরি স্বজীবনে দেখাইয়াছেন; যদি গৌরহরি না জন্মিতেন, তবে শ্রীরাধার— "জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর", কৃষ্ণঅঙ্গভ্রমে কুসুমলতা আলিঙ্গন, এক দৃষ্টে ময়ূর ময়ূরীর কণ্ঠ নিরীক্ষণ ও নব পরিচয়ের সুমধুর ভাবাবেশ কবির কল্পনা হইয়া যাইত। ভাবের উচ্ছ্বাসজাত এই ভ্রমময় আত্ম-বিস্মৃতি আজ

শুষ্কযুগে কবিকল্পনা বলিয়া উপেক্ষিত হইত। কিন্তু গৌরহরি শ্রীমদ্ভাগবত ও বৈষ্ণব-গীতি সমূহের সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছেন,—দেখাইয়াছেন, এই বিরাট শাস্ত্র ভক্তির ভিত্তিতে, নয়নের অশ্রুতে, চিত্তের প্রীতিতে দণ্ডায়মান। এই শাস্ত্রের শোভা স্বরূপ পূর্ব্বরাগ, বিরহ, সম্ভোগ, মিলন ইত্যাদি যে সব লীলারসের ধারা ছুটিয়াছে, তাহা কল্পিত নহে, আস্বাদ-যোগ্য ও আস্বাদিত হইয়াছে; প্রেমের আশ্চর্য্য স্ফূর্ত্তিতে শ্রীগৌরের দেহ কদম্বপ্রায় হইয়াছে, সমুদ্র-ঢেউ যমুনা-লহরী হইয়াছে, চটক পর্ব্বত গোবর্দ্ধন হইয়াছে ও পৃথিবী কৃষ্ণময় হইয়াছে। এই অপূর্ব্ব ভক্তি ও প্রেমের উপকরণ দিয়া শ্রীমতী রাধিকাসুন্দরী সৃষ্ট;—তিনি 'আয়েসা' কি 'কুন্দনন্দিনী' নহেন, তাঁহার বিরহের এক কণিকা কষ্ট বহন করিতে পারে,—তাঁহার সুখের এক লহরী ধারণ করিতে পারে, এরূপ নারীচিত্র পৃথিবীর কাব্যোদ্যানে নাই।

পদাবলীর সঙ্গে সম্পর্ক।

এই অধ্যায়ের চরিতশাখা পদাবলী দ্বারা বুঝিতে হইবে, পদাবলী চরিতশাখা দ্বারা বুঝিতে হইবে এবং উভয়ই গৌরহরির লীলারস দ্বারা বুঝিতে হইবে; তাহা কিরূপ দেখাইতে চেষ্টা করিব;—চণ্ডীদাস প্রেমের অজ্ঞান অবস্থা বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন;—"তূলাখানি দিল নাসিকা মাঝে। তবে সে বুঝিল শোয়াস আছে॥" সার্ব্বভৌমের গৃহে যখন চৈতন্যপ্রভু অজ্ঞান, তখন "সূক্ষ্ম তূলা আনি নাসা অগ্রেতে ধরিল। ঈষৎ চলয়ে তূলা দেখি ধৈর্য্য হল॥" (চৈ, চ, মধ্যখণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ);—শ্রীরাধিকা তমাল দেখিয়া—"বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল," (প, ক, ত ৩৯ শ্লোক). ও মেঘ দেখিয়া—"চাহে মেঘ পানে, না চলে নয়নের তারা," (চণ্ডীদাস), কৃষ্ণ ভ্রমে উন্মাদিনী হইয়াছেন; শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনও সেইরূপ ভ্রমময়——"চটক পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে, ধাঞা চলে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে॥" "যাহা নদী দেখে তাহা মানয়ে কালিন্দী। মহাপ্রেম বশে নাচে প্রভু পড়ে কাঁদি॥" (চৈ, চ, মধ্যম খণ্ড ১৭ পরিচ্ছেদ)।—"তমালের বৃক্ষ এক সম্মুখে দেখিয়া। কৃষ্ণ বলি ধেয়ে গিয়ে ধরে জড়াইয়া॥"—(গোবিন্দদাসের করচা)।

"বন দেখি ভ্রম করে এই বৃন্দাবন ॥" (চৈ, চ, ১৭ পঃ)। এরূপ অসংখ্য স্থল আছে। শ্রীরাধিকাকে চেতন করিবার জন্য বলা হইত ;—"উঠ উঠ রাধে বিনোদিনী, দেখ দেখ কৃষ্ণ গুণমণি ॥"—(দিব্যোন্মাদ)। চৈতন্যদেবের প্রতিও সেই ব্যবস্থা, "যখন বা হয় প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত। কর্ণমূলে সবে হরি বলে অতি ভীত ॥" (চৈ, ভা, মধ্য খণ্ড)। রাধিকা কৃষ্ণ-নাম শুনিলে বক্তার পদে বিক্রীত হইতেন, "অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়। যে করে কানুর নাম ধরে তার পায় ॥ পায় ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়। সোণার পুতলী যেন ভূতলে লোটায় ॥"—(চণ্ডীদাস)। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এইরূপ কতবার কৃষ্ণনাম শুনিয়া বক্তার পদে ধরিয়াছেন, আলিঙ্গন করিয়াছেন, "কৃষ্ণ অনুরাগে সদা আকুল হৃদয়। শুনিলে কৃষ্ণের নাম অশ্রুধারা বয় ॥ যদি কেহ রাধে বলি উচ্চ শব্দ করে। অমনি অশ্রুর ধারা ঝর ঝর ঝরে ॥ প্রাণ কৃষ্ণ বলি যদি দৈবে কেহ ডাকে। ধেয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করেন তাহাকে ॥"—(গোবিন্দদাসের করচা)। শ্রীরাধিকা—"পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি। কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি ॥"—(চণ্ডীদাস)। চৈতন্য দেবও—"গদাধরে দেখি প্রভু করয় জিজ্ঞাস। কোথা হরি আছেন শ্যামল পীতবাস ॥ সে আর্ত্তি দেখিতে সর্ব্ব হৃদয় বিদরে। কি বলিব প্রভুর বচন নাহি স্ফুরে ॥ সম্ভ্রমে বলিল গদাধর মহাশয়। নিরবধি আছেন হরি তোমার হৃদয় ॥ হৃদয়ে আছেন হরি বচন শুনিয়া। আপন হৃদয় প্রভু চিরে নখ দিয়া ॥"—(চৈ, ভা, মধ্যম খণ্ড)। কৃষ্ণ-প্রেম-মগ্না রাধিকা ভূপৃষ্ঠে নখাঙ্কন করিয়া কৃষ্ণনাম লিখিয়া সুখী হইতেন,—"ভরমে তোমার নাম ক্ষিতি-তলে লিখি।"—(চণ্ডীদাস)। চৈতন্যদেবও—"ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ আকৃতি। চাহিয়া রোদন করে ভাসে সব ক্ষিতি ॥"—(চৈ, ভা, মধ্য)। রাধিকার হাসি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিভোর,—"হাস, হাস, নয়ন জুড়াক চন্দ্রমুখি। এ বোল বলিতে পিয়ার ছল ছল আঁখি ॥" চৈতন্যদেব রত্নগর্ভের মুখে ভাগবত পাঠ শুনিয়া,— "বোল বোল বলে বিশ্বম্ভর। গড়াগড়ি যায় প্রভু ধরণী উপর ॥ বোল বোল বলে প্রভু, পড়ে দ্বিজবর। উঠিল সমুদ্র কৃষ্ণ-সুখ মনোহর ॥ লোচনের জলে হ'ল পৃথিবী সিঞ্চিত। অশ্রু কম্প পুলকাদি ভাবের উদিত ॥"—(চৈ, ভা, মধ্যম খণ্ড)। গোরার সন্ন্যাস নবদ্বীপের এক মহা শোক-ঘটনা—শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সকরুণ ক্রন্দন রাশি পদকর্ত্তৃগণের মাথুর কীর্ত্তিত যশোদা ও রাধিকার শোকোচ্ছ্বাসে জীবন্ত দুঃখাশ্রু ও মর্ম্মবেদনার স্রোত ঢালিয়া দিয়াছে।

প্রস্ফুট কদম্ব-পুষ্পের ন্যায় প্রেম-রোমাঞ্চিত দেহ, শিশির-ফুল্ল পদ্মদলের ন্যায় প্রেমাশ্রুপূর্ণ চক্ষু—এই ছবিখানি শ্রীচৈতন্যদেবের। ইঁহার প্রেমের অনন্ত আনন্দের কথঞ্চিৎ চণ্ডীদাসের পদে পাওয়া পায়, অপরাপর কবিগণ তটস্থ দর্শকের ন্যায় উঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া গীতি রচনা করিয়াছেন। পদকল্পতরু প্রভৃতি পুস্তক চৈতন্যদেবের অলৌকিক প্রেমের আভাস দিতে চেষ্টিত। তাঁহার লীলা-কাহিনী যাঁহারা জ্ঞাত নহেন তাঁহারা এণ্ড্রোমেকি, জুলিয়েট, ডিডোর সঙ্গে বৈষ্ণব-কবি-অঙ্কিত রাধিকাকে একস্থলে দাঁড় করাইবেন, এই ভয়ে এতগুলি দৃষ্টান্ত খুঁজিয়াছি। বৈষ্ণব পদাবলী, উপন্যাস বা ইন্দ্রজালের ন্যায় অলীক বোধ হইতে পারে, কিন্তু উহা খাঁটি সত্য; ভক্তের চক্ষে মেঘে কৃষ্ণভ্রম হইয়াছে, তাহার পর "কেন মেঘ দেখে রাই এমন হলি।" প্রভৃতি কথার উদ্ভব হইয়াছে। কেবল চৈতন্যদেব নহেন, এই দলে আরও ভক্ত ছিলেন, যাঁহাদের কথা স্বপ্নের ন্যায় অলীক বোধ হয়; "মাধবেন্দ্রপুরীর কথা অকথ্য কথন। মেঘদরশন মাত্র হয় অচেতন॥" (চৈ, ভা,)।

বৈষ্ণব পদবালীর সত্যতা।

এই অধ্যায়ের গ্রন্থরাশি যাঁহার নির্ম্মল অশ্রুবিন্দু-নিঃসৃত ধর্ম্মদ্বারা উজ্জ্বল হইয়া অবর্ণনীয় সুন্দর ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে, দীনা বঙ্গভাষা যাঁহার পবিত্রস্পর্শে গঙ্গাধারার নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গে পদাবলী-সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিলাম। এস্থলে সংক্ষেপে তাঁহার জীবনী বর্ণনা করিব।

শ্রীচৈতন্যদেব।

যে নবদ্বীপ একদা পলায়নপর হিন্দু রাজার একখানি মলিন আলেখ্য দ্বারা ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়াছিল, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সেই নবদ্বীপ তিনটি শ্রেষ্ঠ পুরুষের চিত্রপট উপহার দিয়া স্বীয় ঐতিহাসিক ত্রুটি উৎকৃষ্ট ভাবে সংশোধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহারা রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও শ্রীচৈতন্যদেব। প্রথম দুই জন শাস্ত্রচর্চ্চাকারীদিগের মধ্যে 'রাজা' উপাধি পাইবার যোগ্য; শেষোক্ত জনও অল্পবয়সে সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শুষ্কপত্রের ন্যায় সেই শিক্ষা ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া সদ্য-বিকশিত উৎকৃষ্ট মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব দেখাইয়াছিলেন। প্রথম দুইজনের সমকক্ষ আছে; কিন্তু তৃতীয় জন তুলনারহিত, মানবজাতির তপস্যার ফলস্বরূপ।

নবদ্বীপের তিনটি রত্ন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজধানী নবদ্বীপ একটি বিরাট পাঠশালায় পরিণত হইয়াছিল; মল্লযুদ্ধের দিনগতে তথায় তর্কযুদ্ধই প্রশংসা অর্জ্জনের পন্থা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল। এই সময়ে নবদ্বীপের পরিসর অতিশয় বৃহৎ ছিল। আতোপুর, শিমলিয়া, মাজিতাগ্রাম, বামণপোখেরা, হাটডাঙ্গা, চাঁপাহাট, রাতুপুর, বিদ্যানগর, মাউগাছি, রাহুপুর, বেলপোখেরা, মায়াপুর প্রভৃতি বহুসংখ্যক পল্লী ইহার অন্তর্গত ছিল; নরহরির অতিরঞ্জিত বর্ণনায় ইহার বসতি অষ্টক্রোশব্যাপক বলিয়া উল্লিখিত আছে।* উক্ত পল্লীসমূহ ব্যতীত গন্ধবণিকপাড়া, তাঁতিপাড়া, শাখারিপাড়া, মালাকারপাড়া প্রভৃতি চৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত দেখিতে পাই।

১৫শ শতাব্দীতে নবদ্বীপ।

---

* ভক্তিরত্নাকর। দ্বাদশ তরঙ্গ।

নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল তখন হিন্দুস্থানে অদ্বিতীয়; দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রেরও সে স্থানে বিশেষরূপ চর্চ্চা হইতেছিল। এসব সত্ত্বেও নবদ্বীপবাসী স্বল্প সংখ্যক লোকের কিছু বাসনা অপূর্ণ থাকিয়া যাইত। মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি ও ষষ্ঠীর পূজা, যোগীপাল, গোপীপাল, মহীপালের গীত, এবং পশুরক্ত ও মদ্য দ্বারা আর্দ্র [illegible] দেখিয়া তাঁহারা আক্ষেপ করিতেন। হরিভক্তিহীন নবদ্বীপের [illegible] বিদ্যাসমৃদ্ধি তাঁহাদের নিকট সিন্দূরহীন রমণীললাটের ন্যায় বৃথা মনে হইত। তাঁহারা পৃথিবীতে ভক্তির অভাব দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে অশ্রুপাত করিতেন। এই ভক্তবৃন্দের মধ্যে অদ্বৈতাচার্য্য অগ্রগণ্য। প্রবাদ আছে, ইঁহাদের অভাব পূরণ করিতে শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হন।

নবদ্বীপে বৈষ্ণব-সম্মিলন।

বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তখন এই কয়েকটি বৈষ্ণব আবির্ভূত হন,—ইঁহারা চারিদিকে ভক্তির অপূর্ব্ব কথা প্রচার করিবেন, কিন্তু এক সময়ে নবদ্বীপে ইঁহাদের সকলের মিলন হয়। শ্রীহট্টে—শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীবাস, শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ও মুরারি গুপ্ত। চট্টগ্রামে—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও চৈতন্যবল্লভ দত্ত। বূঢ়নে—হরিদাস ও রাঢ়দেশে একচক্রা গ্রামে—শ্রীনিত্যানন্দ। ইঁহারা দীপশলাকা; কিন্তু চৈতন্যদেব দীপ; চৈতন্য-দেব আবির্ভূত না হইলে ইঁহারা জ্বলিতে পারিতেন কি না, কে বলিবে?

অলৌকিক লীলা।

শ্রীচৈতন্যের জীবনে অনেক অদ্ভুত ঘটনা বর্ণিত আছে; এক দিনে আম্রবীজরোপন ও তাহা হইতে বৃক্ষ ও ফলোদগম, স্পর্শমাত্র কুষ্ঠরোগীর আরোগ্য-লাভ, সুদর্শনচক্রকে আহ্বানমাত্র আকাশ হইতে উক্ত চক্রের আবির্ভাব, ষড়্‌ভুজপ্রকাশ ইত্যাদি। এ সব সত্য কি মিথ্যা, সে সম্বন্ধে কোনও মত প্রকাশ করিতে আমি সাহসী নহি। এই সব প্রকৃত হইলেই বা

গৌরাঙ্গ প্রভু ও পারিষদবর্গ (কুঞ্জঘাটা রাজবাটীর
তৈল চিত্রের প্রতিলিপি।)

ইহাদের কি মূল্য, তাহা বুঝিতে পারি না। তাঁহার জীবনে যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা আরোপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তাঁহার নয়নাশ্রুর ন্যায় কোনটিই অলৌকিক নহে। যে প্রেমে তাঁহার শরীর কদম্ব-কোরকের ন্যায় কণ্টকিত হইয়াছে ও অৰ্দ্ধনিমীলিত চক্ষুপুট হইতে অজস্র অশ্রুবিন্দুপাত হইয়াছে, সেই প্রেমের ন্যায় তাঁহার জীবনে কিছুই অপূর্ব্ব কি মনোহর হয় নাই। চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি পুস্তকে তাঁহার আলেখ্য এই ভাবে লিখিত আছে,—

জন্ম ও শৈশব।

চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খৃঃ) নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার বাড়ী শ্রীহট্ট;—

জন্ম ও বংশ-পরিচয়।

নবদ্বীপে পড়িতে আসিয়াছিলেন, জগন্নাথ মিশ্রের পূর্ব্বপুরুষ উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুর হইতে রাজা ভ্রমরের ভয়ে শ্রীহট্টে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। নবদ্বীপে পাঠ সমাপনান্তে ইনি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর গুণবতী কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করেন। গোবিন্দদাসের করচায় শচীদেবী সম্পর্কে এই ছত্রটি পাওয়া যায়—"শান্ত মূর্ত্তি শচীদেবী অতি খর্ব্বকায়।" শচীর গর্ভে ৮ কন্যা ও ২ পুত্র জন্মে। সব কয়টী কন্যারই অল্পবয়সে মৃত্যু হয়। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমে শাস্ত্রচর্চ্চায় বিব্রত যুবক বিশ্বরূপ বিবাহরূপ জটিল প্রশ্ন দ্বারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুতরাং জগন্নাথ মিশ্র নিজে সুপণ্ডিত হইয়াও দ্বিতীয় পুত্র নিমাইএর পড়াশুনা বন্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তি এইরূপ,—

"এই যদি সর্ব্বশাস্ত্রে হবে গুণবান্। ছাড়িয়া সংসার সুখ করিবে পয়ান॥ অতএব ইহার পড়িয়া কার্য্য নাই। মূর্খ হৈয়া ঘরে মোর থাকুক নিমাঞি॥"—(চৈ. ভা. আদি)।

শৈশবে উচ্ছৃঙ্খলতা।

শৈশবে জগন্নাথ মিশ্রের এই দ্বিতীয় বালকটী নবদ্বীপে বড় শান্ত শিষ্ট বলিয়া পরিচিত হন নাই। ইনি গঙ্গা-স্নানকারী ভক্তিমান্ ব্রাহ্মণগণের উপর বিশেষ উৎপীড়ন করিতেন, অভিযোগগুলি এইরূপ,—একজন বলিতেছে,—"সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া। ডুব দিয়া লৈয়া যায় চরণ ধরিয়া॥"—(চৈ, ভা, আদি)। "কেহ বলে মোর শিব-লিঙ্গ করে চুরি। কেহ বলে মোর লয়ে পলায় উত্তরী॥"—(চৈ, ভা, আদি)।

গঙ্গার ঘাটে বালিকাগণের মাথায় ওকড়ার বীচি ফেলিয়া দিতেন, দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশজালের দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া উক্ত বীচির নির্গমকালে অনেক গাছি নষ্ট না হইয়া যাইত না। শিশু চৈতন্যপ্রভু তামাসা দেখিতেন; এইসব অভিযোগকারিণী বালিকাদের মধ্যে কাহারও বিষয় গুরুতর ছিল। "কেহ বলে মোরে চাহে বিভা করিবারে।"—(চৈ, ভা, আদি)॥* প্রভুর বয়স তখন পঞ্চবর্ষমাত্র, ইহা স্মরণ করিলে অভিযোগের গুরুত্ব অনেকটা হ্রাস হইবে, সন্দেহ নাই। একদিন নিমাই রন্ধনের বর্জ্জিত হাঁড়ির উপর বসিয়া পাগলামির এক নব অবয়ব প্রকটিত করিলেন; মাতা কর্ত্তৃক ভৎ‍র্সিত হইলে শিশু উত্তর করিলেন,—"প্রভু বলে মোরে তোরা না দিস পড়িতে। ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্র জানিব কি মতে॥ মূর্খ আমি না জানি যে ভাল মন্দ স্থান। সর্ব্বত্র আমার এক অদ্বিতীয় স্থান॥" (চৈ, ভা, আদি)। এই উত্তরের সবটুকু খাঁটি সত্য কিম্বা ইহার মধ্যে লেখকগণের কিছু মুন্সীয়ানা আছে, ঠিক বলিতে পারি না। যেরূপ ভাবেই হউক, শিশুর সুখকর উপদ্রব হইতে গ্রামবাসীদিগকে মুক্তি দেওয়া একসময়ে নিতান্ত

---

* এই সব কাহিনীতে ভাগবতের সঙ্গে মিল রাখিবার কিছু কিছু চেষ্টা আছে, এজন্য ইহাদের ঐতিহাসিকত্বে আমরা খুব বিশ্বাসপরায়ণ হইতে পারি নাই; বালিকাগণ নানারূপ অভিযোগ করিয়া শেষে বলিতেছে,—

"পূর্ব্বে শুনিলাম যেন নন্দের কুমার। সেইমত তোমার পুত্রের ব্যবহার॥"—চৈ, ভা, আদি।

আবশ্যক হইয়া উঠিল। তখন মাতাপিতা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়িতে পাঠাইয়া দিলেন।

নিমাই ছাত্র ও নিমাই অধ্যাপক।

"কি মাধুরী করি প্রভু ক, খ, গ, ঘ বলে।" বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন।

পাঠে একাগ্রতা।

নিমাইএর পড়া শুনার ইতিহাস প্রকৃতই বড় মধুর। যে একাগ্রতায় শচীর পাগল ছেলে পাগলামি করিয়াছে, সেই একাগ্রতায় শচীর দুরন্ত ছেলে পড়া শুনা লইয়া পাগল হইল।

"কিবা স্নানে কি ভোজনে কিবা পর্য্যটনে। নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র বিনে।" "আপনি করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনী। ভুলিয়া পুস্তক রসে সর্ব্ব দেবমণি॥" "না ছাড়েন শ্রীহস্তে পুস্তক একক্ষণে।" "পুঁথি ছাড়িয়া নিমাঞি না জানে কোন কর্ম্ম। বিদ্যারস ইহার হয়েছে সর্ব্ব ধর্ম্ম॥" "একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায়। আরবার উলটিয়া সবারে ঠেকায়॥"—(চৈ, ভা, আদি)।

এইরূপ একাগ্রতার বলে নিমাই শীঘ্রই ব্যাকরণশাস্ত্রে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। কিন্তু নিমাই এখনও সেই পাগল ছেলে, সে পাগলামির লীলারস বড় মধুর—উহা তাহার উদ্দাম ও স্ফূর্ত্তিপূর্ণ প্রকৃতির সহজ খেলা—উহা নির্ম্মল জলস্রোতের ন্যায় আনন্দদায়ী, তাহাতে সরলতা বিম্বিত। নব-যুবক তাঁহার তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও শিক্ষার ধনু লইয়া

পাণ্ডিত্য ও টোলের অধ্যাপকতা।

বড় বড় অধ্যাপকদিগের পাঠশালা লক্ষ্যে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; মুরারিগুপ্ত বয়সে বড়, তাঁহাকে তর্কে হারাইয়া নিমাই বলিতেছেন;—

"প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেন পড়। লতা পাতা নিয়া গিয়া রোগী দৃঢ় কর॥ ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি। কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥"

—(চৈ, ভা, আদি)।

গদাধর পণ্ডিতকে পথে পাইয়া,—

"হাসি দুই হাত প্রভু রাখিলা ধরিয়া। স্যায় পড় তুমি আমা যাও প্রবোধিয়া॥
জিজ্ঞাসহ গদাধর বলিল বচন। প্রভু কহে বল দেখি মুক্তির লক্ষণ॥"—(চৈ, ভা, আদি)।

এইরূপে পথিকদিগকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া পরাভবব্যঞ্জক হাস্য ও শ্লেষ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। নদীয়ার বড় বড় পণ্ডিত এই তরুণ যুবকের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দেখিয়া প্রীত ও বিস্মিত হইলেন। নিমাই যে টোল স্থাপন করিলেন, তাহাতে অসংখ্য ছাত্র পড়িতে আসিল। তাঁহার অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য সেই টোলের গৌরব অশেষরূপে বাড়াইয়া দিল। কিন্তু তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অনতিক্রান্ত বিংশ বর্ষ মাত্র।

দিগ্বিজয়ী-জয়।

কেশবকাশ্মীর নামক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীকে তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির গৌরবে নবদ্বীপবাসিগণ ভীত হইলেন; কিন্তু তরুণ নিমাই হাস্যমুখে গঙ্গাতীরে তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে বলা মাত্র তিনি গঙ্গার সেই সময়ের শোভা বর্ণন করিয়া একটি স্তোত্র রচনা করিলেন; শ্লোকগুলির সুন্দর উপমা, সহজ ভাব, শ্রোতৃবর্গের মন মুগ্ধ করিল; কিন্তু নিমাই সেই শ্লোকগুলির প্রত্যেকটি হইতে অলঙ্কারের দোষ বাহির করিয়া দিগ্বিজয়ীর অখণ্ড-অভিমান-স্ফীত মুখমণ্ডল খর্ব্ব ও মলিন করিয়া দিলেন। তাঁহার প্রথম ছত্রের 'ভবানী-ভর্ত্তৃ' শব্দে 'বিরুদ্ধমতি দোষ,' 'বিভবতি' শব্দের পরে 'ক্রমভঙ্গদোষ,' 'শ্রীলক্ষ্মী' শব্দে 'পুনরুক্তবদাভাস,' ইত্যাদি। যিনি ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তিতে অসাধারণরূপ কৃতী, তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের সূক্ষ্মতত্ত্বও অবগত ছিলেন, একথা দিগ্বিজয়ী কখনও মনে ভাবেন নাই। তাই দম্ভ-ভরে বলিয়াছিলেন;—

"ব্যাকরণী তুমি নাহি পড় অলঙ্কার। তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার॥"
—(চৈ, চ, আদি)।

কিন্তু এবার তাঁহার আটোপ বৃথা হইল। প্রভু যখন তাঁহার রত্নমুষ্টির ন্যায় কবিতাটিকে শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে ছাইমুষ্টির মত প্রতিপন্ন করিলেন, তখন দিগ্বিজয়ী তাঁহার অহঙ্কারের পুচ্ছ গুণ্ঠিত করিয়া কোন্ পথে পলায়নপর হইলেন, কেহ তাঁহাকে আর দেখিল না।

ব্যঙ্গ-প্রিয়তা।

এই তরুণবয়সে প্রবীণশিক্ষাপ্রাপ্ত পণ্ডিতটির দুরন্তপনার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। শ্রীহট্টীয়াগণকে দেখিলে নিমাই ব্যঙ্গ করিতেন ; তিনি খাঁটি নদেবাসীর সন্তান হইলে শ্রীহট্টবাসীদের ততদূর দুঃখ হইত না। ময়ূরের পুচ্ছ শরীরে সংলগ্ন করিলেই ময়ূর উপাধি পাওয়া যায় না, শ্রীহট্টবাসিগণের এইজন্য একটু ন্যায্য কষ্ট হইত ;—

"শ্রীহট্টীয়াগণ বলে হয় হয় হয়। তুমি কোন্ দেশী তাহা কহ মহাশয়॥ পিতা মাতা আদি করি তাবৎ তোমার। বল দেখি শ্রীহট্টে জন্ম না হয় কাহার॥"—(চৈ, ভা, আদি)।

কিন্তু রহস্যপ্রিয় পণ্ডিতমহাশয় এসব যুক্তি শুনিতে প্রস্তুত নহেন। "তাবৎ শ্রীহট্টীয়ারে চালেন ঠাকুর। যাবৎ তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর॥ মহাক্রোধে কেহ লই যায় খেদায়িয়া। লাগালি না পায় যায় তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া॥"—(চৈ, ভা, আদি)।

সাবধানতা।

কিন্তু যে স্থলে এই যুবাবয়সে তাঁহার চাঞ্চল্য না থাকা শ্রেয়ঃ ছিল, সে স্থলে তিনি সংযত ছিলেন ;—

"এই মত চাপল্য করেন সব সনে। সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন দৃষ্টি কোনে॥ সবে পরস্ত্রী মাত্র নাহি উপহাস। স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয়েন এক পাশ॥"—(চৈ, ভা, আদি)।

ধর্ম্মহীনতা শুধু ভাণ।

ধর্ম্ম না থাকিলে হিন্দুস্থানে রূপ বৃথা,—বিদ্যা বৃথা। সকলেই নিমাইকে ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দিতে যাইত। রহস্যের স্রোতে ধর্ম্মকথা ভাসাইয়া দিয়া নিমাই হাসিতেন ; ঈশ্বরপুরী পরমবৈষ্ণব, তাঁহাকে ধর্ম্মে মতি লওয়াইতে নিত্য নিত্য কত শ্লোক পাঠ করিতেন, কিন্তু নিমাই তাঁহার শ্লোক হইতে ব্যাকরণের দোষ বাহির করিতে নিপুণ ছিলেন। "প্রভু কহে এ ধাতু আত্মনেপদী নয়॥"—ব্যাকরণের অতলগর্ভে ধর্ম্মের কথাগুলির গঙ্গাপ্রাপ্তি

হইত। কিন্তু তাঁহার বাহিরের এই রহস্য-প্রিয়তা প্রকৃত ধর্ম্মহীনতার পরিচায়ক ছিল না। তিনি ব্যঙ্গ করিয়াও শ্রীধর এবং গদাধরকে দেখিলে মনে মনে আহ্লাদিত হইতেন এবং ঈশ্বরপুরীকে দেখিলে পাগল হইতেন।

এই যুবকের হৃদয় শরদভ্রের ন্যায় নির্ম্মল ও শরৎ শেফালিকার ন্যায় পবিত্র ছিল; ইঁহার চাপল্য—স্বচ্ছ, উদ্দাম প্রকৃতির হর্ষময় রসপূর্ণ খেলা,—তাহা সকলের প্রীতি উৎপাদন করিত; এই নির্ম্মল ও পবিত্র প্রাকৃতিক উপাদানে সরস ভক্তি কিরূপ কার্য্যকরী হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখাইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।

পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণ।

নিমাইপণ্ডিত পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যটন করিতে গেলেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি বঙ্গের সর্ব্বত্র একজন শ্রেষ্ঠপণ্ডিত বলিয়া নামে পরিচিত ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহাকে যথেষ্ট আদরের সহিত অর্চ্চনা করিয়া বলিলেন,—

"উদ্দেশে আমরা সবে তোমার টিপ্পনী। লই, পড়ি, পড়াই শুনহ দ্বিজমণি॥"—(চৈ, ভা, আদি)।

ইহা দ্বারা জানা যায়, নিমাইপণ্ডিতের টীকা বঙ্গদেশের টোলগুলিতে প্রচলিত হইয়াছিল।* তিনি পূর্ব্ববঙ্গের কোন্ কোন্ স্থল ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই। চৈতন্য ভাগবতকার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি পদ্মানদীর তীর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন।

---

* চৈতন্যপ্রভুর ব্যাকরণের টীকার কথা অনেক স্থলেই পাওয়া যায়, যথা—"দিনে দিনে ব্যাকরণে হৈয়া চমৎকার। ব্যাকরণে করয় টিপ্পনী আপনার॥"—(ভক্তিরত্নাকর, ১২ তরঙ্গ)। "বিদ্যাসাগর উপাধিক নিমাঞি পণ্ডিত। 'বিদ্যাসাগর' নামে টীকা যাহার রচিত॥"—(অদ্বৈত প্রকাশ, ১৩৪ পৃঃ)।

নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গিগণের নিকট পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার অনুকরণ করিয়া হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু একটি প্রফুল্ল পুতুলের ন্যায় যখন জননীদেবীর চরণে প্রণত হইলেন, তখন প্রত্যাগত কুমারের মুখ দেখিয়া শচী ঠাকুরাণী কাঁদিয়া ফেলিলেন। নিমাই জানিতে পারিলেন, সর্পদংশনে তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হইয়াছে। নবীনপণ্ডিত মাতাকে প্রবোধ দিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া সেই প্রবোধ সম্পূর্ণ করিলেন; কিন্তু নিজে, বোধ হয়, প্রবোধ পান নাই। পিতৃপিণ্ডপ্রদানার্থ গয়াযাত্রা করিলেন; এবার তাঁহার চিত্ত শোকে আকুল হইয়াছিল, তীর্থস্থানে যাইয়া ঈশ্বরপুরীর ভক্তির উচ্ছ্বাস দর্শনে নিমাই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ভক্তিময় ঈশ্বরপুরীর মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে একখানি দেবচ্ছবির ন্যায় অপূর্ব্ব বোধ হইল; ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান কুমারহট্ট গয়া হইতেও শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া বোধ হইল;—"প্রভু বলে কুমারহট্টেরে নমস্কার। শ্রীঈশ্বরপুরী যে গ্রামে অবতার॥ * * * ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান। এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ॥"—(চৈ, ভা, আদি)।—বলিয়া নিমাই অশ্রুনেত্রে কুমারহট্টের ধূলিরেণু দুর্লভ সামগ্রীর ন্যায় উত্তরীয়-অঞ্চলে বাঁধিতে লাগিলেন।

স্ত্রী বিয়োগ ও পুনঃ পরিণয়।

গয়া গমন ও ভক্তির উচ্ছ্বাস।

ইহার পর আর এক দৃশ্য,—সে দৃশ্য চিত্রে অঙ্কিত হওয়ার উপযুক্ত। স্ত্রীবিয়োগকাতর শিক্ষাভিমানী যুবক গয়ায় অঞ্জলি দিতে দাঁড়াইয়াছেন; যে চরণ হইতে ভগবতী গঙ্গা নিঃসৃত, যে চরণে বলি দলিত, যে চরণরেণু ধারণ করিতে শুক সন্ন্যাসী, নারদ বৈরাগী, যোগেশ্বরগণ তপোরত—সেই চরণ দেখিতে দেখিতে নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সঙ্গিগণের যত্নে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, তখন অজস্র নয়নাশ্রু ফুল্লারবিন্দগুচ্ছের ন্যায় সেই শ্রীচরণ উদ্দেশে বর্ষিত হইতেছিল, কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি পথ দেখিতে পান নাই, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সঙ্গিগণকে বলিলেন,—"তোমরা গৃহে ফিরিয়া

যাও, আমি আর সংসারে যাইব না ; আমি প্রাণেশ্বরকে দেখিতে মথুরায় চলিলাম।”

এই অপূর্ব্ব ভক্তি উচ্ছ্বসিত পূর্ব্বরাগের আবেশময় যুবককে সঙ্গিগণ নানা উপায়ে প্রত্যাবর্ত্তিত করিলেন। গৃহে আসিয়া নিমাই সেই পাদপদ্মের কথা বলিতে পারেন নাই,—বলিতে যাইয়া ভাবাবেগে কথা রুদ্ধ হইয়াছে ; 'কি দেখিয়াছি' বলিতে উদ্যত হইয়া একবার শ্রীমান্ পণ্ডিত, আবার গদাধরের কণ্ঠ জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভাষায় ব্যক্ত হয় নাই—তাঁহার মুক্তাদামসম উজ্জ্বল অশ্রুজলে ব্যক্ত হইয়াছিল।

এই প্রেমোন্মত্ত বালককে শচীদেবী পুত্রবধূর রূপ দ্বারা গৃহে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন,—"লক্ষ্মীরে আনিয়া প্রভুর নিকটে বসায়। দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়॥ কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ। দিবানিশি শ্লোক পড়ি করয় ক্রন্দন॥"—চৈ, ভা, আদি।

ইহার পর কাঁটোয়ার কেশব ভারতীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম গ্রহণ ও সন্ন্যাস অবলম্বন অচিরে সম্পন্ন হইল ; তখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর মাত্র। (১৫০৯ খৃঃ)।

মন্ত্রগ্রহণ, সন্ন্যাস ও ভক্তি-মাধুর্য্য।

গয়া গমন অবধি তাঁহার ইতিহাস স্বতন্ত্ররূপ। এরূপ অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যজড়িত ছবি ইতিহাসে যুগ যুগান্তর পরে একবার প্রকটিত হইয়া থাকে। বক্তৃতার গুণে নহে,—রূপ দেখাইয়া চৈতন্যদেব পৃথিবী মোহিত করিলেন ;—শিশিরস্নিগ্ধকুসুমসৌরভ বক্তৃতা দ্বারা উপলব্ধি করাইতে হয় না ; চৈতন্যদেব স্বীয় ভক্তিময় অশ্রুসিক্ত মূর্ত্তিখানি দ্বারে দ্বারে দেখাইয়াছেন, যে দেখিয়াছে সেই ভুলিয়াছে ; সত্যবাই, লক্ষ্মীবাই—বেশ্যাদ্বয় তাঁহাকে প্রতারিত করিতে যাইয়া কাঁদিয়া পদে শরণ লইয়াছে ; ভীলপন্থ, নরোজী প্রভৃতি দস্যুগণ তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া কাঁদিয়া পায় ধরিয়াছে।

হরিনাম করিতে করিতে তাঁহার অঙ্গ পুলকিত ও চক্ষু মুদিত হইয়াছে, তখন সেই চক্ষু ফাটিয়া অতি মনোহর মুক্তাদাম পতিত হইয়াছে; তমালকে জড়াইয়া কাঁদিয়াছেন; কদম্ব বৃক্ষ দেখিয়া অজ্ঞান হইয়াছেন; বিষ্ণুর উদ্দেশে প্রদত্ত ভোগের অন্ন খাইতে চক্ষু জলে আর্দ্র হইয়াছে ও এক একটি অন্ন অমৃত জ্ঞানে খাইয়া পাগল হইয়াছেন; বেঙ্কট নগরের নিকট এক বৃক্ষতলে তিন দিন তিন রাত্রি পাগলের মত হরি হরি বলিয়া কাঁদিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, এই সময়ের মধ্যে আহার, নিদ্রা, বাহ্যজ্ঞান কিছুই ছিল না। যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি বিদ্বেষযুক্ত ভাব লইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেও তাঁহার অপূর্ব্ব গৌরবর্ণ কান্তিতে বিদ্যুৎলহরী, অশ্রুসিক্ত মুখখানিতে আশ্চর্য্য ভক্তির প্রভা দেখিয়া কাঁদিয়া 'হরি বোল' বলিয়াছে। সত্যই যমুনাভ্রমে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন; পুণানগরে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল—"তোমার হরি ঐ পুষ্করিণীতে আছেন।" তখন চৈতন্য জলে ঝাঁপ দিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই মূর্ত্তি ধ্রুব, প্রহ্লাদের প্রতিচ্ছায়া।

তাঁহার প্রতি লোকানুরাগ।

এই অপূর্ব্ব মনুষ্যটিকে দেখিয়া জাতীয় জীবনে যে বিস্ময় ও প্রেম জন্মিয়াছিল,—তাহা অলৌকিক উচ্ছ্বাসময়। শ্রীবাস-অঙ্গনে সারারাত্রি চৈতন্যদেব সঙ্গিগণ সহ হরিনাম কীর্ত্তনে উন্মত্ত ছিলেন, নিশি কিরূপে ভোর হইল তাহা তাঁহারা জানেন নাই। এই অপূর্ব্ব সম্মিলনের সুখ উপভোগের বস্তু, ভাষায় ব্যক্ত হওয়ার যোগ্য নহে,—"চমকিত হৈয়া সবে চারিদিগে চায়। নিশি পোহাইল বলি কাঁদে উভরায়॥ কোটী পুত্রশোকেও এত দুঃখ নহে। যে দুঃখে বৈষ্ণব সব অরুণেরে চাহে॥"—চৈ, ভা, মধ্য খণ্ড। অদ্বৈত গোঁসাই বলিয়াছিলেন,—"শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়। তবুও প্রভুর নিন্দা সহন না যায়॥" লোকবৃন্দের ভক্তি এতদূর হইয়াছিল,—"যাঁহা যাঁহা প্রভুর চরণ পড়য় চলিতে॥ সে মৃত্তিকা লয় লোকে গর্ত্ত হয় পথে॥"—চৈ, চ, মধ্য ১ম পঃ। চিরসঙ্গী গোবিন্দ-

ভৃত্য পুরীতে চৈতন্যদেবের নিকট হইতে পত্র লইয়া শান্তিপুর যাইতে আদিষ্ট হইলে, দুদিনের বিচ্ছেদ ভাবিয়াই ব্যাকুল হইয়াছিল। "এই বাক্য শুনি মোর চক্ষে বারি বহে। প্রভুর বিরহবাণ প্রাণে নাহি সহে॥"—(করচা)। হরি-দর্শনেচ্ছু অশ্রুপূর্ণ চক্ষুর্দ্বয় দ্বারা যেদিকে চাহিয়াছেন, সেইদিকে কুসুমগুচ্ছ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে,—"বিশাল নয়নে যেইদিগে যবে চায়। সেইদিগে নীলপদ্ম বরষিয়া যায়॥"—(গোবিন্দ দাসের করচা)। পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দ দাস—"যঁহি যঁহি তরল বিলোচন পড়ই। তঁহি তঁহি নীল উৎপল ভরই॥"—পদে এই মূর্ত্তির আবেশময় প্রতিবিম্ব দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণনা-গুলিতে কিছুমাত্র অতিরঞ্জন নাই। আমরা অলৌকিক শক্তির স্ফুরণ দেখি নাই, যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা উপমা ও অলঙ্কার ভিন্ন কথা কহিতে পারেন নাই, তাই পৃথিবীর ধর্ম্মকাব্যগুলি রূপকথার ন্যায় বোধ হয়।

বাঙ্গালী নবদ্বীপের ছেলেটির রূপে গুণে এখনও মোহিত রহিয়াছে, এখনও সেই স্মৃতিতে সদ্যোজাত প্রিয় বালকের মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে 'নবদ্বীপচন্দ্র', 'নগরবাসী', 'নদেবাসী', প্রভৃতি নাম দিয়া ৪০০ বৎসর পূর্ব্বের শিশুটির প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা জানাইয়া থাকে।

তাঁহার জীবনে ধর্ম্মনীতি।

পৌরুষ ও বিনয়।

ফুলের মৃদুতা মেয়েলী গুণ; "মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয়। পুষ্পসম কোমল কঠিনবজ্রময়॥"—* কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি। পৌরুষ ভিন্ন পুরুষ হয় না, পুষ্পভারানত ব্রততীজড়িত দেবদারুর ন্যায় মহাপুরুষগণ নানা কোমল গুণ বেষ্টিত হইয়া স্বীয় চরিত্রের অনমনীয়ত্ব সুদৃঢ় ভাবে স্থাপন করেন। চৈতন্যদেবের

* "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনী কুসুমাদপি।" উত্তরচরিত।

চরিত্রে কোমলত্ব ও পৌরুষ মিশিয়া গিয়াছিল। একদিক্ হইতে সেই চরিত্রের ভক্তি, প্রেম ও বিনয় ফুল্ল পুষ্পের ন্যায় মনোহর দেখায়, অন্যদিক্ হইতে সে চরিত্রের দৃঢ়ত্ব বিস্ময় উৎপাদন করে। একদিকে পাহাড়ের ন্যায় ঋজু বিরাট; অন্যদিকে অলিগুঞ্জরিত ফুলময়। কিন্তু তাঁহার বিনয়ও প্রকৃত বীররসে পুষ্ট—ইহার মৃদুতায়ও দৃঢ়তা আছে; গঙ্গার ঘাটে তিনি লোক-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত;—"তোমা সব সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই। এত বলি কারু পায় ধরে সেই ঠাঞি॥ নিঙ্গাড়য়ে বস্ত্র কারু করিয়া যতনে। ধুতি বস্ত্র তুলি কারে দেন ত আপনে॥ কুশ গঙ্গা মৃত্তিকা কাহার দেন করে। সাজি বহি কোন দিন চলে কার ঘরে॥"—(চৈ, ভা, মধ্য)। তিনি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণগণ শূদ্রজাতির উপর পরিচর্য্যার ভার দিয়া অনেক দিন হস্তের পুণ্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন,—তাই এ বিনয় বীরের যোগ্য।

তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য।

কিন্তু এই মৃদু পুষ্প-সম ব্যক্তিও কোন কোন সময় বজ্রবৎ কাঠিন্য দেখাইতেন। তাঁহার নির্ম্মল প্রীতিতে যদি কেহ বিলাসের পঙ্ক মিশাইতে যাইত, তখন এই মধুর প্রেমবিগলিত ছবি একটি উজ্জ্বল বজ্রময় মূর্ত্তিতে পরিণত হইত। জগদানন্দ একটি তূলার বালিশ তাঁহার জন্য রাখিয়াছিল, তজ্জন্য "জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে" বলিয়া তিনি তাহাকে অশেষরূপ ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। এক ব্যক্তি এক হাঁড়ি সুগন্ধি তৈল তাঁহাকে উপঢৌকন দিয়াছিল, প্রভুর আদেশে সেই তৈলহাঁড়ি আঙ্গিনায় ভগ্ন করিতে হইল। অগ্রদ্বীপবাসী গোবিন্দঘোষ প্রভুর মুখশুদ্ধির জন্য একার্দ্ধ হরিতকী দিয়া অপরার্দ্ধ পরদিবসের জন্য রাখিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সঞ্চয়বুদ্ধি আছে, এই বলিয়া তিনি তাহাকে বৈরাগ্য-ধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিলেন। তাহার শত অনুনয় বিনয় বিফল হইল। ছোট হরিদাস শিখি-মাহিতির ভগিনী মাধবীর নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছিল, "প্রভু কহে সন্ন্যাসী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥"—(চৈ, চ, অন্তখণ্ড)। চৈতন্য

তাহার মুখ আর দেখেন নাই। সনাতন ধনীর পুত্র, তিন টাকা মূল্যের একখানা ভোটকম্বল গায় দিয়া আসিয়াছিল, কৌপিনসার চৈতন্যদেব নবীন সন্ন্যাসীর সঙ্গে নানাপ্রকার সদালাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু "ভোট কম্বলের পানে প্রভু চাহে বারে বার" সুতরাং তাহার ভোটকম্বল ত্যাগ করিতে হইল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সংকল্প যে দিন মুখ হইতে বহির্গত হইল, সে দিন সমস্ত নবদ্বীপবাসী শোকোন্মত্ত ভাবে স্নেহের বাহুদ্বারা তাঁহাকে জড়াইয়া রাখিতে চাহিল, তাঁহার শোকক্ষিপ্ত মাতা দ্বাদশ দিন উপবাস করিলেন, "দ্বাদশ উপাসে আই করিলা ভোজন (চৈ, ভা, মধ্য)। নির্ম্মম সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিতে যাওয়ার সময় শত শত লোক তাঁহার সঙ্গে যাইতে পাগল-প্রায়, কাহারও অশ্রুজল লক্ষ্য না করিয়া একমাত্র ভৃত্যসঙ্গে চৈতন্য চলিয়া গেলেন। রামানন্দরায়ের বাড়ীতে বিষ্ণু-মন্দির পরিষ্কার করিতে বহুবিধ লোক নিযুক্ত; কিন্তু শেষে দেখা গেল উপবাস-ক্ষীণ কৃষ্ণবিরহে শীর্ণদেহ চৈতন্যের আহৃত বোঝাই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এই কষ্টসহিষ্ণু কৌপিনধারী, সত্যবাক্য, বিষয়নিস্পৃহ ব্রাহ্মণবালক সেই প্রাচীন ঋষিগণেরই বংশধর, যুগে যুগে সেই ব্রহ্মনিষ্ঠাপূর্ণ ঋষিবংশোদ্ভব মহাজনগণ প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান শিখাইবার জন্য এই ভাবে হিন্দুসমাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

এরূপ সময় হয়, যখন আরাধ্য ও আরাধকে প্রভেদ থাকে না; ভাগবতে তদবস্থায় গোপীগণ নিজকে শ্রীকৃষ্ণ ভ্রম করিতেছেন; গোপী-গণ,—"সকলেই কৃষ্ণাত্মিকা হইয়া পরস্পর 'আমিই এই কৃষ্ণ', এই প্রকার কহিতে লাগিলেন" (ভাগবত ১১শ স্কন্ধ, ৩০ অঃ, ৩ শ্লোক)। জয়দেবও রাধার এই অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, "মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা। মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা॥" বিদ্যাপতির গীতেও সেই কথার পুনরুক্তি আছে "অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে, সুন্দরী ভেল মাধাই॥" ইহাই যোগীর "সোঽহং", খ্রীষ্টের "আমি এবং আমার পিতা এক।" এইরূপ

সোঽহং।

মুহূর্ত্ত চৈতন্যদেবের জীবনেও হইত বলিয়া বর্ণিত আছে। যদি ফুল্লপদ্মে ভ্রমর পতিত হইলে হর্ষ-উচ্ছ্বসিত পদ্ম স্বীয় দল মুদিত করিয়া ভ্রমরকে সম্ভোগ করে, তখন অন্তঃপ্রবিষ্ট ভ্রমরযুক্ত পদ্মটি যেরূপ পূর্ণ আনন্দের চিত্র হইয়া দাঁড়ায়, চৈতন্যপ্রভুও সেইরূপ যাঁহাকে খুঁজিতেন, তাঁহাকে সময়ে সময়ে হৃদয়ে পাইয়া মুদিত হইতেন, তখন তাঁহার ছবি অমানুষী প্রফুল্লভাব ধারণ করিয়াছে—বাঞ্ছিতের আলিঙ্গনে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া তখন "মুঞি সেই মুঞি সেই কহি কহি হাসে।"—(চৈ, ভা, মধ্য)। সেই সময় তাঁহার মূর্ত্তি সাধারণ মনুষ্য হইতে স্বতন্ত্র হইত, তখন তাঁহার শরীরের দিব্যপ্রভা দর্শনে বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্যও তুলসী-চন্দন-দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়াছেন!

ঈশ্বরত্ব আরোপে বিরক্তি ও বিনয়।

কিন্তু ঐ ভাব অল্পকালব্যাপক; তদবসানে চৈতন্যদেবের বাহ্যজ্ঞান হইয়াছে, তখন তাঁহাকে যে ঈশ্বর সম্বোধন করিয়াছে, তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন। দাক্ষিণাত্য হইতে উড়িষ্যায় প্রত্যাগত হইলে বাসুদেব সার্ব্বভৌম গললগ্নীকৃতবাস ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ঈশ্বরজ্ঞানে তাঁহার বন্দনা পাঠ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "প্রভু কহে সার্ব্বভৌম আর কথা কহ। আতাল পাতাল কথা কেন বা বলহ॥"—(গোবিন্দের করচা)। রামানন্দ রায় তাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলাতে চৈতন্যদেব সবিনয়ে উত্তর করিলেন, "প্রভু কহে আমি মানুষ আশ্রমে সন্ন্যাসী। কায় মন বাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি॥ শুক্লবস্ত্রে মসী বিন্দু যৈছে না লুকায়। সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়॥ * * * পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস। সুরাবিন্দুপাতে কেহ না করে পরশ॥"—(চৈ, চ, অন্ত্যখণ্ড)। এক গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বিষ্ণুমন্দিরে তাঁহার পাদোদক পান করিয়াছিল, প্রভুর অসন্তোষহেতু সেই ব্রাহ্মণকে অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল। চণ্ডীপুরে ঈশ্বরভারতী তাঁহাকে 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া সম্বোধন করাতে তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীবাস-

অঙ্গনে হরির নামে সংকীর্ত্তন না করিয়া 'চৈতন্যজয়' বলিয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করায় তিনি বিরক্ত হইয়া তাহা নিবারিত করিয়া দিলেন। বাহুল্য ভয়ে আর উদাহরণ দিব না, এরূপ অনেক স্থলেই পাওয়া যাইবে। তাঁহার মত বিনয়ী জগতে দুর্লভ, তিনি অহঙ্কারীকে বিনয়-দ্বারা পরাজয় করিয়াছেন ; বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সঙ্গে প্রথম দর্শনের পর বৃদ্ধ অধ্যাপক চৈতন্যদেবকে অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করার জন্য ভৎ'সনা করিলেন এবং প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন এ বয়সে তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার নাই ; তদুত্তরে—"প্রভু কহে শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়। সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিও নিশ্চয়॥ কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া। বাহির হইনু শিখা সূত্র মুড়াইয়া॥ সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি। কৃপাকর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি॥"—(চৈ, ভা, মধ্য)। তুঙ্গভদ্রাবাসী ঢুণ্ডিরামতীর্থ তাঁহার সঙ্গে বিচার করিতে চাহিলে চৈতন্যদেব—"মূরখ সন্ন্যাসী মুই কিছু নাহি জানি" বলিয়া তাঁহাকে 'জয়-পত্র' লিখিয়া দিতে চাহিলেন। চণ্ডীপুরে ঈশ্বরভারতীকে এবং রামেশ্বর-তীর্থে এক যোগী পণ্ডিতকেও তিনি এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন ; কিন্তু এই সব পণ্ডিতগণ সকলেই তাঁহার সুধাকণ্ঠে হরির নাম শুনিয়া, তাঁহার ব্যাকুল উন্মত্ততা দেখিয়া করজোড়ে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। আর যেখানে তিনি ইচ্ছাক্রমে তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন, সেখানে অবলীলাক্রমে সমস্ত দর্শন ও ন্যায়ের যুক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া সর্ব্বশেষ উন্মত্তবৎ হরিনামের কথা কহিতে কহিতে উপদেশ শেষ করিতেন, তখন কদম্বকোরকের ন্যায় অঙ্গ পুলকিত হইত ও হরিনাম বলিতে বলিতে কাঁদিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। বড় বড় পণ্ডিত তাঁহার অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান, প্রতিভা ও যুক্তির প্রবল মুখে যখন তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতে উদ্যত, তখন সহসা বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে তাঁহারা অভিনব সৌন্দর্য্যজড়িত ভক্তিময় এই দেবরূপ দেখিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া কৃতার্থ হইতেন, লজ্জা বোধ করিতেন না। চৈতন্যদেব ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ১৮ বৎসর নীলাচলে (উড়িষ্যায়) বাস করেন, ৬ বৎসর

দাক্ষিণাত্য, বৃন্দাবন, গৌড় প্রভৃতি স্থানে গমনাগমনে ব্যয় করেন। ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে (১৫৩৩ খৃঃ আষাঢ়ের শুক্ল পক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে, রবিবার দিনে) তাঁহার অপূর্ব্ব লীলার অবসান হয়।

লীলাবসান।

অদ্য ৪০০ বৎসর পরে পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিমান ও স্পর্দ্ধা সহকারে অগ্রসর নবযুবক সমাজে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করিতে নিজকে অসমর্থ ও হীনবল মনে করিতেছেন, সেই সময়ের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-তনয় সমাজের মস্তকে ও চরণে—ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে সেই সমবেদনাসূচক প্রীতি জাগাইয়া দিয়াছিলেন। প্রেমের অভয় পতাকা উড্ডীন করিয়া "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ" বলিয়া বেড়াইয়াছিলেন। ইতরজাতির অন্ন গ্রহণ করিলে সামাজিক খর্ব্বতা হউক কিন্তু হরিভক্তির হানি হয় না,— "প্রভু বলে যে জন ডোমের অন্ন খায়। কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্ব্বথায়॥"—(চৈ, ভা, অন্ত্যখণ্ড)। "মুচি যদি ভক্তিসহ ডাকে কৃষ্ণধনে। কোটী নমস্কার করি তাহার চরণে॥"—(গোবিন্দের করচা)। দেবরূপী মনুষ্য মনুষ্যজাতির সম্মান বুঝিয়াছিলেন এবং শ্রেণীবিশেষে সমস্ত মনুষ্যজাতির প্রাপ্য মর্য্যাদা সীমাবদ্ধ নহে, একথা বিনয় সহকারে কিন্তু অটল বীরত্বের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন।

সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব।

রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পৌরাণিক ব্যক্তিগণ ব্যতীত আধুনিক কালের মনুষ্যগণেরও জীবনচরিত লিপিবদ্ধ হইতে পারে, ইহা সে সময় হিন্দুসমাজের বিশ্বাসের কথা ছিল না। পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় লোকবৃন্দ ব্রাহ্মণ-মুখ-নিঃসৃত শ্লোক বলা অভ্যাস করিয়াছিল কিন্তু নিজের নৈসর্গিক বুলি ভুলিয়া গিয়াছিল। চৈতন্যদেবের প্রভাবে শ্লোকপরম্পরানিয়ন্ত্রিত যন্ত্রবৎ মনুষ্য-জীবনে এক অভিনব প্রাণশক্তির সঞ্চার হয়; পুরুষোচিত সরলতা ও উদ্যম সহকারে মনুষ্যচরিত্র পুনরায়

জীবনী-লেখার সূত্রপাত ও বিকাশ।

গঠিত হয়, তাই জীবন-চরিত-সাহিত্য এই সময়ে বঙ্গভাষার এক নূতন অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দেয়। নরহরির ন্যায় কত ব্রাহ্মণ অসংখ্য প্রণি-পাত সহকারে নরোত্তমের ন্যায় শূদ্রের জীবন-আখ্যান বর্ণন করিয়া ধন্য হইয়াছেন ;—ইহা বঙ্গসমাজের নব সামগ্রী। সাহিত্য-মুকুরে প্রতি-বিম্বিত তাৎকালিক সমাজে চৈতন্যদেবের চরিত্রের এক অদ্বিতীয় সৌন্দর্য্যের রশ্মিপাত দৃষ্ট হয়। সাহিত্য এবং সমাজের উন্নতির কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যাইবে, তিনি ধর্ম্মজগতে চিরকালের জন্য এক অপূর্ব্ব দ্রব্য রাখিয়া গিয়াছেন,—যাহার অফুরন্ত সুধা যুগ যুগান্তরের জন্য হিন্দুর উপভোগার্থ সঞ্চিত থাকিবে, উহা তাঁহার চিরস্মারক নাম-মাহাত্ম্য প্রচার, কলিযুগের নব গায়ত্রী —

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

উৎকলকবি সদানন্দ চৈতন্যপ্রভুকে "হরিনামমূর্ত্তি" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন,—কেমন সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর নাম !

পদাবলী সাহিত্য।

আমরা পুনর্ব্বার পদাবলী সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি। বলা নিষ্প্রয়োজন, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ব্যতীত সকল পদকর্ত্তাই চৈতন্যপ্রভুর সমকালিক অথবা পরবর্ত্তী। আমরা পদকল্পতরু, রসমঞ্জরী, গীতচিন্তামণি, পদকল্পলতিকা প্রভৃতি সংগ্রহপুস্তক অবলম্বন করিয়া পদকর্ত্তাদিগের একটী বর্ণানুক্রমিক তালিকা নিম্নে প্রদান করিতেছি,—

নাম।		পদসংখ্যা।
১। অনন্ত দাস	... ...	৪৭
২। অনন্ত আচার্য্য	... ...	২

	নাম।				পদসংখ্যা।
৩।	আকবর আলি	...	...	...	১
৪।	আত্মারাম দাস	...	...	...	৯
৫।	আনন্দ দাস	...	...	...	৩
৬।	উদ্ধব দাস	...	...	...	১১০
৭।	কবির	...	...	...	১
৮।	কবিরঞ্জন	...	...	...	৯
৯।	কমরালী	...	...	...	১
১০।	কানাই দাস	...	...	...	৪
১১।	কানু দাস	...	...	...	১৪
১২।	কামদেব	...	...	...	১
১৩।	কালীকিশোর	...	...	...	১৭৯
১৪।	কৃষ্ণকান্ত দাস	...	...	...	২৯
১৫।	কৃষ্ণদাস	...	...	...	* ২২
১৬।	কৃষ্ণপ্রমোদ	...	...	...	২
১৭।	কৃষ্ণপ্রসাদ	...	...	...	৫
১৮।	গতিগোবিন্দ	...	...	...	১
১৯।	গদাধর	...	...	...	৩
২০।	গিরিধর	...	...	...	১
২১।	গুপ্ত দাস	...	...	...	১
২২।	গোকুলানন্দ	...	...	...	১
২৩।	গোকুল দাস	...	...	...	১
২৪।	গোপাল দাস	...	...	...	৬
২৫।	গোপাল ভট্ট	...	...	...	২
২৬।	গোপীকান্ত	...	...	...	১
২৭।	গোপীরমণ	...	...	...	১
২৮।	গোবর্দ্ধন দাস	...	...	...	১৭
২৯।	গোবিন্দ দাস	...	...	...	৪৫৮
৩০।	গোবিন্দ ঘোষ	...	...	...	১২

	নাম।				পদসংখ্যা।
৩১।	গৌরমোহন	...	...	...	২
৩২।	গৌরদাস	...	...	...	২
৩৩।	গৌরসুন্দর দাস	...	...	...	৩
৩৪।	গৌরীদাস	...	...	...	২
৩৫।	ঘনরাম দাস	...	...	...	১৪
৩৬।	ঘনশ্যাম দাস	...	...	...	৩৫
৩৭।	চণ্ডীদাস	...	...	...	প্রায় ৯০০
৩৮।	চন্দ্রশেখর	...	...	...	৩
৩৯।	চম্পতি ঠাকুর	...	...	...	১৩
৪০।	চূড়ামণি দাস	...	...	...	১
৪১।	চৈতন্য দাস	...	...	...	১৫
৪২।	জগদানন্দ দাস	...	...	...	৫
৪৩।	জগন্নাথ দাস	...	...	...	৯
৪৪।	জগমোহন দাস	...	...	...	২
৪৫।	জয়কৃষ্ণ দাস	...	...	...	১
৪৬।	জ্ঞানদাস	...	...	...	১৯৪
৪৭।	জ্ঞানহরি দাস	...	...	...	২
৪৮।	তুলসীদাস	...	...	...	১
৪৯।	দলপতি	...	...	...	১
৫০।	দীনঘোষ	...	...	...	১
৫১।	দীনহীন দাস	...	...	...	৩
৫২।	দুঃখিনী	...	...	...	২
৫৩।	দুঃখীকৃষ্ণ দাস	...	...	...	৪
৫৪।	দৈবকীনন্দন দাস	...	...	...	৪
৫৫।	ধরণীদাস	...	...	...	৩
৫৬।	নটবর	...	...	...	১
৫৭।	নন্দন দাস	...	...	...	১
৫৮।	নন্দ (দ্বিজ)	...	...	...	১

	নাম।				পদসংখ্যা।
৫৯।	নরসিংহ দাস	...	...	...	১
৬০।	নরহরি দাস	...	...	...	২২
৬১।	নরোত্তম দাস	...	...	...	৬১
৬২।	নবকান্ত দাস	...	...	...	১
৬৩।	নবচন্দ্র দাস	...	...	...	২
৬৪।	নবনারায়ণ ভূপতি		...	...	১
৬৫।	নয়নানন্দ দাস	...	...	...	২২
৬৬।	নসির মামুদ	...	...	...	১
৬৭।	নৃপতিসিংহ	...	...	...	১
৬৮।	নৃসিংহ দেব	...	...	...	৪
৬৯।	পরমানন্দ দাস	...	...	...	১২
৭০।	পরমেশ্বর দাস	...	...	...	১
৭১।	পীতাম্বর দাস	...	...	...	
৭২।	পুরুষোত্তম	...	...	...	৯
৭৩।	প্রতাপনারায়ণ	...	...	...	১
৭৪।	প্রমোদ দাস	...	...	...	৫
৭৫।	প্রসাদ দাস	...	...	...	১
৭৬।	প্রেমদাস	...	...	...	৩১
৭৭।	প্রেমানন্দ দাস	...	...	...	৫
৭৮।	ফকির হবির	...	...	...	১
৭৯।	ফতন	...	...	...	১
৮০।	বলদেব *	...	...	...	১
৮১।	বলরাম দাস *	...	...	...	১৩১
৮২।	বলাই দাস *	...	...	...	৩
৮৩।	বল্লভ দাস	...	...	...	২৬
৮৪।	বংশীবদন	...	...	...	৩৮
৮৫।	বসন্তরায়	...	...	...	৩৩

* চিহ্নিত নামগুলি বর্গীয় 'ব', অবশিষ্ট অন্তঃস্থ 'ব' এর অন্তর্গত।

নাম।				পদসংখ্যা।
৮৬। বাসুদেব ঘোষ	...	...	...	১৩৪
৮৭। বিজয়ানন্দ দাস	...	...	...	১
৮৮। বিদ্যাপতি *	...	...	...	৮০০
৮৯। বিন্দুদাস	...	...	...	৪
৯০। বিপ্রদাস	...	...	...	৬
৯১। বিপ্রদাস ঘোষ	...	...	...	১৬১
৯২। বিশ্বম্ভর দাস	...	...	...	২
৯৩। বীরচন্দ্র কর	...	...	...	১
৯৪। বীরনারায়ণ	...	...	...	২
৯৫। বীরবল্লভ দাস	...	...	...	১
৯৬। বীর হাম্বীর	...	...	...	২
৯৭। বৃন্দাবনদাস	...	...	...	৩০
৯৮। বৈষ্ণবদাস	...	...	...	২৭
৯৯। ব্রজানন্দ	...	...	...	১
১০০। ভূপতিনাথ	...	...	...	৭
১০১। ভুবন দাস	...	...	...	২
১০২। মথুর দাস	...	...	...	১
১০৩। মধুসূদন	...	...	...	৫
১০৪। মহেশ বসু	...	...	...	১
১০৫। মনোহর দাস	...	...	...	৬
১০৬। মাধব ঘোষ	...	...	...	৯
১০৭। মাধব দাস	...	...	...	৬৫
১০৮। মাধবাচার্য্য	...	...	...	৫
১০৯। মাধবী দাস	...	...	..	১৭
১১০। মাধো	...	...	...	৩
১১১। মুরারি গুপ্ত	...	...	...	৫
১১২। মুরারি দাস	...	...	...	১

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাপতির পদের যে বিপুল সংগ্রহ করিতেছেন, তাহাতে মিথিলা ও বাঙ্গালা উভয় স্থান হইতে প্রায় ৮০০ পদ সংগৃহীত হইয়াছে।

	নাম।				পদসংখ্যা।
১১৩।	মোহন দাস	...	...	...	২৭
১১৪।	মোহনী দাস	...	...	...	৪
১১৫।	যদুনন্দন	...	...	...	৯৫
১১৬।	যদুনাথ দাস	...	...	...	১৭
১১৭।	যদুপতি	...	...	...	১
১১৮।	যশোরাজখান	...	...	...	১
১১৯।	যাদবেন্দ্র	...	...	...	৩
১২০।	রঘুনাথ	...	...	...	৩
১২১।	রসময় দাস	...	...	...	২
১২২।	রসময়ী দাসী	...	...	...	১
১২৩।	রসিক দাস	...	...	...	৩
১২৪।	রামকান্ত	...	...	...	১
১২৫।	রামচন্দ্র দাস	...	...	...	৪
১২৬।	রামদাস	...	...	...	২
১২৭।	রাম রায়	...	...	...	১
১২৮।	রামী	...	...	...	২
১২৯।	রাধাসিংহ ভূপতি		...	...	৪
১৩০।	রাধাবল্লভ	...	...	...	২৯
১৩১।	রাধামাধব	...	...	...	১
১৩২।	রাধামোহন	...	...	...	১৭৫
১৩৩।	রামানন্দ	...	...	...	১৫
১৩৪।	রামানন্দ দাস	...	...	...	১
১৩৫।	রামানন্দ বসু	...	...	...	৯
১৩৬।	রূপনারায়ণ	...	...	...	৩
১৩৭।	লক্ষ্মীকান্ত দাস	...	...	...	১
১৩৮।	লোচনদাস	...	...	...	৩০
১৩৯।	শঙ্কর দাস	...	...	...	৪
১৪০।	শচীনন্দন দাস	...	...	...	৩
১৪১।	শশিশেখর	...	...	...	৩

	নাম।	পদসংখ্যা।
১৪২।	শ্যামচাঁদ দাস	১
১৪৩।	শ্যাম দাস	৩
১৪৪।	শ্যামানন্দ	৭
১৪৫।	শিবরায়	১
১৪৬।	শিবরাম দাস	২৫
১৪৭।	শিবাই দাস	৭
১৪৮।	শিবানন্দ	৪
১৪৯।	শিবাসহচরী	১
১৫০।	শ্রীনিবাস	৩
১৫১।	শ্রীনিবাসাচার্য্য	২
১৫২।	শেখর রায়	১৭৬
১৫৩।	সদানন্দ	১
১৫৪।	সালবেগ	১
১৫৫।	সিংহভূপতি	৭
১৫৬।	সুন্দর দাস	২
১৫৭।	সুবল	১
১৫৮।	সেখ জালাল	১
১৫৯।	সেখ ভিক	১
১৬০।	সেখলাল	১
১৬১।	সৈয়দমর্ত্তুজা	১
১৬২।	হরিদাস	৭
১৬৩।	হরিবল্লভ	৪
১৬৪।	হরেকৃষ্ণ দাস	২
১৬৫।	হরেরাম দাস	২

এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে, কাষ্ঠ-মলাটে আবদ্ধ আরও বিস্তর কবিতা অজ্ঞাত অবস্থায় আছে; তাহাদের একটা সদ্গতি হইলে অনেক লুপ্ত কবির পদ পাওয়া যাইবে, এরূপ আশা করা যায়। ইহা ছাড়া প্রদত্ত

তালিকায় এক কবির নামে স্থানে স্থানে ২, ৩ কি ততোধিক কবির পদ পরিচিত হইয়াছে,—নিম্নলিখিত "গোবিন্দগণ" বিখ্যাত পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাসের নামের আড়ালে পড়িয়া যাইতে পারেন *; দাসশব্দের সাধারণতন্ত্রে স্বাতন্ত্র্য-সূচক উপাধিগুলি লুপ্ত হওয়াতে পদদ্বারা তাঁহাদের পরিচয়ের পথ রুদ্ধ হইয়াছে,—

বিভিন্ন গোবিন্দ দাস।

(১) গোবিন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী—ইনি চৈতন্যের অনুচর ও নবদ্বীপবাসী। (২) শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র মালিহাটী নিবাসী গোবিন্দ আচার্য্য। ইনি "গতিগোবিন্দ" নামে পরিচিত; ("জয় জয় শ্রীগতিগোবিন্দ রসময়। জয় তছু ভকত সমাজ॥" পদকল্পতরু)। (৩) গিরীশ্বর-দত্তের পুত্র গোবিন্দদত্ত। (৪) কুলীনগ্রামবাসী গোবিন্দ ঘোষ; ইনি মধ্যে মধ্যে 'দাস' উপাধি গ্রহণ না করিয়া 'ঘোষ' সংজ্ঞা দ্বারাও ভণিতা দিয়াছেন; ("গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই। যা সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি॥"—(চৈ, চ)। (৫) কাশীশ্বর ব্রহ্মচারীর শিষ্য উৎকলবাসী গোবিন্দ। (৬) প্রসিদ্ধ করচা-লেখক গোবিন্দ কর্ম্মকার। (৭) গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, নিবাস বোরাকুলি—মুরশিদাবাদ, শ্রীনিবাস-শিষ্য। (৮) মৈথিল কবি গোবিন্দ দাস। †

বিভিন্ন বলরাম দাস এবং অপরাপর কবি।

বলরামদাসও ৪।৫টী স্বতন্ত্র ব্যক্তির নাম বলিয়া বোধ হয়।

(১) মহাপ্রভুর দক্ষিণাত্য হইতে আগমন সময় পুরীতে এক বলরামদাসকে শিঙ্গা বাজাইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে দেখা যায়।

---

* পূর্ব্বকালে প্রায় প্রত্যেক বৈষ্ণবই পদ রচনা করিতেন; সুতরাং ইঁহারা সকলেই পদকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ না করিলেও পদকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

† ইঁহার সৌভাগ্য যে, ইনি বর্ত্তমান দ্বারবঙ্গাধিপের বংশীয়। আমরা বিদ্যাপতিকে যেরূপ বাঙ্গলাদেশে বাঙ্গালা ভাষায় গ্রহণ করিয়াছি, সেইরূপ মিথিলায়ও বঙ্গীয় বহু বৈষ্ণব কবির পদ প্রচলিত হইয়াছে। এই প্রচলনের সুবিধার জন্য সেই সব কবির পদে মৈথিল শব্দ অনেক স্থলে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গীয় গোবিন্দ দাস কবির পদ কতক কতক মিথিলায় প্রচলিত আছে। মৈথিল কবি গোবিন্দ দাসের উপরে সেই সমস্ত আরোপ করিয়া তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কবির সিংহাসন দিতে পারিলে বর্ত্তমান রাজবংশের অনুগ্রহ লাভ করার কল্পনা মনে উদিত হওয়া সহজ। যে বঙ্গীয় সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ দাসের পদের গৌরব 'ভক্তমাল,' 'নরোত্তম চরিত,' 'ভক্তি রত্নাকর,' 'প্রেমবিলাস,' প্রভৃতি বহুবিধ বৈষ্ণব ঐতিহাসিক গ্রন্থে বিবৃত রহিয়াছে এবং যাঁহার নির্ম্মল যশোভাতি সমস্ত বৈষ্ণব পদসংগ্রহ গ্রন্থে সমুদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই মহাকবির যশ ক্ষুণ্ণ করিয়া মৈথিল রাজবংশীয়

("রামশিঙ্গা বাজাইতে বড়ই পণ্ডিত। বলরাম দাস আসে হয়ে পুলকিত॥"—গোবিন্দের করচা)। বৈষ্ণব বন্দনায় তিনজন বলরামের নাম উল্লিখিত আছে। (২) "সংগীতকারক বন্দো বলরামদাস। নিত্যানন্দধর্ম্মে যার সুদৃঢ় বিশ্বাস॥" (৩) "কানাইখুটিয়া বন্দো বিশ্বের প্রচার। জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যার॥"* বৈষ্ণব বন্দনা। (৪) "বন্দো উড়িয়া বলরামদাস মহাশয়। জগন্নাথ, বলরাম বস যার হয়॥" (৫) প্রেমবিলাসরচক নিত্যানন্দ দাসও "বলরাম" নামে পরিচিত। (৬) নরোত্তমবিলাসে 'পূজারি বলরাম' নামধেয় নরোত্তম ঠাকুরের একজন শিষ্য দেখা যায়। (৭) উক্ত পুস্তকে 'বলরাম কবিরাজ' নামক অপর একটী 'বিজ্ঞ ব্যক্তি'র উল্লেখ আছে। (৮) পদকল্পতরুর ভূমিকায়—"কবিনৃপবংশজ ভুবনবিদিত যশ জয় ঘনশ্যাম বলরাম" পাওয়া যায়। (৯) অদ্বৈতাচার্য্যের এক পুত্রের নাম বলরাম ছিল। (১০) প্রেমবিলাসে রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য "কবিপতি বলরাম" নামে আর একজন বলরামকে পাওয়া যায়, এবং উক্ত পুস্তকেই (১১) শ্রীনিবাস শাখায় অপর এক বলরামের নাম আছে। এই বলরাম সম্প্রদায়ের ১২ জনই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয় না। সম্প্রতি শিশির বাবু স্বীয়কৃত সুন্দর সুন্দর পদে 'বলরাম দাস' ভণিতা দেওয়াতে এই বলরাম সমস্যা কালে আরও জটিল হইবে বলিয়া বোধ হয়।

(১) যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী † ও (২) যদুনন্দন দাস উভয়েই পদকর্ত্তা সুলেখক। চক্রবর্ত্তী অনেক স্থলে 'দাস' সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন, ইঁহার বাড়ী কাঁটোয়া, ইনি গদাধরের শিষ্য ও চৈতন্য প্রভুর চরিতলেখক,। "যদুনন্দনের চেষ্টা পরম আশ্চর্য্য!—দীনপ্রতি চেষ্টা যৈছে না কহিলে নয়। বৈষ্ণব মণ্ডলে যার প্রশংসাতিশয়॥ যে রচিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত। দ্রবে দারু পাষাণাদি শুনি যার গীত॥"—ভক্তিরত্নাকর।

(১) শ্রীখণ্ড নিবাসী নরহরি সরকার চৈতন্য প্রভুর পার্শ্বচর ও বৈষ্ণব সমাজে একজন পরিচিত পদকর্ত্তা। (২) জগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রসিদ্ধ চরিত-লেখক, ইনিও একজন পদকর্ত্তা—ইঁহার দ্বিতীয় নাম ঘনশ্যাম।

এইরূপ অনেক স্থলেই বহুবিধ নাম পাওয়া যায়, অথচ এক নাম দ্বারাই পদকর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এ বিষয়ে যাঁহারা তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত, তাঁহারা সুবিচার দ্বারা মৃত কবিগণের আত্মার সম্যক্ তৃপ্তি সাধন করিতে পারিবেন কি না, সন্দেহস্থল। সুতরাং প্রদত্ত কবি-তালিকা

কবিকে মিথ্যা গৌরবে উজ্জ্বল করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এই মেকি চলিবে না।

* কেহ কেহ বলেন, এই বলরাম মানুষ নহেন; "জগন্নাথ বলরাম" তাহার জীবিকা সংস্থান করিয়াছিলেন ও তিনি তাহাদিগকে বাৎসল্য ভাবে সেবা করিতেন বলিয়া "দুই পুত্র" কহা হইয়াছে।

† যদুনন্দন চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীর নাম ছিল লক্ষ্মী, ইঁহার দুই কন্যা শ্রীমতী ও নারায়ণী দেবীকে নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র বিবাহ করেন।

বিশুদ্ধ নহে ; উহা এখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই ; লুপ্ত কবিগণের উদ্ধার-কার্য্য শেষ হইতে বিলম্ব আছে।

শাস্ত্রীমহাশয় তাঁহার তালিকায় চণ্ডীদাসের পদ সংখ্যা ১১০ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সংস্করণে চণ্ডীদাসের ১৯৬টি পদ প্রদত্ত হইয়াছে। "বীরভূমি" সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায়, বি এ, ও 'বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক' সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের চেষ্টায় চণ্ডীদাসের আরও অনেকগুলি নূতন পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই নূতন পদগুলি লইয়া চণ্ডীদাসের পদসংখ্যা প্রায় ৯০০ হইবে।

বৈষ্ণবযুগের চরিত-শাখা-সাহিত্য অতি সুবিস্তার। বড় বড় মহাজনগণের জীবন বর্ণনায় প্রাসঙ্গিক নানা কবির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে ; এই ঐতিহাসিক অরণ্যে প্রবেশ করিয়া প্রকৃততত্ত্ব সংগ্রহ করা অতি কঠিন কার্য্য। শুধু 'দাস' শব্দের বাহুল্য দ্বারা কাঠিন্য বৃদ্ধি হইয়াছে, এমন নহে, কেহ কেহ বিদ্যাপতিকে "বিদ্যাবল্লভ" লিখিয়াছেন।* শ্যামানন্দ পুরী নিজকে "দুঃখিনী" ও শিবানন্দ আপনাকে "শিবাসহচরী" নামে ভণিতা দিয়াছেন।† সুতরাং স্ত্রীলোকের নাম পাইলেই আমরা স্ত্রীলোকশ্রেণীভুক্ত করিয়া পদকর্ত্তারূপে পরিচয় দিতে সাহসী নহি। রসময়ী দাসী, মাধবী দাসী ও রামীর ভণিতাযুক্ত পদগুলি স্ত্রীলোকের পদ বলিয়া আপাততঃ গ্রহণ করা গেল। আমরা তালিকাটিতে ১১ জন মুসলমান কবির নাম ও পদের উল্লেখ করিয়াছি।‡

তালিকায় ভ্রম সম্ভাবনা।

স্ত্রীকবি ও মুসলমান কবিগণ।

* গীতিচিন্তামণি দেখুন।

† পদকল্পলতিকা দেখুন।

‡ প্রদত্ত তালিকায় ৩, ৭, ৯, ৬৬, ৭৮, ৭৯, ১৫৪, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, সংখ্যক নাম দেখুন।

লুপ্ত জীবনী।

পদকর্ত্তৃগণের জীবন-চরিত সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় নাই; বড় বড় কবিগণের জীবনের অতি যৎকিঞ্চিৎ বিবরণই পাওয়া যায়; কবিগণের সুন্দর পদগুলি আছে, প্রকৃতির বাগানে কুসুমরাশির ন্যায় তাহারা অসংখ্য; মানুষের হাতের সুন্দর রচনা ও তরুর ফুল্ল ফুল একই নিয়মে উৎপাদিত। বৃক্ষ ও মনুষ্য উপলক্ষ মাত্র;—আমরা প্রকৃত কর্ত্তাকে না পাইয়া উপলক্ষে কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়া থাকি; আপাততঃ এইরূপ দর্শনের সহায়তা গ্রহণ করিয়া কবিগণের জীবনী না পাওয়ার ক্ষোভজনিত দুঃখ হইতে সান্ত্বনা লাভ করা যাউক।

গোবিন্দ কবিরাজ।

এস্থলে আমরা প্রসিদ্ধ কয়েকজন পদকর্ত্তা সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ দিতেছি। এই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ চৈতন্য-সহচর পরম ভাগবত চিরঞ্জীব সেনের পুত্র ও শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক এবং কবি দামোদরের দৌহিত্র। চিরঞ্জীব সেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের শিষ্য, তাঁহার বাড়ী কুমারনগর ছিল; কিন্তু তিনি দামোদরের কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া শ্রীখণ্ডে আসিয়া বাস করেন। উত্তরকালে তাঁহার পুত্রদ্বয় পুনরায় কুমার-নগরে পৈত্রিক বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত স্থানের বৈষ্ণবদ্বেষী শাক্তগণ দ্বারা উৎপীড়িত হওয়াতে পদ্মাপারস্থিত তেলিয়া-বুধরী গ্রামে বাড়ী করেন।

গোবিন্দ দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজ নরোত্তম ঠাকুরের সুহৃদ্ ও স্বয়ং প্রসিদ্ধ সংস্কৃতকবি ছিলেন। রামচন্দ্রের বাঙ্গালা পদ পদ-কল্পলতিকায় আছে, কিন্তু তিনি বাঙ্গালা ভাষায় প্রসিদ্ধি লাভের উপযোগী কোন গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়া আমরা প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই নাই। তাঁহার 'স্মরণদর্পণ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুস্তক নহে; শুনিয়াছি 'বঙ্গজয়' নামক মহাপ্রভুর পূর্ব্ববঙ্গভ্রমণ সম্বন্ধে তাঁহার একখানি বড় ঐতিহাসিক পদ্যগ্রন্থ

আছে, আমরা তাহা পাই নাই। যাহা হউক রামচন্দ্র কবিরাজ তাঁহার সাময়িক বৈষ্ণব-সমাজের ভূষণ ছিলেন, কিন্তু ভাষা কবিতার স্বাভাবিক পথ অবলম্বন করাতে তৎকনিষ্ঠ গোবিন্দ কবিরাজের খ্যাতি অতীত ও বর্ত্তমান ব্যাপক হইয়া রহিয়াছে। তিনি স্বীয় কবিতার সরস মাধুরী বিতরণ করিয়া বঙ্গীয় যুবকগণের চিরসুহৃদ্‌রূপে বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তদপেক্ষা পণ্ডিত রামচন্দ্র কবিরাজ বাঙ্গালা লেখার চেষ্টা না করাতে তাঁহার স্মৃতি এখন প্রাচীন ইতিহাসের অচিহ্নিত পত্রে বিলীনপ্রায়।

প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, সারাবলী, অনুরাগবল্লী প্রভৃতি বহুবিধ পুস্তকে গোবিন্দ কবিরাজ সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক বিবরণ আছে ; দুঃখের বিষয়, ঐ সব বিবরণে তাঁহার জীবনের কতিপয় স্থূল ঘটনা মাত্র অবগত হওয়া যায়। তাঁহার কবিতা হইতেই তাঁহার হৃদয়ের সুকুমারত্ব, ভাব-প্রবণতা ও অন্তর্জ্জীবনের চিত্র ধারণা করিয়া লইতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত পুস্তকগুলিতে তিনি খেতুরীর মহোৎসবে, তেলিয়া-বুধরীতে ও বৃন্দাবনে কখনও বা পথিক, কখনও বা পাচকের তত্বাবধায়ক, আবার কখনও প্রশংসিত কবিরূপে সহসা দর্শন দিয়া নিবিড় জনতার অরণ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছেন ; ইতিহাস ক্ষুদ্র আলোপ্রক্ষেপে তাঁহার অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখাইয়া তৎসম্বন্ধে নির্ব্বাণ পাইতেছে, আমরা তাঁহার ধারাবাহিক চরিত জানি না।

এরূপ কথিত আছে, তিনি ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শাক্ত ছিলেন, তৎপর গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হইয়া বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে আদিষ্ট হন ; তদনুসারে অনুমান ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি আরও ৩৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি এই অবশিষ্ট জীবন, বৈষ্ণবসমাজের প্রীতি ও সম্মান সহকারে অতিবাহিত করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। উভয় ভ্রাতাই 'কবিরাজ' উপাধিলাভ করিয়াছিলেন, গোবিন্দদাসের পদসমূহ কাঁচাগড়িয়ানিবাসী চৈতন্য-সহচর

দ্বিজহরিদাসের পুত্র সুগায়ক ও পদকর্ত্তা গোকুলদাস এবং শ্রীদাস দ্বারা বৈষ্ণবমণ্ডলীতে সর্ব্বদা গীত হইত এবং গীতগুলিতে মুগ্ধ হইয়া বীরচন্দ্র-প্রভু ও জীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবসমাজের আচার্য্যগণ কবিকে ক্রোড় দিতেন। শেষ বয়সে কবিকে বুধরীগ্রামে স্বীয় পদসংগ্রহকার্য্যে ব্যস্ত দেখা যায়, "নির্জ্জনে বসিয়া নিজ পদরত্নগণে। করেন একত্র অতি উল্লসিত মনে॥"—(ভক্তিরত্নাকর ১৪ তরঙ্গ)।

১৫৩৭ খৃঃ * অব্দে শ্রীখণ্ডে গোবিন্দদাসের জন্ম ও ১৬১২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রের নাম দিব্যসিংহ। ভাষায় রচিত পদ ছাড়া তিনি সংস্কৃতে "সঙ্গীতমাধব" নামক নাটক ও 'কর্ণামৃত' নামক কাব্য রচনা করেন। ভক্তিরত্নাকরে "সঙ্গীতমাধবের" অনেক শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়। এস্থলে আর একটী কথা বলা উচিত, বিদ্যাপতির কয়েকটী পদে গোবিন্দদাসের ভণিতা দৃষ্ট হয়। শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের স্বকৃত টীকায় ইহার একটীর সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন ;—

"বিদ্যাপতিকৃতত্রিচরণগীতং লব্ধ্বা শ্রীগোবিন্দকবিরাজেন চরণৈকং কৃত্বা পূর্ণং কৃতং।" †

বলরাম দাস।

পূর্ব্বে এক পত্রে ১১ বার বলরামদাসের উল্লেখ করিয়াছি। ইঁহারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি নহেন। পদকর্ত্তা বলরাম দাস উক্ত ১১ স্থলের অন্ততঃ ৪টির উদ্দিষ্ট কবি বলিয়া বোধ হয়। প্রেম-বিলাসের লেখক নিত্যানন্দের অপর নাম বলরাম দাস। ইনি শ্রীখণ্ডের কবিরাজ বংশীয়, বৈদ্যজাতীয় কবি। পদকল্পতরুর কবি-বন্দনায় পদকর্ত্তা বলরাম দাসকে "কবি-

* শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর মতে ১৫২৫ খৃঃ (সাহিত্য ১২৯৯, আশ্বিন)।

† এক কবির পদের সঙ্গে অন্য কবির ভণিতা দেওয়ার পদ্ধতি আরও অনেক স্থলে দেখা যায়, যথা—"গোবিন্দদাস কহয় মতিমন্ত। ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত॥" "রামদাসের পহুঁ সুন্দর রসবর গৌরীদাস নাহি জানে। অখিল লোক যত ইহ রসে উনমত জ্ঞানদাস গুণগানে॥"—(পদকল্পলতিকা)।

নৃপবংশজ” (কবিরাজ) বলা হইয়াছে ; এই “বলরাম কবিরাজ” নরোত্তম-বিলাস প্রভৃতি পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছেন, ইনিই বৈষ্ণববন্দনায় “সঙ্গীতকারক” ও “নিত্যানন্দশাখাভুক্ত” বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। প্রেমবিলাস-রচক বলরামদাসও বৈদ্য এবং স্পষ্টতঃই নিত্যানন্দশাখাভুক্ত। সুতরাং পদকর্ত্তা বলরামদাস ও প্রেমবিলাস-রচক অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে। * বলরাম দাসের পিতার নাম আত্মারাম দাস ও মাতার নাম সৌদামিনী। পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহপুস্তকে আত্মারাম দাস কৃত কয়েকটি পদ পাওয়া যায়।

জ্ঞানদাস।

জ্ঞানদাস সম্বন্ধে অতি অল্প বিবরণই পাওয়া যায় ; বীরভূম জেলার একচক্রাগ্রামে (মল্লারপুর ষ্টেশনের নিকট) নিত্যানন্দ প্রভুর পিতৃগৃহ ছিল ; তাহার বিশ ক্রোশ পূর্ব্বে ও বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার ১০ মাইল পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রাম ; তথায় ‘মঙ্গল ঠাকুরের’ বংশ বলিয়া একটি গোঁসাইবংশ আছে। এই বংশেই ১৫৩০ খৃঃ অব্দে জ্ঞানদাস জন্ম গ্রহণ করেন ; ইনি নিত্যানন্দশাখাভুক্ত ; শ্রীখেতুরীর উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন, দেখা যায়, সুতরাং ইনি গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস প্রভৃতির সমকালিক কবি।

---

* “গৌরভূষণ শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় অনুমান করেন, ইঁহারা দুইজন এক ব্যক্তি নহেন। কারণ বলরামের পদ প্রাঞ্জল, প্রেমবিলাসের রচনা কুটিল। নরহরির নরোত্তমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকরের ভাষা সাদা সিধা গদ্যের ন্যায়, কিন্তু তৎকৃত পদগুলি কবিত্বময় ; বৃন্দাবনদাসের পদ ও ভাগবতের রচনা এক কবির লেখার মত শুনায় না। আমরা এসম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় গৌরভূষণ মহাশয়ের মত গ্রহণ করিতে পারিলাম না।”—এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের পাদটীকায় আমরা উপরি উক্ত কথাগুলি লিখিয়াছিলাম কিন্তু সম্প্রতি অচ্যুতবাবু আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই আমার এই মতের পরিবর্ত্তন হয়। তৎপূর্ব্বেই আমি নব্যভারত ১৪শ খণ্ড ৮ম সংখ্যায় (তোমার মতানুযায়ী) পদকর্ত্তা বলরামকেই প্রেমবিলাস-প্রণেতা বলিয়াই জানি।”

কাদড়া গ্রামে জ্ঞানদাসের একটি মঠ এখনও আছে, পৌষ মাসের পূর্ণিমায় সেখানে প্রতিবৎসর মহোৎসব এবং সেই সঙ্গে তিন দিন ব্যাপিয়া মেলা হয়। গদাধরের শিষ্য যতুনন্দন চক্রবর্ত্তীর কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; ইনি সুকবি ছিলেন। ইঁহার রচিত 'রাধাকৃষ্ণ-লীলা-কদম্ব' পুস্তকের শ্লোকসংখ্যা ৬০০০। কিন্তু মালিহাটির বৈদ্যবংশজ কবি যতুনন্দন দাস (জন্ম ১৫৩৭ খৃঃ) তাঁহা অপেক্ষা বেশী যশস্বী।

যতুনন্দন দাস ও যতুনন্দন চক্রবর্ত্তী।

পদকল্পতরুর বন্দনায় ইঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে,—"প্রভুসুতাচরণসরোরুহ-মধুকর জয় যতুনন্দন দাস।" প্রভু অর্থে শ্রীনিবাস আচার্য্য। যতুনন্দন, শ্রীনিবাস-কন্যা হেমলতার আদেশে ১৬০৭ খৃঃ অব্দে ঐতিহাসিক 'কর্ণানন্দ' গ্রন্থ রচনা করেন। গোবিন্দলীলামৃতের অনেক স্থলেও ইনি "শ্রীল হেমলতার" গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র সুবলচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য, যতুনন্দন 'কর্ণানন্দ' নামক ঐতি-হাসিক পদ্যগ্রন্থ, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দলীলামৃত' ও রূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের পয়ারানুবাদ সঙ্কলিত করেন। কিন্তু পদকর্ত্তা বলি-য়াই ইঁহার যশ স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পুরুষোত্তমের গুরুদত্ত নাম

প্রেমদাস।

'প্রেমদাস'; ইনি নবদ্বীপের কুলিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন; ইঁহার পিতার নাম গঙ্গাদাস; ইনি গোবিন্দদেবের মন্দিরের (বৃন্দাবনে) পূজারি ছিলেন। ১৭১২ খৃঃ অব্দে ইনি 'বংশীশিক্ষা' গ্রন্থ রচনা করেন, তৎপরে কর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করেন। পদকর্ত্তা গৌরীদাস পণ্ডিত প্রসিদ্ধ

গৌরীদাস।

সূর্য্যদাস সরখেলের * ভ্রাতা; গৌরীদাসের বাড়ী শান্তিপুরের নিকট অম্বিকাগ্রামে; ইনি চৈতন্যদেবের অনুচর ছিলেন, কথিত আছে, চৈতন্যদেবের

* ইঁহার দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীদেবীকে নিত্যানন্দ প্রভু বিবাহ করেন।

স্বহস্ত-লিপি গীতাগ্রন্থখানি ইঁহার নিকট রক্ষিত ছিল। ইনি নিম্বকাষ্ঠে চৈতন্যবিগ্রহ গঠন করিয়া অম্বিকা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ভক্ত সদ্গোপকুলভূষণ শ্যামানন্দ নবদ্বীপভ্রমণকালে ইঁহাকে উক্ত বিগ্রহপূজায় নিযুক্ত দেখিয়াছিলেন। রায়বসন্ত নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। ইনি শেষ বয়সে বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। জীবগোস্বামীর পত্র লইয়া গৌড়ে একবার শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট আসিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত আছে, "হেনই সময় বিজ্ঞ শ্রীবসন্ত রায়। পত্রী লৈয়া আইল তেহোঁ আচার্য্যসভায়॥"—(১৪ তরঙ্গ)। এই বিজ্ঞ ব্যক্তিকেই বোধ হয় নরহরি পুনর্ব্বার নরোত্তম-বিলাসে বন্দনা করিয়া লিখিয়াছেন, "জয় জয় মহাকবি শ্রীবসন্ত রায়। সদা মগ্ন রাধা কৃষ্ণ চৈতন্য লীলায়॥"—১২ বিলাস। সুতরাং ইঁহাকেই পদকর্ত্তা 'দ্বিজবসন্তরায়' বলিয়া বোধ হয়; যশোহর-নিবাসী কায়স্থ "রায়বসন্তের" নাম ইদানীং প্রবন্ধাদিতে পাইয়া থাকি, কিন্তু কোনও প্রাচীন পুস্তকে উক্ত পদকর্ত্তা সম্বন্ধে প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয় নাই। একটি প্রাচীন পদে দৃষ্ট হয়, গোবিন্দদাসকবি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, কিন্তু রায়বসন্তের পদে প্রতাপাদিত্য কিম্বা যশোহরের কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

রায় বসন্ত।

শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার (১৪৭৮—১৫৪০ খৃঃ অব্দ) মহাপ্রভুর একজন অনুচর ছিলেন; ইনি নীলাচলে চৈতন্যদেবের অতি অনুরক্ত সঙ্গী ছিলেন; কথিত আছে, নরহরি চির-কৌমারব্রত পালন করেন। নরহরি সরকার প্রসিদ্ধ লোচন দাসের গুরু ও 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনার উপদেষ্টা ছিলেন। একটি সংস্কৃত বন্দনায় জানা যায়, নরহরির বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর ও তাঁহার পিতার নাম নারায়ণ ছিল। নরহরি গৌরলীলার পদরচনার প্রবর্ত্তক বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে আদৃত। ইঁহার পথ অনুসরণ করিয়া বাসুদেব ঘোষ যশস্বী

নরহরি সরকার।

হইয়াছেন। নরহরি সরকার ১৫৪০ খৃঃ অব্দে গুপ্ত হন। বসু রামানন্দ কুলীনগ্রামের প্রসিদ্ধ মালাধর বসুর পৌত্র।

বসু রামানন্দ।

ইনি দ্বারকা নগরী হইতে নীলাচল পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, মহাপ্রভু ইহাকে মিত্র সম্বোধন করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ রায় রামানন্দ উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের একজন [illegible] কর্ম্মচারী

রায় রামানন্দ।

ছিলেন। ইনি বিখ্যাত জগন্নাথবল্লভ নামক নাটক রচনা করেন। চৈতন্যদেব ইহার [illegible] বিদ্যা-নগরে গিয়াছিলেন। ইনি রসিক ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে প্রসিদ্ধ। ১৫৩৪ খৃঃ অব্দের মাঘমাসে রায় রামানন্দের তিরোধান হয়। নরহরি চক্রবর্ত্তীই পদকর্ত্তা ঘনশ্যাম বলিয়া পরিচিত, কিন্তু "কবিনৃপবংশজ ভুবন-বিদিতযশ [illegible] ঘনশ্যাম বলরাম।" পদকল্পতরুর

ঘনশ্যাম।

এই শ্লোক দ্বারা জানা যায়, ঘনশ্যাম নামে অপর একজন পদকর্ত্তা কবিরাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র ও দিব্যসিংহের পুত্র।

পীতাম্বর দাস যে রসমঞ্জরী সঙ্কলন করেন, তন্মধ্যে তাঁহার কয়েকটি পদ সন্নিবিষ্ট আছে। শ্রীচৈতন্যপ্রভু যে সময় নীলাচলে ছিলেন, তখন চক্রপাণি ও মহানন্দ নামে দুই ভাই তাঁহার নিকট রঘুনন্দনের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেন। চক্রপাণি চৌধুরীর পুত্র রামানন্দ, তৎপুত্র গঙ্গারাম এবং তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ গোবিন্দলীলামৃত অনুবাদকারক মদনরায়চৌধুরী ও দ্বিতীয় ব্যক্তি রসকল্পবল্লী-প্রণেতা রাম-গোপাল। রামগোপালের রসকল্পবল্লী পাওয়া গিয়াছে, উহা ১৬৪৩ খৃঃ অব্দে বিরচিত হয়, এবং ইহার কিছু পরে রামগোপালের পুত্র পীতাম্বর দাস "রসমঞ্জরী" সঙ্কলন করেন। রসমঞ্জরীতে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্ত্তৃগণের পদই অধিকাংশ। সঙ্কলিত পদাবলী দৃষ্টে

কবি জগদানন্দের হস্তাক্ষর।

বোধ হয়, পীতাম্বরের রসবোধ ও পদ মনোনীত করিবার বিলক্ষণ শক্তি ছিল। তাঁহার স্বরুত পদগুলিও বেশ সুন্দর। দুঃখের বিষয়, তিনি তাঁহার পিতা গোপাল দাসের (রামগোপাল দাসের) পদ কিছু বেশী পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়াছেন; ইহা পিতৃভক্তির পরিচায়ক, কিন্তু সাহিত্য-সেবীর পক্ষে সঙ্গত কার্য্য নহে। আরও একটি দুঃখের বিষয় এই যে, চণ্ডীদাসের দুইটি পদ (যথা, "ভাল হৈলা আরে বঁধু আইলা সকালে" ইত্যাদি ও "চিকুর ফুরিছে, বসন খসিছে" ইত্যাদি) তিনি পিতার ভণিতা দিয়া প্রচারিত করিয়াছেন।*

জগদানন্দ,—জাতিতে বৈদ্য, ইনি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গভক্ত খণ্ডবাসী মুকুন্দের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতামহের নাম পরমানন্দ, এবং পিতার নাম নিত্যানন্দ। জগদানন্দের সর্ব্বানন্দ, কৃষ্ণানন্দ ও সচ্চিদানন্দ নামক তিন সহোদর ছিলেম। জগদানন্দের পিতা শ্রীখণ্ড ত্যাগ করিয়া আগরডিহি দক্ষিণখণ্ডে বাস করেন. এবং জগদানন্দও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া বীরভূমির অন্তর্গত দুবরাজপুর থানার অধীন জোফলাই গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। অপরাপর বৈষ্ণবভক্তের ন্যায় ইহার জীবন সম্বন্ধেও অনেক অলৌকিক কাহিনী বর্ণিত আছে। জগদানন্দ-পদাবলীপ্রকাশক ৺ কালিদাস নাথ মহাশয় তাহা বিস্তৃত রূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

১৭০৪ (১৭৮২ খৃঃ) শকে জগদানন্দ স্বর্গগত হন। এতদুপলক্ষে তাঁহার নিবাসস্থান জোফলাই গ্রামে এখনও বৎসর বৎসর একটি মহোৎসব হইয়া থাকে। বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরুতে জগদানন্দের অল্পসংখ্যক কয়েকটি পদ সন্নিবিষ্ট আছে।

যাহারা শুধু ললিতশব্দকেই কবিতার প্রাণ মনে করিয়া অনেকস্থলে অর্থশূন্য কাকলির সৃষ্টি করিয়াছেন, জগদানন্দ সেই শ্রেণীর কবি-সম্প্রদায়ের

---

* সাহিত্যপরিষদ্ হইতে প্রকাশিত পুস্তক দেখুন।

মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিবেন, সন্দেহ নাই। হৃদয়ের অন্তঃপুরে যে কবিতার নিভৃত স্থান এ কবিতা সে শ্রেণীর নহে ;—শুধু ললিত শব্দ-প্রহেলিকায় শ্রুতিকে অব্যক্ত সুখদান করাই, এ ভাবের কবিতার চরম লক্ষ্য, কিন্তু যমক অলঙ্কার ও 'ম'-কার, 'ল'-কারের নিবিড় সমাবেশেই যে সর্ব্বদা শ্রুতিসুখকর পদ হইতে পারে, জগদানন্দের পদ পড়িয়া আমরা তাহা বুঝি নাই। বহুতন্ত্রীতে অনভ্যস্ত স্পর্শজনিত উচ্ছৃঙ্খল ধ্বনির ন্যায় জগদানন্দের পদরাশি শ্রুতিকে সুখদান না করিয়া অনেকস্থলে পীড়ন করে। কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, এই কবি স্থানে স্থানে জয়দেবের মত সুন্দর শব্দ গ্রন্থনে সমর্থ হইয়াছেন।

আমরা জগদানন্দের সম্বন্ধে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি। এই কবি ভাবী কবিগণের সাহায্যার্থ একটি যমক-অলঙ্কারের ধারা রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন ; তদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, জগদানন্দ আকাশের তারা কি বনের ফুল দেখিয়া অতি অনায়াসে কবিত্ব-মন্ত্রে দীক্ষিত হন নাই। তিনি শ্রমে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া কবিতা রচনা শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তদ্বিষয়ক একটি প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়া ভাবী কবিগণের জন্য পন্থা নিরূপণের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। "জগদানন্দের খসড়া" ললিত শব্দের বিপণি বলিয়া উল্লেখ করা যায়, পাঠক খসড়াখানি পাঠ করিলে জগদানন্দের কবিতার গুহ্যতত্ত্ব অবগত হইবেন। ইহা প্রাচীন রীতি অনুসারে বঙ্গীয় ভাষায় অলঙ্কার শাস্ত্র সঙ্কলনের প্রথম ও শেষ চেষ্টা। আমরা জগদানন্দের স্বহস্ত লিখিত খসড়া হইতে কিছু প্রতিলিপি পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

বংশীবদনের পিতা ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় পাটুলীনিবাসী ছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভুর আদেশে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। ১৪০৬ শকে (১৪৯৪ খৃঃ অব্দ) চৈত্র মাসে পূর্ণিমা-দিনে বংশীবদন ভূমিষ্ঠ হন। তিনি বিল্বগ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি ও নবদ্বীপে 'প্রাণবল্লভ' নামে এক বিগ্রহ

প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার দুই পুত্র, চৈতন্য ও নিত্যানন্দ। পদাবলী ব্যতীত বংশীবদন 'দীপান্বিতা' নামক ক্ষুদ্র কাব্য প্রণয়ন করেন।

বংশীবদনের পৌত্র (চৈতন্য দাসের পুত্র) রামচন্দ্র একজন বিখ্যাত পদকর্ত্তা। ইনি ১৪৫৬ শকে (১৫৩৪ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০৫ শকে (১৫৮৩ খৃঃ) মাঘ মাসের কৃষ্ণতৃতীয়াতিথিতে অপ্রকট হন। রামচন্দ্র জাহ্নবীদেবীর শিষ্য ছিলেন; ইনি কুলীয়ার সন্নিকটস্থ রাধানগরে বাস করেন। রাধানগরের নিকট বাঘাপাড়ায়ও ইঁহার আর এক বাটী ছিল। রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শচীনন্দন দাস একজন পদকর্ত্তা। তিনি 'গৌরাঙ্গবিজয়' নামক কাব্য প্রণয়ন করেন।

পরমেশ্বরী দাস—ইনি খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহার বাড়ী কাউগ্রাম, ইনি জাতীতে বৈদ্য। ইনি জাহ্নবী ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; এবং তাঁহার আদেশে 'তড়া আটপুর' যাইয়া শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ প্রকাশ করেন। সম্প্রতি এই বিগ্রহের নাম 'শ্যামসুন্দর' হইয়াছে। ইনি কিছুদিন 'গরলগাছা' গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক প্রবাদ প্রচলিত আছে।

বৈষ্ণবাচারদর্পণমতে যদুনাথ আচার্য্যের পূর্ব্বনিবাস ছিল শ্রীহট্ট, বুরুঙ্গা গ্রামে; ইনি রত্নগর্ভ আচার্য্যের পুত্র। ইঁহার উপাধি ছিল 'কবিচন্দ্র'। ইনি নিত্যানন্দশাখাভুক্ত। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন :—

"যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেমরসময়। নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহাকে সদয়॥"

প্রসাদ দাস—বিষ্ণুপুরস্থ করুণাময় দাসের (মজুমদার) পুত্র ও শ্রীনিবাসের শিষ্য; ইঁহার উপাধি ছিল 'কবিপতি'।

উদ্ধব দাস—অপর নাম কৃষ্ণকান্ত; ইনি পদকল্পতরু-সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাসের বন্ধু ছিলেন; বাড়ী টেঞা (বৈদ্যপুর)।

রাধাবল্লভ দাস—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য, কাঞ্চনগড়িয়া

গ্রামবাসী সুধাকর মণ্ডল ও তৎপত্নী শ্যামাপ্রিয়ার পুত্র। রাধাবল্লভ রঘুনাথ গোস্বামী কৃত বিলাপকুসুমাঞ্জলির বাঙ্গালা অনুবাদ করেন।

রায়শেখর—প্রকৃত নাম শশিশেখর, অপর নাম চন্দ্রশেখর; বর্দ্ধমান পড়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীখণ্ডবাসী রঘুনন্দন-গোস্বামীর শিষ্য ও নিত্যানন্দ-বংশসম্ভূত। ইনি গোবিন্দদাসের পরবর্ত্তী।

পরমানন্দ সেন—বাড়ী কাঞ্চনপল্লীগ্রাম, জাতিতে বৈদ্য। ইনি মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বচর শিবানন্দ সেনের পুত্র। ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে পরমানন্দের জন্ম হয়। মহাপ্রভু ইঁহাকে 'কবিকর্ণপূর' উপাধি দিয়াছিলেন। ইনি ১৪৯৪ শকে (১৫৭২ খৃঃ) সুবিখ্যাত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক ও তাহার চারি বৎসর পরে 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' প্রণয়ন করেন; ইহা ছাড়া 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ', 'কেশবাষ্টক', 'চৈতন্যচরিত কাব্য' প্রভৃতি বহুসংখ্যক সংস্কৃত পুস্তক রচনা করেন।

বাসুদেব, মাধব ও গোবিন্দানন্দ—ইঁহারা তিন সহোদর, পূর্ব্ব নিবাস কুমারহট্ট। কেহ কেহ বলেন শ্রীহট্টের বুড়ন গ্রামে মাতুলালয়ে বাসুঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। এই তিন ভ্রাতা শেষে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। গৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় পদাবলী-রচকগণের মধ্যে বাসুঘোষ শীর্ষস্থানীয়। তিন ভ্রাতাই বিখ্যাত 'কীর্ত্তনিয়া' ও মহাপ্রভুর অনুরক্ত অনুচর ছিলেন।

ধনঞ্জয় দাস—বর্দ্ধমান ছাঁচড়া-পাঁচড়া গ্রামে বাড়ী। চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতে ইনি পণ্ডিত ও নিত্যানন্দপ্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

গোকুল দাস—৪ জন। (১) জাজী গ্রামবাসী প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনিয়া। (২) কাঞ্চনগড়িয়াবাসী শ্রীদাসঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোকুল দাস, শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। (৩) বীরহাম্বীরের সমসাময়িক,

বনবিষ্ণুপুরবাসী গোকুলদাস মহান্ত। (৪) 'কবীন্দ্র' উপাধিধারী পঞ্চ-কোট সেরগড়বাসী গোকুল। (ভঃ রঃ)।

আনন্দ দাস—জগদীশপণ্ডিতের শাখায় এক আনন্দদাসের নাম পাওয়া যায়, ইনি "জগদীশচরিত্রবিজয়" গ্রন্থ প্রণেতা। **কানুরাম**—ইনি শ্যামানন্দের শাখাশিষ্য; ইঁহার গুরু দামোদর পণ্ডিত।

কৃষ্ণদাস—পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে কৃষ্ণদাসের সংখ্যা অনেক। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরিচয় পরে প্রদান করিব। অম্বিকা নিবাসী গৌরীদাসের ভ্রাতা কৃষ্ণদাসও একজন পদকর্ত্তা ছিলেন।

কৃষ্ণপ্রসাদ—"শ্রীগতিপ্রভুর শিষ্য প্রধান তনয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর গম্ভীর হৃদয়॥" শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র ছিলেন। **গতিগোবিন্দ**—শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র, ইঁহার রচিত "বীররত্নাবলী" নামক একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে। **গোকুলানন্দ সেন**—জাতি বৈদ্য, নিবাস টেঞা-বৈদ্যপুর, ইঁহার নামান্তর বৈষ্ণব দাস। ইনিই প্রসিদ্ধ পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। **গোপাল দাস**—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। কর্ণানন্দে উল্লিখিত আছে যে, ইনি একজন উৎকৃষ্ট কীর্ত্তনিয়া ছিলেন। বাড়ী বুঁদইপাড়া। **গোপাল ভট্ট গোস্বামী** (১৫০০ হইতে ১৫৮৭ খৃঃ) ইনি মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ ছিলেন, বাড়ী কাবেরীতীরস্থ শ্রীরঙ্গক্ষেত্র (দাক্ষিণাত্য), ইনি পরিশেষে বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন।

গোপীরমণ চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য, বাড়ী বুধরী। গোবর্দ্ধন দাস দামোদরের শিষ্য। রসিকমঙ্গল নামক গ্রন্থে ইঁহার কথার উল্লেখ আছে। **চম্পতি রায়**—রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের টীকায় লিখিয়াছেন "চম্পতিনাম দাক্ষিণাত্য-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভক্তরাজ কশ্চিৎ আসীৎ স এব গীতকর্ত্তা" **দৈবকীনন্দন**—ইনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। বৈষ্ণবনিন্দা প্রভৃতিই ইঁহার কার্য্য ছিল। দৈবকীনন্দন

কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মহাপ্রভুর শরণাগত হইলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ 'বৈষ্ণববন্দনা' রচনা করিতে আদিষ্ট হন। ইনিও "বৈষ্ণববন্দনা" গ্রন্থ রচনা করিয়া মহাব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করেন।

নরসিংহ দেব—"নরোত্তমের স্বগণ নরসিংহ মহাশয়। দূরদেশ পক্কপল্লী যার রাজ্য হয়॥" প্রেমবিলাসে—"কমললিত চরণ কমল মধু পাওয়ে সেই সুজান, রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ গোবিন্দদাস অনুমান॥" নয়নানন্দ—গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতা বাণীনাথের পুত্র, চরিতামৃতে ইঁহার উল্লেখ আছে। প্রসাদ দাস—বিষ্ণুপুরবাসী করুণাময় দাসের পুত্র, ইঁহাদের কৌলিক উপাধি মজুমদার। আচার্য্য প্রভুর সমকালিক, উপাধি—কবিপতি। মাধো—নীলাচলের লোক, শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দের শিষ্য। (রসিকমঙ্গল গ্রন্থ, ১৪৩পৃষ্ঠা)। রসিকানন্দ—নীলাচলের অচ্যুতানন্দের পুত্র শ্যামানন্দের শিষ্য। জন্ম ১৫৯০ খৃঃ। রাধাবল্লভ—সুধাকরমণ্ডলের পুত্র, আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। হরিবল্লভ—প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর নামান্তর। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহার গুরু কৃষ্ণচরণের নামান্তর, হরিবল্লভ তাঁহার গুরুর নামেই পদের ভণিতা দেন। যাহা হউক, ঐ ভণিতা-যুক্ত পদ যে চক্রবর্ত্তীমহাশয়কৃত, তাহা সর্ব্বসম্মত। তিনি 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' নামে একখানি পদ-গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। চক্রবর্ত্তি-কৃত ২৩খানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচলিত আছে। ১৭০৪ খৃঃ অব্দে তিনি "সারার্থদর্শিনী" নামে ভাগবতের টীকা রচনা করেন, ইহাই তাঁহার শেষ ও সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। এই সকল পদকর্ত্তা ছাড়া বনবিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ রাজা বীরহাম্বীর * ও নীলাচলবাসী শিখিমাহিতীর ভগিনী প্রসিদ্ধ ৩॥০ রসিকভক্তের অর্দ্ধজন—মাধবীর—পদও পাওয়া গিয়াছে।

এস্থলে বলা উচিত, যাঁহারা বড় বড় গ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, অথবা যাঁহাদের রচিত পদাপেক্ষা ভক্তিরসময় জীবনই বেশী

* ভক্তিরত্নাকরে ইঁহার দুইটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

সুরভিময়, যথা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস, ত্রিলোচন দাস ও নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি গ্রন্থকার ও শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজন,—তাঁহাদের প্রসঙ্গ পরে প্রদত্ত হইবে।

এই যুগের পদকর্ত্তৃগণ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি হইতে নিম্নে স্থান পাইবার যোগ্য, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট কবি আছেন। এই দলে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, রায়শেখর, ঘনশ্যাম, রায়বসন্ত, যদুনন্দন, বংশীবদন এবং বাসুঘোষ শ্রেষ্ঠ। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেম ভিন্ন অন্য ভাব নাই, কিন্তু গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদে প্রেমের সঙ্গে ভক্তি মিশ্রিত হইয়াছে; ভক্তির সঙ্গে নির্ম্মলতা প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু গাঢ়তার হ্রাস হয়; প্রেমেতে অঙ্কিত মূর্ত্তি আলিঙ্গন করিলে প্রাণ জুড়ায়, ভক্তিতে অঙ্কিত মূর্ত্তির পদ স্পর্শ করিতে পারিলে কৃতার্থ জ্ঞান হয়, সুতরাং প্রেম অপেক্ষা ভক্তিতে উদ্দিষ্ট ছবি একটু দূরে স্থাপিত হয়। ভক্ত তাঁহার আরাধ্যকে না পাইলে আবার তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন, প্রেমিকের মত তাঁহার রাগ ও মান করিবার শক্তি নাই—কিন্তু আত্মসমর্পণের ইচ্ছা আছে। নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে প্রেম অপেক্ষা তপস্যার কথা বেশী আছেঃ—

"যাঁহা পঁহু অরুণ চরণে চলি যাত। তাঁহা তাঁহা ধরণী হই এ মঝু গাত॥ যো সরোবরে পঁহু নিতি নিতি নাহ। হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ॥ যো দরপণে পঁহু নিজ মুখ চাহ। মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ॥ যো বীজনে পঁহু বীজই গাত। মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদুবাত॥ যাঁহা পঁহু ভরমই জলধর শ্যাম। মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥ গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরি। সো মরকত তনু তোহে কিএ ছোড়ি॥"

বৈষ্ণবকবিগণের প্রেম পণ্যদ্রব্য নহে। দানই এ প্রেমের ধর্ম্ম, দানেই এ প্রেমের সুখ; প্রতিদান চাহিয়া এ বিপণিতে কেহ প্রবেশাধিকার পায় না। ফুলের সুরভি বিনা মূল্যে বিতরিত হয়; চাঁদের জ্যোৎস্না, মলয় সমীর ক্রয়

বৈষ্ণব কবির প্রেম।

বিক্রয়ের সামগ্রী নহে; প্রাতঃসূর্য্যরশ্মি শীতকালে কত মধুর, কিন্তু শাল বনাতের মত তাহার মূল্য নাই; বনের কুন্দ, যূথি, জাতি, গৃহ-সুন্দরীগণ হইতে কম সুন্দর নহে, কিন্তু উহাদের পণে বিক্রয় হয় না; এ প্রেমও তেমনই অমূল্য। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় প্রেমিক এ প্রেম-ভরে উন্মত্তভাবে যাহা খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহা প্রতিদান নহে,—

"মো যদি সিনান আগিলা ঘাটে, আর ঘাটে পিয়া নায়। মোর অঙ্গের জল, পরশ লাগিয়া, বাহু পশারিয়া রয়॥ বসনে বসন লাগিবে বলিয়া, একই রজকে দেয়। আমার নামের একটি আখর, পাইলে হরিষে লেয়॥ ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে বলিয়া, ফিরয় কতই পাকে। আমার অঙ্গের বাতাস যেদিকে সে দিন সে মুখে থাকে॥ মনের কাকুতি বেকত করিতে কত না সন্ধান জানে। পায়ের সেবক রায়শেখর কিছু জানে অনুমানে॥"

এই অপূর্ব্ব ব্রতের এই অপূর্ব্ব কথা। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে প্রেম ও সৌন্দর্য্যপূজার পূর্ণপ্রভাব দেখা দিয়াছিল। বিরল-দ্রুম নগর-রাজিতে বসন্তের সৌষ্ঠব এখন বিকাশ পায় না; এখন বনে আসে—কোকিলের জন্য, রক্ত-কিশলয়ের জন্য, বনকুরঙ্গ ও জন্য; মনুষ্য-সমাজে এখন বিজ্ঞানের নীরস শীত-বায়ু কবিত্বের ফল-পল্লব সংহার করিয়া সত্যের অস্থিপঞ্জর দেখাইতেছে; এখনকার প্রেমের কবিতা পঞ্চদশ-শতাব্দীর স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত; সেরূপ মধুর কথা এখন আর লিখিত হইবে না; সেই স্বপ্নময়ী চিত্রলেখা বিজ্ঞানের শীতল নীহারিকাজড়িত হইয়া এখন চির-অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই পুষ্পতরু-পল্লবগুচ্ছমণ্ডিত পৃথিবী পূর্ব্বেও যেরূপ, এখনও অবশ্য সেইরূপ সুন্দর আছে—কিন্তু আমরা ইহাকে সুন্দর দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছি।

পঞ্চদশ শতাব্দীর ভালবাসার সাহিত্য।

পদকর্ত্তৃগণের মধ্যে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহার রচিত পদে বিদ্যাপতির রস-পূর্ণ উচ্ছ্বাসের অপ্রস্ফুট প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে; মৈথিল কবির পদে অনুভবের তীব্রত্ব ও উদ্দীপনাশক্তি বেশী, কিন্তু গোবিন্দের

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস।

পদে স্বার্থত্যাগ ও পবিত্রতা অধিক, কবিত্বের হিসাবে গোবিন্দ বিদ্যাপতি হইতে নিম্নে দাঁড়াইবেন, কিন্তু বহু নিম্নে নহে। বিদ্যাপতি যেরূপ গোবিন্দদাসের আদর্শ, চণ্ডীদাস সেইরূপ জ্ঞানদাসের আদর্শ; জ্ঞানদাসের কতকগুলি পদ চণ্ডীদাসের চরণ-ভাঙ্গা; তাহা মধুর এবং মূলের প্রতিধ্বনির মত শুনায়। জ্ঞানদাসবর্ণিত নায়কের প্রেম-বিকাশ-চেষ্টা নানা বিচিত্র বর্ণপাতে সুন্দর এবং সেই সৌন্দর্য্য সততই নির্ম্মল অশ্রুজলে উজ্জ্বল হইয়াছে। বলরামদাস কাহাকেও আদর্শ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, চণ্ডীদাসের ন্যায় ইঁহার কবিতা যেন স্বভাবের সংস্করণ, চণ্ডীদাসের ন্যায় ইনিও সরল বক্তা, কিন্তু ততদূর গভীর নহেন। তাঁহার পদ সরল প্রেমের সুন্দর অভিব্যক্তি। গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসে, জ্ঞানদাস ও বলরাম দাসে শক্তির পার্থক্য আছে; যে ক্রমে এই সমালোচনা লিখিত হইল—এ পার্থক্য সেই ক্রমে, কিন্তু তাহা কেশ প্রমাণ।

জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস।

বলরামদাস ও চণ্ডীদাস।

বৈষ্ণব কবিগণের পদ প্রথম সংগ্রহ করেন, বাবা আউল মনোহরদাস; হুগলী জেলায় বদনগঞ্জে ইঁহার সমাধি আছে; কথিত আছে ইনি জ্ঞানদাসের বন্ধু ছিলেন ও যোগবলে অতি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন; ইঁহার রচিত সংগ্রহের নাম পদ-সমুদ্র। * খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষে এই সংগ্রহ

পদাবলী সংগ্রহ।

---

* পদসমুদ্র স্বর্গীয় পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের নিকট ছিল; কলিকাতার কোন দোকানদার ২০০০৲ টাকা মূল্যে এই গ্রন্থস্বত্ব খরিদ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তিনিধি মহাশয় তাহা দেন নাই; বৃদ্ধবয়সে তিনি এই পুস্তক নিজের তত্ত্বাবধানে ছাপাইয়া পাত্রবিশেষে বিতরণ করিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে আরও একটু বক্তব্য আছে, আমার শ্রদ্ধাস্পদ কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধু এই পুস্তকের অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়াছেন;—সে সকল কথা এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

সঙ্কলিত হয়। ইহার পদ-সংখ্যা ১৫০০০ ; বোধ হয় পদসমুদ্রের অব্যবহিত পরেই শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্র সঙ্কলন করেন। তিনি ইহার যে "মহাভাবানুসারিণী" নামক সংস্কৃত টিপ্পনী দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শিক্ষা এবং অন্তর্দৃষ্টির বিলক্ষণ পরিচয় আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য বৈষ্ণব দাস পদকল্পতরু প্রণয়ন করেন। পদকল্প-লতিকা গৌরীমোহনদাসকৃত ; গীতচিন্তামণি হরিবল্লভকৃত ; গীতচন্দ্রোদয় নরহরিচক্রবর্ত্তিকৃত ; পদচিন্তামণিমালা প্রসাদদাসকৃত ; রসমঞ্জরী পীতাম্বরদাসকৃত ; ইহা ছাড়া লীলাসমুদ্র, পদার্ণবসারাবলী, গীতকল্পতরু, প্রভৃতি বহুবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সংগ্রহগ্রন্থ আছে।

পদ-সমুদ্র, পদামৃত, পদকল্পলতিকা, ও পদকল্পতরু।

পদ-সমুদ্র অতি বিরাট গ্রন্থ—রিচার্ডসনের সিলেক্সনের ন্যায়। ছাপা হইলে উহা বড় বড় পুস্তকাগারে শোভা পাইতে পারে। রাধামোহনঠাকুরের সংগ্রহপুস্তকের অনেকাংশ তিনি স্বকৃত পদ দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন, কতকগুলি বাঙ্গালা পদ ও ব্রজবুলির সংস্কৃত টীকা এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। গৌরমোহন দাসের সঙ্কলন দৃষ্টে বোধ হয়, ভাল ভাল পদ মনোনীত করিবার শক্তি ইঁহার বেশ ছিল, পদ-সন্নিবেশও বড় সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু সংগ্রহকারকের দৃষ্টি প্রগাঢ় ভাবাপেক্ষা সুললিত শব্দবিশিষ্ট পদগুলির উপর বেশী এবং পুস্তকখানা বড় ক্ষুদ্র ; মাত্র ৩৫১ পদে সম্পূর্ণ। মোটের উপর বৈষ্ণবদাসের সংগৃহীত পদ-কল্পতরুই ব্যবহার পক্ষে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার পদসংখ্যা ৩১০১ ; পদামৃতসমুদ্র ইহা হইতে অনেক ছোট পুস্তক, অথচ সংগ্রাহক তন্মধ্যে ৪০০টিরও অধিক স্বকৃত পদ দিয়াছেন, বৈষ্ণবদাস স্বীয় বিরাট সংগ্রহে মাত্র ২৭টি স্বকৃত পদ দিয়াছেন, সে কয়েকটি পদও বন্দনাসূচক, সুতরাং সংগ্রহগ্রন্থে অপরিহার্য্য। বৈষ্ণবদাস এই সংগ্রহ সঙ্কলন করিতে যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা প্রবীণ

ব্যক্তির উপযুক্ত। পদকল্পতরু ৪ শাখায় বিভক্ত; প্রথম শাখায় ১১ পল্লব, মোট পদসংখ্যা ২৬৫। দ্বিতীয় শাখায় ২৪ পল্লব, মোট পদসংখ্যা ৩৫১। তৃতীয় শাখায় ৩১ পল্লব, মোট পদসংখ্যা ৯৬৫; চতুর্থ শাখায় ৩৬ পল্লব, মোট পদসংখ্যা ১৫২০। ইহার কোন্ পল্লবে কত পদ তাহাও পুস্তকের শেষভাগে নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রকাশিত পদকল্পতরু অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়; বৈষ্ণবদাস তৎকৃত সূচীপত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ৪র্থ শাখায় ২৬ পল্লবে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থ মধ্যে উক্ত পল্লবটি বর্জ্জিত হইয়াছে; এরূপ আরও কয়েক স্থল স্পষ্টতঃই অসম্পূর্ণ দেখা যায়। সূচীনির্দ্দিষ্ট ৩১০১ পদের মধ্যে মুদ্রিত পুস্তকে মাত্র ৩০৩০টি পদ দৃষ্ট হয়। যে অংশটুকু ঐতিহাসিক, হিন্দুস্থানবাসিগণের তাহা লুপ্ত করিবার একটা বিশেষ শক্তি আছে। পদকল্পতরুর আদ্যন্তই সুন্দর সুন্দর পদপূর্ণ নহে। হোমারের রচনায়ও মধ্যে মধ্যে তন্দ্রালসতা দৃষ্ট হয়—এটি একটি প্রবাদ বাক্য। বৈষ্ণব কবিগণের পদগুলিও সর্ব্বত্রই প্রতিভাপ্রদীপ্ত নহে, অনেক স্থল পুনরাবৃত্তি-দোষ-দুষ্ট; কিন্তু পদকল্পতরুর প্রতিপত্রেই এমন দুএকটি ছত্র বা পদ আছে, যাহা পড়িলে বোধ হয়, কবি বাগ্দেবীর লেখনী কাড়িয়া লইয়া তাহা লিখিয়াছেন, পাঠক সেই সকল পদে প্রেমের নানারূপ লীলা-সরস চিত্রলেখা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন।

পদবিন্যাস রীতি।

বিদেশীয় ভাবাপন্ন পাঠক, বর্ণমালানুক্রমে পদগুলি সন্নিবিষ্ট হয় নাই, দেখিয়া বিরক্ত হইতে পারেন। পূর্ব্বে লিখিয়াছি, এই পদাবলীসাহিত্য ভালবাসার বিজ্ঞান। ভালবাসারহস্যের এরূপ গূঢ়ভেদ আর কোন দেশের সাহিত্যে নাই। লতা যে ক্রম এবং কৌশলে তরুকে জড়াইয়া বশীভূত করে, এই বিজ্ঞানে সেই ক্রম লিখিত হইয়াছে। প্রেমের নানা লীলা হইতে অলঙ্কারশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ সূত্র রচনা করিয়াছেন। অলঙ্কারগ্রন্থে ৩৬০ রূপ

নায়িকা-ভেদ বর্ণিত আছে; এই ভেদপ্রকাশকসূত্রে এক একটি চিত্র-নির্দ্দেশক রেখাপাত করা হইয়াছে, সেই রেখার উপর কবিগণ তুলি দ্বারা সজীব বর্ণ ফলাইয়াছেন। এই সূত্রগুলি অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সূত্রের ন্যায় কঠোর নহে, যুবকগণ তৎপাঠে আনন্দ অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই; যথা,—নায়িকা স্বীয় সৌন্দর্য্য-দর্পে মানিনী হইয়া কর্ণোৎপল দ্বারা নায়ককে তাড়না করিতেছে, এই চিত্রখানি প্রগল্‌ভার; তমালকুঞ্জে অধীরা নায়িকা প্রণয়ী-সঙ্গ অপেক্ষায় পত্রকম্পনে আশান্বিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে, এই চিত্রের নাম বাসকসজ্জা; এই অপেক্ষা যখন আক্ষেপে পরিণত হইতেছে, তখন বিপ্রলব্ধা; মানিনী—খণ্ডিতায় বিষাদ ও রোষ-স্ফীতা; প্রোষিত ভর্তৃকাভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এখানে মান ও ক্রোধ অশ্রুজলে মগ্ন; এখানে নায়িকার মূর্ত্তি বড়ই সুন্দর, কারণ—"যা কান্তায়াঃ মুখে চিরায় বিরহে সা মাধুরী মাধুরী।"—এইরূপ আরও অসংখ্য সূত্র আছে।

বঙ্গীয় পদসমূহে এই সব লীলাময় ভাব ভক্তি-বিধৃত হইয়া স্বর্গীয় ভালবাসার উপাদান হইয়াছে, তাহাদের ঊর্দ্ধোন্মুখ গতি ও নিষ্কাম আবেগ বিলাসকলা হইতে স্বতন্ত্র।

বলা নিষ্প্রয়োজন, সংগৃহীত পদগুলি পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমরা এস্থলে পদকল্প-লতিকা হইতে সংগ্রহনৈপুণ্যের কিছু নমুনা দিতেছি; পাঠক দেখিবেন, সংগ্রাহক নানা কবির পদ নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া কেমন সুন্দরভাবে যোজনা করিয়াছেন,—বিন্যাস-কৌশলে একখানি সম্যক্‌ভাবের চিত্র কেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, নানা কবির তুলি দ্বারা যেন একই বর্ণ ফলিত হইয়াছে;—

সংগ্রহ-নৈপুণ্যের দৃষ্টান্ত।

মুরলী শিক্ষা।

কামোদ। বহুদিনের সাধ আছে হরি। বাজাইব মোহন মুরলী॥ তুমি লহ মোর

নীল সাড়ী। তব পীত ধড়া দেহ পরি॥ তুমি লহ মোর গজমতি। মোরে দেহ তোমার মালতী॥ ঝাঁপা খোঁপা লহ খসাইয়া। মোরে দেহ চূড়াটি বাঁধিয়া॥ তুমি লহ সিন্দূর কপালে। তোমার চন্দন দেহ ভালে॥ তুমি লহ কঙ্কণ কেউড়ি। তোড় তাড় বালা দেহ পরি॥ তুমি লহ মোর আভরণ। মোরে দেহ তোমারি ভূষণ॥ শুন মোর এই নিবেদন। শুনি হরষিত বৃন্দাবন॥ ১॥

কানেড়া। মুরলী করাও উপদেশ। যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ। কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম। কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলি লয় আমার নাম॥ কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি। কোন্ রন্ধ্রে কেকা শব্দে নাচে ময়ূরিণী॥ কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয় পারিজাত। কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটেহে প্রাণনাথ॥ কোন্ রন্ধ্রে ষড়্‌ঋতু হয় এক কালে। কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুল ফলে॥ কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়। একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যাম রায়॥ জ্ঞানদাস কহে হাসি হাসি। 'রাধা মোর' বলি বাজিবেক বাঁশী॥ ২॥

কামোদ। কৌতুকে মুরলী শিখে রসবতী রাধা। মদনমোহন মনোমোহিনীর সাধা॥ প্রেমরঙ্গে শ্যাম-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া। মুরলী পূরয় রাই ত্রিভঙ্গ হইয়া॥ বিনা তন্ত্রে বিনা মন্ত্রে কত ফুক দেই। বাজে বা না বাজে বাঁশী পিয়া-মুখ চাই॥ রাধার অধরে বেণু ধরে বনমালী। পাণি পঙ্কজ ধরি লোলয় অঙ্গুলি॥ কানু কোলে কলাবতী কেলির বিলাসে। দুহুঁকরূপ দেখি শিবানন্দ ভাষে॥ ৩॥

বেহাগ। আজু কে গো মুরলী বাজায়। এত কভু নহে শ্যাম রায়॥ ইহার গৌরবরণে করে আলো। চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল॥ তাঁহার ইন্দ্রনীলকান্ত তনু। এত নহে নন্দ-সুত কানু॥ ইহার রূপ দেখি নবীন আরতী। নটবর বেশ পাইল কতি॥ বনমালা গলে দোলে ভাল। এনা বেশ কোন্ দেশে ছিল॥ কে বানাইল হেনরূপ খানি। ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী॥ নীল উয়লী নীলমণি। হবে বুঝি ইহার সুন্দরী। সখীগণ করে ঠারাঠারি॥ কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী। কোথা গেল কিছুই না জানি॥ আজু কেনে দেখি বিপরীত। হবে বুঝি দোহার চরিত॥ চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে। এরূপ হইবে কোন্ দেশে॥ ৪॥ *

---

* প্রথম পদে (বৃন্দাবন-কৃত) রাধিকা হরির নিকট বেশ পরিবর্তন ও বংশীবাদনের অনুমতি চাহিয়াছেন, দ্বিতীয় পদে (জ্ঞানদাস কৃত) বেশ পরিবর্তন সম্পূর্ণ, কিন্তু রাধিকা বাঁশী বাজাইতে পারেন নাই, এজন্য তদুপদেশ চাহিয়াছেন, তৃতীয় পদে (শিবানন্দকৃত) কৃষ্ণ রাধাকে বাঁশী বাজাইতে শিক্ষা দিতেছেন। ৪র্থ পদে (চণ্ডীদাসকৃত) রাই কানু ও কানু রাই সাজিয়াছেন, তখন বেশ পরিবর্তন সম্পূর্ণ—রাধা সুললিত স্বরে বাঁশীতে ঝঙ্কার দিতেছেন, এবং সখীগণ চিনিতে না পারিয়া "আজু কে গো মুরলী বাজায়" প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

পদের অতল রত্নাকর হইতে নানা যুগের ভিন্ন ভিন্ন নামাঙ্কিত এই চারিটি রত্নের উদ্ধার করিয়া এরূপ সুন্দর সমন্বয় করাতে সংগ্রাহক একটি উৎকৃষ্ট মণিকারের সম্মান পাইবার যোগ্য।

বঙ্গীয় গীতি-কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব।

পদাবলী-সাহিত্য হইতে আমরা বিদায় গ্রহণ করিতেছি। বঙ্গদেশের ভক্তির অবতার চৈতন্যদেবের জীবন একটি গীতির ন্যায়; এদেশের গীতি-কবিতাই উৎকৃষ্ট কবিতা; যে জাতি উদ্যমপূর্ণ, উন্নতি পথে ধাবিত, তাঁহাদের মধ্যে পুরুষকারের চিত্র জীবন্ত; সে দেশে নরনারী জীবন নাটকীয় চরিত্রের গূঢ় সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বে ব্যক্ত হয়, রামায়ণে ও মহাভারতে একদা হিন্দুর সেইরূপ চরিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। কিন্তু অবস্থার ক্রীড়াশীলচক্রে পতিত, ছিন্ন ভিন্ন জাতির অশ্রুই সম্বল; সেই অশ্রু কখনও দুঃখজ্ঞাপক হইয়া মর্ম্মস্পর্শী হয়, কখনও বা ভক্তির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া গীতি-কবিতার মৃদু উপাদানের মধ্যেও এরূপ মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য ছায়া দেখাইতে পারে, যাহাতে সেই দুঃখে দয়া করার অধিকার হয় না,—সে দুঃখ গৌরবের বিষয় হইতে পারে।

এই গীতিকবিতাগুলি আমরা ইংলণ্ডের ও আমেরিকার সাহিত্য-প্রদর্শনীতে লইয়া দেখাইতে পারি;—আত্মগরিমার রাজ্যের অধিবাসি-বৃন্দকে আত্মবিসর্জ্জনের কথা শুনাইয়া মুগ্ধ করিতে পারি।

চরিত-শাখা।

(ক) গোবিন্দদাসের করচা।

(খ) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

(গ) চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যচরিতামৃত।

(ঘ) ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, প্রেমবিলাস প্রভৃতি।

(ক) গোবিন্দদাসের করচা।

চরিত-রচনাপ্রবর্ত্তন

মহাপ্রভুর মহিমান্বিত আদর্শ হইতে বঙ্গসাহিত্যে জীবন-চরিত লেখার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। মনুষ্যের নৈসর্গিক চরিত্র এক সময়ে শাস্ত্রীয় যবনিকার পশ্চাতে পড়িয়া উপেক্ষিত ছিল। তাই চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে শাস্ত্রীয় অনুবাদ ও শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুর অবতারণা হয় নাই। মহাপ্রভু নিজের জীবন দেখাইয়া বুঝাইলেন, মনুষ্য-লীলার সৌন্দর্য্যপাতেই শাস্ত্র উজ্জ্বল হয় ও মনুষ্য শাস্ত্র হইতে মহত্তর। পুস্তকে যে সকল ভাব ও চরিত্রের কথা বর্ণিত হয়, মহাজনগণের জীবনে তাহা জীবন্তভাবে ক্রিয়া করে।

মনুষ্যত্বের প্রতি উপেক্ষা।

চরিত-সাহিত্যের সূত্রপাত হইল; বঙ্গদেশীয়গণ পৌরাণিক চরিত্রগুলির দেবদত্ত অমানুষী শক্তির বিষয় অবগত হইয়া মনুষ্য-সুলভগুণের প্রতি অবহেলা করিতে শিখিয়াছিল; দয়া, ভক্তি এবং সরলতা প্রভৃতি গুণই প্রকৃত পূজনীয়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অমানুষী বিরাটত্ব বা বহুলত্ব প্রকৃত শোভা কিংবা মহত্ত্ব দান করিতে পারে না—একথা বাঙ্গালী জনসাধারণ তখনও ভাল করিয়া বুঝে নাই; তাই চৈতন্যদেবের ভক্তের মধ্যে অনেকে তাঁহার চরিত্রে অলৌকিক বর্ণপাত করিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন, সুতরাং শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ চৈতন্যদেবের জীবনের অতিমানুষিক

প্রভাব প্রতিপন্ন করিতে অক্ষম হন নাই।* সে সময়ে ধ
জন্য সেরূপ করা আবশ্যক ছিল। চৈতন্যদেবের জীবন সম্ব ...রি

চৈতন্যজীবনী।

সঙ্গিগণের কেহ কেহ করচা বা নোট রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই নোট ও জনশ্রুতি অবলম্বনে এবং তাঁহার কোন কোন সঙ্গীর কথিত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও পরে কৃষ্ণদাস চরিতামৃতের ন্যায় অপূর্ব্ব ভক্তিমিশ্র দর্শনাত্মক চরিতাখ্যান প্রণয়ন করেন। নোটগুলিকে সাবেকী বাঙ্গালায় "করচা" বলিত; ইহাদের মধ্যে মুরারিগুপ্তের করচাখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ, কিন্তু উহা সংস্কৃতে লিখিত, সুতরাং এ পুস্তকে উল্লেখযোগ্য নহে।

গোবিন্দের করচার প্রামাণিকতা।

করচা-লেখকগণের মধ্যে গোবি ... উচ্চ-শিক্ষিত ... বৃত্তান্ত লইয়া ... স দুই বৎসর ... রচর্য্যা করিয়াছেন, কথনও সঙ্গ-বিচ্যুত ... হার লেখায় এমন একটু সারল্যমাখা সত্য-প্রিয়তা আছে, ... খানা ফটোগ্রাফের ন্যায় সুন্দর ও বিশুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান ... বর্ণিত ইতিহাস কথনও পূর্ণ

* ১০০ বৎসর হইল কবি প্রেমানন্দদাস চৈতন্যদেবের অবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় যে সব প্রমাণ উদ্ধার করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই সব প্রমাণসহ কবির স্বহস্তলিখিত কাগজখানি [illegible] পাইয়াছি; তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—বামনপুরাণে ব্যাসং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—"অহমেব ক্বচিৎব্রহ্ম সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়িষ্যে কলৌ পাপহতান্নরান্।" বায়ুপুরাণে—"দিবিজাভুবিজায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তিরূপিণঃ। কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥" মৎস্যপুরাণে,—"শুদ্ধগৌরঃ ... সমুদ্ভবঃ। দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলিযুগে।" এইরূপে গরুড় ... পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, দেবীপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বাল্মীকিপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ, বৃহৎযাম ... তি অনেক পুরাণের নাম করিয়া শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; এসব প্রেমানন্দদাস উদ্ধৃত করিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত পুরাণগুলির নবসংস্করণে সেগুলি খুঁজিয়া না পাইলে পাঠক আমাকে দায়ী করিবেন না।

দিতভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, তবে গোবিন্দের করচা [illegible]কাংশে প্রামাণিক ঐতিহাসিক-গ্রন্থ বলিয়া গণ্য করা যাইতে [illegible]রে।

এই [illegible]স্তকের রচনা নানাবিধ গুণান্বিত। যাঁহার চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তি ও বিস্ময়-উচ্ছ্বসিত অশ্রুসিক্ত অনুচর এই উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার এরূপ প্রেমমধুর চিত্র-লেখা আর কোনও পুস্তকে লিখিত হয় নাই। বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাসকবিরাজ মহাপ্রভুকে দেখেন নাই; জনশ্রুতি, ভক্তগণের বর্ণিত বৃত্তান্ত ও করচাগুলির সাহায্যে তাঁহার মহিমান্বিত চরিত্র উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দ তাঁহার রূপ অনুক্ষণ দর্শন [illegible]সেই রূপমাধুরী অনুক্ষণ ধ্যান করিয়াছেন। জয়ানন্দ [illegible]ন, কিন্তু তাঁহার রচিত চরিতাখ্যানও গোবিন্দে[illegible]রচার ন্যায় চা[illegible]ঘটনার ইতিহাস নহে। গোবিন্দ যে ছবিখানা দেখিতে পাইতেন, [illegible]হা পাণ্ডিত্যের প্রভাবে কৃত্রিম বা রূপান্তরিত হয় [illegible] সরল ভৃত্য প্রভুর খড়ম দুইখানা স্কন্ধে করিয়া কিছু [illegible]র লালসায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেন; তিনি বাগ্দেবীর বরে চি[illegible]। হইয়া ব্যাস ও বাল্মীকির লেখনীর উত্তরাধিকারী হইবেন, এইরূপ কোন অহঙ্কারের ভাব তাঁহার রচনার আবেগপূর্ণ সারল্য পরাভূত করিতে পারে নাই; আমরা নানা কারণে এই পুস্তকখানি চৈতন্যদেব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া অনুমান করি।

করচার চৈতন্যের চরিত্র।

১৫০৮ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানস্থ কাঞ্চননগরবাসী শ্যামদাসকর্ম্মকারের পুত্র গোবিন্দকর্ম্মকার স্ত্রীকর্তৃক 'মূর্খ,' 'নির্গুণ' প্রভৃতি দুর্ব্বাক্যে তিরস্কৃত হইয়া অভিমানে গৃহত্যাগী হন। পরবর্ষের মাঘ মাসের প্রথমার্দ্ধে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সুতরাং সন্ন্যাস গ্রহণের কিঞ্চিদধিক একবৎসর পূর্ব্বে

গোবিন্দের পরিচয়।

গোবিন্দ চৈতন্যপ্রভুকে প্রথম দর্শন করেন, তখন প্রভু স্নানার্থ গঙ্গাতীরে; গোবিন্দ দেখা মাত্র মুগ্ধ হইলেন।

"কটিতে গামছা বাঁধা অপূর্ব্ব দর্শন। সঙ্গে এক অবধূত প্রসন্ন বদন॥ * * * অবশেষে আইলা তথি অদ্বৈত গোঁসাই। এমন তেজস্বী মুই কভু দেখি নাই॥ পক্ক কেশ পক্ক দাড়ী বড় মোহনিয়া। দাড়ী পড়িয়াছে তার হৃদয় ছাড়িয়া॥ * * * আশ্চর্য্য প্রভুর রূপ হেরিতে লাগিনু। রূপের ছটায় মুঞি মোহিত হইনু॥ * * * ঘাটে বসি এই লীলা হেরিনু নয়নে। কি জানি কেমন ভাব উপজিল মনে॥ কদম্বকুসুম সম অঙ্গে কাঁটা দিল। থরথরি সব অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল॥ ঘামিয়া উঠিল দেহ তিতিল বসন। ইচ্ছা অশ্রুজলে মুঞি পাখালি চরণ॥"

প্রভুর দর্শনেই গোবিন্দ পূর্ব্বরাগের ভাবাবেশ অনুভব করিলেন। গোবিন্দ যখন যাহা দেখিয়াছেন, তাহা দেখিতে দেখিতে নোট করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনেক কথায় নূতন নূতন চিত্র লক্ষিত হয়;—চৈতন্য-প্রভুর বাড়ী সম্বন্ধে:—

"গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর। পাঁচখানা বড় ঘর দেখিতে সুন্দর॥ * * * শান্তমূর্ত্তি শচীদেবী অতি খর্ব্বকায়। নিমাই নিমাই বলি সদা ফুকরায়॥ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী হন প্রভুর ঘরণী। প্রভুর সেবায় ব্যস্ত দিবস রজনী॥ লজ্জাবতী বিনয়িনী মৃদু মৃদু ভাষ। মুই হইলাম গিয়া চরণের দাস॥"

গোবিন্দের করচা হইতে আমরা চৈতন্যদেবের একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া নিম্নে প্রদান করিলাম। পাদটীকায় আমরা স্থানগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য দিয়া যাইতেছি।

চৈতন্যের ভ্রমণ।

কণ্টকনগর (কাঁটোয়া) হইতে বর্দ্ধমান; কাঞ্চননগরে গোবিন্দের স্ত্রী তাহাকে ফিরাইয়া লইতে আসে; দামোদর নদ পার হইয়া কাশীমিত্রের বাটীতে অবস্থান; তথা হইতে হাজিপুরে, হাজিপুর হইতে মেদিনীপুরে; এস্থলে কেশবসামন্ত নামক ধনী ব্যক্তি মহাপ্রভুকে কটূক্তি করে; মেদিনীপুর হইতে নারায়ণগড়ে, তৎপর জলেশ্বরে, সুবর্ণরেখা পার হইয়া হরিহরপুরে, হরিহরপুর হইতে বালেশ্বরে, সেস্থান হইতে নীলগড়ে, বৈতরণী নদী পার হইয়া মহানদীর তীরে গোপীনাথদেব ও সাক্ষী-গোপাল দর্শন, নিংরাজের

(লিঙ্গরাজের) মন্দির দর্শন, ইহার পর আঠারনালায় জগন্নাথের মন্দিরের ধ্বজা দর্শনে চৈতন্যপ্রভুর উন্মত্তাবস্থা, পুরীগমন। তিন মাস কাল পুরীতে অবস্থানের পর, ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ৭ই বৈশাখ চৈতন্যপ্রভু দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে বহির্গত হন। পুরী হইতে গোদাবরীতীরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে দেখা করেন।* তথা হইতে ত্রিমন্দনগর † গমন করিয়া তুঙ্গভদ্রাবাসী ঢুণ্ডি-রামতীর্থকে ভক্তিপথে প্রবর্ত্তিত করেন। ত্রিমন্দ হইতে সিদ্ধবটেশ্বরে গমন করেন, ‡ এই স্থানে তীর্থরাম নামক ধনী সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই নামক বেশ্যাদ্বয় দ্বারা চৈতন্যপ্রভুকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন, পরে তাঁহার প্রভাবে নিজেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ৭ দিন বটেশ্বরে থাকিয়া ২০ মাইল ব্যাপক এক জঙ্গল অতিক্রম করেন, তৎপরে মুন্নানগরে § গমন,

---

* চৈতন্যচরিতামৃতেও লিখিত আছে, চৈতন্যদেব গোদাবরীতীরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন; রামানন্দের বাড়ী বিদ্যানগর গোদাবরী হইতে অনেক উত্তরে; রাজকার্য্যো-পলক্ষে রামানন্দের গোদাবরীতীরে থাকা সম্ভব। পুরী হইতে গোদাবরী অনেক দক্ষিণে। এই দুইএর মধ্যে কোন্ কোন্ দেশ চৈতন্যদেব অতিক্রম করেন, করচায় তাহা নির্দ্দিষ্ট নাই। গোদাবরীর কোন শাখা তখন উত্তরদিকে প্রবাহিত ছিল কি না জানা যায় না।

† 'ত্রিমন্দ' শিশির বাবুর অমিয়নিমাইচরিতে 'ত্রিমদ' বলিয়া উল্লিখিত আছে কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর ও চৈতন্যভাগবতে উহা 'ত্রিমল্ল' বলিয়া অভিহিত; বেঙ্কটভট্ট ও ত্রিমল্লভট্ট দুই সহোদরের নাম অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থেই পাওয়া যায়, বেঙ্কট ও ত্রিমল্ল দুইটি নিকটবর্ত্তী স্থানের নামানুসারেই ভ্রাতৃদ্বয় উক্তরূপে অভিহিত হইয়া থাকিবেন; "ত্রিমল্ল"ই প্রকৃত নাম বলিয়া বোধ হয়; উহা হায়দরাবাদ নগরের নিকটস্থ আধুনিক "ত্রিমল্লঘেরী" বলিয়া বোধ হয়।

‡ সিদ্ধবটেশ্বর ('সিদ্ধবটেশ্বরম্') কডপ্পানগরের নিকটবর্ত্তী ও পান্নার নদীর তীরস্থ।

§ মুন্নানগরের নাম পোষ্টাল গাইডে পাইলাম না; বড় ভাল মানচিত্রে মূর্ণা নামক নদী মান্দ্রাজের নিকট দৃষ্ট হয়; এই নদীর তীরে মুন্নাগ্রাম অবস্থিত ছিল (হয়ত এখনও আছে) বলিয়া বোধ হয়।

মুন্না হইতে বেঙ্কটনগরে; * শেষোক্ত স্থানে তিন দিন থাকিয়া বগুলাবনে পন্থভিল নামক দস্যুকে ভক্তিদান করেন, তৎপরে এক বৃক্ষতলে ৩ দিবস হরিনাম করিতে করিতে উন্মত্তাবস্থায় কর্ত্তন, তৎপরে গিরীশ্বরে দুই দিবস যাপন, গিরীশ্বর হইতে ত্রিপদীনগরে, † তথা হইতে পানানরসিংহদর্শন, বিষ্ণুকাঞ্চীতে ‡ গমন এবং তথা হইতে কালতীর্থ ও সন্ধিতীর্থে প্রবেশ— তৎপরে চাইপল্লীনগরে, § সেস্থান হইতে নাগরনগরে ¶ ও নাগর হইতে তাঞ্জোরে ** গমন করেন, তথা হইতে চণ্ডালু পর্ব্বত পার হইয়া

---

* বেঙ্কটনগর পাওয়া গেল না; বোম্বের নিকট এক বেঙ্কটনগর আছে, কিন্তু ইহা সে "বেঙ্কট" কথনই হওয়া সম্ভব নহে; এক নামের অনেকগুলি স্থান সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়; এই করচা-নির্দ্দিষ্ট ত্রিপাত্রনগর ও নাগরনগর আমরা দুই দুই পৃথক স্থানে পাইয়াছি; বেঙ্কটনগর ও মুন্নানগর সিদ্ধবটেশ্বর ও ত্রিপদী নগরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থলে অবস্থিত থাকা সম্ভব; এই দুই স্থানের মধ্যে ব্যবধান প্রায় ৬০ মাইল। গিরীশ্বরও ত্রিপদীনগরের নিকটবর্ত্তী বলিয়া বর্ণিত আছে।

† ত্রিপদীনগর হইতে চৈতন্যদেবের ভ্রমণের রেখা অতি শুদ্ধরূপে অনুসরণ করা যায়; পুরী হইতে ত্রিপদীনগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রদেশের মধ্যে কোন কোন স্থান পাওয়া গেল না, এবং অন্যান্য স্থান সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য একেবারে শুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিতে সাহস হয় না, কিন্তু ত্রিপদী হইতে চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী পর্য্যটনের সঙ্গে বর্ত্তমান মানচিত্রের রেখায় রেখায় মিল পড়িয়া যাইতেছে। ত্রিপদীনগর মাদ্রাজ হইতে ৪০ মাইল উত্তর পশ্চিমে।

‡ পানানরসিংহ প্রভৃতি ছোট ছোট স্থান দর্শন করিয়া চৈতন্য "বিষ্ণুকাঞ্চীপুরে" গমন করেন; ইহা আধুনিক "কাঞ্জিভরম" (কাঞ্চীপুরম্); কাঞ্জিভরম্ ত্রিপদী হইতে প্রায় ৪৭ মাইল দক্ষিণে।

§ কঞ্জিভারম্ হইতে-চাইপল্লী (আধুনিক ত্রিচিনপল্লী অথবা ত্রিচাইপল্লী) প্রায় ১২০ মাইল দক্ষিণে।

¶ ত্রিচাইপল্লী হইতে নাগরনগর ১৪৫ মাইল পূর্ব্বে ও সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত। বোম্বের উপকূলে তুঙ্গনদীর তীরবর্ত্তী এক নাগরনগর (বেদনুরের সমীপবর্ত্তী) আছে, ইহা সেই স্থান নহে।

** তাঞ্জোর,—নাগর হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে।

পদ্মকোটে, * তার পর ত্রিপাত্র নগরে, † সেই স্থান হইতে ৩০০ মাইল ব্যাপক এক জঙ্গল অতিক্রম করেন। ইহাতে একপক্ষ ব্যয়িত হয়। জঙ্গল পার হইয়া রঙ্গধামে ‡ নৃসিংহ মূর্ত্তি দর্শন করেন, রঙ্গধাম হইতে রামনাথ নগরে ¶ ও রামনাথ হইতে রামেশ্বরে গমন করেন। তথা হইতে মাধ্বীক-বনে প্রবেশ করেন ও তাম্রপর্ণী পার হইয়া কন্যাকুমারীতে উপস্থিত হন। কন্যাকুমারী হইতে "ত্রিবঙ্কু" § দেশে প্রবেশ করেন; এই দেশ পর্ব্বত-বেষ্টিত ও ইহার তদানীন্তন রাজা রুদ্রপতি অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ত্রিবঙ্কু হইতে পয়োষ্ণী ** নগরে, তথা হইতে মৎস্যতীর্থ, কাচাড়, ভদ্রানদী, নাগপঞ্চপদী অতিক্রম করিয়া চিতোলে †† গমন করেন। চিতোল হইতে চণ্ডপুর, গুর্জ্জরীনগর, ‡‡ ও পরে পূর্ণনগরে §§ প্রবেশ করেন, পূর্ণনগর তখন 'দাক্ষিণাত্যের নবদ্বীপ' অর্থাৎ শাস্ত্রালোচনার কেন্দ্র-স্থান ছিল। পূর্ণনগর হইতে পাটননগরে, তথা হইতে জেজুরীনগরে গমন করেন; এই স্থলে খাণ্ডবাদেবের পরিচারিকা অভাগিনী মুরলীদিগের বিবরণ দেওয়া আছে। তৎপরে চোরানন্দী বনে নারোজী নামক

---

* পদ্মকোট—তাঞ্জোর হইতে ২৫ মাইল দক্ষিণ।

† ত্রিপাত্র—পদ্মকোট হইতে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণ; পদ্মকোট হইতে প্রায় ১২৫ মাইল উত্তরে আরকটের নিকট অপর এক 'ত্রিপাত্র' নগর আছে, ইহা সেটি নহে।

‡ রঙ্গধাম,—ইহা আধুনিক শ্রীরঙ্গম্, ত্রিপাত্রের দক্ষিণপশ্চিমে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে এই স্থানকে শ্রীরঙ্গ-পটম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৭৬ পৃষ্ঠা); কিন্তু, শ্রীরঙ্গপটম ত্রিপাত্র হইতে প্রায় ৩০০ মাইল উত্তরে; পরবর্ত্তী স্থানগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে শ্রীরঙ্গম্‌কেই রঙ্গধাম বলিয়া স্পষ্ট বোধ হয়।

¶ রামনাথ—সমুদ্রের উপকূলে, রামেশ্বরের অতি নিকটে।

§ ত্রিবঙ্কু—ত্রিবাঙ্কুর।

** পয়োষ্ণী—আধুকি পনানি।

†† চিতোল—বোধ হয় আধুনিক চিত্রলদুর্গ, ইহা মহীশূরের উত্তর সীমান্তে।

‡‡ গুর্জ্জরী—গুজরাত নহে, ইহা হায়দ্রাবাদ রাজ্যের নিকটে।

§§ পূর্ণ—পুণা; এখনও তন্নিকটবর্ত্তী নদীর নাম পূর্ণ রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণদস্যুকে সন্ন্যাসগ্রহণে প্রবর্ত্তিত করেন ; মূলানদী পার হইয়া নাসিকে, নাসিক হইতে ত্রিম্বক ও দমননগর* এবং তাপ্তীনদী অতিক্রম করিয়া ভঁরোচ নগরে প্রবেশ ; ভঁরোচ † হইতে বরদা, তথায় নারোজীর মৃত্যু, আহমদাবাদের ঐশ্বর্য্যবর্ণন ; শুভ্রামতী নদী অতিক্রম করেন, ‡ এস্থলে কুলীনগ্রামবাসী রামানন্দ ও গোবিন্দচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহারা চৈতন্যদেবের সঙ্গী হন। ঘোগা নামক গ্রামে ¶ গমন, বারমুখী বেশ্যার উদ্ধার ; জাফরাবাদ পরে সোমনাথ গমন। সোমনাথের পরে জুনাগড়ে, গৃনার পাহাড় অতিক্রম, ১লা আশ্বিন দ্বারকায় গমন, ১৬ই আশ্বিন দ্বারকা হইতে নর্ম্মদাতীরে দোহাদনগরে, তথা হইতে কুক্ষি, আমঝোড়া, মন্দুরা, দেওঘর (বৈদ্যনাথ নহে), চণ্ডীপুর, রায়পুর, বিদ্যানগর, রত্নপুর গমন ও মহানদী পার হইয়া স্বর্ণগড়ে প্রবেশ, তথা হইতে সম্বলপুর, দাসপাল নগর ও আলালনাথ আগমন—এই স্থান হইতে পুরীতে উপস্থিত হন। §

---

* নাসিক—নাসিক, ত্রিম্বক (বোধ হয় আধুনিক ত্রিম্বুক), ও দমননগর পরস্পরের সন্নিকটবর্ত্তী।

এই দুই স্থানের মধ্যে কালতীর্থ, সন্ধিতীর্থ, পঙ্কতীর্থ প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সব তীর্থ এখন জাগ্রত অবস্থায় কি না বলা যায় না।

† ভঁরোচ—তাপ্তী নদীর নিকট আধুনিক মানচিত্রে ব্রোচ নগর।

‡ আহমদাবাদ নগর ও শুভ্রামতী নদী—মানচিত্র দেখুন।

¶ ঘোগা—পোষ্টাল গাইড দেখুন।

§ সোমনাথ হইতে সমস্ত স্থানই মানচিত্রের সঙ্গে মিলিয়া যায় ; রামানন্দ রায়ের বাড়ী বিদ্যানগর রায়পুর ও রত্নপুরের মধ্যে অবস্থিত থাকা সম্ভব। রায়পুর ও রত্নপুর ভারতবর্ষের যে কোন মানচিত্রে পাওয়া যাইবে ; উহারা সেণ্ট্রাল প্রভিন্সের অন্তর্ব্বর্ত্তী ; স্বর্ণগড়ের এখনকার নাম রায়গড়। গোবিন্দের স্থান-নির্দ্দেশগুলি এরূপ বিশুদ্ধ যে মানচিত্র অনুসরণ করিতে করিতে তাঁহাকে স্বতঃই সাধুবাদ দিতে প্রবৃত্তি হয় ; এই বৃত্তান্তে নিশ্চিতরূপে [illegible] যাইতেছে, চৈতন্যদেব পুরী হইতে পূর্ব্ব উপকূলের সমস্ত দক্ষিণাংশ ক্রমে পরিভ্রমণ করিয়া পশ্চিম উপকূলে ক্রমে গুজরাট পর্য্যন্ত দর্শন করেন, গুজরাট হইতে নর্ম্মদা ও বিন্ধ্যাগিরির সমসূত্রপথে প্রায় এক সরলরেখায় পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১০১০

এই করচার মধ্যে পাঠক ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক নানা তত্ত্ব পাইবেন। ইহাকে 'নোট' সংজ্ঞা দেওয়া উচিত নহে। করচা কাব্য বা ইতিহাসের রেখাপাত মাত্র; ইহা একখানা বিস্তৃত চরিতাখ্যান। উৎকৃষ্ট শিল্পী কর্ম্মকার বহুমূল্যমণিখচিত স্বর্ণময় দেব-বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিলে যতদূর সুন্দর হইতে পারে, গোবিন্দকর্ম্মকারের লেখনী-নির্ম্মিত চৈতন্যমূর্ত্তি তাহা হইতেও সুন্দর হইয়াছে। সিদ্ধবটেশ্বরে তীর্থরাম নামক ধনী ব্যক্তি চৈতন্যদেবকে পরীক্ষা করিতে যাইয়া নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্থলটি উদ্ধৃত করিতেছি ;—

করচায় বর্ণিত চৈতন্য-চরিত্র।

"হেনকালে আইল সেথা তীর্থ ধনবান্॥ দুইজন বেশ্যা সঙ্গে আইলা দেখিতে। সন্ন্যাসীর ভারিভুরি পরীক্ষা করিতে॥ সত্যবাই লক্ষ্মীবাই নামে বেশ্যাদ্বয়। প্রভুর নিকট আসি কত কথা কয়॥ ধনীর শিক্ষায় সেই বেশ্যা দুই জন। প্রভুরে বুঝিতে বহু করে আয়োজন॥ তীর্থরাম মনে মনে নানা কথা বলে। সন্ন্যাসীর তেজ এবে হরে লব ছলে॥ কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী সত্যবালা হাসে। সত্যবালা হাসিমুখে বসে প্রভু পাশে॥ কাঁচলি খুলিয়া সত্য দেখাইলা স্তন। সত্যরে করিলা প্রভু মাতৃ সম্বোধন॥ থরথরি কাঁপে সত্য প্রভুর বচনে। ইহা দেখি লক্ষ্মী বড় ভয় পায় মনে॥ কিছুই বিকার নাই প্রভুর মনেতে। ধেঁয়ে গিয়া সত্যবালা পড়ে চরণেতে॥ কেন অপরাধী কর আমারে জননী। এইমাত্র বলি প্রভু পড়িলা ধরণী॥ খসিল জটার ভার ধূলায় ধূসর। অনুরাগে থরথর কাঁপে কলেবর॥ সব এলোথেলো হলো প্রভুর আমার। কোথা লক্ষ্মী কোথা সত্য নাহি দেখি আর॥ নাচিতে লাগিলা প্রভু বলি হরি হরি। লোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দরদরি॥ গিয়াছে কৌপীন খুলি কোথা বহির্ব্বাস। উলঙ্গ হইয়া নাচে ঘন বহে শ্বাস। আছাড়িয়া পড়ে নাহি মানে কাঁটা খোঁচা। ছিঁড়ে গেল কণ্ঠ হৈতে মালিকার গোছা॥ না খাইয়া অস্থিচর্ম্ম হইয়াছে সার। ক্ষীণ অঙ্গে বহিতেছে শোণিতের ধার॥ হরিনামে মত্ত

খৃষ্টাব্দের ৭ই বৈশাখ তিনি দাক্ষিণাত্য অভিমুখে রওনা হন, ও ১৫১১ খৃষ্টাব্দের ৩রা মাঘ পুরীতে প্রত্যাগমন করেন; সুতরাং এই ভ্রমণকার্য্য ১ বৎসর ৮ মাস ২৬ দিনে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল।

হয়ে নাচে গোরারায়। অঙ্গ হতে অদ্ভুত তেজ বাহিরায়॥ ইহা দেখি সেই ধনী মনে চমকিল। চরণতলেতে পড়ি আশ্রয় লইল॥ চরণে দলেন তারে নাহি বাহ্যজ্ঞান। হরি বলে বাহু তুলে নাচে আগুয়ান॥ সত্যরে বাহুতে ছাঁদি বলে বল হরি। হরি বল প্রাণেশ্বর মুকুন্দ মুরারি॥ কোথা প্রভু কোথায় বা মুকুন্দ মুরারি। অজ্ঞান হইল সবে এইভাব হেরি॥ হরি নামে মত্ত প্রভু নাহি বাহ্যজ্ঞান। ঘাড়িভাঙ্গি পড়িতেছে আকুল পরাণ॥ মুখে লালা অঙ্গে ধূলা নাহিক বসন। কণ্টকিত কলেবর মুদিত নয়ন॥ ভাব দেখি যত বৌদ্ধ বলে হরি হরি। শুনিয়া গোরার চক্ষে বহে অশ্রুবারি॥ পিচকিরি সম অশ্রু বহিতে লাগিল। ইহা দেখি তীর্থরাম কাঁদিয়া উঠিল॥ বড়ই পাষণ্ড মুই বলে তীর্থরাম। কৃপা করি দেহ মোরে প্রভু হরিনাম॥ তীর্থরাম পাষণ্ডেরে করি আলিঙ্গন। প্রভু বলে তীর্থরাম তুমি সাধুজন॥ পবিত্র হইনু আমি পরশে তোমার। তুমি ত প্রধান ভক্ত কহে বারেবার॥"

এই মন্ত্রে নরোজী, ভীলপন্থ দস্যুদ্বয় ও বারমুখী বেশ্যা পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। যে গ্রামে চৈতন্যদেব গমন করিয়াছেন, সে গ্রামের লোক তাঁহাকে ভুলিতে পারে নাই,—গুর্জ্জরীনগরে তাঁহার প্রেমময় মূর্ত্তির এইরূপ একটি প্রতিচ্ছায়া প্রদত্ত হইয়াছে,—

"এত বলি কৃষ্ণ হে বলিয়া ডাক দিল। সে স্থান অমনি যেন বৈকুণ্ঠ হইল॥ অনুকূল বায়ু তবে বহিতে লাগিল। দলে দলে গ্রাম্যলোক আসি দেখা দিল॥ ছুটিল পদ্মের গন্ধ বিমোহিত করি। অজ্ঞান হইয়া নাম করে গৌরহরি॥ প্রভুর মুখের পানে সবার নয়ন। ঝর ঝর করি অশ্রু পড়ে অনুক্ষণ॥ বড় বড় মহারাষ্ট্রী আসি দলে দলে। শুনিতে লাগিল নাম মিলিয়া সকলে॥ পশ্চাৎ ভাগেতে মুই দেখি তাকাইয়া। শত শত কুলবধূ আছে দাঁড়াইয়া॥ নারীগণ অশ্রুজল মুছিছে আঁচলে। ভক্তিভরে হরি নাম শুনিছে সকলে॥ অসংখ্য বৈষ্ণব শৈব সন্ন্যাসী জুটিয়া। হরিনাম শুনিতেছে নয়ন মুদিয়া॥"

ভক্তির পূর্ণ আবেগের সময় এই মনুষ্য-দেবটির শরীরে একরূপ আশ্চর্য্য প্রতিভা প্রকাশ পাইত; অনুচর গোবিন্দও সেই রূপ ভীত হইয়া দর্শন করিতেন,—

"কি কব প্রেমের কথা কহিতে ডরাই। এমন আশ্চর্য্য ভাব কভু দেখি নাই॥ কৃষ্ণ হে বলিয়া ডাকে কথায় কথায়। পাগলের ন্যায় কভু ইতি উতি চায়॥ কি জানি কাহারে

ডাকে আকাশে চাহিয়া। কখন চমকি উঠে কি যেন দেখিয়া॥ উপবাসে কেটে যায় দুই এক দিন। অন্ন না খাইয়া দেহ হইয়াছে ক্ষীণ॥ একদিন গুহা মধ্যে পঞ্চবটী বনে। ভিক্ষা হ'তে এসে মুই দেখি সঙ্গোপনে॥ নিথর নিঃশব্দ সেই জনশূন্য বন। মাঝে মাঝে বাস করে দুই চারি জন॥ ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে বনের ভিতর। চক্ষু মুদি কি ভাবিছে গৌরাঙ্গ-সুন্দর॥ অঙ্গ- হৈতে বাহির হইছে তেজ রাশি। ধ্যান করিতেছে মোর নবীন সন্ন্যাসী॥ এই ভাব হেরি মোর ধাঁধিল নয়ন।"

প্রকৃতি বর্ণনা।

বাঙ্গালী এই জলপ্লাবিত শস্যশ্যামল প্রদেশে খড়ের ঘরে কোনও রূপে দীর্ঘজীবনটি কাটাইয়া দেয়; উত্তরে হিমাদ্রি, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে বিন্ধ্য,—নিকট-বর্ত্তি-প্রকৃতির এই মহান্ আলেখ্য বাঙ্গালীকে মাতৃভূমির ক্রোড় হইতে বড় ভুলাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। এদেশের উর্ব্বর ক্ষেত্ররাশি অকাতরে শস্যদান করিত, উদর স্বচ্ছন্দে পূর্ণ করিয়া বঙ্গবীরগণ বাড়ীর চতুঃসীমানায় ভ্রমণ ও নিয়মিতরূপে রজনীপাত করিতেন। রণক্ষেত্রে যাইতে সিপাহীর যে আগ্রহ,—পাঠশালা, গোশালা কিম্বা তদ্রূপ নিকটবর্ত্তী অন্য কোন কর্ম্মশালা হইতে বাঙ্গালীর স্বমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তনের তদ্রূপই আগ্রহ,—ইহা তাঁহার ঐতিহাসিক দুর্নাম। এই দোষে বঙ্গীয় প্রাচীন-কাব্যে স্বভাবের মহিমান্বিত পট চিত্রিত হয় নাই। বাইরণ, স্কট কি ওয়ার্ডসোয়ার্থের রচনায়, কোথাও ক্লিটামনাসের উজ্জ্বল ও ভীতিকর চিত্র, বজ্রনাদি-ঝরণার শব্দে প্রতিশব্দিত জাঙ্গ্ ফ্রে ও আপিনাইনের তুষার-ধবল উদাসকান্তি, কোথাও লক্‌লেমন্, লক্‌কেট্রিন্ প্রভৃতি পাহাড়-বেষ্টিত তড়াগের সুন্দর ও বিস্ময়কর কান্তি, কোথাও টিন্‌টারণ্ সন্নিহিত মৃদু নীলোজ্জ্বল সলিলের গতির বর্ণনায় যে অভিনব মহত্ব-মিশ্র সৌন্দর্য্যের আভা পড়িয়াছে, বঙ্গদেশের ঈষৎ উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে তাহা হইতে শতগুণ শোভা ও মহিমান্বিতা প্রকৃতির মূর্ত্তি; কিন্তু গৃহস্থ বাঙ্গালী ভ্রমণ-কার্য্যে নিতান্তই অপারগ ছিল, তাই প্রাচীন সাহিত্যে ভেরাণ্ডার থাম ও জবাপুষ্প অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট প্রাকৃতিক চিত্রের অঙ্কন প্রায়ই দৃষ্ট

হয় না। কিন্তু গোবিন্দের প্রকৃতিবর্ণনায় বঙ্গীয় প্রাচীন-সাহিত্য-দুর্লভ রূপের প্রভা পড়িয়াছে; ঘরের নিরুদ্ধ-বায়ু-সেবনাভ্যস্ত বাঙ্গালী ঘরের বাহির হইয়া প্রকৃতির নব নব চিত্র দর্শন করিয়াছেন, তাই তাঁহার লেখায় এক প্রফুল্ল নব সৌন্দর্য্যের বায়ু প্রবাহিত হইয়া চিত্রগুলি স্ফূর্ত্তিশালী ও জীবন্ত করিয়াছে:—নীলগিরি বর্ণনাটি আধুনিক কবির রচনার ন্যায় সরল ও সুন্দরভাবে গ্রথিত।

"কিবা শোভা পায় আহা নীলগিরিরাজে। ধ্যানমগ্ন যেন মহাপুরুষ বিরাজে॥ কত শত গুহা তার নিম্নে শোভা পায়। আশ্চর্য্য তাহার ভাব শোভিছে চূড়ায়॥ বড় বড় বৃক্ষ তার শির আরোহিয়া। চামর ব্যজন করে বাতাসে দুলিয়া॥ ঝর ঝর শব্দে পড়ে ঝর-ণার জল। তাহা দেখি বাড়িল মনের কুতূহল॥ পর্ব্বতের নিয়ড়েতে ঘুরিয়া বেড়াই। নবীন নবীন শোভা দেখিবার পাই॥ কত শত লতা বৃক্ষ করিয়া বেষ্টন। আদরেতে দেখাইছে দম্পতি বন্ধন॥ ময়ূর বসিয়া ডালে কেকারব করে। নানাজাতি পক্ষী গায় সুমধুর স্বরে॥ নানাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আলা। প্রকৃতির গলে যেন দুলিতেছে মালা॥ রজনীতে কত লতা ধগ্‌ধগি জ্বলে। গাছে গাছে জোনাকি জ্বলিছে দলে দলে॥ ক্ষুদ্র এক নদী বহে ঝুরু ঝুরু স্বরে। তার ধারে বসি প্রভু সন্ধ্যাপূজা করে॥"

কিন্তু স্থানে স্থানে গম্ভীরতরভাবের ছায়া আছে, কন্যাকুমারীর বর্ণনায়'—

"তাম্রপর্ণী পার হয়ে সমুদ্রের ধারে। প্রভু—কন্যাকুমারী চলিল দেখিবারে॥ কেবল সিন্ধুর শব্দ শুনিবার পাই। পর্ব্বত কানন দেশ নাহি সেই ঠাঁই॥ হুঁ হুঁ শব্দে সমুদ্র ডাকিছে নিরন্তর। কি কব অধিক সেথা সকলি সুন্দর॥ দেখিবার কিছুঁ নাই তথাপি শোভন। সেথানে সৌন্দর্য্য দেখে শুদ্ধ যার মন॥"

সেথানে দেখিবার কিছুই নাই,—কিন্তু জাগতিক সমস্ত দ্রব্যের সমাধির ন্যায় সেই বিশাল অনন্ত ক্ষেত্রের অনুভবনীয় শোভা ধারণা করিতে শুদ্ধচিত্তের প্রয়োজন।

কবির চিত্তে প্রকৃতি অলক্ষিতভাবে একটি অস্পষ্ট, নিগূঢ় উচ্চভাব বিম্বিত করিয়া দিয়াছিল।

গোবিন্দের করচার আর এক গুণ, ইহাতে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার মালিন্য নাই; এই অনাবিল রচনা সর্ব্বত্র সুরুচিসঙ্গত ও সুস্বাদু। পরবর্ত্তী লেখকগণের বৈষ্ণবীয় বিনয়ও, স্থলে স্থলে সাম্প্রদায়িকতার মিশ্রণে দুষ্ট হইয়াছে; কিন্তু যাঁহার নাম করিয়া সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছিল, তিনি নিজে অসংশ্লিষ্ট ও অসাম্প্রদায়িক ছিলেন; তাঁহার প্রিয় অনুচরের লেখায়ও অসাম্প্রদায়িক উদারতার প্রীতিফুল্লভাব শ্রেণীনির্ব্বিশেষে সকলের মনোরঞ্জন করিবে।

চৈতন্যপ্রভুর অসাম্প্রদায়িক ভাব।

চৈতন্যপ্রভু যেখানে যে দেবতা দেখিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে সঙ্কেতমাত্রে চিরারাধ্য ভগবানের স্মৃতি উদ্রেক করিয়া দিয়াছে। পরবর্ত্তী সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণ তাঁহার এই জগৎপূজ্য পবিত্রচরিত্রকে একদর্শি-সংকীর্ণতায় সংক্ষুব্ধ করিয়া শাক্ত-বৈষ্ণবের কোলাহলময় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, এই বিদ্বেষপ্রণোদিত সাম্প্রদায়িকধর্ম্মে তাঁহার অণুমাত্রও অনুমোদন ছিল না; নারায়ণগড়ে তিনি "ধলেশ্বর" শিব দর্শনে—"হর হর বলি প্রভু উচ্চরব করি। আছাড় খাইয়া পড়ে ধরণী উপরি॥" জলেশ্বরের 'বিল্বেশ্বর' শিব দর্শনেও তাঁহার ভাবোচ্ছ্বাস হইয়াছিল, বেঙ্কটনগরের নিকট "গিরীশ্বর" শিব দর্শন করিতে অনুরাগী হইয়া তিনি দীর্ঘপথ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, পাটস গ্রামের নিকট "ভোলেশ্বর" শিব দর্শনে "প্রভুর প্রেম উপজিল। জোড় হস্তে স্তব স্তুতি বহুত করিল॥ অজ্ঞান হইয়া গোরা পড়িয়া ধরায়। উলটি পালটি কত গড়াগড়ি যায়॥" এবং সোমনাথদর্শনে তাঁহার যে ব্যাকুলতা হইয়াছিল, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ত্রিম্বকের নিকট রামের চরণচিহ্ন বিদ্যমান ছিল বলিয়া কথিত আছে, "চরণের চিহ্ন প্রভু করিয়া পরশ। গাঢ়তর প্রেমভরে হইলা অবশ॥ অবশেষে মোর কণ্ঠ আঁকড়ি ধরিয়া। কোথা মোর রাম বলি উঠিলা কান্দিয়া॥" পঞ্চবটী বনে যাইয়া তিনি 'গণেশ' বিগ্রহ দেখিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। পদ্মকোট তীর্থে দেবী অষ্টভুজা ভগবতী দেখিবার জন্য গমন করেন এবং—"সেখানেই প্রভু গিয়া করিল প্রণতি।" দমন-নগরের নিকট সুরথপ্রতিষ্ঠিত অষ্টভুজা শক্তিমূর্ত্তি "দেখি প্রভু ধরণী লুটায়" ও

সেই মূর্ত্তি "দেখিয়া নয়নে। তিনদিন বাস করে প্রভু সেই স্থানে॥" এইরূপ বহুবিধ স্থলেই তাঁহার উদার ভক্তিমূলক ধর্ম্ম দৃষ্ট হইবে। "না করিব অন্য দেব নিন্দন বন্দন"—এই কথায় চৈতন্যদেবের স্বাক্ষর কোথায়? তিনি ত শ্রীকৃষ্ণসেবক, শিবসেবক, রামসেবক, অষ্টভুজাসেবক, গণেশসেবক, কিম্বা এ সকলের কাহারও সেবক নহেন;—এ সমস্ত বিগ্রহ, চিহ্নস্বরূপ যাঁহার কথা আভাসে জ্ঞাপন করিতেছে, তিনি তাঁহারই প্রকৃত সেবক; যে কথা তাঁহার বিরহ-মথিত—হৃদয়ে অশ্রুর অক্ষরে চিরলিখিত ছিল, সেই অন্তঃপ্রবাহিত চিরনির্ম্মল ঈশ্বরকথা—যে স্থানে লোকভক্তির চিহ্নিত স্থান,—তীর্থভূমি, সেই স্থানে কিংবা সর্ব্বত্রই উদ্রিক্ত হইয়াছে। এবং একথা নিশ্চয় যে, শ্রেণীবিশেষকে বিশেষরূপে আপ্যায়িত করিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই। *

গোবিন্দের চরিত্র।

গোবিন্দের সরলতা ও আড়ম্বরশূন্যতা করচার সর্ব্বত্রই বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য; সামান্য ঘটনাগুলি নিপুণ কবির স্পষ্ট ও সংযত বর্ণনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার নিজ সম্বন্ধীয় বর্ণনাগুলি এতদূর অকৃত্রিম ও অভিমানশূন্য যে, সময় সময় তাঁহার চরিত্রকে তিনি অনাহূত ভাবে নিজেই উপহাসযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন; কোথাও একটা 'পরেটা ফল' একটা 'লাডডু' ও গুড়-সংযুক্ত 'চুক্রাম্ল' দেখিয়া খাইবার প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেই প্রবৃত্তিকে তিনি নৈতিক চক্ষে দেখিয়া অতিরঞ্জিত অপরাধের শ্রেণীতে গণ্য করিয়াছেন। নিজে অবশ্য স্বচরিত্রকে একটু সভ্যভব্য ও সুমার্জ্জিত করিয়া বর্ণনা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি আদৌ করেন নাই। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের সময় গোবিন্দও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি যতই কেন ক্ষুদ্র হউন না,

* গোঁড়া বৈষ্ণবগণ এই করচার প্রতি শ্রদ্ধাবান নহেন। তাঁহারা বহুদিন যাবত এই পুস্তকখানিকে অমূলক প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু সত্যের অপলাপ করিবার শক্তি মানুষের নাই।

এই বিষম সংসার-কারাগৃহের শৃঙ্খল তাঁহার পক্ষেও বলবৎ শক্তিশালী ছিল, সন্দেহ নাই। "সোণার শৃঙ্খল মায়া,—লৌহের শৃঙ্খল। স্বর্ণমত মনোরম লৌহ-মত দৃঢ়।" ইহা ছেদন করা তাঁহার পক্ষে সহজ কার্য্য ছিল না; কিন্তু তিনি তৎসম্বন্ধে একটি কথাও বলা প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই; অনেক কবিই এতদুপলক্ষে বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের ছদ্মবেশে আত্ম-বিজৃম্ভণ করিতে ছাড়িতেন না। গোবিন্দের মুখে এই সন্ন্যাসের কথা বহুদিন পরে অপর এক প্রসঙ্গে অজ্ঞাতসারে প্রকাশিত হইয়াছিল,—কাঞ্চননগরে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনের কথা শুনিয়া তিনি এই বলিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন, "প্রভুর সন্ন্যাসকালে ধরেছি কৌপীন। অহঙ্কার ত্যজিয়া হয়েছি অতি দীন॥ আর ত বাসনা নাই সংসার করিতে।" তাঁহার স্ত্রী যখন মর্ম্মভেদী দুঃখের কথা বলিয়া তাঁহাকে গৃহে ফিরাইতে চাহিয়াছিল, তখন সংসার আবার সুন্দর ও করুণ আহ্বানে তাঁহাকে শৃঙ্খল পরাইতে আসিয়াছে, এই ভয়ে ভীত হইয়া গোবিন্দ ঈশ্বরের শরণ লইয়াছিলেন,—"শুনিয়া তাহার কথা মাথা হেঁট করি। মনে মনে বলিতে লাগিনু হরি হরি॥ হরি শরণেতে কাটে যতেক বন্ধন। সেকারণে মনে করি হরির চরণ॥"

তাঁহার প্রভুভক্তি।

মিষ্টান্নব্যবসায়ী মিষ্টের স্বাদ ভুলিয়া যায়, কিন্তু তথাপি মিষ্টদ্রব্য লইয়া নড়াচাড়া না করিয়া থাকিতে পারে না, উহা তাহার জীবিকা ও মুখ্যচিন্তা, চৈতন্য-দেবের ভক্তির উচ্ছ্বাস, যাহা দেখিয়া সমস্ত লোক অশ্রুসিঞ্চিত হইয়াছে, যে ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া গোবিন্দ প্রথম দিন বলিয়াছিলেন,—"ইচ্ছা অশ্রু-জলে মুঞি পাখালি চরণ॥" সর্ব্বদা সাহচর্য্যহেতু সেই ভক্তিবিহ্বলতায় গোবিন্দ একান্তরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহার সম্মুখে এক প্রবল ভক্তি-বন্যায় ধরিত্রী টলমল করিতেছিল, কিন্তু তিনি সর্ব্বদা সে দৃশ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়াছেন, এ কথা বলেন নাই। কিন্তু কোন কোন মুহূর্ত্তে স্বর্গীয় ভাবে তাঁহার হৃদয় অভিভূত হইয়া না পড়িয়াছে এমন নহে। অগস্ত্যকুণ্ডতীরে একদিন চৈতন্যপ্রভুর উদ্দামভক্তি দর্শনে গোবিন্দ এই দুইটি ছত্র লিখিয়াছেন

—"প্রভুর মুখেতে নাম শুনিয়াছি কত। আজি কিন্তু দেহ মোর হৈল পুলকিত॥" নিত্য দেবলীলা দেখিতে দেখিতে তিনি লীলারসের নিত্য নূতন আস্বাদ ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রকৃত ভক্তির হ্রাস হয় নাই, যেমন গঙ্গাতীরবাসী লোক মফঃস্বলের লোকের ন্যায় গঙ্গাদর্শনে হঠাৎ আনন্দ বোধ করে না, অথচ গঙ্গাতীর ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিতেও পারে না। দুই-দিনের জন্য প্রভুসঙ্গবিচ্যুত হওয়ার আক্ষেপে গোবিন্দ—"মোর চক্ষে শত ধারা বহিতে লাগিল।"—এইরূপ কাতরতা দেখাইয়াছেন।

তাঁহার নৈতিক বিশুদ্ধতা।

গোবিন্দের নৈতিক জীবনটি বড় নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ ছিল, তাহা বাক্য-পল্লব পরম্পরায় তিনি নিজে কীর্ত্তন করেন নাই, কিন্তু সহসা দুই একটি বাক্য তাঁহার সমগ্র চরিত্রের উপর এক পবিত্র মধুর আলোকপাত করিয়া দিয়াছে। চৈতন্যদেব দস্যু, তস্কর প্রভৃতির নিকট গিয়াছেন, গোবিন্দ বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইয়াছেন। চৈতন্য প্রভুর কোন অভিপ্রায়ে তিনি ইঙ্গিতেও বাধা দেন নাই, কিন্তু যেদিন প্রভু মুরলী বেশ্যাদিগের নিকট যাইতে উদ্যত, সেদিন গোবিন্দ একটু আপত্তি করিয়াছিলেন:—"মুহি বলি সে স্থানেতে গিয়া কাজ নাই। না শুনিল মোর বাণী চৈতন্য গোসাই॥" এই একমাত্র আপত্তি তাঁহার নৈতিক সাবধানতার বিশেষরূপ অভিব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

তাঁহার সত্যপ্রিয়তা।

গোবিন্দ যে স্থলে চৈতন্যদেবের রূপের বর্ণনা করিতে গিয়াছেন, সেস্থলে তাঁহার হৃদয়ের গাঢ়ভক্তি-প্রণোদিত কবিত্ব উদ্রিক্ত হইয়াছে:—"যদ্যপি দাঁড়ায় প্রভু অন্ধকার ঘরে। শরীরের প্রভায় আঁধার নাশ করে॥" এ সব কথায় একটু কল্পনা না আছে এমন নহে, ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু দৈনন্দিন ঘটনা তিনি কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত করেন নাই, সেরূপ অতিরঞ্জন সত্যনিষ্ঠ, বিষয়নিস্পৃহ ভক্তির অবতার চৈতন্যদেবের অনুচরের অনুপযুক্ত হইত। মহারাষ্ট্র ও তন্নিকটবর্ত্তী অপরাপর দেশীয় লোকের কথা গোবিন্দ বুঝিতে পারেন নাই

বগুলাবনে—"একজন লোক আসি কাঁইমাই করি। কি বলিল আমি সব বুঝিতে না পারি॥ তার বাক্য বুলি সব প্রভু সমঝিয়া। কাঁইমাই বলি তারে দিলেন বুঝাইয়া॥" এস্থলে পাঠকের মনে হইতে পারে চৈতন্য প্রভু স্বর্গীয় শক্তি-প্রভাবে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষা বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু গোবিন্দ সেরূপ অলৌকিক কল্পনা করিবার আদৌ সুবিধা দেন নাই, কিছু পরেই লিখিয়াছেন:—"এই দেশে ভ্রমি দীর্ঘকাল। সকলের ভাষা বুঝে শচীর দুলাল॥"

চৈতন্য প্রভুর স্বর্গীয় ভক্তিপ্রভাবের আশ্চর্য্য মোহিনীশক্তিতে দস্যু, তস্কর, বেশ্যা উদ্ধার পাইয়াছে; যেখানে সে ভক্তির বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে, সেস্থান তীর্থধামের তুল্য পবিত্র হইয়াছে; পাষণ্ড নাস্তিকের মন ফিরিয়া গিয়াছে; কিন্তু দুই এক স্থলে বিষয়বুদ্ধিদুষ্ট, অর্থযৌবন-স্পর্দ্ধিত ব্যক্তি সে প্রভাবে ধরা পড়ে নাই। নরসমাজে এমন দুই একজন আছে, সম্যক্ অভিব্যক্ত সাধু-জীবনের সৌন্দর্য্য ও সুরভি যাহাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, ভগবান্ পশুকে পুষ্পশোভা ও পুষ্পগন্ধ উপভোগ করিতে শক্তি দেন নাই। হাজিপুরে কেশবসামন্ত চৈতন্যপ্রভুকে কটূক্তি করিয়াছিল, কিন্তু চৈতন্যপ্রভু তাহাকে ভক্তি দিতে পারেন নাই, তাঁহার চেষ্টা সেস্থলে বিফল হইয়াছিল, গোবিন্দ তাহা ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন, কেশবসামন্তের ব্যবহার দেখিয়া চৈতন্যপ্রভু হাজিপুর ত্যাগ করিলেন:—"নারায়ণগড় পানে চল মোরা যাই। সেই খানে গেলে যদি কোন সুখ পাই॥" এইরূপ ভাবের কথা চৈতন্যপ্রভু সম্বন্ধে অন্য কোন কোন পুস্তকে আছে বলিয়া আমরা জানি না, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমরা পুনরায় বলিতেছি, এই সত্যভাষী সেবকের লেখনীতে চৈতন্যদেবের প্রকৃতসৌন্দর্য্য যেরূপ প্রস্ফুট হইয়াছে, অন্যত্র তাহা বিরল।

পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন।

বহুদিনের কৃচ্ছ্র-সাধনে কৃশশরীর, সমস্ত দাক্ষিণাত্য পর্য্যটনে, উপবাসে ও ভক্তিবিহ্বলতায় ব্যাকুল চৈতন্যদেবের পরিমৃদিত কমলনিভ সুক্ষীণ অথচ মনোহর দেহযষ্টিতে ছিন্ন বহির্বাস ও পরিক্ষিপ্ত ধূলিরেণু বিরাজ করিতেছিল এবং

তাহা যুগপৎ কারুণ্য ও ভালবাসার পরিক্লিষ্ট লাবণ্যে হেমন্তের পদ্মের শ্রী ধারণ করিয়াছিল,—"ছিন্ন এক বহির্বাস পাগলের বেশ। সদা উনমত্ত প্রভু কৃষ্ণেতে আবেশ॥ সব অঙ্গে ধূলি মাখা মুদিত নয়ন।" এই শ্রীমূর্ত্তির দর্শনলোলুপ সমস্ত বঙ্গদেশ—নবদ্বীপ ও উড়িষ্যার পণ্ডিত ভক্তমণ্ডলী—চিরবিরহক্ষিন্ন হইয়া ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিল, প্রভু ত তাহাদিগকে স্মরণ করেন নাই, তাহারা প্রভুদর্শন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে জীবন ধারণ করে নাই। এই সুদীর্ঘ দুই বৎসরের মধ্যে চৈতন্য একদিন মাত্র প্রলাপে নরহরির নাম করিয়াছিলেন,—"কখন বলেন এস প্রাণ নরহরি। কৃষ্ণনাম শুনে তোরে আলিঙ্গন করি॥" তাহারা ত দিবারাত্র গৌরনাম লইয়া কাঁদিতেছিল, সঙ্গে যাইতে অনুমতি পায় নাই, কিন্তু সেই স্বর্গীয়সঙ্গের স্মৃতিসুখে তাহারা পার্থিব কষ্ট ভুলিয়াছিল; তিনি দু বৎসর পরে আসিতেছেন, এই সংবাদ চকিতে বঙ্গদেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, সেই অসম্ভব সুধাস্বাদন-প্রত্যাশায় প্রত্যেক ভক্তের হৃদয় বিহ্বল হইল; চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণমিলনের পূর্ব্বাভাস-মুগ্ধা রাধিকার এই অবস্থা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন,—"চিকুর ফুরিছে, বসন খসিছে, পুলক যৌবন ভার। বাম অঙ্গ আঁখি, সঘনে নাচিছে, দুলিছে হিয়ার হার॥" এই শুভলক্ষণাক্রান্ত মুহূর্ত্ত দীর্ঘ কালের পরে ভক্তগণের জীবনে ফিরিয়া আসিল। প্রভুকে তাহারা যে সমারোহপূর্ণ আনন্দোৎসবের সঙ্গে অভ্যর্থনা করিল, তাহা এক অশ্রুতপূর্ব্ব সুখের চিত্রপটের ন্যায় গোবিন্দ দাস আঁকিয়া দেখাইয়াছেন, আমরা সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করিলাম:—

"আলালনাথের কাছে প্রভু যবে আসে। গদাধর মুরারি ছুটিয়া আইল পাশে॥ খঞ্জন আচার্য্য আসে বড় অনুরাগে। খোঁড়া বটে তবু আইসে সকলের আগে॥ সার্ব্বভৌম আসে দুই ডঙ্কা বাজাইয়া। নরহরি দেখা দেয় নিশান লইয়া॥ হরিদাস রামদাস আর কৃষ্ণদাস। ব্যগ্র হইয়া আসে সবে ঘন বহে শ্বাস॥ জগন্নাথ দাস আর দেবকীনন্দন। ছোট হরিদাস আর গায়ক লক্ষ্মণ॥ বিষ্ণুদাস পুরীদাস আর দামোদর। নারায়ণতীর্থ আর দাস গিরিধর॥ গিরি পুরী সরস্বতী অসংখ্য ব্রাহ্মণ। প্রভুরে দেখিতে সবে করে আগমন॥ রামশিঙ্গা বাজাইতে বড়ই পণ্ডিত। বলরামদাস আসে হয়ে পুলকিত।

শত শত পণ্ডিত গোঁসাই দেখা দিল। আনন্দে আমার চিত্ত নাচিতে লাগিল॥ কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ গান গায়॥ এক মুখে সে আনন্দ কহনে না যায়॥ হাজার হাজার লোক প্রভুকে ঘেরিয়া। নাম আরম্ভিলা সব আনন্দে মাতিয়া॥ মুরারি মুকুন্দে প্রভু কোল দিতে গেলা। ঠাকুর নিকটে গুপ্ত ঢলিয়া পড়িলা॥ সিদ্ধ কৃষ্ণদাস আসি প্রণাম করিল। হাত ধরি তুলি তারে প্রভু আলিঙ্গিল॥ একত্রে মিলিয়া আর আর ভক্তগণে। প্রভুকে লইতে সবে করে আগমনে॥ মাদল বাজায় যত বৈষ্ণবের দল। আনন্দ করয়ে প্রভুর আঁখি ছল ছল॥ কীর্ত্তন করয়ে যত বৈষ্ণব মিলিয়া। মাথা ঢুলাইয়া নাচে গোরা বিনোদিয়া॥ খঞ্জনে দেখিয়া প্রভু দিয়া হরি বোল। দুই বাহু পাশরিয়া দিলা তারে কোল॥ নাচিতে লাগিলা গোরা বাহু পশারিয়া। সার্ব্বভৌম-পদতলে পড়িল লুটিয়া॥ হাত জোড়ি সার্ব্বভৌম কহিতে লাগিল। তোমার বিরহ-বাণ হৃদয়ে বিন্ধিল॥ বড় মূঢ় বলি তব বিরহ সহিয়া। এত দিন আছি মুহি পরাণ ধরিয়া॥...শ্বেত নীল বিচিত্র পতাকা শত শত। গুড়্ গুড়্ শব্দ করি ডঙ্কা বাজে কত॥ কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দে মাতিয়া। একদৃষ্টে কত লোক রহিল চাহিয়া॥ হেলিতে দুলিতে যায় শচীর দুলাল। মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥ হস্ত তুলি নাচিতে লাগিল গদাধর। রঘুনাথ দাস নাচে আর দামোদর॥ প্রভু পুছে রঘুনাথে আদর করিয়া। বড়ই আনন্দ পাই তোমারে দেখিয়া॥ রঘুনাথে কোল দিতে যান গোরা রায়। রঘুনাথ পদতলে পড়িয়া লুটায়॥ মাঘের তৃতীয় দিনে মোর গোরা রায়। সঙ্গোপাঙ্গ সহ মিলি পুরীতে পৌঁছায়॥ অপরাহ্ণে মহাপ্রভু পুরীতে পৌঁছিলা। কোটি কোটি লোক তথা আসি ঝাঁকি দিলা॥ ধূলাপায় প্রভু বহু লোক করি সাথ। হেরিলেন মন্দিরে প্রবেশি জগন্নাথ॥ এক দৃষ্টে মহাবিষ্ণু দেখিতে দেখিতে। দর দর প্রেম-অশ্রু লাগিল বহিতে॥ একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়ে গোরা রায়। অমনি আছাড় খেয়ে পড়িল ধরায়॥ * * * * ধন্য হইলাম আজি এই কথা বলি। আনন্দে সকলে নাচে দিয়া করতালি॥ * * বড় পটু রামদাস ভেরী বাজাইতে। এই জন্য নিত্য আসে কীর্ত্তনের ভিতে॥ বড় ভক্ত রামদাস প্রেম অনুরাগে। ভেরী বাজাইয়া চলে কীর্ত্তনের আগে॥ আনন্দে প্রতাপ রুদ্র ছাড়ি রাজপাট। মিশ্রের ভবনে আসি নিত্য দেখে নাট॥"

করচার দোষ।

গোবিন্দদাসের করচায় চৈতন্যদেবের উপদেশগুলির মনোহারিত্ব নষ্ট হইয়াছে; অশিক্ষিত ভৃত্য হইতে আমরা তাহা প্রত্যাশা করিতে পারি না। যে উপদেশশ্রবণে শত শত লোক মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে উপদেশ গোবিন্দের

লেখনীতে ভালরূপ ফোটে নাই। রামানন্দরায়ের সঙ্গে আলাপ ও দাক্ষিণাত্যের বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গে চৈতন্যপ্রভুর বিচার উচ্চ শিক্ষার অভাবে গোবিন্দ লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই; কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত কোন বিজ্ঞব্যক্তি সেই সব স্থলে উপস্থিত থাকিলে উপযুক্ত বিবরণ পাওয়া যাইত।

নিম্ন শ্রেণীতে শিক্ষা-বিস্তার।

গোবিন্দদাসের করচা পড়িয়া মনে হয়, সেকালেও "অস্ত্রহাতা বেড়ি-গড়া" অপেক্ষা কর্ম্মকার শ্রেণীর মধ্যেও কেহ কেহ উৎকৃষ্টতর ব্যবসায়ের জন্য যোগ্যতা দেখাইতেন; সমাজের অস্থায়ি-সীমাবন্ধনী কোন কালেই মানব-প্রকৃতির প্রকৃতসীমাবন্ধনী বলিয়া গণ্য হয় নাই। *

---

* জয়ানন্দকৃত চৈতন্যমঙ্গলের কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথি সম্প্রতি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে মহাপ্রভুর সঙ্গে গোবিন্দ কর্ম্মকারের দাক্ষিণাত্য যাওয়ার বিষয় উল্লিখিত আছে। সুতরাং যাঁহারা বলিয়াছিলেন গোবিন্দ কর্ম্মকারজাতীয় ছিলেন না, তিনি কায়স্থ ছিলেন, এবং এই মত প্রচার করিয়া প্রকাশিত গোবিন্দদাসের করচার ৫০ পৃষ্ঠা জাল বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যুক্তি নিতান্ত হীনবল হইয়া পড়িয়াছে। গোবিন্দদাসের করচাপ্রকাশক শ্রীযুক্ত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় আমাদের নিকট যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে করচার আদ্যন্ত খাঁটি জিনিষ বলিয়া আমাদের দৃঢ় ধারণা হইয়াছে। বিরুদ্ধবাদী মহোদয়গণ উক্ত ৫০ পৃষ্ঠা জাল প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া যে সকল যুক্তি প্রচার করিয়াছিলেন, এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের টীকায় (১৯২ পৃঃ) তাহা বিস্তারিত ভাবে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। জয়ানন্দের পুঁথিতে গোবিন্দ স্পষ্টরূপে কর্ম্মকার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন,—ইহা আবিষ্কৃত হওয়ার পর আমাদের বিশ্বাস নিঃসংশয়রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, সুতরাং সেই সকল যুক্তিতর্কের পুনশ্চ অবতারণা করা প্রয়োজনীয় মনে করিও না। তবে করচার ভাষা দৃষ্টে বোধ হয়, দুএক স্থলে শব্দাদির সংশোধন হইয়া থাকিবে,—কিন্তু নিখুঁত প্রাচীনরচনা এখন কোন পুস্তকেরই নাই।—নকলকারিগণ সকল পুঁথিরই এক আধটু সংশোধন করিয়াছেন, তজ্জন্য এই প্রাচীন-তত্ত্ববহুল উৎকৃষ্ট প্রামাণিক পুস্তকখানিকে আমরা উড়াইয়া দিতে পারি না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, "গোবিন্দদাসের করচা নামক যে চৈতন্যজীবনী

(খ) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

কবির পরিচয়।

কবি জয়ানন্দ বর্দ্ধমানস্থ আমাইপুরা গ্রাম (বৈষ্ণবাচারদর্পণমতে অম্বিকা) নিবাসী সুবুদ্ধিমিশ্রের পুত্র। চৈতন্য চরিতামৃত, বৈষ্ণবাচারদর্পণ প্রভৃতি পুস্তকে চৈতন্যশাখায় সুবুদ্ধিমিশ্রের নাম উল্লিখিত আছে। কবি যে বংশে জন্ম-গ্রহণ করেন, সেই বংশের নাম স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের দ্বারা ইতিহাসে উজ্জ্বল রহিয়াছে। কবি—"খুড়া জেঠা পাষণ্ড চৈতন্য অল্প ভক্তি"—বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আত্মীয়বর্গের মধ্যে বাণীনাথ মিশ্র, মহানন্দ-বিদ্যাভূষণ, ইন্দ্রিয়ানন্দ কবীন্দ্র, বৈষ্ণব মিশ্র এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামানন্দ-মিশ্রের কথা গর্ব্বের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই সদ্বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক ছিলেন। সেকালে যিনি যত বেশী উপবাস করিতে পারিতেন, তিনি সমাজে ততদূর আদরণীয় হইতেন। কৃত্তিবাস—"শ্রীকরণ ভাই মোর নিত্য উপবাসী"—বলিয়া ভ্রাতার উপবাসের বড়াই করিয়াছেন, জয়ানন্দও—"বাণীনাথ মিশ্র ষট্ রাত্রি উপবাসী"—সগর্ব্বে প্রচার করিতে ক্রটী করেন নাই। জয়ানন্দ মাতামহগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। কবির মাতার নাম ছিল রোদনী; তাঁহার ছেলে হইয়া বাঁচিত না, এজন্য জয়ানন্দের নাম রাখা হইয়াছিল 'গুইঞা'। চৈতন্যদেব নীলাচল হইতে বর্দ্ধমান ফিরিয়া যাইতে আমাইপুরা গ্রামে শিষ্য সুবুদ্ধি মিশ্রের বাড়ীতে উপস্থিত হন, এবং আমাদের কবির 'গুইঞা' নাম ঘুচাইয়া জয়ানন্দ নাম রাখিয়া যান। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল আবিষ্কর্ত্তা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে ১৫১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫১৩ মধ্যে জয়ানন্দ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মন্ত্রগুরু ছিলেন

প্রচলিত আছে, তাহা উক্ত গোবিন্দ কর্ম্মকারের রচিত।" (পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৪, তৃতীয় সংখ্যা)। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় আমার নিকট চিঠিতে লিখিয়াছেন—"গোবিন্দদাসের করচায় ৫০পৃষ্ঠা ব্যাপক জাল বলিয়া আমিও বোধ করি না। কেননা কবি জয়ানন্দও গোবিন্দকে কায়স্থ বলেন নাই, কর্ম্মকারই বলিয়াছেন।"

অভিরাম গোস্বামী। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র ও গদাধরপণ্ডিতের আজ্ঞায় তিনি চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন।

চৈতন্য-মঙ্গলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। কতকগুলি বিষয়ে বৈষ্ণব ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রচলিত মত হইতে স্বতন্ত্র। প্রচলিত মত জগন্নাথ মিশ্রের পূর্ব্বনিবাসস্থান শ্রীহট্টস্থ ঢাকা দক্ষিণ গ্রাম, কিন্তু জয়ানন্দের মতে উহা শ্রীহট্টস্থ জয়পুর গ্রাম। প্রচলিত মত, হরিদাসঠাকুরের জন্মস্থান বুড়নগ্রাম ("বুড়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস"—চৈ, ভা, আদি)। কিন্তু জয়ানন্দের মতে, স্বর্ণনদীতীরস্থ ভাটকলাগাছি গ্রাম। এতদ্ভিন্ন জয়ানন্দ অনেকগুলি অজ্ঞাতপূর্ব্ব ঐতিহাসিকতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে আমরা জানিতে পাই, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষ উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুর গ্রামে বাস করিতেন। মহারাজ কপিলেন্দ্রদেবের (ইঁহার উপাধি ছিল রাজা ভ্রমর) ভয়ে তিনি পলাইয়া শ্রীহট্টে আগমনপূর্ব্বক বাস করেন। চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্বন্ধে জয়ানন্দ প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। আষাঢ় মাসে একদা কীর্ত্তন করিতে করিতে চৈতন্যদেবের পদ ইষ্টকবিদ্ধ হয়; দুই এক দিনের মধ্যেই বেদনা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমীতিথিতে তিনি শয্যাশায়ী হন এবং সপ্তমীতিথিতে ইহলোক ত্যাগ করেন। চৈতন্যদেবের তিরোধানসংক্রান্ত নানারূপ অলৌকিক গল্পে সত্য কাহিনী কুহকাচ্ছন্ন হইয়াছিল,—জয়ানন্দের লেখায় সেই ঘনীভূত তিমিররাশি এখন অন্তর্হিত হইবে। চৈতন্যদেবের জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে নবদ্বীপে নানারূপ বিপ্লব উপস্থিত হয়, সে সব বৃত্তান্ত এই পুস্তক ভিন্ন অন্য কোন প্রাচীন পুস্তকে পাওয়া যায় নাই। নিম্নে সেই প্রসঙ্গের কতক অংশ উদ্ধৃত হইল :—

"আর এক পুত্র হৈল বিশ্বরূপ নাম। দুর্ভিক্ষ জন্মিল বড় নবদ্বীপ গ্রাম॥ নিরবধি ডাকাচুরি অরিষ্ট দেখিঞা। নানাদেশে সর্ব্বলোক গেল পলাইঞা॥ তবে জগন্নাথ মিশ্র দেখিঞা কৌতুকে। বিশ্বরূপ দশকর্ম্ম করি একে একে॥ আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল

রাজভয়। ব্রাহ্মণ ধরিঞা রাজা জাতি প্রাণ লয়॥ নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে। ধন প্রাণ লয়ে তার জাতি নাশ করে॥ কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে। ঘর দ্বার লোটে তার সেই পাশে বান্ধে॥ দেউল দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী। প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী॥ গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত। অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥ পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন। উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥ ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে। বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে॥ গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যাবাদ। নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিব প্রমাদ॥ গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে। নিশ্চিন্তে না থাকিও প্রমাদ হব পাছে॥ নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা। গন্ধর্ব্বে লিখন আছে ধনুর্ম্ময় প্রজা॥ এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল। নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল॥ বিশারদসুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। স্ববংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য॥ উৎকলে প্রতাপরুদ্র ধনুর্ম্ময় রাজা। রত্ন সিংহাসনে সার্ব্বভৌমে কৈল পূজা॥ তার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়ে বসি। বিশারদ নিবাস করিল বারাণসী॥"

কিন্তু ইহার পর গৌড়েশ্বর নবদ্বীপের প্রতি প্রসন্ন হন, তাঁহার প্রসাদে ভগ্ন প্রাচীর, দেবমন্দির প্রভৃতির পুনঃ সংস্কার হইল; কিন্তু পিরল্যা গ্রামে বসিয়া মুসলমানগণ যে সব ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহারা জাতিচ্যুত অবস্থায়ই রহিয়া গেলেন। "পানি পিয়ে শেষে জাতি বিচার" আর বৃথা। নবদ্বীপের গত বৈভব ফিরিয়া আসিলে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন।

পদকল্পতরু ১৭৮৩ সংখ্যক পদে লোচনদাসের ভণিতাযুক্ত বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর যে বারমাস্যা দৃষ্ট হয়, তাহা জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলের প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যাইতেছে; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে উহা বলাতে তিনি পরিষৎ-পত্রিকায় * নানারূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া উক্ত কবিতাটী জয়ানন্দের খাতায়ই লেখা সাব্যস্ত করিয়াছেন। আমরা কিন্তু উক্ত পদটীর মধ্যে যেন লোচনদাসের রচনার সুমধুর ঝাঁজ পাইয়াছিলাম; যাহা হউক, উহা জয়ানন্দের রচিত বলিয়া পাঠ করিলে সাহিত্যসেবীর পক্ষে রসাস্বাদের কোন বৈষম্য ঘটিবে না।

* ৩য় সংখ্যা, ১৩০৪ সন।

সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে প্রাচীন লেখকগণ কোনরূপ আভাস দিতে এতই কৃপণতা করিয়া গিয়াছেন যে, দৈবক্রমে কোন লেখক যদি এ সম্বন্ধে আমাদিগকে মুষ্টিমেয় তত্ত্বও ভিক্ষা দিয়া গিয়া থাকেন, আমরা তাহাতেই নিরতিশয় পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। জয়ানন্দ নিম্নলিখিত সামান্য বিবরণটী প্রদান করিয়া আমাদিগের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন ;—

বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা।

"চৈতন্য অনন্তরূপ অনন্তাবতার। অনন্ত কবীন্দ্র গাএ মহিমা জাহার॥ শ্রীভাগবত কৈল ব্যাস মহাশয়। গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়॥ জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র তাঁরা করিল প্রকাশ॥ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ব্যাস অবতার। চৈতন্যচরিত্র আগে করিল প্রচার॥ চৈতন্য সহস্র নাম শ্লোক প্রবন্ধে। সার্ব্বভৌম রচিল কেবল প্রেমানন্দে॥ শ্রীপরমানন্দপুরী গোসাঞি মহাশয়ে। সংক্ষেপ করিল তিঁহি গোবিন্দবিজয়ে॥ আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড করি। শ্রীবৃন্দাবনদাস রচিল সর্ব্বোপরি। গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী। সঙ্গীত প্রবন্ধে তার পদে পদে ধ্বনি॥ সংক্ষেপে করিলেন তিঁহি পরমানন্দ গুপ্ত। গৌরাঙ্গ-বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত॥ গোপালবসু করিলেন সঙ্গীত প্রবন্ধে। চৈতন্যমঙ্গল তাঁর চামর বিচ্ছন্দে॥ ইবে শব্দ চামর সঙ্গীত বাদ্যরসে। জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল গাএ শেষে॥"

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে নানারূপ ঐতিহাসিকতত্ত্বের নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনায় কবিত্বশক্তির ভালরূপ বিকাশ পাইতে পারে নাই, কিন্তু এই সমস্ত চরিতাখ্যানগুলিকে কাব্যের মানদণ্ডে পরিমাণ করা বোধ হয় সমীচীন হইবে না।

জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে কড়চা-লেখক গোবিন্দদাস যে কর্ম্মকার ছিলেন, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

চৈতন্যমঙ্গল ছাড়া জয়ানন্দ-বিরচিত 'ধ্রুব-চরিত্র' ও 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' নামক দুইখানি ছোট কাব্যোপাখ্যান পাওয়া গিয়াছে।

কবির অন্যান্য রচনা।

বাং ১০৬৮ সালের লিখিত চৈতন্যভাগবত পুঁথির মলাটে প্রদত্ত চিত্রের প্রতিলিপি।

(গ) বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত।

বৈষ্ণব সমাজের স্বাতন্ত্র্য।

পরবর্ত্তী চরিত-সাহিত্য চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে রচিত, তখন নিম্বকাষ্ঠে গৌরীদাস পণ্ডিত চৈতন্যবিগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছেন ও তাঁহাকে সাক্ষাৎ বিষ্ণু প্রতিপন্ন করিয়া পণ্ডিতগণ শ্লোক রচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। ভক্তির যে একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে নির্ম্মিত হইয়া উহার ক্রোড়ে লুক্কায়িত ছিল, তাহা তখন উক্ত সমাজের সীমা অতিক্রম করিয়া স্বীয় স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করিয়াছে। এই বিচ্ছিন্ন নব-উপাদান-বিশিষ্ট সম্প্রদায়টির উপর হিন্দুসমাজের বিদ্বেষতরঙ্গ নিয়ত আঘাত করিতেছিল; আত্মরক্ষণশীল ক্ষুদ্র সম্প্রদায়টির সুন্দর বিনয়ধর্ম্ম অবিরত লবণাম্বুস্পর্শে ক্রমে ক্রমে একটু কলুষিত হইল।

বৃন্দাবনদাসের পরিচয়।

বৈষ্ণবগণ নির্দ্দেশ করেন, ১৪২৯ শকে (১৫০৭ খৃঃ অব্দে) শ্রীনিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবনদাস নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন; তাহা হইলে চৈতন্য প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের দুই বৎসর পূর্ব্বে বৃন্দাবনদাসের আবির্ভাব হয়; কিন্তু তিনি মহাপ্রভুকে দেখেন নাই বলিয়া বারংবার আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন,— "হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হৈল তখন"—(চৈ, ভা, আদি, ১০ অঃ ও মধ্য ১ম ও ৮ম অঃ)। তাঁহার দুই বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত প্রভু নবদ্বীপেই ছিলেন, সুতরাং এ কথাটির ভাল সমন্বয় হয় না। তবে এরূপ হইতে পারে, তিনি নিতান্ত শিশু বলিয়া এ আক্ষেপ করিয়াছেন। ১৫০৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হইয়া থাকিলে মহাপ্রভুর তিরোধানের সময় তাঁহার বয়স ২৬ বৎসর ছিল; তিনি চৈতন্যপ্রভুর পরম ভক্ত চরিতলেখক, নীলাচলে যাইয়া তাঁহাকে দেখেন নাই কেন, বলা যায় না। বৃন্দাবনদাস ৮২বৎসর জীবিত ছিলেন, ১৫৮৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার অদর্শন হয়; এই দীর্ঘ জীবন তিনি বৈষ্ণবসমাজে পরম আদরে অতিবাহিত করেন, খেতুরির উৎসব উপলক্ষে 'বিজ্ঞবর' বৃন্দাবনদাস উপস্থিত

ছিলেন। ১৫৩৫ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ মহাপ্রভুর তিরোধানের ২বৎসর পরে তিনি 'চৈতন্যভাগবত' ও ১৫৭৩ খৃঃ অব্দে 'নিত্যানন্দবংশমালা' রচনা করেন।* তিনি নিত্যানন্দের পরম ভক্ত শিষ্য ছিলেন, তাঁহার রচিত দুই পুস্তকেই বিদ্বেষীর প্রতি তীব্র কটাক্ষযুক্ত রোষদীপ্তভাষায় নিত্যানন্দবন্দনা পাওয়া যায়। বর্দ্ধমান জেলায় দেনুড়গ্রামে (মন্ত্রেশ্বর থানা) বৃন্দাবনদাস একটি মন্দির ও বিগ্রহ স্থাপন করেন, উহা 'দেনুড় শ্রীপাঠ' নামে এখনও পরিচিত।

চৈতন্য ভাগবতে শ্রীমদ্ভাগবত-অনুকরণ।

চৈতন্যভাগবতকে শ্রীমদ্ভাগবতের ছাঁচে ফেলিয়া গড়া হইয়াছে। শিশু চৈতন্যপ্রভু অতিথি ব্রাহ্মণের উৎসর্গ করা অন্নাদি উচ্ছিষ্ট করিয়া দিতেছেন,—তাঁহাকে পরক্ষণে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী রূপ দেখাইয়া বিমুগ্ধ করিতেছেন, কখনও শচীমাতাকে বিশ্বরূপ দেখাইতেছেন—তাঁহার পদাঙ্কে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন ধরা পড়িতেছে— এই সব স্থল ভাগবতের পুনরাবৃত্তিমাত্র। অতিক্রান্ত-শৈশবে চৈতন্যদেব বিদ্যামুগ্ধ যুবক, পরে ভক্তির উজ্জ্বল দেবমূর্ত্তি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতার,— সুতরাং উভয় চরিত্রে ঐক্য অতি অল্প; তথাপি বৃন্দাবনদাস সততই চৈতন্যদেবকে ভাগবতের লীলাদ্বারা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, চৈতন্যলীলা হইতে শ্রীকৃষ্ণলীলাই তাঁহার কল্পনায় স্পষ্টতররূপে মুদ্রিত ছিল, তাই তিনি শিষ্য-বেষ্টিত চৈতন্যদেবকে—"সনকাদি শিষ্যগণ-বেষ্টিত বদরিকাশ্রমে আসীন"—নারায়ণের সঙ্গে উপমা দিয়াছেন এবং দিগ্বিজয়ীর পরাজয় উপলক্ষে "হৈহয়, বাণ, নহুষ, নরক, রাবণ" প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কল্পিত ঐক্যের কেশ-প্রমাণ সূত্র যথাসম্ভব সূক্ষ্মভাবে

---

* এই সকল তারিখ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারি নাই। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে ১৫৪৮ খৃঃ অব্দে চৈতন্যভাগবত রচিত হয়। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী তৎপ্রণীত বঙ্গরত্নে (দ্বিতীয় ভাগ) লিখিয়াছেন, চৈতন্যভাগবত ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে প্রণীত হয়।

অনুসরণ করিয়াছেন ও চৈতন্যলীলার সঙ্গে কৃষ্ণলীলার রেখায় রেখায় মিল রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

আধুনিক ইতিহাসের অনেকগুলিই দর্শনের ছাঁচে ঢালা; গুইজো, বাকল্, ফ্রিজওয়েল ইতিহাস হইতে সূত্র সঙ্কলন করার চেষ্টা করিয়াছেন; ঘটনার তালিকা দিলেই ইতিহাস হয় না, কিন্তু জড়-জগতের নিয়মগুলির ন্যায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মজীবন হইতেও নিয়ম সঙ্কলন করা ইতিহাসের একটা বিশেষ কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রথা সর্ব্বত্রই উৎকৃষ্ট ও নিরাপদ্ কি না, বলা যায় না; এই ভাবে অনেক লেখক স্বীয় মনঃকল্পিত সূত্রের বর্ণে ঘটনারাশি বিবর্ণ করিয়া ফেলিতে পারেন; বড় বড় লেখকের সম্বন্ধেও এ আশঙ্কা না আছে এমন নহে, কিন্তু তাঁহাদের ঐন্দ্রজালিক লেখার গুণে মিথ্যাসুন্দরীও অনেক সময়ে সত্যের পোষাকে আসিয়া প্রতারণা করিয়া যায়। বৃন্দাবনদাস গীতার—"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত"—আদি শ্লোক ও ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের যুগাবতার সম্বন্ধে অপর একটী শ্লোককে সূত্ররূপে ব্যবহার করিয়া চৈতন্যপ্রভুর অবতারের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। সাঙ্গোপাঙ্গের আবির্ভাব ও যুগ-প্রয়োজন বেশ সুন্দরভাবে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। চৈতন্যভাগবতের সুন্দর প্রারম্ভটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"কারো জন্ম নবদ্বীপে কারো চাটিগ্রামে। কেহ রাঢ়ে উড্রদেশে শ্রীহট্টে পশ্চিমে॥ নানা স্থানে অবতীর্ণ হইল ভক্তগণ। নবদ্বীপে আসি হইল সবার মিলন॥ নবদ্বীপে হইল প্রভুর অবতার। অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার॥ নবদ্বীপ সম গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি। যাঁহা অবতীর্ণ হৈল চৈতন্য গোঁসাঞি॥ সর্ব্ব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ গ্রামে। কোন মহা-প্রিয়বসে জন্ম অন্যস্থানে॥ শ্রীবাসপণ্ডিত আর শ্রীরামপণ্ডিত। শ্রীচন্দ্রশেখরদেব ত্রৈলোক্য পূজিত॥ ভবরোগবৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যার। শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার॥ পুণ্ড-রীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব প্রধান। চৈতন্যবল্লভদত্ত বাসুদেব নাম॥ চাটিগ্রামে হৈল ইহা

সবার পরকাশ। বুড়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস॥ রাঢ়মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম। যথা অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান॥ * * * নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈল ভক্তগণ। নবদ্বীপে আসি সবে হইল মিলন॥ নবদ্বীপ সম গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি। যথা অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি॥ অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা। সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা॥ নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবার পারে। এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥ ত্রিবিধ বৈসে একজাতি লক্ষ লক্ষ। সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ॥ সভে মহাঅধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে। বালকে হো ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥ নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়। নবদ্বীপ পঢ়িলে সে বিদ্যারস পায়॥ অতএব পঢ়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়। লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥ রমাদৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে। ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে॥ কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার। প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥ দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনজন। পুত্তলি করয় কেহ দিয়া বহুধন॥ ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়ে। এইমত জগতের ব্যর্থকাল যায়ে॥ যে বা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব। তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থ-অনুভব॥ শাস্ত্র পঢ়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে। শ্রোতার সহিত যমপাশে বন্ধি মরে॥ না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন। দোষ বহি কারো গুণ না করে কথন॥ যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী। তা সভার মুখেহ নাহিক হরিধ্বনি॥ অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়। গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চরয়॥ গীতা ভাগবত যে জনাতে পঢ়ায়। ভক্তির বাখান নাই তাহার জিহ্বায়॥ বলিলেও কেহো নাহি লয় কৃষ্ণ নাম। নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান॥ * * * সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে। কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি নাহি কারো বাসে॥ বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে। মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥ নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহলে। না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গলে॥ কৃষ্ণশূন্য মণ্ডলে দেহের নাহি সুখ॥ বিশেষ অদ্বৈত মনে পায় বড় দুঃখ॥ * * * সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমে ভাগবতগণ। কোথাহ না শুনে ভক্তিযোগের কথন॥ কেহ দুঃখে চায় নিজ শরীর এড়িতে। কেহ কৃষ্ণ বলি শ্বাস ছাড়য়ে কাঁদিতে॥ অন্ন ভালমতে কার না রুচয়ে মুখে। জগতের ব্যবহার দেখি পায় দুঃখে॥ ছাড়িলেন ভক্তগণ সব উপভোগ। অবতারিবারে প্রভু করিলা উদ্যোগ॥" *

* চৈতন্যভাগবত, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়-সম্পাদিত, আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৬—১৯ পৃ:।

উদ্ধৃত স্থলটি সূত্রাংশে ও ঐতিহাসিক অংশে মন্দ হয় নাই। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সূত্রের পশ্চাতে ধাবিত হওয়া সর্ব্বদা নিরাপদ্ নহে। বৃন্দাবনদাস মধ্যে মধ্যে ভাগবতের সূত্রে এত বিভোর হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহার চৈতন্যপ্রভুর স্বরূপ দেখার অবকাশ হয় নাই।

অলৌকিকত্বে বিশ্বাস।

চৈতন্যভাগবতে যে অলৌকিক বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, সেগুলি বৃন্দাবন দাসের উদ্ভাবনী শক্তির উপর চাপাইয়া দেওয়া উচিত নহে। তিনি যেরূপ শুনিয়াছেন, সম্ভবতঃ সেই ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিজের জন্ম এক অলৌকিক গল্পে জড়িত, সুতরাং অলৌকিকত্বে বিশ্বাস কতকটা তাঁহার প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছিল। ঘটনা বিশ্বাস করা বা পরিহার করা পাঠকের ইচ্ছাধীন, কিন্তু আমরা লেখককে কল্পনাশীল অথবা কপট বলিতে অধিকারী নহি।

ক্রোধের কারণ।

বৃন্দাবনদাস অবৈষ্ণব সমাজকে লক্ষ্য করিয়া যে কটূক্তি করিয়াছেন, * তজ্জন্য সমালোচকগণ একবাক্যে তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। রুচি সকল সময় একরূপ থাকে না; সে কালের কটূক্তি পল্লীগ্রামে কৃষকের নাতিসূক্ষ্ম হলের ন্যায় অমার্জ্জিত অপভাষার কথায় প্রকাশ পাইত। সভ্যতার দোকানে অন্যান্য অস্ত্রের ন্যায় বিদ্বেষসূচক কথাগুলিও মার্জ্জিত এবং তীক্ষ্ণ করা হইয়াছে; কটূক্তি করিবার জন্য এই সব তীক্ষ্ণ অস্ত্র বৃন্দাবন-দাসের আয়ত্ত ছিল না, সুতরাং তিনি রাগের বশে অসংযতবাক্ দুর্দ্দান্ত একটি শিশুর ন্যায় অকৃত্রিম ইতর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু বৃন্দাবন দাসের ভর্ৎসনাপূর্ণ রচনায় আমরা এক পক্ষের ক্রোধ চিত্রিত দেখিতেছি মাত্র; উদ্দিষ্ট ব্যক্তিগণ এখন সম্পূর্ণভাবে যবনিকার পশ্চাৎভাগে, তথাপি বৈষ্ণবসাহিত্য হইতে তাঁহাদের ভীষণ বিদ্বেষের কিছু কিছু পরিচয় না পাওয়া যায়, এমন নহে; চৈতন্যভাগবতে ইহাদের উপহাস ও বিদ্বেষের

কথা অনেক স্থলে উল্লিখিত আছে। ভক্তিরত্নাকরে দেখিতে পাই, সংকীর্ত্তনকারিগণ এক রাত্রেই মরিয়া যায়, এজন্য বৈষ্ণবদ্বেষী সম্প্রদায় কালীমন্দিরে যাইয়া মানসিক করিতেছে ও নরোত্তমদাসের শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া করতালি দিয়া ব্যঙ্গ করিতেছে; ইহারা চৈতন্যদাসের দারিদ্র্য ও পুত্রহীনতা বিষ্ণুভক্তির ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিল এবং "ইন্ধনমালা বলয়িত বাহু। পরধনহরণে সাক্ষাৎ রাহু॥ * * ভঞ্জনে বীর। কীর্ত্তনে পতনে মল্লশরীর॥" প্রভৃতি তীব্র নিন্দাযুক্ত শ্লোক রচনা করিয়াছিল। ইহা ছাড়াও বৃন্দাবনদাসের ক্রোধের গুরুতর কারণ বর্ত্তমান ছিল বলিয়া বোধ হয়, সম্ভবতঃ তাঁহার জন্ম লইয়া ইতরভাবের পরিহাস চলিতেছিল, চৈতন্যভাগবতে এক স্থলে তাহার আভাস আছে,—"চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী॥ যারে সেই আজ্ঞা করে ঠাকুর চৈতন্য। সেই আসি অবিলম্বে হয় উপপন্ন॥ এসব বচনে যার নাহিক প্রতীত। সদ্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত॥"—চৈ, ভা, মধ্য। বৈষ্ণবগণ বিনয়ের আদর্শ; "মৃদুনি কুসুমাদপি" তাঁহাদেরই জীবনে প্রমাণিত। সমুচিত উত্তেজনার কারণ না থাকিলে তাঁহাদের বিনয় ভঙ্গ হয় নাই। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রথম উদ্যমকালে অত্যধিক নিপীড়ন নিবন্ধন অবশেষে মানবজাতির জন্য অঙ্গীকৃত প্রীতির ফুল ভাঙ্গিয়া শূল প্রস্তুত করিয়াছেন; মানুষ-রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণ অত্যাচার সহ্য করিয়া যদি লেখনীমুখে মাত্র কিঞ্চিৎ ক্রোধের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা অমার্জ্জনীয় নহে।

চৈতন্যভাগবতের ঐতিহাসিক মূল্য।

বৃন্দাবনদাস ২৮ বৎসর বয়সে (১৫৩৫ খৃঃ অব্দে) ভাগবত রচনা করেন। এই বয়সে তাঁহার বিরাট ঘটনা রাশি আয়ত্ত করিয়া নিমন্ত্রিত করার ক্ষমতা জন্মিয়াছিল; তাঁহার রচনায় তরুণ বয়সোচিত কিছু কিছু দোষ আছে সত্য, কিন্তু নানা কারণে আমরা চৈতন্য-ভাগবতকে বঙ্গভাষার একখানা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করি। বঙ্গদেশের যে কোন বিষয় লইয়া প্রচীন ইতিহাস রচনার প্রয়োজন হইবে,

চৈতন্যভাগবত হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে তজ্জন্য উপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক হইবে। চৈতন্যভাগবতের মূল বিষয় বর্ণনা হইতেও প্রাসঙ্গিক আলোচনা বেশী আবশ্যক। প্রসঙ্গক্রমে ইতস্ততঃ নানা বিষয় সম্বন্ধে এমন কি বৈষ্ণবদ্বেষী সমাজ সম্বন্ধেও যে সব কথা উল্লিখিত আছে, তাহা কুড়াইয়া লইলে বঙ্গদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও লৌকিক ইতিহাসের এক একখানা মূল্যবান পৃষ্ঠা সংগৃহীত হইবে। ভক্তিমান পাঠক বিনয়-সহকারে চৈতন্যভাগবত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে নয়নাশ্রুর মধ্য দিয়া ইহার এক সুন্দর রূপ দেখিতে পাইবেন; কঠোর ক্রোধপূর্ণ প্রাচীন রচনার মধ্যে মধ্যে চৈতন্যপ্রভুর যে মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার বর্ণক্ষেপ প্রবীণ চিত্রকরের উপযুক্ত,—তাহা প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় স্থায়ী ও ছবির ন্যায় উজ্জ্বল; দৃষ্টান্তস্থলে চৈতন্যপ্রভুর গয়াগমন ও প্রত্যাগমনের বৃত্তান্তটি বারংবার পাঠ করুন।

চৈতন্য-ভাগবত ৩ খণ্ডে বিভক্ত। আদিখণ্ডে গৌরপ্রভুর গয়াগমন পর্য্যন্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মধ্যমখণ্ডে প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ পর্য্যন্ত ও অন্ত্যখণ্ডে শেষলীলা বর্ণিত হইয়াছে। আদিখণ্ড পঞ্চদশ অধ্যায়ে, মধ্যমখণ্ড ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ে ও শেষখণ্ড মাত্র অষ্টম অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত। শেষখণ্ডের এই অসম্পূর্ণতা পরসময়ে অন্য একজন শ্রেষ্ঠ লেখককে চৈতন্য-জীবন-বর্ণনায় প্রবর্ত্তিত করে। চৈতন্যপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিপুণ লেখনীতে দর্শনাত্মক সৌন্দর্য্যে জড়িত হইয়াছে, আমরা যথাসময়ে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব। চৈতন্যভাগবত বৈষ্ণবসমাজের বিশেষ আদরের দ্রব্য, এ আদর ভেকধারী বৈষ্ণব অপাত্রে প্রয়োগ করেন নাই; কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বয়ং সর্ব্বদা বৃন্দাবনদাসকে 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'চৈতন্যভাগবত' ও 'নিত্যানন্দবংশমালা' ব্যতীত বৃন্দাবনদাস বহুসংখ্যক পদ রচনা করেন, সেগুলি পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহপুস্তকে পাওয়া যায়।

(ঘ) লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল।

লোচনদাস ১৪৪৫ শকে (১৫২৩ খৃঃ অব্দে) বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন; ইহার পূর্ণ নাম ত্রিলোচন দাস; তাঁহার বাড়ী কোগ্রাম, বর্দ্ধমানের ১৫ ক্রোশ উত্তরে,—গুস্করা ষ্টেসন হইতে ৫ ক্রোশ দূরে। দুর্ল্লভসার ও চৈতন্য-মঙ্গলের ভূমিকায় তিনি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন:—

কবির পরিচয়।

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে বাস। মাতা শুদ্ধমতি সদানন্দী তাঁর নাম। * যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ নাম॥ কমলাকরদাস মোর পিতা জন্মদাতা। শ্রীনরহরিদাস মোর প্রেমভক্তিদাতা॥ মাতৃকুল পিতৃকুল হয় এক গ্রামে। ধন্য মাতামহী সে অভয়াদেবী নামে। মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত। সর্ব্ব তীর্থ পূত তিঁহ তপস্যার তৃপ্ত॥ মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র। সহোদর নাই মোর মাতামহের পুত্র॥ যথা যাই তথাই দুলিল করে মোরে। দুলিল দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে॥ মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাল আখর। ধন্য সে পুরুষোত্তম চরিত তাহার॥"

চৈতন্যমঙ্গল ব্যতীত লোচনদাস 'দুর্লভ সার' এবং 'আনন্দলতিকা' নামক আর দুই খানি বড় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। চৈতন্যমঙ্গলই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। কথিত আছে যে তিনি ১৫৩৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার গুরু নরহরি সরকারের আদেশে এই গ্রন্থ রচনা করেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৪ বৎসর। যিনি "আহ্লাদে-ছেলে" বলিয়া সম্ভবতঃ বিশেষ প্রহার সহ্য করিয়া বাল্যাতিক্রান্তে অক্ষর চিনিয়াছিলেন, তিনি চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রমে চৈতন্যমঙ্গলের ন্যায় এত বড় ও

চৈতন্য মঙ্গল।

---

* একখানি প্রাচীন চৈতন্যমঙ্গলের পুঁথিতে (১১০৬ সনের হস্তলিপি, পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৪ সন, ৪র্থ সংখ্যা, ৩১৩ পৃঃ) দ্বিতীয় ছত্রটি এইরূপ পাওয়া যাইতেছে "মাতাসতী সুরপতি অরুন্ধতী নাম।" এই দ্বিতীয় ছত্রটির যে দুইটি পাঠ পাওয়া যাইতেছে, তাহার কোনটি বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। "সদানন্দী" ও "সুরপতি অরুন্ধতী" দুই-ই বিকৃত পাঠের ন্যায় শুনায়; এই দুইটি পাঠ ভাঙ্গিয়া এইরূপ একটি ছত্র গড়া যায়, "মাতাসতী শুদ্ধমতি অরুন্ধতী নাম।"

সুন্দর গ্রন্থখানি রচনা করেন, বৈষ্ণবগণকথিত এই বিবরণে সম্পূর্ণ আস্থা হয় না। বৈষ্ণবসমাজে এ পুস্তকখানি বিশেষ আদৃত, কিন্তু চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় প্রামাণিক বলিয়া গণ্য নহে।

কথিত আছে, কোন ঘটনাবশতঃ লোচনদাস তাঁহার স্ত্রীর সহিত চির-কাল ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করেন, এ সম্বন্ধে গৌরভূষণ অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় বলেন,—"গৌরভক্তগণের প্রভাব এইরূপই। ইন্দ্রিয় তাঁহাদের কাছে দন্তোৎ-পাটিত সর্পের ন্যায় খেলার বস্তু। দেখিতে সুন্দর কিন্তু দংশনের ক্ষমতা রহিত।"

ভাগবত ও মঙ্গল-নাম লইয়া বিরোধ।

চৈতন্যভাগবত প্রথমতঃ 'চৈতন্যমঙ্গল' নামেই অভিহিত ছিল, কৃষ্ণদাসকবিরাজ চৈতন্য ভাগবতকে 'চৈতন্য-মঙ্গল' নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। কথিত আছে, লোচন দাসের গ্রন্থের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' রাখাতে বৃন্দাবনদাসের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ ঘটে; বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণীদেবী বৃন্দাবনদাসের পুস্তকের নামের 'মঙ্গল' শব্দ উঠাইয়া তৎস্থলে 'ভাগবত' করেন; এইভাবে দুই কবির বিবাদের মীমাংসা হয়। চৈতন্যমঙ্গলের প্রায় তাবৎ হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথিতেই "বৃন্দাবনদাস বন্দিব এক চিতে, জগৎ মোহিত যার ভাগবত-গীতে"—এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। সুতরাং উক্ত প্রবাদ কতদূর সত্য, বলিতে পারি না।

কল্পিত ঘটনা।

চৈতন্য-প্রভুর তিরোধানের পর তাঁহার জীবন সম্বন্ধে অনেক অলৌ-কিক উপাখ্যান প্রচলিত হইয়াছিল। বৃন্দা-বনদাস লেখনী দ্বারা ঘটনারাশি আয়ত্ত করিতে জানিতেন; তাঁহার বর্ণিত ঘটনার সুবিস্তার সমতটক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে অলৌকিক গল্পের উপলখণ্ড বাছিয়া ফেলিয়া পাঠক সত্যের পথ পরিষ্কার রাখিতে পারেন। কিন্তু লোচনদাসের পুস্তক অন্যরূপ, চৈতন্য-প্রভু সম্বন্ধে অলৌকিক গল্পগুলি তাঁহার কল্পনার চক্ষু হরিদ্বর্ণ করিয়া দিয়াছিল, তিনি ঘটনা প্রকৃতবর্ণে ফলাইতে পারেন নাই; তাঁহার পুস্তক

হইতে গল্পাংশ ছাঁকিয়া ফেলিয়া নির্ম্মল সত্যাংশ গ্রহণ করা একরূপ অসম্ভব। তাঁহার পুস্তক ইতিহাসের মলাট দেওয়া খাঁটি কল্পনার দ্রব্য।

অবতারবাদের ব্যাখ্যা।

বৃন্দাবনদাস যুগাবতারের আবশ্যকতা কেমন সুন্দরভাবে দেখাইয়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। কিন্তু লোচনদাস গোলোকধামে রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণের কল্পিত কথোপকথন অবলম্বন করিয়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চৈতন্যমঙ্গলের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কেবল দেবলীলা; মানুষী মহিমার শ্রেষ্ঠত্বই যে প্রকৃত দেবত্ব, লোচনদাস তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। চৈতন্যমঙ্গলে উপাখ্যানরাশির নিবিড় মেঘরাশি ভেদ করিয়া ক্বচিৎ চৈতন্যদেবের নির্ম্মল দেব-হাস্যটুকুর বিকাশ হয়, কিন্তু তাহা পরক্ষণে দৈব ঘটনার আঁধারে লীন হইয়া যায়। সে ছবির প্রতি ভালবাসা আকৃষ্ট হওয়া মাত্র অলৌকিক ঘটনারাশির নিবিড় অরণ্যে মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তখন পথহারা পান্থের ন্যায় একটু স্বাভাবিক পথে বহির্গত হইবার জন্য অবকাশ চায়।

প্রামাণ্য নহে।

চৈতন্যজীবন সম্বন্ধে চৈতন্যমঙ্গলকে আমরা প্রামাণ্যগ্রন্থ মনে করি না এবং বৈষ্ণবসমাজও সদ্বিবেচনার সহিতই ইহার স্থান চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত-লেখক বহুবার শ্রদ্ধার সহিত চৈতন্য-ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু চৈতন্যমঙ্গলের সেরূপ করেন নাই। ভক্তিরত্নাকরে নরহরিচক্রবর্ত্তী চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত হইতে বহুসংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু চৈতন্যমঙ্গলের উল্লেখ করেন নাই।

কবিত্ব।

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য হইলেও, উহা একেবারে নির্গুণ নহে। ৩০০ বৎসর কাল যাহা লুপ্ত হয় নাই, সে সামগ্রীর অবশ্যই আয়ুবল আছে। চৈতন্যমঙ্গলের রচনা বড় সুন্দর। লোচনদাসের

লেখনী ইতিহাস লিখিতে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু তাহার গতি কবিত্বের পুষ্পপল্লবে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা সত্যের পথে ধাবিত হইয়া করুণ ও আদিরসের কুণ্ডে পড়িয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে; বৃন্দাবনদাসের সাদাসিধা রচনায় কিংবা কৃষ্ণদাস কবিরাজের নানাভাষামিশ্রিত জটিল লেখায় কবিত্বের সুরভি নাই। এই দুই পুস্তক ইতিহাসের নিবিড় বন, প্রত্ন-তত্ত্ববিৎ ও বৈষ্ণব ভিন্ন অপর কেহ ধৈর্য্যসহ এই ঘোর অরণ্য-পর্য্যটনশ্রম স্বীকার করিবেন না, কিন্তু লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের অনেক স্থলে কবিত্বের সৌন্দর্য্য আছে; ইতিহাসের রেখাঙ্কিত প্রস্তরখণ্ডের নিষ্ফল খোঁজে পাঠক বিরক্ত হইলে পথে পথে কল্পনাবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাধবী ও কুন্দ-কুসুম কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাঁহার শ্রম অপনোদনে সাহায্য করিবে। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণসংবাদে শোক-বিধুরা বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপ এইভাবে অঙ্কিত হইয়াছে;—

"চরণ কমল পাশে, নিশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে, নেহারয়ে কাতর নয়ানে। হিয়ার উপরে থুইয়া, বান্ধে ভুজ-লতা দিয়া, প্রিয় প্রাণনাথের চরণে॥ দুনয়নে বহে নীর, ভিজিল হিয়ার চীর, বুক বাহিয়া পড়ে ধার। চেতন পাইয়া চিতে, উঠে প্রভু আচম্বিতে, বিষ্ণুপ্রিয়া পুছে আরবার॥ মোর প্রাণপ্রিয়া তুমি, কাঁদ কি কারণে জানি, কহ কহ ইহার উত্তর। থুইয়া হিয়ার পরে, চিবুক দক্ষিণ করে, পুছে বাণী মধুর অক্ষর॥ কাঁদে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, শুনিতে বিদরে হিয়া, পুছিতে না কহে কিছু বাণী। অন্তরে দগধে প্রাণ, দেহে নাই সম্বিধান, নয়নে ঝরয়ে মাত্র পানি॥ পুনঃ পুনঃ পুছে প্রভু, সম্বরিতে নারে তবু, কাঁদে মাত্র চরণ ধরিয়া। প্রভু সর্ব্ব কলা জানে, কহে বিষ্ণুপ্রিয়া স্থানে, অঙ্গবাসে বদন মুছিয়া॥ নানারূপে কথা-ভাব, কহিয়া বাড়ায় ভাব, যে কথায় পাষাণ মুঞ্জরে। প্রভুর ব্যগ্রতা দেখি, বিষ্ণুপ্রিয়া চাঁদমুখী, কহে কিছু গদ গদ স্বরে॥ শুন শুন প্রাণনাথ, মোর শিরে দেহ হাত, সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি। লোকমুখে শুনি ইহা, বিদরিয়া যায় হিয়া, আগুনেতে প্রবেশিব আমি॥ তো লাগি জীবন ধন, এ রূপ যৌবন, বেশ লীলা রসকলা। তুমি যদি ছাড়ি যাবে, কি কাজ এ ছার জীবে, হিয়া পোড়ে যেন বিষ জ্বালা॥ আমা হেন ভাগ্যবতী, নাহি হেন যুবতী, তুমি হেন মোর প্রাণনাথ। বড় আশা ছিল মনে, এ নব যৌবনে, প্রাণনাথ দিব তোমা হাতে॥ ধিক রহু মোর দেহে, এক নিবেদন তোহে, কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে।

গহন কণ্টক বনে, কোথা যাবে কার সনে, কেবা তব যাবে সাথে সাথে। শিরীষকুসুম যেন, সুকোমল চরণ তেন, পরশিতে মনে লাগে ভয়। ভূমেতে দাঁড়াও যবে, প্রাণে মোর লয় তবে, হেলিয়া পড়এ পাছে গাএ॥ অরণ্য কণ্টক বনে, কোথা যাবে কোন স্থানে, কেমনে হাঁটিবে রাঙ্গা পায়। সুখময় মুখ ইন্দু, তাহে ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু, অল্প আয়াসে মাত্র দেখি। বরিষা বাদল ধারা, ক্ষণে জল ক্ষণে খরা, সন্ন্যাস করণ বড় দুঃখী॥ তোমার চরণ বিনি, আর কিছু নাহি জানি, আমারে ফেলাহ কার ঠাঁই॥ * * * কি কহিব মুই ছার, আমি তোমার সংসার, সন্ন্যাস করিবে মোর তরে। তোমার নিছনি লইয়া, মরি যাব বিষ খাইয়া, সুখে তুমি বঞ্চ এই ঘরে॥"—চৈ, ম, হস্তলিখিত পুঁথি।

লোচনের হস্তলিপি।

কোগ্রামের নিকটবর্ত্তী কাঁকড়া গ্রামের (গুস্করা ষ্টেসনের নিকট) বিখ্যাত চৈতন্যমঙ্গলগায়ক শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে লোচনের স্বহস্তলিখিত চৈতন্যমঙ্গল আছে। প্রাণকৃষ্ণ বলেন, "লোচনের আখর উঠানযোড়া কএর মত।" লোচন যে প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া চৈতন্যমঙ্গল লিখেন, তাহা এখনও আছে।

অন্যান্য রচনা।

চৈতন্যমঙ্গলও তিন খণ্ডে বিভক্ত, কিন্তু ইহা চৈতন্যভাগবত হইতে অনেক ছোট, চৈতন্যভাগবতের অর্দ্ধাংশের তুল্য হইবে। লোচনদাস ১৫৮৯ খৃঃ অব্দে ৬৬ বৎসর বয়সে তিরোহিত হন। চৈতন্যমঙ্গল ভিন্ন ইঁহার 'দুর্লভসার' নামক অপর একখানি পুস্তক আছে; এতদ্ব্যতীত লোচনদাস বহুসংখ্যক সুমিষ্ট পদ রচনা করেন।

মুদ্রিত চৈতন্যমঙ্গল অসম্পূর্ণ।

এস্থলে বলা আবশ্যক, বটতলার ছাপা চৈতন্যমঙ্গল নিতান্ত অসম্পূর্ণ; উহাতে আত্মপরিচয়টি নাই এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য কতকগুলি স্থানও বর্জ্জিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে হস্ত-লিখিত পুস্তকে এই বিবরণটি পাওয়া যায়, তাহা বটতলার ছাপা পুস্তকে নাই!

"বৃন্দাবন কথা কহে ব্যথিত অন্তরে। সম্ভ্রমে উঠিয়া প্রভু জগন্নাথ দেখিবারে॥ ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহ দ্বারে॥ সঙ্গে নিজ জন যত তেমনি চলিল। সত্বরে চলিয়া গেল মন্দির ভিতরে॥ নিরখে বদন প্রভু, দেখিতে না পায়। সেইখানে মনে প্রভু চিন্তিলা

উপায়॥ তখনে দুয়ারে নিজ লাগিলা কপাট। সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট॥ আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে। নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর। বিশেষতঃ কলিযুগে সংকীর্ত্তন সার॥ কৃপা কর জগন্নাথ পতিতপাবন। কলিযুগ আইল এই দেহত শরণ॥ এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগতরায়। বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়॥ তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে। জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥ গুঞ্জা বাড়ীতে ছিল পণ্ডা যে ব্রাহ্মণ। দেখিয়া সে কি কি বলি আইল তখন। বিপ্রে দেখি প্রভু কহে শুনহ পড়িছা। ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখি বড় ইচ্ছা॥ ভক্তআৰ্ত্তি দেখি পড়িছা কহয় কথন। গুঞ্জা বাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন॥ সাক্ষাৎ দেখিল গৌর প্রভুর মিলন। নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন॥ এ বোল শুনিয়া ভক্ত করে হাহাকার। শ্রীমুখ চন্দ্রিমা প্রভুর না দেখিব আর॥"

এই বিবরণের সঙ্গে ভক্তিরত্নাকরে প্রদত্ত বিবরণের ঐক্য নাই।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত।

চৈতন্য-চরিতামৃত-রচক কৃষ্ণদাস কবিরাজ সম্ভবতঃ ১৫১৭ খৃঃ অব্দে বৰ্দ্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্ম গ্রহণ করেন।* তাঁহার পিতা ভগীরথ সামান্য চিকিৎসা ব্যবসায় দ্বারা পরিবার ভরণপোষণ করিতেন; কৃষ্ণদাসের যখন ৬ বৎসর বয়ঃক্রম তখন তাঁহার পিতার কাল হয়, কৃষ্ণদাসের কনিষ্ঠ শ্যামদাস তখন ৪ বৎসরের শিশু; এই দুই শিশুপুত্র লইয়া মাতা সুনন্দার বড় ভাবিতে হয় নাই, তিনিও স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই কালগ্রাসে পতিত হন। কৃষ্ণদাস ও শ্যামদাস পিতৃষ্বসার গৃহে পালিত হন।

কৃষ্ণদাসের পরিচয়।

সুতরাং কৃষ্ণদাস শৈশব হইতেই কষ্টে অভ্যস্ত; কিন্তু একদিন ব্যতীত

---

* মুকুন্দদেব গোস্বামী নামক কৃষ্ণদাস কবিরাজের একজন শিষ্য তৎকৃত "আনন্দ-রত্নাবলী" নামক পুস্তকে কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে নানারূপ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। বিবর্ত্তবিলাস-প্রণেতা চৈতন্যচরিতামৃতের অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন করিতে যে সমস্ত আখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—তাহা আমরা পরিত্যাগ করিলাম।

কষ্ট তাঁহাকে কখনই অভিভূত করিতে পারে নাই, সে দিন—জীবনের শেষ দিন; সে বড় শোচনীয় কথা, পরে বলিব। বালক কৃষ্ণদাস লিখিতে পড়িতে শিখিলেন, কিছু সংস্কৃত পড়িলেন; জীবনে ভাগ্যের হাসিমুখ দেখেন নাই; প্রকৃতি তাঁহাকে বিমাতার চক্ষে দেখিয়াছিলেন; ধাত্রীক্রোড়ে পালিত শিশুর ন্যায় তিনি প্রকৃতির অনাবৃত আঙ্গিনায় উপেক্ষিত ছিলেন; কিন্তু সংযত-চিত্ত কৃষ্ণদাস সংসারের ভোগ-সুখ তাচ্ছিল্যের সহিত উপেক্ষা করিলেন; তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই।

একদিন নিত্যানন্দপ্রভুর সুবিখ্যাত ভৃত্য 'মীনকেতন' রামদাস ঝামটপুরে আগমন করেন; আজন্মদুঃখী কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবপ্রভাবে মুগ্ধ হইলেন, ইহসংসার হইতে এক উৎকৃষ্ট সংসারের চিত্র তাঁহার চক্ষে পড়িল; শ্যামদাসের চপল বাগ্বিতণ্ডায় যখন একটু ক্ষুব্ধ হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন তখন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবন যাইতে স্বপ্নাদেশ করিলেন; নিঃসম্বল কৃষ্ণদাস ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা পাথেয় নির্ব্বাহ করিয়া তথায় উপনীত হন। যমুনার মৃদু-তরঙ্গ-নাদিত নীপ-তরুমূল, শ্যামতমালাবৃতকুঞ্জ বৈষ্ণবের চিত্তে নানা উৎসে ভক্তির কথা সঞ্চারিত করে; কৃষ্ণদাস সংসারে প্রবেশ করেন নাই, তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল,—শুভ্রপুষ্পসম; সুতরাং যখন সনাতন, রূপ, জীব, রঘুনাথদাস, গোপালভট্ট ও কবিকর্ণপূর এই ছয় বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট ভাগবতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, তখন সেই নির্ম্মল চিত্তে ভক্তির কথা অতি সরস ভাবে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া গেল; এই সময়ে তিনি সংস্কৃতে "গোবিন্দলীলামৃত" ও "কৃষ্ণকর্ণামৃতের টিপ্পনী" প্রণয়ন করেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকায় ও কবিত্বশক্তি গোবিন্দলীলামৃতে বৈষ্ণবসমাজে বিদিত হয়। ইহা ছাড়া তিনি বাঙ্গালা ভাষায় "অদ্বৈতসূত্রকড়চা," "স্বরূপবর্ণন," "রাগময়ীকণা" প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেন।

বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ "চৈতন্যভাগবত" রীতিমত প্রত্যহ সায়ংকালে একত্র হইয়া পাঠ করিতেন; কিন্তু উহাতে চৈতন্যপ্রভুর অন্তলীলা বিশেষরূপে বর্ণিত না থাকায় বৃন্দাবনবাসী কাশীশ্বর গোঁসাঞির শিষ্য গোবিন্দ গোঁসাঞি, যাদবাচার্য্য গোঁসাঞি, ভূগর্ভ গোঁসাঞি, চৈতন্যদাস, কুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণদাস ও শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজকে চৈতন্যদেবের শেষ জীবন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতে অনুরোধ করেন,—তখন কৃষ্ণদাস কবিরাজ শুভ্রকেশমণ্ডিত অশীতিপর বৃদ্ধ, ধীরে ধীরে কালের অবশিষ্ট স্বল্পসংখ্যক সোপানাবলি অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর সন্নিহিত হইতেছিলেন; এ বিষম অনুরোধ প্রাপ্ত হইয়া তিনি একটু গোলে পড়িলেন; পূজক আসিয়া গোবিন্দজীর আদেশমাল্য হস্তে আনিয়া দিয়া গেল, তখন সেই অনুরোধ আদেশের শক্তি লাভ করিল, তিনি আর এড়াইতে পারিলেন না।

চৈতন্য-চরিতামৃত-রচনা আরম্ভ।

কিন্তু দৃষ্টিশক্তি হারা হইয়াছে, লিখিতে বারংবার হস্ত কম্পিত হয়; বৃদ্ধ ব্যাপার সমাধা করিয়া যাইতে পারিবেন, এ বিশ্বাস তাঁহার মনে স্থির থাকে না। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, মুরারিগুপ্ত ও স্বরূপ দামোদরের কড়চা এবং কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক মূলতঃ অবলম্বন করিয়া এবং শ্রীদাস, লোকনাথ গোস্বামী, গোপালভট্ট, রঘুনাথদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নিকট মৌখিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রবল ও অমানুষী অধ্যবসায়ে ১৬১৫ খৃঃ অব্দে (নয় বৎসরের চেষ্টায়) কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। *

রচনা শেষ।

* "শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ শ্রীমদ্বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যে হসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"
এই শ্লোকটি চরিতামৃতের অনেকগুলি প্রাচীন ও প্রামাণ্য পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে।

চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গলসুলভ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের চিহ্ন নাই; বৃন্দাবনের শীতল বায়ু ও নির্ম্মল আকাশের তলে ভক্তির অবতার চৈতন্য-

গ্রন্থ সমালোচনা।

মূর্ত্তি কৃষ্ণদাসের চিত্তে যেরূপ নির্ম্মল ও সুন্দরভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল, চৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহার সুন্দর প্রতিলিপি উঠিয়াছে। গৌড়দেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ গাঢ় বিদ্বেষে পরিণত হইতেছিল ও উভয় পক্ষের ক্রোধোন্মত্ত যুবকগণ লেখনী ও জিহ্বার তীব্রতা দ্বারা পরস্পরকে তাড়না করিতেছিলেন; সুদূর বৃন্দাবনতীর্থে এই দলাদলির কলুষিত বায়ু বহে নাই ও অশীতিপর বৃদ্ধ সেই প্রসঙ্গ অবগত থাকিলেও সেই সব চাপল্যে যোগ দিতে প্রবৃত্তি বোধ করেন নাই। বৃদ্ধের হৃদয়টি শিশুর ন্যায় সুকুমার ও বিনয়মাখা; আমরা কোন বিষয়ে পুস্তক লিখিলে তদ্বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী পুস্তকের দোষ গাহিয়া মুখবন্ধ করিয়া থাকি, কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত কোন কোন বিষয়ে চৈতন্যভাগবত হইতে অনেক উৎকৃষ্ট হইলেও কৃষ্ণদাস পত্রে পত্রে নারায়ণীসুত বৃন্দাবনের প্রশংসা করিয়াছেন. সেই প্রশংসোক্তি পড়িয়া আমরা তাঁহার নিজের বিনয়েরই অধিক প্রশংসা করিয়াছি। চৈতন্যপ্রভুর জীবন সম্বন্ধে গোবিন্দদাসের কড়চার পরে চৈতন্যচরিতামৃতই শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ; কিন্তু গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রবীণতাগুণে এই পুস্তক পূর্ব্ববর্ত্তী সকল পুস্তক হইতেই শ্রেষ্ঠ। চৈতন্যভাগবতের ন্যায় ইহাতে ঘটনার তত ঘন সন্নিবেশ নাই; বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে মধ্যে অবকাশ আছে,—কিন্তু সেই অবকাশ, ছবির অধিষ্ঠানক্ষেত্রের ন্যায় মূল ঘটনার সৌন্দর্য্য গাঢ়ভাবে স্পষ্ট করে। বৈষ্ণবোচিত সুন্দর বিনয়, ভক্তির ব্যাখ্যা, স্বচ্ছন্দে সংযত লেখনী দ্বারা বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আলোড়ন ও প্রেমকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুসম্বদ্ধ করার নৈপুণ্য,—এই বহুগুণসমন্বিত হইয়া চৈতন্যচরিতামৃত এক উন্নত প্রাকৃতিক দৃশ্যপটে ক্ষুদ্র লতাগুল্মপুষ্প হইতে বৃহৎ বনস্পতির বিচিত্র সমাবেশযুক্ত বৈভব প্রকটিত করিতেছে।

কেবল অন্ত্যলীলায় নহে, আদি ও মধ্যলীলার যে যে স্থান বৃন্দাবনদাস ভাল করিয়া লিখিতে পারেন নাই, কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই সব স্থল বিচক্ষণ ভাবে পূরণ করিয়াছেন। দিগ্বিজয়ী রামানন্দ রায়ের সঙ্গে বিচার বর্ণনায় চরিতামৃতে পাণ্ডিত্যের একশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। পুস্তকখানি বহু সংখ্যক সংস্কৃত শ্লোকে পূর্ণ, ইহার অনেক শ্লোক তাঁহার নিজের রচিত, আর অনেকগুলি নানাবিধ সংস্কৃত পুস্তক হইতে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত।*

এই পুস্তকের মোট শ্লোক সংখ্যা ১২০৫১, তন্মধ্যে আদিখণ্ডে, ১৭ পরিচ্ছেদ, শ্লোকসংখ্যা ২৫০০; মধ্যে ২৫ পরিচ্ছেদ, শ্লোকসংখ্যা ৬০৫১; ও অন্তে ২০ পরিচ্ছেদ, শ্লোকসংখ্যা ৬৫০০।

মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা।

অন্ত্যখণ্ডে মহাপ্রভুর যে সকল ভাব বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিগূঢ় ভক্তিরসাত্মক। আমরা গোবিন্দদাসের কড়চায়

---

* চৈতন্যচরিতামৃতে কোন্ কোন্ সংস্কৃতগ্রন্থ হইতে প্রমাণ স্বরূপ শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধুভদ্র মহাশয় বর্ণমালানুক্রমে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, (অনুসন্ধান; ১৩০২ সাল, ৫ম সংখ্যা।) তাহা এই;—

(১) অভিজ্ঞান শকুন্তলা, (২) অমরকোষ, (৩) আদিপুরাণ, (৪) উত্তরচরিত, (৫) উজ্জ্বলনীলমণি, (৬) একাদশী তত্ত্ব, (৭) কাব্য প্রকাশ, (৮) কূর্ম্মপুরাণ, (৯) কৃষ্ণকর্ণামৃত, (১০) কৃষ্ণসন্দর্ভ, (১১) ক্রমসন্দর্ভ, (১২) গরুড়পুরাণ, (১৩) গীতগোবিন্দ, (১৪) গোবিন্দলীলামৃত, (১৫) গৌতমীয়তন্ত্র, (১৬) চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, (১৭) জগন্নাথবল্লভ নাটক, (১৮) দানকেলিকৌমুদী, (১৯) নাটক চন্দ্রিকা, (২০) নারদ পঞ্চরাত্র, (২১) নৃসিংহপুরাণ, (২২) পঞ্চদশী, (২৩) পদ্মপুরাণ, (২৪) পদ্যাবলী, (২৫) পাণিনিসূত্র, (২৬) বরাহপুরাণ, (২৭) বিদগ্ধমাধব, (২৮) বিশ্বপ্রকাশ, (২৯) বিষ্ণুপুরাণ, (৩০) বীরচরিত, (৩১) বৃহৎগৌতমীয়তন্ত্র, (৩২) বৃহন্নারদীয়পুরাণ, (৩৩) বেদান্তদর্শন, (৩৪) বৈষ্ণবতোষিণী, (৩৫) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, (৩৬) ব্রহ্মসংহিতা, (৩৭) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, (৩৮) ভক্তিলহরী, (৩৯) ভক্তিসন্দর্ভ, (৪০) ভগবদ্গীতা, (৪১) ভাগবতপুরাণ, (৪২) ভাগবতসন্দর্ভ, (৪৩) ভাবার্থ-দীপিকা, (৪৪) ভারতী, (৪৫) মলমাসতত্ত্ব, (৪৬) মনুসংহিতা, (৪৭) মহাভারত, (৪৮) যামুনাচার্য্যকৃতালকমন্দারস্তোত্র, (৪৯) রঘুবংশ, (৫০) রামায়ণ, (৫১) রূপগোস্বামীর কড়চা, (৫২) লঘুভাগবতামৃত, (৫৩) ললিতমাধব,

চৈতন্যপ্রভুর উদ্দাম পূর্ব্বরাগের প্রেমাবেশের লক্ষণ দেখিয়াছি, তখন তাঁহার ভাবের পূর্ণ আবেশ একক্ষণে হইয়াছে, পরক্ষণে তিনি সুস্থ হইয়াছেন; তাঁহার মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের মধ্যে পরিষ্কার একটি ব্যবচ্ছেদ-রেখা অনুভব করা যায়, কিন্তু চরিতামৃতের শেষখণ্ডে তাঁহার ভাবোন্মত্ততা ক্কচিৎ মাত্র ভঙ্গ হইয়াছে; তাঁহার জীবনে পূর্ব্বে যে ভাব মেঘান্তরিত আলোক রেখার ন্যায় মধ্যে মধ্যে দীপ্তি প্রকাশ করিত, সেইভাব শেষে জীবনব্যাপক হইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছে; জাগরণ স্বপ্নে, জ্ঞান ভ্রান্তিতে তখন মিশিয়া গিয়াছে। এই ভাব-বিহ্বলতার ক্রমবিকাশ কৃষ্ণদাস অন্ত্যখণ্ডে আঁকিয়াছেন। চৈতন্য-প্রভু কখনও বিরহে জগন্নাথ-মন্দিরের গাম্ভীরায় সারারাত্রি মস্তক ঘর্ষণ করিয়া শোণিত-সিক্ত মৃতকল্প হইয়া রহিয়াছেন, কখনও সলিল হইতে তাঁহার শিথিল অস্থি বিশিষ্ট প্রেমের শেষ দশার আকৃতিটি উঠাইয়া লোকবৃন্দ কর্ণমূলে হরিনাম বলিয়া চৈতন্য সঞ্চার করিতেছে; কখনও প্রভু জয়দেবের গান শুনিয়া উন্মত্তভাবে গায়িকারমণীকে আলিঙ্গন করিতে কণ্টকবিদ্ধ পদে ছুটিতেছেন,—স্ত্রী পুরুষে ভেদজ্ঞান তখন বিলুপ্ত হইয়াছে; রাত্রিকালে বহুবিধ লোক তাঁহাকে প্রহরীরূপে রক্ষা করিতেছে, তাহাদের ঈষৎ তন্দ্রাবেশ হইলে পাগলের ন্যায় জঙ্গলে ছুটিয়া অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছেন; শরীর বিশীর্ণ, চর্ম্মসার,—"চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধি আছে দীর্ঘ হৈয়া। দুঃখিত হইলা সবে প্রভুরে দেখিয়া॥"—(চৈ, চ, অন্ত)। তাঁহার জাগরণ ও স্বপ্ন একইরূপ, "একদিন মহাপ্রভু করেছে শয়ন। কৃষ্ণরাসলীলা হয় দেখিলা স্বপন॥"—(চৈ, চ, অন্ত)। জাগরণেও ত নিত্য তাহাই দর্শন।

যদিও চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর ঠিক তিরোধানটি বর্ণিত হয় নাই, কিন্তু এই ভক্তিবিহ্বলতার ক্রমবৃদ্ধিজনিত দেহতাচ্ছিল্যো পরিণামের ছায়াপাত করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

---

(৫৪) সংক্ষেপভাগবতামৃত, (৫৫) সাহিত্যদর্পণ, (৫৬) স্তবমালা, (৫৭) স্বরূপ গোস্বামীর কড়চা, (৫৮) শাশ্বততন্ত্র, (৫৯) হরিভক্তিবিলাস, (৬০) হরিভক্তিসুধোদয়।

শেষ সময়েও 'মা' বলিয়া মধ্যে মধ্যে মনে হইত ; আমদিগের ধর্ম্মের কথা যেমন কোনও অতি শুভক্ষণে ছায়ার ন্যায় মনে উদয় হইয়া লীন হয়, সেইরূপ ইহসংসারের কথা ক্বচিৎ ছায়ার ন্যায় চৈতন্যপ্রভুরও স্মৃতিপথে উদিত হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হইত। জগদানন্দকে বৎসর বৎসর নদীয়া পাঠাইতেন, একবার মায়ের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন,—"তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস। বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ॥ এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার। তোমার অধীন আমি পুত্র সে তোমার॥"—(চৈ, চ, অন্ত)।

ইহ সংসারের স্মৃতি।

চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষা নির্দ্দোষ নহে ; কবিরাজঠাকুর সংস্কৃতে সুদক্ষ থাকিলেও বাঙ্গালায় বড় নিপুণ ছিলেন না। বিশেষ, বৃন্দাবনে দীর্ঘকাল থাকাতে তাঁহার বাঙ্গালাভাষায় বৃন্দাবনী এরূপ মিশিয়া গিয়াছিল যে, একজন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোক কয়েক বর্ষ বাঙ্গালামুলুকে থাকিলে যেরূপ বাঙ্গালা কহে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষাটিও মধ্যে মধ্যে সেইরূপ হইয়াছে। এই পুস্তক সংস্কৃত, বৃন্দাবনী ও বাঙ্গালা, এই তিনরূপ পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে প্রস্তুত। কিন্তু গ্রন্থের সর্ব্বত্রই ভাষা এরূপ নহে, মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার বাঙ্গালাও পাওয়া যায়। ভাষা সম্বন্ধে পরিশিষ্টে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। চরিতামৃত পরিপক্ক লেখনীর রচনা, উহা সর্ব্বত্রই সুমিষ্ট না হউক, মনের ভাব জ্ঞাপন করিতে উৎকৃষ্ট-রূপ উপযোগী।

রচনার দোষ।

৮৫ বর্ষ বয়সে ১৬১৫ খৃঃ অব্দে পুস্তক সমাধা করিয়া কবিরাজ এই কয়েকটি কথা লিখেন,—"আমি লিখি ইহ মিথ্যা করি অনুমান। আমার শরীর কাষ্ঠপুতলী সমান॥ বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির। হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে আর স্থির॥ নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি। পঞ্চরোগ পীড়া ব্যাকুল রাত্রি দিন মরি॥"

রচনায় বিনয়।

কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস প্রভৃতি লেখকগণ তাঁহাদের পুস্তকপাঠ ভবসিন্ধু

পার হইবার একমাত্র সেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, "কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্" ইত্যাদি ভাবের ভণিতাপাঠে অভ্যস্ত বাঙ্গালীপাঠক বৈষ্ণবাগ্রগণ্য কৃষ্ণদাসের ভণিতায় বিনয়ের নূতন আদর্শ পাইবেন, সন্দেহ নাই,—

"চৈতন্যচরিতামৃত যেইজন শুনে।
তাঁহার চরণ ধূঞা করোঁ মুঞি পানে॥"—(চৈ, চ, অন্ত)।

কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন, জীবনে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সংসারের নানা বিচিত্র উপদ্রব সহ্য করিয়া, রৌদ্র বৃষ্টি অকাতরে মাথায় বহিয়া যে দৃঢ় চরিত্রের বিকাশ পাইয়াছিল, সে চরিত্রের শেষফল এই যে চরিতামৃত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ভবধামের অমৃত বলিয়া এখনও অনেকে উপভোগ করেন; পণ্ডিত হারাধনদত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন,— "যে দিন এই পুস্তক পাঠ না হয় সেই দিনই বিফল।"*

পুস্তক লুণ্ঠন ও কবিরাজের মৃত্যু।

এই পুস্তক লেখার পর তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য সাধিত হইল—এ কথা মনে উদয় হইয়াছিল; এখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তত ছিলেন। জীবগোস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই পুস্তক অনুমোদন করিলে কবিরাজের স্বহস্ত-লিখিত পুঁথি গৌড়ে প্রেরিত হয়; কিন্তু পথে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরের নিযুক্ত দস্যুগণ পুস্তক লুণ্ঠন করে; এই পুস্তকের প্রচার চিন্তা করিয়া কৃষ্ণদাস মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিলেন, সহসা বনবিষ্ণুপুর হইতে বৃন্দাবনে লোক আসিয়া এই শোকাবহ সংবাদ জ্ঞাত করাইল। অবস্থার কোন আঘাতে যে কৃষ্ণদাস ব্যথিত হন নাই, আজ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠব্রতের ফল—মহাপ্রভুর সেবায় উৎসর্গীকৃত মহাপরিশ্রমের বস্তু অপহৃত হইয়াছে শুনিয়া কৃষ্ণদাস জীবন বহন করিতে পারিলেন না। জীবনপণে যে পুস্তক লিখিয়াছিলেন তাহার শোকে জীবন ত্যাগ করিলেন,—"রঘুনাথ, কবিরাজ শুনিলা,

* নব্যভারত, ভাদ্র ১৩০০; ২৬৫ পৃঃ।

ভুজনে। আছাড় খাইয়া কাঁদে লোটাইয়া ভূমে॥ বৃদ্ধকালে কবিরাজ না পারে উঠিতে। অন্তর্দ্ধান করিলেন দুঃখের সহিতে॥"—প্রেমবিলাস। এই উপলক্ষে পণ্ডিত হারাধন-দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন, "কবিরাজের অন্তর্দ্ধানের কথা লেখা উচিত নহে এবং আমাদের তাহা লিখিতে নাই, লিখিতে গেলে বুক ফাটে।" *

চরিতামৃতের ভাবী দেশব্যাপী যশের বিষয় কবিরাজ জানিয়া মরিতে পারেন নাই—শেষে দেশবিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই পুস্তকের সংস্কৃত টিপ্পনী প্রণয়ন করেন, বৈষ্ণবসমাজে এখনও এ পুস্তক রীতিমত পূজিত হইয়া থাকে। কবিরাজ ইহার একটু পূর্ব্বাভাস জানিয়া মরিলে আমাদের দুঃখ হইত না;—তিনি উপযুক্ত বয়সেই ত প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কবিরাজ প্রেমধর্ম্ম এবং আরাধ্য ও আরাধকের সম্বন্ধবিষয়ে যে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন,—তাহার দুইটি অংশ উদ্ধৃত হইল;—

রচনার নমুনা।

(১) "কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তার প্রেম নাম॥ কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল। কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত প্রবল॥ লোকধর্ম্ম দেহধর্ম্ম বেদধর্ম্ম কর্ম্ম। লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥ দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন। স্বজন করিব যত তাড়ন ভর্ৎসন॥ সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম সেবন॥ ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণ দৃঢ় অনুরাগ। স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥ অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর। কাম অন্ধ তমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥"—(চৈ, চ, আদি)।

(খ) "মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন। রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥ মোর গীত বংশীস্বরে আকর্ষে ত্রিভুবন। রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥ যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ। মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধাঅঙ্গগন্ধ॥ যদ্যপি আমার রসে জগত সরস। রাধার অধররসে আমা করে বশ॥ যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল। রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল॥ এইমত জগতের সুখ আমা হেতু। রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু॥ এইমত অনুভব আমার প্রতীত। বিচারি দেখিয়ে যদি সব

* নব্যভারত, ভাদ্র ১৩০০, ২৬২ পৃঃ। ভক্তিরত্নাকরের সঙ্গে এই বৃত্তান্তের অনৈক্য।

বিপরীত॥ রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন। আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান॥ পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন। মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥ কৃষ্ণআলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে। এই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে॥ অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ। উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হয়ে অন্ধ॥ তাম্বুল চর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে। আনন্দ সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে॥ আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ। শতমুখে বলি তবু না পাই তার অন্ত॥"—(চৈ, চ, আদি)।

চৈতন্যপ্রভুর বৃন্দাবন দর্শন বর্ণনায় প্রাচীন লেখক নবীন কবির স্ফূর্ত্তি দেখাইয়াছেন। তাঁহার পরিণত ইতিহাসের স্বচ্ছ ছায়ায় সেই দৃশ্যটি অতি সুন্দরভাবে বিম্বিত হইয়াছে; দেবদর্শকের পদার্পণে বৃন্দাবন দেবোদ্যানের ন্যায় সুন্দর হইয়া উঠিল,—"প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষ লতাগণ। অঙ্কুর, পুলক, মধু, অশ্রু বরিষণ॥ ফুল ফল ভরি ডাল পড়ে প্রভু পায়। বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লৈয়া যায়॥" উন্মত্ত ভক্তির আবেশে,—"প্রতি বৃক্ষ লতা প্রভু করে আলিঙ্গন। পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ॥" তখন তাঁহার অশ্রুবিন্দু তরুপুষ্পপল্লবের শিশিরবিন্দুর সহিত জড়িত হইয়া গেল; তাঁহার কণ্ঠের ব্যাকুল "কৃষ্ণ" ধ্বনি বিহগকুল আকাশে প্রতিধ্বনিত করিল;—"শুক শারিকা প্রভুর হাতে উড়ে পড়ে। প্রভুকে শুনায়ে কৃষ্ণের গুণ শ্লোক পড়ে॥"

তুলিতে আঁকিতে পারিলে এখানে একটি উজ্জ্বল চিত্র সমাবেশের সুযোগ ছিল। রামানন্দরায়ের প্রসঙ্গে চৈতন্যমুখোচ্চারিত—"পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥ সো নহ রমণ হম নহ রমণী।" প্রভৃতি সুশ্রাব্যপদ আমরা 'চৈতন্যচরিতামৃতে'ই দেখিতে পাই। এই পদটি রায় রামানন্দ কৃত।

পূর্ব্বে উল্লিখিত পুস্তকগুলি ছাড়া কৃষ্ণদাসকবিরাজ "রসভক্তিলহরী" * নামক একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক বাঙ্গালায় রচনা করেন; ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন নায়িকার লক্ষণ বর্ণিত আছে। †

* এই পুস্তকের হস্ত-লিখিত একখানা প্রাচীন পুঁথি আমার নিকট আছে, অন্য কোথাও আছে বলিয়া জানি না।

† 'ভক্ত দিগ্‌দর্শনী'র তালিকা মতে কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম ১৪১৮ শক (১৪৯৬ খৃঃ অঃ) এবং মৃত্যু ১৫০৪ শকের (১৫৮২ খৃঃ অঃ) চান্দ্রাশ্বিন শুক্লাদ্বাদশী।

নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তম বিলাস ও নিত্যানন্দদাসের প্রেম-বিলাস প্রভৃতি।

পরবর্ত্তী চরিতসাহিত্যে চৈতন্য-প্রভুর পারিষদগণ ও অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্য-প্রভুর সমস্ত জীবনচরিতগুলিতেই প্রসঙ্গক্রমে নিত্যানন্দপ্রভুর বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে আমরা বৃন্দাবনদাসের "নিত্যানন্দ-বংশাবলী"র কথা উল্লেখ করিয়াছি। নিত্যানন্দ-প্রভুর পিতামহের নাম সুন্দরামল্লবাঁড়ুরী, পিতার নাম হরাইওঝা ও মাতার নাম পদ্মাবতী—বাসস্থান বীরভূম জেলায় একচক্রাগ্রাম, তিনি ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ অম্বিকাগ্রামের নিকট শালিগ্রামনিবাসী সূর্য্যদাস সরখেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীদেবীকে বিবাহ করেন; জাহ্নবীদেবীর নাম বৈষ্ণবসাহিত্যে সুপরিচিত। জাহ্নবী-দেবীদ্বারা নিত্যানন্দের গঙ্গা নামে কন্যা ও বীরভদ্র নামক পুত্র লাভ হয়; ভগীরথ আচার্য্যের পুত্র মাধবাচার্য্য (মহাপ্রভুর পড়ুয়া) গঙ্গাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

নিত্যানন্দ।

অদ্বৈত আচার্য্যের পিতামহের নাম নৃসিংহ, * পিতার নাম কুবেরপণ্ডিত, মাতার নাম নাভাদেবী ও পত্নীর নাম সীতাদেবী;—আদিম বাসস্থান শ্রীহট্টান্তর্গত নবগ্রাম, পরে শান্তিপুরে বসতি স্থাপন করেন। ইনি ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শ্যামদাসপ্রণীত "অদ্বৈতমঙ্গলে," ঈশাননাগর-

অদ্বৈতাচার্য্য।

* "নৃসিংহ সন্ততি বলি লোকে যারে গায়॥ সেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাতি। সিদ্ধশ্রোত্রিয়াখ্য আরু ওঝার সন্ততি॥ যাহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা। গৌড়ীয় বাদসাহ মারি গৌড়ে হ'ল রাজা॥"—ঈশান নাগর কৃত অদ্বৈত প্রকাশ। এই "নাড়িয়াল" বংশোদ্ভূত বলিয়াই মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে কখনও "নাড়াবুড়া" কিম্বা শুধু "নাড়া" বলিয়া আহ্বান করিতেন।

প্রণীত "অদ্বৈতপ্রকাশে" ও লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস প্রণীত "অদ্বৈতের বাল্যলীলা-সূত্র" প্রভৃতি পুস্তকে ইহার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, পরন্তু সমস্ত বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতেই নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্যের সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রূপসনাতন।

রূপ-সনাতন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অগ্রগণ্য ও মহাপ্রভুর পরমভক্ত পার্শ্বচর। ইহারা কর্ণাটাধিপ বিপ্ররাজের বংশোদ্ভূত। নিম্নে বংশাবলী প্রদান করিতেছি ;—
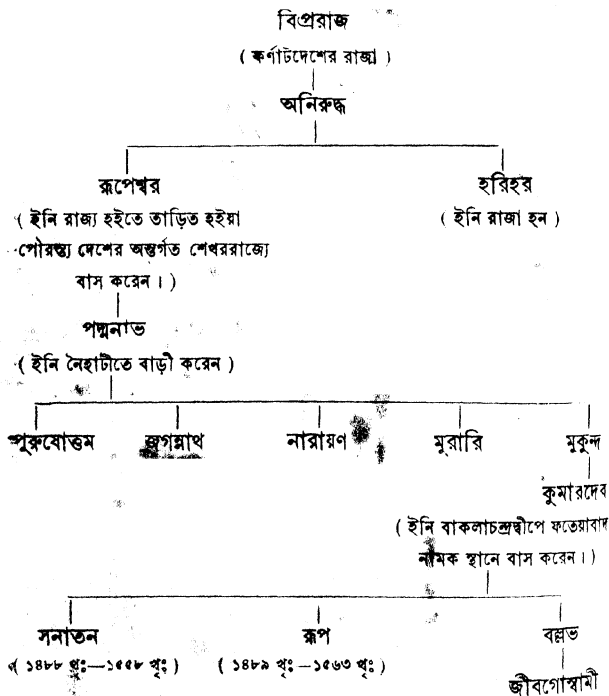
রূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামী বহুবিধ সংস্কৃতগ্রন্থ প্রণয়ন করেন; ইঁহারা একদিকে শুদ্ধাচারী বৈষ্ণব, অপরদিকে প্রতিভাপন্ন কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমস্ত গ্রন্থই সংস্কৃতে রচনা করাতে ইঁহারা আমাদের প্রসঙ্গ-বহির্ভূত হইয়াছেন। *

অন্যান্য ভক্তগণ।

পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ব্যতীত বেঙ্কটভট্টের পুত্র গোপালভট্ট, মাধবমিশ্রের পুত্র গদাধর (১৪৮৬ খৃঃ—১৫১৪ খৃঃ), সপ্তগ্রামবাসী গোবর্দ্ধনদাসের পুত্র রঘুনাথদাস, (১৪৯৮ খৃঃ জন্ম), শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপূর ('চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক'-প্রণেতা) প্রভৃতি মহাপ্রভুর পার্শ্বচরগণের বৃত্তান্ত অনেক পুস্তকেই পাওয়া যায়।

ত্রিবেণীর প্রসিদ্ধ ভক্ত উদ্ধরণ দত্তের বৃত্তান্ত অনেক প্রাচীন পুঁথিতেই উল্লিখিত দৃষ্ট হয়; পদসমুদ্রের একটি পদে তাঁহার এইরূপ পরিচয় আছে;—
"শ্রীকরনন্দন, দত্ত উদ্ধরণ, ভদ্রাবতী গর্ভজাত। ত্রিবেণীতে বাস, নিতাইর দাস, শ্রীগৌরাঙ্গপদাশ্রিত॥ শাণ্ডিল্যপ্রবর, শ্রেষ্ঠ শান্ত ধীর, সুবর্ণবণিক্ খ্যাতি। রাধাকৃষ্ণপদ, ধ্যায় নিরন্তর, বৈশ্যকুলেতে উৎপত্তি॥ বিষয় বাণিজ্য, সাংসারিক কার্য্য, মলপ্রায় ত্যাগ করি। পুত্র শ্রীনিবাসে, রাখিয়া আবাসে, হইলা বিবেকাচারী॥ নীলাচলপুরে, প্রভু মিলিবারে সদা ইতি উতি ধায়। আশাঝুলি লয়ে, ভিখারী হইয়ে, প্রসাদ মাগিয়া খায়॥

---

* সনাতন গোস্বামী 'দিক্প্রদর্শিনী' নামক 'হরিভক্তিবিলাসের' টীকা, শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'বৈষ্ণবতোষিণী' নামক টীকা, 'লীলাস্তব' ও 'টীকাসহ দুইখণ্ড ভাগবতামৃত' প্রণয়ন করেন। রূপগোস্বামী 'হংসদূত', 'উদ্ধবসন্দেশ', 'কৃষ্ণজন্মতিথি', 'গণোদ্দেশদীপিকা', 'স্তবমালা', 'বিদগ্ধমাধব', 'ললিতমাধব', 'দানকেলি-কৌমুদী', 'আনন্দমহোদধি', 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু', 'উজ্জ্বল নীলমণি', 'প্রযুক্তাখ্যাত চন্দ্রিকা,' 'মথুরামহিমা', 'পদ্যাবলী', 'নাটক-চন্দ্রিকা', 'লঘুভাগবতামৃত', 'গোবিন্দবিরুদাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। জীব গোস্বামীর 'হরিনামামৃতব্যাকরণ', 'সূত্রমালিকা', 'কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা', 'গোপাল-বিরুদাবলী', 'মাধবমহোৎসব', 'সঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ', 'ভাবার্থসূচকচম্পূ' প্রভৃতি ২৫ খানা সংস্কৃতগ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে সুবিদিত। ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ 'ভক্তিরত্নাকরে'র প্রথম তরঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রভুভক্তগণ, পাই নিজ জন, রাখিয়া যতন করি। এ দাসমুকুন্দ, দেখিয়া আনন্দ দত্তের দৈন্যতা হেরি॥" স্বর্গীয় হারাধনদত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় আপনাকে উদ্ধরণ দত্তের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। *

শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ।

বৈষ্ণবসমাজে নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য ও গদাধরদাস একসময়ে যে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দও সেইরূপ শ্রদ্ধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এমন কি, বৈষ্ণবসমাজে শ্রীনিবাস ও নরোত্তম মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার বলিয়া আদৃত। ইঁহাদের জীবন বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিতে বহুসংখ্যক গ্রন্থকার লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এই বিরাট অধ্যবসায়চিহ্নিত কীর্ত্তির প্রান্তে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। বটতলার কর্ম্মঠতা ও উদ্যম এই সাহিত্যের অতি নগণ্য অংশমাত্র এপর্য্যন্ত মুদ্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। কীট, অগ্নি প্রভৃতির উপদ্রবে বৎসর বৎসর এই প্রাচীন কীর্ত্তিরাশি লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার উপযুক্ত কোন আয়োজন এখন পর্য্যন্তও হয় নাই।

শ্রীনিবাসের পিতা গঙ্গাধরচক্রবর্ত্তীর নিবাস গঙ্গাতীরস্থ চাথন্দিগ্রামে। গঙ্গাধর শেষে চৈতন্যদাস নাম গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাসের মাতার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া ও মাতুলালয় জাজিগ্রামে। নরোত্তমদাস পদ্মানদীর তীরস্থ গোপালপুরের কায়স্থ রাজা কৃষ্ণানন্দদত্তের পুত্র, মাতার নাম নারায়ণী ইনি বৃন্দাবনবাসী লোকনাথগোস্বামীর নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হন। নরোত্তম রাজপুত্র হইয়াও রঘুনাথদাসের ন্যায় সংসারত্যাগী হন; তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতজ ভ্রাতা সন্তোষদত্ত (পুরুষোত্তমদত্তের পুত্র) তৎস্থলে রাজা হন। এই

* ৺ হারাধনদত্তের মতে উদ্ধরণদত্ত ১৪৮১ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা লক্ষ্মণসেনের অন্যতম অমাত্য উমাপতিধর ভবেশদত্তের শ্যালক ছিলেন। ভক্তিনিধি মহাশয় বলেন, এই ভবেশদত্তই উদ্ধরণ দত্তের আদিপুরুষ।

উদ্ধারণ দত্তের প্রতিমূর্ত্তি

সন্তোষদত্তই শ্রীখেতুরীর বহু বিগ্রহস্থাপন উপলক্ষে প্রসিদ্ধ উৎসব করিয়া সমস্ত বৈষ্ণবমণ্ডলী একত্র করেন।

শ্যামানন্দ দণ্ডেশ্বর গ্রামবাসী কৃষ্ণমণ্ডল নামক এক সদেগাপের পুত্র, মাতার নাম দুরিকা। বাল্যকালে ইঁহাকে সকলে 'দুঃখী' বলিয়া ডাকিত, তৎপর 'কৃষ্ণদাস' ও বৃন্দাবনে বাস-কালে 'শ্যামানন্দ' আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইঁহার দীক্ষাগুরুর নাম হৃদয়চৈতন্য। 'শ্যামানন্দ প্রকাশ' ও 'অভিরামলীলা গ্রন্থে' তাঁহার সম্বন্ধে অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইঁহার পিতা শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল পূর্ব্বে গৌড়দেশবাসী ছিলেন; তৎপর উৎকল দেশে যাইয়া দণ্ডকেশ্বরের অন্তর্গত ধারেন্দা বাহাদুরপুরে নিবাসস্থাপন করেন। শ্যামানন্দ শেষজীবনে উৎকলে নৃসিংহপুরে অবস্থানপূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে ব্রতী হন। ইঁহার শিষ্যগণের মধ্যে রসিকানন্দ ও মুরারিই প্রধান। ইঁহাদের চেষ্টায় উৎকলবাসী অসংখ্য নরনারী বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বর্ত্তমান ময়ূরভঞ্জাধিপতি এবং উড়িষ্যার বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ পরিবার রসিকানন্দবংশীয়গণের শিষ্য।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভমধ্যে এই তিন জন প্রেমবীর বৈষ্ণবসমাজে প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহাদের মধ্যে কেবল মাত্র শ্রীনিবাস ব্রাহ্মণ ছিলেন, নরোত্তমদাস শূদ্র হইলেও বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কবি বসন্তরায় ও গঙ্গানারায়ণচক্রবর্ত্তী সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ছদ্মবেশী গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী পক্কপল্লীর রাজা নৃসিংহের সমস্ত সভাপণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন। সেই সব পণ্ডিতগণ যে রাশীকৃত সংস্কৃতগ্রন্থ বহুসংখ্যক বাহকের স্কন্ধে চাপাইয়া তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হন নাই; সুতরাং বিচারজয়ী ব্রাহ্মণটি যে শূদ্রপ্রবরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিজকে সম্মানিত মনে করিয়াছিলেন, সদলে পক্কপল্লীরাজাকেও তাঁহারই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল।

এই সাধু ভাগবতগণের জীবন বর্ণন করিতে যে সকল লেখক অগ্রসর হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভাগবতের টীকাকার,—প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর শিষ্য, জগন্নাথচক্রবর্ত্তীর পুত্র,—গঙ্গাতীরবাসী নরহরিচক্রবর্ত্তীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নরহরিচক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকর রত্নাকর সদৃশই বিরাট এবং রত্নাকরের গর্ভে যেরূপ নানা মূল্যবান ও মূল্যহীন দ্রব্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে, এই পুস্তকেও সেইরূপ নানা মূল্যবান্ ও মূল্যহীন কথার একত্র সমাবেশ হওয়াতে ইহার সার উদ্ধারে বিশেষ অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। সমস্ত পুঁথি আলোড়ন না করিলে ইহা হইতে কোন প্রয়োজনীয় বিষয় জানার উপায় নাই; ভক্তিরত্নাকর পাঠারম্ভ ও নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ একইরূপ ব্যাপার।

ভক্তিরত্নাকর।

এই বৈষ্ণব ইতিহাস-সাহিত্য সম্বন্ধে এস্থলে প্রাসঙ্গিক একটি কথা বলা আবশ্যক। য়ুরোপে ইতিহাস লিখিতে হইলে, স্বাধীনতার জন্য বড় রকমের যুদ্ধ বিগ্রহ, লেখনীর মূল লক্ষ্য হয়। বক্তৃতামালা-উত্তেজিত জনসাধারণের চেষ্টায় শাসনের কঠিন বেলাভূমি ভঙ্গ করা, কিম্বা নবদেশ আবিষ্কারচিন্তায় প্রশান্তসাগরের শান্তি ভাঙ্গিয়া বর্ব্বরের পত্রাচ্ছন্ন কুটীরে লগুড়াঘাত পূর্ব্বক তাহাকে গুলির শব্দে চমৎকৃত করিয়া টিকি ধরিয়া টানাহেঁচড়া করা প্রভৃতি বিষয় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য হয়। কতকগুলি যষ্টি মুষ্টির শব্দ ও গুলি বারুদের ঘনীভূত ধূম্রপটলে গ্রন্থপত্র যেন বিড়ম্বিত হইয়া পড়ে। ধর্ম্মের ইতিহাসও রাজনৈতিক ব্যাপারেরই যেন এক নব সংস্করণ। উহাতেও অকথ্য অত্যাচার ও নর-শোণিতলিপ্সার অভিনয়ই দৃষ্ট হয়।

য়ুরোপের ইতিহাস।

কিন্তু বৈষ্ণবেতিহাসের লক্ষ্য অন্যরূপ। মুণ্ডিতমস্তক, ভূলুণ্ঠিত, তুলসী-মাল্যবিরাজিত বৈরাগীই এই সব গ্রন্থের নায়ক। খোলবাদ্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে লেখকগণ যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, বোধ হয় য়ুরোপীয় লেখকগণ ব্লুচার কি করটেজের

বৈষ্ণবের লক্ষ্য।

যুদ্ধনীতিরও ততদূর প্রশংসা করিবেন না। কীর্ত্তনের কথা বলিতে গদ্‌গদ ভাবে লেখকগণ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়িয়া বর্ণনা করিয়াছেন—তাহা পাঠকের ধৈর্য্যের একরূপ অগ্নিপরীক্ষা। বর্ণিত গ্রন্থসকলের নায়কগণ "অশ্রুকম্পস্বেদাদিভূষিত" ('ভক্তিরত্নাকর' ৯ম অধ্যায়ে) হইলেই তাঁহারা লেখকের চক্ষে দেবরূপী হইয়া দাঁড়ান। পাঠক অনুমান করিবেন না, আমি বিদ্রূপ করিতেছি। ভক্তির রাজ্যের স্বাদ বাহিরের লোক পায় না, এই সম্বন্ধে কবির উক্তি—"অরসিকে তু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ।" আমার বক্তব্য এই যে, বৈষ্ণবগণের নিকট এই সব পুস্তক এবং তদ্বর্ণিত প্রশংসাপূর্ণ বিষয়গুলি অমূল্য, বাহিরের লোক অনধিকারী, তাঁহারা ততদূর স্বাদ পাইবেন না। কিন্তু ইতিহাস-লেখক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই সব গ্রন্থের কীট ঝাড়িয়া ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দ্বারা ক্ষুদ্র অক্ষর বড় করিয়া—লুপ্ত কথা কল্পনার দ্বারা গাঁথিয়া অগ্রসর হইলে অনেক লাভজনক উপকরণ পাইতে পারিবেন, নানাদিক্ হইতে নানাপ্রকার ঐতিহাসিক চিত্র পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল হইয়া দাঁড়াইবে।

ভক্তিরত্নাকরের সূচী।

'ভক্তিরত্নাকরে' মোট পঞ্চদশ তরঙ্গ। প্রথম তরঙ্গে জীবগোস্বামীর পূর্ব্বপুরুষগণের বিষয়, গোস্বামিগণের গ্রন্থ বর্ণন, ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৃত্তান্ত; দ্বিতীয় তরঙ্গে শ্রীনিবাসের পিতা চৈতন্যদাসের কথা; তৃতীয় এবং চতুর্থ তরঙ্গে শ্রীনিবাসের শ্রীক্ষেত্রে, গৌড়ে ও বৃন্দাবনে গমন বৃত্তান্ত; পঞ্চম ও ষষ্ঠ তরঙ্গে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও রাঘবপণ্ডিতের ব্রজবিহার, রাগরাগিণী ও নায়িকাভেদবর্ণন ও শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ প্রভৃতি গোস্বামিগণকৃত গ্রন্থ লইয়া গৌড়াভিমুখে যাত্রা; সপ্তম তরঙ্গে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বির কর্ত্তৃক গ্রন্থ চুরি ও পরিশেষে বীরহাম্বিরের বৈষ্ণবধর্ম্মগ্রহণ; অষ্টমে শ্রীনিবাসের রামচন্দ্রকে শিষ্য করা; নবমে কাঁচাগড়িয়া ও শ্রীখেতুরি গ্রামের মহোৎসবের কথা; দশমে ও একাদশে জাহ্নবীদেবীর

তীর্থাদি-দর্শন-বৃত্তান্ত ; দ্বাদশে শ্রীনিবাসের নবদ্বীপ গমন ও ঈশানকর্ত্তৃক নবদ্বীপ-বৃত্তান্ত-বর্ণন ; ত্রয়োদশে আচার্য্যমহাশয়ের দ্বিতীয় পরিণয় ও চতুর্দ্দশে বেরাকুলী গ্রামের সংকীর্ত্তন ; পঞ্চদশতরঙ্গে শ্যামানন্দকর্ত্তৃক উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার লিখিত হইয়াছে। ৫ম অধ্যায়ে গ্রন্থকর্ত্তা রাগরাগিণী সম্বন্ধে সুদীর্ঘ শাস্ত্রীয় গবেষণা ও নায়কনায়িকাভেদ এবং প্রেমের লক্ষণ বিচার দ্বারা যে পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে তিনি চিরদিনই শিক্ষিত সমাজের পূজা পাইবেন। তিনি বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের যে সুবৃহৎ ও পরিষ্কার মানচিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে কালের পৃষ্ঠায় এই দুই স্থানের ভৌগোলিক তত্ত্ব চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে। ম্যাণ্ডিভাই-লের অঙ্কিত জেরুজেলেম এবং হিউনসঙ্গএর অঙ্কিত কুশীনগর হইতেও নরহরির নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন চিত্র অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে।

ভাষাগ্রন্থের আদর।

'ভক্তিরত্নাকরে' বরাহপুরাণ, পদ্মপুরাণ, আদিপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, সৌরপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, লঘু-তোষিণী, গোবিন্দবিরুদাবলী, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা, সাধনদীপিকা, নবপন্থ, গোপালচম্পূ, লঘুভাগবত, চৈতন্য-চন্দ্রোদয়নাটক ব্রজবিলাস, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, মুরারিগুপ্তকৃত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরিত, উজ্জ্বলনীলমণি, গোবর্দ্ধনাশ্রয়, হরিভক্তিবিলাস, স্তবমালা, সঙ্গীতমাধব, বৈষ্ণবতোষিণী, শ্যামানন্দশতক, মথুরাখণ্ড প্রভৃতি বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সংস্কৃতশ্লোক প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করা পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, কিন্তু উহা এদেশের চিরাগত প্রথা-নুযায়ী। নরহরি শুধু প্রথানুগামী নহেন, একটি নূতন প্রথার প্রবর্ত্তক। 'ভক্তিরত্নাকরে' চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত হইতে অনেক শ্লোক প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে—ইহা দ্বারা নরহরিই সর্ব্বপ্রথম ভাষাগ্রন্থকে সংস্কৃতের ন্যায় সম্মানিত করিয়াছেন। 'ভক্তিরত্নাকরে' গোবিন্দদাস, নরোত্তম দাস, রায়বসন্ত প্রভৃতি বহুবিধ পদকর্ত্তার পদ সাময়িকপ্রসঙ্গসৌষ্ঠবার্থ

উদ্ধৃত হইয়াছে—তিনি নিজেও অনেকগুলি স্বীয় পদ তন্মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন কোনটির ভণিতায় স্বীয় অপর নাম 'ঘনশ্যাম' ব্যবহার কবিয়াছেন। এই পুস্তক ব্যতীত নরহরি প্রক্রিয়া-পদ্ধতি, গৌরচরিতচিন্তামণি, গীতচন্দ্রোদয়, ছন্দঃসমুদ্র, শ্রীনিবাস-চরিত, ও নরোত্তম-বিলাস রচনা করেন। এই অপরিসীম কর্ম্মঠতা ও পাণ্ডিত্যের কীর্ত্তি, বৈষ্ণব সাহিত্যের বিরাটরাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রেমের জয়চিহ্নাঙ্কিত কেতু দ্বারা চিরস্থায়ী যশঃ-স্বর্গ স্পর্শ করিতেছে; নরহরি ইতিহাসের দৃঢ়মন্দির পদাবলীর কোমল লতিকা দ্বারা বেষ্টন করিয়া পাষাণে কুসুম-সৌরভ প্রদান করিয়াছেন।

নরহরির অপরাপর রচনা।

নরোত্তম-বিলাস বোধ হয় তাঁহার শেষ গ্রন্থ; এই পুস্তকে ১২ বিলাসে নরোত্তমদাসের চরিত বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তিরত্নাকর হইতে ইহা আকারে অনেক ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে নরহরির পরিণতশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে শাস্ত্রজ্ঞান দেখাইবার ততদূর তীব্র আগ্রহ নাই, কিন্তু উপকরণরাশি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার শক্তি ভক্তিরত্নাকর হইতেও অধিক লক্ষিত হয়।

নরোত্তম-বিলাস।

সন্তোষদত্ত খেতুরীতে ছয়টি বিগ্রহ স্থাপন উপলক্ষে যে মহা-সমারোহজনক উৎসব করেন, তাহাতে তাৎকালিক সমস্ত বৈষ্ণবমণ্ডলী আহূত হন। এই ঘটনাটি বৈষ্ণবসাহিত্যের অনেক পুস্তকেই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই উৎসব, অতীত ইতিহাসের দুর্নিরীক্ষ্য ও অচিহ্নিত রাজ্যের একটি পথপ্রদর্শক আলোকস্তম্ভস্বরূপ। ইহার প্রভাবে আমরা সমাগত অসংখ্য বৈষ্ণবের মধ্যে পরিচিত কয়েক জন শ্রেষ্ঠ লেখককে অনুসরণ করিতে পারি। ইঁহারা ছায়ার ন্যায় ত্বরিতগতিতে আমাদের দৃষ্টি হইতে অপসৃত হইলেও সেই ক্ষণিক সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাইয়া আমরা

খেতুরীর উৎসব।

তাঁহাদের উত্তরীয়বস্ত্রে ১৫০৪ শক অঙ্কিত করিয়া দিয়াছি। এই উৎসব উপলক্ষে অনেক বৈষ্ণবলেখকের সময় নিরূপিত হইয়াছে।

রচনার নমুনা।

নরহরির ইতিহাসের রচনা-প্রণালী অতি সরল,—গদ্যের ন্যায়; গদ্য লেখার প্রথা প্রচলিত থাকিলে ইনি বোধ হয় পদ্যচ্ছন্দে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেন না। রচনার নমুনা এইরূপ,—

"আচার্য্য অধৈর্য্য বাহ্যে ধৈর্য্য প্রকাশিয়া। নরোত্তমে কৈলা স্থির যত্নে প্রবোধিয়া॥ প্রসাদী পাকান্ন সব লৈয়া থরে থরে। অতি শীঘ্র গেলেন সবার বাসাঘরে॥ সকল মহান্ত প্রতি কহে বারে বার। কালি এ খেতুরি গ্রাম হবে অন্ধকার॥ পদ্মাবতী পার হৈয়া পদ্মাবতী তীরে। করিবেন স্নান সবে প্রসন্ন অন্তরে॥ তথা ভুঞ্জিবেন এই প্রসাদী পাকান্ন। বুধরি গ্রামেতে গিয়া হইবে মধ্যাহ্ন। আগে যাইবেন গোবিন্দাদি কথোজন। সেই সঙ্গে পাককর্ত্তা করিবে গমন॥ রামচন্দ্রাদি এসঙ্গে যাইবেন তথা। বুধরি হইতে তাঁরা আসিবেন এথা॥"—নরোত্তমবিলাস।

গৌরচরিত চিন্তামণি।

এই আড়ম্বরবিহীন লেখক যখন পদ রচনা করিয়াছেন, তখন তাঁহার লেখনী মুখ হইতে এক অতি মুগ্ধকর পুষ্পবাস নিঃসৃত হইয়াছে; তাঁহার পদ সমূহ সর্ব্বত্র সুপরিচিত। "গৌরচরিতচিন্তামণি" খানি নানামধুরালাপসম্বলিত রাগিণীতে পরিব্যক্ত একটি গানের ন্যায়; নিম্নে একটি স্থল উদ্ধৃত হইল;—

"নিশি গত শশিদরপ দূরে। অতিশয় দুঃখে চকোর ফিরে॥ পতিবিড়ম্বনলজ্জিত মনে। লুকাইল তারা গগনবনে॥ নদীয়ার লোক জাগিল ত্বরা। তেঁই বলি শেজ তেজহ গোরা॥ মোরে না প্রত্যয় করহ যদি। তবে পুছহ নরহরির প্রতি॥ * * * ময়ুর ময়ূরী পৃথক আছে॥ কেহ না আইসে কাহারো কাছে। বিরস হইয়া রৈয়াছে গাছে॥ তুমি না দেখিলে না নাচে তারা। ভ্রমর ভ্রমরী রুচির কুঞ্জে। ভুলি না বৈসয়ে কুসুম পুঞ্জে॥ কারে শুনাইব বলি না গুঞ্জে। ফিরয়ে বিপিনে ব্যাকুলপারা॥"—২য় কিরণ।

প্রেমবিলাস এবং অপরাপর পুস্তক।

প্রেমবিলাসরচক নিত্যানন্দদাসের কথা ৩০২।৩০৩ পৃষ্ঠায় একবার উল্লেখ করিয়াছি; ইহার অপর নাম বলরাম-দাস,—ইনি শ্রীখণ্ডনিবাসী আত্মারামদাসের পুত্র, বৈদ্যবংশসম্ভূত ও ইহার মাতার নাম সৌদামিনী। ইনি পিতামাতার একমাত্র সন্তান।

প্রেমবিলাস ২০ অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের কথাই মূলতঃ বর্ণিত হইয়াছে। প্রায় ৩৫০ বৎসর হয়, নিত্যানন্দদাস প্রেমবিলাস রচনা করেন। ভক্তিরত্নাকর হইতে ইহার রচনা জটিল। একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি :—

প্রভুদত্ত শেষ নিদর্শন।

"দুই মহাশয়ের গুণ যে লিখিত আছে। পশ্চাতে লিখিব তাহা থাকি তার পাছে॥ এবে লিখি যে হইল বিরহ বেদনা। দেখিয়া কি প্রাণ ধরে দীন হীন জনা॥ সনাতনের দশা দেখি রূপে চমৎকার। তুমি এমন হৈলে মরণ হইবে সবার॥ প্রভুর দ্বিতীয় দেহ তুমি মহাশয়। তোমারে ব্যাকুল দেখি কার বাহ্য হয়॥ নানা যত্ন করি রূপে চেতন করাইল। দারুণ বিরহকম্প দ্বিগুণ বাড়িল॥ সেদিন হইতে সনাতন অস্থির হইল। গৌরাঙ্গবিরহব্যাধি দ্বিগুণ বাড়িল॥ চিন্তিত হইলা পাছে দেখি সনাতন। শূন্য পাছে গোবিন্দ করেন বৃন্দাবন॥ সম্বিত পাইয়া রূপ আসন লইয়া। ভট্টের নিকটে যান গৌরব করিয়া॥ দুই ভাই দুই দ্রব্য যত্ন করি বুকে। ভট্টের বাসাকে গেলা পাইয়া বড় সুখে। দিলেন আসন ডোর দণ্ডবৎ করি। পত্র পড়ি শুনাইলা পাত্রের মাধুরী॥ পত্রের গৌরব শুনি মূর্চ্ছিত হইলা। আসন বুকে করি ভট্ট কাঁদিতে লাগিলা॥ যত্ন করি শ্রীরূপ করেন কিছু স্থির। সনাতন দেখি ভট্ট হইলেন ধীর॥ সনাতন কহে ভট্ট শুন গোসাঞি। কথার কালে বসিবা আসনে দোষ নাঞি॥ প্রভুর আসনে আমি কেমনে বসিব। আজ্ঞা করিয়াছেন প্রভু কেমনে উপেক্ষিব॥ প্রভু আজ্ঞা বলবতী শ্রীরূপ কহিলা। গলে ডোর করি ভট্ট কাঁদিতে লাগিলা।"

৩০৪ পৃষ্ঠায় যদুনন্দনদাসের 'কর্ণানন্দ' নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি,—ইহা আকারে চৈতন্যচরিতামৃতের অর্দ্ধেক হইবে। কর্ণানন্দ

৬ অধ্যায়ে বিভক্ত; এই পুস্তকে শ্রীনিবাসআচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যবর্গের কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার রচনা সম্বন্ধে গ্রন্থকার নিজে এই লিখিয়াছেন;—

"বুধুইপাড়াতে রহি শ্রীমতি * নিকটে। সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে॥ পঞ্চদশশত আর বৎসর উনত্রিশে। † বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে॥ নিজপ্রভুপাদ-পদ্ম মস্তকে ধরিয়া। সমাপ্ত করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া॥"

প্রেমদাসের (অপর নাম পুরুষোত্তম) "বংশী-শিক্ষার" নামও ৩০৪ পৃষ্ঠায় আমরা একবার উল্লেখ করিয়া গিয়াছি। "বংশীশিক্ষা"—আকারে যদুনন্দনদাসের 'কর্ণানন্দের' তুল্যই হইবে। মহাপ্রভুর গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস এবং গৌরাঙ্গপার্ষদ বংশীদাসঠাকুরের জন্মাদি ও তাঁহার শিক্ষাপ্রসঙ্গবর্ণনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। প্রেমদাস ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার উপাধি "সিদ্ধান্তবাগীশ" ছিল। ইনি "বংশী-শিক্ষা" ও স্বকৃত "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাটকের অনুবাদ সম্বন্ধে এই পরিচয় দিয়াছেন,—

"শকাদিত্য ষোলশত চৌত্রিশ শকেতে। ‡ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক সুখেতে॥ লৌকিক ভাষাতে মুঞি করিনু লিখনে। ষোলশত অষ্টত্রিংশ শকের গণনে॥ § শ্রীশ্রীবংশী-শিক্ষা গ্রন্থ করিনু বর্ণন। নিজ পরিচয় তবে শুন ভক্তগণ॥"—বংশীশিক্ষা।

অদ্বৈত প্রকাশ।

ঈশাননাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ আমরা ঐতিহাসিক ভাবে বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করিতে পারি না, ইহাতে ঈশাননাগর নিতান্ত অতি-প্রাকৃত কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া স্বর্গ ও পৃথিবীকে একটি কল্পনার সূত্রে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন। অদ্বৈতপ্রভু স্বয়ং মহাদেবভাবে ক্ষীরোদসমুদ্রতীরে

---

* শ্রীনিবাসচার্য্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী।
† ১৫২৯ শক অর্থাৎ ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে।
‡ ১৬৩৪ শক অর্থাৎ ১৭১২ খৃষ্টাব্দ।
§ ১৬৩৮ শক অর্থাৎ ১৭১৬ খৃষ্টাব্দ।

তপস্যায় মগ্ন, শ্রীহরি গৌরাবতারের কথা অঙ্গীকার করিয়া শূলপাণিকে অদ্বৈতরূপে পূর্ব্বেই মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইতে বলিতেছেন, মুখবন্ধটি এইরূপ। তৎপর গৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করিয়াই এই অদ্বৈতরূপী মহাদেবটিকে চিনিতে পারিলেন। সেই সদ্যোজাত শিশু স্বর্গ-মর্ত্ত্যের নানা কথার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, ঈশাননাগর সেই কথাবার্ত্তার সমস্তই লিপিবদ্ধ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

এই সমস্ত অমানুষীতত্ত্ব প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যের সর্ব্বত্রই সুলভ; কিন্তু পুঁথির অধিকাংশ পৃষ্ঠাই যদি তদ্দ্বারা পূর্ণ করা যায়, তবে পাঠ করিবার ধৈর্য্য রাখা কঠিন হয়। ঈশাননাগর নিজে যাহা দেখিয়াছিলেন সেই অংশের যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতেন, তবে গ্রন্থখানি উপাদেয় হইতে পারিত,—তাঁহার বর্ণনাশক্তি বেশ ছিল,—লেখা সহজ, সুন্দর ও তন্মধ্যে কবিত্বের একেবারে স্ফুরণ না ছিল এমন নহে। তিনি শ্রুত কথার উপর এবম্বিধ প্রাণঢালা আস্থা স্থাপন না করিলে ভাল হইত,—যেটুকু নিজে দেখিয়াছেন, সেই প্রসঙ্গগুলি বেশ সরস হইয়াছে। গ্রন্থশেষে নিজের কথা, বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর অবস্থা, শান্তিপুরে গৌরাঙ্গমিলন, এ সকল আখ্যান উপাদেয় হইয়াছে, স্থানে স্থানে করুণ রসের প্রবাহ উচ্ছলিত হইয়াছে। এখানে এ কথাও বলা আবশ্যক,—প্রাচীন পুঁথি কোন খানিই একেবারে মূল্যহীন নহে,—অদ্বৈতপ্রকাশেও কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া গিয়াছে। মহাপ্রভুর জন্মের ঠিক ৫২ বৎসর পূর্ব্বে অদ্বৈত আবির্ভূত হন, —("অহে বিভু আজি দ্বিপঞ্চাশ বর্ষ হৈল। তুয়া লাগি ধরাধামে এ দাস আইল॥") তাঁহার জীবন অতি দীর্ঘ হইয়াছিল, ১২৫ বৎসর এই ঘোর কলিযুগে কাল্পনিক আয়ু বলিয়া বোধ হয়,—কিন্তু আমরা ঈশাননাগরকে এ বিষয়ে অবিশ্বাস করি নাই।—"সওয়া শত বর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে। অনন্ত অর্ব্বুদ লীলা কৈলা যথাক্রমে॥"—অবশ্য "অনন্ত অর্ব্বুদ লীলা" সম্বন্ধে আপত্তি হইতে পারে,—কিন্তু প্রভুবর্গের খাওয়া, দাওয়া, শোওয়া, এ সমস্তই যখন

ভক্তগণ লীলা সংজ্ঞায় অভিহিত করেন, তখন এ আপত্তির কোন কারণ নাই। অদ্বৈত ১৪৩৩ খৃঃ অঃ জন্মগ্রহণ করেন ও ১৫৫৭ খৃঃ অব্দে তিরোহিত হন, এই পুস্তক হইতে ইহা জানা গেল। আরও জানা যাই-তেছে, অদ্বৈতপ্রভুর পূর্ব্বপুরুষ নারসিংহ নাড়িয়াল গৌড়ের হিন্দু সম্রাট রাজা গণেশের মন্ত্রী ছিলেন।—"সেই নারসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাতি। সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়াখ্য আরু ওঝার সন্ততি॥ যাহার মন্ত্রণা বলে শ্রীগণেশ রাজা। গৌড়ীয় বাদসাহ মারি গৌড়ে হৈল রাজা॥" এই নাড়িয়াল বংশোদ্ভূত বলিয়াই মহাপ্রভু অদ্বৈতকে "নাড়া বুড়া" কিম্বা শুধু "নাড়া" বলিয়া আহ্বান করিতেন, এ সকল কথা আমরা পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি! ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে, অদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গে কবি বিদ্যাপতির দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এ কথা অদ্বৈতপ্রকাশ ভিন্ন অন্য কোন পুস্তকে পাওয়া যায় নাই। অদ্বৈত প্রভুর নাম ছিল কমলাক্ষ-আচার্য্য, ও তাঁহার উপাধি ছিল "বেদ-পঞ্চানন"। মহাপ্রভু অদ্বৈতের নিকট কতক দিন পড়িয়াছিলেন ও 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে চৈতন্যদেবের পূর্ণনাম এইরূপ পাওয়া গেল,—"শ্রীবিশ্বম্ভর মিশ্র বিদ্যাসাগর"—এই উপাধিবিশিষ্ট নামটি কৌতুকাবহ। অদ্বৈতপ্রকাশে চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর যে অবস্থা বর্ণিত হই-য়াছে, তাহাও একটি নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক চিত্রপট। সেই চিত্র শোকে সকরুণ, ব্রত উদ্‌যাপনে পবিত্র ও কঠোর পাতিব্রত্যে মহিমান্বিত,—এই চিত্রের বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্ত্তি সর্ব্বতোভাবে মহাপ্রভুর সহধর্ম্মিণীর উপযুক্ত,—ঈশাননাগর চাক্ষুষ যাহা দেখিয়াছেন, তাহা লিখিয়া এস্থলে করুণার প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

এস্থলে ঈশাননাগরের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ঈশান ব্রাহ্মণ ছিলেন, ১৪৯২ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন,—তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার বিধবা মাতা অদ্বৈতপ্রভুর পরিবারে আশ্রয়

গ্রহণ করেন, তদবধি ঈশান সেইখানে। ঈশান ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে অদ্বৈতরমণী সীতাদেবীর আদেশে বিবাহ করেন। ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি বিবাহ করেন নাই, পবিত্র কৌমারব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার জীবনের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হইবে। শান্তিপুরে এক দিন তিনি মহাপ্রভুর পা ধোয়াইয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে ব্রাহ্মণ জানিয়া বারণ করেন। তখন ঈশান উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন,—ঈশান ধর্ম্ম-জগতে সত্যই একটি বলবান্ পুরুষ ছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন, ঈশান পদ্মাতীরস্থ তেওথা গ্রামে বিবাহ করেন। 'অদ্বৈতপ্রকাশ' তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের রচনা, ১৫৬০ খৃঃ অব্দে এই পুস্তক সম্পূর্ণ হয়। তিনি বৃদ্ধকালে শ্রীহট্টস্থ লাউড় যাইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে আদিষ্ট হন,—লাউড় রাজ্য নষ্ট হইবার পরে তাঁহার বংশধরগণ গোয়া-লন্দের নিকট ঝাঁকপাল গ্রামে বসতি স্থাপন করেন।

হরিচরণদাসের অদ্বৈত-মঙ্গল।

অদ্বৈতপ্রভুর পুত্র অচ্যুত-শিষ্য হরিচরণদাস একখানি 'অদ্বৈতজীবনী' প্রণয়ন করেন। শ্রীহট্টস্থ নবগ্রামবাসী বিজয়-পুরী গ্রামসম্পর্কে অদ্বৈতপ্রভুর মাতা নাভা-দেবীর মাতুল ছিলেন। হরিচরণদাস অনেক কথাই তাঁহার নিকট শুনিয়া এই জীবনী প্রণয়ন করিয়াছেন। এই পুস্তক ২৩ "সংখ্যায়" (অধ্যায়ে) বিভক্ত। ইহাতে জানা যায়, অদ্বৈত-প্রভুর ৬ জন জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন; তাঁহাদের নাম,—১। লক্ষ্মীকান্ত, ২। শ্রীকান্ত, ৩। শ্রীহরিহরানন্দ, ৪। সদাশিব, ৫। কুশল, ৬। কীর্ত্তিচন্দ্র। আরও জানা যায়, অদ্বৈতপ্রভু মাঘমাসের সপ্তমীতিথিতে জন্মগ্রহণ করেন, উহা অবশ্য ১৪৩৩ খৃঃ অব্দে হইবে। শ্রীযুক্ত রাসকচন্দ্র বসু মহাশয় এই পুস্তক সম্বন্ধে ১৩০৩ সালের মাঘ মাসের পরিষৎ-পত্রিকায় একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

নরহরিদাস শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ নরহরিসরকার নহেন, বন্দনাসূচক একটি পদে লিখিয়াছেন, "জয় জয় নরহরি শ্রীখণ্ডনিবাসী। যার প্রাণসর্ব্বস্ব শ্রীগৌর গুণরাশি।" নিজের পরিচয়-স্থলে শুধু "অতি অকিঞ্চন", "মহামূর্খ" প্রভৃতি সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবোচিত বিনয় দেখাইয়াছেন। বন্দনার পদগুলির মধ্যে একটি কৃষ্ণদাস কবিরাজের উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরবর্ত্তী এইমাত্র জানা যাইতেছে।

নরহরিদাসের অদ্বৈত-বিলাস।

এই পুস্তকে অদ্বৈত সম্বন্ধে বিশেষ কোন তত্ত্ব খুঁজিয়া পাই নাই, অদ্বৈতের জন্ম, তাঁহার শৈশবের হামাগুড়ি ও কথা বলিতে শিক্ষা সম্বন্ধে দীর্ঘ বর্ণনা আছে, অর্থাৎ যে সকল ঘটনা সকল শিশু সম্বন্ধেই বর্ণিত হইতে পারিত, অদ্বৈতসম্বন্ধেও সেই প্রসঙ্গগুলি আড়ম্বরের সহিত লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এতদ্বর্ণিত প্রসঙ্গগুলি দ্বারা প্রাচীন ইতিহাসের কোন নূতন পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। আমরা যে পুস্তকখানি পাইয়াছি, তাহা খণ্ডিত,—মাত্র ১৫ পত্র। রচনা বেশ প্রাঞ্জল ও মধুর; একটুকু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি:—"নদীয়া বেষ্টিত গঙ্গা বহে সুনির্ম্মল। অপূর্ব্ব তরঙ্গ দুগ্ধ জিনি শ্বেত জল॥ স্রোতজল পরিপূর্ণ শোভার অবধি। বুঝি কুন্দমালা নবদ্বীপে দিল বিধি॥ ঝলমল করে গঙ্গাতট মনোরম। শত শত ঘাটশ্রেণী অতি অনুপম॥ নানা জাতি বৃক্ষ শোভা করে সারি সারি। বিবিধ প্রকার লতা সর্ব্ব চিত্তহারী। স্থানে স্থানে নানা জাতি পুষ্পের কানন। তাহে মহামত্ত হৈয়া ভ্রমে ভৃঙ্গগণ॥ নানা পক্ষী শব্দ করে অতি মনোহর। মৃগ আদি পশু তথা ফিরে নিরন্তর॥"—পরিষদের পুঁথি, ৫।৬ পত্র।

অদ্বৈতের দুই স্ত্রী—শ্রী ও সীতা; সীতা ঠাকুরাণীর প্রভাব সেই সময়ের বৈষ্ণবসমাজের উপর বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়, অনেক সাধু বৈষ্ণব সীতাঠাকুরাণীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ধন্য হন। লোকনাথ দাস 'সীতা-চরিত্রে' এই সুচরিত্রা রমণীর জীবন বর্ণনা করিয়াছেন। 'সীতা-চরিত্র' বিশেষ বড় পুস্তক নহে, ইহা দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ।

লোকনাথদাসের সীতা চরিত্র।

রচনা সহজ ও সুন্দর, কিন্তু অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ, ঐতিহাসিকের নিকট এই পুস্তক বিশেষ সমাদৃত হইবে কি না সন্দেহ। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় অনুমান করেন, 'সীতাচরিত্র'-লেখক লোকনাথদাস আর প্রসিদ্ধ ভক্ত ব্রজবাসী লোকনাথ অভিন্ন ব্যক্তি। বৈষ্ণব জগতের গুরু স্থানে সমাসীন, মহাপ্রভুতে তদ্গতপ্রাণ, যশোহর তালগড়ি গ্রামবাসী পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর একমাত্র পুত্র লোকনাথ গোস্বামী সম্পূর্ণ বিষয়নিস্পৃহ বৈষ্ণব, উদাসীন ও ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজকে 'চৈতন্য চরিতামৃতে' তাঁহার নাম উল্লেখ করিতে নিষেধ করেন,—কোনও রূপ খ্যাতি লাভে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, তিনি যে 'সীতাচরিত' লিখিয়াছেন, তাহার কোন উল্লেখ বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। তাঁহার ন্যায় বৈষ্ণবাগ্রগণ্যের রচিত কোন পুস্তক থাকিলে বৈষ্ণবসমাজে তাহার বহুল প্রচার থাকিত; অন্ততঃ পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগ্রন্থসমূহের অনেকখানিতে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হইত। সীতা চরিত্রে চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লেখ পাওয়া যায়। শেষোক্ত গ্রন্থ রচিত হওয়ার পর লোকনাথ গোস্বামী 'সীতা-চরিত্র' লেখা আরম্ভ করিলে, তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম অন্যূন শত বৎসর হইবার কথা। * নানা কারণে ভক্তপ্রবর লোকনাথ গোস্বামী 'সীতাচরিত্র' লিখিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা হয় না। 'সীতাচরিত্রে' দুএকটি নূতন কথা পাওয়া গিয়াছে; মহাপ্রভুর তিরোধানের পরেও শচীদেবী জীবিত ছিলেন, নন্দিনী ও জঙ্গলী নামক সীতা ঠাকুরাণীর দুই শিষ্য ছিলেন, তাঁহাদের অনেক আশ্চর্য্য শক্তির কথা, জানুরায়ের প্রসঙ্গ প্রভৃতি বিষয় এই পুস্তকে প্রাসঙ্গিক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

---

* ১৪৩২ শকে বৃন্দাবনে তিনি আগমন করেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে তথায় কঠোর ব্রত অবলম্বনে নিযুক্ত করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম কখনই ২৫ বৎসরের ন্যূন হওয়া সম্ভাবিত নহে,—১৫০৩ শকে চৈতন্যচরিতামৃত রচিত হয়, তাহার পরে সীতা-চরিত রচিত হইলে প্রায় একশত বৎসরের হিসাব পাওয়া যাইতেছে।

রসিক-মঙ্গল।

উঁড়িয্যাবাসী গোপীবল্লভদাস বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় শকাব্দ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে "রসিক-মঙ্গল" নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। প্রসিদ্ধ শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্র রসিক মুরারির চরিত্রই বর্ণনার বিষয়। গ্রন্থকার রসিক মুরারির শিষ্য ছিলেন। তিনি নিজ পিতামাতা প্রভৃতির কথা গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তাহা এই ;—

"চরণে লোটায়া বন্দো রসময় পিতা। তবে ত বন্দিনু মাতাজিউ পতিব্রতা। পতিপত্নী দোঁহে আর পুত্র পাঁচ জন। রসিকচরণে সবে পশিঁয়ো শরণ॥ খুল্লতাত বন্দিনু বংশী-মথুরা দাস। আদ্য শ্যামানন্দীতে যাহার প্রকাশ॥ গোপকুলে মো সবার হইল উৎপত্তি। শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব কুল শীল জাতি॥ গোপীজনবল্লভ হরিচরণ দাস। মাধব রসিকানন্দ কিশোরের দাস॥ জাতি ধন প্রাণ যার অচ্যুতনন্দন। শ্রীরসময় নন্দন ভাই পঞ্চজন॥ বল্লভের সুত রাধাবল্লভ বিখ্যাতা। রসিকেন্দ্র চূড়ামণি যার পিতা মাতা॥ সগোষ্ঠী সহিত তারা রসিক কিঙ্করে। রসিক সঙ্গেতে তারা সতত বিহরে॥"

গ্রন্থখানি ৪ ভাগে ১৬ লহরীতে পূর্ণ। আকারে লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গলের' তুল্য হইবে।

রসিকানন্দের জন্ম (১৫১২ শক) ১৫৯০ খৃঃ অব্দে। গ্রন্থকার স্বীয় গুরু রসিকের সমকালিক। গ্রন্থরচনার তারিখ পাওয়া যায় নাই। 'রসিক মঙ্গল' কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস্ ডিপজিটারী হইতে কতক দিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে।

মনঃসন্তোষিণী এবং অপরাপর পুস্তক।

প্রায় ২০০ শত বৎসর হইল, মহাপ্রভুর পিতামহ উপেন্দ্রমিশ্র বংশোদ্ভব জগজীবনমিশ্র "মনঃসন্তোষিণী" নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; ইহাতে মহাপ্রভুর শ্রীহট্টভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। জগজীবনমিশ্রের বাড়ী শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণগ্রামে, অর্থাৎ যেখানে উপেন্দ্রমিশ্রের বাড়ী ছিল। জগজীবনমিশ্র মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথমিশ্রের

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরমানন্দমিশ্র হইতে ৮ম পর্য্যায়ে উৎপন্ন। এই সকল পুস্তক ছাড়া 'মহাপ্রসাদ বৈভব', 'চৈতন্যগণোদ্দেশ', 'বৈষ্ণবাচারদর্পণ' প্রভৃতি পুস্তকও চরিত-শাখার অন্তর্গত। আরও রাশি রাশি পুস্তক রহিয়া গেল, তাহাদিগের নামোল্লেখ করিতে আমাদের শক্তি ও সময় নাই। এই নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিলে ধৈর্য্যহারা ও পথহারা হইতে হয়। যদিও এই পুস্তক-সমূহের অনেকগুলিকেই কাল প্রতিবৎসর কীট ও অগ্নির মুখে উপহার দিতেছেন এবং তাহাদের একঘেয়ে মৃদঙ্গ বাদ্যের ন্যায় বর্ণনা শুনিতে শুনিতে বিরক্ত হইয়া আমরাও কালের ধ্বংস ক্রীড়ায় কিছুমাত্র আপত্তি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি বোধ করি না—তথাপি বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে মহতী শক্তিতে এই সুপ্রসার সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, যে অধ্যবসায়-সিন্ধু হইতে অবিরত এইরূপ সাহিত্যিক শক্তির প্রবল তরঙ্গ ও বুদ্বুদ উত্থিত হইয়াছে, সামাজিক জীবনে সেই বিরাট আন্দোলন ও কর্ম্মঠতার ব্যাপার দেখিলে মনে হয় না বঙ্গদেশীয়গণ শবের ন্যায় নিশ্চেষ্ট অবস্থায় পড়িয়া ছিল, বিদেশী শাসনকর্ত্তৃগণের ভেরীধ্বনিতে এইমাত্র তাহারা হাই তুলিয়া জাগিয়া বসিয়াছে!

৭ম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

অনুবাদ-গ্রন্থাবলী।

৭ম অধ্যায়ে বৈষ্ণব-সাহিত্যের ব্যাখ্যা ও অনুবাদসংক্রান্ত পুস্তকের আলোচনা করা হয় নাই,—স্থলে স্থলে উল্লেখ মাত্র করিয়াছি। অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিষয়ক পুস্তকও বিস্তর; স্বতন্ত্র অধ্যায়ভাগ করিয়া ব্যাখ্যাশাখা ও অনুবাদ-শাখার আলোচনা করিতে গেলে গ্রন্থের পরিসর বড় বাড়িয়া যাইবে; তাই অধ্যায়ভাগে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলিয়া এস্থলে সংক্ষেপে তাহাদিগের উল্লেখ করিয়া যাইতেছি।

আগরদাসের শিষ্য নাভাজী রচিত হিন্দী "ভক্তমাল" শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য কৃষ্ণদাস বাবাজী অনুবাদ করেন। ভক্তমালে বহুসংখ্যক বৈষ্ণব মহা-জনগণের জীবন বর্ণিত হইয়াছে। আদত হিন্দী ভক্তমালগ্রন্থ নাভাজীর শিষ্য প্রিয়দাস স্বকৃত টীকা দ্বারা বিস্তারিত করিয়াছেন; কৃষ্ণদাস তন্মধ্যে আরও বহুসংখ্যক বৈষ্ণবের জীবনী প্রদান করিয়া এবং প্রিয়দাসের টীকার বিস্তার করিয়া গ্রন্থকলেবর দ্বিগুণ পরিমাণে বাড়াইয়াছেন; তিনি নিজে ভাল হিন্দী জানিতেন না, সুতরাং এই গ্রন্থ রচনা করিতে তাঁহার বিশেষ শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল; তিনি নিজেই তাহা লিখিয়াছেন;—

ভক্তমাল।

"গ্রন্থ হয় ব্রজভাষা সব বুঝি নহি। যেহেতু গৌড়ীয় বাক্যে শ্রেণীমত কহি॥ রচনা পূর্ব্বক কহিবারে নাহি জানি। যথাশক্তি করযোড়ে মিলাইয়া ভণি॥ উপহাস কেহ নাহি করিহ ইহাতে। বৈষ্ণবের গুণগান করি যে তেমতে॥ অতএব টীকার অর্থ বুদ্ধি সাধ্যমতে। রচিয়া কহিবা মাত্র মন বুঝাইতে॥ যথা যথা প্রিয়দাস সংক্ষেপেতে অতি। বর্ণিলা না প্রবেশয় সাধারণ মতি॥ সেই সেই কোন কোন স্থানে কিছু কিছু। বিস্তার করিয়া কহি তার পিছু পিছু॥"—ভক্তমালগ্রন্থ।

ভক্তমালের বঙ্গীয় অনুবাদের আকার চৈতন্যভাগবতের তুল্য।

পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে গুণরাজ খাঁ সঙ্কলিত ভাগবতের ১০ম ও ১১শ স্কন্ধের অনুবাদ বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরীঠাকুর ভাগবতকে আশ্রয় করিয়া 'রত্নাবলী' নামক একখানি সংস্কৃতকাব্য প্রণয়ন করেন। অদ্বৈত-প্রভুর সমকালিক "লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস" এই রত্নাবলীর একখানি বাঙ্গালা অনুবাদ রচনা করেন। আমরা অনুবাদপুস্তকের মুখবন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি;—

রত্নাবলীর অনুবাদ।

"শ্রীকৃষ্ণপুরী ঠাকুর ভকত সন্ন্যাসী। জীব নিস্তারিলা কৃষ্ণ ভকতি প্রকাশি॥ বিচারি বিচারি ভাগবত পয়োনিধি। বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী প্রকাশিলা নিধি॥ প্রতি অধ্যায় বিচারিয়া

দ্বাদশ স্কন্ধ॥ সার শ্লোক উদ্ধারিয়া করিলা প্রবন্ধ। নানান প্রকার শ্লোক ব্যাখ্যা করি সাধু। তথাপি জীবের তরে সিঞ্চিলেক মধু॥ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক ভাগবত। তা হইতে উদ্ধার করিলা শ্লোক চারিশত॥ বিষ্ণুপুরী ঠাকুর রচিল রত্নাবলী। কৃষ্ণদাস গাইলেক অদ্ভুত পাঁচালী।" *

অনুবাদপুস্তকে কবিত্ব প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিলে মূলের ভাব বজায় থাকে না, আবার একবারে কবিত্ববিহীন হইলেও অনুবাদ কিংশুকের ন্যায় পরিত্যাজ্য হয়, সুতরাং ভাল একখানি অনুবাদ রচনা করা বড় বিষম ব্যাপার; কৃষ্ণদাসের হাতে অনুবাদটি মন্দ হয় নাই, সেকেলে ভাষায় যতদূর কুলাইয়াছিল, কৃষ্ণদাস ততদূর মার্জ্জিত রচনার আদর্শ দেখাইয়াছেন, স্বীকার করিতে হইবে; যথা:—

"ভ্রমর রময়ে যেন কমলের মাঝে। মোর মন তেন রমৌক তোমা পদাম্বুজে॥ যেই পুষ্প থাকয়ে কণ্টক অভ্যন্তরে। তাহাতে প্রবেশিয়া কি ভ্রমরা নাহি চরে॥ সহস্র বিপদ মোর থাকুক সর্ব্বক্ষণ। তোমা পদ কমল চিন্তয় যদি মন॥ সুবর্ণ মুকুট মাথে সেহ যেন ভার। যেই শিরে কৃষ্ণপদ না কৈল নমস্কার॥ জগন্নাথ মূর্ত্তি যেই না কৈল নিরীক্ষণ। ময়ূরের পুচ্ছ তার দুইটি নয়ন॥"

এখন "লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস" কে, তৎসম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি। শ্রীহট্টে লাউড় নামে একটি স্থান আছে। ৪৫০ বৎসরের অধিক হইল সেখানে দিব্যসিংহ নামক এক জন হিন্দু রাজা ছিলেন। অদ্বৈতপ্রভুর পিতা কুবের পণ্ডিত ইঁহারই মন্ত্রী; পরে কুবের গঙ্গাবাস হেতু সপরিবারে শান্তি-পুরে আগমন করেন, ইহারও পরে যখন অদ্বৈত ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, দিব্যসিংহ তখন অতি বৃদ্ধ, তিনি পুত্রের উপর রাজ্যভার দিয়া শান্তিপুরে বাস করেন। তাঁহারই বৈষ্ণবাবস্থার নাম কৃষ্ণদাস। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, কৃষ্ণদাস অদ্বৈতের 'বাল্যলীলা' বর্ণনা করেন, অদ্বৈত-

* এই গ্রন্থের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি ত্রিপুরেশ্বরের সেক্রেটরী বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমণ ঘোষ বি, এ মহাশয়ের নিকট আছে, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন।

শিষ্য ঈশাননাগর স্বীয় "অদ্বৈতপ্রকাশে" উক্ত পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন যথা,—"লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলা সূত্র। যে গ্রন্থ পড়িলে হয় ভুবন পবিত্র॥"

দ্বিজমাধবের 'কৃষ্ণমঙ্গল'।

মহাপ্রভুর শ্যালক মাধব মিশ্র কর্ত্তৃক একখানি ভাগবতানুবাদ প্রণীত হয়। ইহা ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের একটি সরল ও সুন্দর বাঙ্গালানুবাদ। এই পুস্তকখানির নাম 'কৃষ্ণমঙ্গল' ও ইহা মহাপ্রভুর পদে উৎসর্গ করা হয়; মাধব মহাপ্রভুর টোলের ছাত্র ছিলেন। 'প্রেমবিলাসে' ইঁহার পরিচয় এই ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে;—

"দুর্গাদাস মিশ্র সর্ব্ব গুণের আকর। বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস নদীয়া নগর॥ তাঁহার পত্নীর হয় শ্রীবিজয়া নাম। প্রসবিলা দুই পুত্র অতি গুণধাম॥ জ্যেষ্ঠ সনাতন হয় কনিষ্ঠ কালিদাস। পরম পণ্ডিত সর্ব্ব গুণের আবাস॥ সনাতন পত্নীর নাম হয় মহামায়া। এক কন্যা প্রসবিলা নাম বিষ্ণুপ্রিয়া॥ আর এক পুত্র হৈল অতি গুণধাম। শ্রীযাদব নাম তার হয় আখ্যান॥ কালিদাস মিশ্র পত্নী বিধুমুখী নাম। প্রসবিলা পুত্ররত্ন সর্ব্বগুণধাম॥ * * * * * শ্রীমৎভাগবতের শ্রীদশম স্কন্ধ। গীতবর্ণনাতে তিঁহো করি নানা ছন্দ॥ রাখিল গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। শ্রীচৈতন্যপদে তাহা সমর্পণ কৈল॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তারে কৈল অনুগ্রহ। সর্ব্ব ভক্তগণ তারে করিলেক স্নেহ॥"--১৯ বিলাস।

অন্যত্র প্রেমবিলাসে—

"শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীদশম স্কন্ধ।
রচিলা মাধব দ্বিজ করি নানা ছন্দ॥"

মাধব মিশ্রের "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" ব্যতীত "প্রেমরত্নাকর" নামক আর একখানি (সংস্কৃত) কাব্য আমরা দেখিয়াছি। পরবর্ত্তী সময়ে ভাগবতের আরও কয়েক খানি অনুবাদ সঙ্কলিত হইয়াছিল, তদ্বিবরণ আমরা পরে লিপিবদ্ধ করিব।

অপর কয়েকখানি অনুবাদ ও ব্যাখ্যাপুস্তক।

যদুনন্দন দাস কৃত "গোবিন্দলীলামৃতের" বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বীয় 'গোবিন্দলীলামৃত'খানি পরিণত পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে সাজাইয়াছেন—যদুনন্দন দাসের অনুবাদটিতে আদত সৌন্দর্য্য বেশ ফুটিয়াছে। এই পুস্তকে শ্রীমতী রাধা ও

তাঁহা সখীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অনুবাদপুস্তক আকারে চৈতন্যমঙ্গলের তুল্য হইবে। ইহা ছাড়া যদুনন্দন দাস রূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' ও বিল্বমঙ্গলঠাকুরের 'কৃষ্ণকর্ণামৃতের' অনুবাদ করেন। প্রেমদাসকৃত চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ের অনুবাদ, সনাতন চক্রবর্ত্তীর ভাগবতের অনুবাদ ও রসময় এবং গিরিধরের গীতগোবিন্দের অনুবাদ এইস্থলে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয় সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

ব্যাখ্যা-শাখায় ঠাকুর নরোত্তমদাসের 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা', 'সাধনভক্তিচন্দ্রিকা', 'হাটপত্তন', ও 'প্রার্থনা' প্রভৃতি পুস্তকই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। 'বিবর্ত্ত-বিলাসের' গ্রন্থকার নিজকে কৃষ্ণদাসকবিরাজের জনৈক শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, ইহাতে গোপীভাবে ভজন সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত তত্ত্ব লিখিত হইয়াছে—ইহা কোন শঠ বৈষ্ণবের লেখা। বৈষ্ণব সমাজ বিবেচনা করেন, 'কর্ত্তাভজাদলের' কোনও লেখক এই ঘৃণিত কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া বৈষ্ণবসমাজের স্কন্ধে কলঙ্ক চাপাইয়াছেন। কৃষ্ণদাস-বিরচিত 'পাষণ্ডদলন' ও রামচন্দ্র কবিরাজপ্রণীত 'স্মরণদর্পণ' এই শাখার অন্তর্গত। এইস্থলে বৃন্দাবনদাসের 'গোপিকামোহন' কাব্যের উল্লেখ করা আবশ্যক। যে বৃন্দাবন 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করিয়া চিরযশস্বী, তাঁহার লেখনী-প্রসূত 'গোপিকামোহন' কাব্য ক্ষুদ্র হইলেও বৈষ্ণবসমাজের বিশেষ আদরের সামগ্রী হইবে, সন্দেহ নাই। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিকাদের সম্বন্ধ এবং লীলাদি বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বহু প্রাচীন হস্তলিখিত একখানা পুঁথি আমার নিকট আছে।

আমরা আর পুস্তকের নাম করা আবশ্যক মনে করি না; এখনও এক্ষেত্রে প্রত্নতত্ত্বের আলো প্রবেশ করে নাই।

একই ভাবের বিকাশ।

ভবিষ্যতে আরও অনেক বড় গ্রন্থ আবিষ্কৃত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যে সমস্ত পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছি, তদ্দারাই

যথেষ্টরূপে সাহিত্যের রুচি ও গতি নির্ণীত হইবে। সমুদ্রে ভ্রমণকারী যেরূপ প্রত্যহ লবণাম্বুর একইরূপ নীলবৃত্ত প্রত্যক্ষ করিয়া অগ্রসর হন, আমরাও সেইরূপ চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া যাহা কিছু ক্রমে পাইয়াছি, তাহাতে ন্যূনাধিক পরিমাণে একই আদর্শ ও একই ভাবের বিকাশ দেখিয়া অগ্রসর হইয়াছি; নরহরি সরকার এবং তৎপথাবলম্বী লেখকগণ যে গাথা গাহিয়াছেন, তাহার প্রতিধ্বনি ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া কোন কীটভুক্ত পুঁথির শেষ পংক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে কে বলিবে?

হিন্দী-প্রভাব।

এই যুগের সাহিত্য হিন্দীউপকরণে বিশেষরূপ পুষ্ট। এখন যেরূপ ইংরেজীভাষার রাজত্ব, বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবকালে তখন ছিল বৃন্দাবনীভাষার রাজত্ব। বৃন্দাবন এখনও বড় তীর্থ বলিয়া গণ্য, কিন্তু তখন বঙ্গের শিক্ষিতসমাজ ইহাকে ধরাতলে স্বর্গ বলিয়া গণ্য করিতেন,—শ্যামকুণ্ড কি রাধাকুণ্ড দর্শনার্থ তাঁহাদের যে উৎসাহ-পূর্ণ আগ্রহ ছিল, বিলাত যাইতে শিক্ষিতগণের তেমন ঐকান্তিক আগ্রহ নাই। এখন যেরূপ আমরা বাঙ্গালা কথার মধ্যে চারি আনা ইংরেজী মিশাইয়া বিদ্যা দেখাইয়া থাকি, তখন সেইরূপ বৈষ্ণবগণের বাঙ্গালাকথা চারি আনা বৃন্দাবনীর মিশ্রণে সিদ্ধ হইত। কোন কাব্য কি ইতিহাসে যে স্থলে কথাবার্ত্তা বর্ণিত হয়, সেইস্থলে গ্রন্থকর্ত্তা প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। চৈতন্যচরিতামৃত, নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি পুস্তকে দৃষ্ট হইবে, যে স্থলে কথাবার্ত্তার উল্লেখ, সেই খানেই বৃন্দাবনী ভাষার সমধিক ছড়াছড়ি হইয়াছে; যথা—

"প্রয়াগ পর্য্যন্ত দুহেঁ তোমা সঙ্গে যাব। তোমার চরণসঙ্গ পুনঃ কাঁহা পাব॥ ম্লেচ্ছদেশ কেহ কাঁহা করয়ে উৎপাত। ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত কহিতে না জানেন বাত॥"—চৈ, চ, মধ্য ১৮ পঃ।

"হইলুঁ উদ্বিগ্ন বৃন্দাবিপিন দেখিতে। তাঁহা না হইল, গেলুঁ অদ্বৈত-গৃহেতে।

সবে মহাদুঃখী হৈলা আমার সন্ন্যাসে। সভা প্রবোধিলুঁ রহি অদ্বৈতের বাসে। সভা মনো-বৃত্তি জানি নীলাচলে গেঁলু। তাঁহা কথোদিন রহি দক্ষিণ ভ্রমিলুঁ॥"—নরোত্তম বিলাস।

এরূপ বহুসংখ্যক উদাহরণ প্রদর্শিত হইতে পারে; বৃন্দাবনীবুলি বাঙ্গালীর স্বভাববুলি না হইলেও ইহা তাহারা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল।

বঙ্গ-মৈথিলের পূর্ণ বিকাশ।

বিদ্যাপতির মৈথিলপদের অনুকরণে যাঁহারা পদরচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে গোবিন্দদাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সাহিত্যের প্রথম স্ফুরণে কবির শুধু ভাব প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য হয়, প্রথম যুগের কবিগণ ভাষার প্রতি লক্ষ্য করেন না, কোনও রূপে ভাবটি প্রকাশিত হইলেই তাঁহাদের লক্ষ্য সার্থক হয়। ভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ হইলে, পরবর্ত্তী কবিগণ ভাষাটিকে সাজাইতে চেষ্টা করেন; ভাব-যুগের অবসানে সাহিত্যে ভাষা-যুগ প্রবর্ত্তিত হয়; তখন মানুষের দৃষ্টি প্রকৃতির নগ্ন শোভা হইতে অপসারিত হইয়া অলঙ্কার শাস্ত্রের কৃত্রিম পুষ্পপল্লবের পশ্চাতে ধাবিত হয়। গোবিন্দ-দাসের ভাষায় বঙ্গমৈথিলগীতের চরম বিকাশ, এমন কি বিদ্যাপতির ভাব-প্রধানপদও গোবিন্দের পদের ন্যায় মসৃণ নহে। গোবিন্দদাসের (১) "কেবল কান্ত কথা, কহি কাঁদয়ে—কাম কলঙ্কিনী গোরী।" (২) "মুকুলিত মল্লী, মধুর মধু মাধুরী, মালতী মঞ্জুল মাল॥" (৩) "ও নব জলধর অঙ্গ। ইহ থির বিজুরীতরঙ্গ॥ ও বর মরকতঠাম। ইহ কাঞ্চন দশ বাণ॥ ও তনু তরুণতমাল। ইহ হেমযুথিরসাল॥ ও নব পদমুনী সাজ। ইহ মত্ত মধুকররাজ॥ ও মুখ চাঁদ উজোর। ইহ দিঠি লুবধ চকোর॥ অরুণ নিবড়ে পুন চন্দ। গোবিন্দদাস রহ ধন্দ॥" প্রভৃতি পদ পড়িয়া প্রথমেই কর্ণ মুগ্ধ হয়, ভাব ও অর্থের কথা পরে মনে উদয় হয়।

সত্যরাম কবি।

গোবিন্দদাস বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী ব্রজবুলির চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। তৎপর শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলেও বঙ্গ-মৈথিলের প্রতিধ্বনি হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ক্ষীণতর;—

"কাঁহেকো শোচ কর মন পামর। রাম ভজ, তুহুঁ রহনা দিনা। ইষ্ট কুটম্বক ছোড়দে আশ, এসংসার অসার, এক উহ নাম বিনা॥ যো কীট পতঙ্গক, আহার যোগাওত, পালক হ্যায় উহি একজনা। কবি সত্য কহে, মন থির রহো, যিনি দিহাঁ দন্ত, সো দেগা চনা॥"—(সত্যরাম কবি)। একযুগব্যাপী চেষ্টার বিকাশের পর বঙ্গমৈথিলসাহিত্যের উপর পটক্ষেপ হইয়াছে।

হিন্দীপ্রভাবে ইতিহাসের ভাষার দুর্গতি।

কিন্তু পদাবলীতে মৈথিল অনুকরণ যত সুন্দর হইয়াছে, কাব্য কি ইতিহাসে বৃন্দাবনী ভাষা ততদূর মিষ্ট হয় নাই। চৈতন্যভাগবতকার বঙ্গদেশেই জীবন যাপন করিয়াছেন, ও তাঁহার সময়ে বৃন্দাবনী বাঙ্গালার সঙ্গে গাঢ়ভাবে মিশে নাই, তাঁহার রচনায় তাই অনেক পরিমাণে খাঁটি বাঙ্গালার আদর্শ পাওয়া যায়; তাঁহার রচনার মধ্যে মধ্যেও বৃন্দাবনীস্বরের আভাস একেবারে না পাওয়া যায় এমন নহে; যথা :—
"সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবার পাঙ। তবে মুঞি সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াঙ॥"—চৈ, ভা, আদি।

বৈষ্ণব সমাজের কথিত বাঙ্গালা তখন বৃন্দাবনী-ভাষা-মিশ্রিত হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহারা মুখে যাহা বলিতেন, লেখনীতেও তাহাই ব্যবহার করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত এসম্বন্ধে দৃষ্টান্তস্থলীয়। দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে থাকাতে কবিরাজগোস্বামীর বাঙ্গালা বৃন্দাবনী দ্বারা এরূপ আবৃত হইয়াছিল যে, তাঁহার রচনায় খাঁটি দেশী কথা অতি অল্প স্থলেই ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা ছাড়া তাঁহার সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যও সহজ বাঙ্গালা-রচনার অন্তরায় হইয়াছিল। একদিকে 'গুহ্যাতিগুহ্য,' 'বাহ্যাবতরণ' 'মহদনুভব' প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ ও অন্যদিকে 'যবহুঁ' 'কবহুঁ', 'যৈছে', 'তৈছে', 'তিঁহ' প্রভৃতি বৃন্দাবনীবুলি তাঁহার বাক্যে নিবিড়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের দীর্ঘ ও ঘনসন্নিবিষ্ট ব্যূহের মধ্যে বঙ্গভাষার কোমল প্রাণ পীড়িত হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালা, হিন্দী, সংস্কৃত, এমন কি উর্দ্দু

কথা পর্য্যন্ত কৃষ্ণদাস অবাধে ব্যবহার করিয়াছেন, ভাষায় এই সাধারণ-তন্ত্রের হট্টগোলে বাঙ্গালীর স্বর চেনা সুকঠিন। চৈতন্যচরিতামৃতকে 'বাঙ্গালাগ্রন্থ' উপাধি দিতে আমাদিগকে বহুতর সংস্কৃত ও প্রাকৃত শ্লোক, অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ, বৃন্দাবনী—'যৈছে', 'তৈছে' ও উর্দ্দু—'নানা', 'মামু', 'চাচা', পথ হইতে পরিষ্কার করিতে হয় এবং সেইভাবে অতিকষ্টে বাঙ্গালা গ্রন্থটির জাতি রক্ষা করিতে পারা যায়। নিম্নে কবিরাজগোস্বামীর বহুরূপী রচনার কিছু কিছু নমুনা দিতেছি,—

(১) "বিবিধাঙ্গ সাধন ভক্তি বহুত বিস্তার। সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ তার॥ গুরু পদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন। সধর্ম্ম শিক্ষা পৃচ্ছা সাধুমার্গানুগমন॥ কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ ত্যাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস। যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ একাদশ্যুপবাস॥ ধাত্র্যাশ্বথ গোবিন্দ বৈষ্ণব পূজন। সেবানামপরাদধি দূরে পূজন॥"—চৈ, চ, মধ্য, ১২ পঃ।

(২) কহে তাঁহা কৈছে রহে রূপ সনাতন। কৈছে করে বৈরাগ্য কৈছে ভোজন॥ কৈছে অষ্ট প্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ ভজন। তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ॥ অনিকেতন দুঁহে রহে যত বৃক্ষগণ। একৈক বৃক্ষের তলে একৈক রাত্রি শয়ন॥ কঁরোয়া মাত্র কাঁথা ছিঁড়া বর্হিবাস। কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ নাম নর্ত্তন উল্লাস॥—মধ্য, ১৯ পঃ।

(৩) "ইবে তুমি শান্ত হৈলে আসি মিলিলাম। ভাগ্য মোর তুমি হেন অতিথি পাইলাম॥ গ্রামসম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় আমার চাচা। দেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা॥ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা। সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥"—আদি ৭ পঃ।

বৃন্দাবনীভাষার প্রভাব কালে লুপ্ত হইল; কৃত্রিম ভাষা ব্যবহার করিয়া কবি কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারেন গোবিন্দদাস তাহা দেখাইয়াছেন,—কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও তদনুচর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তিরোধানের পর বৃন্দাবনী ভাষা কেহ ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু হিন্দীর অধিকার অন্তেও বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে অন্য ত্রিবিধ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা রহিয়া গেল, তাহা এই,—

বঙ্গভাষার ত্রিবিধ রূপ।

(১ উর্দ্দু,—আমরা প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যেও কতকগুলি উর্দ্দু শব্দের ব্যবহার দেখিয়াছি। উর্দ্দু নবাবী আমলের ভাষা, ইহার প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে অবশ্যই কিছু আসিয়াছিল, কিন্তু রামেশ্বরী সত্যপীরোপাখ্যান এবং ভারতচন্দ্র

প্রভৃতি কবির কোন রচনায় উর্দ্দুপ্রভাব অনেক পরিমাণে লক্ষিত হইলেও তাৎকালিক বঙ্গভাষায় সংস্কৃতানুবর্ত্তিতার কোনও বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। এখনও ইংরেজের মুলুকে দুএকজন কবি—"বুট পরি, হুট করি, যাবে ভাই যাও। হোটেলে কাটলেট সুখে খাবে যদি খাও। এলবার্ট ফ্যাসানে কেশ ফিরাবে ফিরাও॥" (দীনেশচন্দ্র বসু-রচিত 'কবিকাহিনী'।) প্রভৃতি পদে বিদেশী ভাষার শরণ লইলেও মাইকেল প্রভৃতি কবিগণের গুরুগম্ভীর সংস্কৃতের ধ্বনিতে সেই সব ক্ষীণ ম্লেচ্ছস্বর ডুবিয়া গিয়াছে।

(২) খাঁটি বাঙ্গালা —ইহা কথিতভাষা, "মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা" কিংবা "ইন্দুবিন্দুতুষারসঙ্কাশা" প্রভৃতি কথা ঠিক কথিতভাষা নহে। ইহা-দিগকে বাঙ্গালা বলিতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু এরূপ রচনা পোষাকী বাঙ্গালা। কথিত বাঙ্গালার প্রভাব মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবির রচনায় বিশেষরূপে দৃষ্ট হয়। যে চিত্রকর প্রকৃতি হইতে আলোকচিত্র উঠাইবেন, তিনি পৃথিবী ও স্বর্গ কেবল পুষ্প দিয়া ভরিয়া ফেলিতে পারেন না, তাঁহাকে শুষ্ক গুল্ম ও কুৎসিত গলিত পত্রেরও প্রতিচ্ছায়া উঠাইতে হইবে। খাঁটি বাঙ্গালীকবি এইজন্য কথিত অপভাষা খুঁটিয়া ফেলিয়া কেবল ললিতলবঙ্গলতার মত মিষ্ট মিষ্ট কথার খোঁজ করিবেন না। মুকুন্দরাম ভিন্ন প্রায় সমস্ত কবিই ন্যূনাধিক পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ দ্বারা কাব্য পুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা তাহা পরে দেখাইব।

(৩) সংস্কৃত। বৃন্দাবনদাসের সাদাসিধা রচনার মধ্যেও "স্বানু-ভাবানন্দে"র ন্যায় দুই একটি বড় সংস্কৃত কথা দৃষ্ট হয়। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালী কবি মনের উক্তিসম্বলিত গান রচনা করিতেন, ভাষাগ্রন্থগুলি সাধারণ লোকের মনোরঞ্জনার্থে গানের পালারূপে রচিত হইত; সংস্কৃতে ও পার্শীতে অন্যবিধ গুরুতর বিষয় সম্বন্ধীয় রচনার কাজ চলিত। কিন্তু বৈষ্ণবগণ বঙ্গভাষাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাসমূহের সঙ্গে সমকক্ষতা করিবার উপযোগী শক্তি প্রদান করিলেন। বৈষ্ণব লেখকগণ

পাষণ্ডীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া বাঙ্গালায় দর্শন ও ন্যায়ের সমস্ত তত্ত্ব সুগম করিলেন বিরুদ্ধপক্ষীয়গণের বিপরীতমুখী উদ্যম চলিল, তাঁহারা নানাবিধ তন্ত্রাদি অনুবাদ করিয়া বৈষ্ণবগণের প্রতিপক্ষতা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই উভয় পক্ষের শাস্ত্রচর্চ্চাহেতু বঙ্গভাষা সংস্কৃতের ভিত্তির উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অভিনব নাট্যশালার ন্যায়, পাতঞ্জলদর্শনের উচ্চতত্ত্ব হইতে কালিদাস ও জয়দেবের সুন্দর শব্দলালিত্যের বিচিত্র শোভা দেখাইল। কিন্তু বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত মিশ্রিত করিতে যাইয়া প্রথম উদ্যমেই বঙ্গীয় লেখকগণ কৃতকার্য্য হন নাই। চৈতন্যচরিতামৃতের "স্বধর্ম্ম এলভাক পুমান প্রভু উত্তর দিল।"—অন্ত, ২য় পঃ।—"কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ।"—অন্ত, ৯ পঃ। ও "দেহকান্ত্যা হয় তিঁহ অকৃষ্ণ বরণ।"—আদি, ১ পঃ। প্রভৃতি স্থল দুর্ব্বোধ্য ও শ্রুতিকটু হইয়াছে; এমন কি অনেক পরে রামপ্রসাদও এ বিষয়ে অতি শোচনীয় অযোগ্যতা দেখাইয়াছেন, তাহা যথাকালে লিখিব।

উর্দ্দু, কথিত বা খাঁটি বাঙ্গালা ও সংস্কৃতানুযায়ী বাঙ্গালা—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে এই ত্রিবিধ শক্তির প্রভাব দৃষ্ট হয়; এই ত্রিশক্তির কোন না কোনটি বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়া প্রাচীন কবিগণ কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা অতঃপর দৃষ্ট হইবে।

এই অধ্যায়ের অন্তর্গত বাঙ্গালা গ্রন্থের অপ্রচলিত শব্দগুলির অর্থসমেত তালিকা দিতেছি, ইহাদের কতকগুলি ভিন্নার্থ গ্রহণ করিয়াছে। নানা পুস্তকেই এই সব শব্দ পাওয়া যায়, আমরা পাঠকের আলোচনার সুবিধার্থ পূর্ব্বের ন্যায় গ্রন্থবিশেষের নাম উল্লেখ করিলাম।

অপ্রচলিত শব্দের তালিকা।

চৈতন্যভাগবতে,—দৃঢ়—প্রমাণ ("আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়, সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দৃঢ়" আদি)। ঠাকুরাল—প্রভাব; ছিণ্ডে—ছিঁড়ে; সমুচ্চয়—সংখ্যা; বহি—ব্যতীত; বিরক্ত—উদাসীন; এই শব্দ প্রাচীন সাহিত্যের কোথাও "ত্যক্ত" অর্থে ব্যবহৃত দেখিতে পাই নাই—ইহার অর্থ সংসার-অনুরাগশূন্য ছিল, এখন ইহা

অর্থদুষ্ট হইয়াছে। উপস্থান—উপস্থিতি ; পরিহার—প্রার্থনা ; উপস্কার—মার্জ্জন, পরিষ্কার ; সম্ভার—আয়োজন ; আর্য্য—রাগী ("বিপ্র বলে মিশ্র তুমি বড় দেখি আর্য্য")। কিন্তু স্থলে স্থলে ইহার অর্থ "পূজ্য" দেখা যায়,—যথা—"বৈষ্ণবের গুরু তিন জগতের আর্য্য।"—(চৈ, ম)। উপসন্ন—উপভোগ বা উৎপন্ন ; পরতেক—প্রত্যক্ষ ; বাহ্য—বাহ্যজ্ঞান ; জুয়ায়—যোগ্য হয় ; নিছনি—মূল অর্থ, যাহা মুছিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, এই শব্দ স্থলে "নির্ম্মঞ্ছন" শব্দও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়, যথা "যাবক রঞ্জিত চরণ তলে, জীউ নিরমঞ্ছব গোবিন্দদাস।"—(প, ক, ত ১০৭১ পদ)। "বিশ্বম্ভর নির্ম্মঞ্ছন করে আয়োগণ"—(লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, আদি)। চেষ্টা—এই শব্দ অনেক স্থলেই "ভক্তির আবেগ" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কদর্থেন—ঠাট্টা করেন ; দৃঢ়—সুস্থ ("লতা পাতা নিয়া গিয়া রোগী দৃঢ় কর।"—আদি) ; কোন্‌ভিতে—কোন্‌দিকে ; রায়—রবে ; এনে—এখন ; সাধ্বস—সার্থক ; ভাবক—ক্ষণস্থায়ী ভাবযুক্ত (Emotional),—"বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। তাহা ছাড়ি কর কেন ভাবকের কর্ম্ম॥"—(চৈ, চ)। কাকু—কাকুতি ; ব্যবসায়—ব্যবহার—"এইরূপ প্রভুর কোমল ব্যবসায়"—আদি। 'প্রাকৃত' এই শব্দ সংস্কৃতের ন্যায় অনেক স্থলেই 'ইতর' ও 'সাধারণ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে,—"প্রাকৃত লোকের প্রায় বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর। লোক শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর।"—আদি ; অন্যত্র চৈতন্যমঙ্গলে—"প্রাকৃত লোকের প্রায় হাসে বিশ্বম্ভর।" চৈতন্যভাগবতে—"প্রাকৃত শব্দেও যেবা বলিবেক আই। আই শব্দ প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই॥"—(মধ্য)। প্রাকৃত শব্দের এইরূপ অর্থ সংস্কৃতের অনুরূপ, যথা—রামায়ণে "কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্। রুক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব॥"—লঙ্কা ১১৮ম সঃ। বিমরিষ—বিমর্ষ ; উদার—চিন্তাযুক্ত। প্রচণ্ডশব্দ এখন ভীতিজনক দ্রব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু চৈতন্যভাগবতে "প্রচণ্ড অনুগ্রহ" প্রভৃতি ভাবের ব্যবহার পাওয়া যায়। সম্পত্তি—সমৃদ্ধি ("নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবার পারে।"—আদি) ; লজ্ঘন—দংশন ; চালেন—ঠেকাইয়া দেন ; কতি—কোথা। ওঝা শব্দ গৌরবজনক অর্থেই সর্ব্বদা ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়,—ইহা উপাধ্যায় শব্দের অপভ্রংশ ও পূর্ব্বে মূল শব্দের অর্থেই ব্যবহৃত হইত। আত্মসাৎ—এই শব্দ এখন অর্থদুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে,—কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে সর্ব্বদাই ইহা ভাল অর্থে ব্যবহৃত হইত ; যথা—"ভক্তি দিয়া জীবে প্রভু কর আত্মসাৎ।" আখরিয়া—উৎকৃষ্ট হাতের লেখা যাহার। **চৈতন্যচরিতামৃতে,**—হাতসানি—হস্তসঙ্কেত, লঘু—ক্ষুদ্র (যথা "লঘু পদচিহ্ন") ; পাতনা—তুষ ; ওলাহন—ভৎর্সনা ; ভদ্রকর—ক্ষৌরকার্য্য সমাধা কর ("ভদ্রকর ছাড় এই মলিন বসন।") ; তরজা—কূটসমস্যা। **নরোত্তমবিলাসে,**—উমড়য়ে—কষ্ট পায় ; সঙ্গোপন—মৃত্যু ; হাতসানে—হস্তসঙ্কেতে ; সমাধিয়া—বিবেচনা করিয়া ; সমীহিত—

ইচ্ছা। পদকল্পতরুতে,—রাতা—রক্তবর্ণ; "রাতা উৎপল, অধরযুগল"—২২ পদ; "নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা"—২৮৯ পদ, "মেঘগণ দেখে রাতা"—১৮০৪ পদ, কবিকঙ্কণেও এই শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়, (যথা—"কার সঙ্গে বিবাদ করি চক্ষু কল্লি রাতা")। বাউল—উন্মত্ত, বৈরাগী; পিছলিতে—ফিরাইতে ("পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আঁখি"—চণ্ডীদাস)। তিলাঞ্জলি এই শব্দ এখন "জলাঞ্জলি" যে স্থলে প্রযুক্ত হয়, সেই স্থলে ব্যবহৃত হইত। বুলে—ভ্রমণ করে, "সকল ফুলে ভ্রমর বুলে, কে তার আপন পর। চণ্ডীদাস কহে কানুর পীরিতি কেবল দুঃখের ঘর॥"—৯১৪ পদ)। চৈতন্যমঙ্গলে,—প্রেমা—প্রেম; সিনেহ—স্নেহ; মহু—মধু; উচাট—উদ্বিগ্ন; তোকানি মোকানি—জনরব। পীরিতি শব্দ পূর্ব্বে, 'প্রীতি' অর্থে ব্যবহৃত হইত, যথা—"পিতৃশূন্য পুত্রে মোর পীরিতি করিবে।" উমতি—উন্মত্ত; সানাসানি—ইঙ্গিত; নিবড়িল—সমাপ্ত করিল; বহুয়ারী—[illegible] ("মোর ঘরে ছিল এই ঘরের ঈশ্বরী। আজি হৈতে তোর দাসী কোণের বহুয়ারী॥"); সায়—সাঙ্গ; বেদিনী—ব্যথিত (Sympathiser); আর্ত্তি—কাতরতা; [illegible]টিয়া—আলোড়ন করিয়া। ভক্তিরত্নাকরে,—তাড়ক—কর্ণভূষণ; দাদুর—ভেক; টোটা—বাগান; সম্বাহন—সেবা; না ভয়—ভাল লাগে না; ওট—ওষ্ঠ ("বাঁধুলী জিনিয়া রাঙ্গা ওটখানি হাস"; এই "ওট" শব্দের অর্থ ৺ রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, "অট্ট অট্ট হাস"—ভক্তিরত্নাকর ৮৩৭ পৃঃ দেখুন)। ময়ঙ্ক—মৃগাঙ্ক।

ছন্দঃ।

বঙ্গভাষায় এই সময় নানা ছন্দঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পদকল্পতরু প্রভৃতি পুস্তকে কবিতাকে একটি পুষ্পিতা লতার ন্যায় নানাচ্ছন্দে প্রবাহিত হইয়া সৌন্দর্য্য-জাল বিস্তার করিতে দেখা যায়; স্বয়ং ভারতচন্দ্রও বঙ্গীয় ছন্দের মূলধন বেশী বাড়াইতে পারেন নাই; নিম্নলিখিত পদের সুন্দর ছন্দটি দেখুন;—

"ধনি রঙ্গিণী রাই। বিলসহি হরি সঞে রস অবগাহই॥ হরি সুন্দর মুখে। তাম্বুল দেই চুম্বই নিজ সুখে॥ ধনি রঙ্গিণী ভোর। ভুলল গৌরবে কানু করি কোড়॥ দুহুঁ গুণ গায়। একই মুরলীরন্ধ্রে দুজনে বাজায়॥ কেহ কেহ কহে মৃদুভাষ। নারীপরশে অবশ পীতবাস॥ কেহ কাড়ি লয় বেণু। রাসে রসে আজ ভুলল কানু॥—(পঃ কঃ ১৩১১পদ)।

ত্রিপদী ছন্দের প্রথম দ্বিচরণার্দ্ধে মিল রাখা সর্ব্বদা প্রয়োজন ছিল না; যথা;—

"আমার অঙ্গের, বরণ লাগিয়া, পীতবাস পরে শ্যাম। প্রাণের অধিক, করের মুরলী লইতে আমার নাম॥ আমার অঙ্গের, বরণ সৌরভ, যখন যে দিকে পায়। বাহু পসারিয়া,

বাউল হইয়া, তখন সে দিকে যায়॥"—(জ্ঞানদাস)। পদগুলি সর্ব্বদাই গীত হইত, সুতরাং কোন অক্ষর-নিয়মের বশীভূত ছিল না। কোন কোন স্থলে পদ অপরিমিতরূপ দীর্ঘ হইয়াছে, যথা;—"জয় জয় দেব কবি-নৃপতি শিরোমণি বিদ্যাপতি রসধাম। জয় জয় চণ্ডীদাস রসশেখর অখিল ভুবনে অনুপাম॥"—(পঃ কঃ, ১৫ পদ)। ছন্দসম্বন্ধে আমরা পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব।

বিভক্তি।

বঙ্গভাষার ব্যাকরণ না থাকাতে বিভক্তি অনেকটা ইচ্ছাধীন ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় হইতে এই অধ্যায়ে সে বিষয়ে কোনরূপ উন্নতি লক্ষিত হয় না। এই অধ্যায়েও "কাশীরে গমন", "বৈকুণ্ঠকে গমন", "মাতাতে পাঠান" (মাতাকে পাঠান), "মোহর" (আমার), "তাথি" (তাহাতে), "ইথি" (ইহাতে), প্রভৃতি নানাবিধ অনিয়মিত বিভক্তি দেখা যায়। "চণ্ডালাদিক", "পাককর্ত্তাদিক," প্রভৃতির বহুল ব্যবহার দৃষ্টে "দিগ" ও "দিগের" প্রাগ্‌লক্ষণ বিশেষরূপে পাওয়া যাইতেছে।

সামাজিক অবস্থা, শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব।

সামাজিক অবস্থা লক্ষ্য করিলে এই যুগে এক বিরাট্‌ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণের পদরজঃসেবী, জাতিভেদের দৃঢ়দুর্গে আশ্রিত সমাজ অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য-কর্ম্মের নিয়মে শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, নূতনভাবের তীব্র জ্বালাতে সেই শৃঙ্খল অপসৃত হইলে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এক শ্রেণীভুক্ত হইয়া গেল—নব সৃষ্টির কোলে ক্ষণকালের জন্য প্রাচীন সৃষ্টি নিমজ্জিত হইল; প্রাচীন সমাজ স্বীয় দুর্দ্দান্ত শিশুটির ভয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া কিছুকাল স্তম্ভিত হইয়াছিল; কিন্তু ক্রমে স্খলিত পদ পুনরপি স্থির করিয়া স্বীয় অদম্য বালকটিকে শাসন করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল। এই যুগে মৃদঙ্গের ধ্বনি ও হরিবোলের আনন্দ একদিকে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া উত্থিত হইতেছে, অপরদিকে এই আনন্দবিদ্বেষী দল বিদ্রূপ করিয়া বেড়াইতেছে;—

"শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস। কেহ বলে যত পেট ভরিবার আশ॥ কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার। পরম উদ্ধতপনা কোন ব্যবহার॥ কেহ বলে কতরূপ পড়িল

ভাগবত। নাচিব, কাঁদিব হেন না দেখিল পথ॥ ধীরে ধীরে বলিলে কি পুণ্য নহে। নাচিলে গাহিলে ডাক ছাড়িলে কি হয়ে॥"—চৈ, ভা, আদি।

এই দলের কোন কোন অগ্রসর ব্যক্তি কালী-মন্দিরে যাইয়া স্বীয় দুষ্ট অভিপ্রায়ের মঞ্জুরী চাহিতেছে;—"এত কহি হাসি হাসি পাষণ্ডীর গণ। চণ্ডীর মন্দিরে গিয়া করে আস্ফালন॥ প্রণমিয়ে চণ্ডীরে কহয়ে বারেবার। অদ্যরাত্র এ গুলিরে করিবে সংহার॥"—(ভক্তিরত্নাকর)। বৈষ্ণবগণও ইহাদিগের ঋণ সুদ সহিত পরিশোধ করিতে ত্রুটি করেন নাই,—"লোচন বলে আমার নিতাই যেবা নাহি মানে। অনল জ্বালিয়া দিব তার মাঝ মুখ পানে॥" অন্যত্র "এত পরিহারে যে পাপী নিন্দা করে। তবে লাথি মারি তার মাথার উপরে॥"—চৈ, ভা। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ গোঁড়া, তাঁহারা দোয়াতের কালিকে 'মেহাই', হাঁড়ীর কালীকে 'ভুষা', ও জবা ফুলকে 'ওড় ফুল' বলিতেন। কালীপূজার মধ্যে কোনরূপে সংশ্লিষ্ট থাকা ইঁহারা নিতান্ত পাপকর কার্য্য মনে করিতেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে গোপাল নামক এক ব্রাহ্মণ বিদ্রূপ করিয়া রাত্রিকালে,—"কলার পাত উপরে থুইল ওড়ফুল। হরিদ্রা সিন্দূর রক্তচন্দন তণ্ডুল॥"—চৈ, চ, ম। কালীপূজার এই আয়োজন দেখিয়া শ্রীবাস মান্যগণ্য লোকদিগকে প্রাতে ডাকিয়া দেখাইলেন—"সবায়ে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া॥ নিত্যরাত্রে করি আমি ভবানী-পূজন। আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সজ্জন॥ তবে সব শিষ্ট লোক করে হাহাকার। ঐছে কর্ম্ম হেথা কৈল কোন দুরাচার॥"—(চৈ, চ, ম)। এই অপরাধে সেই রসিক ব্রাহ্মণটির কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল বলিয়া চৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত আছে।

এই কলহব্যাপার প্রশংসনীয় না হইলেও একটি সান্ত্বনার কথা এই দেখা যায় যে, জাতীয় জীবনের নিরুদ্ধ শক্তি জড়তার বাঁধ ভাঙ্গিয়া নূতনভাব গ্রহণে উন্মুখতা দেখাইতেছিল।

অবতার-বাদ।

অবতার-বাদ কেবল চৈতন্য সম্প্রদায়ে আবদ্ধ ছিল না; লৌকিক বিশ্বাসের সুবিধা পাইয়া চৈতন্যদেবের পশ্চাতে বঙ্গদেশে কয়েকটি নকল চৈতন্যদেব দাঁড়াইয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস ক্রোধের সহিত জানাইতেছেন, পূর্ব্ববঙ্গে এক

দুরাত্মা আপনাকে রামের অবতার বলিয়া প্রচার করিতেছিল; ভক্তি-রত্নাকরে এই স্থলের ব্যাখ্যায় নরহরি চক্রবর্ত্তী বলেন, এই ব্যক্তির নাম 'কবীন্দ্র' ছিল। কিন্তু বৃন্দাবনদাস রাঢ়দেশস্থ অপর একজন অবতারের প্রসঙ্গ বলিতেই ক্রোধে বিশেষ ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে প্রথম "ব্রহ্মদৈত্য" প্রভৃতি নানারূপ অশিষ্ট সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া উপ-সংহারে লিখিয়াছিলেন,—"সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল। অতএব তারে সবে বলেন শিয়াল ॥" এই স্থলের ব্যাখ্যায় নরহরি চক্রবর্ত্তী উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিকে বিপ্রকুলজাত ও "মল্লিক" খ্যাতিবিশিষ্ট বলিয়া জানাইয়াছেন এবং বৃন্দাবন দাসের স্বর অনুকরণ করিয়া তাঁহার প্রতি "রাক্ষস", "পাপিষ্ঠ" প্রভৃতি অসংযতভাষা বর্ষণ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। *

---

* বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় গৌরগণ-চন্দ্রিকানামক পুস্তকে ইহাদের বিবরণ বিস্তারিত ভাবে দিয়াছেন; যথা,—

"চৈতন্যদেবে জগদীশবুদ্ধীন্
কেচিজ্জনান্ বীক্ষ্যচ রাঢ়বঙ্গে ॥
স্বস্মেশ্বরত্বং পরিবোধয়ন্তো
ধৃত্বেশবেশং ব্যচরন্ বিমূঢ়াঃ ॥
তোষাস্তু কশ্চিদ্দ্বিজবাসুদেবো
গোপালদেবঃ পশুপাঙ্গজোঽহং।
এবং হি বিখ্যাপয়িতুং প্রলাপী
শৃগালসংজ্ঞাং সমবাপ রাঢ়ে ॥
শ্রীবিষ্ণুদাসো রঘুনন্দনোঽহং
বৈকুণ্ঠধাম্নঃ সমিতঃ কপীন্দ্রাঃ ॥
ভক্তা মমেতি চ্ছলনাপরাধা-
ত্ত্যক্তঃ কপীন্দ্রীতি সমাখ্যয়ার্য্যৈঃ॥
উদ্ধারার্থং ক্ষিতিনিবসতাং শ্রীলনারায়ণোঽহং
সংপ্রাপ্তোঽস্মি ব্রজবনভুবো মূর্দ্ধ্নি চূড়াং নিধায়।

চৈতন্যদেবের পরেও বৈষ্ণবসমাজে ভক্তিময় বৈরাগ্যের স্বাভাবিক-ক্রিয়া কতক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্রমশঃ মহোৎসব ব্যাপারাদির আধিক্যে তাঁহাদের নানারূপ বিলাসবৃত্তির উদ্রেক হয়। এস্থলে অবশ্য কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতে হইবে, মাংসের স্বাদ ত্যাগ করিয়া তৎস্থল পূরণ করিতে প্রয়াসী বৈষ্ণবগণ নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য ও উপাদেয় শাকশব্জী দ্বারা বাঙ্গালীর আহারীয় সামগ্রীর তালিকা খুব প্রশংসনীয়ভাবে বাড়াইয়া ফেলেন। ইঁহাদিগের নাম সম্পূর্ণরূপে উল্লেখ করা দুরূহ; পাঠক চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের ৩ ও ১৫ পরিচ্ছেদে, অন্ত্যখণ্ডের ১০ পরিচ্ছেদে এবং পদকল্পতরুর ২৪৯৮ সংখ্যক পদে এবং জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে প্রদত্ত খাদ্য-তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন। এই বিষয়ে আমাদের এই একটি আক্ষেপ যে, একদিন রঘুনাথদাস ভূনিক্ষিপ্ত পচা প্রসাদান্নকণার এক মুষ্টি খাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন এবং চৈতন্যপ্রভু তাহা "খাসাবস্তু" বলিয়া গ্রহণ করিতেন, বৈষ্ণবসমাজের সেই এক নিবৃত্তির দিন ছিল— ক্রমে ক্রমে সেই গৌরবজনক বৈরাগ্য সমাজ হইতে তিরোহিত হইয়াছিল। বৈষ্ণবসমাজ যতই বড় হইতে লাগিল, ততই সাধারণমনুষ্য-সুলভ দুর্ব্বলতা ও পাপ তাহাতে প্রবিষ্ট হইল;—সামাজিক আয়তন বৃদ্ধির ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল বলিতে হইবে। কিন্তু চৈতন্যদেবের পরেও ইঁহাদের মধ্যে অনেক খাঁটি লোক জন্মিয়াছিলেন। নরোত্তমদাস দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় রাজবৈভব ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রভাবে

বৈষ্ণবসমাজের অধোগতি।

মন্দং হস্যান্নিতি চ কথয়ন্ ব্রাহ্মণো মাধবাখ্য-
শ্চূড়াধারী ত্বিতি জনগণৈঃ কীর্ত্ত্যতে বঙ্গদেশে॥
কৃষ্ণলীলাং প্রকুর্ব্বাণঃ কামুকঃ শূদ্রযাজকঃ॥
দেবলোঽসৌ পরিত্যক্তশ্চৈতন্যেনেতি বিশ্রুতঃ॥
অতিভব্যাদয়োঽপ্যন্যে পরিত্যক্তাস্তু বৈষ্ণবৈঃ।
তেষাং সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ সঙ্গাদ্ধর্ম্মো বিনশ্যতি॥
আলাপাৎ গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ।
সঞ্চরন্তীহ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥"

হরিশ্চন্দ্র রায় ও চাঁদরায় প্রভৃতি দস্যুগণ পর্য্যন্ত সাধুবৈষ্ণব হইয়াছিল। শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রেমবিহ্বলতা, নৈসর্গিক-শক্তি ও শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য তাঁহার জীবনের প্রথমভাগকে কেমন উজ্জ্বল শ্রী প্রদান করিয়াছে! এক-দিনের চিত্র ভুলিবার কথা নহে;—গোস্বামিগণ-কৃত গ্রন্থগুলি হারাইয়া শ্রীনিবাস পাগলের ন্যায় বীরহাম্বিরের সভায় প্রবেশ করিয়াছেন, শোকে বিহ্বল শ্রীনিবাসের অন্য জ্ঞান নাই, বজ্রাহতের ন্যায় তিনি নিস্পন্দ; সভায় ব্যাসাচার্য্য ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন,—দেবরূপী দর্শকের অপূর্ব্ব অবয়ব দর্শনে, ভক্তিভরে বীরহাম্বির প্রণত হইলেন—সভাস্থলীতে তাড়িৎপ্রবাহের ন্যায় এক আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তারিত হইল; তাঁহার আগমনের কারণ কি প্রশ্ন হইল—কিন্তু অসহ্য দুঃখ-কাতর শ্রীনিবাস উত্তর করিলেন "ভাগবত পাঠ সাঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন বাঞ্ছনীয় নহে।" সেই দুঃখের সময়েও ভক্তি-পূরিত চিত্তে দাঁড়াইয়া তিনি ভাগবতপাঠ শুনিতে লাগিলেন, যেন পাহাড়ের বক্ষে অগ্নির স্রোত বহিতেছিল! কিন্তু সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি ঋজু হিমাচ্ছন্ন শৃঙ্গ অন্তর্দাহের কিছুমাত্র চিহ্ন প্রকাশ করিল না। কি সুন্দর ভাগবতে ভক্তি! কি সুন্দর সভাসৌষ্ঠবকারী উজ্জ্বল বিনয়! শ্রীনিবাসআচার্য্য অনুরুদ্ধ হইয়া ভাগবত পড়িতে লাগিলেন। শোকাকুল স্বরে, ভক্তিমাখা কণ্ঠের আবেগে অসাধারণ পাণ্ডিত্য সহকারে শ্রীনিবাস যখন ভাগবত ব্যাখ্যা করিলেন, তখন বীরহাম্বির, ব্যাসাচার্য্য প্রভৃতি সকলে তাঁহার পদে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। অশ্রুজলে সভামণ্ডপ প্লাবিত হইল, বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসে বনবিষ্ণুপুর স্বর্গপুর হইয়া উঠিল।

শ্রীনিবাসের প্রথম জীবন।

কিন্তু বৈষ্ণবসমাজের এই উচ্চভাব পরে রক্ষিত হয় নাই, ক্রমশঃ এই কীর্ত্তি স্বীয় উন্নত গৌরবচ্যুত হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইল। পরে স্বয়ং শ্রীনিবাসের দেবমূর্ত্তি খানিও যেন বিলাসপঙ্কসংযোগে মলিন হইয়া পড়িল। তিনি বীরহাম্বিরের প্রদত্ত

শেষ-জীবন।

বহুসংখ্যক অর্থ রীতিমত গ্রহণ করিয়া ধনী হইলেন ও পরিণত বয়সে এক স্ত্রী বর্ত্তমানে শুধু অনুরোধরক্ষার্থ দ্বিতীয়বার পরিণয় করিলেন। নরহরি-চক্রবর্ত্তীর উৎসাহসূচক বর্ণনা সেই স্থলে আমাদের কর্ণে বাজিয়াছে, তিনি শ্রীনিবাসের দ্বিতীয় পরিণয় উপলক্ষে লিখিয়াছেন—"গোষ্ঠীসহ রাজার উল্লাস অতিশয়। আচার্য্য বিবাহে বহু অর্থ কৈল ব্যয়॥ সর্ব্বলোকে ধন্য ধন্য কহে বারেবার॥" —(ভঃ রঃ)।

কিন্তু বৈষ্ণবসমাজে তখনও এরূপ ভক্ত ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার এই সকল ব্যবহার অনুমোদন করেন নাই, যথা—প্রেমবিলাসে, গোপালভট্টের সঙ্গে মনোহরদাসের কথোপকথন,—

"বিষ্ণুপুর মোর ঘর হয় বার ক্রোশ। রাজার রাজ্যে বাস করি হইয়া সন্তোষ॥ আচার্য্যের সেবক রাজা বীরহাম্বির। ব্যাসাচার্য্যাদি অমাত্য পরম সুধীর॥ সেই গ্রামে আচার্য্য প্রভু বাস করিয়াছে। গ্রাম ভূমি বৃত্তি আদি রাজা যা দিয়াছে॥ এই ত ফাল্গুন মাসে বিবাহ করিলা। অত্যন্ত যোগ্যতা তার যতেক কহিলা॥ মৌন হয়ে ভট্ট কিছু না বলিলা আর। "স্খলৎপাদ স্খলৎপাদ" কহে বারেবার॥"

ইহার কিছু পূর্ব্বে গোপাল ভট্ট, লোকনাথ প্রভৃতি আচার্য্যগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজকে তাঁহাদের জীবনচরিত লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, ইঁহাদের সাংসারিকতা ও গৌরবস্পৃহা একেবারেই ছিল না।

যাঁহারা ভক্তির রাজ্যে দেবতা ছিলেন, তাঁহাদিগের দেহেও যেন সাংসারিক সুখের মৃদু বায়ু বহিতে লাগিল। নরোত্তমবিলাসে দেখা যায়, জাহ্নবীদেবী ভোজনান্তে "উষ্ণজলে" স্নান করিতেন, এক ব্রাহ্মণী পরিচারিকা "অতি সূক্ষ্মবস্ত্রে" তাঁহার অঙ্গ সাবধানে মোছাইয়া দিত, অপর এক পরিচারিকা বস্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। (সপ্তম বিলাস)। মূলকথা, বৈষ্ণবসমাজের সেই প্রেমের কঠোর দেবব্রত পরে আর রক্ষিত হয় নাই। শেষে বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর সাঙ্গোপাঙ্গ-দিগকে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গিনীগণের নূতন অবতার কল্পনা করিয়া পুস্তক

সাংসারিক সুখ-তৃষ্ণা ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নানারূপ বিকৃতি।

লিখিলেন, গদাধর রাধিকা, রূপ, সনাতন—রূপমঞ্জরী ও লবঙ্গমঞ্জরী, এবং কবিকর্ণপূর গুণচূড়াসখীর অবতাররূপে ব্যাখ্যাত হইলেন; এইরূপে অন্যান্য প্রত্যেক ভক্তগণকেই পূর্ব্বাবতারের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া পবিত্র করা হইল। মুরারিগুপ্ত হনুমান ও পুরন্দর অঙ্গদের অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইলেন এবং এক লেখক চাক্ষুষ ঘটনা বলিয়া এই অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, "পুরন্দর পণ্ডিত বন্দো অঙ্গদ বিক্রম। সপরিবারে লাঙ্গুল যার দেখিল ব্রাহ্মণ॥"—বৈষ্ণব-বন্দনা।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভক্তির প্রভাব ক্রমে ক্রমে হ্রাস হওয়াতে—জীবনের আদর্শ ক্রমে খর্ব্ব হওয়াতে—ভক্তগণ এইরূপে ক্রমে পৌরাণিক ভূত হইয়া পড়িলেন ও ধর্ম্মটিকে সাংসারিক নানারূপ সুখে চরিতার্থ করিবার উপযোগী করিয়া অধ্যাপকবৃন্দ 'সহজিয়া' প্রভৃতি মতানুসারে ইহার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। চৈতন্যপ্রভুর এত নির্ম্মল ও উন্মাদকর প্রেমধর্ম্ম ধীরে ধীরে বিলাস ও কুসংস্কারের কুক্ষিগত হইল।

সমাজের অপরদিকে নরহত্যা ইত্যাদি ব্যভিচার চলিতেছিল। নরোত্তমবিলাসের এই লোমহর্ষণ অংশটি দেখুন—"করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে পারে। ছাগ মেষ মহিষ-শোণিত ঘর দ্বারে॥ কেহ কেহ মানুষের কাটা মুণ্ড লৈয়া। খড়্গ করে করয় নর্ত্তন মত্ত হৈয়া॥ সে সময় যদি কেহ সেই পথে যায়। হইলেও বিপ্র তার হাত না এড়ায়॥ মত্তে স্ত্রী লম্পট জাতি বিচার রহিত। মদ্য মাংস বিনে না ভুঞ্জয়ে কদাচিত॥" (সপ্তম বিলাস)। পরন্তু জগাই মাধাই প্রভৃতির বৃত্তান্তে জানা যায়, তাহারা ব্রাহ্মণ হইয়া সর্ব্বদা মদ্য এবং গোমাংস ভক্ষণ করিত *, কিন্তু এরূপ বোধ হয় না যে, তাহারা তজ্জন্য জাতি-চ্যুত অবস্থায় ছিল।

অপর এক চিত্র।

"ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকা চুরি পরগৃহ দাহ সর্ব্বক্ষণ॥"—চৈ, ভা, মধ্য, ১৩ অঃ।

বাজারের ব্যয়।

এই কালে বাঙ্গালী খাইয়া পরিয়া বেশ সুখী ছিল; গৃহজাত দ্রব্যেই দৈনিক অভাবগুলি একরূপ সুন্দরভাবে পূর্ণ হইত, বাজারের ব্যয় কিছুই ছিল না বলিলেই চলে। মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে কালকেতুর বিবাহের ব্যয়ের যে একটা ফর্দ্দ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে নিম্নশ্রেণীর বিবাহে যে ব্যয় হইত, তাহার একটা মোটামুটি ওজন পাওয়া যায়। ধর্ম্মকেতু ১৩ গণ্ডা কড়া (আড়াই পয়সার কিছু বেশী) লইয়া বাজারে গেল, ব্যয় এইরূপ,—

দুইখানি ধরা (বোধ হয় নেংটী, ধরা বা ধটা হইতে ধুতি শব্দ আসিয়াছে)— ৫

পান	১
খয়ের	১
চূণ	।। কড়া
মেটে সিন্দূর	১
খুঞা (একরূপ বস্ত্র)	৪।।
মোট	১৩

ইহা কবির কল্পিত হিসাব বলিয়া বোধ হয় না। ভদ্রলোকের বিবাহের ব্যয়েরও আর একখানি ফর্দ্দ দেখাইতেছি। চৈতন্যপ্রভুর প্রথম বিবাহ অতি সামান্যরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল,—তাহাতে শ্বশুরালয় হইতে তিনি পঞ্চহরীতকী মাত্র উপঢৌকন পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় বারের বিবাহকে বৃন্দাবনদাস একটা প্রকাণ্ড উৎসব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কথিত আছে, এই এক বিবাহের ব্যয়ে পাঁচ বিবাহ সুনির্ব্বাহ হইতে পারিত, চৈতন্যভাগবতের বর্ণনা এইরূপ,—"বুদ্ধিমন্ত খান বলে শুন সর্ব্ব ভাই। বামনিয়া মত কিছু এ বিবাহে নাই॥ এ বিবাহ পণ্ডিতের করাইব হেন। রাজকুমারের মত লোক দেখে যেন॥" বিবাহের আয়োজনের মধ্যে দেখা

যায়, গৃহ "আলিপনা" দ্বারা রঞ্জিত হইল ও আঙ্গিনার মধ্যস্থলে বড় বড় কয়েকটি কদলী বৃক্ষ রোপিত হইল। এই বিবাহ উপলক্ষে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণমণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; কিন্তু আহার করার কথা ছিল না;—এ নিমন্ত্রণ "গুয়াপান"-গ্রহণের। গুয়াপান ও মাল্য চন্দন সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হইল, কিন্তু "ইতিমধ্যে লোভিষ্ঠ অনেক জন আছে। একবার লৈয়া পুনঃ আর বেশ কাছে॥ আরবার আসি মহা লোকের গহলে। চন্দন গুবাক মালা নিয়া যায় ছলে॥ সবেই আনন্দে মত্ত কে কাহারে চিনে। প্রভুও হাসিয়া আজ্ঞা করিলা আপনে॥ সবারে তাম্বুল মালা দেহ তিন বার। চিন্তা নাহি ব্যয় কর যে ইচ্ছা যাহার॥ এই গুবাক ও মাল্যচন্দন বিতরণ উপলক্ষে বৃন্দাবনদাস আরও লিখিয়াছেন যে, সমাগত ব্যক্তিবৃন্দ যাহা লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা দূরে থাকুক, ভূমিতলে যে পরিমাণে গুবাক ও মাল্য পড়িয়াছিল,—"সেই যদি প্রাকৃতলোকের ঘরে হয়। তাহাতেই ভাল পাঁচ বিবাহ নির্ব্বা হয়॥" উপসংহারে "সকল লোকের চিত্তে হইল উল্লাস। সবে বলে ধন্য ধন্য ধন্য অধিবাস॥ লক্ষেশ্বর দেখিয়াছি এই নবদ্বীপে। হেন অধিবাস নাহি করে কার বাপে॥ এমত চন্দন মাল্য দিব্য গুয়াপান। অকাতরে কেহ কভু নাহি করে দান॥"—(চৈ, ভা, আদি)।

ভরসা করি, এখনকার কৃপণ ধনিগণ এই প্রাচীন নজিরের বলে ব্যয় সংক্ষেপ করিতে সমর্থ হইবেন।

অসঙ্গত উপাধি।

সে কালে মানুষের নামের সঙ্গে প্রায়ই একটা অসঙ্গত উপাধি লগ্ন থাকিত, এখনও মধ্যে মধ্যে গ্রামদেশে তাহা না থাকে এমন নহে, কিন্তু সে কালে লেখকগণ প্রকাশ্যভাবে তাহা পুস্তকে ব্যবহার করিতেন, "খোলাবেচা শ্রীধর", "কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ", প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা "খঞ্জভগবান", "কালাকৃষ্ণদাস", "ভুঁড়ে শ্যামদাস", "নির্লোম গঙ্গাদাস" প্রভৃতি সার্টিফিকেট-যুক্ত নামের উল্লেখ পাইয়াছি। শিশু এখন প্রথম পুস্তকেই এই নীতি মুখস্থ করিয়া থাকে "কাণাকে কাণা বলিও না।" তখনকার গ্রন্থকারগণ বোধ হয় এই নীতি মানিতেন না।

শাসনাদি সম্বন্ধে দৃষ্ট হয়, সাধারণ বিচারের ভার কাজির উপর ছিল—কাজির নীচে 'শিকদার' ও শিকদারের অধীন 'দেওয়ান' ছিল ; কোটালের দায়িত্বই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল, পুলিস দারোগার কার্য্য ছাড়া রাজ্যের নূতন সমস্ত সংবাদের রিপোর্ট কোটালের দিতে হইত। হিন্দুরাজগণ পুলিস-দারোগার কাজ "নিশাপতি"দিগের দ্বারা করাইতেন ; এই "নিশাপতি" ও 'কোটাল' একই রূপ কর্ম্মচারী বলিয়া বোধ হয়। যুদ্ধবিগ্রহাদির সময় এক রাজ্য হইতে অপর রাজ্যে লোক যাতায়াত করিতে পারিত না ; নিষিদ্ধ পথে ত্রিশূল পুঁতিয়া পথিকদিগকে সতর্ক করা হইত। রাজাদিগের আদেশ-সম্বলিত "ডুরি" লইয়া পথিকগণ যাতায়াত করিতে পারিতেন। এই "ডুরি" একরূপ পাসপোর্টের ন্যায় ছিল। রাজগণ অনেক সময় দস্যুবৃত্তি করিতেন, বীরহাম্বির এইরূপ একজন দস্যুদলপতি ছিলেন ; আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও বহুসংখ্যক দস্যুপতির নাম পাইয়াছি। ইহা-দিগের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ। হরিশ্চন্দ্ররায়, চাঁদরায়, নারোজী প্রভৃতি দস্যুগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রতি গ্রামে রাজা একজন "মণ্ডল" নিযুক্ত করিতেন ; এই "মণ্ডল" গ্রামের একরূপ শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

শাসনপ্রণালী।

আমরা মৈথিলবঙ্গ-অধ্যায় শেষ করিবার পূর্ব্বে নিম্নে দুরূহ শব্দার্থ-বোধক একটি তালিকা দিতেছি ;—

দুরূহ শব্দের তালিকা।

অতএ—অতএব, অথরু—অস্থির, অবক—এইক্ষণ, অনুসঙ্গ—ইঙ্গিত, অলখিতে—অলক্ষ্যভাবে, অরু—রক্তবর্ণ, আন—অন্য, আঁতর—অন্তর, উরল—উদিত হইল, উকি—অগ্নি, উঘার—ব্যক্ত, উমড়ি—উথলিয়া, ওখদ—ঔষধ, কতি—কোথা, কর্ষণক শিলা—কষ্টি-পাথর, কানড়—একরূপ ফুল, কাঁধার—কুল, কোর—ক্রোড়, খিণি—ক্ষীণ, খেরি—খেলা, গাগরি—ক্ষুদ্র কলস, গারি—গালি, গীম—গ্রীবা, গেয়ান—জ্ঞান, গোরী—গৌরী, সুন্দরী, গোঙার—লম্পট, চোর ; ("হামি অবুঝ নারী তুহুঁত গোঙার", বিদ্যাপতি)।—"অমূল্য রতন সাথে, গোঙারের ভয় পথে, লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া॥"—(প, ক,)। চকেবা—চক্রবাক, চঞ্চুরী—চটক, চোরাবলি—চুরি করিলে, ছটাছটি—প্রকাণ্ড, ছাতিয়া—বক্ষ।

জনু—যেন, জয়তুর—জয়ঢাক, জীউ—জীবন, জীক—যাহার, তোড়ল—ত্যাগ করিল, তোর—তোমাকে, দুগুলি— দুইযোড়া, দিঠি—দৃষ্টি, দউ—দুই, ধড়ে—দেহে, দোতিক—দুতীর, ধম্মিল্ল—খোঁপা, নিঙারিতে—ঝাড়িতে, নিয়ড়—নিকট, নুকি—লুক্কায়িত থাকা, পদুমিনী—পদ্মিনী, পাতিয়ায়—প্রত্যয় করে, পুরুখ—পুরুষ, পবারেল—বিস্তৃত করিল, ফুয়ল—উন্মুক্ত, ফুলায়ল—প্রস্ফুট করিল, বরিখন্তিয়া—বর্ষণ করে, বাউর—বাউল, বালি—বালিকা, বিছুরি—বিস্মৃত হওয়া, বিহি—বিধাতা, বেসালি—দুগ্ধ জ্বাল দেওয়ার পাত্র, ভাঙ—ভ্রু, ভাব, ভাগি—ভাগ্য, ভাখী—ভাষা, ভিয়াইল—হইল, ভোখিল—ক্ষুধার্ত্ত, মরু—আমার, শিঙ্গার—বেশ-ভূষা, শুতিয়া—শুইয়া, শেজ—শয্যা, সামাইল—প্রবেশ করিল, সঞে—স্নেহে, সিহালা—শৈবাল, সিনান—স্নান।

ভাষায় হিন্দী প্রভাবের স্থায়ী চিহ্ন।

এখন দেখা যাউক, বাঙ্গালা ভাষার উপর হিন্দী কোন স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে কি না; হিন্দী শব্দ সমূহে মৃচ্ছকটিকাদি নাটকের প্রাকৃতের মত অনেকটা সংপ্রসারণ ক্রিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে; যথা,—হর্ষ—হরিষ, মগ্ন—মগন, নির্ম্মাণ—নিরমাণ, গর্জ্জন,—গরজন, নির্ম্মল—নিরমল, জন্ম—জনম, নির্দ্দয়—নিরদয়, রত্ন—রতন, যত্ন—যতন, প্রকাশ—পরকাশ, দর্শন—দরশন, বর্ষা—বরিষা, ইত্যাদি। এই কোমল শব্দগুলি বাঙ্গালা কথায় ব্যবহৃত হয় না, কেবল পদ্যরচনায় দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবযুগের কবিতায় এই ভাবের কোমল শব্দ বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু পরবর্ত্তী সাহিত্যে ক্রমশঃ তাহাদের সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালাভাষা যে ভাবে রূপান্তরিত হইতেছে, এই সম্প্রসারণ ক্রিয়া সেই পরিবর্ত্তনের অনুকূলে নহে, এজন্য এই প্রথা হিন্দীপ্রভাবের শেষ চিহ্ন বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দী ভাষার অনুনাসিক শব্দের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, যাঁহা, তাঁহা, কবহুঁ, যবহুঁ, প্রভৃতি অসংখ্য শব্দের উপর চন্দ্রবিন্দু দিতে হয়, ঐ সমুদয় শব্দ যে সকল সংস্কৃতশব্দের রূপান্তর, তাহাতে এরূপ কিছুই নাই, যদ্দারা এই চন্দ্রবিন্দু সমর্থিত হইতে পারে। চন্দ্রবিন্দু, 'ঞ' এবং 'ঙ' হিন্দীভাষা হইতে আসিয়া বৈষ্ণবযুগের রচনায় গাঢ় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।* এখনও বঙ্গভাষায় আঁখি, কুঁড়ে, কুঁজ, কাঁক, পুঁথি ইত্যাদি শব্দের অনুনাসিক উচ্চারণ

* "The same was the case in Bengali, four hundred years ago

রহিয়া গিয়াছে, অথচ অক্ষি, কুটীর, কুঞ্জ, কক্ষ, পুস্তক ইত্যাদি শব্দের রূপান্তরে চন্দ্রবিন্দু কিরূপে সমাগত হইবে, ভাবিয়া পাওয়া যায় না। ইহাও হিন্দী-প্রভাবের শেষ চিহ্ন বলিয়া বোধ হয়।

বৈষ্ণবগণ "শ্রী" শব্দের পক্ষপাতী ছিলেন, পরবর্ত্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে (ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে) 'শ্রীকেশ', 'শ্রীদর্শন', 'শ্রীহস্ত', 'শ্রীললাট', 'শ্রীপ্রসাদ' প্রভৃতির অবধি নাই,—সেই সব পুস্তকে ক্ষুদ্র শ্রেণীবদ্ধ অক্ষর-গুলির মধ্যে মধ্যে প্রায়ই পতাকাধারী সেনাপতির ন্যায় "শ্রী" গুলি বড় সুন্দর দেখায়। বৈষ্ণবগণের দ্বারা "মহোৎসব", "দশা", "লুট" (হরির লুট) প্রভৃতি শব্দের অর্থ সীমাবদ্ধ হইয়াছে। "বাঁকা" শব্দ বঙ্কিম শব্দের অপভ্রংশ, ইহা এখন "উৎকৃষ্ট" অর্থে ব্যবহৃত হয়; শ্রীকৃষ্ণের বঙ্কিমত্ব হেতু এই শব্দ গৌরবাত্মক হইয়াছে।

শিরোমুণ্ডন।

এই স্থলে বৈরাগিগণের শিরোমুণ্ডন সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক। চৈতন্যভাগবত ইত্যাদি পুস্তকে দেখা যায়, মহাপ্রভুর শিরোমুণ্ডনের সময় শিষ্যগণ নানারূপ বিলাপ করিতেছে, সামান্য কেশচ্ছেদ উপলক্ষে এত বেশী আক্ষেপ কোন কোন পাঠকের নিকট বিরক্তিকর বোধ হইতে পারে। এবিষয়টি আমরা প্রাচীনকালের মানদণ্ড দ্বারাই মাত্র বিচার করিতে পারি। সে সময় বঙ্গের বহুসংখ্যক শিক্ষিত যুবক সংসারত্যাগী হইতেন; এখনকার শিক্ষা আমাদিগকে সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করে, তখনকার শিক্ষা সংসার ত্যাগ করিতে শিখাইত। বহুসংখ্যক পিতামাতার স্নেহের হৃদয় ছিন্ন করিয়া, গৃহস্থের প্রফুল্লতার দীপটি চিরদিনের জন্য নিবাইয়া যুবকগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন, একবার শিরোমুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাস লইলে

---

and the Chaitanya Charitamrita affords innumerable instances of its use in words like যাইঞা, খাইঞা for the modern যাইয়া, খাইয়া &c."

Indo-Aryans, Vol. II., P. 320.

তিনি আর সমাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন না। যুবকগণ সে সময় দীর্ঘ-কেশ রাখিয়া আমলকী দ্বারা তাহা ধৌত করিয়া পুষ্পাভরণে সজ্জিত করিতেন। এহেন কেশচ্ছেদ অর্থে তখন চিরদিনের জন্য,—পিতা, মাতা ও বন্ধু বান্ধবের আশাচ্ছেদ বুঝাইত,—এই জন্য চৈতন্যপ্রভুর শিরোমুণ্ডন উপলক্ষে এত দীর্ঘ আক্ষেপোক্তির কথা দৃষ্ট হয়। এই সন্ন্যাস-গ্রহণ তখন গৃহস্থের একটি সাধারণ আতঙ্কের কারণ ছিল,—এখনও বালকগণ পিতামাতা বর্ত্তমানে কুশাসনে বসিতে পায় না,—কিন্তু ইহা প্রাচীন ভয়ের শেষ চিহ্ন,—বস্তুতঃ ভয়ের আর কোন কারণ নাই। রমণীগণ বিধবা হইলে তাঁহাদের কপালের সিন্দূর মোছা ও শাঁখা ভাঙ্গা যত কষ্টের কারণ হয়,—তখন যুবকগণের কেশচ্ছেদও সেইরূপ একটি শোকাবহ ব্যাপার ছিল। আমরা বৌদ্ধযুগ-অধ্যায়ান্তর্গত গোবিন্দচন্দ্রের গানেও গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসোপলক্ষে তাঁহার কেশচ্ছেদ ব্যাপারে একান্ত শোকাকুলা রাণীবর্গের মুখে—"কার বোলে মহারাজা মুড়াইল কেশ"—প্রভৃতি কাতরোক্তি শুনিয়াছি।

বৌদ্ধযুগের নিদর্শন।

বৌদ্ধযুগের কিছু কিছু চিহ্ন বৈষ্ণবযুগের ভাষায় পাওয়া যায়। হরিদাসকে প্রলুব্ধ করার বর্ণনোপলক্ষে "মায়া-মোহিত" শব্দ পাওয়া গিয়াছে, উহা বুদ্ধদেবের প্রলোভনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। "গোফা" শব্দ বৌদ্ধদিগের, উহাও চৈতন্যভাগবত, গোবিন্দদাসের করচা প্রভৃতি পুস্তকে অনেক স্থলে পাওয়া যায়। আর একটী শব্দ "পাষণ্ডী"; ইহা বৌদ্ধগণ অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি ব্যবহার করিতেন,—হিন্দুর "ম্লেচ্ছ", মুসলমানের "কাফের", খ্রীষ্টানের "infidel" যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, বৌদ্ধগণও "পাষণ্ডী" শব্দ সেই অর্থেই প্রয়োগ করিতেন, যথা—অশোকের আদেশ-লিপিতে,—"দেবানম্ পিয়ো পিয়দশি রাজা সবত ইচ্ছতি, সবে পাষণ্ড বংসেয়ু সবে তে সয়মঞ্চ ভাবশুদ্ধিন্ চ ইচ্ছতি।" (দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী (অশোকের নামান্তর) রাজা এই ইচ্ছা

করেন যে, পাষণ্ড (বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থাশূন্য ব্যক্তিগণও) যেন সর্ব্বত্র নিরাপদে বাস করেন)। বৈষ্ণবগণ এই শব্দ বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে ধার করিয়া অন্যধর্ম্মাবলম্বী-দিগের প্রতি প্রয়োগ করিতেন।

স্ুবুদ্ধি রায়।

বৈষ্ণব অধ্যায়ে প্রসঙ্গতঃ এখানে আমরা "সুবুদ্ধিরায়" সম্বন্ধে একটা কথা বলিব। "সুবুদ্ধিরায়" "গৌড়ের অধি-কারী" বলিয়া মুদ্রিত চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য-খণ্ডের ২৫ অধ্যায়ে উল্লিখিত দেখা যায়, এইজন্য ঐতিহাসিক রাজ্যে এই অজ্ঞাত "গৌড়াধিপ" মহাশয়ের জন্য তদন্ত হয়, কিন্তু ঐতিহাসিকগণ ইহার কোনও খোঁজ পান নাই; আমার নিকট দুইশত বৎসরের অধিক প্রাচীন যে হস্তলিখিত চৈতন্যচরিতামৃত আছে, তাহাতে—"পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধিরায় গৌড় অধিকারী" স্থলে—"পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধিরায় ছিল অধিকারী" এই পাঠ দৃষ্ট হয়; কিন্তু যখন বীরহাম্বিরের সভাসদ ব্যাসাচার্য্যের হস্ত-লিখিত চৈতন্যচরিতামৃত, এমন কি কৃষ্ণদাস কবিরাজের স্বহস্ত লিখিত চৈতন্যচরিতামৃতও রক্ষিত আছে বলিয়া প্রচারিত হইতেছে, তখন এবিষয়টির সহজেই মীমাংসা হইতে পারে।

সাহিত্যে নবযুগ।

আমরা এখন "সংস্কারযুগের" সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছি। এই যুগের অমৃতময় গীতি বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব ও আদরের জিনিষ। যে দেবরূপী মানুষ বর্ত্ত-মানকে অতীতের কঠোর শাসন হইতে নিষ্কৃতি দিয়া ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়াছেন, পশুমুণ্ড ও বনফুল ছাড়িয়া নয়নাশ্রু দ্বারা দেবার্চ্চনা শিখাইয়া-ছেন—যাঁহার নির্ম্মল অশ্রুবিন্দুতে প্রতিভাত হইয়া এক যুগের বঙ্গসাহিত্য মণির ন্যায় সুন্দর হইয়া রহিয়াছে, সেই চৈতন্যপ্রভুর পবিত্র নামাঙ্কিত যুগ আমরা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে এই খানে সমাপন করিতেছি।

কিন্তু গীতিকবিতার যুগাবসানে বঙ্গসাহিত্যে দেশীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোক-গণের কতকগুলি খাঁটি ছবি অঙ্কিত হইয়াছিল—সেগুলি তিনশত বৎসর

পূর্ব্বের। এই ছবিগুলি বড় উজ্জ্বল, বড় সুন্দর—দেখিলে প্রাচীন পর্ণকুটীরকেও সুন্দর বলিতে হইবে এবং কুটীরবাসিনীগণের চরিত্রের সৌন্দর্য্যে পাঠক মুগ্ধ হইয়া পড়িবেন। এখন আমরা কাব্যের নির্ম্মল মুকুরে বিম্বিত প্রাচীন সামাজিক জীবনের প্রকৃত রূপ দেখিতে পাইব।

অষ্টম অধ্যায়।

সংস্কার-যুগ।

১। লৌকিক ধর্ম্ম-শাখা।

২। অনুবাদ-শাখা।

সংস্কার-যুগ।

"সংস্কার-যুগ" কেন বলি? সমাজের ইতিহাসে সর্ব্বত্রই দুইরূপ শক্তির ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। যুগে যুগে প্রতিভান্বিত পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, কিন্তু প্রাচীন ভগ্ন হওয়ার জিনিষ নহে। প্রতিভাবান্ ব্যক্তি অন্তর্হিত হইলে পুনশ্চ প্রাচীন আসিয়া স্বীয় আধিপত্য সুস্থির করে; নূতন ও পুরাতন কালের দ্বন্দ্বে ভাবীসমাজ গঠিত হয়। নূতন সম্প্রদায়ে অদম্য তেজ থাকে, তাহাতে প্রাচীনের আবর্জ্জনা ভাসাইয়া লইয়া যায়; সেই সঙ্গে প্রাচীনকালের মণিমুক্তা ভাসিয়া না যায়, এইজন্য রক্ষণ-শীল-সম্প্রদায় স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। স্বাধীনতার চিত্র সর্ব্বত্রই বিস্ময় ও আনন্দ উৎপন্ন করে। স্বাধীনতার অগ্নিতে অতীতের মৃতদেহের সৎকার হয়, এবং বর্ত্তমানের চিত্র উজ্জ্বল হয়; কিন্তু অন্যদিকে উহার একটি গৃহস্থালী-বিরোধী উচ্ছৃঙ্খলতা থাকে, যাহার সতেজ আবর্ত্তে ভাল মন্দ একসঙ্গে মিশিয়া লুপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে।

বৈষ্ণব-যুগে বঙ্গের চরম প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা দেখাইয়াছি, বঙ্গসাহিত্যের নিরুদ্ধ-স্রোত চৈতন্যপ্রভুর চরণস্পর্শে

নবজীবনের স্ফূর্ত্তিসহ প্রবাহিত হয়। বৈষ্ণবপদাবলী ও চরিতাখ্যানে আমরা স্বাধীনতার অপূর্ব্ব প্রভাব দেখিয়াছি।

কিন্তু প্রাচীন পদ্মাপুরাণ, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি শত শত পুস্তক বাঙ্গালাসাহিত্যে অনাদরে পড়িয়াছিল, তাহাদের কোন কোনটির উপর বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি লেখক রোষানল বর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা দগ্ধ হয় নাই। ফুল্লরার চরিত্রে, খুল্লনার চরিত্রে যে স্থায়ী সৌন্দর্য্যের আভাস ছিল, তাহা বাঙ্গালী পাঠক ভুলিতে পারে নাই। যে টুকু ভাল,—জীবনে হউক, সমাজে হউক, ইতিহাসে হউক—তাহা দলিত হইয়াও লুপ্ত হয় না, পুনঃ পুনঃ তাহার অঙ্কুরোদ্গম হয়,—তাহার সৌন্দর্য্য বারংবার ইতিহাসে প্রকটিত হয়; যাঁহারা তাহা লুপ্ত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা তাহার সৌন্দর্য্য আরও বাড়াইয়া ফেলেন এবং তাহাকে নবশক্তিলাভ করিতে সুবিধা দেন। এই যুগে প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি আবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু রক্ষণ-শীল-সম্প্রদায়ও প্রাচীনকে কতকটা নূতন ছাঁচে ঢালিয়া রক্ষা করেন; আধুনিক চিন্তার নারায়ণতৈলসংযোগে প্রাচীনকে সজীব রাখিতে হয়। রামায়ণ, মহাভারতাদির অনুবাদ, চণ্ডীকাব্য, পদ্মাপুরাণ, শিবসংকীর্ত্তন ইত্যাদি পুস্তক এই যুগে নবভাবে সংস্কৃত হইয়া পুনরায় লোকমনোরঞ্জনের উপযোগী হয়। রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, মনসারভাসান প্রভৃতি সমস্ত পুস্তকেরই নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই নূতন সংস্করণময়-যুগকে আমরা—"সংস্কার-যুগ" আখ্যা প্রদান করিয়াছি।

প্রাচীন ও পরবর্ত্তী লেখকগণের সম্বন্ধ।

আমরা দেখাইব, কৃত্তিবাস, সঞ্জয়, কবীন্দ্রপরমেশ্বর, প্রভৃতি অনুবাদ-লেখকগণ ষষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন, কাশী-দাস, রামমোহন, রঘুনন্দন প্রভৃতি পরবর্ত্তী লেখকগণের হস্তে,—দ্বিজজনার্দ্দন, বলরাম-কবিকঙ্কণ প্রভৃতি লেখক মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম প্রভৃতি লেখকদিগের

হস্তে,—এবং কাণাহরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব প্রভৃতি লেখকবর্গ কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দদাস প্রভৃতি একগোষ্ঠী নূতন মনসার ভাসান রচকের হস্তে এইযুগে নব জীবন লাভ করিলেন। কিন্তু প্রাচীন লেখকগণের কীর্ত্তি নবভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নূতন কবিগণ তাঁহাদিগের যশের সমস্ত অংশ অধিকার করিয়া লইলেন,—প্রাচীন কীটভুক্ত কাগজের নজিরে প্রকৃত মহাজনগণের ঋণের কথা জানা যাইতে পারে, কিন্তু কে তাহার খোঁজ করে!

ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র।

এ ঋণের পরিমাণ ও গুরুত্ব কত, তাহা দেখা যাক্। মাধবাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীলেখকগণের নিকট মুকুন্দরাম নানাবিষয়ে ঋণী। মূল বিষয়ের ত কথাই নাই,—সমস্তই এক কথা; তাহা ছাড়া পংক্তিগুলি পর্য্যন্ত অপহৃত দেখা যায়। ভারতচন্দ্র স্বীয় নায়ক সুন্দরের মত সিঁধ কাটিয়া চুরি করিয়াছেন; তাঁহার কণ্ঠে যে যশের মুক্তামালা, তাহা তিনি ইহলোকে নিজের বলিয়াই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যেখানে ন্যায়ের উচিত তুলাদণ্ডে প্রকৃত অধিকারের ভাগ হয়, সেখানে সেই বড় মুক্তাছড়ার একটি মুক্তাও তাঁহার থাকিবে কি না সন্দেহ। বঙ্গসাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, কালিদাস পদ্মপুরাণ হইতে, সেক্ষপীয়র হলিন্‌সিয়াড্ হইতে, মিণ্টন ইলিয়াড় প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বিষয় এবং উপকরণ অবাধে সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সব পরস্বাপহারক দস্যু কাব্যজগতে লব্ধযশা ও শ্রেষ্ঠ কেন? ইহার একমাত্র উত্তর—ইহারা প্রতিভার রাজদণ্ড লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা যাহা স্পর্শ করিয়াছেন, তাহাতেই ইহাদের অধিকার বর্ত্তিয়াছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজগণ সকলেই এক প্রকার দস্যু। কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি লেখক নানা স্থান হইতে আহৃত রত্নের উৎকৃষ্ট সমন্বয় করিয়াছেন; পৃথিবী ক্ষমতার পূজক—এজন্য ইহারা অপহরণ করিয়াও লোকপূজার পুষ্পচন্দন পাইতেছেন। কিন্তু যাহার

চুরি করিয়া ঢাকিতে পারে না,—যাহাদের কুৎসিৎ সমন্বয়ে পল্লবের সঙ্গে শাখার, ত্বকের সঙ্গে অস্থির মিল পড়ে না, সেই দুর্ভাগাগণের জন্যই লোকনিগ্রহের নিষ্ঠুর শাসনের ব্যবস্থা। শক্তিমান্ স্বেচ্ছাচারীর দ্বারা পাপ পুণ্যের কৃত্রিম গণ্ডী নির্দ্ধারিত হইতেছে,—কিন্তু এই সমস্ত সামাজিক উন্নতি ও অবনতির মূলে ভাগ্যদেবী দাঁড়াইয়া পাগলিনীর মত কাহারও মাথায় ছত্র ধরিতেছেন, কাহারও মাথার ছত্র কাড়িয়া লইতেছেন।

প্রতিভান্বিত কবি মন্ত্রবলে প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালের সমস্ত সৌন্দর্য্য অপহরণ করিয়া স্বীয় কাব্যপটে সন্নিবিষ্ট করেন; ইহাকে অপহরণ না বলিয়া আহরণ বলা উচিত, কারণ অঙ্কনপটু চিত্রকরের জন্য গত যুগের কাব্য-চিত্র ও নব-যুগের দৃশ্যাবলী তুল্যরূপই ব্যবহার্য্য ও তিনিই এবিষয়ে একমাত্র স্বত্ববান্।

১। লৌকিক শাখা।

মাধবাচার্য্য, মুকুন্দরাম, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি ও ঘনরাম।

দ্বিজজনার্দ্দনের চণ্ডী।

চণ্ডীর উপাখ্যান দ্বিজ জনার্দ্দন রচনা করিয়াছিলেন, উহা একটি ছোট খাট ব্রতকথা। চণ্ডীর ভক্তগণ এই ব্রত-কথাটিকে ক্রমে বড় কাব্যে পরিণত করিলেন; কয়েক মিনিটের মধ্যে পুরোহিতঠাকুর যে ব্রতকথা সমাধা করিয়া যাইতেন, তাহা লইয়া ষোল পালা গান রচিত হইল।

মুকুন্দরামের পূর্ব্বে কতজন কবি এই উপাখ্যান লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, ঠিক বলা যায় না। বলরাম-কবিকঙ্কণের চণ্ডী মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, মাধবাচার্য্যের চণ্ডী ১৫৭৯ খৃঃ অব্দে প্রণীত হয়। এই চিত্রগুলি সংশোধন করিয়া মুকুন্দরাম নূতন কাব্য প্রণয়ন করেন। *

বলরামের চণ্ডী।

সংশোধিত চিত্র সম্মুখে থাকিতে প্রথম উদ্যমের নমুনা দেখিয়া কাব্যামোদিগণ কতদূর পরিতৃপ্ত হইবেন বলা যায় না, তবে একরূপ ভাব-বিকাশের পর্য্যায় লক্ষ্য করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক, তাঁহারা পূর্ব্ব নিদর্শন গুলি পাইলে আদর করিবেন, সন্দেহ নাই।

বলরাম-রচিত চণ্ডী আমরা দেখি নাই, কিন্তু মাধবাচার্য্যের চণ্ডী মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। মাধবাচার্য্য আত্মপরিচয়স্থলে লিখিয়াছেন ;—

মাধবাচার্য্য।

"পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার। একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥ অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি। কলিযুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥ সেই পঞ্চগৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল। ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল॥ সেই মহানদী তটবাসী পরাশর। যাগ যজ্ঞে জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥ মর্য্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু। আচারে বিচারে বুদ্ধে সম দেবগুরু॥ তাঁহার তনুজ আমি মাধব-আচার্য্য। ভক্তিভরে বিরচিনু দেবার মাহাত্ম্য॥ আমার আসরে যত অশুদ্ধ গায় গান। তার দোষ ক্ষমা কর কর অবধান॥ শ্রুতিতালভঙ্গ অন্য দোষ না নিবা আমার। তোমার চরণে মাগি এই পরিহার॥ ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত। দ্বিজ মাধবে গায় সারদা রচিত॥ সারদার চরণ-সরোজ মধু লোভে। দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হয়ে শোভে॥"

"ইন্দু বিন্দু বাণধাতা" অর্থ ১৫০১ শক, ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দ। কথিত আছে, মাধবাচার্য্য ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণে মেঘনা নদীর তীরস্থ নবীনপুর

* মুকুন্দরাম তাঁহার হস্তলিখিত পুঁথির দীর্ঘ বন্দনাপত্রে লিখিয়াছেন,—"গীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীকবিকঙ্কণ"—ইহা দ্বারা অনুমান হয়, বলরামকবিকঙ্কণের চণ্ডী অবলম্বন করিয়া তিনি স্বীয় কাব্য রচনা করেন। "মেদিনীপুরের লোকদিগের সংস্কার, এই বলরামকবিকঙ্কণ মুকুন্দরামকবিকঙ্কণের শিক্ষা-গুরু।"—পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০২ শ্রাবণ, ১১০ পৃঃ।

(স্থানপুর) গ্রামে বাস স্থাপন করেন। এই স্থান এখন গোসাঁইপুর বলিয়া পরিচিত। মাধবাচার্য্যের পিতামহের নাম ধরণীধরবিশারদ, পিতার নাম পরাশর ও একমাত্র পুত্রের নাম জয়রামচন্দ্র গোস্বামী।

মুকুন্দ ও মাধবাচার্য্য।

মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরামের ক্ষমতা একদরের নহে—মুকুন্দরামের প্রতিভা প্রথম শ্রেণীর কবির, মাধবাচার্য্য দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিগণের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য; কিন্তু উভয় কবির প্রতিভায় কতকটা একপরিবারের লক্ষণ দৃষ্ট হয়,—যেন প্রকৃতি সুন্দরী একই হস্তে দুইটি ফুল সৃষ্টি করিয়াছেন, দুইটিতেই স্বভাব-গত অনেক সাদৃশ্য, কিন্তু একটি অন্যটি হইতে বেশী উজ্জ্বল, সুগন্ধি ও সুন্দর, তাই পথিকের চক্ষু সেইটির প্রতি মুগ্ধ হইয়া অপরটিকে উপেক্ষা করে। কিন্তু যেখানে গোলাপ নাই, সেইখানেই পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতে মালতী ফুলটির রূপ উপভোগ করা সম্ভবপর। কবিকঙ্কণের সান্নিধ্যের ছায়া হইতে মাধুকবিকে নিরাপদ স্থলে রাখিয়া গুণের বিচার করা উচিত। আমরা উভয় কবিকে দেখিয়া ফেলিয়াছি; সুতরাং বোধ হয় প্রকৃত বিচারের অধিকারী নহি। মাধুকবির ফুল্লরা কবিকঙ্কণের ফুল্লরার ন্যায় লজ্জা-নতা সুন্দরী গৃহস্থবধূ নহে। এই ফুল্লরার জিহ্বা অসংযত, তাহার চরিত্রে অপরটির ন্যায় সংযমশীলতা ও স্বাভাবিক সরমের বিকাশ পায় নাই। মাধুর লহনা ও খুল্লনা ততদূর পরিষ্কার ছবি নহে—উহারা মুকুন্দের লহনা ও খুল্লনার রেখাপাত মাত্র। গল্পাংশে উভয় কবিরই বেশ ঐক্য আছে—মধ্যে মধ্যে মুকুন্দ স্বীয় কল্পনার কোন রম্য দৃশ্য বা মানুষ-চরিত্র-জ্ঞানের কোন বিচিত্র আদর্শ দেখাইতে পূর্ব্বশ্রুত গল্পের সরলবর্ত্মের পার্শ্বে একটু তির্য্যগ্-লীলা করিয়া লইয়াছেন। উষার সিন্দূরবর্ণে প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ পাইবার পূর্ব্বে, শেষতারার ক্ষীণালোকে আধমুদিত জগৎদৃশ্যের ন্যায় মুকুন্দের চণ্ডীর পূর্ব্বে মাধুর চণ্ডী কাব্য-বিকাশের পূর্ব্বাভাষ দেখাইতেছে।

মাধুর তুলিতে চণ্ডীকাব্যের যে সকল ছায়াপাত হইয়াছিল, মুকুন্দের বর্ণবিন্যাসক্রমে তাহারা সজীব সুন্দর চিত্র হইয়াছে।

মুকুন্দ স্বভাবের নিজ ঘরের কবি, মাধু তদপেক্ষা ক্ষমতায় অল্প, কিন্তু তাঁহারও স্বভাবের প্রতি স্থির লক্ষ্য। ক্ষুদ্র ঘটনা, ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ বিষয় লইয়া অনেক সময় শ্রেষ্ঠ কবির কবিত্ব বিকাশ পায়। কবি ব্যাধের ক্ষুদ্র কুটীর বর্ণনা করিবেন,- এস্থলে লেখনীর ছেঁড়াকাঁথা, মাংসের পসরা ও ভেরাণ্ডার থামই বর্ণনীয় বিষয়। এখানে কবির 'নবনীত কোমল,' 'নখরুচি কিংশুক জাল' প্রভৃতি কেতাবতী উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করিবার একেবারেই সুবিধা নাই। মাধু যে কার্য্য হাতে লইয়াছিলেন, তাহার যোগ্য ক্ষমতা তাহার বেশ ছিল,—"ঘুলি পেলি খেলী এয়ো আইল ব্যাধ ঘরে। মৃগ চর্ম্ম পরিধান, দুর্গন্ধ শরীরে॥" প্রভৃতি বর্ণনায় দেখা যায়, মাধু ভেরাণ্ডার থাম ধরিয়া ব্যাধের ঘরে উঁকি মারিয়া নিজে দেখিয়াছেন; সেখানে ব্যাধরূপসীগণের অর্দ্ধবৃত অঙ্গের দুর্গন্ধ সহ্য করিয়াও ভদ্রকবি তাহাদের গ্রাম্যরূপের ফটো তুলিয়া লইয়াছেন,—তাহা মার্জ্জিত করিয়া সুন্দর করিতে যান নাই; বাঙ্গাল প্রাচীন কবিগণের মধ্যে খগরাজ ও তিলফুলের হাত হইতে যাঁহারা নায়ক নায়িকার নগ্ন নিরাভরণ রূপটি রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের নৈসর্গিকশক্তির বিশেষ প্রশংসা করিতে হইবে। কোন কোন সময় মাধুকবি বর্ণনা-প্রসঙ্গে নিঃসহায়ভাবে প্রকৃতির হাতে যাইয়া পড়িয়াছেন, কাব্যের মর্য্যাদা ভুলিয়া বালকের ন্যায় একটি বিড়ালের গতি পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া তৃপ্তি বোধ করিয়াছেন, তাঁহার এই অসংযত ক্রীড়ায় এমন একটু স্বাভাবিকত্ব আছে, যাহাতে শিশুর পোকা ধরিবার যত্ন মনে পড়ে,—নিম্নের অংশটি "আপপিজিয়ের" গল্পের মত,—

স্বাভাবিকত্ব।

"খুল্লনায় বলে দিদি মুড়া খাও তুমি। তবে এক লক্ষ টাকা পাইব যে আমি॥
ঠেলাঠেলি ফেলাফেলি কেহ নাহি খায়। মাচার তলে থাকি বিড়াল আড় চোখে চায়॥

ধীরে ধীরে আড়ে আড়ে গেল পাতের কাছে। মুড়া লৈয়া বিড়াল গেল বাড়ীর পাছে। অনেক যতন করি পুষিনু বিড়াল। হেন বিড়াল মুড়া লৈয়া কার বাড়ী গেল। হাউ হাউ চিই চিই করিতে করিতে। এবাড়ী হইতে বিড়াল ও বাড়ী যাইতে॥ মুড়া গেল পড়ি কোথাকার পথেতে॥"

কবির রূপ বর্ণনায়ও সর্ব্বত্র সেই স্বভাবের খেলা—কালকেতুব্যাধের শৈশবের মূর্ত্তিটি এইরূপ—"তবে বাড়ে বীরবর, জিনি মত্ত করিবর, গজশুণ্ড জিনি কর বাড়ে। যতেক আখেটি সুত, তারা সব পরাভূত, খেলায় জিনিতে কেহ নারে॥ বাটুল বাঁশ লয়ে করে, পশু পক্ষী চাপি ধরে, কাহার ঘরেতে নাহি যায়। কুঞ্চিত করিয়া আঁখি, ধাকিয়া মারয়ে পাখী, ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়ে যথায়॥" মুকুন্দরাম এই আভাস-দৃশ্যটিকে বড় এবং উজ্জ্বল করিয়া, পরিষ্কার বর্ণক্ষেপে আঁকিয়াছেন, যথা,—

"দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু। বলে মত্ত গজপতি, রূপে নব রতিপতি, সবার লোচন-সুখ হেতু॥ নাক মুখ চক্ষু কাণ, কুন্দে যেন নিরমাণ, দুই বাহু লোহার সাবল। রূপগুণ শীলবাড়া, বাড়ে যেন হাতী কড়া, যেন শ্যাম চামর কুন্তল॥ বিচিত্র কপালতটী, গলায় জালের কাঁটী, করযোড়া লোহার শিকলি॥ বুক শোভে ব্যাঘ্রনখে, অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে, কটিতটে শোভয়ে ত্রিবলী॥ দুই চক্ষু জিনি নাটা, খেলে দাণ্ডা গুলি ভাঁটা, কাণে শোভে স্ফটিক কুণ্ডল॥ পরিধান রাঙ্গা ধুতি, মস্তকে জালের দড়ী, শিশুমাঝে যেমন মণ্ডল। সহিয়া শতেক ঠেলা, যার সঙ্গে করে খেলা, তার হয় জীবন সংশয়॥ যে জন আকুড়ি করে, আছাড়ে ধরণী ধরে, ডরে কেহ নিকটে না রয়॥ সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, শজারু তাড়িয়ে ধরে, দূরে গেলে ধরায় কুক্কুরে। বিহঙ্গম বাঁটুলে বিন্ধে, লতায় জড়িয়ে বাঁধে স্কন্ধে ভার বীর আইসে ঘরে॥"—কবি, ক, চণ্ডী।

উভয় চণ্ডীতে অনেক ছত্র পাওয়া যায়, যাহা ঠিক একরূপ; হয়ত, মুকুন্দরাম সেগুলি মাধবের চণ্ডী হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, নতুবা উভয় কবিই কোন লুপ্তকবির ভূপ্রোথিত ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছেন।

মুকুন্দের কাব্যের প্রায় সমস্ত অংশই মাধুর চণ্ডী হইতে উৎকৃষ্ট; উহাতে আখ্যান বস্তুর বর্ণনা, কাব্যাংশ, ঘটনা-বৈচিত্র্য প্রভৃতি সকল গুণেরই বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয়। কিন্তু মাধুর কালকেতু, মুকুন্দের কালকেতু হইতে বিক্রমশালী, মাধুর ভাঁড়ুদত্ত, কবিকঙ্কণের ভাঁড়ুদত্ত

হইতে শঠতায় প্রবীণ। এই দুই চরিত্র সমালোচনার সময় আমরা মাধুর চণ্ডী হইতে সাহায্য গ্রহণ করিব। মাধু প্রকৃত বাঙ্গালী কবির ন্যায় কঠোর বিষয় হইতে কোমল বিষয় রচনায় পটু—তাঁহার রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ধুয়াগুলি বনফুলের সৌরভময়—নিম্নে কতকটি উদ্ধৃত করিতেছি ;—

ধুয়া।

(ক) কানাই তুমি ভাল বিনোদিয়া। নবকোটী চাঁদ ফেলাই ও মুখ নিছিয়া ॥
বনে থাক বন-ফুল দিয়া গাঁথ হার। গোপ ঘরে ননী খাও গরিমা তোমার ॥
মাঠে থাক ধেনু রাখ, বাঁশীতে দেও শান। গোপালের ঘরের মণি গোপালের পরাণ ॥"

(খ) কাল ভ্রমরা, যথা মধু তথা চলি যাও। আমার সংবাদ প্রাণনাথেরে জানাও ॥
সে কথা কহিবে প্রভুর বনাইয়া কাছে। সুস্থির সম্ভ্রমে কেও লোকে শুনে পাছে ॥
চরণকমলে শত জানাইও প্রণাম। অবশেষে শুনাইও রাধার নিজ নাম ॥

(গ) আজু মোর মন্দিরে আওত কালা। কি করিবে চাঁদ পবন অলি কোকিলা ॥

(ঘ) শিশু পশু চলি যায় অনেক সন্ধানে। কানাই কালা, বলাই দাদা চাঁদের সমানে ॥

যুদ্ধবর্ণনায় ছন্দ।

কবি মাধু যুদ্ধবর্ণনায় যে ছন্দ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাঁহার ১৭৩ বৎসর পরে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে সেই ছন্দ অনুসরণ করিয়া যুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন ; কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গাধিপের যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে—"যুঝে প্রচণ্ড ভাইয়া কোপে প্রজ্বলিত হৈয়া, মার কাট সঘনে ফুকারে। জনার্দ্দনের যত সেনা, শব্দেতে কম্পমানা, নানা অস্ত্র বরিষণ করে ॥ পদাতি পদাতি রণে, অস্ত্র মায়ে ঘন ঘনে, কুঞ্জরে কুঞ্জরে, চাপাচাপি। অস্ত্র বাছনি করি, তুরগ উপরে চড়ি, রাহুতে রাহুতে কোপাকুপি ॥ কোপে বলে কালদণ্ড, শুনরে ভাই প্রচণ্ড, মিছা কেন কর হটাহট। লুটিব আর পুরিব, কালকেতুরে ধরিব, নগর করিব ধুলাপাট ॥" প্রভৃতির পরে—"যুঝে প্রতাপ আদিত্য। ভাবিয়া অসার, ডাকে মার মার, সংসারে সব অনিত্য"—ইত্যাদি একটি প্রতিধ্বনির মত শুনায়।

মাধবাচার্য্যের চণ্ডী চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যদুর্গ আশ্রয় করিয়া নিরাপদ্ ছিল, কিন্তু কবিকঙ্কণ এখন মুদ্রাযন্ত্রপ্রভাবে নবশক্তি লাভ করিয়া তাঁহাকে সেই নিভৃত নিকেতন হইতে তাড়াইতেছেন।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

হুসেনসাহের রাজত্ব বঙ্গ-ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা ব্যাপক। কিন্তু সাধারণতঃ মুসলমান অধিকারে হিন্দুর অন্নসংস্থান ক্রমে নষ্ট হইতেছিল, ও উৎপীড়নে দেশ শুদ্ধ আতঙ্ক জন্মিয়াছিল; মুসলমান আইনের একটি ধারা এইরূপ ছিল,

হিন্দুর প্রতি অত্যাচার।

"যদি কোন মুসলমান দেওয়ান হিন্দুর নিকট কর আদায় করিতে উপস্থিত হন, তবে সেই হিন্দুর সম্পূর্ণ অবনতিসহকারে তাহা দিতে হইবে; অপিচ যদি মুসলমান দেওয়ান ইচ্ছা করেন যে কাফেরের মুখে থুথু প্রদান করিবেন, তবে তাহার তৎক্ষণাৎ মুখ ব্যাদান করিয়া তাহা লইতে হইবে,—ইহাতে তাহাদের ঘৃণার বিন্দুমাত্রও কারণ নাই; এই থুথুপ্রদানের কয়েকটি নিগূঢ় অর্থ স্বীকার করিতে হইবে, ইহা দ্বারা সরকারের আশ্রিত কাফেরের সম্পূর্ণ বশ্যতার পরীক্ষা হইবে, এবং একমাত্র সনাতন ইসলামধর্ম্মের গৌরব ও মিথ্যাধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শিত হইবে।"* আইনের ধারা পর্য্যন্ত এইরূপ মার্জ্জিত ছিল। বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য খুঁজিলে মধ্যে মধ্যে মুসলমান অত্যাচারের কথা প্রসঙ্গক্রমে পাওয়া যায়। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণেও থুথুর বিষয় উল্লিখিত দেখা যায়:—"ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে। কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুথু দেয় মুখে॥" "যাহার মস্তকে দেখে তুলসীর পাত। হাতে গলায় বাঁধি লয় কাজির সাক্ষাৎ॥ কক্ষতলে মাথা থুইয়া বজ্র মারে কিল। পাথর প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল॥ পরেরে মারিতে পরের কিবা লাগে ব্যথা। চড় চাপড় মারে আর ঘাড় গোতা॥ ব্রাহ্মণ

* "When the Collector of the Dewan asks them (the Hindoos) to pay the tax, they should pay it with all humility and submission: and if the Collector wishes to spit into their mouths, they should open their mouths without the slightest fear of contamination so that the Collector may do so. The object of such humiliation and spitting into their mouths is to prove the obedience of the infidel subjects under protection and promote if possible, the glory of the Islam,—the true religion and to shew comtempt to false religions.—(Von Neor's Akbor). আকবর এই আইন রদ্দ করেন।

সজ্জন তথা বৈসে অতিশয়। ঘরেতে গোময় না দেয় দুর্জ্জনের ভয়॥ বাছিয়া ব্রাহ্মণ প্রায় পৈতা যার কাঁধে। পেয়াদাগণ নাগ পাইলে হাতে গলায় বাঁধে॥" এবং—"পিরুল্যা গ্রামতে বৈসে যতেক যবন। উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥ কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কাঁধে। ঘর দ্বার লোটে আর লৌহপাশে বাঁধে॥"—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল। মুকুন্দরামের অনেক স্থলের বর্ণনায়ও এইরূপ অত্যাচারের আভাস পাওয়া যায়। মুসলমানপ্রভাবের ক্রমোন্নতির পশ্চাতে দূর ভাগ্যাকাশের সীমান্তে হিন্দুর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তারা ডুবিয়া যাইতেছিল; বঙ্গদেশে হিন্দুর দুর্ভাগ্য ও মুসলমানের সৌভাগ্যের ভাষাই প্রমাণ দিতেছে; হিন্দুর "কুঁড়ে" (কুটীর)

ভাষার সাক্ষ্য।

—মুসলমানের "দালান," "এমারত"; হিন্দুর গাঁ (গ্রাম), মুসলমানের "সহর"; হিন্দুর 'শস্য' কর্ত্তিত হইয়া যখন মুসলমানের সেবায় লাগে, তখন তাহা "ফসল"; হিন্দুর "টাকা" (তঙ্কা) করগ্রাহী মুসলমানের হস্তে পৌঁছিলে "খাজানা" হয়; ক্ষুদ্র মেটে তৈলের "প্রদীপটি" মাত্র হিন্দুর; "ঝাড়", "ফানস", "দেওয়ালগিরি"—সমস্ত বিলাসের আলো মুসলমানের; হিন্দু অপরাধ করিলে "কাজি" "মেয়াদ" দেয়; ইহা ছাড়া "বাদশাহ", "ওমরাহ" হইতে "উজির", "নাজির", সামান্য "কোটাল", "পেয়াদা", "বরকন্দাজ", "নফর", পর্য্যন্ত সকলই মুসলমানীশব্দ; "জমি", "তালুক", "মুলুক" প্রভৃতি মুসলমানী শব্দ; "জমিন্দার", "তালুকদার"ও তাই; উপাধিগুলিও সমস্তই মুসলমানী—"জুমলদার", "মজুমদার", "হাবিলদার", সম্মানসূচক "সাহেব", প্রভুত্বসূচক "হুজুর" এই সকল কথা বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়া হিন্দুর ভাষাকে যবনাধিকারচিহ্নিত করিয়াছিল। কিন্তু স্বভাবের 'চন্দ্র' 'সূর্য্য' 'তরু' 'ফুল' 'পল্লবে' হিন্দুর অধিকার ঘোচে নাই; পল্লীবাসী হিন্দু, নিজের ধর্ম্মটি ও প্রকৃতির মূর্ত্তিটিতে মুসলমানের ছায়া স্পর্শ করিতে দেন নাই। সংস্কৃত শব্দগুলি সেখানে পবিত্র মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে।

বঙ্গদেশের রাজনৈতিক বিপ্লব দূরপল্লীর কৃষককবিকেও গৃহসুখে বঞ্চিত করিল। মামুদ সরিফ্ নামক ডিহিদারকে কবি মুকুন্দরাম দুরপনেয় কালীর বর্ণে অঙ্কিত করিয়া তাঁহার অমর কাব্যের একপার্শ্বে রাখিয়া দিয়াছেন। এই ব্যক্তির অত্যাচারে প্রজাগণের দুঃখ অসহ্য হইয়া উঠিল, সরকারগণ খিল ভূমি আবাদী বলিয়া লিখিয়া লইল, তাহারা খাজানা শোধ করিতে না পারিয়া ধান, গরু বিক্রয় করিল; বাজারে জিনিষের মূল্য হ্রাস হওয়াতে টাকার দ্রব্য দশ আনায় বিক্রয় হইতে লাগিল। পোদ্দারগণ প্রত্যেক টাকায় আড়াই আনা কম দিতে আরম্ভ করিল এবং আমলাগণ এক কুড়ার মাপ খর্ব্ব করিয়া ১৫ কাঠায় বিঘা ধরিতে লাগিল। এদিকে প্রজাগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পাছে প্রাণটি লইয়া পলাইয়া যায়, এইজন্য কোটাল ও জমিদারগণ পথ অবরোধ করিয়া পাহারা দিতে লাগিল।

ডিহিদার মামুদ সরিফ্।

দরিদ্র মুকুন্দ সাতপুরুষ যাবৎ চাষ-আবাদ করিয়া দামুন্যায় বাস করিতেছিলেন,—এই দামুন্যা পল্লীতে * তাঁহার কবিতার প্রথম নমুনা "শিবকীর্ত্তন" প্রসূত হয়; কিন্তু এবার এই রাষ্ট্রবিপ্লবে তিনি স্বীয় গ্রামে কোনরূপেই থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মুনিব গোপীনাথ-নন্দী ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু খাজানার দাবী পূর্ণ করিতে না পারিয়া বন্দী হইলেন; কবি গম্ভীরখাঁর সহিত যুক্তি করিয়া চণ্ডীগড়ের শ্রীমন্তখাঁর সাহায্যে, শিশু পুত্র স্ত্রী ও ভ্রাতা রামানন্দের সহিত পলাইয়া দেশত্যাগী হইলেন। "তৈল বিনা করি স্নান"—এবং "শিশু কাঁদে ওদনের তরে" প্রভৃতি দুই একটি ইঙ্গিতবাক্যে এই বিপদাপন্ন ক্ষুদ্র পরিবারটির শোচনীয় দুরবস্থা চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। গভীর দুঃখে কোন সময় গভীর ব্যাকুলতা জন্মে; তখন নির্ভর ও ভক্তিপূর্ণ অশ্রু চক্ষে উচ্ছলিত হয়। সংসারের অন্য

কবির দুরবস্থা ও স্বদেশ-প্রেম।

* বর্দ্ধমান সিলিমাবাদ পরগণার অধীন। এই গ্রাম রত্নামুনদীর তীরবর্ত্তী।

অবলম্বন রহিত হইলে যিনি শেষের আশ্রয়, তাঁহারই পদে মানুষের মনের স্বভাবপ্রবৃত্তি ধাবিত হইয়া থাকে। মুকুন্দ এই সময় জলপথে যাইতে-ছিলেন, জলকুমুদ চয়ন করিয়া নয়নজল মিশাইয়া চণ্ডীদেবীর পদে উপহার দিলেন, স্বপ্নে চণ্ডী তাঁহাকে কাব্য লিখিতে আদেশ করিলেন; কবি এই স্বপ্নে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার চণ্ডীকাব্য তাই এত সুন্দর হইয়াছে। দৈবশক্তিলাভে বিশ্বাস জন্মিলে মানুষী শক্তি বাড়িয়া যায়, ইহা কোন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কবি তেলি গাঁ, গোড়াই নদী, তেউটা, দারুকেশ্বর, আমোদরনদ, গোথরা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া আরড়া ব্রাহ্মণভূমির রাজা রঘুনাথরায়ের শরণ লইলেন। রঘুনাথরায়ের পিতার নাম বাঁকুড়া রায়,—তাঁহার অনুগ্রহে কবি রাজপরিবারের শিশু-গণের শিক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। এই ব্রাহ্মণভূমিতে রঘুনাথ রায় তাঁহাকে দশআড়া ধান মাপিয়া প্রদান করেন, এই স্থানের অন্নজলে পুষ্ট হইয়া তিনি চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। কিন্তু স্বদেশ-নির্ব্বাসিত কবি দামুন্যা গ্রামের চিত্রপট ভুলিতে পারেন নাই। রত্নানুনদের নাম স্মরণ করিতে তাঁহার প্রাণে অব্যক্ত বেদনারাশি উথলিয়া উঠিয়াছে,—"গঙ্গাসম সুনির্ম্মল, তোমার চরণজল, পান কৈনু শিশুকাল হ'তে। সেই সে পুণ্যের ফলে, কবি হই শিশুকালে"—বলিয়া শিবচরণ নিঃসৃত রত্নানুনদের উল্লেখ করিয়াছেন। দামুন্যা গ্রামের প্রত্যেকটি পাড়া তাঁহার মনশ্চক্ষে চিত্রিত ছিল, তাহা গ্রন্থসূচনায় বর্ণনা করিতে ভুলেন নাই। হরিনন্দী, যশোবন্ত অধিকারী, উমাপতি নাগ, বৃষদত্ত, লোকনাথ মিশ্র, ধনঞ্জয়, ঈশান পণ্ডিতমহাশয় প্রভৃতি গ্রামিক সজ্জনগণের প্রসঙ্গে তাঁহার স্মৃতিমথিত ব্যাকুলতা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। স্বদেশ ছাড়িয়া গেলে পল্লীগ্রামের প্রতি ঘাট, প্রতি উদ্যান কল্পনায় এক অপরূপ মাধুর্য্য ধারণ করে, কবি স্বীয় গ্রামের দেউলটীও সকাতরে স্মরণ করিয়াছেন। "দামুন্যার লোক যত শিবের চরণে রত"—সেই পল্লীর সকল লোকই ধার্ম্মিক, সকল দৃশ্যই সুন্দর। স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি হইতে ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে বিতাড়িত কবি এই

ভাবে সেই পবিত্র জন্মপল্লীর প্রতি অশ্রুসংবদ্ধ, সকরুণ, বেদনাপূর্ণ অতৃপ্তকামনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। দামুন্যার বিবরণটি প্রবাসী পাঠক ভাবিয়া পড়িবেন এবং কবির মর্ম্মস্পর্শী কাতরতা হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

কবি, "সুপণ্ডিত ও সুকবির" আবাসভূমি বলিয়া দামুন্যাপল্লীর "সুধন্য দক্ষিণ পাড়া"রই বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন; বোধ হয়, দামুন্যার দক্ষিণপাড়াতেই ইঁহারা ৬।৭ পুরুষ পর্য্যন্ত বসবাস করিয়া থাকিবেন।

যখন কবি আর্‌ড়াতে * আসিয়া চণ্ডীকাব্য সমাধা করিয়াছিলেন, তখন মানসিংহ "গৌড়বঙ্গ উৎকলের" রাজা হইয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু যখন দামুন্যা হইতে পলাইয়া আসেন, তখন "অধর্ম্মী রাজা"র (হুসেন কুলিখাঁ অথবা মজফরখাঁ) হস্তে বঙ্গের শাসনভার অর্পিত ছিল। কবির স্বহস্ত-লিখিত চণ্ডীর পাঠ এইরূপ,—"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজে ভৃঙ্গ, গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ। অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে, খিলাৎ পায় মামুদ সরিফ।" কবির ধন্যবাদপাত্র, প্রবল বিষ্ণু-ভক্তি-পরায়ণ, রাজা মানসিংহ কখনই দ্বিতীয় ছত্রের "অধর্ম্মী রাজা" হইতে পারেন না। বিশেষ যদি মানসিংহের সময়ই কবি পলাইয়া আসিতেন, তখন তাঁহার প্রবল বিষ্ণুভক্তি সত্ত্বেও কবির পক্ষে তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। উক্ত ছত্র কয়েকটির অর্থ এইরূপ "এখনকার রাজা মানসিংহ ধন্য, তিনি গৌড়বঙ্গ উৎকলের অধিপ, (প্রজাদিগকে সুখে রাখিয়াছেন)। কিন্তু অধর্ম্মী (মুসলমান) রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে মামুদ সরিফ খিলাৎ পাইয়া অনেক অত্যাচার

---

* এই আর্‌ড়া গ্রাম বর্ত্তমান ঘাটাল থানার অধীন ও জেলা মেদিনীপুরের অন্তঃপাতী। আর্‌ড়ার ব্রাহ্মণ রাজা রঘুনাথের বংশধরগণ এখনও ঐ স্থানের ২ ক্রোশ দূরে "সেনাপতে" গ্রামে বাস করিতেছেন; তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি এখন বর্দ্ধমান রাজা দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। রঘুনাথরায়ের বর্ত্তমান বংশধর রামহরিদেবের অতি যৎসামান্য সম্পত্তি আছে।

করিয়াছিল'', ইত্যাদি। "শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা। সেইকালে দিলা গীত হয়ের বনিতা॥"—অর্থাৎ ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে, দামুন্যা হইতে পলাইয়া আসিবার পথে চণ্ডীদেবী কবিকে পুস্তকরচনার আদেশ প্রদান করেন। এই আদেশের ১১।১২ বৎসর পরে পুস্তক সমাধা করিয়া যখন কবি গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ লিখেন, তখন রাজা মানসিংহ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ সমস্ত প্রাচীন কবিই গ্রন্থ সমাধা করিয়া লিখিতেন। বটতলার ছাপা পুস্তকে ইহা পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া ইহা পূর্ব্বে রচিত হয় নাই,—"এই গীতি হইল যেমনে" কথাটি দ্বারাও দৃষ্ট হয় গীতি সমাপ্ত হওয়ার পরই মুখবন্ধটি রচিত হইয়াছিল। এখনও গ্রন্থরচনা শেষ হইলে লেখকগণ ভূমিকা লিখিয়া থাকেন। ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে কবির দামুন্যা ত্যাগ স্বীকার করিয়া তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর ধরিয়া লইলে অনুমান ১৫৩৭ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে তিনি জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। *

কবিকঙ্কণের পিতামহের নাম জগন্নাথমিশ্র, পিতার নাম হৃদয়মিশ্র। এই হৃদয়মিশ্রের উপাধি ছিল "গুণরাজ।" হৃদয়মিশ্রের পুত্রগণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মতভেদ আছে। কবি নিজে জানাইয়াছেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিচন্দ্র ছিলেন, কনিষ্ঠ রামানন্দের কথাও আমরা তাঁহার নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছি। "কবিচন্দ্র'' উপাধি কি আদত নাম তৎসম্বন্ধে মতের বিভিন্নতা আছে। শিশুবোধকে যে "অযোধ্যা-রাম'' কৃত "দাতাকর্ণ", পাওয়া যায়, সেই অযোধ্যারামই কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। আমাদের ধারণা, কবিচন্দ্রের নাম ছিল "নিধিরাম''। চণ্ডীকাব্যের হস্তলিখিত একখানি

* চণ্ডীকাব্য আরম্ভের সময় কবির বয়স ৪০ বৎসরের ন্যূন ছিল বলিয়া বোধ হয় না, এই কাব্যের প্রারম্ভে কবির পুত্রবধূ, জামাতার নাম ও পৌত্রের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে।

প্রাচীন পুঁথি আমার নিকট আছে, তন্মধ্যে "বন্দ মাতা সুরধুনী"-শীর্ষক গঙ্গাবন্দনাটি "দ্বিজ নিধিরামের" ভণিতাযুক্ত পাইয়াছি। সম্প্রতি নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়-সংগৃহীত একখানি গঙ্গাবন্দনার প্রাচীন পুঁথিতে "নিধিরাম" ভণিতা প্রকাশ পাইয়াছে।—(৪৩ নং পুঁথি)। মুকুন্দরামের রচিত পুস্তকে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা-কৃত গঙ্গাবন্দনাটি যোজনা করিয়া দেওয়া স্বাভাবিক। যাহা হউক এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা সম্ভব নহে। নিধিরাম, মুকুন্দরাম ও রামানন্দ এই তিন নামে 'রামের' ঐক্য আছে। শিশুবোধকে 'কবিচন্দ্র' প্রণীত দাতাকর্ণ আমরা পড়িয়াছি। ইহা ছাড়া বহু সংখ্যক প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে "কবিচন্দ্রের" ভণিতা দৃষ্ট হয়। সেই সকল পুস্তকের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা যথাস্থানে প্রদান করিব। "কবিচন্দ্র" পাইলেই মুকুন্দরামের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে জড়িত করা আমাদের সাহসে কুলায় না। বরঞ্চ সেগুলি যে মুকুন্দরামের ভ্রাতা কবিচন্দ্রের নহে, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; পরে তাহা লিখিব।

মুকুন্দরামের পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র "মীনমাংস" ত্যাগ করিয়া গোপাল আরাধনা করিয়াছিলেন,—কবির মাতার নাম 'দৈবকী', পুত্রের নাম 'শিবরাম', পুত্রবধূর নাম 'চিত্রলেখা', কন্যার নাম 'যশোদা' ও জামাতার নাম 'মহেশ' ছিল। এখনও কবিকঙ্কণের বংশধরগণ বর্দ্ধমানে রায়না থানার অধীন ছোটবৈনান গ্রামে বাস করিতেছেন। *

* কবির হস্তলিখিত পুঁথি দামুন্যায় এখনও রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে এই কয়েকটি ছত্র দৃষ্ট হয়,—"কুলে শীলে নিরবদ্য, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য, দামুন্যায় সজ্জনের স্থান। অতিশয় গুণ বাড়া, সুধন্য দক্ষিণ পাড়া, সুপণ্ডিত সুকবি সমান॥ ধন্য ধন্য কলিকালে, রত্নামু নদের কূলে, অবতার করিলা শঙ্কর। ধরি চক্রাদিত্য নাম, দামুন্যা করিলা ধাম, তীর্থ কৈলা সেই সে নগর॥ বুঝিয়া তোমার তত্ত্ব, দেউলা দিলা বৃষদত্ত, কতকাল তথায় বিহার। কে বুঝে তোমার মায়া, সুরকুল তেয়াগিয়া, বরদান করিলা

কবিকঙ্কণ সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার উপায় নাই। লহনা ও খুল্লনার বিবাদ উপলক্ষে—"একজন সহিলে কোন্দল হয় দূর। বিশেষিয়া জানেন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর॥" কবি এইভাবের একটি কুটিল ইঙ্গিত দ্বারা যেন বুঝাইয়াছেন, তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল। কবি তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়সহ মাণিকদত্ত নামক এক

সঞ্চার॥ গঙ্গা সম সুনির্ম্মল, তোমার চরণজল, পান কৈনু শিশুকাল হৈতে। সেইত পুণ্যের ফলে, কবি হই শিশুকালে, রচিলাম তোমার সঙ্গীতে॥ হরিনন্দী ভাগ্যবান্, শিবে দিল ভূমিদান, মাধব ওঝা ধামাধিকারিণী। দামুন্যার লোক যত, শিবের চরণে রত, সেই পুরী হরের ধরণী। * * কুলের আর, যশোমন্ত অধিকার, কল্পতরু নাগ উমাপতি। অশেষ পুণ্যকন্দ, নাগঋষি সর্ব্বানন্দ, সেই পুরী সজ্জন বসতি॥ কাঁটাদিয়া বন্দ্যঘাটী, বেদান্ত নিগম পাটী, ঈশানপণ্ডিত মহাশয়। ধন্য ধন্য পুরোবাসী, বন্দ্য সে বাঙ্গালপাশী, লোকনাথ মিশ্র ধনঞ্জয়। কাঞ্জারী কুলের আর, মহামিশ্র অলঙ্কার, শব্দকোষ কাব্যের নিদান। কয়ড়িকুলের রাজা, সুকৃতি তপন ওঝা, তস্য সুত উমাপতি নাম॥ তনয় মাধব শর্ম্মা, সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা, তার নয় তনয় সোদর। উদ্ধরণ পুরন্দর, নিত্যানন্দ সুরেশ্বর, বাসুদেব মহেশ সাগর॥ সর্ব্বেশ্বর অনুজাত, মহামিশ্র জগন্নাথ, একভাবে পূজিল শঙ্কর। বিশেষ পুণ্যের ধাম, সুধন্য হৃদয় নাম, কবিচন্দ্র তার বংশধর॥ অনুজ মুকুন্দ শর্ম্মা, সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা, নানা শাস্ত্রে নিশ্চয় বিদ্বান্॥ শিবরাম বংশধর, কৃপা কর মহেশ্বর, রক্ষ পুত্র পৌত্রে ত্রিনয়ান।"—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, কবিকঙ্কণের শিবরাম ভিন্ন অপর এক পুত্র ছিল, তাহার নাম পঞ্চানন এবং কবির বংশ এখন তিন স্থানে বাস করিতেছেন, ১ম দামুন্যায়, ২য় বীরসিংহে, ৩য় হুগলীর অন্তঃপাতী রাধাবল্লভপুরে। বিদ্যানিধি মহাশয় আরও বলেন, "কবিকঙ্কণের অধস্তন ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম ও দশম পুরুষ অদ্যাবধি জীবিত।"—পরিষৎ পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩০২, ১১৯ পৃষ্ঠা। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে—অনুসন্ধান, ১২৮৯ সাল মাঘ, ৩১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কবিকঙ্কণের বংশধর দামুন্যা নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে কবির স্বহস্তলিখিত পুঁথি গ্রহণ করিয়া 'সাহিত্য পরিষৎ' একটী নকল লইয়াছেন। ঐ পুঁথি সাহিত্য পরিষৎ ক্রয় করিয়াছিলেন; কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা লইয়া গৃহে চলিয়া গিয়াছেন। সে পুঁথি এখন পাওয়া যাইতেছে না।

অধ্যাপকের নিকট সঙ্গীত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, একথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। "পাথরকুচা"-নিবাসী গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণভূমির রাজসভায় "চণ্ডীকাব্য" প্রথম গান করিয়াছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে।

প্রথম শ্রেণীর চিত্রকর—দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্র।

কবিকঙ্কণ প্রথম শ্রেণীর কবি, কিন্তু তিনি যে সমাজের চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর। ষোড়শ শতাব্দীর জীবন্ত ইংরেজসমাজ আর সেই যুগের স্তিমিত সুখদুঃখের আলয় বঙ্গীয় কুটীর একরূপ দৃশ্য নহে। কিন্তু আল্লাইনশীর্ষে দ্বিযামার শশি-রশ্মি এবং পল্লী-গ্রামের বর্ষাপ্রপাতসিক্ত তরুগুল্ম, এই উভয় দৃশ্যে সৌন্দর্য্যের বিশেষ পার্থক্য থাকিলেও উভয়কেই উৎকৃষ্টভাবে অঙ্কন করিতে প্রথম শ্রেণীর তুলির প্রয়োজন। সেক্ষপীয়রের হাতে যে তুলি ছিল, মুকুন্দরামও সেই-রূপ এক তুলি লইয়া চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন, কিন্তু দৃশ্যগুলি একদরের নহে। এইদেশে ইতিহাসের মধ্য-অধ্যায়ে রাম, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, নল প্রভৃতি আদর্শ পুরুষগণের শ্রেণী একবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি রমণীদলের শ্রেণী কতকাংশে অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে।

নারী-চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব।

স্বামীর সঙ্গে বনগমন না করিলেও সেদিন পর্য্যন্ত বঙ্গীয় রমণীগণ হাস্যমুখে স্বামীর শ্মশানে পতঙ্গের ন্যায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিতা ফুল্লরা, খুল্লনা ও বেহুলাকে চিনিতে বিলম্ব হইলেও তাহারা সেই পৌরাণিক রমণীগণেরই ভগিনী এবং একবংশের লক্ষণাক্রান্ত। মুকুন্দরামের চণ্ডীতে পুরুষের পৌরুষ না থাকিলেও উৎকৃষ্ট রমণীচরিত্র বিরল নহে।

কাব্যে নাটকীয় কৌশল।

কাব্য লিখিতে লিখিতে যখন অন্তর্দৃষ্টি নির্ম্মল ও প্রতিভান্বিত হইয়াছে, তখন মুকুন্দরাম নিজে লেখনী ছাড়িয়া দিয়াছেন, চরিত্রগুলি হাস্যপরিহাস ও কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তিনি ভণিতায় নিজের নাম সই করিয়া গ্রন্থস্বত্ব স্থির

রাখিয়াছেন। এইভাবে যবনিকার পশ্চাতে যাইয়া সঙ্কেতে কার্য্য করা কতকটা প্রকৃতির নিজের কার্য্য করার ন্যায়। সাহিত্যে উৎকৃষ্ট নাটক-লেখকগণ মাত্র এই গুণ দেখাইয়া থাকেন ; মুরারিশীলের সঙ্গে কালকেতুর সাক্ষাৎকারের অংশটি দেখুন।—

"বেণে বড় দুষ্টশীল, নামেতে মুরারিশীল, লেখা জোখা করে টাকা কড়ি। পাইয়া বীরের সাড়া, প্রবেশে ভিতর পাড়া, মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি॥—খুড়া খুড়া ডাকে কাল-কেতু।—কোথা হে বণিকরাজ, বিশেষ আছয়ে কাজ, আমি আইলাম সেই হেতু॥ বীরের বচন শুনি, আসিয়া বলে বেণ্যানী, আজি ঘরে নাহিক পোদ্দার। প্রভাতে তোমার খুড়া, গিয়াছে খাতক-পাড়া, কালি দিব মাংসের উধার॥ আজি কালকেতু— যাহ ঘর।—কাষ্ঠ আন এক ভার, হাল বাকী দিব ধার, মিষ্ট কিছু আনিহ বদর। শুনগো শুনগো খুড়ী, কিছু কার্য্য আছে দেরী, ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী॥ আমার জোহার খুড়ী, কালি দিহ বাকী কড়ি, অন্য বণিকের যাই বাড়ী॥—বাপা এক দণ্ড কর বিলম্বন। সহাস্য বদনে বাণী, বলে বেণে নিতম্বিনী, দেখি বাপা অঙ্গুরী কেমন॥ ধনের পাইয়া আশ, আসিতে বীরের পাশ, ধায় বেণে খিড়কীর পথে। মনে বড় কুতূহলী, কাঁধেতে কড়ির থলী, হরপী তরাজু করি হাতে॥ করে বীর বেণেরে জোহার। বেণে বলে ভাই পো, এবে নাহি দেখি তো, এ তোর কেমন ব্যবহার॥ খুড়া—উঠিয়া প্রভাতকালে, কাননে এড়িয়া জালে, হাতে শর চারি প্রহর ভ্রমি। ফুল্লরা পসরা করে, সন্ধ্যাকালে যাই ঘরে, এই হেতু নাহি দেখ তুমি॥ খুড়া ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী।—হয়ে মোর অনুকূল, উচিত করিও মূল, তবে সে বিপদ আমি তরি॥ বীর দেয় অঙ্গুরী, বাণিয়া প্রণাম করি, জোঁখে রত্ন চড়ায়্যে পড়্যান। কুঁচ দিয়া করে মান, ষোল রতি দুই ধান, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥"

সোণা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল। ঘষিয়া মাজিয়া বাপা করেছ উজ্জ্বল॥ রতি প্রতি হইল বীর দশগণ্ডা দর। দুধানের কড়ি আর পাঁচগণ্ডা ধর॥ অষ্টপণ পঞ্চগণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ী। মাংসের পিছিলা বাকী ধরি দেড় বুড়ি॥ একুনে হইল অষ্টপণ আড়াই বুড়ি। কিছু চালু চালু খুদ কিছু লহ কড়ি॥ কালকেতু বলে খুড়া মূল্য নাহি পাই। যেজন অঙ্গুরী দিল দিব তার ঠাঁই॥ বেণে বলে দরে বাড়াইলাম পঞ্চবট। আমা সঙ্গে সওদা করি না পাবে কপট॥ ধর্ম্মকেতু ভায়া সঙ্গে ছিল নেনা দেনা। তাহা হইতে দেখি বাপা বড় সেয়ানা॥ কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া। অঙ্গুরী লইয়া আমি যাই

অস্ত পাড়া॥ বেণে বলে দরে বাড়াইলাম আড়াই বুড়ি। চালু খুদ না লইও গাণে লও কড়ি॥"

লহনার সঙ্গে খুল্লনা বিবাদ করিতেছে, কবির ইহা বর্ণনীয় বিষয়। কলহাকৃষ্টা প্রতিবেশিনীগণ,—"চুলাচুলি দুসতিনে অঙ্গনেতে ফিরে। চাহিয়া রহিল সবে নিবারিতে নারে॥ চাহিয়া রয়েছ কেন নাকে হাত দিয়ে। উচিত কহনা কেন ভাতার পুত খেয়ে॥"—শেষ দুটি উক্তি লহনার, কিন্তু কবির তাহা বলিবার অবকাশ নাই। মূল কথা কবি বর্ণনা আরম্ভ করিয়াই ঠিক বর্ণিত ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করেন ও সম্পূর্ণরূপে তদ্‌গত হইয়া পড়েন, তিনি তখন চক্ষে দেখিয়া লিখেন। ধনপতি চাঁদ বণিক্‌কে মাল্যচন্দন দেওয়াতে নিমন্ত্রিত বণিক্‌গণ ক্রুদ্ধ হইয়াছে। তাহাদের বাক্‌বিতণ্ডা ও কলহ কবি যেন দেখিতে দেখিতে নোট করিয়া গিয়াছেন,—

"এমন বিচার সাধু করি মনে মনে। আগে জল দিল চাঁদ বেণের চরণে॥ কপালে চন্দন দিয়া মালা দিল গলে। এমন সময়ে শঙ্খদত্ত কিছু বলে॥ বণিক্-সভায় আমি আগে পাই মান। সম্পদে মাতিয়া নাহি কর অবধান॥ যেকালে বাপের কর্ম্ম কৈল ধুসদত্ত। তাহার সভায় হৈল ষোলশত॥ ষোলশতের আগে শঙ্খদত্ত পাইল মান। ধুসদত্ত জানে ইহা চন্দ্র মতিমান॥ ইহা শুনি ধনপতি করিল উত্তর। সেইকালে নাহি ছিল চাঁদ সদাগর॥ ধনে মানে কুলে শীলে চাঁদ নহে বাঁকা। বাহির মহলে যার সাত ঘড়াই টাকা॥ ইহা শুনি হাসি কহে নীলাম্বর দাস। ধন হেতু হয় কিবা কুলের প্রকাশ॥ ছয়বধূ যার ঘরে নিবসয়ে রাঁড়। ধন হেতু চাঁদবেণে সভা মধ্যে ষাঁড়॥ চাঁদ বলে তোরে জানি নীলাম্বর দাস। তোমার বাপের কিছু শুন ইতিহাস॥ হাটে হাটে তোর বাপ বেচিত আমলা। যতন করিয়া তাহা কিনিত অবলা॥ নিরন্তর হাতাহাতি বারবধূর সনে। নাহি স্নান করি বেটা বসিত ভোজনে॥ কড়ির পুটলী সে বাঁধিত তিন ঠাঁই। সভা মধ্যে কহ কথা কিছু মনে নাই॥ নীলাম্বর দাস কহে শুন রামরায়। পসরা করিলে তাহে জাতি নাহি যায়॥ কড়ির পুটলী বাঁধি জাতির ব্যাভার। আঁটো ছোপড়া খাইলে নহে কুলের খাখার॥ নীলাম্বর দাস রামরায়ের শ্বশুর। ধনপতি গঞ্জি কিছু বলিল প্রচুর॥ জাতিবাদ হয় যদি তবে হই বঙ্ক। বনে জায়া ছাগ রাখে এ বড় কলঙ্ক॥"

খাঁটি সংসার-চিত্র।

আর একটি গুণ, মুকুন্দ কবি সংসারের খাঁটিরূপ ভিন্ন অন্য কিছু কল্পনা করেন না; তিনি মিথ্যা কল্পনার একান্ত বিরোধী। যেখানে বাধ্য হইয়া কোন দীর্ঘ রূপকথার অবতারণা করিয়াছেন, সেখানেও প্রকৃত রাজ্যের কথা দ্বারা

তাহা যথাসাধ্য সংযত ও সত্যের আভাযুক্ত করিয়া তুলিয়াছেন,—স্বপ্নের মধ্যে জীবনের রেখা আঁকিয়াছেন। পশুর সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধের অংশটি পাঠ করুন। কবির স্পষ্ট অঙ্গুলীসঙ্কেতে এই যুদ্ধের বর্ণনাটি আমার নিকট একটি গূঢ় ও মহিমান্বিত রাজনৈতিক বিপ্লবের কথার ন্যায় বোধ হইয়াছে। পশুগণ যুদ্ধে হারিয়া ভগবতীর নিকট কাঁদিতেছে—তাহাদের সঙ্গে চণ্ডীর কথোপকথন এইরূপ ঃ—

চণ্ডী—সিংহ তুমি মহাতেজা, পশু মধ্যে তুমি রাজা, তোর নখে পাষাণ বিদরে। শুনিয়া তোমার রা, কম্প হয় সর্ব্ব গা, কি কারণে ভয় কর নরে॥

সিংহ—বীর ক্ষত্রি অদ্‌ভুত, দ্বিতীয় যমের দুত, সমরে হানয়ে বীর রথ। দেখিয়া বীরের ঠাম, ভয়ে তনু কম্পমান, পলাইতে নাহি পাই পথ॥

চণ্ডী—আদি ক্ষত্রি তুমি বাঘ, কে পায় তোমার লাগ, পবন জিনিতে পার জোরে। তব নখ হীরাধার, দশন বজ্রের সার, কি কারণে ভয় কর নরে॥

ব্যাঘ্র—যদি গো নিকটে পাই, ঘাড় ভাঙ্গি রক্ত খাই, কি করিতে পারি আমি দূরে। ব্যর্থ নহে তার বাণ, একে একে লয় প্রাণ, দেখি বীরে প্রাণ কাঁপে ডরে॥

চণ্ডী—পশু মধ্যে তুমি গণ্ডা, উত্তম তোমার খাণ্ডা, বিরোধ না কর কার সনে। তুমি যদি মনে কর, প্রলয় করিতে পার, নরে ভয় কর কি কারণে॥

গণ্ডা—কালকেতু মহাবীর, দূর হতে মারে তীর, খড়্গে তার কি করিতে পারে। বীরের অস্ত্রের বেগে, বত্রিশ দশন ভাঙ্গে, পশুগণে মহামারি করে॥

চণ্ডী—তুমি হস্তী মহাশয়, তোমার কিসের ভয়, বজ্রসম তোমার দশন। তব কোপে যেই পড়ে, যমপথে সেই নড়ে, কেবা ইচ্ছে তব দরশন॥

হস্তী—দুই চারি ক্রোশ যায়, তবে মোর লাগ পায়, উলটিয়া শুণ্ডে মোরে খেঁচে। মোর পিঠে মারে বাড়ি, লয়ে যায় তাড়াতাড়ি, ছাগলের মূল্যে লয়ে বেচে॥ ইত্যাদি।

মনে হয় যেন, পশুযুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া মানুষীদ্বন্দ্বের কথারই আভাস দিয়াছেন,—যেন মুসলমান প্রতাপের সমীপে হীনবল হিন্দুশক্তির বিড়ম্বনাই কবির ইঙ্গিতে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। উদ্ধৃত অংশ হইতে এবিষয়ে আরও স্পষ্টতর আভাস আছে; ভালুক কাঁদিয়া বলিতেছে—"বনে থাকি বনে খাই জাতিতে ভালুক। নেউগী, চৌধুরী নহি, না রাখি তালুক॥" হস্তী বলিতেছে,—

"বড় নাম, বড় গ্রাম, বড় কলেবর। লুকাইতে স্থান নাই বীরের গোচর॥ পলাইয়া কোথা যাই, কোথা গেলে তরি। আপনার দন্ত দুটা আপনার অরি॥" ইত্যাদি।

মনুষ্যসমাজের ছায়া।

এই কবির লেখনীর বড় চমৎকার গুণ এই যে, উঁহার মন্ত্রপূত স্পর্শে পশু জগতে মানবীয় তত্ত্বের বিকাশ পায়। কবি প্রকৃতির পুষ্প পল্লবের বর্ণনাগুলিও মানুষী উপমা দ্বারা সজীব ও উপভোগযোগ্য করিয়া তুলেন—এই উপমাটি দেখুন, "এক ফুলে মকরন্দ, পান করি সদানন্দ, ধায় অলি অপর কুসুমে। এক ঘরে পেয়ে মান, গ্রামযাজি দ্বিজ যান, অন্য ঘরে আপন সম্ভ্রমে॥" কবির চিত্তে মনুষ্যসমাজ এত স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও গাঢ়বর্ণে মুদ্রিত ছিল যে,—জলে, স্থলে, গুল্ম লতায় এবং ইতর জীবসমূহের মধ্যেও তিনি সতত মানবীয় ভাবই প্রত্যক্ষ করিতেন।

দুঃখবর্ণনায় কৃতিত্ব।

কিন্তু কবিকঙ্কণ সুখের কথায় বড় নহেন, দুঃখের কথায় বড়। বড় বড় উজ্জ্বল ঘটনার মধ্যে অবিরত ফল্গুনদীর ন্যায় এক অন্তর্বাহী দুঃখ-সংগীতের মর্ম্মস্পর্শী আর্ত্তধ্বনি শুনা যায়। সুশীলার বারমাস্যা হইতে ফুল্লরার বারমাস্যা হৃদয়কে গভীরতর রূপে স্পর্শ করে। নিঃশব্দ করুণরস কাব্যখানিকে বিয়োগান্ত নাটকের গূঢ়মহিমাপূর্ণ করিয়াছে—সুখবসন্তকাল বর্ণনায়ও কবির প্রেমগীতির মলয় বায়ু পরাভূত করিয়া উদরচিন্তার আক্ষেপবাণী উঠিয়াছে। নানাবিধ দুঃখের কথা তাঁহার প্রতিভার চরণ-নূপুর কাড়িয়া লইয়া যেন গতি মন্থর করিয়া দিয়াছে।

পুরুষে পৌরুষের অভাব।

কবিকঙ্কণের পুরুষচরিত্রগুলিতে পুরুষোচিত উদ্যম ও স্বাবলম্বন বিরল,—ইহা কবির দোষ নহে, দেশের যেরূপ পুরুষসমাজ, কাব্যে আমরা তাহারই একখানি ছায়া প্রত্যাশা করিতে পারি; ঘটনাগুলি অদ্ভুত, কবি খুব বড় দরের পুরুষচরিত্র গঠন করিবার উপকরণ লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন। কিন্তু চরিত্রগুলি কেমন খাটো হইয়া গিয়াছে, ধনপতির চণ্ডীর

প্রতি অবজ্ঞা, নানারূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতন,—শ্রীমন্তের পিতৃভক্তি এবং বিপদের প্রতি উপেক্ষা, নানারূপ অবস্থান্তর, এগুলি কি মহামহিম নায়ক-চিত্র অঙ্কনের উপযোগী উৎকৃষ্ট উপকরণ নহে? অথচ কবি এই অবস্থাগুলি শিল্পীর মত সুকৌশলে ব্যবহার করিতে পারেন নাই,—দেবশক্তির প্রতি একান্তরূপ নির্ভরতা হেতু পুরুষচরিত্রগুলি স্বীয় শক্তির ভিত্তিতে দাঁড়াইতে পারে নাই। তাহারা অবস্থার ক্রীড়নকের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, কোন উন্নত চিন্তায় প্রণোদিত হইয়া তাহারা কোন উন্নত কার্য্যে বিব্রত হয় নাই; তাহাদের শক্তি, অদৃষ্ট ও দৈবশক্তির প্রতি অতিরিক্তমাত্র নির্ভরশীলতা-হেতু স্বাধীন ভাবে উদ্বোধিত হইতে অবকাশ পায় নাই।

কাব্য কেন্দ্র-শূন্য।

কবিকঙ্কণের বর্ণিত ঘটনার একটা মূলকেন্দ্র নাই; উৎকৃষ্ট নাটক বা কাব্যে ছোট বড় বিচিত্র ঘটনার স্রোত দৌড়াইয়া একটি মূলকেন্দ্রে পড়িয়া মিশিয়া যায়,—সেই মূল দৃশ্যের চতুষ্পার্শ্বে নানা ঘটনা ও চরিত্রের বিকাশ পায়; বিশেষ একটি অঙ্ক নানাশৃঙ্গবেষ্টিত কাঞ্চনজঙ্ঘার ন্যায় অধ্যায়সমন্বিত হইয়া সকলের উপরে স্বীয় অত্যুচ্চ আবেগের শীর্ষ দেখাইয়া থাকে। কবিকঙ্কণের দুই একটি মূল ঘটনা ধরিতে পারা গেলেও তাহাদের সঙ্গে অন্যান্য ঘটনার সেরূপ অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক দৃষ্ট হয় না। চণ্ডীকাব্য বিশৃঙ্খল একটি প্রাকৃতিক অরণ্যানীর ন্যায় তরু, গুল্ম, পুষ্প, গুহা,—সমস্ত একত্র এক দৃশ্যপটে দেখাইতেছে এই সৌন্দর্য্যের সাধারণ তন্ত্রে প্রত্যেক শোভাই নিরীক্ষণযোগ্য, কিন্তু বিশেষ কোন একটি অংশ অপূর্ব্ব সুদৃশ্য হয় নাই।

রমণী-চরিত্র।

কবিকঙ্কণের অন্য একবিধ গৌরব আছে। সরলা মিরেণ্ডা, স্নেহশীলা কর্ডেলিয়া, পতিপ্রাণা দেস্‌দেমনা ইঁহারা সহসা ঘটনা-বিশেষের মধ্যে পড়িয়া চরিত্রের বিকাশ দেখাইয়াছেন—ইঁহাদের নাম ইতিহাসের পত্রে অঙ্কিত হইবার

যোগ্য। কিন্তু বঙ্গীয় কবির ফুল্লরা ও খুল্লনার ন্যায় বিলাতি সুন্দরীগণ সুগৃহিণী নহেন; বঙ্গের কুঁড়ে ঘরে যে দৈনন্দিন সহিষ্ণুতার পরীক্ষা হয়, নিত্য প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিলেই আত্মোৎসর্গের যে মন্ত্র জপ করিয়া বঙ্গনারী-গণের গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে হয়, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং সেই মন্ত্র সহিষ্ণুতার সহিত অভ্যাস করা সকল স্থলে সম্ভবপর নহে,—এই স্থানে কাব্য ও নীতি-হিসাবে মুকুন্দ কবির নির্ব্বিরোধ শ্রেষ্ঠত্ব। আমরা এখানে চণ্ডীকাব্যের উপাখ্যানভাগ সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

কালকেতুর গল্প।

লোমশ মুনি।

লোমশ মুনি সমুদ্রের তীরে বসিয়া তপস্যা করিতেছিলেন; ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর তাঁহার নিকটে যাইয়া কহিলেন, "মুনি, আপনি শীতাতপ সহ্য করিয়া তপ করিতেছেন, একখানি কুটীর প্রস্তুত করিলে ভাল হয় না?" লোমশ উত্তরে বলিলেন, "কি হেতু বাঁধিব ঘর জীবন নশ্বর।"—(মা, চ)। নীলাম্বর প্রশ্ন করিলেন "মুনি আপনার আয়ু কত?"—উত্তরে—"লোমশ বলিল শুন, ইন্দ্রের তনয়। পরিচ্ছন্ন লোম মোর দেখ সর্ব্ব গায়॥ এক ইন্দ্রপাতে এক লোম হয় ক্ষয়। সর্ব্বলোম ক্ষয় হ'লে মরণ নিশ্চয়॥"—(মা, চ)। এই মহাপুরুষ তথাপি ঘর বাঁধিতে বিরত ছিলেন। ইঁহার কঠোর দার্শনিক উপেক্ষার নিকট আধুনিক সভ্যতার প্রকাণ্ডকাণ্ড কি একটা ঘোর পণ্ডশ্রম বলিয়া বোধ হয়!

নীলাম্বরের জন্ম-গ্রহণ।

নীলাম্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমর কে?" উত্তর—"একমাত্র শিব।" সুতরাং নীলাম্বর শিবসেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। নীলাম্বরের আহৃত পূজার ফুলগুলির মধ্যে একটি কীট ছিল, তাহার দংশন-জ্বালায় মহাদেব অস্থির হইয়া নীলাম্বরকে

শাপ দিলেন—"পৃথিবীতে গিয়া জন্মগ্রহণ কর।" তাঁহার স্ত্রী ছায়াও তৎসহ গমন করিল। মর্ত্ত্যলোকে এই দুই ব্যক্তিই কালকেতু ও ফুল্লরা। কিন্তু এই অলৌকিক অংশ মূল গল্পের কোন হানি করে নাই; পূর্ব্ব জন্মের একটি ব্যাখ্যা দেওয়া বৌদ্ধদিগের সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছিল; এখন আমরা মনুষ্যজীবনকে আদ্যন্তরহিত একটি বিচ্ছিন্ন প্রহেলিকার ন্যায় মনে করি, কিন্তু সেকালে কবিগণ জীবনের আদি অন্ত দেখাইয়া দিতেন।

বাল্যকাল।

কিন্তু সুখের বিষয়, নীলাম্বর, কালকেতু-অবতারে তাঁহার স্বর্গীয় বৈভবের কোন চিহ্ন লইয়া আসেন নাই। কালকেতুকে আমরা খাঁটি একটি ব্যাধরূপেই দেখিতেছি; শৈশবে তাহার শরীরে দুর্দ্দান্ত তেজ,—সে শশারু তাড়িয়া ধরিত, শিকার দূরে গেলে কুকুর দিয়া ধরাইত, পক্ষীগুলিকে বাঁটুল ছুঁড়িয়া মারিত; কালকেতু পঞ্চবর্ষেই—"শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল।"—(ক, ক, চ)। ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। সে কাব্যের প্রধান চরিত্র, কিন্তু মুকুন্দকবি তাহাকে বর্ণনা করিতে গগন হইতে চন্দ্র এবং স্থল হইতে বাঁধুলি কিম্বা পদ্মফুল লইয়া নাড়াচাড়া করেন নাই। তাহার "দুই বাহু লোহার সাবল"—(ক, চ)। সে যখন ভোজন করিতে বসে, তখন কবির উৎপ্রেক্ষা এইরূপ,—"শয়ন কুৎসিৎ বীরের ভোজন বিকার। গ্রাসগুলি তোলে যেন তেআঁটিয়া তাল॥" নায়কের প্রতি এরূপ অবমাননাকর কথা বলিতে এখনকার কবিগণ কখনই স্বীকৃত হইবেন না। মুকুন্দ ব্যাধের রূপ শাস্ত্রীয় প্রভায় সংস্কার করিতে চেষ্টা করেন নাই—কবির উপর স্বভাবের বিশেষ অনুকম্পা, তিনি সততই স্বভাবকে অবলম্বন করিতে পারিয়াছেন।

বিবাহ ও জীবনোপায়।

কালকেতু একাদশবর্ষ বয়সে বিবাহ করিলেন, সোমাইওঝা ঘটক-রূপে যখন সঞ্জয়ব্যাধের বাড়ীতে যাইয়া তাহার কন্যাটি দেখিতে চাহিলেন, তখন পিতা স্বীয় কন্যার মেঘবরণ চুল ও চাঁদবরণ মুখের প্রশংসা করেন নাই, তিনি

বলিলেন "এই কন্যা রূপে গুণে নাম যে ফুল্লরা। কিনিতে বেচিতে ভাল পারয়ে পসরা॥ রন্ধন করিতে ভাল এই কন্যা জানে। বন্ধুজন মিলিয়া ইহার গুণ গানে॥" (ক, চ)। এই স্থলে আমরা ফুল্লরাকে প্রথম দেখি। শিশু কালকেতুর বর্ণনাটি আমরা ইতিপূর্ব্বে একবার উদ্ধৃত করিয়াছি। যৌবনে কালকেতু নিত্য নিত্য বনে যাইয়া শিকার করিত; ব্যাঘ্রগুলিকে লেজ মোচড়াইয়া মারিত,—"দেবীর বাহন" বলিয়া সিংহকে বধ করিত না, কিন্তু ধনুকের বাড়ি দিয়া তাহাকে এরূপ শিক্ষা দিত যে,—"তৃষ্ণায় আকুল সিংহ পান করে নীর।"

ক্ষুধা ও খাদ্য।

সারাদিন শিকার করিয়া এক ভার মৃত পশুস্কন্ধে কালকেতু সন্ধ্যাকালে গৃহে ফিরিয়া আসিত; তাহার ভোজনটি খুব বিরাট রকমের ছিল, সে হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত, নেউলপোড়া, পুঁইশাক, কাঁকড়া প্রভৃতি খাইয়া নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিত,—"রন্ধন করেছ ভাল আর কিছু আছে?"—(ক, ক, চ)। স্বীকার করিতে হইবে, তখন ক্ষুধা ও খাদ্য উভয়ই প্রচুর ছিল।

চণ্ডীর বর।

এদিকে পশুগণ বিষম বিপদে পড়িয়া চণ্ডীদেবীর শরণাপন্ন হইল; তিনি বর দিলেন "কালকেতু আর তোমাদিগকে কিছু করিতে পারিবে না।"

পূর্ব্বাভাস।

সে দিন কালকেতু রীতিমত ধনু হস্তে বনে যাত্রা করিল; তাহার নিশ্চিন্ত অন্তঃকরণে দেবীর কৃপার পূর্ব্বাভাস নিঃশঙ্ক প্রফুল্লতার উদ্রেক করিতেছিল,—

"প্রভাতে পরিয়া ধড়া, শরাসনে দিয়া চড়া, খর খর কাছে তিনবাণ। শিরে বাঁধা জাল-দড়ি, কর্ণে ফটিকের কড়ি, মহাবীর করিল প্রয়াণ॥ দেখে কালকেতু সুমঙ্গল—দক্ষিণে গো, মৃগ, দ্বিজ, বিকশিত সরসিজ, বামে শিবা ঘটপূর্ণ জল॥ চৌদিকে মঙ্গল ধ্বনি, কেহ জ্বালে হোম বহ্নি, দধি দধি ডাকে গোয়ালিনী। দেখিল রুচির তনু, বৎসের সহিত ধেনু, পুরাঙ্গনা দেয় জয়ধ্বনি॥ দূর্ব্বা ধান্য পুষ্পমালা, হীরা নীলা মতিপলা, বামভাগে বারনিতম্বিনী॥ মৃদঙ্গ মন্দিরা রায়, কেহ নাচে, কেহ গায়, শুনে বীর হরি হরি ধ্বনি॥

কিন্তু হঠাৎ পথে স্বর্ণবর্ণ গোসাপ দেখিতে পাইল। গোসাপ যাত্রার পক্ষে শুভ চিহ্ন নহে; কালকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে ধনুর্গুণে বাঁধিয়া লইল, "যদি অন্য শিকার জোটে, তবে ইহাকে ছাড়িয়া দিব, নতুবা ইহাকেই শিকপোড়া করিয়া খাইব।"

দেবীর চক্রান্তে সেদিন ঘনঘোর কুজ্ঝটিকাতে বনপ্রদেশ আচ্ছন্ন হইল।

ব্যর্থ শিকারী।

কালকেতু সারাদিন ধনুঃশর হস্তে বনে বনে ঘুরিয়া কিছুই পাইল না—কংসনদীর তীরে অতবটুকু জল খাইয়া অবসন্ন দেহে বিশ্রাম করিতে বসিল, কিন্তু—

"...ঃ সম্বল চিন্তা মহাবীর লাগে। এক চক্ষে নিদ্রা যায়, এক চক্ষে জাগে॥"

ফুল্লরা শিকারের আশায় অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু কালকেতুর শূন্য হস্ত দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। কালকেতু

গৃহের বন্দোবস্ত।

আপাততঃ গোসাপটাকে "ছাল উতাড়িয়া শিকপোড়া" করিতে আদেশ করিল এবং সখীগৃহ হইতে ফুল্লরাকে কিছু ক্ষুদ ধার করিয়া আনিতে বলিল, তৎপর স্বয়ং ক্ষুণ্ণমনে বাসি মাংসের পসরা লইয়া গোলাঘাট অভিমুখে ধাবিত হইল।

ফুল্লরা বিমলার মাতার নিকট দুই কাঠা ক্ষুদ ধার করিল, দুই সখী একস্থানে বসিয়া একদণ্ড গৃহের আলাপ করিল, শেষে ফুল্লরাসুন্দরী ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

এদিকে গোসাপরূপিণী চণ্ডী পরমা সুন্দরী যুবতী হইয়া কুটীরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার রূপের প্রভায়

চণ্ডীর স্বমূর্ত্তিগ্রহণ।

"ভাঙ্গা কুড়্যা ঘরখানা করে ঝলমল। কোটীচন্দ্র প্রকাশিত গগনমণ্ডল॥" বিস্মিতা ফুল্লরা প্রণাম করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। চণ্ডী বলিলেন, তিনি সতিনীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া আসিয়াছেন; সেই ব্যাধ কুটীরেই তিনি থাকা স্থির করিয়াছেন। ফুল্লরা সেই ভাঙ্গা কুটীরে স্বামীর প্রেমের গর্ব্ব করিয়া সুখী ছিল;

তাহার উপবাস, দারিদ্র্য সকলই সহ্য হইয়াছিল, কিন্তু অদ্য চণ্ডীর রূপ দেখিয়া আশঙ্কায় মুখ শুকাইয়া গেল ;—"পেটে বিষ, মুখে মধু, জিজ্ঞাসে ফুল্লরা। ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল রন্ধনের ত্বরা॥" যতবার জিজ্ঞাসা করিল, ততবারই এক উত্তর, চণ্ডী সেই স্থানেই থাকিবেন। তখন মনের আশঙ্কা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ফুল্লরা-সুন্দরী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি নানা পৌরাণিক রমণীর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিতে লাগিল—"স্বামী ছাড়িয়া স্ত্রীলোকের এক দণ্ডও পরগৃহে থাকা উচিত নয়, আপনার এস্থান ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।" সে কত নৈতিক বক্তৃতা দ্বারা চণ্ডীদেবীকে প্রবোধ দি[illegible] চেষ্টা করিল—"সতিনী কোন্দল করে, দ্বিগুণ বলিবে তারে, অভিমানে ঘর [illegible] কেনি॥" "এ বিরহজ্বরে, যদি স্বামী মরে, কোন্ ঘাটে খাবে পানী॥"

ফুল্লরার দুশ্চিন্তা ও দেবীর রহস্য।

কিন্তু দেবীর নিঃশব্দ রহস্য-প্রিয়তা একটি অটল অভিসন্ধির [illegible] ধরিয়া উপায়হীনা ফুল্লরার সমস্ত অনুনয় বিনয় ব্যর্থ করিয়া দিল। ফুল্ল[illegible] নীতিবাক্যে ফিরাইতে না পারিয়া দারিদ্র্যের ভয় দেখাইতে লাগিল, "বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে দুঃখবাণী। ভাঙ্গা কুড়ে ঘর তালপাতের ছাউনি॥ ভেরাণ্ড[illegible] থাম তার আছে মধ্য ঘরে। প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥"—প্রভৃতি বর্ণ[illegible] পড়িলে এই রহস্যের অভিনয়ের মধ্যেও আমাদের কান্না পায়। জ্যৈষ্ঠে,— "বইচির ফল খেয়ে করি উপবাস।" "পসরা এড়িয়া জল খাইতে না পারি। দেখি[illegible] দেখিতে চিলে করে আধসারি॥" শ্রাবণে,—"কত শত খায় জোঁক, নাহি খায় ফণী[illegible] "দুঃখ কর অবধান। বৃষ্টি হৈলে কুড়ায় ভাসিয়া যায় বান॥" মাংসের পসরা লয়ে ফি[illegible] ঘরে ঘরে। আচ্ছাদন নাহি অঙ্গে স্নান বৃষ্টি নীরে॥" আশ্বিন মাসে,—"উত্তম বস[illegible] বেশ করয়ে বনিতা। অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা॥ কেহ না আদরে মাংস কে[illegible] না আদরে। দেবীর প্রসাদমাংস সবাকার ঘরে॥" কার্ত্তিক মাসে,—নিযুক্ত করি[illegible] বিধি সবার কাপড়। অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়॥" ফুল্লরার আছে কত কর্ম্মে[illegible] বিপাক। মাঘমাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক।" মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ। মালতী[illegible] মধুকর পিয়ে মকরন্দ॥ বনিতা পুরুষ দোঁহে পীড়িত মদনে। ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদরদহনে॥" এই বর্ণনাগুলির মধ্যে স্থলে স্থলে চণ্ডীদেবীকে ভয় দেখাইবার প্রকা[illegible] চেষ্টা আছে,—"কোন্ সুখে ইচ্ছিলে হইতে ব্যাধের নারী।"

কাঙ্গালিনীর এই দৈনিক কষ্টসহ মুর্ত্তিখানি বঙ্গীয় কুটীরে কিরূপ সুন্দর দেখাইতেছে! ফুল্লরা নিজের এই ঘোর দারিদ্র্যদুঃখ লজ্জায় কাহাকেও বলিত না,

সন্দেহে সৌন্দর্য্য।

কিন্তু এই রূপসী কামিনীকে উহা না জানাইলে সে ত গৃহ ছাড়ে না। ফুল্লরার নীরব পতিপ্রেমের এই সুন্দর বিকাশে আমরা প্রীত হই—কিন্তু তাহার অকারণ কাতরতায় ঈষৎ হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না।

তথাপি দেবী যাইবেন না, তাঁহার প্রচুর ধন আছে—তিনি ব্যাধ-কুটীরের দারিদ্র্য ঘুচাইবেন। আর তিনি ত নিজে ইচ্ছা করিয়া আসেন নাই—"এনেছে তোমার স্বামী বাঁধি নিজ গুণে।"* "হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ মহাবীরে।"

স্বামী ইঁহাকে নিজে লইয়া আসিয়াছেন, শুনিয়া উপায়হীনা অভিমানিনী ফুল্লরা মনের ভাব গোপন করিতে পারিল না।

দুইটি চিত্র।

"বিষাদ ভাবিয়া কাঁদে ফুল্লরা রূপসী। নয়নের জলেতে মলিন মুখশশী॥ কাঁদিতে কাঁদিতে রামা করিল গমন। শীঘ্রগতি গোলাঘাটে দিল দরশন॥ গদগদ বচনে চক্ষুতে বহে নীর। সবিস্ময় হইয়া জিজ্ঞাসে মহাবীর॥ শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা। কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কল্লি রতা॥"

ফুল্লরা—"সতা সতীন নাহি প্রভু তুমি মোর সতা। ফুল্লরার এবে হৈল বিমুখ বিধাতা॥ কি দোষ দেখিলা মোর জাগ্রত স্বপনে। দোষ না দেখিয়া কর অভিমান কেনে॥ কি লাগিয়া প্রভু তুমি পাপে দিলা মন। আজি হৈতে হৈলা তুমি লঙ্কার রাবণ॥ আজি হৈতে বিধাতা হইল মোরে বাম। তুমি হৈলা রাবণ বিপক্ষ হৈলা রাম॥ পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে। কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে॥ শিয়রে কলিঙ্গ রাজা বড় দুরাচার। তোমারে বধিয়া জাতি লইবে আমার॥" কালকেতু—"সুব্যক্ত করিয়া রামা কহ সত্য ভাষা। মিথ্যা হৈলে চোয়াড়ে কাটিব তোর নাসা॥" ফুল্লরা—"সত্য মিথ্যা বচনে আপনি ধর্ম্ম সাক্ষী। তিন দিবসের চন্দ্র দ্বারে বসি দেখি॥"

একদিকে ফুল্লরার সরল প্রেমপূর্ণ ভয়, অপরদিকে কালকেতুর নির্ম্মল অমার্জ্জিত চরিত্রে বৃথা সন্দেহজনিত ক্রোধ,—দুইটি বিপরীত ভাবের উদ্দাম অভিনয় চিত্রকরযোগ্য নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে।

* গুণের এখানে সরল অর্থ 'ধনুগুর্ণ', কিন্তু ফুল্লরা তাহা বোঝে নাই।

কালকেতু গৃহে আসিয়া দেখিল "ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর খানা করে ঝলমল। কোটি চন্দ্র বিরাজিত বদনমণ্ডল॥" বিস্মিত হইয়া কালকেতু বলিল, এই শ্মশান সমান ব্যাধগৃহে তুমি কে? ব্যাধ হিংসক, চতুর্দ্দিকে পশুর হাড় এই ঘরে—"প্রবেশে উচিত হয় স্নান।" এখানে তুমি কেন? এখানে রাত্রিবাস করা উচিত নহে,—লোকে মন্দ কথা বলিতে পারে। তুমি চল, আমি তোমাকে বাড়ী লইয়া যাইব। কিন্তু ব্যাধের স্বতঃপ্রবৃত্ত নৈতিক সাবধানতা ছিল, সে একাকী যাইবে না—"চল বন্ধুজনপথে, ফুল্লরা চলুক সাথে, পিছে লয়ে যাব ধনুঃশর।" দেবী উত্তর দিলেন না—চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কালকেতুর রাগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—"বড়র বহুরি তুমি বড় লোকের ঝি। বুঝিয়া ব্যাধের ভাব তোর লাভ কি॥" তথাপি চণ্ডী যান না, তখন ব্যাধ বলিল,—"চরণে ধরিয়া মাগি ছাড়গো নিলয়" এবং অবশেষে—"এত বাক্যে চণ্ডী যদি না দিলা উত্তর। ভানু সাক্ষী করি বীর যুড়িলেক শর॥" কিন্তু সহসা অপূর্ব্ব পুলকে ব্যাধ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেল, তাহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল—শরীর ঘন ঘন রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল—যে শর ছাড়িতে চাহিয়াছিল, তাহা ছাড়িতে পারিল না; শর ধনু হস্তে আটকিয়া গেল। তখন স্বামীর বিপদে ফুল্লরা সুন্দরী আসিয়া সহায় হইল,—"নিতে চাহে ফুল্লরা হাতের ধনুঃশর। ছাড়াইতে নারে রামা হইল ফাঁফর॥" এই সময় দেবী কৃপা করিয়া বলিলেন, "আমি চণ্ডী, তোমাকে বর দিতে আসিয়াছি।" এই স্বভাব-নির্ভীক সত্যবাদী ব্যাধ স্বীয় সামাজিক হীনতা ও অপরাধ স্মরণ করিয়া চির-বিনীত, সে চণ্ডীকে বলিতেছে,—"হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচ জাতি। কি কারণে মোর গৃহে আসিবে পার্ব্বতী।" তখন দেবী স্বীয় দশভুজামূর্ত্তি দেখাইয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন। সেই মূর্ত্তির বর্ণনাটি এস্থলে বড় সুন্দর হইয়াছে।

দেবীর প্রতি অভ্যর্থনা।

অতি-প্রাকৃত।

চণ্ডীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া ব্যাধ ও ফুল্লরা কাঁদিয়া পায় পড়িল।

চণ্ডীর দয়া।

চণ্ডী কালকেতুকে একটি অঙ্গুরী উপহার দিলেন, কিন্তু—"লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী।
এক অঙ্গুরীতে প্রভু হবে কোন্ কাম। সারিতে নারিবে প্রভু হইবে দুর্নাম।"
সুতরাং চণ্ডীদেবীকে আরও সাত ঘড়া ধন দিতে হইল, এই সাত ঘড়া ধন ফুল্লরা ও কালকেতু সমস্ত বহিয়া লইতে পারিল না; তখন কালকেতু তাহার অভ্যস্ত সরলতা সহকারে একটি অনুরোধ করিল,—
"এক ঘড়া ধন মা আপনি কাঁখে কর।" ক্ষীণাঙ্গী দেবী এক ঘড়া ধন নিজে কাঁখে তুলিয়া লইলেন; কিন্তু কালকেতু মূর্খ, দরিদ্র—তাহার মনে যে সমস্ত ভাব খেলা করিয়াছে, কবি তাহার কোনটিই গোপন করেন নাই—তাহার সরলতা, বর্ব্বরতা, মূর্খতা এবং চরিত্রবল এ সমস্তই ব্যাধ-নায়কেরই উপযোগী, অন্য কোন মানদণ্ডে তাহার তুলনা করিলে অন্যায় হইবে। যখন চণ্ডী ধনঘড়া লইয়া ধীরে ধীরে চলিতেছেন, তখন—
মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি। ধন ঘড়া লৈয়ে পাছে পলায় পার্ব্বতী।
এই সব বর্ণনায় এরূপ একটি সুন্দর অকৃত্রিমতার বিকাশ আছে, যাহা প্রথম শ্রেণীর কবি ভিন্ন অন্য কেহ দেখাইতে পারে না। মুরারিশীলের নিকট অঙ্গুরী ভাঙ্গাইবার স্থলটি স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইয়াছে। একদিকে

শঠে সরলে।

প্রবঞ্চক মুরারির কপট-ভদ্রতা-সূচক প্রশ্ন, অপরদিকে কালকেতুর সরল বন্ধুভাবের উত্তর ও নির্ভীক সত্যপ্রিয়তা তাহার বর্ব্বরতাকেও যেন প্রকৃত সুনীতির বর্ণে মার্জ্জিত করিয়াছে।

ইহার পর কালকেতু চণ্ডীর আদেশে গুজরাটের বন কাটাইয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিল। কিন্তু পরবর্ত্তী অংশে

মুকুন্দ ও মাধব।

মুকুন্দকবি তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারেন নাই। মুকুন্দের কালকেতু ব্যাধ, তাহার কালকেতু রাজা হইতে

শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কালকেতু কলিঙ্গাধিপতির সহিত যুদ্ধে হারিয়া, স্ত্রীর অনুরোধে শয়নপ্রকোষ্ঠে লুকাইয়াছিল—এ দৃশ্য দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। কবি বাঙ্গালী বীরকে বোধ হয় যথাদৃষ্ট তথা অঙ্কন করিয়াছেন, কিন্তু মাধবাচার্য্য কালকেতুর শেষ জীবন বেশ প্রশংসনীয় ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন; ফুল্লরা যখন স্বামীকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিতেছে, তখন কালকেতু বলিতেছে—"শুনিয়া যে বীরবর, কোপে কাঁপে থর থর, শুন রামা আমার উত্তর। করে লৈয়া শর গাণ্ডী, পূজিব মঙ্গলচণ্ডী, বলি দিব কলিঙ্গ ঈশ্বর॥ যতেক দেখহ অশ্ব, সকল করিব ভস্ম, কুঞ্জর করিব লণ্ড ভণ্ড। বলি দিব কলিঙ্গ রায়, তুষিব চণ্ডিকা মায়, আপনি ধরিব ছত্র দণ্ড॥"—(মা, আ, চ)। এবং যেখানে কালকেতু বন্দী অবস্থায় রাজসভায় প্রবেশ করিল, তখন—"রাজসভা দেখি বীর প্রণাম না করে।"—(মা, আ, চ)।

কলিঙ্গাধিপতিকে চণ্ডীদেবী স্বপ্নে আদেশ দিলেন,—"আমার ভৃত্য কালকেতু, তাহাকে আমি রাজগি দিয়াছি, তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দেও।" কলিঙ্গাধিপতি এই আদেশ অনুসারে কালকেতুকে মুক্তি প্রদান করিয়া স্বয়ং তাহাকে গুজরাটের সিংহাসনে দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত করিলেন।

ইহার পর সহসা একদিন কালকেতু 'নীলাম্বর হইয়া ও ফুল্লরা ছায়া হইয়া স্বর্গে গমন করিল।

ভাড়ু-দত্ত।

ধূর্ত্ততার প্রতিমূর্ত্তি।

উপাখ্যান-ভাগে একটি আবশ্যক ব্যক্তিকে বাদ দিয়া গিয়াছি। আমরা তাহাকে উপেক্ষা করিয়া যাই নাই, ভাড়ু দত্তকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিব, এইজন্য পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে কিছু লিখি নাই। ভাড়ু শকুনিশ্রেণীর ব্যক্তি,—ধূর্ত্ততার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। এই চরিত বর্ণনায় কবিকঙ্কণ হইতে মাধবাচার্য্য বেশী ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, আমরা মাধবাচার্য্যের কাব্যকে মূলতঃ অবলম্বন করিয়া ভাড়ু-চরিত বর্ণনা করিব।

ভাড়ু দত্তের বাড়ী গুজরাটের নিকট, বাড়ীতে লক্ষ্মীর কৃপা আঁটে না, —পরিবারের সকলেরই মধ্যে মধ্যে উপবাসী থাকিতে হয়। ভাড়ু দত্ত একদিন উপবাসে

ঘরের কথা।

বঞ্চন করিয়া প্রাতে স্বীয় স্ত্রীর নিকট কিছু খাবার চাহিতেছে,—"ভাড়ু দত্ত বলে শুন তপনদত্তের মা। ক্ষুধার কারণে মোর পোড়ে সর্ব্ব গা॥" তপনদত্ত ভাড়ুর পুত্র। ভাড়ুর গুণবতী ভার্য্যা ক্ষুধার্ত্ত স্বামীর প্রতি হাসিয়া বলিল,—"যেন মতে কথা কহ লোকে বলে আউল। কালি গেল উপবাস আজি কোথা চাউল॥"

তখন ভাড়ু দুঃখিত চিত্তে—"ভাঙ্গা কড়ি ছয় বুড়ি গামছা বাঁধিয়া। ছাওয়ালের মাথে বোঝা দিলেক তুলিয়া॥" "ভাঙ্গা কড়ি" দিয়া কি হইবে, পাঠক সে প্রশ্ন এখন করিবেন না।

বাজারে উপনীত হইয়া ভাড়ু প্রথমে ধনাপসারীর নিকট গেল, কয়েক সের চাউল চাহিল এবং বলিল "তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দিয়া যাব তোরে।" কিন্তু ধনা

ভাড়ু দত্ত বাজারে।

তাহাকে চিনিত, সে আগে কড়ি না পাইলে, চাউল দিবে না। কিন্তু ভাড়ু দত্ত তাহাকে নানা রূপ উৎপীড়নের ভয় দেখাইল, রাজার পাইকগণ তাহাকে মান্য করে, সে তাহাদিগের সাহায্যে ধনাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবে। ধনা ভয় পাইয়া বলিল—"পরিহাস করিলাম করি বাড়াবাড়ি। চাউল নিয়া যাও তুমি নাহি দিও কড়ি॥" শাক-বিক্রেতাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া এক বোঝা শাকশব্জি লাভ করিল—"কাণি দুই তিন ভূমি ইনাম্ দিব তোরে।" এইরূপ নানা ধূর্ত্ততা করিয়া সে লবণ ও তৈল আদায় করিয়া লইল; কিন্তু গুবাক বিক্রেতার সম্মুখে প্রথমে একটু জব্দ হইল, তাহাকেও টাকা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দেওয়ার কথা বলাতে সে বলিল,—"তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া মজুত আন গিয়া কড়ি। মজুর পাঠাইয়া গুয়া নিও তবে বাড়ী॥" তখন ভাড়ু দত্ত রাজদরবারে তাহার প্রতিপত্তির কথা বলিতে লাগিল;—স্বীয় গৌরবের নানা খ্যাতি করিয়া বলিল—রাজা তাহাকে গাড়ু, কম্বল

ও পাটের পাছড়া উপঢৌকন দিয়াছেন; বলা নিষ্প্রয়োজন এ সকলই মিথ্যা। গুবাক বিক্রেতাকে ভয় দেখাইয়া বলিল,—"প্রাতঃকালে প্যাদা পাঠাইব ঘরে ঘরে। পতাকা তুলিয়া দিব গাছের উপরে॥" এইভাবে গুবাক, চিড়া, মিঠাই, সন্দেশ প্রভৃতি নানা দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লইল। কিন্তু ঘোষের মা দধি বিক্রয় করিতেছিল, তাহার দধি ধরিয়া টানাটানি করাতে বৃদ্ধা তাহাকে কটুমুখে গালি দিতে লাগিল, ভাড়ু নানা উপায় জানে, সে তাহার কাণে কাণে বলিল,—"চোরা গরু লয়ে বুড়ি তোমার বসতি। বাদী হইয়াছে যত গ্রামের রায়তি॥" ভয়ে ঘোষের মার মুখ শুকাইয়া গেল। কিন্তু মৎস্য-বিক্রেতার কঠিন হস্ত হইতে মৎস্য আদায় করিতে গিয়া ভাড়ু প্রকৃতই জব্দ হইল; সে কোনরূপেই মৎস্য দিবে না। ভাড়ু যত বলিল, মৎস্য-বিক্রেতা ভ্রুকুটি-কুটিল মুখে সব অগ্রাহ্য করিল, শেষে ভাড়ু টানাটানি আরম্ভ করাতে দুইজনে মল্লযুদ্ধ লাগিল; এই যুদ্ধে,—"কচ্ছ হতে ভাড়ুদত্তের পড়ে কাণা কড়ি॥" "কাণা কড়ি পড়ে ভাড়ু বহু লজ্জা পায়। মৎস্য ছাড়িয়া তবে উঠিয়া পলায়॥"

এই গেল বাজারের পালা; তার পর ভাড়ু কালকেতুরাজাকে প্রতারণা করিতে গিয়াছে,—

রাজ-দরবারে।

"ভেট লয়ে কাঁচকলা, পশ্চাতে ভাড়ুর শালা, আগে ভাড়ুদত্তের প্রয়াণ। ফোঁটা কাটা মহাদম্ভ, ছেঁড়া জোড় কোঁচা লম্ব, শ্রবণে কলম লম্বমান॥ প্রণাম করিয়া বীরে, ভাড়ু নিবেদন করে, সম্বন্ধ পাতিয়া খুড়া বুড়া। ছেঁড়া কম্বলে বসি, মুখে মন্দ মন্দ হাসি, ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া॥ আইনু বড় প্রীত আশে, বসিতে তোমার দেশে, আগেতে ডাকিবে ভাড়ুদত্তে॥ যতেক কায়স্থে দেখ, ভাড়ুর পশ্চাতে লেখ, কুলশীল বিচার মহত্ত্বে॥ কহি আপনার তত্ত্ব, আমলহাঁড়ার দত্ত তিনকুলে আমার মিলন। ঘোষ ও বসুর কন্যা, দুই নারী মোর ধন্যা, মিত্রে কৈল কন্যার গ্রহণ॥ গঙ্গার দুকুল পাশে, যতেক কায়স্থ বৈসে, মোর ঘরে করয়ে ভোজন। ঝারি বস্ত্র অলঙ্কার, দিয়ে করে ব্যবহার, কেহ নাহি করয়ে রন্ধন।" ইত্যাদি।—ক, ক, চ।*

---

* ভাড়ুদত্তের প্রসঙ্গে এই স্থলটি মাত্র কবিকঙ্কণচণ্ডী হইতে উদ্ধৃত হইল; অন্যান্য অংশ মাধবাচার্য্যের চণ্ডী হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

সে কালকেতুর মন্ত্রিত্ব পদ পাইতে অভিলাষী। কালকেতু তাহাতে সম্মত হইল না; তখন ভাড়ু বকিতে আরম্ভ করিল,—কালকেতুর লোকজন যাইয়া ভাড়ুকে খুব প্রহার করিয়া দিল; তখন ভাড়ু— "পুনর্ব্বার হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা।" প্রভৃতি ভাবের গালি দিতে দিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল,—

"পথে পড়া ফুল পাইয়া মাথে তুলি দিল। হাসিতে হাসিতে ভাড়ু বাড়ীতে চলিল॥ বাড়ীর নিকটে গিয়া ডাকয়ে রমণী। সত্বরে আনিয়া দেও এক ঘটি পানি। প্রভুর বচন শুনি রমণী অস্থির। ভাঙ্গা ঘটিতে পুরি বাহির করে নীর॥ ভাড়ুরে দেখিয়া তার রমণী চিন্তয়। দেওয়ানেরে গেলা প্রভু ধূলি কেন গায়॥ ভাড়ু এ বোলয় প্রিয়া শুনহ কর্কশা। মহাবীর সনে আজি খেলিয়াছি পাশা॥ ক্রমে ক্রমে মহাবীর ছয় পাটী হারি। রসে অবশ হইয়া করে হুড়াহুড়ি॥ ধূলা ঝাড়ি বহুমতে পাইয়াছি রস। বীরের গায়েতে দিছি তার দুই দশ॥ কি বলিতে পারি প্রিয়া বীরের মাহাত্ম্য। যাহার পীরিতে বশ হৈল ভাড়ু দত্ত।"

স্ত্রীর নিকট কৈফিয়ৎ।

কিন্তু রমণীকে এই সুখকর প্রবোধ দিলেও ধূর্ত্তের হৃদয় ক্রোধে জ্বলিতেছিল; ইহার পর সে কলিঙ্গাধিপকে জানাইল যে, তাঁহার রাজ্যের নিকট একজন নীচজাতি ব্যাধ রাজ্য স্থাপন করিয়াছে এবং কৌশলে কলিঙ্গরাজকে উত্তেজিত করিয়া কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইল। এই যুদ্ধের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

প্রতিহিংসা।

যখন দুই রাজার পুনঃ সন্ধি হইল, তখন উভয়ের অনুমতিক্রমে নাপিত ভাড়ুর মস্তক অশ্বমূত্রে ভিজাইয়া লইল এবং মধ্যে মধ্যে ক্ষুর বাম পদের তলাতে ঘষিয়া মাথাটি বেশ করিয়া মুণ্ডন করিয়া দিল। মস্তক মুণ্ডনের পর নাগরিকগণ প্রত্যেকে এক এক বড়া ঘোল তাহার মাথায় ঢালিয়া দিয়া গেল; ছেলেরা গীত বাঁধিয়া তাহার পাছে পাছে গান গাহিয়া চলিল; "কাল হাঁড়ি ফেল্যা মারে কুলের বহুড়ী"—এতদবস্থায় ভাড়ুকে গঙ্গা পার করিয়া

ভাড়ুদত্তের শাস্তি।

দেওয়া হইল। কিন্তু শতবার ধৌত হইলেও অঙ্গারের মলিনত্ব ঘোচে না; গঙ্গাপার হইয়া,—"লোকের সাক্ষাতে ভাড়ু কহে মিথ্যা কথা। গঙ্গা সাগরেতে গিয়া মুড়ায়েছি মাথা॥ এ বলিয়া মাগি খায় নগরে নগরে।"

শ্রীমন্তের গল্প।

খুল্লনার জন্ম।

রত্নমালা অপ্সরী তালভঙ্গ দোষে লক্ষপতিবণিকের ঘরে খুল্লনা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

কৌতুকে বিপদ।

একদা উজানিনগরের যুবক ধনপতি-সদাগর শ্যামল প্রান্তরে ক্রীড়াচ্ছলে পায়রা উড়াইতেছিলেন; এই পায়রা খুল্লনার বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইল; ধনপতি পায়রা চাহিতে গেলেন, খুল্লনা জানিতে পারিল, ধনপতি তাহার খুড়তত ভগিনীর স্বামী, সুতরাং সম্বন্ধটিতে আমোদ করিবার সুযোগ ছিল; ঈষদুদ্ভিন্ন-যৌবনা খুল্লনা সুন্দর মুখখানি বিদ্রূপ-মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত করিয়া কৌতুক করিতে করিতে চলিয়া গেল; ধনপতির মাথা ঘুরিয়া গেল, তিনি দাঁড়াইয়া খুল্লনাকে বিবাহ করিবার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

লহনাকে প্রবোধ।

ধনপতি কুলে ও ধনে শ্রেষ্ঠ, কাব্য নাটক পড়িয়া পণ্ডিত; সুতরাং এ বিবাহে সম্মতি পাইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রথমা স্ত্রী লহনাসুন্দরীকে প্রবোধ না দিলে হয় না—সে ত এ কথা শ্রবণমাত্র অভিমানে মাতিয়া বসিয়া আছে—কথা বলে না;—

"লহনা লহনা বলি ডাকে সদাগর। অভিমানযুক্ত রামা না দেয় উত্তর॥ ইঙ্গিতে বুঝিল লহনার অভিমান। কপট সম্ভাষে সাধু লহনা বুঝান॥ রূপ নাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে। চিন্তামণি নাশ কৈলে কাঁচের বদলে॥ স্নান করি আসি শিরে না দাও চিরুণী। রৌদ্র না পায় কেশ শিরে বিঁধে পানি॥ অবিরত ঐ চিন্তা অন্য নাহি গণি। রন্ধনের শালে নাশ হইল পদ্মিনী॥ মাসী, পিসী, মাতুলানী, ভগিনী, সতিনী। কেহ নাহি থাকে ঘরে হইয়া রান্ধুনী॥ যুক্তি যদি দেহ মনে কহিবা প্রকাশি। রন্ধনের

তরে তব করি দিব দাসী॥ বরিষা বাদলেতে উননে পাড় ফুঁক। কর্পূর তাম্বুল বিনে রসহীন মুখ॥"

এই কথাগুলির মোহিনীশক্তিতে এবং একখানি পাটশাড়ী এবং চুড়ি গড়াইবার জন্য ৫ তোলা সোণা পাইয়া লহনা আর কোন আপত্তি করিল না।

লহনা-চরিত্র ; সপত্নী-প্রেম।

লহনা মোটের উপর মন্দ মেয়ে নহে, তবে বুদ্ধিটি বড় স্থূল ; তাহার প্রকৃতি সরল ও সুন্দর, কিন্তু কোন দুষ্ট চালাক লোকের হাতে পড়িলে নির্ব্বোধ লহনা খেলার পুতুলের ন্যায় আয়ত্ত হইয়া যায়, প্ররোচনায় সে নিতান্ত গর্হিত কর্ম্মও করিতে পারে।

বিবাহের পর ধনপতিকে রাজাজ্ঞায় প্রবাসে (গৌড়ে) যাইতে হইল, তখন দ্বাদশবর্ষীয়া খুল্লনাকে সাধু লহনার হাতে হাতে সঁপিয়া গেল। লহনা স্বামীর কথা মাথায় করিয়া খুল্লনাকে ভালবাসিতে লাগিল ; দুই দিনের মধ্যেই খুল্লনা সেই ভালবাসার আতিশয্যে অস্থির হইয়া উঠিল ;—

"সাধু গেল গৌড় পথে, লহনার হাতে হাতে, খুল্লনা করিয়া সমর্পণ। পালয়ে স্বামীর সত্য, জননী সমান নিত্য, খুল্লনারে করয়ে পালন॥ যবে ছয় দণ্ড বেলা, কুঙ্কুমে তুলিয়া মলা, নারায়ণ তৈল দিয়া গায়। যাহারা প্রাণের সখী, শিরে দেয় আমলকী, তোলা জলে স্নান করায়॥ আপনি লহনা নারী, শিরেতে ঢালয়ে বারি, পরিবার যোগায় বসন। করেতে চিরুণী ধরি, কুন্তল মার্জ্জন করি, অঙ্গে দেয় ভূষণ চন্দন॥ যবে বেলা দণ্ড দশ, হেম থালে ছয় রস, সহিত যোগায় অন্ন পান। ভুঞ্জয়ে খুল্লনা নারী, কাছে থোয় হেম ঝাড়ি, লহনার খুল্লনা পরাণ॥ ওদন পায়স পিঠা, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন মিঠা, অবশেষে ক্ষীরখণ্ড কলা। পরশে লহনা নারী, গায় দেখি ঘর্ম্ম বারি, পাখা ধরি ব্যজয়ে দুর্ব্বলা॥ অন্ন খায় লজ্জা করি, যদি বা খুল্লনা নারী, লহনা মাথার দেয় কিরা। দুসতীনে প্রেমবন্ধ, দেখিয়া লাগয়ে ধন্ধ, সুবর্ণে জড়িত যেন হীরা॥ লহনার ত সরল চরিত্রে গরল প্রবেশ করিতে বেশী সময় লাগে না। দুর্ব্বলাদাসী নির্জ্জনে বসিয়া খানিক এই চিন্তা করিল,—"যেই ঘরে দুসতীনে না হয় কোন্দল।

সে ঘরে যে দাসী থাকে সে বড় পাগল॥" "একের করিয়া নিন্দা যাব অন্য স্থান। সে ধনী বাসিবে মোরে প্রাণের সমান॥" তৎপর সে লহনাকে যাইয়া এই ভাবে উত্তেজিত করিল—"শুন শুন মোর বোল শুনগো লহনা। এবে সে করিলে নাশ আপনি আপনা॥ ঋজুমতি ঠাকুরাণী নাহি জান পাপ। দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কালসাপ॥ সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে। অবশেষে এই তোমায় বধিবে পরাণে॥ কলাপী-কলাপ জিনি খুল্লনার কেশ। অর্দ্ধ পাকা কেশে তুমি কি, করিবে বেশ॥ খুল্লনার মুখশশী করে ঢল ঢল। মাছিতায় মলিন তোমার গণ্ডস্থল॥ * * * ক্ষীণমধ্যা খুল্লনা যেমন মধুকরী। যৌবনবিহীনা তুমি হৈলা ঘটোদরী॥ আসিবেন সাধু গৌড়ে থাকি কতদিন। খুল্লনার রূপ দেখি হবেন অধীন॥ অধিকারী হবে তুমি রন্ধনের ধামে। মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে॥ নেউটিয়া আইসে ধন সুত বন্ধুজন। না নেউটে পুন দেখ জীবন যৌবন॥"

এই উপদেশ লহনার উপর উদ্দিষ্ট কাজ করিল ; সে ক্ষেপিয়া গেল ; —খুল্লনাকে স্বামীর চক্ষের বিষ করিতে নানা তন্ত্র মন্ত্র ও ঔষধ খুঁজিতে লাগিল। অবশেষে এক জালপত্র লইয়া খুল্লনার নিকট উপস্থিত হইল ; পত্রের মর্ম্ম এই—তুমি অদ্য হইতে ছাগল রাখিবে, ঢেঁকিশালে শুইয়া থাকিবে, এক বেলা আধপেটা ভাত খাইবে ও 'খুঁয়া বস্ত্র' পরিবে।

সরলে গরল।

এই স্থান হইতে খুল্লনার চরিত্র পরিষ্কাররূপে বিকাশ পাইয়াছে। খুল্লনার যেরূপ পতিভক্তি, সেইরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ; তাহারও একেবারে রাগ না আছে, এমন নহে, কিন্তু লহনা যেরূপ রাগে পাগল হইয়া যায়—রাগের বশীভূত হইয়া নিতান্ত একটা দুষ্কর্ম্মও করিয়া ফেলিতে পারে,—খুল্লনার চরিত্রে সেরূপ নির্ব্বোধ রাগ দৃষ্ট হয় না। জাল পত্র লইয়া লহনা উপস্থিত হইলে, সে তাহা একবারে অগ্রাহ্য করিল—ইহা তাহার স্বামীর লেখা নহে ; আর সে এমন কি পাপ করিয়াছে, যাহাতে তাহার উপর এই কঠিন দণ্ডাজ্ঞা হইতে পারে। লহনা বলিল—তুমি আসিবার পরেই তাঁহাকে দেশ ছাড়িয়া গৌড়ে যাইতে হইয়াছে, বোধ হয়

এইজন্য তিনি রাগিয়াছেন ; আর তিনি নিজ হাতে চিঠি না লিখিয়া হয়ত মুহুরি দিয়া লিখাইয়াছেন। খুল্লনা বলিল—ও কথা কিছু নহে, এ পত্র জাল। তখন লহনা রাগিয়া তাহাকে মারিতে গেল। খুল্লনা রাগী ছিল না, তবে সে নিতান্ত আত্মসমর্থন না জানিত, এমত নহে—"খুল্লনার অঙ্গুলী বিধির বিপাকে। দৈবাৎ লাগিল গিয়া লহনার বুকে॥ লহনা হইল তাহে যেন অগ্নিকণা। খুল্লনার দুই গালে মারে দুই ঠোনা॥" এইত ঘটনা ; তবে খুল্লনার "অঙ্গুলী" যে নিতান্তই "দৈবাৎ" লহনার বুকে লাগিয়াছিল, তাহা না-ও হইতে পারে। শেষে শুদ্ধ শারীরিক বলের প্রভাবে লহনারই জয় হইল, খুল্লনাসুন্দরী ভূলুণ্ঠিত হইল—"কাতরে খুল্লনা দেয় রাজার দোহাই॥"

খুল্লনা বনবাসিনী।

এই অবস্থায় খুল্লনাকে বাধ্য হইয়া ছাগল চরাইতে বনে বনে যাইতে হইল, ঢেঁকিশালে শুইতে হইল ও খুঁয়ার কাপড় পরিতে হইল। ছাগল রাখার সময় স্ফুরন্তযৌবনা খুল্লনাসুন্দরী গৃহের আড়াল হইতে বনের শ্যামল প্রদেশে আসিলেন ; যেথানে নানা বনফুল, সেথানে তাহাদেরই মত কামিনীর রূপ বিকাশ পাইল। তাহার ছেলি-রক্ষণের কষ্ট পড়িতে আমাদের হতভাগিনী ফুল্লরার কথা মনে পড়িয়াছে। ইহার বারমাসীতেও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়। এই দুঃখের সময় পিতা মাতা খুল্লনার কোন বিশেষ সংবাদ লয়েন নাই—"শুনিয়া খুল্লনা দুঃখে ছাড়য়ে নিঃশ্বাস। অবনী প্রবেশি যদি পাই অবকাশ॥" সুন্দরীর এই দুঃখের মুর্ত্তিখানা দেখুন—

"ধীরে ধীরে যায় রামা লইয়া ছাগল। ছাট হাতে, পাত মাথে, যেমন পাগল॥ নানা শস্য দেখিয়া চৌদিকে ধায় ছেলি। দেখিয়া কৃষাণ সব দেয় গালাগালি॥ শিরীষকুসুম তনু অতি অনুপাম। বসন ভিজিয়া তার গায় পড়ে ঘাম॥"

কিন্তু খুল্লনা এখন বিদ্যাপতি-বর্ণিত বয়ঃসন্ধির মনোহর অবস্থায় ; নব যৌবনাগমে খুল্লনা এই দুঃখ ভুলিয়া বসন্তকালে বিরহে মাতিয়া

গেল; বহিঃপ্রকৃতির উন্মাদকর সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের আবেগ মিশিয়া গেল।

"মন্দ মন্দ বহে হিম দক্ষিণ পবন। অশোক কিংশুকে রামা করে আলিঙ্গন॥ কেতকী ধাতকী ফোটে চম্পক কাঞ্চন। কুসুম পরাগে শ্লথ হৈল অলিগণ॥ লতায় বেষ্টিত রামা দেখিয়া অশোক। খুল্লনা বলেন সই তুমি বড় লোক॥ আমা হৈতে তোমার জনম দেখি ভাল। তোমার সোহাগে সখি বন কৈলা আলো॥" খুল্লনা ভ্রমরের নিকট করযোড়ে বলিল,—"চিত্ত চমকিত, যদি গাও গীত, খাও ভ্রমরীর মাথা॥" কিন্তু ভ্রমরের গুন্ গুন্ গুঞ্জরণ থামিল না, তখন খুল্লনা রাগিয়া ভ্রমরকে গালি দিতেছে,—"তুই মাতোয়াল, মোরে হৈলি কাল, না শুন বিনয়বাণী। ধুতুরার ফুলে, কিবা মধু পিলে, তাহা মনে নাহি গণি॥" কোকিলের কুহুস্বরে চমকিত হইয়া খুল্লনা কাঁদিয়া বেড়াইল; প্রকৃতির তরু পল্লব, পাখী, অন্য নিরাশ্রয়া খুল্লনা সকলেরই অধীনা, কোকিলকে বলিতেছে,—"সদাগর আছে যথা, কেন নাহি যাও তথা, এই বনে ডাক অকারণ।"

বঙ্গীয় গ্রাম্যসৌন্দর্য্য এই সব স্থলে উজ্জ্বল ও উপভোগ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পাঠক এই সব বর্ণনা পড়িতে পড়িতে বসন্তঋতুর নূতন হিল্লোল ও বনফুল-মত্ত হাওয়ার স্পর্শে সুখী হইবেন,—খুল্লনাকে বড় ভাল ও সুন্দর বোধ হইবে।

পথশ্রান্তা খুল্লনা এই সকল শোভা দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

চণ্ডীদেবীর বরপ্রদান।

চণ্ডীদেবী এইখানে খুল্লনাকে মাতৃরূপে দেখা দিয়া স্বপ্নে বলিলেন—"কত দুঃখ আছে ঝি তোমার কপালে। সর্ব্বশী ছাগল তোর খাইল শৃগালে॥ তোর দুঃখ দেখিয়া পাঁজরে বিঁধে ঘুণ। আজি লো লহনা তোরে করিবেক খুন।" খুল্লনা জাগিয়া দেখিল, সত্য সত্যই "সর্ব্বশী" ছাগলটি নাই,—তখন লহনার শাস্তির ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বনপ্রদেশ ঘুরিয়া বেড়াইল। এই সময় পঞ্চ কন্যা তাহাকে চণ্ডীপূজা শিখাইয়া গেল, চণ্ডী খুল্লনাকে দেখা দিলেন; অশ্রুনেত্রে চিরদুঃখিনী খুল্লনা চণ্ডীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"জন্মে জন্মে ছেলে তুমি হ'ও নিজ

জন। তোমা হতে দেখিলাম চণ্ডীর চরণ॥" চণ্ডী তাহাকে স্বামী পুত্রলাভের বর দিয়া চলিয়া গেলেন।

প্রত্যাগত প্রবাসী।

এতদিনে দুঃখের রাত্রি প্রভাত হইল, সে রাত্রি খুল্লনা বাড়ী যায় নাই; লহনার মনে অনুতাপ হইল, "স্বামী আমাকে হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন, খুল্লনাকে বনের কোন পশু মারিয়া ফেলে নাই ত?" প্রভাতে যখন খুল্লনা বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন লহনা তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় আদর ও যত্ন করিতে লাগিল; ধনপতির চরিত্র-বল বেশী কিছু ছিল না; সে গৌড়ে যাইয়া অসঙ্গত সুখে মত্ত হইয়া বাড়ী ভুলিয়াছিল; সেই রাত্রিতে খুল্ল-নাকে স্বপ্নে দেখিয়া বাড়ী যাওয়ার কথা মনে হইল। ধনপতি বাড়ী আসিলেন, তাঁহার আগমন সংবাদে লহনা স্বীয় শিথিল সৌন্দর্য্যকে যথা-সাধ্য টানিয়া বুনিয়া নূতন বেশভূষায় সজ্জিত করিতে বসিল; "শুয়াঠুটি" খোঁপা বড় সুন্দর করিয়া বাঁধিল কিন্তু—"মাছিতা বদনে দেখি দর্পণে চাপড়।" দর্পণ ভাঙ্গিলে সুন্দরীগণের মুখের মাছিতা ঘোচে কি? লহনা "মেঘ ডুম্বুর" কাপড় পরিয়া পরী সাজিয়া স্বামীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে গেল। এদিকে সে দিন অনেক লোক সাধুর ঘরে নিমন্ত্রিত; দুর্ব্বলা দাসী বিস্তর পয়সা চুরি করিয়াও বাজার হইতে অনেক আয়োজনপত্র সংগ্রহ করিয়াছে; সাধু খুল্লনাকে রাঁধিতে বলিলেন; লহনা তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল,—খুল্লনা কোন কাজের মেয়ে নহে, উহাকে পাক করিতে দিলে সব নষ্ট করিয়া ফেলিবে, খুল্লনা কেবল পাশা খেলিতে জানে—"নাহি রাঁধে, নাহি বাড়ে, নাহি দেয় ফুঁক। পরের রাঁধন খেয়ে চাঁদ পানা মুখ।" কিন্তু এই আপত্তিতে কোন ফল হইল না, খুল্লনাই রাঁধিতে গেল; দেবীর কৃপায় পাক বড় উত্তম হইল, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ধন্য ধন্য বলিল, কিন্তু—"বাসি পান্ত ভাত ছিল সরা দুই তিন। তাহা খাইয়া লহনা কাটাইল দিন॥" সকলকে খাওয়াইয়া দেবী-রূপিনী লক্ষ্মীবউ খুল্লনা লহনার নিকটে গেল,—"সম্ভ্রমে খুল্লনা আসি ধরিল

চরণে। ঘুচিল কোন্দল দোঁহে বসিল ভোজনে॥"—খুল্লনা এইরূপ ক্ষমাশীলা ছিল।

শয্যাগৃহের অভিনয়।

তার পর খুল্লনা সাধুর শয্যাগৃহে যাইবে। লহনা তাহাকে নানা যুক্তি দেখাইয়া নিবারণ করিল; কিন্তু খুল্লনা সেই সব যুক্তিপ্রবর্ত্তক অভিসন্ধি বেশ বুঝিতে পারিল ও গল্পচ্ছলে যুক্তিগুলির অসারতা দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে পতিগৃহে গেল।

শয্যাগৃহে সুন্দর কৌতুকের অভিনয় হইয়াছিল, খুল্লনা শয্যার নীচে পলাইয়া ছিল, তখন ধনপতির মুখে অনাহূত অনেক কবিত্বের কথা নিঃসৃত হইয়াছিল,—

"কহ খট্টা কোথা মোর খুল্লনা সুন্দরী। কহ না প্রদীপ কোথা মোর সহচরী॥ সত্য করি কহ কথা মধুকরবধূ। খুল্লনার কবরীতে পান কৈলা মধু॥ চিত্তের পুত্তলী যত আছে চারিভিতে। সবে জিজ্ঞাসয়ে সদাগর এক চিত্তে॥ এতদিন একলা আছিনু পরবাসে। স্বপ্নেতে খুল্লনা নারী বৈসে মোর পাশে॥ প্রবাস ছাড়িয়া আমি আসি নিজ ঘর। কি দিয়া সুন্দরী মোরে করিলা পাগল॥"

ক্রীড়াময়ী খুল্লনা ধরা দিল, স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে লহনা যত কষ্ট দিয়াছে, তাহা বলিতে লাগিল; শুনিয়া সাধু রাগে, দুঃখে জর্জ্জরিত হইল, কিন্তু সে লহনার নিকট নিজে অপরাধী—খুল্লনাকে পাইয়া লহনার প্রতি তাহার ভালবাসার হ্রাস হইয়াছিল, আর এদিকে রাত্রিশেষে যখন সাধু খুল্লনার ঘর হইতে বাহির হইতেছিল, তখন ঈর্ষা ও ক্রোধের প্রতিমূর্ত্তি লহনা দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল। "বা'র হতে লহনার চক্ষে চক্ষে ভেট। লজ্জায় লজ্জিত সাধু মাথা কৈল হেট॥" কি অপরাধহেতু রাগ করার পরিবর্ত্তে সাধু লজ্জিত হইল, পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন।

পিতৃশ্রাদ্ধে বিভ্রাট।

ইহার পরে পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ধনপতি নানা স্থান হইতে স্বজাতিবর্গ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল। এই বণিক্‌সমাজে মালা চন্দন দেওয়া লইয়া ঘোর কলহ বাঁধিয়া গেল, সে স্থলটি পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি; এই কলহের পরিণাম এই

দাঁড়াইল, সভায় প্রশ্ন হইল, "ধনপতি খুল্লনাকে কিরূপে গৃহে রাখিয়াছেন, সে বনে বনে ছাগল চরাইত।" "শুষ্কজলে মৎস্য আর নারীর যৌবন। বনান্তরে পায় যদি রজত কাঞ্চন॥ অযত্নে পাইলে তাহা ছাড়ে কোন্ জন। দেখিলে ভুলয়ে ইথে মুনিজনার মন॥" খুল্লনা যদি সতী হয়, তবে পরীক্ষা হউক, নতুবা আমরা আপনার বাড়ী থাইব না। ইহা শুনিয়া খুল্লনার পিতা লক্ষপতি কাতরভাবে রাজার দোহাই দিলেন। তাহা শুনিয়া—"বলে বেণে শঙ্খদত্ত, রাজবলে হয়ে মত্ত, জ্ঞাতিরে দেখাও রাজবল। জ্ঞাতি যদি অভিরোষে, গরুড়ের পাখা খসে, ইহার উচিত পাবে ফল॥" খুল্লনা যদি পরীক্ষা না দেয়, তবে ধনপতিকে এক লক্ষ টাকা দিতে হইবে, তবেই ভোজন হইতে পারে।

খুল্লনার পরীক্ষা।

জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের যে অবস্থায় বুদ্ধি টলিয়াছিল, অন্য উপায়হীন ধনপতির সেই অবস্থা। দুর্ব্বল বণিক্ গৃহে যাইয়া লহনাকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। "তুমি কেন খুল্লনাকে ছেলি রাখিতে বনে পাঠাইলে?" এবং খুল্লনাকে যাইয়া বলিল—"আমি লক্ষ টাকা দিব, তোমার পরীক্ষা দিবার কাজ নাই।" কিন্তু খুল্লনা সেরূপ মেয়ে নহে, সে বলিল এই লক্ষ টাকা তুমি অদ্য দিবে, তৎপর আর এক নিমন্ত্রণে আমাকে উপলক্ষ করিয়া দ্বিগুণ চাহিবে, তুমি কত দিতে পারিবে। আর এই কলঙ্ক আমি সহ্য করিতে পারিব না—
"পরীক্ষা লইতে নাথ যদি কর আন। গরল ভখিয়া আমি ত্যজিব পরাণ॥"

এইরূপে খুল্লনা সতী নিজ চরিত্রের দৃঢ়তা দেখাইয়া প্রফুল্লমুখে সভায় পরীক্ষা দিতে দাঁড়াইলেন; তাঁহাকে জলে ডুবাইতে চেষ্টা হইল,—সর্প দ্বারা দংশন করান হইল, প্রজ্বলিত লৌহদণ্ডে তাঁহাকে দগ্ধ করিতে চেষ্টা করা হইল, অবশেষে জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া খুল্লনাকে তন্মধ্যে রাখিয়া আগুন দেওয়া হইল; এইবার লক্ষপতি কাঁদিয়া উঠিল এবং ধনপতি শোকে বিহ্বল হইয়া আগুনে ঝাঁপ দিতে গেল।

কিন্তু শুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় এই জতুগৃহ হইতে খুল্লনাসতী আরও উজ্জ্বল

হইয়া বাহির হইলেন। এইবার শত্রুগণ পরাভব মানিয়া খুল্লনাকে প্রণাম করিল।

পুনশ্চ প্রবাসে।

এই ঘটনার কিছু পরে রাজভাণ্ডারে চন্দনাদি দ্রব্যের অভাব হওয়াতে রাজাজ্ঞায় ধনপতিকে সিংহল যাইতে হইল। ধনপতি "সাতডিঙ্গা" বোঝাই করিয়া দীর্ঘ প্রবাসের জন্য প্রস্তুত হইল। যাত্রার যে সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহা লগ্নাচার্য্য অশুভ বলিয়া নিন্দা করাতে,—"এমন শুনিয়া সাধু মুখ করে বাঁকা। নফরে হুকুম দিয়া মারে তারে ধাক্কা॥" খুল্লনা পতির শুভ কামনা করিয়া চণ্ডীপূজা করিতে বসিয়াছিল, সদাগর "ডাকিনী দেবতা" বলিয়া চণ্ডীর ঘটে লাথি মারিল।

সদাগর,—ইন্দ্রাণী পরগণা, ললিতপুর, ভাওসিঙের ঘাট, মেটেরি, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া চলিল; সে সময় সপ্তগ্রাম খুব প্রসিদ্ধ ছিল, বোধ হয় হুগলীর ততদূর উন্নতি হয় নাই। কবি সমুদ্রের মানচিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা কল্পনা ও কিম্বদন্তীর রেখায় অঙ্কিত, কিন্তু তন্মধ্যে দুএকটি ঐতিহাসিক তত্ত্ব দুর্লভ নহে,—"ফিরিঙ্গীর দেশখান বাহে কর্ণধারে। রাত্রিদিন বহে যায় হারমাদের ডরে॥" এই বাক্য দ্বারা বোধ হয়, দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলের পর্ত্তুগিজ দস্যুদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছে।

কমলে-কামিনী।

চণ্ডীর ঘটে সাধু লাথি দিয়াছিল, অকূল সমুদ্রে পাইয়া চণ্ডী তাহার শোধ তুলিলেন; তুফানে সাত ডিঙ্গার মধ্যে ছয় ডিঙ্গা মারা গেল; একমাত্র "মধুকর ডিঙ্গা" লইয়া সাধু সিংহলে পৌঁছিলেন। কিন্তু পথে কালীদহে দেবী এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখাইয়া সাধুর চক্ষু প্রতারিত করিলেন। সমুদ্রে ঘন ঘন বড় ঢেউ উঠিতেছে, অনন্ত জলরাশির বহুদূর ব্যাপিয়া এক সুন্দর পদ্মবন; তন্মধ্যে এক প্রফুল্ল পদ্মারূঢ়া পরমাসুন্দরী রমণী-মূর্ত্তি; তিনি এক হস্তে হাতী ধরিয়া গ্রাস করিতেছেন। এই উজ্জ্বল, আশ্চর্য্য ও অপ্রাকৃত দৃশ্য দেখিয়া সাধু

স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল ; হাতীশুদ্ধ সুন্দরীর ভরে প্রফুল্ল পদ্মের ক্ষীণাঙ্গ কাঁপিতেছিল ; সদাগরের সানুরাগ সহানুভূতি সেই বেপথুমতী নলিনীলতার উপর ; সে কৃপাপূর্ণ বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল,—"হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর।" যাহা হউক সদাগর ভিন্ন এদৃশ্য অপর কেহ দেখে নাই। সাধু সিংহলে গেলে সিংহলরাজ তাহাকে যথেষ্ট আদর ও প্রীতি দেখাইলেন। কিন্তু সদাগরের মুখে কমলবনে কমলিনীর হস্তী গিলিবার কথা শুনিয়া কাহারও প্রত্যয় হইল না। * রাজা ও সাধুর মধ্যে অঙ্গীকার পত্রের বিনিময় হইল, এই কমলবনের দৃশ্য দেখাইতে পারিলে রাজা তাহাকে অৰ্দ্ধরাজ্য দিবেন, নতুবা সাধু যাবজ্জীবনের জন্য বন্দী হইবে। সাধু রাজাকে লইয়া কালীদহে সেই দৃশ্য আর দেখিল না—এই উপলক্ষে সাধুর নৈরাশ্যসূচক সংগীত—"এ যে ছিল, কোথায় গেল, কমলদলবাসিনী! লোকলাজ ভয়ে বুঝি লুকাল শুভবদনী।" আমরা অশ্রুপূর্ণচক্ষে যাত্রায় শুনিয়াছি ; সাধুর যাবজ্জীবন কারাবাসের হুকুম হইল। কারাগারে চণ্ডী স্বপ্ন দেখাইয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন,—আমার পূজা করিলে তোর এ দুর্গতি মোচন হইবে। কিন্তু সাধু উত্তরে বলিল,—
যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী। মহেশ ঠাকুর বিনে অন্য নাহি জানি।"

---

* শ্রদ্ধাভাজন কোন সমালোচক এই আখ্যানটি লইয়া মুকুন্দরামের সৌন্দর্য্য-কল্পনায় খুঁত বাহির করিয়াছেন। এমন অসীম সমুদ্রের শোভা, এমন সুন্দর পদ্মবন, তন্মধ্যে এমন সুন্দরী রমণীমূর্ত্তি, এক মাত্র হস্তী গ্রাস করিবার বীভৎস কল্পনায় সৌন্দর্য্যের চিত্র খানি কবি একবারে কুৎসিত করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীকাব্য ধর্ম্ম-কাব্য, এই আখ্যান বর্ণিত চণ্ডীই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ও একান্ত আরাধ্য দেবতা। গজগ্রাসশীলা চণ্ডী দেবীর প্রসঙ্গ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত চণ্ডীকাব্যে দেবীর এই মূর্ত্তিই বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পূজামণ্ডপে ভাস্করহস্তে এই ভাবের মূর্ত্তিই গঠিত হইয়া পূজিত হইত ; কবি এই মূর্ত্তিকে স্বীয় তুলি দ্বারা, সংস্কার করিতে অধিকারী ছিলেন না। গণেশের শুণ্ড বর্জ্জন করিয়া তাঁহার দন্তের সঙ্গে মুক্তা কি দাড়িম্ববীজের উপমা দেওয়াও যেরূপ হাস্যকর হয়, এস্থলে কবির স্বীয় কল্পনাদ্বারা দেবীর মূর্ত্তি সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টাও তদ্রূপই [illegible] হইত।

এদিকে বাড়ীতে খুল্লনার এক পুত্র জন্মিল। প্রসব সময়ে লহনা নিজে বাজারে যাইয়া ধাত্রী ডাকিয়া আনিল ও খুল্লনার শুশ্রূষা করিতে কোনরূপ ত্রুটী করিল না। মালাধর নামক গন্ধর্ব্ব শিবের শাপে খুল্লনার গর্ভে শ্রীমন্ত হইয়া জন্ম লইলেন। শিশুটি বড় সুন্দর—"সাত আট যায় মাস, দুই দন্ত পরকাশ।" বালক সেই অর্দ্ধোদ্গত দন্ত দেখাইয়া নানা ভাবে হাসে ও ক্রীড়া করে; পঞ্চবর্ষ বয়সে শ্রীমন্ত ভাগবত শুনিয়া সহচরগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-অনুষ্ঠিত খেলাগুলি খেলিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীমন্ত বড় চঞ্চল। সহচর শিশুগুলি খুল্লনার নিকট নালিশ করিতেছে,—"করিয়া ক্রন্দন, বলে শিশুগণ, শুন গো শ্রীমন্তের মা। তোমার তনয়, মারয় সবায়, দেখ দেখ মারণের ঘা॥ সব শিশু মিলি, এক সঙ্গে খেলি, শ্রীমন্ত বড় দুরন্ত। দারুণ চাপড়ে, সব দন্ত নড়ে, লাঘবের নাহি অন্ত॥ ভুবন কিরণা, দুই ভাই কাণা, চক্ষে দিল বালি গুঁড়া। যাদব মাধব, দুভাই নীরব, দাম্বেগে হৈল খোঁড়া॥ খুল্লনা ঝাড়িয়া ধূলা, দিল হাতে নাড়ু কলা তৈল দিল সর্ব্বগায়" ইত্যাদি। কবি জানিতেন ক্রীড়াশীল অশান্ত ছেলেগুলি শেষে ভাল হয়; শ্রীকৃষ্ণজীবনের অশান্তপনার মাধুর্য্য হইতে বঙ্গের গৃহে গৃহে এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। ইহার পর শ্রীমন্ত পড়িতে গেল; পিঙ্গল-কৃত ছন্দের ব্যাখ্যা, মাঘ, ভারবি, জৈমিনিভারত, প্রসন্নরাঘব প্রভৃতি পুস্তকে অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার হইল।

শ্রীমন্তের জন্ম ও শৈশব।

একদিন তিনি গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পূতনা, অজামিল ইহারা গর্হিত আচরণ করিয়াও মুক্তি পাইল, কিন্তু শূর্পণখার মুক্তি হইল না কেন, তাহার কেবল নাক কাণই কাটা গেল; "নবধা ভক্তির মধ্যে আত্মদান বড়।" সেত সেই আত্মদান করিতে চাহিয়াছিল। গুরু উত্তরে বলিলেন, "এ সকল শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা।" কিন্তু শ্রীমন্ত এই উত্তর সন্তুষ্ট না হইয়া গুরুর প্রতি ঈষৎ পরিহাস-সূচক বাক্য প্রয়োগ করিলেন।

গুরু ও শিষ্য।

গুরু রাগে ক্ষেপিয়া গেলেন ও শ্রীমন্তকে নিতান্ত অসঙ্গত বাক্যে গালি দিতে লাগিলেন। শ্রীমন্ত গুরুর কুব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া উচিত উত্তর দিতে বিরত হন নাই, কিন্তু তাঁহার মাতার চরিত্র সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করাতে শ্রীমন্ত ক্রোধে দুঃখে বাড়ীতে যাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেই দিন তরুণবয়স্ক শ্রীমন্ত পিতার অনুসন্ধানে সিংহল-যাত্রার দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। রাজার অনুরোধ, মাতার কাতরতা কিছুতেই তাঁহাকে বিরত করিতে পারিল না। পুনরায় সাত ডিঙ্গা শ্রীমন্তকে লইয়া সিংহলাভিমুখে যাত্রা করিল।

সিংহল-যাত্রা।

আবার সেই নীল জলরাশির মধ্যে সেই সেই ঘটনা, কালীদহে আশ্চর্য্য কমলবন, সিংহলাধিপের নিকট যাইয়া সেই বৃত্তান্ত বলাতে সভাসদগণ ও রাজার অপ্রত্যয়; এবার এই পণ স্থির হইল—যদি শ্রীমন্ত কমলবন দেখাইতে পারেন, তবে রাজা তাঁহাকে অর্দ্ধরাজ্য ও নিজ কন্যা দিবেন, নতুবা দক্ষিণ মশানে তাঁহার শির কর্ত্তিত হইবে। শ্রীমন্ত রাজাকে লইয়া যাইয়া কমলবন দেখাইতে পারিলেন না, সুতরাং দক্ষিণ মশানে তাঁহার শিরশ্ছেদ হওয়ার উদ্যোগ হইল। স্নান করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীমন্ত জীবনের শেষে পিতা ও মাতা প্রভৃতির উদ্দেশে তর্পণ করিতে লাগিলেন; চক্ষের জলের সঙ্গে, তর্পণের জল মিশিয়া গেল,—

মশানে শ্রীমন্ত।

"তর্পণের জল লহ পিতা ধনপতি। মশানে রহিল প্রাণ বিড়ম্বে পার্ব্বতী॥ তর্পণের জল লহ খুল্লনা জননী। এ জনমের মত ছিরা মাগিল মেলানি॥ তর্পণের জল লহ খেলাবার ভাই। উজানী নগরে আর দেখা হবে নাই॥ তর্পণের জল লহ দুর্ব্বলা পুষিণী। তব হস্তে সমর্পণ করিনু জননী॥ তর্পণের জল লহ জননীর মা। উজানী নগরে আমি আর যাব না॥ তর্পণের জল লহ লহনা বিমাতা। তব আশীর্ব্বাদে মোর কাটা যাবে মাথা॥ সবাকারে সমর্পণ আপন জননী। এ জনমের মত ছিরা মাগিল মেলানি॥"

ইহার পরে নিবিষ্টমনে শ্রীমন্ত ভগবতীর চৌত্রিশঅক্ষরা স্তব করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে শ্রীমন্তের নৌকার বাঙ্গাল মাঝিগণের দুর্দ্দশা বর্ণনায় কবি বেশ পরিহাস-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন—"বাঙ্গাল কাঁদেরে হুড়ুর বাপই বাপই। কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই॥ * * * আর বাঙ্গাল বলে বাই হইল অনাথ। হর্ব্বধন গেল মোর হুকুতার পাত॥ আর বাঙ্গাল বলে বাই কইতে বড় লাজ। অলদি গুড়ি ব্যাসা গেল জীবনে কি কাজ॥ যুবতী যৌবনবতী ত্যজিলাম রোষে। আর বাঙ্গাল বলে দুঃখ পাই গ্রহদোষে॥ ইষ্ট মিত্র কুটুম্বের লাগে মায়া মো। আর বাঙ্গাল বলে না দেখিনু মাগু পো॥" *

বাঙ্গালদের কাতরতা।

বাঙ্গালগণকে লইয়া বিদ্রূপ বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম নহে; চৈতন্যপ্রভু এবিষয়ের প্রধান পাণ্ডা ছিলেন—চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থে দেখা গিয়াছে।

ইহার পরে চণ্ডীদেবী আসিয়া শ্রীমন্তকে কোলে লইয়া বসিলেন। রাজার সৈন্যগণ চণ্ডীর ভূতপ্রেতের হাতে মার খাইয়া পলাইল; রাজা সসৈন্যে পরাস্ত হইলেন। চণ্ডীর কৃপায় তিনি আশ্চর্য্য কমলবন দেখিলেন; পিতা পুত্রে মিলন হইল; শ্রীমন্ত রাজকন্যা সুশীলার পাণিগ্রহণ করিলেন।

চণ্ডীর কৃপা।

যখন পিতা পুত্র বাড়ীতে ফিরিতে ইচ্ছুক, তখন সুশীলা স্বামীকে সিংহলে আর একটি বৎসর থাকিতে প্রার্থনা করিল; এই উপলক্ষে সিংহলের বার মাসের সুখ বর্ণিত হইয়াছে, রাজকন্যা স্বামীকে সিংহলী সুখের চিত্র দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন,—বৈশাখে—"চন্দনাদি তৈল দিব সুশীতল বারি। সাঙলি গামছা দিব ভূষা কস্তুরি।" জ্যৈষ্ঠে—"পুষ্পশয্যা করি দিব চাঁদোয়া টানায়ে। হাস্য পরিহাসে যাবে রজনী বহিয়ে॥ আষাঢ়ে—দেখহ ঘন নাচয়ে ময়ূর। নবজলধর দৃষ্টে ডাকয়ে দাদুর॥ শুন প্রাণনাথ তুমি শুন প্রাণনাথ। নিদাঘে শীতল বড় তরুণীর হাত॥" শ্রাবণে—

সুশীলার বারমাস্যা।

---

*তর্পণের অংশ ও এই অংশ হস্তলিখিত পুস্তকে ঠিক এই ভাবে নাই। বটতলার পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।

"বিদেশ ত্যজিয়া লোক আইসে নারী পাশে। কেমনে কামিনী ছাড়ি যাবে পরবাসে॥" ভাদ্রে—"মশা নিবারিতে দিব পাটের মশারি। চামর বাতাস দিব হয়ে সহচরী; মধুঘরে প্রাণনাথ করাইব বাস। আর না করিহ প্রভু উজানীর আশ॥" ফাল্গুনে—"ফুটিবে পুষ্প মোর উপবনে। তথি দোলমঞ্চ আমি করিব রচনে॥ সখী মিলি গাব সবে বসন্তের গীত। আনন্দিত হয়ে গাব কৃষ্ণের চরিত॥" চৈত্রমাসে—"মালতী মল্লিকা চাঁপা বিছাইব খাটে। মধুপানে গোঙাইব সদা গীত নাটে॥" কিন্তু এই সকল সুখের চিত্র মাতৃদর্শন-ব্যাকুল পুত্রকে প্রলুব্ধ করিতে পারিল না। পিতা, পুত্র বাড়ী গেলেন, পথে ধনপতি জলমগ্ন ডিঙ্গাগুলি চণ্ডীর কৃপায় ফিরিয়া পাইলেন; তিনি চণ্ডী পূজা করিতে সম্মত হইলেন।

শেষ।

বাড়ী আসিয়া কমলবনে আশ্চর্য্য রমণীমূর্ত্তি দেখাইয়া শ্রীমন্ত দেশীয় রাজাকেও মুগ্ধ করিলেন এবং তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিলেন।

যথাকালে শাপভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ স্বর্গে ফিরিয়া গেলেন। পৃথিবীতে চণ্ডীর পূজা প্রচারিত হইল।

কবির ভাবের প্রগাঢ়তা।

চণ্ডীকাব্যের পূর্ব্বভাগে শিব-বিবাহাদি বর্ণিত হইয়াছে; এই অংশ নানা কবি নূতন করিয়া গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—ভারতচন্দ্রের অনুকরণটি তন্মধ্যে বিশেষ প্রশংসা-যোগ্য হইয়াছে। কিন্তু এক শ্রেণীর কবির কথার লালিত্যে কর্ণ মুগ্ধ হইয়া যায়, অপর এক শ্রেণীর ভাবের উচ্ছ্বাসে হৃদয় তৃপ্ত হয়; শুধু শব্দের মাধুর্য্য যে সকল পাঠকের নিকট কাব্যের উৎকর্ষের একমাত্র মানদণ্ড নহে, তাঁহাদের নিকট মুকুন্দরামের "কামভস্ম", "শিববিবাহ" প্রভৃতি অংশ গাঢ় রসের আকর বলিয়া বোধ হইবে; তিনি ভারতচন্দ্রের—পতি শোকে রতি কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে, ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।" প্রভৃতি উচ্ছ্বলিত কামকলাপূর্ণ পদ বিন্যাস ফেলিয়া সেই প্রসঙ্গে মুকুন্দরামের রতির,—মোর পরমায়ু লয়ে, চিরকাল থাক জীয়ে, আমি মরি তোমার বদলে" প্রভৃতি

সরল উক্তির মধ্যে প্রকৃত শোকের তীব্রত্ব বেশী অনুভব করিবেন। যাঁহারা শুধু ভাষার মিষ্টত্বের খোঁজ করেন, তাঁহারা জয়দেব ও ভারতচন্দ্র পাঠ করুন, চণ্ডীদাস ও কবিকঙ্কণের কবিতা স্বাদ করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই।

শিবায়ন।

শিবপ্রসঙ্গ।

শিবের গীত বঙ্গসাহিত্যে অতি প্রাচীন বিষয়। আমরা রতিদেব ও রঘুরামরায়কৃত "মৃগলুব্ধের" কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই পুস্তক ১৬৭৪ খৃঃ অব্দে রচিত। কালে শিববিবাহাদি ব্যাপার স্বতন্ত্র কাব্যের বিষয় না হইয়া প্রাচীন অনেকগুলি কাব্যের অংশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। পদ্মাপুরাণ ও চণ্ডীকাব্যগুলিতে "শিবের বিবাহ", "হরগৌরী-কোন্দল" প্রভৃতি গ্রন্থারম্ভে বর্ণিত হইতে দেখা যায়। এমন কি, খাঁটি কৃত্তিবাসের রচনা বলিয়া যে উত্তরকাণ্ড রামায়ণ সাহিত্যপরিষৎ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও শিবলীলা বর্ণিত হইয়াছে। এই শিবপ্রসঙ্গও কবিগণের উপর্য্যুপরি চেষ্টায় সুন্দররূপে বিকাশ পাইয়াছে। বৃদ্ধ ও তরুণীকে এক গৃহস্থালীর হলে জুড়িয়া দিলে যে সব দুর্গতি ঘটে, তাহা নির্ম্মল হাস্যের সহিত দর্শন করিয়া রামেশ্বর প্রভৃতি কবিগণ শিবপ্রসঙ্গ উপলক্ষে কয়েকখানি কৌতুককর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র একখানি শিবায়ন প্রণয়ন করেন। ইহার পরে দ্বিজ হরিহরের পুত্র শঙ্কর নামক কবিকৃত 'বৈদ্যনাথমঙ্গল' বিরচিত হয়। এই পুস্তকখানিও আকারে বৃহৎ। শিবপার্ব্বতীর ঝগড়া, শিবের চাষ আবাদের কথা, বর্ষারম্ভে ভগবতীর বিরহ, এবং মশা, জোঁক, প্রভৃতি উৎপাতের সৃষ্টি করিয়া শিবঠাকুরকে

ধান্যক্ষেত্র হইতে কৈলাসের কুঞ্জবনে আনিবার চেষ্টা, অকৃতকার্য্য হইয়া পার্ব্বতীর বাগ্দিনীবেশে শিবকে প্রতারণা করিবার চেষ্টা, বাগ্দিনীর প্রতি অনুরাগ, এবং তাহার পাণিগ্রহণের চেষ্টায় ভগবতীর ভীষণ ক্রোধ, নারদের যত্নে দম্পতীর ক্রোধশান্তি এবং মিলন, শিবের নিকট পার্ব্বতীর শঙ্খ পরিবার ইচ্ছা প্রকাশ, গৃহের অসচ্ছলতা নির্দ্দেশ করিয়া শিবের সেই অনুরোধ প্রত্যাখান, পার্ব্বতীর অভিমান এবং পিত্রালয়ে গমন, শাঁখারি বেশে শিবের হিমালয় যাত্রা এবং পার্ব্বতীর হস্তে শাঁখা পরান, উভয়ের পুনর্মিলন প্রভৃতি প্রসঙ্গ প্রায় সমস্ত শিবায়ন বা শিবমঙ্গলে বিবৃত হইয়াছে। কাব্যাংশে শঙ্কর কৃত 'বৈদ্যনাথ মঙ্গল' দ্বিজ ভগীরথের 'শিবগুণ-মাহাত্ম্য' এবং রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের 'শিবায়ন' হীন না হইলেও, বোধ হয়, বটতলার আশ্রয়লাভ করিয়াই অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে রচিত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের 'শিবায়ন'খানিই বঙ্গদেশে বিশেষ প্রচার-লাভ করিয়াছে।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ভট্টনারায়ণ বংশোদ্ভূত। ইঁহার প্রপিতামহের নাম নারায়ণ, পিতামহের নাম গোবর্দ্ধন, পিতার নাম লক্ষ্মণ ও মাতার নাম রূপবতী বরদাপরগণার অন্তর্গত যদুপুরগ্রামে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্বনিবাস ছিল; তিনি এই যদুপুরে বাস করার সময় "সত্যপীরের কথা" রচনা করেন; "পরে সত্যপীর বন্দী কহে কবি রাম। সাকীন বরদাবাটী যদুপুর গ্রাম॥" শেষে কবি মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা যশোমন্ত সিংহের সভাসদ হইয়া উক্ত পরগণাস্থিত অযোধ্যাবাড় গ্রামে বাস স্থাপন করেন। যশোমন্ত সিংহের উৎসাহে তিনি "শিব-সংকীর্ত্তন" কাব্য রচনা করেন। গ্রন্থের অনেক স্থলেই যশোমন্তসিংহের যশঃ প্রচারিত হইয়াছে; সেই সকল পদে জানা যায়, যশোমন্তসিংহের পিতামহের নাম রঘুবীর, পিতার নাম রামসিংহ ও পুত্রের নাম অজিতসিংহ; যশোমন্তসিংহ ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে

ঢাকার দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবায়নের ১৭৬৩ খৃঃ অঃ লিখিত একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং শিবায়ন ঐ সময়ের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। কবির দুই স্ত্রী ছিল, এক জনের নাম সুমিত্রা ও অপরের নাম পরমেশ্বরী; এতদ্ব্যতীত তাঁহার দুই ভ্রাতা শম্ভুরাম ও সনাতন.—পার্ব্বতী, গৌরী ও সরস্বতী এই তিন ভগিনী ও দুর্গাচরণাদি ছয় ভাগিনেয়ের কথাও তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

কাব্যবর্ণিত বিষয়

অন্যান্য পৌরাণিক কাব্যের ন্যায় শিবসংকীর্ত্তনেও দেবদেবীর বন্দনা, সৃষ্টিপ্রকরণ, দক্ষযজ্ঞ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন ইহাতে রুক্মিণীব্রত, বাণরাজার উপাখ্যান, প্রভৃতি বিষয়ের প্রাসঙ্গিক বর্ণনা আছে। বাগ্দিনীরূপে গৌরীর শিবকে প্রতারণার স্থলটি রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় কবির স্বকপোলকল্পিত মনে করেন; কিন্তু আমরা এই গ্রন্থের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে ভগবতীর ডোমিনীরূপে শিবকে প্রতারণা করিবার বিষয় পাঠ করিয়াছি। পূর্ব্বকালে পৌরাণিক বিষয়গুলি লইয়া অক্ষরজ্ঞ অনেক ব্যক্তিই কবিতা রচনা করিতেন, উপাখ্যানভাগের কোন্ অংশগুলি কোন্ কবি দ্বারা প্রথম কল্পিত হয়, তাহা খুঁজিতে যাওয়া এবং আঁধারে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করা একইরূপ কাজ।

শিবায়নে হাস্যরস।

রামেশ্বরের রচনা অতিরিক্ত অনুপ্রাস-দোষ-দুষ্ট, কিন্তু অনেক স্থলে নিবিড় অনুপ্রাস ভেদ করিয়া বেশ একটু স্বাভাবিক হাস্যরসের খেলা দৃষ্ট হয়। রামেশ্বর কোন গভীর ভাব উদ্রেক করিতে চেষ্টা করেন নাই, এজন্য তিনি কখনই খুব বড় কবি বলিয়া পরিচিত হইবেন না। কিন্তু "শিবসংকীর্ত্তনের" আদ্যন্ত কবির মার্জ্জিত মৃদুহাস্যের রশ্মিতে সুন্দর। কার্ত্তিক, গণেশ লইয়া শিব আহার করিতে বসিয়াছেন—এই উপলক্ষে কবি রহস্যের কুটিল আলোতে একটি অন্নপূর্ণা গৃহিণীর সুন্দর মূর্ত্তি দেখাইয়া লইয়াছেন—

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী। ত্বটি স্থতে সপ্ত মুঁখ পঞ্চ মুখ পতি॥ তিন জনে একুনে বদন হ'ল বার। গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার॥ তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়। এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়॥ শুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া নাকে। অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে॥ গুহ গণপতি ডাকে অন্ন আন মা। হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হয়ে খা॥ মুষিকী মায়ের বাক্যে মৌনী হয়ে রয়। শঙ্কর শিখায়ে দেন শিখিধ্বজ কয়॥ রাক্ষস ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে। যত পাব তত খাব ধৈর্য্য হব বটে॥ হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে। ঈষদুষ্ণ সুপ দিল বেসারীর পরে॥ লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্রের ঝি। সুপ হল সাঙ্গ আন আর আছে কি? দড়বড় দেবী এনে দিলা ভাজাদশ। খেতে খেতে গিরিশ গৌরীর গান যশ॥ সিদ্ধিফল কোমল ধুতুরা ফল ভাজা। মুখে ফেলে মাথা নাড়ে দেবতার রাজা॥ * * * * দিতে দিতে গতায়াতে নাহি অবসর। শ্রমে হলো সজল কোমল কলেবর॥ ইন্দু মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মবিন্দু সাজে। মৌক্তিকের শ্রেণী যেন বিদ্যুতের মাঝে॥ অন্নদানে গৃহিণীর এ আনন্দের ছবি এখন শিল্পশিক্ষা এবং উন্নত সাহিত্যিকরসপিপাসু রমণীবর্গের নিকট ভাল বোধ হইবে কি না জানি না। বৃদ্ধ স্বামীর লাঞ্ছনা শাখা পরার প্রসঙ্গে বেশ সুন্দররূপ বর্ণিত হইয়াছে; দেবী দুগাছি শাঁখা চাহিয়াছিলেন; শিব তাহা দিতে অপারগ, নিজের বাড়ীর অবস্থা সম্বন্ধে দেবীকে অনেক কথা বলিয়া শিব কিছু শ্লেষ সহকারে বলিলেন—"বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তারে। জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে॥" এই কথা দ্বারা শিব দেবীকে ভয় দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দেবী তাহার শোধ তুলিলেন,—"দণ্ডবৎ হইয়া দেবের দুটি পায়। কান্তসনে ক্রোধ করি কাত্যায়নী যায়॥ কোলে করি কার্ত্তিকেরে, হস্তে গজানন। চঞ্চল চরণে হৈলা চণ্ডীর চলন॥ গোড়াইল গিরিশ গৌরীর পিছু পিছু। শিব ডাকে শশিমুখী শুনে নাই কিছু॥ নিদান দারুণ দিব্য দিলা দেবরায়। আর গেলে অম্বিকা আমার মাথা খাও॥ করে কর্ণ চাপিয়া চলিল চণ্ডবতী। ভাবিল ভাইএর কিরা ভবানীর প্রতি॥ ধাইয়া ধূর্জ্জটি গিয়া ধরে দুটি হাতে। আড় হইয়া পশুপতি পড়িলেন পথে॥ "যাও যাও যত ভাব জানা গেল" বলি। ঠেলিয়া ঠাকুরে ঠাকুরাণী গেলা চলি॥ চমৎকার চন্দ্রচূড় চারিদিকে যায়। নিবারিতে নারিয়া নারদপাশে ধায়॥ রামেশ্বর ভাবে ঋষি দেখ বসে কি। পাথারে ফেলিয়া গেলা পর্ব্বতের ঝি॥" এই "পাথারে ফেলিয়া গেলা পর্ব্বতের ঝি।"

ছত্রে তরুণী ভার্য্যার শ্রীপাদ-পদ্মে বিক্রীত বৃদ্ধ গৃহস্থের মহা বিপদ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা একটু কৌতুক ও হাস্য উপভোগ করিয়া লইয়াছি, ইহা উচিত না হইলেও আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক কি না?

রামেশ্বরের সত্যপীর।

বহুদিন একত্রবাসনিবন্ধন হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পরের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কতকটা উদারভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। সত্যপীর নামক মিশ্রদেবতার পূজা সেই উদারতার ফল। হরিঠাকুর এই উপলক্ষে ফকিরী আল-খাল্লা গায় পরিয়াছেন ও উর্দ্দু জবানে বক্তৃতা দিতেছেন;—

"বিশ্বনাথ বিশ্বাস বুঝায়ে বলে বাছা। দুনিয়ামে এসাভি আদমি রহে সাঁচা॥ ভালা বাওয়া কাহে তেরা মৃত্যুকাল কাহে। রাত দিন যৈসা তৈসা সুখ দুঃখ হোয়ে॥ জানা গেও বাত বাওয়া জানা গেও বাত। কাপড়াত লেও আও মেরা সাথ॥ জাওত সত্যপীর মেরা জীওত সত্যপীর। তেরা দুঃখ দূর করতও হাম ফকির॥"

মনসাদেবীর ভাসান রচকগণ।

মনসার ভাসান লেখকবর্গ।
কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ।

মনসার গল্পেরও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বিজয়গুপ্ত এবং নারায়ণদেব প্রভৃতি আদিলেখকগণের দলে একদল নূতন কবি ভর্ত্তি হইলেন। এপর্য্যন্ত আমরা মনসার ভাসানরচক ৬২জন কবির নাম জানিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদান করিতেছি;—

১। কাণাহরিদত্ত, ২। নারায়ণদেব, ৩। বিজয়গুপ্ত, ৪। রঘুনাথ, ৫। যদুনাথ পণ্ডিত, ৬। বলরাম দাস, ৭। জগন্নাথসেন, ৮। বংশীধন, ৯। দ্বিজবংশীদাস, ১০। বল্লভঘোষ, ১১। বিপ্রহৃদয়, ১২। গোবিন্দদাস, ১৩। গোপীচন্দ্র, ১৪। বিপ্রজানকীনাথ, ১৫। দ্বিজবলরাম, ১৬। কেতকাদাস, ১৭। ক্ষেমানন্দ, ১৮। অনুপচন্দ্র, ১৯। রাধাকৃষ্ণ, ২০। হরিদাস, ২১। কমলনয়ন, ২২। সীতাপতি, ২৩। রামনিধি,

২৪। করিচন্দ্রপতি, ২৫। গোলোকচন্দ্র, ২৬। কবিকর্ণপূর, ২৭। জানকী-নাথ দাস, ২৮। বর্দ্ধমান দাস, ২৯। ষষ্ঠীবর সেন, ৩০। গঙ্গাদাস সেন, ৩১। রামবিনোদ, ৩২। আদিত্য দাস, ৩৩। কমললোচন, ৩৪। কৃষ্ণানন্দ, ৩৫। পণ্ডিত গঙ্গাদাস, ৩৬। গুণানন্দ সেন, ৩৭। জগৎবল্লভ, ৩৮। বিপ্রজগন্নাথ, ৩৯। জগমোহন মিত্র, ৪০। জয়দেব দাস, ৪১। দ্বিজজয়-রাম, ৪২। নন্দলাল, ৪৩। বাণেশ্বর, ৪৪। মধুসূদন দে, ৪৫। বিপ্ররতি দেব, ৪৬। রতিদেব সেন, ৪৭। রমাকান্ত, ৪৮। দ্বিজরসিকচন্দ্র, ৪৯। রাজা রাজসিংহ (সুসঙ্গ), ৫০। রামচন্দ্র, ৫১। রামজীবন বিদ্যাভূষণ, ৫২। বিপ্ররাম দাস, ৫৩। রামদাস সেন, ৫৪। দ্বিজবনমালী, ৫৫। বন-মালীদাস, ৫৬। বিপ্রদাস, ৫৭। বিশ্বেশ্বর, ৫৮। বিষ্ণুপাল, ৫৯। সুকবি দাস, ৬০। সুখদাস, ৬১। সুদাম দাস, ৬২। দ্বিজহরিরাম।

এই মনসার ভাসানরচকদিগের মধ্যে কেতকাদাস—ক্ষেমানন্দের ক্ষুদ্র পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। পুস্তকখানি ২৬০০শ্লোকে পূর্ণ, ও ইহার পদসংখ্যা ৬৬; তন্মধ্যে ২৬টি পদ কেতকাদাসের ভণিতাযুক্ত, অবশিষ্ট ৪০টি ক্ষেমানন্দদাসের নামাঙ্কিত। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, পুস্তকের প্রথমার্দ্ধের অর্থাৎ লখীন্দরের বিবাহপালা পর্য্যন্ত অধিকাংশস্থল কেতকদাসের ও শেষার্দ্ধের অধিকাংশস্থল ক্ষেমানন্দের ভণিতাযুক্ত। ক্ষেমানন্দ করুণরসে ও কেতকাদাস হাস্যরসে পটু। কবিত্ব দেখাইয়া পাঠকবর্গকে সন্তুষ্ট করা যায়, এরূপ অংশ মনসার ভাসানে বড় বিরল; কিন্তু গল্পের আগাগোড়া পড়িলে পাঠকের চক্ষু মধ্যে মধ্যে অশ্রুপূর্ণ হইতে পারে, এবং বেহুলা সতীর সুন্দর রূপে চিত্ত মুগ্ধ হইয়া যাইতে পারে। আমরা যখন এই পুঁথি প্রথম পড়িয়াছিলাম, তখন মানবী বেহুলাকে দেবী বলিয়া বোধ হইয়াছিল; বেহুলার পাতিব্রত্যের কথা পড়িতে পড়িতে ভাবিয়া-ছিলাম—বাঁধুলী, তিল ফুল ও চতুর্দ্দশীর চাঁদ দিয়া কবিগণ সচরাচর

বেহুলা-চরিত্র।

যে সব সুন্দরী সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহাদের অনেকে বেহুলার বাঁদী হইবার যোগ্যা নহে। শ্রাবণমাসে বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে সর্ব্বত্র ভাসান গান উপলক্ষে নৌকা লইয়া ক্রীড়া হইত; সেই সব গানের মূল্ লক্ষ্য ছিল বেহুলা;—সেই গীত নানা রাগ রাগিণীতে উজ্জ্বল হইয়া পল্লী-বধূগণের হৃদয়ে হৃদয়ে বেহুলা সতীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিত;—আমরা এখন রেবেকা ও কসেটির রূপে মুগ্ধ হইয়া ঘরের খাঁটি সোণার মূর্ত্তিকে পূজা করিতে ভুলিয়াছি!

কবিদ্বয়ের পরিচয়।

পূর্ব্ববর্ত্তী মনসার উপাখ্যানগুলির সঙ্গে তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে, কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের পুঁথিতে চাঁদসদাগরের উন্নত চরিত্র কতকটা খর্ব্ব হইয়াছে, কিন্তু বেহুলার চরিত্র আরও বিকাশ পাইয়াছে।

কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ সম্ভবতঃ কায়স্থ ছিলেন, একস্থলে কেতকা-দাসের ভণিতায় সমস্ত কায়স্থকুলের প্রতি আশীর্ব্বাদসূচক—"কেতকার বাণী, রক্ষ ঠাকুরাণী, কায়স্থ যতেক আছে।" পাওয়া গিয়াছে, অপর এক স্থলে "ব্রাহ্মণ-চরণে, ক্ষেমানন্দ ভণে, দেবী যারে কৃপা কৈল।"—দৃষ্ট হয়, ইহা দ্বারা কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের কায়স্থ জাতিত্ব প্রতীয়মান হয়। অন্য দুইটি পদ্দ দৃষ্টে বোধ হয়, ক্ষেমানন্দ দাসের রাজীব ও অভিরাম নামক দুই পুত্র ছিল—"ক্ষেমানন্দ কহে কবি। রাজীবে রাখিবে দেবী॥" বেহুলার জলপথে ভ্রমণ উপলক্ষে বর্দ্ধমান অঞ্চলের স্থান নির্দ্দেশ যথাযথ হইয়াছে, অন্য দেশের তদ্রূপ হয় নাই, সুতরাং কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ বর্দ্ধমানবাসী ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এক স্থলে "ক্ষেমানন্দ বিরচিল সেবিয়া ব্রাহ্মণী" পদে তিনি কোন ব্রাহ্মণীর শিষ্য ছিলেন এরূপ অনুমিত হয়।

কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের আত্মবিবরণযুক্ত নিম্নলিখিত বিবরণটী পাওয়া গিয়াছে।

"সুন ভাই পুর্ব্ব কথা, দেবী হৈলা বরদাতা,
সহায় পুর্ব্বক বিষহরী।
বলিভদ্র মহাশয়, চন্দ্রহাসের তনয়;
তাহারে তালুকে ঘর করি॥
তাহার রাজত্ব শেষ, চলি গেল স্বর্গদেশ,
তিন পুত্রে দিএ অধিকার।
শ্রীযুক্ত আস্কর্ণরায়, পুত্রের অধিক তায়,
রণে বনে বিজয়ী তাহার॥
তিন পুত্র অল্প বয়, প্রসাদ গুরুমহাশয়,
তালুকের করে লেখা পড়া।
তাহার তালুকে বৈসে, প্রজা নাই চাস চসে,
শমন নগর হইল কাঁথড়া॥
রণে পড়ে বারা খাঁ, বিপাকে ছাড়িল গাঁ,
যুক্তি করেন জনে জন।
দিন কত ছাড়িয়া জাই, তবে সে নিস্তার পাই,
সকলের তবে ভাল জান॥
শ্রীযুত আস্কর্ণ রাএ, অনুমতি দিল তাএ,
যুক্তি দিল পালাবার তরে।
তার যুক্তি সুনি বাণী, পলাএ অনেক প্রাণী,
বড়ই প্রমাদ হৈল পুরে॥
মনে ভাবি সবিস্ময়, বেলা আছে দণ্ড ছয়,
সঙ্গে লয়্যা অভিরাম ভাই।
অবসান হ'ল বেলা, গ্রামের উত্তর জলা,
খড় কাটিবারে তথা যাই॥
তথায় ছাওল পাঁচে, খোলা দিয়ে জল সিঁচে,
মৎস্য ধরে পঙ্কেতে ভূষিত।
আমার কৌতুক বড়, ছাওাল পাঁচেতে জড়,
সেইখানে হইলাম উপনীত॥

মৎস্য লইআ অভিরাম, চলিল আপন ধাম,
যত শিশু গেল নিজ পুরে।
* * *
মুচিনীর বেশ ধরি, বলেন দেবী বিষহরী,
কাপড় কিনিতে আছে টাকা।
এতেক কহিয়া মোরে, কপট চাতুরী করে,
যত্নে একাইআ দেই টাকা॥
বেষ্টিত ভুজঙ্গ ঠাটে, অবতরি মাঝ মাঠে,
দেখি মোর মুখে উঠে ধূলা।
পাইলাম মনস্তাপ, দেখিলাম অনেক সাপ,
আমারে বেঢ়িল কথোগুলা॥
জেরূপ দেখিলা নেতে, মানা কৈল প্রকাশিতে,
কহিলে না হব তোর ভাল॥
ওরে পুত্র ক্ষেমানন্দ, কবিত্বে কর প্রবন্ধ,
আমার মঙ্গল গাইআ বোল॥"

কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ এক কবিরই নাম হওয়া আশ্চর্য্য নহে এই মনসামঙ্গলেরই এক স্থানে দৃষ্ট হয় যে, মনসাদেবীর এক নাম ছিল কেতকা,—যথা—

"বনের ভিতর নাম মনসা কুমারী।
কেআ পাতে জন্ম হৈল কেতকা সুন্দরী॥"

মনসাভক্ত ক্ষেমানন্দ আপনাকে সম্ভবতঃ কেতকাদাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন।

যে বারা খাঁ * রণে পড়িল বলিয়া কবি আক্ষেপ করিয়াছেন, সেই বারা খাঁ বর্দ্ধমান সিলিমাবাদ পরগণার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি ১৬৪০ খৃঃ অঃ (১০৪৭ বাং সনে) কবিকঙ্কণের পুত্র শিবরাম ভট্টাচার্য্যকে বিশ বিঘা মৌরসী জমি প্রদান করেন। কবিকঙ্কণের বংশধর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত দান পত্র খানি কতকদিনের

* বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত পলাশডাঙ্গা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাদিগকে জানাইতেছেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের পানাগড় ষ্টেশনের দুই মাইল দক্ষিণে সিলামপুর নামক গ্রামে বারা খাঁর সমাধি আছে। চাঁদ সদাগরের নিবাস-স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ চম্পাইনগর ঐ স্থান হইতে ৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত।

জন্য আমার নিকটে রাখিয়াছিলেন। ১৬৪০ খৃঃ অব্দের পরে বারা খাঁ যুদ্ধে নিহত হ'ন এবং তৎপর কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল বিরচিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

যে সমস্ত মনসামঙ্গল-রচয়িতার নাম উল্লেখ করা গেল তাঁহাদের অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গবাসী। ইঁহাদের মধ্যে রামজীবন বিদ্যাভূষণ ১৭০৩ খৃঃ অব্দে যে মনসামঙ্গল প্রণয়ন করেন, তাহার রচনা বড়ই সরল এবং মধুর।

বর্দ্ধমানদাসের কবিত্ব।

অপরাপর মনসারভাসান-রচকদিগের রচনাও অনেকস্থলে বেশ সুন্দর হইয়াছে; সকলগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার স্থানাভাব। মনসা গোয়ালিনী-বেশে ধন্বন্তরির নিকট বিষাক্ত দধি বিক্রয় করিতে গিয়াছেন; তাঁহার শিষ্যগণের সঙ্গে গোয়ালিনী-রূপিণী দেবীর কৌতুককর কলহটি বর্দ্ধমান-দাস কবির হস্তে বেশ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিলাম ;—

"কেমনে তোমার স্বামী, পাঠায় তোমায় একাকিনী, গোয়ালা রহিল তোমার ঘরে॥ দরিদ্রের মত নয়, ধন আছে জ্ঞান হয়, নানাবিধ আছে অলঙ্কারে॥ এত ধন যার আছে, সে কেন বা দধি বেচে, হাটে ঘাটে মাথায় পসার। দুষ্ট জনে লাগ পায়, দধি ঘোল করে দেয়, কথা কহিতে মুখে মারে। তোমার নাহিক ভয়, দুষ্ট জন যদি হয়, কাড়ি লয় লণ্ড ভণ্ড করে॥ * * * বলিয়া এসব বোল, মূল্য করে দধি ঘোল, শিষ্য সব বড়ই চতুর। বর্দ্ধমান দাসে কয়, খেয়ে দেখ কেমন হয়, দধি মোর টক না মধুর॥ শিষ্যের বচন শুনি বলে গোয়ালিনী। এ দেশে এমন বিচার আমি নাহি জানি॥ রাজা চন্দ্রধর হয় দেশে অধিকার। এই দেশে নাহি জানি এমন বিচার। ভিন্ন দেশী আসিয়াছি দধি বেচিবার। পথে একা পেয়ে কেন পরিহাস কর॥ আমার জাতির ধর্ম্ম মাথার পসার। যাহার প্রসাদে মোর ভুঞ্জে পরিবার॥ বিনা দুঃখে কাহার কড়ি হয় উৎপত্তি। আমার সকল এই ঘরের সম্পত্তি॥ খাইয়া বেড়াও তুমি কহিতে না দেও ফুক। পরেরে বলিতে

কি পরের লাগে দুঃখ। * * বর্দ্ধমান দাস কহে কীর্ত্তি মনসার। হাস্য করে শিষ্যগণ বলে আর বার॥ তোমার জাতির বুঝি পুরাতন কড়ি। দুনা কড়ি লাগে দিব বেচ দধি হাঁড়ি॥ যত হাঁড়ি আছে তোমার সকল কিনিব। আগে দধি খেয়ে দেখি পাছে কড়ি দিব॥ * * * পসার ভাঙ্গিয়া তোমার হাঁড়ি করি চূর। মোর ঠাঁই দেখাও তোমার হার কেউর॥ বর্দ্ধমানদাসে কয় কীর্ত্তি মনসার। ঘনাইয়া গোয়ালিনী বলে আরবার॥ * * যে জন আমার ধন দেখিতে না পারে। বিকাউক মোর ঠাঁই কিনিব তাহারে॥ শিষ্যগণ বলে মোরা যেই ধন চাই। সেই ধন পাই যদি তোমাতে বিকাই॥ বর্দ্ধমান দাস কহে কীর্ত্তি মনসার। ঘনাইয়া গোয়ালিনী বলে আরবার॥"

বৈষ্ণব কবির প্রভাব।

গোপবধূর প্রসঙ্গে বৈষ্ণবকবিগণের দানলীলার পদ মনে হয়। বস্তুতঃ কবিগণ প্রচীন বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বত্রই এই ভাবে বৈষ্ণব প্রসঙ্গের মাদকতা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। হস্তলিখিত পুঁথিগুলির রচনা দৃষ্টে বোধ হয় কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি মনসার ভাসান-রচকগণ ৩০০ হইতে ২০০ বৎসর পূর্ব্বে এই উপাখ্যানগুলি রচনা করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মমঙ্গল।

ধর্ম্মমঙ্গলে বৌদ্ধভাব।

বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশের নিম্ন শ্রেণীর হাতে পড়িয়া যে বিকৃত ভাব ধারণ করে, ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি তাহার হিন্দু সংস্করণ। রামাইপণ্ডিতের পদ্ধতিতে বৌদ্ধভাবের যে স্পষ্ট পরিচয় আছে, পরবর্ত্তী ধর্ম্মকাব্যগুলিতে তাহা ক্রমেই তেত্রিশ কোটি হিন্দু দেবতার উঠন্ত প্রভাবের নীচে চাপা পড়িয়াছে, কিন্তু তথাপি স্বীকার্য্য যে, ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি বৌদ্ধ রাজা ও সাধুগণের মহিমা কীর্ত্তন করিতেই প্রথম রচিত হইয়াছিল। ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণহস্তে শ্রমণগণ হৃতসর্ব্বস্ব ও পরাভূত হইলেন ; ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ ভিক্ষুর আসনগুলিও আয়ত্ত করিয়া ভারতবিজয়ী যে বিরাট পূজার আয়োজন করিলেন, তাহাতে বাইতি,

হাড়ি প্রভৃতি জাতির ধর্ম্মযাজকত্ব রক্ষিত হইল না; ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য ব্রাহ্মণগণের হাতে পড়িয়া দেবলীলা জ্ঞাপক হইল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইহার গোড়ায় ক্ষীণ ও পরাভূত বৌদ্ধধর্ম্মের লুক্কায়িত ছায়া আবিষ্কার করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

ঘনরামের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ।

রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি, হাকন্দপুরাণ, ময়ুরভট্ট, রামচন্দ্র, মাণিক গাঙ্গুলী, খেলারাম প্রভুরাম, রূপরাম, সীতারাম, দ্বিজরামচন্দ্র, সেনপণ্ডিত, রামদাস আদক, ঘনরাম, বলদেব চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কবির ধর্ম্ম-মঙ্গল আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ১৫২৭ খৃঃ অব্দে খেলারাম স্বীয় ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন।* ১৬০৩ খৃঃ অব্দে সীতারাম দাস নামক আর একজন কবি একখানি ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। ইনিও "গজলক্ষ্মী"র স্বপ্নাদেশে গীত রচনায় প্রবৃত্ত হন;—"শিওরে বসিল মোর গজলক্ষ্মী মা। উঠ বাছা সীতারাম গীত লেখ গা।" সীতারাম দাস ধর্ম্মকাব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও দুই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন,—'খণ্ডঘোষ' নিবাসী অযোধ্যারাম চক্রবর্ত্তী এবং

---

* খেলারামের হস্তলিখিত পুঁথি হইতে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন॥
হে ধর্ম্ম এ দাসের পূরাও মনস্কাম।
গৌড়কাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলারাম॥
তোমার কৃপায় যদি গ্রন্থ পূর্ণ হয়।
অষ্টমঙ্গলায় দিব আত্ম-পরিচয়॥"

তাঁহার শেষ অধ্যায় (অষ্টমঙ্গলা) পাওয়া যায় নাই; সুতরাং আত্মবিবরণটী নষ্ট হইয়াছে। খেলারামের কবিতা সরল ও সরস; কিছু নমুনা এই :—

"স্থিত শৈলেশ্বর শিব বঙ্গের অঞ্চলে।
সুরম্য সরসী এক তার মাঝে ঝলে॥
কমল কুমুদ আদি নানা ফুলদল।
বিকাশিয়া ভূষে তার নীল উরঃস্থল॥
শুন বাছা লাউসেন বলিরে তোমায়।
এওজাৎ দিও, নেড়া দেউল তলায়॥"

নারায়ণ পণ্ডিত নামক অপর একজন। শেষোক্ত ব্যক্তির আগ্রহ সমধিক দেখা যায়, তিনি আমাদের কবির স্বপ্নাদেশ-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া "দুখানি কলম মোরে দিল বানাইয়া" এবং এ হেন কবিবর যদি পরিত্যাগ করিয়া যান সেই ভয়ে "অনেক যতনে মোরে রাখিল ধরিয়া।" কেবল "গজলক্ষ্মী মা"ই কবির শিওরে উপস্থিত হন নাই, তিনি আরও বিবিধ বিগ্রহ দর্শন করিয়াছিলেন, ধর্ম্ম দেখা দিল জামকুড়ির বনে।" এই সকল প্রত্যাদেশের ভাণ করিয়া কবি অনায়াসে উদরান্ন লাভ করিয়াছিলেন, এবং পর কর্ত্তৃক প্রস্তুত লেখনী মস্যাধার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় উপকরণ রাশি পাইয়া সচ্ছন্দ মনে "আনন্দিত পুঁথি সব লিখিনু বসিয়া।" ইত্যাদি জ্ঞাপন করিয়াছেন। নিজ নিজ পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় দিতে কবি ভুলেন নাই। "ইন্দেসার অম্বগোষ্ঠী স্থানে সর্ব্বলোকে।" ইনি বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ইন্দাসের দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ ভদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন। আদিপুরুষ গোপীনাথ দে, তাহার ৩ পুত্র;—মথুরা দাস, মদন দাস ও ধর্ম্ম দাস। ধর্ম্ম দাসের ৪ পুত্র,—শ্রীহরি দাস, রাজীবলোচন দাস, দুর্য্যোধন দাস ও কুশলরাম দাস। মদনের পুত্র দেবীদাস ও দেবীদাসের পুত্র আমাদের কবি সীতারাম দাস,—সীতরামের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম সভারাম রায়। কবির মাতামহের নাম শ্যামাদাস। ১০০৪ সালে এই পুঁথি সমাপ্ত হয়। এই সমস্ত বিবরণ দ্বারা কবি স্বীয় বংশের একটি নামমাত্র তালিকা রক্ষা করিয়াছেন,—সীতারামদাসের পুস্তকের খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু লিখিতে পারিলাম না।

রামদাস কৈবর্ত্তের 'অনাদি-মঙ্গল।'

সীতারামের পরে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কৈবর্ত্ত বংশোদ্ভব রামদাস আদক নামক জনৈক কবি "অনাদিমঙ্গল" নামক একখানি ধর্ম্মকাব্য প্রণয়ন করেন। রামদাসের পিতার নাম রঘুনন্দন আদক, তাহার পূর্ব্ব নিবাস হুগলী জেলার আরামবাগ থানার অধীন হায়ৎপুর গ্রামে,

পরে সেই থানার অন্তর্গত পাড়াগ্রামে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। কবি নিজ বংশের পরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন,—"ভুরস্থটে রাজা রায় প্রতাপনারায়ণ। দানদাতা কল্পতরু কর্ণের সমান॥ তাঁহার রাজত্বে বাস বহুদিন হোতে। পুরুষে পুরুষে চাষ চষি বিধিমতে॥"

কবির ধর্ম্মমঙ্গল রচনার ভার গ্রহণ করিবার বৃত্তান্তটি বড় কৌতুকাবহ;—হায়ৎপুরে চৈতন্যসামন্ত নামক একজন দুর্দ্দান্ত তসীলদারের অত্যাচারে অল্পবয়স্ক কবি কারারুদ্ধ হন,—খাজনার টাকা শোধ না করিতে পারায় তাহার পিতা ঋণ গ্রহণের চেষ্টায় গ্রামান্তরে প্রস্থান করেন। সুতরাং রামদাস উপায়ান্তর না দেখিয়া দ্বারবানের নিকট অনেক কাকুতি মিনতি করাতে তাঁহার অতি গোপনে অব্যাহতি লাভ ঘটে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর কবি মাতুলালয়ে পলাইয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় পাড়াবাঘনান গ্রামের পথে এক সশস্ত্র সিপাহী তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, সেকালে সৈনিকপুরুষগণ বলপূর্ব্বক বেগার ধরিয়া লইয়া যাইত। কবি কাতরচিত্তে লিখিয়াছেন,—"ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হায় ফেটে যায় বুক। ভাগ্যহীন জনার জীবনে নাই সুখ॥ সম্মুখে শিপাই শোভে শমন সমান। হায় বুঝি বিদেশে বিপত্তে যায় প্রাণ॥" তৃতীয় ছত্রের "শোভে" শব্দটি সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি আছে,—যখন সিপাহী কবিকে তর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিল,—"মনে কর বেটা তুমি যাবে পলাইয়া। এতক্ষণ ঘুরিলাম বেগারী খুঁজিয়া। গোলাড় যাইব আমি সঙ্গে তুমি চল। এত বলি শিরে দিল ঝারি আর কম্বল॥ ছোট মোট বটে কিন্তু অতিশয় ভারি। বহিতে না পারি বোঝা বুক ফেটে মরি॥ * * * আমার সম্মুখে যদি ফেল এই মোট। দ্বিখণ্ড করিব তোরে মারি এক চোট॥" তখন ভীত কবির চক্ষে সিপাহী সাহেবের শ্রীমূর্ত্তি অবশ্যই "শোভা" পায় নাই, তাহা বলা বাহুল্য। সিপাহীর কথা শুনিয়া ত্রাসে "মুদি গেল আঁখি। কোথায় শিপাই ঘোড়া আর নাহি দেখি॥" সেদিনকার সমস্ত বৃত্তান্তই বিচিত্র ঘটনাসঙ্কুল। তৎপর কবির ভয়ানক জ্বর বোধ হইল,—শুষ্ককণ্ঠ রামদাস সম্মুখস্থ "কাণাদীঘির" জল খাইতে ছুটিলেন, দীঘির

দক্ষিণদিকে বাতান্দোলিত অমল ধবল জলের উপর সুন্দর পদ্মকুসুম ধীরে ধীরে দুলিতেছিল, কবি সাগ্রহে জলে নামিতে জল শুষ্ক হইয়া গেল,—রামদাস পদে পদে এইরূপ বিপন্ন ও নিরাশা-গ্রস্ত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তখন এক দিব্য পুরুষ স্বর্ণভৃঙ্গার গঙ্গোদকে পূর্ণ করিয়া কবির সন্নিহিত হইয়া বলিলেন—"ক্ষুধায় তৃষ্ণায় রাম ক্লেশ পাও তুমি। তোমার লাগিয়া জল আনিয়াছি আমি॥ এত বলি বদনে দিলেন গঙ্গাজল। আজি হোতে হোল তব জনম সফল॥ জল পানে রামদাস প্রাণ পেলে তুমি। ধর্ম্মের সঙ্গীত গাও শুনি কিছু আমি॥" রামদাস বলিলেন—"পাঠ পড়ি নাই প্রভু চঞ্চল হইয়া। গোধন চরাই মাঠে রাখাল লইয়া॥ খেলা ছলে পূজি ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞানহীন। জানি না ধর্ম্মের গীত তায় অর্ব্বাচীন॥" কিন্তু দিব্য পুরুষ নাছাড়বান্দা—"আজি হৈতে রামদাস কবিবর তুমি। জাড়গ্রামে কালুরায় ধর্ম্ম হই আমি॥ আসরে জুড়িব গীত আমার স্মরণে। সঙ্গীত কবিতা ভাষা ভাসিবে বদনে॥ সুছন্দ বন্ধন গীত সুশ্রাব্য সবার। শ্রীধর্ম্ম মাহাত্ম্য মর্ত্ত্যে হইবে প্রচার॥" হায়ৎপুর গ্রামে ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক প্রথম গীত হয়। অনাদিমঙ্গলের ভাষা সরস ও সহজ,—কবিত্বপূর্ণ ভাব ও উদ্দীপনার অভাব নাই।*

১৫৪৭খৃঃ অব্দে মাণিক গাঙ্গুলী একখানি 'ধর্ম্মমঙ্গল' রচনা করেন। এই ধর্ম্মমঙ্গলখানি মৎকৃত বিস্তৃত ভূমিকাসহ সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। মাণিকরাম একজন সু-কবি ছিমেন; কিন্তু সদ্‌ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিকৃত দেবতা ধর্ম্মঠাকুরের উদ্দেশে কাব্য রচনা করার জন্য, বোধ হয় সমাজে কিছু নিগৃহীত হইয়াছিলেন, অন্ততঃ ধর্ম্মঠাকুরের প্রত্যাদেশ পাইয়া তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আশঙ্কা হইয়াছিল। তিনি স্বপ্নে ধর্ম্মঠাকুরকে বলিয়াছিলেন—

'জাতি যায় তবে প্রভু যদি করি গান।'

মাণিকরামের পূর্ব্বে প্রভুরাম, দ্বিজরামচন্দ্র ও শ্যামপণ্ডিত সুবৃহৎ ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ ইঁহাদের সকলের পূর্ব্বে

---

* এই পুস্তকখানি বর্দ্ধমান রায়না-নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন।

রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল প্রচারিত হয়। ইনি অনেকস্থলে 'আদিরূপরাম' নামে পরিচিত।

এই সকল কাব্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ১৭১৩খৃষ্টাব্দে ঘনরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার শ্রীধর্ম্মমঙ্গলকাব্য সমাধা করেন। ধনরাম, ময়ূরভট্টের কথা স্বীয় কাব্যে শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন—"ময়ূরভট্ট বন্দিব সংগীতের আদি কবি" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, ১ম সর্গ)। কথিত আছে, রূপরামের কাব্য বড় বড় শব্দ পূর্ণ ও রচনা জটিল, এবং ঘনরাম উহা পড়িয়া বলিয়াছিলেন—"শব্দ শুনে স্তব্ধ হবে গান শুনবে কি?" রূপরামের খণ্ডিত পুঁথি আমরা দেখিয়াছি।

ঘনরামের জীবনী।

ঘনরামের বাড়ী জেলা বর্দ্ধমানে স্থিত কইয়ড় পরগণান্তর্গত কৃষ্ণপুর-গ্রাম। তাঁহার প্রপিতামহের নাম পরমানন্দ, পিতামহের নাম ধনঞ্জয়,—ধনঞ্জয়ের দুই পুত্র, শঙ্কর ও গৌরীকান্ত; গৌরীকান্ত ঘনরামের পিতা, কবির মাতার নাম সীতা দেবী; সীতাদেবীর পিতা গঙ্গাহরি কৌকুসাবীর রাজকুলোদ্ভূত ছিলেন। ঘনরাম ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে কবি খুব শারীরিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। তৎকৃত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে মল্লদিগের লড়াই ও অশ্বাদির চালনার যেরূপ জীবন্ত বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে কবির ব্যায়ামক্রীড়ায় বিশেষ অধিকার ছিল বলিয়া বোধ হয়। ঘনরাম শৈশবে বড় কলহ-প্রিয় ছিলেন। তাঁহার পিতা গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে বর্দ্ধমানের তাৎকালিক প্রসিদ্ধ শাস্ত্র-চর্চ্চার স্থান—রামপুরের টোলে পাঠাইয়া দেন; তথাকার হিতকর সংসর্গে কবির কলহ-প্রিয়তার অনেকটা দমন হয় এবং পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়া যায়। শৈশবেই কবিতাদেবীর কৃপাকটাক্ষ তাঁহার উপর পতিত হইয়াছিল; গুরু তাঁহার ভাবী যশঃ অঙ্গীকার করিয়া তরুণবয়সেই তাঁহাকে "কবিরত্ন" উপাধি প্রদান করেন।

কৃষ্ণপুরাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের আদেশে ঘনরাম

শ্রীধর্ম্মমঙ্গলকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন—'অখিল বিখ্যাত কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী,—কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান। চিন্তি তার রাজোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি, দ্বিজঘনরাম রসগান।" শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ব্যতীত ঘনরাম-রচিত সত্যনারায়ণের একখানি পাঁচালী দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাঁহার ৪ পুত্র—রামপ্রিয়, রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণের নাম উল্লিখিত আছে। কয়েক বৎসর হইল, কবির বৃদ্ধ প্রপৌত্র মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার একমাত্র পুত্র বর্ত্তমান আছেন।

তাঁহার কৃত ধর্ম্মমঙ্গলের সমালোচনা।

ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ২৪ অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত, মোট শ্লোক-সংখ্যা ৯১৪৭। ১ম সর্গ, স্থাপনপালা শ্লোকসংখ্যা ২৬৭; ২য় সর্গ, ঢেকুরপালা, ২৩৮ শ্লোক; ৩য় সর্গ, রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা, ২৫৬ শ্লোক; ৪র্থ সর্গ, হরিশ্চন্দ্র পালা, ২৬০ শ্লোক; ৫ম সর্গ, শালেভরা পালা, ২৯৭ শ্লোক; ৬ষ্ঠ সর্গ, লাউসেনের জন্মপালা, ৩১৫ শ্লোক; ৭ম সর্গ, আখড়া পালা, ৩৫৪ শ্লোক; ৮ম সর্গ, ফলকনির্ম্মাণপালা, ৩১৭ শ্লোক; ৯ম সর্গ, গৌড় যাত্রার পালা, ৪০৭ শ্লোক; ১০ম সর্গ, কামদল বধ, ৩৫০ শ্লোক; ১১শ সর্গ, জামাতি পালা, ৩২৭ শ্লোক; ১২শ সর্গ. গোলাহাটপালা, ৪৯৪ শ্লোক; ১৩শ সর্গ, হস্তিবধপালা, ৫১৮ শ্লোক; ১৪শ সর্গ, কাঙুরযাত্রা পালা, ৩৫৯ শ্লোক; ১৫শ সর্গ, কামরূপ যুদ্ধপালা, ৪১৪ শ্লোক; ১৬শ সর্গ, কানড়ার স্বয়ম্বর, ৩০৭ শ্লোক; ১৭শ সর্গ, কানড়ার বিবাহ, ৪৮৫ শ্লোক; ১৮শ সর্গ, মায়ামুণ্ড পালা, ৫৬৫ শ্লোক; ১৯শ সর্গ, ইছাইবধ পালা, ৫৩২ শ্লোক; ২০শ সর্গ, বাদল পালা, ২৮১ শ্লোক; ২১শ সর্গ পশ্চিম উদয় আরম্ভ, ১৭৬ শ্লোক, ২২শ সর্গ, জাগরণ পালা, ১০৩১ শ্লোক; ২৩শ সর্গ, পশ্চিম উদয়, ৩৩০ শ্লোক; ২৪শ সর্গ, স্বর্গারোহণ পালা, ৩৬৪ শ্লোক।

সুতরাং এই কাব্য কবির অধ্যবসায়ের এক বিরাট দৃষ্টান্ত বলিতে হইবে। ধর্ম্মমঙ্গলে লাউসেনের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ বর্ণিত হইয়াছে; লাউসেন কুলটাগণের হস্তে পড়িয়া ইন্দ্রিয়জয়ী; ব্যাঘ্র, হস্তী ও ক্ষিপ্ত অশ্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তিনি বুঝাইয়াছেন—তাঁহার বাহুবল অমিত; স্বীয় মাতুল মহামদের দুরভিসন্ধি নানাভাবে বিফল করিয়া বুঝাইয়াছেন, তিনি দেবানুগৃহীত; অজেয় ইছাইঘোষকে জয় করিয়া বুঝাইয়াছেন,

বিক্রমে তাঁহার সমকক্ষ নাই; স্বীয় অঙ্গুলির এক একটী ছেদন করিয়া দেবীর আরাধনা করিয়া বুঝাইয়াছেন—তিনি কঠোর তপস্বী; এতদ্ব্যতীত মৃত শিশুর মুখে কথা বলাইয়াছেন, স্বীয় বিনষ্ট সৈন্যদলের প্রাণদান করিয়াছেন, নানা অদ্ভুত কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়া কলিঙ্গা ও কানড়াকে বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু এই রাশি রাশি ঘটনা বর্ণনা করিয়াও কবি তাঁহার নায়ককে বড় করিতে পারেন নাই; বিচ্ছিন্ন উপকরণরাশি পড়িয়া আছে,—যে বিধি-দত্ত শক্তিগুণে সেগুলি একত্র করিয়া এক মহাবীরের চরিত্র গঠিত হইতে পারে, কবির সে শক্তি ও নৈপুণ্যের সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়। লাউসেনের বিপদের সময় হনুমান আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া দিতেছেন; চণ্ডী আসিয়া তাঁহার শরীরের মশক তাড়াইতেছেন, সুতরাং তাঁহার বিপদে পাঠকের শান্তিভঙ্গের কোন আশঙ্কা নাই, এবং তাঁহার জয়লাভেও পাঠক তাঁহাকে কোনরূপ প্রশংসা করিতে ইচ্ছা বোধ করিবেন না। পাঠক এই কাব্যের আদ্যন্ত ঘুমের ঘোরে অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষে পড়িয়া যাইবেন, কোনস্থলে তাঁহার চক্ষু-কোণে অশ্রুবিন্দু নির্গত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বর্ষাকালে জানালা খুলিয়া অলসচক্ষে বৃষ্টিপাত দেখিতে একরূপ সুখ আছে, অবিরত জলের টুব-টাব শব্দ, পত্রকম্পন ও বায়ু বেগে তরুরাজির শির আন্দোলন লক্ষ্য করিতে করিতে চক্ষুর্দ্বয় মুদিত হইয়া আসে এবং শূন্য নিষ্ক্রিয় মনে পুরাতন কথা ও পুরাতন ছবির স্মৃতি অনাহুতভাবে জাগিয়া উঠে; ঘনরামের শ্রীধর্ম্ম-মঙ্গলের একঘেয়ে বর্ণনা সেই বৃষ্টির টুবটাব শব্দের ন্যায় তানপুরার মত তাহা হইতে অবিরত একরূপ ধ্বনি উঠিতেছে। উহা পড়িতে একরূপ অলস সুখের উৎপত্তি হয়—স্থলে স্থলে কি কথা পড়িতে দূর দূরান্তরের কি কথা স্মৃতিপথে উদিত হয় এবং ঘুমঘোরে চক্ষু মুদিত হইয়া আসে। মধ্যে মধ্যে যুদ্ধের দামামাবাদ্য এই নিদ্রাপ্রবণতা ভাঙ্গিয়া ফেলে, তখন হাই তুলিয়া মন একটু বীররসে মাতিয়া যায়; নিম্নে বীররসের একটু নমুনা দিতেছি—"মার মার বলি ডাক ছাড়েন ভবানী। সেনাগণ

দানাগণ, সমরে নিদারুণ, দুদলে করে হানাহানি॥ রঙ্গিণী রণজয়ী, দুন্দুভি বাজাই, ঘন ঘোর বাজাইয়া দামা॥ রাজপুত মজবুত, যৈছন যমদূত, সমযূথ যুঝে খানসামা॥ দলদালিয়া দলবল, মহীমাঝে মাতল, মানব মহিমে দানদক্ষে। ধর ধর বলি ঘন, ধাইল দাসগণ, ধমকে ধরাধর কম্পে॥ ঝাঁকে ঝাঁকে হরিষে, শরগুলি বরিষে, আকাশে একাকার ধূম। দিশাহারা দিবসে, হত কত হুতাশে, গোলা বাজে দুড়ুম দুড়ুম॥ ঝাকতা ঝাঁকে ঝাঁকে, ঝিঁকিছে হাঁকে হাঁকে, লাখে লাখে বরিষে তীর। সামালিয়া হানিতে, গজবাজী সহিতে, সমরে শিফায়ের শির॥ করিয়া তর্জ্জন, ঘোরতর গর্জ্জন, দুর্জ্জন দানাগণ দর্পে। সমরে সেনাগণ, সংহারে যৈছন, ক্ষুধিত সর্পে॥"—১৭শ সর্গ। বীরের পর বীভৎস রস—"পাতিল প্রেতের হাট পিশাচ পসারী। নরমাংস রুধিরে পসরা সারি সারি॥ ফড়া ফড়া মড়া করে ডাকিনী যোগিনী। কেহ কাটে কেহ কুটে বাঁটে খানি খানি॥ কেহ কিনে, কেহ বেচে, কেহ ধরে তুল। কেহ চাকে, কেহ ভকে, কেহ করে মূল॥ রচিয়া নাড়ীর ফুল কেহ গাঁথে মালা। বয়ে লয়ে কেহ কারে যোগাইছে ডালা॥ মনোরম মানুষের মাথার লয়ে ঘি। যাচিয়া যোগায় যত যোগিনীর ঝি॥ খর্পর পুরিয়া কেহ নিবারিছে ক্ষুধা। চুমুকে রুধির পিয়ে সম তার সুধা॥ কাঁচা মাস খায় কেহ ভাজা ঝোলে ঝালে। মানুষের গোটা মাথা কেহ ভরে গালে॥ দশনে চিবায় কেহ কুঞ্জরের শুঁড়। মুয়া বলে মুখে ভরে মানুষের মুড়॥ হাতী লয়ে হাতে কেহ উড়ায় আকাশে। লাফ দিয়ে লুফে কেহ অমনি গরাসে॥ পরিয়া নাড়ীর মালা কেহ করে নাট। মরা মাঝে মিছা শব্দ শুনি হান কাট॥ ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী চণ্ড দানা॥ হাটে করে কেবল মাংসের বেচা কেনা॥ হেন হাটে হাকিম হৈল হৈমবতী। করপুটে সম্মুখে ধুমশী করে স্তুতি॥"—১৭শ সর্গ। করুণরসের বড় অভাব, তবে মধ্যে মধ্যে পাঠকের অশ্রুপাত না হইলেও দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতে পারে, যথা—"শিঙ্গাদার ওরে ভাই এই ছিল আমার কপালে। নিশায় নিধন রণে, পিতা মাতা বন্ধুগণে, দেখিতে না পেনু শেষকালে॥ গলার কবচ মোর, শিঙ্গাদার ধর ধর, দিহ মোর যেখানে জননী। নিশান অঙ্গুরী লয়ে, মধুরার হাতে দিয়ে, ক'য়ো তুমি হ'লে অনাথিনী॥ তারে মোর মায়ের হাতে হাতে। সঁপে সমাচার বলো, অকালে অভাগা মলো, অভাগিনী রাখে সাথে সাথে॥ শুকায় স্বর্ণ ছড়া, বাপের ও ঢাল খাড়া, সমর্পিয়ে সমাচার বলো। রণে অকাতর হয়ে, শত্রুশির সংহারিয়ে, সম্মুখ সমরে শাকা মলো॥ কাণের কুণ্ডল ধর, শিঙ্গাদার তুমি পর, ছুরী তীরে তুষ বীরগণে। শুনি শোকে শিঙ্গাদার, চক্ষে বহে জলধার, বহে লোহ শাকার নয়নে॥ কেঁদে কহে পুনর্ব্বার, অপরাধ অভাগার, খণ্ডাইতে

মা বাপের পায়। প্রণতি অসংখ্যবার, দেখা নাহি হলো আর, অল্পকালে অভাগা বিদায়॥ মরমে রহিল শেল, হেন জন্ম বৃথা গেল, মুখে না বলিনু রাম নাম। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দেবা, জননী জনক সেবা, না করিনু বিধি হৈল বাম॥"—২২শ অধ্যায়। *

এই পুস্তকের সর্ব্বত্র কেবল শাস্ত্রের উদাহরণ। বৌদ্ধভাব, শাস্ত্রোক্ত দেব দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনের অতিরিক্ত চেষ্টায় একেবারে উন্মূলিত হইয়াছে, আর তাহার পরিচয় পাওয়ার সুবিধা নাই। শাস্ত্রজ্ঞানের পুঞ্জীকৃত ধূম্র-পটল কবির প্রতিভাকে এরূপ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে, স্বানুভূত জ্ঞানের কথা তিনি একটিও বলিবার অবকাশ পান নাই। একমাত্র কর্পূরের চরিত্র বাঙ্গালীর খাঁটি নক্‌সা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। কর্পূর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লাউসেনকে খুব ভালবাসে; ব্যাঘ্র, কুম্ভীর প্রভৃতির সঙ্গে লাউসেনের যুদ্ধের পূর্ব্বে এবং অপরাপর অনেক বিপদের পূর্ব্বে সে দাদাকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে অনেক নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু সে দাদাকে যত ভাল-বাসে, নিজকে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ভাল বাসে, "আত্মার্থং পৃথিবীং ত্যজেৎ" চাণক্যের এই সুবর্ণ-নীতি সে সর্ব্বত্র অনুষ্ঠান করিতে ক্রটী করে নাই। বিপদের সময় সে দাদাকে ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছে, এবং যখন উঁকি মারিয়া দেখিয়াছে আর ভয় নাই, তখন নিকটে আসিয়া অনেক মিথ্যা কথা বলিয়াছে; লাউসেন যখন জামতিনগরে বন্দী, তখন কর্পূর অভ্যস্ত ভাবে পলাতক, লাউসেন মুক্ত হইলে কর্পূর নির্ভয়ে আসিয়া দাদার গলা জড়াইয়া মিথ্যা কথা বলিতে লাগিল—"কাঁদিয়া কর্পূর সেনে করেন জিজ্ঞাসা। কালি কোথা ছিলে ভাই হায় কিবা দশা॥ কর্পূর বলেন যবে বন্দী হলে ভাই। রাতারাতি গৌড় ছিনু ধাওয়া ধাই॥ রাজার আদ্দাশ করি জামতি লুঠিতে। লয়ে আসি লক্ষ সেনা পথে আচম্বিতে॥ পথে শুনি বিজয়, বিদায় দিনু ভাই। লাউসেন বলে তোরে বলিহারি যাই॥"

কর্পূর।

---

* শিঙ্গাদার ও শাকা দুই ভাই, ময়ূরা শাকার স্ত্রী।

উপসংহারে বক্তব্য, ঘনরামের শ্রীধর্ম্মঙ্গল এত বিরাট ও এত একঘেয়ে যে সমস্ত কাব্য যিনি পড়িয়া উঠিতে পারিবেন, তাঁহার ধৈর্য্যের বিশেষ প্রশংসা করা উচিত হইবে।

সহদেব চক্রবর্ত্তী।

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের পর সহদেব চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক কবি তৎসংক্রান্ত আর একখানি কাব্য রচনা করেন; সহদেব চক্রবর্ত্তী হুগলী জেলার বালিগড় পরগণাধীন রাধানগরগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; বাং ১১৪১ (১৭৪০ খৃঃ) সালের ৪ঠা চৈত্র, কবি কালুরায় নামক দেবতার স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া ধর্ম্মমঙ্গল রচনা আরম্ভ করেন। স্বপ্নাদেশপ্রাপ্তি প্রাচীনবঙ্গীয় কবিগণের চিরাভ্যস্ত ঘটনা, লেখনীর কণ্ডূয়ন সমর্থনের এক অদ্বিতীয় অবলম্বন, সুতরাং সহদেব কবি যখন "দয়া কৈলে কালু রায় স্বপনে শিখালে যারে গীত" বলিয়া গ্রন্থারম্ভ করিতেছেন, তখন আমরা অণুমাত্রও বিস্মিত হই নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সহদেবচক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল, ঘনরাম প্রভৃতি কবির কাব্যানুকরণ নহে, উহার বিষয় স্বতন্ত্র। নানাবিধ দেবদেবীর উপাখ্যান দ্বারা সংশোধিত করিতে চেষ্টা করিলেও কবি মূল বৌদ্ধ-উপাখ্যানগুলি একেবারে পরাভূত করিতে পারেন নাই। হর-

লুপ্ত বৌদ্ধ-তত্ত্বের আভাস।

পার্ব্বতীর বিবাহ কথার অতি সান্নিধ্যে 'কালুপা হাড়িপা, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গী প্রভৃতি বৌদ্ধ সাধুগণের কাহিনী স্থান পাইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র, লুইচন্দ্র, ভূমিচন্দ্র, জাজপুরবাসী রামাইপণ্ডিতের কথা, জাজপুরনিবাসী ব্রাহ্মণগণের 'ধর্ম্মদ্বেষ' প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মের রূপান্তর ও কৃত্রিম হিন্দুবেশ সূচিত হইবে; এই পুস্তকে রামাইপণ্ডিতের পদ্ধতির কথা উল্লিখিত আছে,—"এ তিন ভুবনমাঝে, শ্রীধর্ম্মের পূজা আছে, রামাই করিল ঘর ভরা।" ধর্ম্ম-সেবক ডোম জাতির নির্যাতনও বৌদ্ধ প্রসঙ্গ বলিয়া চিহ্নিত করা যায়।

যাহা হউক কবি এই "ধর্ম্মদেবের" প্রচার উপলক্ষে হিন্দু দেবদেবীগণের

বিবিধ কীর্ত্তিকলাপ বর্ণন করিয়াছেন। আমরা মন্দিরের ইষ্টক দ্বারা মসজিদ্ রচিত হইতে দেখিয়াছি,—এখন হিন্দুমন্দিরের উপকরণ অনুসন্ধানকালে বৌদ্ধ মঠের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করিয়া কেন আশ্চর্য্যান্বিত হইব? এমন কি জগন্নাথবিগ্রহের বৌদ্ধউপাদান এখন একপ্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়াছে, অথচ তিনি হিন্দুর পূজ্য থাকিবেন। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলকাব্য মূলে যাহাই থাকুক, এখন হিন্দুপুরোহিতগণের কক্ষতল হইতে এই পুঁথি স্থানান্তরিত করিবার আবশ্যকতা নাই, তবে প্রত্নতত্ত্ব-বিৎগণ ইহা হইতে বৌদ্ধ সময়ের কোন লুপ্তপ্রায় তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া জগতে দেখাইতে পারেন।

সহদেবের কবিত্ব।

সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল স্থানবিশেষে কবিত্বময়;—গ্রাম্য ভাষা কোন কোন স্থলে মর্ম্ম স্পর্শ করিবার উপযোগিনী হইয়াছে, নিম্নে একটি ভক্তি-সূচক পদ উদ্ধৃত হইল :—

"শরণ লইনু, জগৎজননী, ও রাঙ্গা চরণে তোর। ভব জলধিতে, অনুকূল হৈতে, কে আর আছয়ে মোর॥ দুগ্ধকণ্ঠ শিশু, দোষ করে রোষ না করয়ে মায়। যদি বা রুষিবে পঁড়িয়া কান্দিব, ধরিয়া ও রাঙ্গা পায়॥ হরিহর ব্রহ্মা, যে পদ পূজয়ে, তাহে কি বলিব আমি। বিপদ সাগরে, তনয় ফুকারে, বুঝিয়া যা কর তুমি॥"

কদলীপাটনের স্ফুরন্তযৌবনা সুন্দরীগণ যখন এক সঙ্গে বিলোল-কটাক্ষ সন্ধান করিয়া নানাবিধ কামকলাপূর্ণ ভঙ্গীতে মীননাথসাধুর সন্ন্যাসভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার প্রবোধবাক্য-গুলিতে প্রকৃত যোগজীবনের নিবৃত্তিসূচক শান্তি প্রকটিত হইয়াছিল। সেই অংশটি একটি শান্ত মলয়-লহরীর মত সাংসারিক লোকের ইন্দ্রিয়-মথিত চিত্তের উপর বহিয়া যাইবার কথা; কিন্তু মীননাথ সুন্দরীগণের নিক্ষিপ্ত জালে মীনের ন্যায় আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন! তিনি যোগভগ্ন ইন্দ্রিয়বিমূঢ় এবং পরিশেষে ইতরযোনি প্রাপ্ত হইলেন। এই অবস্থায়

তাঁহার শিষ্য গোরক্ষনাথ তাঁহাকে উদ্ধার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া কয়েকটি প্রহেলিকার মত কবিতায় তাঁহার চৈতন্য সঞ্চার করিলেন; সেই প্রহেলিকার ভাষা গ্রাম্য, কথা অসংলগ্ন, কিন্তু উহা আমাদের নিকট বড় মধুর বলিয়া বোধ হইয়াছে,—গ্রাম্যকৃষকের ভাষা অথচ তাহার উন্নত নীতি প্রকৃত সাধুমুখনিঃসৃত উপদেশামৃতের ন্যায় উপাদেয়। এখনও পাড়াগাঁয়ে এইরূপ দুই একটি সাধু পাওয়া যায়, তাহারা উচ্চশিক্ষার অভিমান মনে বহন করিয়া গৌরব করে না, কিন্তু পর্য্যাপ্তরূপে অভ্যস্ত, বহুদর্শিতা হইতে চয়িত উচ্চনীতিদ্বারা তাহাদের জীবন পরিশোভিত। সেই উপদেশলোভে দলে দলে লোক সাধুকে ঘেরিয়া বসিয়া পূজার ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করে—অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এই দৃশ্যে 'গাঁজাখোরের প্রতিপত্তি' এবং 'অজ্ঞলোকের বিশ্বাস' ভাবিয়া স্বীয় অন্তঃসারশূন্য অভিমানাশ্রয়ে প্রীত থাকেন। গোরক্ষনাথ-কথিত সেই প্রহেলিকাটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম;—ইহাতে স্ত্রীজাতির প্রতি একটু বিদ্বেষের ঝাঁজ আছে;—কিন্তু তজ্জন্য আমাদের কবি অপেক্ষা প্রসিদ্ধ সাধু কবীরই অধিক পরিমাণে দায়ী। প্রহেলিকাটিতে অসম্ভব সম্ভব হওয়ায় বিস্ময় ও কতকগুলি অস্পষ্ট উদ্বোধনাসূচক বাক্য আছে, সেগুলি প্রাদেশিক শব্দবাহুল্যে কঠিন হইয়াছে, তথাপি বেশ মিষ্ট ও নৈতিক ওজস্বিতাপূর্ণ।

"গুরুদেব, নিবেদি তোমার রাঙ্গা পায়।
পুতকীর দুগ্ধে, সিন্ধু উথলিল, পর্ব্বত ভাসিয়া যায়॥
গুরু হে, বুঝহ আপন গুণে।
শুষ্ক কাষ্ঠ ছিল, পল্লব মুঞ্জরিল,
পাষাণ বিঁধিল ঘুণে॥
হের দেখ বাঘিনী আইসে।
নেতের আঁচলে, চর্ম্মমণ্ডিত করিয়া
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে॥
শিল নোড়াতে কোন্দল বাঁধিল, সরিষা ধরাধরি করে।
চালের কুমড়া গড়ায়ে পড়িল, পুঁইশাক হাসিয়া মরে॥

এ বড় বচন অদ্ভুত।
আকাট বাঁঝিয়া প্রসব হইল
ছেলে চায় পায়রার দুধ॥
অনেক যতনে নৌকা বাঁধিনু,
কাঁকড়া ধরিল কাঁচি।
মশার লাথিতে পর্ব্বত ভাঙ্গিল,
ক্ষুদ্র পিপীলিকার হাসি॥
আগে নৌকা উড়িল, পশ্চাৎ পুড়িল,
মাঝে বায় উড়িল ধূলা।
সরিষা ভিজাইতে, জলবিন্দু নাই,
ডুবিল দেউল চূড়া॥
বাঘে বলদে, হাল জুড়িনু,
মর্কট হৈল কৃষাণ।
জলের কুম্ভীর, হুড়া ঝাড়ি গেল,
মূষিকে বুনিল ধান॥
তালের গাছে শোলের পোনা,
সয়তান ধরিয়া খায়।
সাগর মাঝে, কই মৎস্য মুড়লি,
পঙ্গু পলই লয়্যা ধায়॥
মধ্যসমুদ্রে, দুয়াড়ি পাতিনু,
সাজকি পড়ে ঝাঁকে ঝাঁক।
মহিষ গণ্ডার ডরায়ে মৈল,
হরিণী পলায় লাখে লাখ॥
তৈল থাকিতে, দীপ নিবাইনু,
আঁধার হইল পুরী।
সহদেব গায়, ভাবি কালুরায়,
শরীর বর্ণন চাতুরী॥"

অনুবাদ-শাখা।

ক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যানাদি।

খ। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি।

বাঙ্গালা কাব্যে সংস্কৃত প্রভাব।

ষোড়শ শতাব্দী অনুবাদের যুগ। কবিকঙ্কণের পর বঙ্গীয় কবি-প্রতিভা যেন শতাব্দীকাল নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। সহসা সংস্কৃতের অতুল ঐশ্বর্য্য বঙ্গীয় লেখকবর্গের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইল। তাঁহারা যে সুধাময় স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে সাহিত্য-বিপিন প্রতিধ্বনিত করিতেছিলেন,—তাহা যেন কতকদিনের জন্য ক্ষান্ত হইয়া পড়িল। প্রায় এক শতাব্দীর জন্য গীতি কবিতার উপর পটক্ষেপ হইল,—সংস্কৃত শাস্ত্র অনূদিত করিয়া ভাষা সংস্কার করা লেখকবর্গের লক্ষ্য হইল। খনার বচনে, গোপীচাঁদ ও মাণিকচাঁদের গানে আমরা সংস্কৃতের কোন চিহ্ন পাই নাই; বৈষ্ণবকবিগণের মধ্যে যিনি সকলের বড়, তিনি নিজের গান নিজের ভাষায় গাহিয়াছেন; চণ্ডীদাস পক্কবিম্ব ও স্ফুরিত কদম্বের বড় ধার ধারেন নাই। অপরাপর বৈষ্ণবকবিগণের পদে মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতের প্রভা পতিত হইয়াছে, দুই এক স্থলে বঙ্গীয় কবিতার গলে সংস্কৃতের দান সোণার হারের ন্যায় শোভা পাইয়াছে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহা কবিতার পদে শৃঙ্খল স্বরূপ হইয়াছে। কবিকঙ্কণ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দুইএক স্থলে সংস্কৃত সাহিত্যের কিছু কিছু রত্ন আনিয়া নিজের কবিতায় যোজনা করিয়াছেন,—যথা—"অঙ্গে যদি লেপি চন্দন পঙ্ক। দহে দেহ যেন দংশে ভুজঙ্গ।" ইহা জয়দেবের—"সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কং। পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কং॥" পদের অনুবাদ; কিন্তু মুকুন্দরাম পথের বাহিরের দুই একটি ফুলের লোভে হাত বাড়াইলেও প্রকৃতির পাছে পাছে অনুগত ভৃত্যের ন্যায়ই চলিয়াছেন।

কবিকঙ্কণের পরে প্রকৃতি বাঙ্গালীর পর হইলেন—শাস্ত্র আপন হইল; ভাষা ভাবের অধিকার ছাড়িয়া স্বীয় স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করিল এবং কবিগণ প্রকৃত মানুষ না দেখিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ছবিগুলি দেখিয়া পাগল হইলেন। সংস্কৃতের নানারূপ অদ্ভুত উপমা ও ভাব দ্বারা লেখনী-গুলি ভূতাশ্রিত হইল, তাহারা সত্যযুগ হইতে আসিয়া কলিযুগের মানুষ-গুলির উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। এখন এদেশে 'আজানুলম্বিত-বাহু' অদৃশ্য;—নগ্নতাআবরণের চেষ্টায় বস্ত্রের প্রসার বৃদ্ধি পাওয়াতে এখন "লম্বোদর" ও "নাভি সুগভীর" আর লোকলোচনের আনন্দদায়ক হয় না; এই জনাকীর্ণ প্রদেশ এক সময় অরণ্যময় ছিল, তখন কুরঙ্গ, মাতঙ্গের নৈসর্গিক ক্রীড়া সর্ব্বদা মানুষের প্রত্যক্ষ হইত,—তাহা ভাল বোধ হইত,—মানুষ নিজ গতিবিধি ও কটাক্ষের সঙ্গে তাহাদের হাবভাব মিলাইয়া মনে মনে প্রীত হইত, এখন স্বভাবের বিশাল অরণ্যে আমরা কুরঙ্গীর বিলোলকটাক্ষ আর দেখিতে পাই না; শীর্ণকায় হস্তীগুলি মাহুতের অঙ্কুশের ভয়ে তাহাদিগের স্বভাবগতি ভুলিয়া গিয়াছে;—ইহা ছাড়া রুচিরও অনেক পার্থক্য ঘটিয়াছে, রামরম্ভার উপমায় মন তৃপ্ত হয় না,—সুতরাং সত্যযুগের উপমাগুলি এখন রহিত হইলে ভাল হয়। কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভর করার দোষে কবিগণ স্বভাবের অধিকারের বাহিরে যাইয়া পড়িলেন; উপমাগুলি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম হইয়া মানবীয়রূপকে ঘোর বিপদাপন্ন করিয়া ফেলিল; এই সময় কবিগণ যে সকল সুন্দর ও সুন্দরীগণের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাঁহারা অতিরিক্ত মাত্রায় শাস্ত্রীয় উপমা দ্বারা অভিভূত হইয়া অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যাঠাকুরাণীর রূপ পড়িয়া তাঁহাকে রূপসী জ্ঞান করা দূরে থাকুক, বীভৎস রসের উদয় না হইলেই যথেষ্ট। বঙ্গসাহিত্যের এই রুচি নষ্ট করার পক্ষে পার্শীরও কতকটা হাত আছে, আমরা পরে তাহা সংক্ষেপে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালা কবিতায় সংস্কৃত উপমা।

যাহা হউক, ভাবের দুর্গতি হইলেও ভাষা ক্রমশঃ মার্জ্জিত হইতে চলিল। বঙ্গভাষা সংস্কৃতের অলঙ্কার ও ছন্দগুলি আয়ত্ত করিয়া লইল—কিন্তু প্রথমে এই বিষয়ে অনেক কবির চেষ্টা বড় হাস্যাস্পদ হইয়াছে,—আমরা সে সম্বন্ধে পরে লিখিব।

সংস্কৃতের অনুবাদ।

এই সংস্কৃতের আনুগত্য বঙ্গ-সাহিত্যের বিরাট অনুবাদচেষ্টায় বিশেষরূপে দৃষ্ট হইবে। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহুসংখ্যক সংস্কৃত পুস্তক অনুবাদিত হইয়াছিল—তাহারা একরূপ নগণ্য; আমরা বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথি পাইয়াছি, কিন্তু তাহাদের সকলগুলি উল্লেখ করিতে পারিব না এবং সকলগুলিই উল্লেখযোগ্য নহে। প্রথমতঃ আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকখানি উপাখ্যান ও পুরাণের অনুবাদের উল্লেখ করিয়া পরে রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। বলা বাহুল্য এই অনুবাদগুলির অধিকাংশই খাঁটি অনুবাদ নহে। কবিগণ পুরাণ কি কাব্যাদি মূলতঃ অবলম্বন করিয়া মধ্যে মধ্যে নিজেদের কল্পনার ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতে ত্রুটি করেন নাই।

১। প্রহ্লাদচরিত্র,—দ্বিজকংসারি প্রণীত; শ্লোকসংখ্যা ২২৪॥ হস্তলিপি (১৭০২ শক) ১৭৮০ খৃঃ অব্দ।

২। পরীক্ষিৎসংবাদ—এই পুস্তকের অধিকাংশই রামায়ণের গল্প পূর্ণ; শুকদেব পরীক্ষিৎকে রামায়ণ শুনাইতেছেন ও প্রসঙ্গক্রমে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছেন। গ্রন্থকারের নাম পাওয়া গেল না। শ্লোকসংখ্যা ৮০০; শ্রীরামধন দেবশর্ম্মার হস্তাক্ষর, (১৭৩৮ শক) ১৮১৬ খৃঃ অব্দ।

৩। নৈষধ—লোকনাথদত্ত-প্রণীত। ইহাতে নলোপাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণের বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে ও সর্ব্বশেষ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে; মোট শ্লোকসংখ্যা ২০৪৪; লেখক শ্রীমাঝিকাইত, হস্তলিপি (১১৭৪ সন) ১৭৬৮ খৃঃ।

৪। ইন্দ্রদ্যুম্নউপাখ্যান—দ্বিজমুকুন্দপ্রণীত; শ্লোকসংখ্যা ৬৯০; হস্তলিপি (১১৮৪ সন) ১৭৭৮ খৃঃ অব্দ।

৫। দণ্ডীপর্ব্ব—রাজারাম দত্ত প্রণীত; শ্লোকসংখ্যা ১৫০০; লেখক শ্রীরামপ্রসাদ দেএ, হস্তলিপি (১৭০৭ শক) ১৭৮৮ খৃঃ।

৬। নলদময়ন্তী—মধুসূদন নাপিত প্রণীত, শ্লোকসংখ্যা ২১২৪; লেখক শ্রীগৌর-কিশোর ধর, হস্তলিপি (১৭৩১ শক) ১৮০৯ খৃঃ।

৭। হরিবংশ—দ্বিজভবানন্দ কর্ত্তৃক অনুবাদিত, শ্লোকসংখ্যা ৩১৬৮; লেখক শ্রীভাগ্যবন্ত ধুপী, হস্তলিপি (বাং ১১৯০ সন) ১৭৮৩ খৃঃ অব্দ।

৯॥ ক্রিয়াযোগসার—পদ্মপুরাণের একাংশের অনুবাদ। অনুবাদক শ্রীঅনন্তরাম-শর্ম্মা, শ্লোকসংখ্যা ১০৫০। লেখক শ্রীরাঘবেন্দ্র রাজা; হস্তলিপি (১৬৫৩ শক) ১৭৩১ খৃঃ অব্দ।

এই পুস্তকগুলি আমার নিকট আছে; ইহা ছাড়া রঘুবংশের অনুবাদ, বেতালপঞ্চবিংশতি, বায়ুপুরাণ, গরুড়পুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি প্রায় সকলগুলি পুরাণের অনুবাদ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র অনেকগুলি হস্তলিখিত পুঁথি আমরা দেখিয়াছি। শ্রীযুক্ত বাবু অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয় রামনারায়ণ-ঘোষের অতি সুন্দর নৈষধ-উপাখ্যান, সুধন্বা-বধ, ধ্রুব-উপাখ্যান প্রভৃতি কতকগুলি পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন।

অনুবাদ গ্রন্থ সমালোচনা।

ইহাদের প্রায় সকলগুলির রচনাই একরূপ; রচনা সরল, মধ্যে মধ্যে কোমল কবিতাবনিতার লীলাখেলাও একটু একটু দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, এই সব পুস্তক বঙ্গভাষায় সংস্কৃতশব্দ ও উপমারাশি বহুল পরিমাণে আমদানি করিয়াছে। এই যুগের শ্রেষ্ঠ অনুবাদলেখক কাশীদাসের রচনায় যে যে গুণ দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বোক্ত অনুবাদ পুস্তকগুলিতে ন্যূনাধিক পরিমাণে সেই সকল গুণ লক্ষিত হইবে। এই নগণ্য পুস্তকরাশির সুশৃঙ্খল খদ্যোত-দীপ্তি নিবিড় সাহিত্যইতিহাসে তাৎকালিক রুচি ও ভাবের আভাস দেখাইতেছে, তাহা অনুসরণ করিতে করিতে আমরা কাশীদাসের প্রতিভার সন্নিহিত হইয়া পড়ি। পুঁথিগুলি হইতে কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত করা উচিত, নিম্নে আমরা কিছু কিছু অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি;—

(১) প্রহ্লাদের স্তব—"ধ্যান করিয়া প্রহ্লাদ বলে উচ্চস্বরে। চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া যে শ্যামরূপ ধরে॥ কিরীট কুণ্ডল হার বসন সুন্দর। বিজলিমণ্ডিত যেন নব জলধর॥ পীতবাস পরিধান চরণে নূপুর। পদনখদীপ্তি কোটি চন্দ্র করে দূর॥ চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদাপদ্ম করে। অঙ্গেতে কৌস্তুভমণি মহা দীপ্তি ধরে॥"—প্রহ্লাদচরিত্র, বে, গ, পুঁথি; ৯ পত্র।

(২) পরশুরামের বর্ণনা—"হেন কালে আসিলেন পরশুরাম বীর। দৈত্য দানব জিনি নির্ভয় শরীর॥ বাম হস্তে ধরে ধনু দক্ষিণ হস্তে তোমর। পৃষ্ঠেতে বিচিত্র টোণ অতি মনোহর॥ টোণের ভিতরে বাণ জ্বলদগ্নি যেন। এক এক শর মুখে যেন কালযম॥ সুবর্ণ বর্ণ তনু লোচন লোহিত। অঙ্গ হৈতে অদ্ভুত তেজ ক্ষরিত॥ লম্বিত পিঙ্গল জটা পরশিছে কটি। রঘুনাথে দেখি করে হাস্য খটখটি॥"—পরীক্ষিৎসংবাদ, বে, গ, পুঁথি, ২৩ পত্র।

(৩) শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—"আমি ব্যাধিরূপ হৈয়া দেই দুঃখ ভোগ। আমি ঔষধ হৈয়া খণ্ডাই সেই রোগ॥ আমি গয়া আমি গঙ্গা আমি বারাণসী। কীট পতঙ্গ আমি, আমি দিবানিশি॥ আমি পণ্ডিতরূপ আমি মূর্খসম। আমি সে সকল করি উত্তম অধম॥ আমার নাশ নাই আমি করি নাশ। কাম ক্রোধ লোভ মোহ আমারই প্রকাশ॥"—পরীক্ষিৎসংবাদ, ১৪ পত্র। এইরূপ ভাব বাঙ্গালার পল্লীকবির রচনায় পাওয়া যায়—ইহা উন্নত অদ্বৈত-তত্ত্বের কথা; যে শুভাশুভ ব্যাখ্যা করিতে অন্যান্য ধর্ম্মে শুভ ঈশ্বরের সঙ্গে পাপ-স্রষ্টা অপর এক ঈশ্বর কল্পিত, সেই শুভাশুভ বোধ আমাদের ভ্রান্তির উৎপত্তি; শুভ এবং অশুভ মায়াশ্রিত অনন্ত পুরুষের ব্যাপক মহিমার প্রসার; মূর্খ পণ্ডিত, রোগ ও ঔষধ ইঙ্গিতে একে অন্যকে দেখাইতেছে, ইহারা একই অবয়বের দুই ভিন্ন দিক মাত্র, কিন্তু ইহাদের কোনটি তাঁহা ছাড়া নহে। হিন্দুস্থানের পল্লীবাসিগণ পৌত্তলিক, কিন্তু উন্নত বেদান্ত ধর্ম্মের মর্ম্মগ্রাহী।

কাশীদাসকে ছাড়িয়া স্থলে স্থলে ভারতচন্দ্রের উপমাগুলির পূর্ব্ব তত্ত্বও পাওয়া যায়। সাহিত্যের রুচি অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত উপমার প্রতি প্রবর্ত্তিত হইতেছিল। লোকনাথদত্তের নৈষধ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্য; মনোনিবেশ পূর্ব্বক লোকনাথদত্তের রচনা পাঠ করিলে ইহাকে 'ক্ষুদ্র ভারতচন্দ্র' উপাধি দেওয়া যাইতে পারে; দময়ন্তীর রূপ বর্ণনা হইতে—

লোকনাথ দত্ত।

"দেখিয়া সুরঙ্গ তার ওষ্ঠাধর। অরুণ আকৃতি সূর্য্য হৈতে সমসর॥ দূরে থাকি

কুসুম বাঁধুলি বিম্বফল। অপমানে বলে মোর সুরঙ্গ বিফল॥ দেখিয়া চিন্তিত তার দশনের কান্তি। সমুদ্রে প্রবেশ কৈল মুকুতার পাঁতি॥ তার শ্রুতি বিমল দেখিয়া মনোহর। আকাশে উড়িল লাজে গৃধিনী সকল॥ দেখিয়া সুচারু তান দিব্য কেশ পাশ। চমরী বনেতে গেল হইয়া নৈরাশ॥ সীমন্ত বিচিত্র তার দেখি অদ্ভুত। ঘন ঘন গগনেতে লুকায় বিদ্যুত॥ দেখিয়া বিচিত্র গ্রীবা অতি শোভান্বিত। সমুদ্রেতে গেল হংস হইয়া লজ্জিত॥ তনু কঠিন তার পীন পয়োধর। দূরে থাকি হেরিলেক সুমেরু মন্দর॥" —নৈষধ, বে, গ, পুঁথি, ৪০ পত্র। কিন্তু ইহাদের সকলের পূর্ব্বে বিদ্যাপতি কবি গাহিয়া রাখিয়াছিলেন—"কবরী ভয়ে চমরী গিরি কন্দরে, মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশ। হরিণ নয়ন ভয়ে, স্বর ভয়ে কোকিল, গতিভয়ে গজ বনবাস॥ ভুজভয়ে কমল মৃণাল পঙ্কে রহু। কর ভয়ে কিশলয় কাঁপে॥"

কল্পনার এই অতিরঞ্জন বঙ্গসাহিত্যে কাশীদাসের পরে ক্রমেই বেশী হইতে লাগিল। এই সময়ের অন্যান্য কবির লেখায় ইতস্ততঃ উক্তরূপ নানা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; নলদময়ন্তীলেখক মধুসূদন নাপিত দময়ন্তীর কপালে নিবিড় কেশ রেখায় ঈষদাবৃত সুন্দর সিন্দূরের উপমা দিয়াছেন, —"রাহু জিহ্বা নাড়ে যেন চন্দ্রে গিলিবারে॥"

নাপিত কবি।

মধুসূদননাপিতরচিত 'নলদময়ন্তী' কাব্যের নাম উল্লেখ করিয়াছি; এই নরসুন্দর কবি স্বীয় পরিচয়স্থলে বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণের দাস নাপিত কুলেতে উদ্ভব। যাহার কবিত্ব কীর্ত্তি লোকেতে সম্ভব॥ তাহার তনয় বাণীনাথ মহাশয়। পৃথিবী ভরিয়া যার কীর্ত্তির বিজয়॥ তাহান তনয় শিষ্য শ্রীমধুসূদন। শুনিয়া প্রভুর কীর্ত্তি উল্লসিত মন॥" সুতরাং দেখা যাইতেছে কবির পিতামহও কাব্য লিখিয়া লব্ধযশা হইয়াছিলেন। মধুসূদনের রচনা সরল ও হৃদয়গ্রাহী; নাপিতকবি বড় একখানা কাব্য লিখিতে লেখনী গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কৃতকার্য্যতায় কেহ বিদ্রূপ করিতে সুবিধা পাইবেন না; স্বভাববর্ণনা এইরূপ—"কতদূর গিয়ে দেখে রম্য একস্থান। দিব্য সরোবর তথা পুষ্পের উদ্যান॥ তীরে, নীরে, নানা পুষ্প লতায় শোভিত। দক্ষিণা পবন তথা অতি সুললিত॥ কোকিলের ধ্বনি তথা ময়ূরের নৃত্য। ভ্রমরা নাচয়ে তথা ভ্রমরী গাহে গীত॥ পাইয়া শীতল

বারি আনন্দ হৃদয়। স্নান তর্পণ কৈল সৈন্য সমুচয়॥ ছায়া, বারি, শীতল পবন মনোহর। নদীতীরে ভ্রমে রাজা সরস অন্তর॥ আনন্দে কর্য়ে কেলি যত জলচর। চক্রবাক কমলে শোভিত সরোবর॥ হংসে মৃণাল তুলি যাচে হংসিনীকে॥ উড়ে পড়ে চকোরী চকোর ডাকে॥ এই কবির পুঁথিতে দুই একটি স্থলে আমরা লোক-নাথ দত্তের ভণিতা পাইয়াছি।

দণ্ডী পর্ব্ব।

দণ্ডীকাব্যের বিষয় এই—দুর্ব্বাসার শাপে উর্ব্বশীঅপ্সরা পৃথিবীতে ঘোটকী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। একদা অবন্তীর রাজা দণ্ডী শিকার করিতে যাইয়া এই অপূর্ব্ব সুন্দরী ঘোটকীটি দেখিয়া সৈন্যসামন্ত ত্যাগ পূর্ব্বক তাহার পাছে পাছে ধাবিত হন; কতকদূরে গেলে নির্জ্জনে ঘোটকী অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি ধারণ করে, রাজা তাঁহাকে বাড়ীতে লইয়া আসেন; ঘোটকী কামরূপিণী, লোকের সম্মুখে ঘোটকী হইয়া থাকিত, কিন্তু রাজার নিকট সুন্দরী রমণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিত। নারদ ঋষি শ্রীকৃষ্ণকে যাইয়া জানান, তাঁহার অধীনস্থ অবন্তীরাজ খুব সুন্দরী একটা ঘোটকী পাইয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট ঘোটকী চাহিয়া বসেন, উত্তরে দণ্ডী বলিয়া পাঠান, তিনি সিংহাসন এবং রাজ্য ছাড়িয়া দিতে পারেন, ঘোটকী ছাড়িতে পারিবেন না। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দণ্ডী যুদ্ধের উদ্যোগ হইল; দণ্ডী সহায় খুঁজিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভ্রমণ করিলেন। বিভীষণ, বাসুকী, ইন্দ্র, যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন প্রভৃতি কেহই তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষে যুদ্ধে সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। সুতরাং ক্ষুব্ধমনে ঘোটকীপৃষ্ঠে দণ্ডী গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিতে গেলেন; এই গঙ্গার ঘাটে সুভদ্রাদেবী স্নান করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি রাজার উদ্দেশ্য জানিয়া ভীমসেনের নিকট রাজার জন্য অনুরোধ করেন; ভীমসেন সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন; তখন বড় একটা গোল বাঁধিয়া গেল; সুহৃদ বন্ধুগণ সকলে আসিয়া ভীমসেনকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল;—কিন্তু ভীম পাহাড়ের ন্যায় অটল; প্রদ্যুম্ন আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ভীমকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা

করিল, দশ অবতারের এক এক অবতারের লীলা বর্ণন করিয়া প্রত্যুম্ন বলিতে লাগিল "সেই প্রভু ঈশ্বর যে দেব ভগবান। হেন গোবিন্দেরে ভীম কর অল্প জ্ঞান।"—কিন্তু ভীম যে ভ্রুকুটী করিয়াছিল, সে ভ্রুকুটিব্রত ভঙ্গ হইল না। বিষম যুদ্ধ বাধিল। ভীমসেনকে রক্ষা করিতে অগত্যা পাণ্ডব কৌরব একত্র হইল,— এই সুহৃদ চমূপরিবৃত, অটল প্রতিজ্ঞাপরায়ণ, শরণাগত আশ্রয়-কারী ভীমসেনকে শ্রীকৃষ্ণ হইতেও পূজ্য দেবের ন্যায় বোধ হয়—কাব্যের সহজ সুন্দর বর্ণনা রাশি এই বৃহৎ চরিত্রের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া পুষ্প-পল্লবযুক্ত লতার ন্যায় দেখাইতেছে। কতকদূর যুদ্ধ হইয়া আর যুদ্ধ হইল না; যুদ্ধের কারণ ফুরাইয়া গেল—ইতিমধ্যে বিবাদের জিনিষ ঘোটকী অপ্সরা হইয়া স্বর্গে নাচিতে গিয়াছে। 'আর কেন?'—ভাবিয়া দণ্ডী শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

অনন্তরাম দত্ত।

আমরা পূর্ব্বোক্ত কবিগণের মধ্যে কাহারও বিশেষ পরিচয় পাই নাই। সম্ভবতঃ ইঁহারা সকলেই পূর্ব্ববঙ্গের লেখক। উঁহাদের মধ্যে এক মাত্র অনন্তরাম দত্ত (ক্রিয়াযোগসার-প্রণেতা) নিজের এক দীর্ঘ পারিবারিক ইতিহাস দিয়াছেন, তাহার সমস্ত অংশ উঠাইতে স্থান দেখিতেছি না। উহাতে জানা যায়, কবির নিবাস ব্রহ্মপুত্রের নিকটবর্ত্তী মেঘনা নদের পশ্চিম পারস্থিত সাহাপুর গ্রাম, কবির পিতামহের নাম কবিদুর্ল্লভ; কবিদুর্ল্লভের তিন পুত্র, রামচন্দ্র, রাঘবেন্দ্র ও রঘুনাথ। অনন্তরাম এই রঘুনাথের পুত্র, ইঁহার মাতামহের নাম রামদাস। কবি 'বিশারদ' উপাধিবিশিষ্ট কোন লোকের শরণ লইয়া 'ক্রিয়াযোগসার' লিখিয়াছেন। এই আত্মবিবরণের পর 'ক্রিয়াযোগসার' পাঠ করিলে কি কি ফল হয়, তাহার এক লম্বা তালিকা আছে; তাহাতে বিশ্বাস করিলে ইন্দ্রের তক্ত হইতে কুবেরের ভাণ্ডার এবং মৃত্যুর পরে অক্ষয় মুক্তির উপর পাঠকের কায়েমি স্বত্ব জন্মিবে।

এস্থলে আমরা প্রসিদ্ধ একজন অনুবাদ-সঙ্কলনকারীর বিষয় উল্লেখ করিব। অনুবাদ-সম্পাদক রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল; কাশীতে ইঁহার স্মৃতি-জ্ঞাপক জয়-নারায়ণ কলেজ এখনও বিদ্যমান। ১০০ বৎসরের অধিক হইল ইনি কাশীবাসকালে কাশীখণ্ডের তর্জ্জমা করিয়াছিলেন, ইহা মূলের ঠিক অনুযায়ী ও নানাবিচিত্র ছন্দোবন্ধে সুপাঠ্য। পুস্তকের শেষে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এই,—

কবি জয়নারায়ণ।

"কাশীবাস করি পঞ্চগঙ্গার উপর। কাশীগুণ গান হেতু ভাবিত অন্তর॥ মনে করি কাশীখণ্ড ভাষা করি লিখি। ইহার সহায় হয় কাহারে না দেখি॥ মিত্র*শতচৌদ্দ শক পৌষ মাস যবে। আমার মানসমত যোগ হৈল তবে॥ শূদ্রমণি কুলে জন্ম পাটুলি নিবাসী। শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব রায়াগত কাশী॥ তার সঙ্গে জগন্নাথ মুখুয্যা আইলা। প্রথম ফাল্গুনে গ্রন্থ আরম্ভ করিলা॥ শ্রীরামপ্রসাদ বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মণ। ভাঙ্গিয়া বলেন কাশীখণ্ড অনুক্ষণ॥ তাহার করেন রায় তর্জ্জমা খসড়া। মুখুয্যা করেন সদা কবিতা পাতড়া॥ রায় পুনর্ব্বার সেই পাতড়া লইয়া। পুস্তকে লিখেন তাহা সমস্ত শুধিয়া॥ এইমতে চল্লিশ লাচাড়ি হৈল যবে। বিদ্যাবাগীশের কাশী প্রাপ্তি হৈল তবে॥ ভাদ্রমাসে মুখুয্যা গেলেন নিজবাটী। বৎসর স্থগিত ছিল গ্রন্থ পরিপাটী॥ পরন্তু বাঙ্গালীটোলা গেলা যবে রায়। বলরাম বাচস্পতি মিলিলা তথায়॥ পচত্তরী অধ্যায় পর্য্যন্ত তার সীমা। বক্রেশ্বর পঞ্চাননে সমাপ্ত গরিমা॥ কাশী পঞ্চক্রোশী আর নগর ভ্রমণ। এ দুই অধ্যায় পঞ্চাননে সমাপন॥ পরে সম্বৎসরাবধি স্থগিত হইলা। শ্রীউমাশঙ্কর তর্কালঙ্কার মিলিলা॥ যদ্যপি নয়নদুটি দৈবযোগে অন্ধ। তথাপি তাঁহার গুণে লোকে লাগে ধন্দ॥ ইষ্ট নিষ্ট বাক্‌নিষ্ট কাশীপুরে জন্ম। পরানিষ্ট পরাঙ্মুখ বিজ্ঞমর্ম্মী মর্ম্ম॥ লোক উপকারে সদা ব্যাকুল অন্তর। গ্রন্থের সমাপ্তি হেতু হৈলেন তৎপর॥ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার আখ্যান। তর্কালঙ্কারের পিতা সুধীর বিদ্বান॥ নিজে তার সহিত করিয়া পর্য্যটন। ছয়মাসে বহু গ্রন্থ করি সঙ্কলন॥ ঋতু মাস তিথি বার বর্ষ যাত্রা যত। পদ্যেতে আনিয়া সংস্কৃত অভিমত॥ তর্কালঙ্কারের বন্ধু বিষ্ণুরাম নাম। সিদ্ধান্ত আখ্যান অতি ধীর গুণবান্। পদ্ধতি ভাষাতে করিলেন পরিষ্কার। রায় করিলেন সর্ব্ব গ্রন্থের প্রচার॥ † ঘোষালবংশের রাজা জয়নারায়ণ। এই খানে সমাপ্ত করিলা বিবরণ॥ তাঁহার আদেশক্রমে কিতাব করিয়া। রামতনু মুখোপাধ্যায় লইল লিখিয়া॥ সেই বহি দৃষ্টি করি নকলনবিসী। কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চাতরা নিবাসী॥"

---

* মিত্র অর্থ ১৭।

† অপর একখানি পুঁথিতে ইহার পর এই দুইটি ছত্র পাওয়া গিয়াছে:—

"নগর বর্ণন মোর গ্রন্থের কারণ।
প্রত্যক্ষ বৃত্তান্ত তাহা যথার্থ বর্ণন॥"

এই অনুবাদ সঙ্কলন করিতে অনেকগুলি পণ্ডিত খাটিয়াছিলেন, ইহা এখনকার পণ্ডিতমণ্ডলীর উপেক্ষণীয় না হইতে পারে। রাজা জয়নারায়ণের সাহায্যকারী নৃসিংহদেব একজন কবি ছিলেন, তাঁহার রচিত কয়েকটি সুন্দর শ্যামাসঙ্গীত আমরা দেখিয়াছি। নৃসিংহদেবের সন্তানগণ এখন হুগলী বাঁশবাড়িয়া গ্রামে বাস করিতেছেন। উদ্ধৃত অংশ-দৃষ্টে বোধ হয়, নৃসিংহদেব অনুবাদকার্য্যে মহারাজকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু পুস্তকের সর্ব্বত্র জয়নারায়ণের ভণিতা দৃষ্ট হয়। কাশীখণ্ডের অনুবাদ ১১২০০ শ্লোকে পূর্ণ। ইহার প্রত্যেক অধ্যায়ে কত শ্লোক আছে, তাহা অধ্যায়শেষে প্রাচীনরীতি-অনুসারে একটি প্রহেলিকার সঙ্কেতে জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

নৃসিংহদেবের সাহায্য, কাশী-খণ্ডের অনুবাদ।

কিন্তু পুস্তকের মূলভাগ হইতে, পুস্তকশেষে যে কাশীর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহার মূল্য বেশী। রাজাবাহাদুরের লিপিকৌশল—তাঁহার সত্যপ্রিয়তা। তাৎকালিক কাশীর যে চিত্র তিনি দিয়াছেন, তাহা এক-শত বৎসরের যবনিকা তুলিয়া অবিকল কাশীর মূর্ত্তিটি আমাদের চক্ষে অঙ্কিত করিয়া দিতেছে; কালে এই চিত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ক্রমে আরও বৃদ্ধি পাইবে; তখন ম্যাণ্ডিভাইলের জেরুজিলাম, ব্যাসের ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ডের প্রাচীন কাশী, হিউনসাঙের কুশীনগর এবং নরহরি চক্রবর্ত্তীর বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের চিত্রপটের সঙ্গে কাশীর এই মানচিত্রখানি এক স্থানে রক্ষিত হইবার উপযুক্ত হইবে।

কবি গঙ্গার অর্দ্ধ গোলাকৃতি তীরের উপর বক্রভাবেস্থিত কাশীকে মহাদেবের কপালের অর্দ্ধচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথমে অসি-ঘাট, পরেশনাথের ঘাট, সাজাদার ঘাট, বৈদ্যনাথের ঘাট, নারদপাড়ের ঘাট, প্রভৃতি ৫৩টি ঘাটের এক ক্ষিপ্র বর্ণনা দিয়া লইয়াছেন, তন্মধ্যে

কাশীর চিত্র।

তাহাদের আয়তন, গঠনপ্রণালী ও তৎসম্বন্ধে চলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমোদ-পূর্ণ জনশ্রুতির উল্লেখ আছে; তৎপরে পোস্তাগুলি, তাহাদের সংখ্যাও কম নহে। সূচীপত্রের সঙ্গে দুই একটি কৌতূহলোদ্দীপক কথা থাকিলে তাহাদের নীরসতা ঘোচে, রাজাবাহাদুরের রচনারও ইহাই গুণ; পোস্তা-গুলির মধ্যে—"মীরের পোস্তাকে সর্ব্বপ্রধান গণিব॥ উর্দ্ধে ষষ্টি হাত দীর্ঘে ত্রিশত প্রমাণ। যেমত পর্ব্বত মধ্যে সুমেরু প্রধান॥" পোস্তাগুলির পরে "ঘাটিয়া" ব্রাহ্মণদিগের কথা; স্নানান্তে লোক সমূহের কপালে তিলক কাটিয়া দেওয়া ইত্যাদি ইহাদের কাজ। কলিকাতা গঙ্গার ঘাটে উড়িয়া মহাশয়-গণ এই কাজ করিয়া থাকেন, অর্দ্ধ পয়সার তৈল খরিদ করিয়াই স্নানকারী ইহাদের "যজমান্‌অ" হইয়া বসেন। তৎপর অট্টালিকাগুলির বর্ণনা; দ্বিতল, ত্রিতল ও চৌতলের সংখ্যাই বেশী কিন্তু—"কদাচিত ছয়তলা সাততলা সাজে।" শ্রীমাধব রায়ের ধারারা কাশীর সর্ব্বোচ্চ মন্দির চূড়া, ইহা ১১০ হস্ত উচ্চ, ৯০ হস্তের পর বসিবার স্থান আছে,—"সুমেরুর দুই শৃঙ্গ যেমত প্রকাশ। মনে হয় তার চূড়া ভেদিল আকাশ॥ তাহার উপর যদি কোন জন যায়। সেই সে কাশীর শোভা দেখিবার পায়॥" এই ধারারা দুঃখী ও নিরাশাগ্রস্তের শেষ উপায় ছিল, তাহারা ইহার উপর হইতে পড়িয়া মরিত। রাজা বাহাদুরের কাশীবাস কালে যে সকল হতভাগ্য ব্যক্তি ইহার উপর হইতে প্রাণ দিয়াছে, তাহাদের উল্লেখ আছে; এক ব্যক্তি কোন সুন্দরীর প্রেমে মজিয়া তাহার সহিত সেই ধারারার উপর উঠে, তিন দিন প্রণয়িযুগ্ম সেই স্থানে যাপন করিয়া শেষে উভয়ে পড়িয়া মরে। কিন্তু মৃত্যু ইচ্ছা করিলেই সর্ব্বদা মরা যায় না, "অন্য একজন সেই ধারারাতে চড়ি। দৈবক্রমে তথা হৈতে তরুপরে পড়ি॥ তরুডাল সহ পুনঃ হইয়া ভূমিষ্ঠ। অনায়াসে নিজ গৃহে হইল প্রবিষ্ট॥" এখন মিউনিসিপালিটি যে কার্য্য করেন, পূর্ব্বে ধর্ম্মভীরু গৃহস্থগণ তাহা সম্পন্ন করিতেন—"মহাজনটোলীমধ্যে রাস্তাতে সর্ব্বথা। দিনকর হিমকর করহীন তথা॥ একারণ নিশাযোগে পথিকের প্রীতে। দীপ শিখা করে সবে নিজ খিড়কীতে॥"

কবি অসংশ্লিষ্ট, অথচ সর্ব্বত্র উৎসুকনেত্র পথিকের ন্যায় সরলভাবে

ভালমন্দ কথার উল্লেখ করিয়া যাওয়াতে চিত্রের কোন কোন অংশ বেশ হাস্যরসোজ্জ্বল হইয়াছে—"লামা সন্ন্যাসীর কত শত মঠ। বাহ্যে উদাসীন মাত্র গৃহী অন্তঃপট॥ সদাগরী মহাজনী ব্যবসা সবার। এক এক জনার বাড়ী পর্ব্বত আকার॥" ভণ্ডপাণ্ডাদের "কাহার ঠাকুর মঠে কার ঠাকুরাণী। বাটী পরিপাটী হেরি যেন রাজধানী।" এবং উৎকৃষ্ট দধিদুগ্ধপুষ্ট "শ্রীবিগ্রহমূর্ত্তি যেন রাজরাজেশ্বর॥" তৎপরে নানাজাতির বর্ণনা আছে; ব্রাহ্মণদের বেদাধ্যয়ন, সামবেদ পাঠ, লোকবৃন্দের গঙ্গাতীরে আমোদ প্রমোদ—এ সব তুলিতে অঙ্কিত চিত্রের মত; এবং আখ্যায়িকার সর্ব্বত্র অতিশয় শ্রদ্ধা, বিনয় ও ধর্ম্মপ্রাণতার উৎকৃষ্ট পরিচয় আছে। কাশীর কুচা-গলিতে সেই সময়ে সর্ব্বদা হত্যাকাণ্ড হইত—"এই মত প্রতি মাসে প্রায় হয় দ্বন্দ্ব। ক্ষণমাত্রে গড়াগড়ি যায় কত স্কন্ধ॥" শিল্পকারগণ কি কি সামগ্রী প্রস্তুত করিতে অভ্যস্ত ছিল, তাহার একটি পূর্ণ তালিকা আছে; জোলাগণ কিংখাপ, একপাটা, জামদানী, সাড়ী, শামলা, গুদড়, তাসের উপর ধনুকপাটা ও জরীমণ্ডিত বস্ত্র প্রস্তুত করিত ও "দ্বিশত পর্য্যন্ত থান মূল্যের নির্ণয়।" কিন্তু "সাদাতে রেশম পাড়ি কত রঙ্গ করে। শুদ্ধ সাদা অত্যুত্তম করিতে না পারে।" নদীয়ার কারিকরগণ পাষাণ দ্বারা অতি সুন্দর শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিত। তৎপর দেবমন্দিরগুলির বর্ণনা,—এ বর্ণনা উজ্জ্বল, পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নাট্যশালার ন্যায় বিচিত্র শোভা-উদ্ঘাটক; তখন অহল্যাবাইএর মন্দির নূতন প্রস্তুত হইয়াছে; পাষাণের খোদগারি ফুল, ফল, লতা ও দক্ষিণদেশস্থ মর্ম্মরের বিশাল বৃষের কথা উল্লেখ করিয়া উপসংহারে—"কনক কলস শোভে মন্দির উপর। তিন লক্ষ ব্যয়ে যেই না হৈল কাতর॥" ইহার পরে বিষ্ণু মহাদেব মহারাট্টার মন্দির ও অপরাপর মন্দিরের বিস্তৃত উল্লেখ—বর্ণনা এরূপ সরল, জীবন্ত ও সুন্দর—পাঠক যেন পথে দেখিতে দেখিতে যাইবেন। কাশীবাসিনী ধর্ম্মপ্রাণা রমণীগণের বর্ণনা আছে, তাঁহাদিগের ধর্ম্মব্রতানুষ্ঠান ও গঙ্গাস্নানাদির পরে রূপবর্ণনা—"গণ্ডারের চুড়ি কারু কনকে রচিত। ঘোর ঘন মাঝে যেন তড়িত জড়িত॥ কি উপমা দিব যেই পিঠে দোলে বেণী। অখণ্ড কদলী দলে বিহরে নাগিনী॥" তাঁহাদের

নোলকে—"বড় দুই মুক্তা মাঝে চুণি শোভা করে। যেমত দাড়িম্ব বীজ শুক চঞ্চু ধরে॥" কিন্তু এই বিষয় কবিকে হঠাৎ প্রলুব্ধ করিতে পারে। কবির অলক্ষিতে উপমার উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া পড়িয়াছিল—"কারু উরঃদেশে মুক্তামালার দোলানী। হিমাচলে আন্দোলিত যেন মন্দাকিনী॥" কিন্তু সতর্ক লেখক লেখনীকে সংযত করিতে জানিতেন—"এসব দর্শনে ভক্তি মনেতে হইবে। কদাচিত অন্যভাব মনেতে নহিবে॥" ইহার পরে কাশীবাসী নানা জাতির অনুষ্ঠিত ধর্ম্মোৎসব, বার মাসের নানারূপ ব্যাপারাদি বর্ণিত আছে। "তুলসী-বিবাহ" সেই সময়ে কাশীর একটি বৃহৎ উৎসব ব্যাপার ছিল—রামলীলা, দুর্গালীলা, প্রভৃতি যাত্রা সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত হইত।

কাশীখণ্ডের পুঁথি।

কাশীখণ্ডের যে পুঁথিখানি আমার নিকট আছে, তাহা প্রেমানন্দদাসের হস্তের লেখা। ইহার হাতের লেখা মুক্তার ন্যায় গোটা গোটা ও পুষ্পিতা লতার ন্যায় নানা ভঙ্গীতে ক্রীড়াশালিনী; এই লেখার সর্ব্বত্রই 'ব' অক্ষরটি 'র'এর মত লিখিত হইয়াছে—ইহা মিথিলার ধরণে। প্রেমানন্দের হস্তের নকল আরও কতকগুলি পুঁথি আমার নিকট আছে—কাশীখণ্ডের হস্তলিপি ১৮০৯ খৃঃ অব্দের। সর্ব্বশেষে কবি প্রেমানন্দ নিজ রচিত দুইটি গান দিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবীয় মাধুর্য্য-মাখা দুর্গা-বন্দনা।

কবির পরিচয়।

এস্থলে আমরা সংক্ষেপে কবি জয়নারায়ণের জীবন কাহিনী বিবৃত করিব। কবির পূর্ব্বপুরুষগণের তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে—১। যদুনাথ পাঠক, ২। গোপীকান্ত, ৩। রামকৃষ্ণ, ৪। রাজেন্দ্র, ৫। বিষ্ণুদেব. ৬। কন্দর্প। কন্দর্পের ৩ পুত্র,—১। কৃষ্ণচন্দ্র, ২। গোকুলচন্দ্র, ৩। রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। গোকুলচন্দ্রের ৫ পুত্র,—১। বৃন্দাবনচন্দ্র, ২। রামনারায়ণ, ৩। হরিনারায়ণ, ৪। লক্ষ্মীনারায়ণ, ৫। গঙ্গানারায়ণ।

এই পঞ্চ পুত্রের কাহারও বংশ রক্ষিত হয় নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের একমাত্র পুত্র জয়নারায়ণ ঘোষাল। যদুনাথ পাঠক "দেশাধিপ" হইতে গোবিন্দপুর, গর্‌য়া বেহালা প্রভৃতি স্থানে বিস্তর ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। কবি জয়নারায়ণ ঘোষালের পুত্র রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল তাঁহার পিতৃদেবের জীবনাখ্যান উৎকীর্ণ করিয়া একখানি সুবৃহৎ তাম্রফলক প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজনারায়ণ ঘোষালের জীবনী অতি বিশদরূপে আখ্যাত হইয়াছে, এই তাম্রফলক হইতে জানা যায়, ১১৫৯ সালে ৩রা আশ্বিন জয়নারায়ণের জন্ম হয়; তিনি অল্প বয়সেই সংস্কৃত, পার্শী, হিন্দী, ইংরাজী এবং ফরাশী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১১৭২ সনে জয়নারায়ণ মোবারেক উদ্দলার অধীনে একটি সম্মানিত পদ গ্রহণ করেন। তিনি ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিশেষ প্রীতির পাত্র হইয়াছিলেন এবং জরিপ কার্য্যে গবর্ণমেণ্টকে বিশেষরূপ সহায়তা করাতে, পদস্থ ইংরেজগণ সর্ব্বদা তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। দিল্লীর সম্রাট ইঁহাকে "মহারাজা" উপধি দান করেন। "জয়নারায়ণ কলেজে"র কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত কাশীতে দুর্গাকুণ্ডের নিকটে ইনি একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে "গুরুপ্রতিমা" প্রতিষ্ঠিত করেন। "গুরু কুণ্ডের পুকুর"ও রাজা জয়নারায়ণের ব্যয়ে খনিত। ১২০০ সনে ইনি কাশীতে "শ্রীকরুণানিধান" নামক কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ১২২৮ সালের ২১শে কার্ত্তিক ৬৯ বৎসর বয়সে রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে প্রাণত্যাগ করেন।

কাশীখণ্ডের অনুবাদ ব্যতীত, জয়নারায়ণপ্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাওয়া গিয়াছে :—

কবির অপরাপর গ্রন্থ।

১। শঙ্করী-সঙ্গীত, ২। ব্রাহ্মণার্চ্চন-চন্দ্রিকা, ৩। জয়নারায়ণ-কল্পদ্রুম, ৪। করুণানিধান-বিলাস।

এই পুস্তকগুলির মধ্যে শেষোক্ত গ্রন্থখানিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে, এবং পুস্তখানির নাম স্পষ্টতই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "করুণা-নিধান বিগ্রহের" নামানুসারে রক্ষিত হইয়াছে। এ পুস্তক-খানিতেও আমরা রাজকবির অত্যন্ত বিনয় ও ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় পাই। রঘুনাথ ভট্ট নামক জনৈক ব্যক্তি এই পুস্তক রচনায় তাঁহাকে সাহায্য করেন,—ইহা গ্রন্থ-সূচনায় উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। ১২২০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে এই কাব্য রচনা আরব্ধ হয়, এবং ১২২১ সালে ইহা সমাপ্ত হয়। গ্রন্থারম্ভে কবি স্বীয় অবস্থান্তর ও ভাবান্তরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি নিচয়ে যে বৈরাগ্যের ঝাঁজ আছে, পরিণামে রাজার চিত্তে তাহাই বিকাশ পাইয়াছিল।—

করুণানিধান-বিলাস।

"প্রথম বয়সে মন বিষয়েতে গেল।
মধ্যম বয়স শেষ রোগেতে ভোগিল॥
পঞ্চাশ বিগত পরে জরায় ঘেরিল।
মরণের ভয় আসি অন্তরে পশিল॥"

কবির একটি রচনায় আমরা আধুনিক ভূগোল বৃত্তান্তের সূচনা পাইয়া কতকটা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। যাঁহারা "ত্রিকোণ ধরাতল" "বাসুকীর শির সঞ্চালনের" ক্রীড়নক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন, তাঁহাদের একজনের মুখে—

"দক্ষিণেতে এফরিকা সকলে জানিবে।
পূর্ব্বদিকে হিন্দুদেশ এসিয়া বলিবে॥"
"পৃষ্ঠদেশে এমেরিকা ধরা গোলাকার।"

প্রভৃতি বর্ত্তমান মানচিত্রের বিশুদ্ধ সংবাদ পাওয়ার আশা আমরা করি নাই। তার পর ধর্ম্মসম্বন্ধে কবি হিন্দুশাস্ত্রে একান্ত অনুরাগ-পরায়ণ হইয়াও অপরাপর ধর্ম্মমতের সত্য অগ্রাহ্য করেন নাই;—তাঁহার আর একটি রচনা এইরূপ,—

"উত্তরেতে লামাগুরু নানক পশ্চিমে।
রামশরণ নাম এক হবে পূর্ব্ব ধামে॥
পুত্ররূপী অবতার হইবে পশ্চিমে।
ইষু ক্রাইষ্ট নাম তার রাখিবেক জনে॥"

(খ) রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির অনুবাদ।

রামায়ণ।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত রচনা।

আমরা কৃত্তিবাসকে বঙ্গের আদি রামায়ণ-রচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। কবিকঙ্কণ ইঁহাকে বন্দনা করিয়া লিখিয়াছেন—"করযোড়ে বন্দিলাম ঠাকুর কৃত্তিবাস। যাঁহা হৈতে রামায়ণ হইল প্রকাশ॥" (অনুসন্ধান, ১৩০২, ২৯৫পৃঃ) এবং পরবর্ত্তী বহুবিধ মহাজন ইঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া অনুবাদ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা কৃত্তিবাস সম্বন্ধে লিখিয়াছি, তাঁহার রামায়ণ সম্ভবতঃ অনেকটা মূলের অনুরূপ ছিল। আমরা হস্তলিখিত পুঁথিগুলিতে তরণীসেনবধ, বীরবাহুবধ, শ্রীরামের দুর্গাপূজা প্রভৃতি মূলবিষয়বহির্ভূত প্রসঙ্গ পাই নাই। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—"শ্রীরামের ভগবতী-পূজা ও রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন প্রভৃতি প্রস্তাব শ্রীরামপুর-মুদ্রিত পুস্তকে কিছুমাত্র নাই।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ৮৪ পৃঃ); সুতরাং আমাদের বিশ্বাস ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে,—কৃত্তিবাস-রচিত সংক্ষিপ্ত মূলানুযায়ী রামায়ণের খাতার সঙ্গে পরবর্ত্তী কবিগণ নানা পুরাণ-সঙ্কলিত প্রস্তাবাংশ ক্রমশঃ একত্র গাঁথিয়া দিয়াছেন* ;—সর্ব্বশেষে যিনি এই সংশোধন ও যোজনাদি

---

* ৩০০ বৎসরের প্রাচীন কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথি কয়েকখানির উত্তরকাণ্ডে মূল-বহির্ভূত অনেক প্রসঙ্গ,—যথা দক্ষযজ্ঞ প্রভৃতি, দৃষ্ট হয়। তুলসীদাসকৃত হিন্দীরামায়ণের উত্তরকাণ্ডেও মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার রহিয়াছে। বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণে তাহা দৃষ্ট হয় না। উত্তরকাণ্ড সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের মত এস্থানে বিচার্য্য নহে, কিন্তু ইহা একরূপ নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, রামায়ণের উত্তরকাণ্ড বাল্মীকি-রচিত নহে, এতৎসম্বন্ধে তিনটি যুক্তি অকাট্য। সেই যুক্তি তিনটী এই :—

কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাকে নিকটে পাইয়া আমরা ধরিতে পারিয়াছি—তিনি জয়গোপাল তর্কালঙ্কার; কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী 'জয়গোপালগণকে' প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অভিযুক্ত করিয়া ধৃত করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। সম্ভবতঃ কৃত্তিবাসের রাক্ষসগণ শ্রীরামের বন্দনাগীত গান নাই। কিছু পরে ভক্তির বন্যায় দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল; সেই ভক্তির কয়েকটি লহরী কৃত্তিবাসী রামায়ণের অসুরগুলির প্রস্তরকঠিনহৃদয় বিধৌত করিয়া তাহাদিগের রূপ সাত্ত্বিকভাবের স্নিগ্ধমহিমা-সংশ্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল; সুতরাং জাতীয় প্রতিভার হস্তে কৃত্তিবাসের প্রতিভা নূতন রূপে গঠিত হইয়াছিল। কোন কোন্ কবি কৃত্তিবাসের ছদ্মবেশে আদিকবির অক্ষরের সঙ্গে স্বীয় অক্ষর মিলাইয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। আমরা কাহার প্রাপ্য যশোমাল্য কাহার কণ্ঠে দোলাইতেছি, কে বলিবে? শৈশবকালে আমরা

১। আদিকাণ্ডে বাল্মীকিমুনির প্রশ্নানুসারে মহর্ষি নারদ রামায়ণাখ্যানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে উত্তরকাণ্ডবর্ণিত বিষয়গুলি উল্লিখিত হয় নাই—সেই সংক্ষিপ্ত আখ্যানটিতে লঙ্কাকাণ্ডের বিবরণ অবধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। বলা বাহুল্য, রামায়ণের এই পূর্ব্বাভাষই বাল্মীকিপ্রণীত মহাকাব্যের মূল অবলম্বনীয় হইয়াছে।

২। লঙ্কাকাণ্ডের শেষভাগে যে ভাবে উপসংহার করা হইয়াছে, তদ্রূপ ভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোন কাণ্ডের শেষ করা হয় নাই, উক্ত উপসংহারটি ভাল করিয়া পড়িলে সেই স্থানেই যে রামায়ণ শেষ করা হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হয়।

৩। যাবাদ্বীপে রামায়ণ প্রচলিত আছে, তাহার উত্তরকাণ্ড নাই; উত্তরকাণ্ড রচিত হইবার পূর্ব্বেই আর্য্যগণ সে দেশে রামায়ণ প্রচলিত করিয়াছিলেন, এতদ্দ্বারা ইহাই অনুমিত হয়। উত্তরকাণ্ড রচিত হইবার পরে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের সঙ্গে যাবাদ্বীপের সমস্ত সংস্রব বিচ্যুত হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া এ বিষয়ে গ্রন্থে অন্তর্বর্ত্তী অন্যান্য বহুসংখ্যক প্রমাণ আছে,—তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। উত্তরকাণ্ডের অনুবাদগুলিতেও একটির সঙ্গে অন্যটির মিল দৃষ্ট হয় না।

বীরবাহুর স্তুতির এই অংশ সাগ্রহে পাঠ করিয়াছি ;—"গজ স্কন্ধ হইতে বীর নেহালে শ্রীরাম। কপটে মনুষ্য দেহ দুর্ব্বাদল শ্যাম॥ চাঁচর চিকুর শোভে চৌরশ কপাল। প্রসন্ন শরীর রাম পরম দয়াল॥ ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন অতি মনোহর। ভুবন-মোহন রূপ শ্যামল সুন্দর॥ রামের হাতের ধনু বিচিত্র গঠন। সকল শরীরে দেখে বিষ্ণুর লক্ষণ॥ নারায়ণরূপ দেখি রাবণ কুমার। নিশ্চয় জানিল রাম বিষ্ণু অবতার॥ হাতের ধনুকবাণ ভূতলে ফেলায়ে। গজ হৈতে নামি কহে বিনয় করিয়ে॥ ধরণী লোটায়ে রহে জুড়ি দুই কর। অকিঞ্চনে কর দয়া রাম রঘুবর॥ প্রণমহ রামচন্দ্র সংসারের সার॥ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বিষ্ণু অবতার॥" কিন্তু এই বিষ্ণুভক্তির গন্ধচন্দনমাখা কবিতা-শেফালিকা কাহার? ইহার লেখক খুব সম্ভব কৃত্তিবাস নহেন। অঙ্গদের রায়বারের উৎকৃষ্ট বিদ্রূপাত্মক পংক্তিগুলি কৃত্তিবাসের নহে,—উহা 'কবিচন্দ্র' নামধেয় কোন অজ্ঞাত মহাজনের ভণিতাযুক্ত। বটতলার রামায়ণে রামচন্দ্র সীতার জন্য সূর্য্যকে ডাকিয়া যে সুললিত পদ্যে বিলাপ করিয়াছেন, তাহা খুব সম্ভব কৃত্তিবাস সে ভাবে লিখিয়া যান নাই। ইহা শুনিয়া কোন কোন কৃত্তিবাস-ভক্ত পাঠকের দুঃখ হইতে পারে—কিন্তু কঠিন সত্যের আঘাতে জীবনের কত প্রাণ-প্রিয় ধারণা বিসর্জ্জন দিতে হয়,—এই জীবন-স্বপ্ন ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে স্বপ্নরাজ্যের অন্তর্গত কত ছোট ছোট স্বপ্ন নিত্য নিত্য ভাঙ্গিয়া যায় ;—দুরন্ত নেংটা শিশুটির ন্যায় সত্য ক্রীড়াচ্ছলে আমাদের সুকুমার বৃত্তির ফুলগুলি লইয়া টানাহেঁচড়া করিতে ভালবাসে।

এখন দেখা যাইতেছে, বহুসংখ্যক পরবর্ত্তী কবি যুগে যুগে যুগোচিত নববস্ত্র পরাইয়া কৃত্তিবাসকে বঙ্গদেশে প্রচলিত রাখিয়াছেন, তবে কৃত্তিবাসকে তাঁহারা একবারে ঢাকিয়া ফেলিতে পারেন নাই। আদিকবির সারল্য ও কবিতার অনাড়ম্বর মাধুর্য্য বর্ত্তমান-আকারগ্রস্ত রামায়ণেরও সর্ব্বত্র লীলা করিতেছে, যাঁহারা তাঁহার পুস্তকে রচনা প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন, তাঁহারাও নিজ লেখা কৃত্তিবাসী সারল্যের ছাঁচে গড়িয়া তবে জোড়া দিতে পারিয়াছেন।

কিন্তু প্রকাশ্যভাবে কৃত্তিবাসের পর অনেক কবি রামায়ণ রচনা করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন। সেই সমকক্ষতা-ইচ্ছু কবিগণের কেহই আদি কবির যশঃ হরণ করিতে পারেন নাই। কেবল যাঁহারা তাঁহার কাব্যে বিন্দু বিন্দু অনুরূপ রচনা মিশাইয়া নিজেরা গা ঢাকা দিয়াছেন, তাঁহারা নামগোত্রশূন্য হইয়া আদি কবির বিরাট কাব্যে আশ্রয় পাইয়াছেন।

অপরাপর রামায়ণ-রচকগণ।

আমরা এস্থলে সংক্ষেপে অপরাপর রামায়ণরচকদিগের উল্লেখ করিয়া যাইতেছি ;—

১ ও ২। ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেন—ইঁহারা পিতা পুত্র। ইঁহাদের বাসস্থান "দীনার দ্বীপ" বলিয়া পুঁথিতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত অক্রূরচন্দ্রসেন মহাশয় অনুমান করেন, এই দীনার দ্বীপ ও মহেশ্বরদি পরগণার অন্তর্গত সোণার গাঁর নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান 'ঝিনারদি' একই স্থান। ষষ্ঠীবর ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। ২০০ বৎসর পূর্ব্বের হস্তলিখিত পুঁথিগুলিতেও ইঁহাদের উভয়ের রচনা পাওয়া যাইতেছে। ইঁহারা উভয়েই সাহিত্যব্রতে আজীবন বিব্রত ছিলেন। পদ্মাপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সমস্ত প্রসঙ্গেই ইঁহাদের প্রতিভা খেলিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিগুলির অধিকাংশেই এই উদ্যোগী কবিদ্বয়ের লেখার নমুনা আছে। একখানি প্রাচীন পদ্মাপুরাণে দেখা গেল—ষষ্ঠীবরের উপাধি ছিল 'গুণরাজ।' মালাধর বসু, হৃদয়মিশ্র ও ষষ্ঠীবর—বঙ্গসাহিত্যে এই তিন ব্যক্তির উপাধি "গুণরাজ" পাওয়া যাইতেছে। ষষ্ঠীবর, জগদানন্দ নামক কোন ব্যক্তির আশ্রয়লাভ করিয়া কাব্য লিখিয়াছিলেন, সেই পরিচয়ের অংশ ১২৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ষষ্ঠীবরের রচিত রামায়ণের অনেক উপাখ্যান পাওয়া গিয়াছে। ষষ্ঠীবরের রচনা সংক্ষিপ্ত, সরল ও পরিপক্ক, কিন্তু তৎপুত্র গঙ্গাদাসের রচিত পদ্য চঞ্চল ও সুন্দর, তাহা বেশ চিত্তাকর্ষক ; তত সংক্ষিপ্ত নহে, কিন্তু বিস্তৃত হইয়াও মনোরম—কোন অংশই বিরক্তিকর হয় নাই। গঙ্গাদাসের রচিত রামায়ণের উত্তরকাণ্ড হইতে নমুনা দেখাইতেছি ;—সীতার অযোধ্যায় প্রবেশের পর শ্রীরাম বলিলেন—"অগ্নিশুদ্ধা হইয়া সীতা পুরীমধ্যে যাউক। পাপিষ্ঠ অযোধ্যার লোক চক্ষু ভরি চাউক॥" কিন্তু সীতার "মুক্তা জিনি বিন্দু বিন্দু চক্ষে পড়ে পানি। রাম সম্বোধিয়া বোলে গদগদ বাণী॥ সংসারের সার তুমি অগতির গতি। আপনি জান যে আমি সতী কি অসতী॥ পৃথিবীনন্দিনী

ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস।

আমি তোমার ঘরণী॥ বিধাতা স্থজিল মোরে করি অলক্ষ্মীণী॥ বারংবার আনি আমা দোষ পুনি পুনি। নগরে চত্বরে যেন কুলটা রমণী॥ অপমান মহাদুঃখ না সও পরাণে। মেলানি মাগিল সীতা তোমার চরণে॥ তবে তুমি পরে আর নাহি মোর গতি। জন্মে জন্মে স্বামী হউ তুমি রঘুপতি॥ এই বলিয়া সীতাদেবী অতি মনোদুখে। মা মা বলিয়া সীতা ঘন ঘন ডাকে॥ সাগর সঙ্গম ভার সহিবার পার। আমার ভার মা কেন সহিতে না পার॥" কবি গঙ্গাদাস সেন প্রায় প্রত্যেক পত্রেই পিতা ও পিতামহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—"পিতামহ কুলপতি পিতা ষষ্ঠীবর। যার যশঃ ঘোষে লোকে পৃথিবী ভিতর॥" ষষ্ঠীবর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার আরও অনেক কারণ আছে। আমরা মহাভারত আলোচনা করিবার সময় এই দুই কবির প্রসঙ্গ পুনশ্চ উত্থাপন করিব।

৩। ভবানী-দাস বিরচিত লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়। ভবানীদাস জয়চন্দ্র নামক কোন রাজার আদেশে এই পুস্তক রচনা করেন। লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন অনুষ্ঠিত নানা দেশবিজয়ের বৃত্তান্ত এই কাব্যে লিখিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়ে প্রায় ৫০০০ শ্লোক আছে, সুতরাং ইহা আকারে বড়; কিন্তু গুণে বড় বলিয়া বোধ হয় না, রচনা শুষ্ক ও একঘেয়ে। এই কাব্যের কয়েকটি স্থলে রামচরণনামক কবির ভণিতা আছে। ভবানীদাস-বিরচিত "রাম-স্বর্গারোহণ" নামক আর একখানি কাব্য আমরা দেখিয়াছি। "লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়" ও "রাম-স্বর্গারোহণ" একই ভবানীদাসের লিখিত কিনা বলা যায় না। শেষোক্ত পুঁথিতে গ্রন্থকারের এই একটু সামান্য পরিচয় আছে;—"নবদ্বীপ বন্দম অতি বড় ধন্য। যাহাতে উৎপত্তি হৈল ঠাকুর চৈতন্য॥ গঙ্গার সমীপে আছে বদরিকাশ্রম। তাহাতে বসতি করে ভবানীদাস নাম॥ বামনদেব পিতা যশোদা জননী। সপুত্রে বন্দম যবে সর্ব্বলোক জানি॥" এই সমস্ত পরিচয় সম্বন্ধে একটি কথা এই যে, পরিচয়ের অংশ প্রায় সমস্ত প্রাচীন পুঁথিতেই পাঠবিকৃতি-দোষে দুষ্ট। গ্রাম এবং ব্যক্তিবিশেষেব নাম কয়েকবার নকলের পরে যথাযথরূপে পাওয়া সুকঠিন।

ভবানীদাস।

৪। দ্বিজ দুর্গারাম প্রণীত রামায়ণ—ইহা শ্রীযুক্ত অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয় পাইয়াছেন। ইহা কৃত্তিবাসের পরে লিখিত, কবি নিজে তাহা অনেক স্থলে স্বীকার করিয়াছেন। কবির কোনও আত্ম-বিবরণ পাওয়া যায় নাই। আমি এই পুস্তক পড়ি নাই। অক্রূর বাবু লিখিয়াছেন—

দুর্গারাম।

ইহার রচনা বড় মধুর। আমরা দ্বিজ দুর্গারামপ্রণীত কালিকাপুরাণের একখানি অনুবাদ পাইয়াছি।

৫। জগৎরাম রায়ের রামায়ণ—কিঞ্চিৎ অধিক ২৫০ বৎসর হইল, বাঁকুড়া জেলার ভুলুই গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জগৎরাম রায় জন্মগ্রহণ করেন।

জগৎরাম রায়।

এই গ্রাম রাণীগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে, ও বাঁকুড়ার ২০ মাইল উত্তরে। সাবেক ভুলুইগ্রাম নদীগর্ভে,—এখনকার ভুলুইগ্রামে জগৎরাম রায়ের বংশধরগন বাস করিতেছেন। ভুলুই ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলির দৃশ্য বেশ রমণীয়, কবির উপভোগ্য ও বাসস্থানের উপযুক্ত—"ভুলুই স্থানটি এখনও অতি রমণীয়। দক্ষিণে অল্পদূরে বিহারীনাথ শৈল, পশ্চিমে কিছু দূরে পঞ্চকোট শৈল-শ্রেণী ও অরণ্য, উত্তরে অতি নিকটে শীর্ণ দামোদর দুই পার্শ্বে বিস্তীর্ণ বালুকাস্তূপের মধ্য দিয়া তরল রজত রেখার ন্যায় ধীরে বহিয়া যাইতেছে।" (পাক্ষিক সমালোচক, ১২৯১ বাং ভাদ্র)। কবির পিতার নাম রঘুনাথ রায় ও মাতার নাম শোভাবতী। পঞ্চকোটের রাজা রঘুনাথসিংহভূপের আদেশে ইনি রামায়ণের অনুবাদ আরম্ভ করেন, ১৭১২ সম্বতে (১৬৫৫ খৃঃ অব্দ) এই পুস্তক শেষ হয়। রামায়ণের পর এই কবি "দুর্গাপঞ্চরাত্রি" নামক একখানা কাব্য রচনা করেন, ইহাতে রামচন্দ্র কর্তৃক কিষ্কিন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত দুর্গোৎসব বর্ণিত হইয়াছে। ১৬০২ শকে (১৬৮০ খৃঃ অব্দ) ইহা সম্পূর্ণ হয়। এই কাব্যের ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমীর পালা জগৎরাম রায়ের রচিত, অবশিষ্ট দুই পালা তৎপুত্র রামপ্রসাদ রচনা করেন। জগৎরাম রায়ের রামায়ণে মধ্যে মধ্যে বেশ সুন্দর বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহা ততদূর প্রাঞ্জল নহে। মিষ্ট শব্দ ব্যবহারে কবি সর্ব্বত্র পটু নহেন; "দুর্গাপঞ্চরাত্রি" কবির পরবর্ত্তী কাব্য, ইহার রচনা পরিপক্ক ও বেশ উপাদেয়। শিব ও গৌরীর কথাবার্ত্তা লইয়া মধুর ও তীব্র একটি দাম্পত্য-কোন্দল লিখিত হইয়াছে; গোপীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের 'রাখালী', 'পীতধটা' ও 'তিন ঠাঁই বাঁকার' খোঁটা ও শিবঠাকুরের সিদ্ধিধুতুরাপ্রিয়তা উপলক্ষে গৌরীর মিষ্টভৎর্সন—সোহাগে ও গালিতে মিশ্রিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে রৌদ্রমিশ্রবৃষ্টির ন্যায় কৌতূহলকর। জগৎরাম রায়ের কবিত্বের নমুনা;—"তুমিহে যেমন, বলিলে তেমন, এমতি তোমার কায। তব দোষ নয়, ধুতুরাতে কয়, তেঞি সে এমন সাজ॥ এই করিয়া, সব খোয়াইয়া, হয়েহ দিগম্বর। তোমার গুণে, বিঁধিল ঘুণে, আমার অন্তর॥ বিভূতি গায়, দেবের সভায়, যে যায় নেংটা বেশে। এমত কথা, বলিতে হেথা, লাজ কি সুখে এসে॥ ভাঙ্গের ঘোরে, নয়ন ফিরে, চলিতে ঠাহর নাই। জটার ঘটা, বিভূতি ফোঁটা, দেখিলে ভয় পাই॥" রামপ্রসাদও পিতার

অযোগ্যপুত্র নহেন,—'দুর্গাপঞ্চরাত্রি'তে তিনি এই ভাবে মুখবন্ধ করিয়াছেন,—"নবমী দশমী দুই দিবসের গান। বর্ণনা করিতে মোরে দিলা আজ্ঞা দান॥ আজ্ঞা পেয়ে হর্ষ হয়ে কৈনু অঙ্গীকার। যেমন মশকে লয় মার্জ্জারের ভার॥ বামন বাসনা যেন বিধু ধরিবারে। পঙ্গু লঙ্ঘিবারে চায় সুমেরু শিখরে॥ তেন অঙ্গীকার কৈনু পিতার বচনে। আগু পাছু কিছুমাত্র না ভাবিলাম মনে॥" রামপ্রসাদরচিত অপর একখানি বড় কাব্য আছে, তাহার নাম—"কৃষ্ণলীলামৃতরস।"

৬। সারদামঙ্গল—শিবচন্দ্র সেন প্রণীত। গ্রন্থকারের পরিচয় এইরূপ—"বৈদ্যকুলে জন্ম হিঙ্গুসেনের সন্ততি। সেনহাটি গ্রামে পূর্ব্ব-পুরুষ-বসতি॥ রামচন্দ্রনাম গুণধাম প্রতিষ্ঠিত। যশে কুলে কীর্ত্তিতে বিখ্যাত বিরাজিত। রত্নেশ্বর গুণবান্ তাহার তনয়। রতন স্বরূপ কুলে হইলা উদয়॥ এ হেন তনয় হৈলা ভুবনে বিখ্যাত। রামনারায়ণ সেন ঠাকুর আখ্যাত॥ সেন-ঠাকুরের পুত্র তুলনায় অতুল। রামগোপাল নাম উভয় শুদ্ধকুল॥ গঙ্গাদেব দত্তপুত্র তাহার পবিত্র। শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ সেন নাম সুচরিত্র। বিক্রমপুরেতে কাঁটাদিয়া গ্রামে ধাম। ধন্বন্তরিবংশে জন্মে প্রাণনাথ নাম॥ সরকারে সুপাত্রে করিলা কন্যা দান। গঙ্গাপ্রসাদ সেন ঠাকুর কীর্ত্তিমান॥ জন্মিল তাঁহার এই তৃতীয় সন্তান। শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র নাম॥" 'সারদামঙ্গল' কাব্য বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এককালে সর্ব্বত্র পঠিত হইত। এই শিবচন্দ্র সেন কবি ভারতচন্দ্রের কিছু পরে আবির্ভূত হন। শ্রীরাম-চন্দ্রের দুর্গাপূজা রামায়ণে সারদামাহাত্ম্যজ্ঞাপক, এই জন্য কবি রামায়ণকে 'সারদামঙ্গল' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। 'সারদামঙ্গল' অনেক দিন হইল মুদ্রিত হইয়াছিল, এখন সেই মুদ্রিত বহি দুষ্প্রাপ্য।

শিবচন্দ্র সেন।

৭। অদ্ভুতআচার্য্যের রামায়ণ—নিত্যানন্দ নামক এক ব্রাহ্মণ 'অদ্ভুতআচার্য্য' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছিলেন, এই রামায়ণখানিও এক সময়ে বিশেষরূপ আদৃত হইয়াছিল,—অনেক স্থলেই ইহার প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্রবসু-মহাশয়সংগৃহীত পুঁথিতে গ্রন্থকারের এইরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে;—"প্রপিতামহো বন্দো জাহার খণ্ড। তাহার পুত্র উপজিল নামেতে প্রচণ্ড॥ তাহার তনয় হ'ল নামে শ্রীনিবাস। গুণ মহাশয় তেঁহো নারায়ণের দাস॥ তাঁহে পুত্র উপজিল মাণিক প্রচার। জন্মিল চারি পুত্র চারি সহোদর। চারি সহোদর পণ্ডিত গুণনিধি। ভারতীর প্রসাদে হইল অলক্ষিত সিদ্ধি॥ সোনা রাজ্যে নাম ছিল বড়বাড়ী গ্রাম। শুভক্ষণে হইল যে নিত্যানন্দ নাম॥

অদ্ভুতআচার্য্য।

মহাপৌরুষ তবে জন্মিল সংসারে। যত যত সৎকর্ম্ম তার পৃথিবী ভিতরে॥ দেবগণে মুনিগণে কর্ম্ম শুভাচার। অদ্ভুত নাম হইল বিদিত সংসার॥ মাঘ মাসে শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী তিথি। ব্রাহ্মণবেশে পরিচয় দিলেন রঘুপতি॥ প্রভুর কৃপা হইল রচিতে রামায়ণ। অদ্ভুত হৈল নাম সেই সে কারণ॥ যজ্ঞোপবীত নাহি বয়সে সপ্ত বৎসর। রামায়ণ গাহিতে আজ্ঞা দিলা রঘুবর॥ জন্মি নাহি জানে বিপ্র অক্ষরের লেশ। যত কিছু কহে বিপ্র রাম উপদেশ॥ পয়ার প্রবন্ধে পোথা করিল প্রচার। তপোবলে হইল তার এ তিন কুমার॥

"সাকে বেদ রিতু সপ্ত চন্দ্রেতে বি×তে। সপ্তমি রেবতি যুত বার ভৃগুসুতে॥ কর্কটাতে স্থিতি রবিপঞ্চদশমীতে। কৃষ্ণপক্ষে সমাপ্তিকা প্রথম যামেতে॥" ১৬৬৪ শকের কথা নির্দ্দিষ্ট আছে, অথচ শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় ইহাকে "সম্বৎ" বলিয়াছেন। কিন্তু এ কার্য্য করা যে সঙ্গত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে তিনি নিজেই একটু সন্দিহান, এই জন্যই "বোধ হয় ১৬৭৪ সালে" এই ভাবে গ্রন্থকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অদ্ভুত-আচার্য্যের রামায়ণ প্রায় ২০০ শত বৎসর হইল বিরচিত হইয়াছিল, আমরাও ইহা অনুমান করি। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সংগৃহীত পুঁথিখানিরই বয়স অনুমানিক ১৫০ শত বৎসর। শ্রীযুক্ত অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয় ইহার খুব প্রাচীন একখানি পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন, এতদবস্থায় "১৭৬৪ শক" সমর্থিত হওয়ার উপায় কি? এদিকে রসিকবাবুর মতানুসারে "শক" শব্দের অর্থ "সম্বৎ" করিয়া নূতন অভিধান সৃষ্টিপূর্ব্বক ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় শুদ্ধ করিবার আমাদিগের অধিকার আছে কি না, তাহাও সন্দেহস্থল। আমার বিবেচনায় ১৭৬৪ শক গ্রন্থ রচনার কাল নহে, উহা গ্রন্থ নকল করিবার কাল। "কৃষ্ণপক্ষে সমাপ্তিকা প্রথম যামেতে।" এই চরণ দ্বারা গ্রন্থের নকল সমাপ্ত হইল, এই অর্থগ্রহণই স্বাভাবিক হয়। প্রাচীন অনেক পুঁথিরই শেষাংশে নকল করিবার তারিখ এইরূপ সাঙ্কেতিক ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইত। যাহা হউক আমরা রসিক বাবুর উদ্ধৃত অংশ অবলম্বন করিয়াই এই মত প্রকাশ করিলাম। শক স্থলে সম্বৎ অর্থ করিবার যদি অপর কোন কারণ থাকে, তবে তাহা শেষে বিবেচ্য। অদ্ভুতআচার্য্য সপ্তমবর্ষ বয়সে রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন, একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। বস্তুতঃ তিনি নিজেও এ কথা কোথাও বলেন নাই। রামচন্দ্র তাঁহার সপ্তমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন, ও রামায়ণ গাহিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তখন কবির যজ্ঞোপবীত হয় নাই। তৎপর সম্ভবতঃ উপযুক্ত বয়সেই কোনও সময় তিনি রামায়ণ রচনা করিয়া থাকিবেন। তিনি নিজে লেখা পড়া জানিতেন না, শুধু দৈবশক্তিবলে রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন—এই জন্য তাঁহার উপাধি হইয়াছিল অদ্ভুতাচার্য্য। তিনি লেখা পড়া না জানিয়া রামায়ণের আচার্য্য হইয়া দাঁড়াইলেন, সুতরাং অদ্ভুত-আচার্য্য নন তবে কি? তিনি নিজেই এ কথা

বলিয়াছেন,—"জন্মি নাহি জানে বিপ্র অক্ষরের লেশ। যত কিছু কহে বিপ্র রাম উপদেশ॥"

তাঁহার রামায়ণে আর একটী অদ্ভুত কথা আছে ;—ইহাতে সীতাকে কাল্মীর অবতার কল্পনা করিয়া বাল্মীকির সীতার উপর এক নূতন সীতা দাঁড় করান হইয়াছে।

৮। কবিচন্দ্র-কৃত রামায়ণ—ইঁহার বিবরণ মহাভারত প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৯। শঙ্কর-বিরচিত রামায়ণ *—শঙ্কর প্রণীত আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা ও সুন্দরাকাণ্ড পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ ইনিও সমস্ত রামায়ণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহার পরিচয় এইটুকু পাওয়া গিয়াছে,—"সাগরদিয়ার বন্দ্য রবিকরী সর্ব্বানন্দ, গোবিন্দতনয় বিজয়রাম। তস্য পঞ্চ পুত্র দ্বিজ ভবানী শঙ্করাগ্রজ,"—ইত্যাদি। অপর এক স্থলে "বন্দিয়া জানকানাথে শ্রীশঙ্কর গায়।" শঙ্কর ও কবিচন্দ্র সম্ভবতঃ অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। উভয়ের একত্র ভণিতাযুক্ত দুই একখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে।

শঙ্কর।

১০। লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত রামায়ণ—লক্ষ্মণকবি সম্ভবতঃ বশিষ্ঠকৃত অধ্যাত্মরামায়ণের বঙ্গীয় অনুবাদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই রামায়ণের প্রায় ২০০ শত বৎসরের প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১১। রামমোহনের রামায়ণ—এই অনুবাদ একরূপ আধুনিক, ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে এই পুস্তক সমাপ্ত হয়। রামমোহনের পিতার নাম বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ; বাড়ী নদীয়া জেলার গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ মেটেরী গ্রাম। গ্রন্থকার পিতার আদেশে নিজ বাড়ীতে সীতারাম বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই বিগ্রহদ্বয়ের নিকট খুব ভক্তির উৎসব চলিত বলিয়া কবি বর্ণনা করিয়াছেন, "সে রামের দ্বারেতে সতত হুড়াহুড়ি। কেহ নাচে কেহ গায় দেয় গড়াগড়ি॥" পিতার আদেশে কবি সীতারাম বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন ও "কৃপা করি আদেশ করিলা হনুমান্। রামায়ণ রচি কর জীবের কল্যাণ॥" তদনুসারে—"রচিলাম তাঁর আজ্ঞা ধরিয়া মস্তকে। সাঙ্গ হইল সপ্তদশ শতষষ্টি শকে॥" এই রামায়ণ সর্ব্বত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণের ন্যায় প্রাঞ্জল না হইলেও মধ্যে মধ্যে এরূপ অংশ আছে, যাহা আদি কবির প্রতিভার কণিকাপাতে স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যে মণ্ডিত হইয়াছে, যথা—"আষাঢ়ে নবীন মেঘ

রামমোহন।

* অনন্ত রামায়ণেও শঙ্করের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, ১৪৪ পৃষ্ঠা দেখ।

দিল দরশন। যেমত সুন্দর শ্যাম রামের বরণ॥ ঘন ঘন ঘন গর্জ্জে অতি অসম্ভব। যেমন রামের ধনু টঙ্কারের রব॥ রয়ে রয়ে সৌদামিনী চমকে গগনে। যেমন রামের রূপ সাধকের মনে॥ ময়ূর করয়ে নৃত্য নব মেঘ দেখি। রাম দেখি সজ্জন যেমত হয় সুখী॥ সদা জলধারা পড়ে ধরণী উপরে। সীতা লাগি যেমত রামের চক্ষু ঝুরে॥ সরসিজ শোভাকর হৈল সরোবরে। যেমন শোভিত রাম সেবক-অন্তরে॥ মধু আশে পদ্মে অলি বাস করে মোদে। যেমত মুনির মন রাঘবের পদে॥ জলপানে চাতকের তৃষ্ণা দূরে যায়। রাম পেলে যেমত বাসনা ক্ষয় পায়॥ পুলকিত হয়ে মেঘ ডাকে ঘনে ঘন। যেমত রামেরে ডাকে নামপরায়ণ॥ নদ নদী অতি বেগে সমুদ্রে মিশায়। যেমত রামের অঙ্গে জীব লয় পায়॥ অবিরত বৃষ্টিতে পৃথ্বীর তাপ যায়। যেমত তাপিত রামনামেতে জুড়ায়॥" (কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড)। কবির বিদ্রূপ শক্তি বেশ ছিল। ভরত ও শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় ফিরিলে পরে কুব্জা সকলের নিকট বড়াই করিয়া বলিয়াছিল, সে রাজপুত্রদের নিকট অনেক ভূষণ উপঢৌকন পাইবে। তৎপরিবর্ত্তে শত্রুঘ্নের প্রহারে কুব্জ দেহ ন্যুব্জ হইয়া পড়িল ও লজ্জায় কুব্জা পলাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। তখন—"নারীগণ কহে ভূষা দেখাইয়া যা। কুব্জা কহে ভাতার পুতের মাথা খা।" হনুমান লঙ্কাদগ্ধের পর বন্দী অবস্থায় ঢাক-ঢোল-বাদ্য-সমন্বিত হইয়া লঙ্কার পথে পথে নীত হইতেছেন,—"হনুমান কন মোর বিবাহ না হয়। কন্যাদান করিবে রাবণ মহাশয়॥ রাবণের কন্যা মোর গলে দিবে মালা। রাবণ শ্বশুর মোর ইন্দ্রজিত শালা॥ চারিদিকে হাসয়ে যতেক নিশাচর। কেহ বা ইষ্টক মারে কেহ বা পাথর॥ হনুমান কন বিবাহের কাজ নাই। এমন মারণ খায় কাহার জামাই॥"—সুন্দরাকাণ্ড। ইহা আধুনিক সংযত রহস্যের ওষ্ঠচাপা হাস্য নহে—ইহা ধূলি ও কাদা হস্তে উচ্চ হো হো শব্দমুখর সেকেলে হাস্যরস। রামমোহন কবির ভ্রাতুষ্পৌত্র শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট এই পুস্তকের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আছে।

১২। রঘুনন্দন গোস্বামি-রচিত রামায়ণ। রঘুনন্দনও বেশী প্রাচীন লেখক নহেন।

রঘুনন্দন গোস্বামী।

১০০ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল গত হইল তিনি বর্দ্ধমান জেলাস্থিত মাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রঘুনন্দন নিত্যানন্দবংশ-সম্ভূত; বংশতালিকা এইরূপ—১। নিত্যানন্দ, ২। বীরভদ্র, ৩। বল্লভ, ৪। রামগোবিন্দ, ৫। বিশ্বম্ভর, ৬। বলদেব, ৭। কিশোরীমোহন, ৮। রঘুনন্দন। কিশোরীমোহনের আর তিন পুত্র ছিল, বিশ্বরূপ, সঙ্কর্ষণ ও মধুসূদন; রঘুনন্দন তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। কিশোরীমোহন স্বয়ং এক জন প্রসিদ্ধ ভাগবত

ছিলেন ও তিনি নিজে বহুবিধ বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রঘুনন্দনের গুরুর নাম গণেশ বিদ্যালঙ্কার। 'সেকাল আর একাল,' পুস্তকে লিখিত আছে, রঘুনন্দন প্রায়শঃ প্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতায় আসিতেন; সেন মহাশয় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

রঘুনন্দনের মাতার নাম উষা ও বিমাতার নাম মধুমতী ছিল। 'রামরসায়ন' ব্যতীত রঘুনন্দনের শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার-লীলা বিষয়ক 'শ্রীরাধামাধবোদয়' নামক একখানি বড় গ্রন্থ আছে। রঘুনন্দনের অপর নাম ভাগবত।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের পর, অপরাপর যে সকল রামায়ণের অনুবাদ আমরা পাইয়াছি, তন্মধ্যে 'রামরসায়ন' খানিই ভাল বলিয়া বোধ হয়। কবি অনেকাংশে বাল্মীকিকে অনুসরণ করিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ হইতেও কোন কোন অংশ গৃহীত হইয়াছে। রামরসায়নের অধ্যায়-বিভাগ ঠিক বাল্মীকির পথে করা হয় নাই, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী রামায়ণগুলি হইতে এখানি বেশী সুশৃঙ্খল, সন্দেহ নাই। অধ্যায়গুলি এইভাবে বিভক্ত হইয়াছে;—আদ্যকাণ্ড ১২, অযোধ্যা ৮, আরণ্য ৮, কিষ্কিন্ধ্যা ১০, সুন্দরা ১২, লঙ্কা ৩৬ ও উত্তরাকাণ্ড ১৮ অধ্যায়। কবির রচনায় সংস্কৃতশব্দ অতিরিক্তমাত্রায় পড়িয়াছে, মধ্যে মধ্যে তাহা শ্রুতিকটু হইয়াছে; কিন্তু এরূপ রচনাও বিরল নহে—"এথা রঘুবর, করিতে সমর, সুখেতে মগন হইয়া। অতি সুকোমল, তরুণ বাকল, পরিলা কটিতে আঁটিয়া॥ শিরে অবিকল, জটার পটল, বাঁধিলা বেড়িয়া বেড়িয়া। পরিলা বিকচ, কঠিন কবচ, শরীরে সুদৃঢ় করিয়া॥" রঘুনন্দনের পয়ারে ১৪ অক্ষরের নিয়ম ক্বচিৎ লঙ্ঘিত হইয়াছে। এই কাব্যে নানা ছন্দের লীলা খেলা দৃষ্ট হয়, তাহা পরে আলোচনা করিব। কিন্তু কবির সংস্কৃতপরায়ণতা সত্বেও হিন্দীভাষার ছিটা ফোঁটা তাঁহার কাব্যের প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। কাঁহিতু, কৈলু, তিঁহ, তবহু প্রভৃতি ক্ষুদ্র শব্দগুলি সংস্কৃতের সুশৃঙ্খল ও পরিশুদ্ধ প্রণালীর মধ্যে হিন্দী-প্রভাবের পতনোন্মুখ ধ্বজা উড়াইতেছে।

কবি রামরসায়নের উত্তরকাণ্ডে করুণরসের অংশগুলি ছাড়িয়া দিয়াছেন। সীতাবর্জ্জন, লক্ষ্মণ-বর্জ্জন, সীতার পাতালপ্রবেশ রামরসায়নে স্থান পায় নাই। যে ঘটনা মনকে দুঃখের তরঙ্গে ফেলিয়া যায়, যাহাতে প্রাকৃতিক বিধানের উৎকর্ষের উপর সন্দেহ জন্মে, যেখানে সত্য ও শুভের অসমর্থতা প্রমাণিত হয়—তাহাদের শ্মশানের উত্তাপে করুণার অশ্রুবিন্দু শুকাইয়া যায়, বৈষ্ণবগণ সেরূপ ঘটনা বর্ণনা করিতে ভালবাসিতেন না। সেজন্যই চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতে গৌরাঙ্গপ্রভুর তিরোধান বর্ণিত হয় নাই।

বিয়োগান্ত দৃশ্য অঙ্কন করিতে হিন্দুকবিগণ সততই অনিচ্ছুক, এই জন্য নায়ক-নায়িকার

দুঃখময় জীবন সমাপ্ত হইলে তাঁহারা শ্মশানের উপরে পটক্ষেপ করিয়া পাঠকের মনে ব্যথা দেন না; কল্পনার স্বর্গরাজ্য গড়িয়া নায়ক নায়িকাকে তথায় পৌঁছাইয়া ক্ষান্ত হন, বিয়োগান্ত দৃশ্য কবির লিপি-কৌশলে সুখান্ত দৃশ্যের আভা ধারণ করিয়া পাঠকের দুঃখ ভুলাইয়া দেয়।

রঘুনন্দন তাঁহার রামরসায়ন গৃহপ্রতিষ্ঠিত 'শ্রীরাধামাধব' বিগ্রহের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন—"করিলাম যেই রামবিলাস বর্ণন। শ্রীরাধামাধবে ইহা করিনু অর্পণ॥"

পূর্ব্বোক্ত অনুবাদগুলি ছাড়া, দ্বিজ দয়ারামকৃত তরণীবধ, ফকিররাম কবিভূষণকৃত লঙ্কাকাণ্ড (বাং ১০০৮ সালের পুঁথি), ভিকন গুরুদাসকৃত আরণ্যকাণ্ড, দ্বিজ তুলসীকৃত "রায়বার", কাশীনাথকৃত ("বাস মোর জল্লীপুরে, আছি ঢেরে")৷ "কালনেমীর রায়বার" প্রভৃতি ও অপরাপর বহু কবিকৃত রামায়ণের বিচ্ছিন্নাংশ পাওয়া গিয়াছে।

মহাভারত, ভাগবত, চণ্ডী প্রভৃতি।

মহাভারতে উপগল্প।

রামায়ণকাব্যে আদত উপাখ্যান ভিন্ন বাজে প্রসঙ্গ বেশী নাই; কিন্তু মহাভারতের মূলগল্পের সহিত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগল্প জড়িত হইয়া রহিয়াছে ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনাদির সঙ্গে যযাতি, নল ও দুষ্মন্ত দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে উপমন্যু, আরুণি ও উতঙ্ক প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তিগুলি দাঁড়াইয়াছেন; মূল ঘটনা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সঙ্গে ইঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই—ইঁহারা প্রাচীন শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ কেন্দ্রস্থ কোন দেববিগ্রহের উর্দ্ধে ও নিম্নে ছোট ছোট অবান্তর চিত্রের ন্যায় মহাভারতের মলাট শোভিত করিতেছেন মাত্র। মহাভারতের উপগল্পের অবধি নাই, পাঠক পড়িতে পড়িতে ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন—দ্রৌপদীর বস্ত্রের ন্যায় তাহারা একরূপ অফুরন্ত। জন্মেজয়ের ন্যায় অনুসন্ধিৎসু শ্রোতা ও বৈশম্পায়নের ন্যায়

ধৈর্য্যশীল বক্তা পরস্পরের গুণের পরিচয় দিতে ইচ্ছুক হইয়াই যেন পুঁথি এত অপরিমিতরূপে দীর্ঘ করিয়া তুলিয়াছেন; রুরুর গল্পের অর্দ্ধভাগ শেষ না হইতেই সর্পযজ্ঞের গল্প, এই গল্পের আধখানা শেষ না হইতেই আবার সমুদ্রমন্থনের প্রসঙ্গ আরম্ভ, সমুদ্রমন্থনের কথা শেষ না হইতেই ইন্দ্রের লক্ষ্মীভ্রষ্ট হওয়ার বিবরণ,—এই গল্পের অকূল সমুদ্রে পড়িয়া পাঠকের দিশাহারা হইয়া যাওয়ার কথা।

এরূপ কাব্যে গল্প জোড়া দেওয়ার বড় সুবিধা। জন্মেজয়কে দিয়া একটা প্রশ্ন করিলেই লেখক স্বীয় কল্পিত গল্পটি জুড়িয়া দিতে পারেন। বাঙ্গালা মহাভারতগুলি এই ভাবে ক্রমে ক্রমে বড় হইয়াছে;—মূল-বহির্ভূত শ্রীবৎস ও চিন্তার উপাখ্যানের ন্যায় অনেক বাজে গল্প মহাভারতরূপ মহাবৃক্ষের আশ্রয় পাইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

কাশীদাসের পূর্ব্বগামিগণ।

আমরা কাশীদাসের পূর্ব্বে রচিত সঞ্জয় মহাভারত, ও কবীন্দ্ররচিত (পরাগলী) মহাভারত সমগ্র পাইয়াছি, এবং নসরত সাহার আদেশে রচিত মহাভারতের সংবাদ পাইয়াছি, এই মহাভারত পরাগলী মহাভারতের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ষষ্ঠীবরসেনরচিত স্বর্গারোহণ পর্ব্বের শেষপত্রে জানিতে পারা গিয়াছে, তিনিও সমগ্র মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দ ঘোষ।

নিত্যানন্দ ঘোষ নামক জনৈক প্রসিদ্ধ কবি সমস্ত মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই মহাভারতই পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। সঞ্জয় যেরূপ পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ মহাভারত-অনুবাদ-কারক, নিত্যানন্দও পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে সেইরূপ স্থানই অধিকার করিয়াছিলেন। গৌরীমঙ্গলকাব্যের মুখবন্ধে কবি পৃথ্বীচন্দ্র লিখিয়াছেন—"অষ্টাদশ পর্ব্ব ভাষা কৈল কাশীদাস। নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব্বে ভারত প্রকাশ॥" নিত্যানন্দঘোষরচিত মহাভারতের নানা অধ্যায় নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে; কাশীদাসী মহাভারতের

শেষ পর্ব্বগুলিতে নিত্যানন্দের রচনাই অনেক স্থলে অপহৃত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে, আমরা পরে তাহা দেখাইব।

কবিচন্দ্র।

কিন্তু বোধ হয় নিত্যানন্দঘোষ হইতেও বিশিষ্টতর একজন কবি তাঁহার সমসময়ে মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইঁহার নাম অজ্ঞাত, কিন্তু উপাধি ছিল 'কবিচন্দ্র'। পাদটীকায় ইঁহার রচিত ৪৬ খানি পুঁথির নাম নির্দ্দেশ করা গেল। * এই সমস্তগুলিই একই 'কবিচন্দ্র' রচনা করিয়াছিলেন

* ১। অক্রূর আগমন, শ্লোক সংখ্যা ১৫০, হস্তলিপি ১০৯০ বাং। ২। অজামিলের উপাখ্যান, হঃ লিপি ১০৮৭ বাং। ৩। অর্জ্জুনের দর্পচূর্ণ, শ্লোক ২০০, হঃ লিপি ১২৫৪। ৪। অর্জ্জুনের বাঁধবাঁধা পালা, শ্লোক ১৩০, হঃ লিপি ১১০১ বাং। ৫। উঞ্ছবৃত্তিপালা, ২৩০,—১০৬১ বাং। ৬। উদ্ধবসংবাদ ৪০০,—১০৬১ বাং। ৭। একাদশীব্রতপালা, ২৫০,—১০৮৭ বাং। ৮। কংসবধ, ৪০০ শ্লোক। ৯। কণ্বমুনির পারণ, ১২২০ বাং। ১০। কপিলামঙ্গল ২০০ শ্লোক। ১১। কুন্তীর শিবপূজা, ১০০,—১০৭৯ বাং। ১২। কৃষ্ণের স্বর্গারোহণ ১২৫,—১০৮৫ বাং। ১৩। কোকিলসংবাদ, ১৪৫,—১২৬৬ বাং। ১৪। গেড়ু-চুরি, ২০০,—১২৮০ বাং। ১৫। চিত্রকেতুর উপাখ্যান, ২৫০, শ্লোক। ১৬। দশম পুরাণ, ৫৫০,—১২১৪ বাং। ১৭। দাতাকর্ণ, ২০০ শ্লোক,—১০৬২ বাং। ১৮। দিবারাস, ১৮০,—১২৪৯ বাং। ১৯। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, ১১০৯ বাং। ২০। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, ১৬০ শ্লোক। ২১। ধ্রুবচরিত্র, ২১১,—১২৬৬ বাং। ২২। নন্দবিদায়, ১১৬৫ বাং। ২৩। পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, ১২৫ শ্লোক। ২৪। পারিজাতহরণ, ২৫০ শ্লোক। ২৫। প্রহ্লাদচরিত্র, ৪০০,—১০৭১ বাং। ২৬। ভরত উপাখ্যান, ৬০০,—১০৮০ বাং। ২৭। মহাভারত বনপর্ব্ব, ২৯০,—১০৮৫ বাং। ২৮। উদ্যোগপর্ব্ব, খণ্ডিত, ১৫০ শ্লোক। ২৯। ভীষ্মপর্ব্ব, দ্রোণপর্ব্ব, খণ্ডিত। ৩০। কর্ণপর্ব্ব, ২০০,—১০৮৩ বাং। ৩১। শল্যপর্ব্ব, ১৭০—১০৮৩ বাং। ৩২। গদাপর্ব্ব, খণ্ডিত। ৩৩। রাধিকামঙ্গল, ২৩০—১০৯৭। ৩৪। রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, খণ্ডিত। ৩৫। রাবণবধ, ৫২,—১২৪৬ বাং। ৩৬। রুক্মিণীহরণ, ২০০ শ্লোক। ৩৭। শিবরামের যুদ্ধ, খণ্ডিত। ৩৮। শিবিউপাখ্যান, ১৩০,—১২৪৭ বাং। ৩৯। সীতাহরণ, ৮০,—১২১৬ বাং। ৪০। হরিশ্চন্দ্রের পালা, ২৫০,—১২০৩ বাং। ৪১। অধ্যাত্ম-

বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যদিও পুঁথিগুলি সংখ্যায় বেশী, তথাপি একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই সাধারণতঃ উহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—(১) রামায়ণ (২) মহাভারত (৩) ভাগবত। তিনি এই তিন গ্রন্থের সমস্ত কিংবা অধিকাংশ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন; এবং লেখকগণ সুবিধা বুঝিয়া ঐ তিন গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন পালা লইয়া পুঁথির আকারে নকল করিয়াছিলেন; এইজন্য উক্ত তিন গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যান এক এক খানি পুঁথিস্বরূপ হইয়া মূল গ্রন্থগুলিকে বহুধা বিভক্ত করিয়াছে। ভাগবতের অনুবাদ হইতে যে সকল উপাখ্যান স্বতন্ত্রাকার ধারণ করিয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকখানির শেষেই—ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।" কিংবা "গোবিন্দমঙ্গল কবিচন্দ্রের বিরচন।" এইরূপ ভণিতা আছে। এতদ্ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক পালার শেষেই "সপ্তম স্কন্ধের কথা কবিচন্দ্র গায়।" "পঞ্চম স্কন্ধের কথা শুনিতে অমৃত।" এই ভাবে ভাগবতের স্কন্ধ নির্দ্দেশিত আছে এবং 'কবিচন্দ্র' ব্যাসের আদেশে ভাগবত অনুবাদ করিতেছেন, ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ পরিচিত ভণিতা দৃষ্টে একজন কবিই সমস্ত পালাগুলি রচনা করিয়াছেন, স্বতঃই ইহা মনে হয়। গৌরীমঙ্গল-কাব্যের ভূমিকায় বর্ণিত আছে যে, কবিচন্দ্র-উপাধিবিশিষ্ট এক ব্যক্তি গোবিন্দমঙ্গল নামক ভাগবতের ভাষানুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন; ইনিই সেই 'কবিচন্দ্র' বলিয়া আমাদের ধারণা। মহাভারত এবং রামায়ণও 'কবিচন্দ্র' সংক্ষেপে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহাতেও সেই ব্যাসের আদেশের কথা ভণিতায় উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটি কথা এই যে, কবিচন্দ্রের অধিকাংশ পুঁথিই বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি হইতে পাওয়া গিয়াছে। সেই পুঁথিসমূহের

রামায়ণ, খণ্ডিত, ১১৫০ বাং। ৪২। অঙ্গদরায়বার, ১২৫৬ বাং। ৪৩। কুম্ভকর্ণের রায়বার ২২ শ্লোক। ৪৪। দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ, খণ্ডিত, ১১৯৪ বাং। ৪৫। দুর্ব্বাসার পারণ, খণ্ডিত, ১১৯৩ বাং। ৪৬। লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

অনেকগুলিরই হস্তলিপি বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগের কিংবা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী সময়ের। পাদটীকায় নির্দ্দিষ্ট ৪৬ থানি পুঁথির মধ্যে ৩৪ থানির তারিথ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ১৭ থানি বাঙ্গালা ১০৬১—১১০৯ সনের মধ্যে লিখিত। এক দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন লেথকগণ অনতিদূরবর্ত্তী সময়ের মধ্যে যে সমস্ত পুঁথি নকল করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একই কথায় একই ভাবের ভণিতা দৃষ্টেও আমরা তদুল্লিথিত 'কবিচন্দ্রকে' এক ব্যক্তি সাব্যস্ত করিয়াছি। এথন কবিচন্দ্রের একটু সামান্য পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তৎসম্বন্ধে এই কয়েকটি ছত্র পাওয়া গিয়াছে;—"কবিচন্দ্র দ্বিজ ভণে ভাবি রমাপতি। লেগোর দক্ষিণে ঘর লুয়ায় বসতি॥" ভাগবতামৃত বা গোবিন্দমঙ্গল ৭ম স্কন্ধ। ১০১ নং পুঁথি (পরিষৎপত্রিকা, ১৩০৪, ৪র্থ সংখ্যা)॥ "চক্রবর্ত্তী মুনিরাম, অশেষ গুণের ধাম, তস্য সুত কবিচন্দ্র গায়।" ভাগবতামৃত, ১১৩ নং পুঁথি। "শ্রীযুত গোপাল সিংহ নৃপতির আদেশে। সংক্ষেপে ভারত কথা কবিচন্দ্র ভাষে॥" মহাভারতে, দ্রোণপর্ব্ব, ১৩০৮ নং পুঁথি। ইহা ছাড়া অনেক স্থলেই 'কবিচন্দ্র-চক্রবর্ত্তী' এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই বিখ্যাত অনুবাদকের নাম ছিল শঙ্কর এবং উপাধি ছিল কবিচন্দ্র। ইঁহার দৌহিত্রবংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত মাথনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইঁহার রচিত অনেক পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন।

কাশীদাসের পূর্ব্বে এইরূপ বহুবিধ মহাভারতের অনুবাদ বঙ্গদেশের নানা স্থানে প্রচলিত ছিল। শুধু সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ নহে, কাশীদাস তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভারতোক্ত উপাখ্যান ও পর্ব্ববিশেষের অনুবাদও হাতে পাইয়াছিলেন। ছুটিখাঁর আদেশে শ্রীকরণ-নন্দী অশ্বমেধপর্ব্বের অনুবাদ করেন। রাজেন্দ্রদাসপ্রণীত আদিপর্ব্ব, গোপীনাথ দত্তপ্রণীত দ্রোণপর্ব্ব, গঙ্গাদাস সেনপ্রণীত আদি ও অশ্বমেধ-পর্ব্ব, এতদ্ব্যতীত নানা কবির রচিত নলোপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র ও ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাখ্যান প্রভৃতি মহাভারতের অংশগুলিও কাশীদাসের পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। কবিকঙ্কণ যেরূপ বলরাম ও

মাধবাচার্য্যের চণ্ডীর উপর তুলি ধরিয়া তাহা সুন্দর করিয়াছেন, কাশীদাস তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের রচনার উপর ঠিক সেই ভাবে তুলিক্ষেপ করিতে পারেন নাই। কবিকঙ্কণ পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীগুলির ভাষা মার্জ্জিত করিতে চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু কাব্যোক্ত চরিত্রগুলি জীবন্ত করিয়াছেন, তিনি মনুষ্য-প্রকৃতি গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহিত পাঠ করিয়া প্রাপ্ত উপকরণ রাশিতে হস্ত দিয়াছেন; যাঁহারা উপকরণ-রাশি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা মুকুন্দরামের মুজুরি করিয়াছেন মাত্র; কবি প্রকৃতির মহাপুরোহিতের ন্যায় স্বীয় প্রতিভার শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া সেই উপকরণরাশিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু কাশীদাসের সেরূপ গৌরব কিছুই নাই; তিনি অনেক স্থলেই পূর্ব্ববর্ত্তী রচনাগুলির ভাষা একটু মার্জ্জিত করিয়া পত্রশেষে "কৃষ্ণদাসানুজ" কি "গদাধরাগ্রজ" ভণিতা দ্বারা স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছেন। কাশীদাসের মহাভারত যে অবস্থায় আমরা পাইতেছি, সে অবস্থায় অংশবিশেষের তুলনা না করিয়া ধারাবাহিকরূপে ইহাকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু রাজেন্দ্রদাসের শকুন্তলোপাখ্যানের সঙ্গে তুলনা করিলে কাশীদাসরচিত সেই উপাখ্যান অতি হীন বলিয়া বোধ হইবে; গঙ্গাদাসের অশ্বমেধপর্ব্ব কাশীদাসের অশ্বমেধপর্ব্বের সঙ্গে তুলিত হইলে যশঃসম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা নাই। পরাগলী মহাভারতে ও সঞ্জয়-কৃত মহাভারতে এরূপ অনেক অংশ আছে যাহা কাশীদাসী মহাভারতের সেই সব অংশ হইতে সুন্দর;—তথাপি ধারাবাহিকভাবে কাশীদাসের পুস্তকখানাই বোধ হয় উৎকৃষ্ট,—কিন্তু বটতলার কৃপায় কাশীদাসের রচনা পরিশুদ্ধ ও মার্জ্জিত না হইলে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত হইত কি না বলা যায় না।

অপরাপর কবিগণের সঙ্গে কাশীদাসের তুলনায় সমালোচনা।

এ পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক সমগ্র মহাভারত ও তাহার পর্ব্ব কি উপাখ্যান

বিশেষের প্রাচীন অনুবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। নিম্নে প্রদত্ত তালিকার অনেক কবিই কাশীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী।

১। নসরতসাহের আদেশে সঙ্কলিত 'ভারত-পঞ্চালী'। (ইহার উল্লেখ মাত্র পাওয়া গিয়াছে)।

২। সঞ্জয়ের মহাভারত,— আদি হইতে স্বর্গারোহণ পর্ব্ব পর্য্যন্ত।

৩। কবীন্দ্রপরমেশ্বর রচিত মহাভারত।— }
৪। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত।— } আদি হইতে অশ্বমেধপর্ব্ব।

এই দুই পুস্তক আমরা প্রকৃত পক্ষে এক পুস্তক বলিয়াই জানি।

৫। ছুটি খাঁর আদেশে রচিত শ্রীকরণনন্দী প্রণীত— অশ্বমেধ পর্ব্ব॥

৬। দ্বিজ অভিরামের— অশ্বমেধ পর্ব্ব।

৭। কৃষ্ণানন্দবসুর মহাভারত (১০৯৯ সনের লেখা পুঁথি পাওয়া গিয়াছে)। শান্তিপর্ব্ব।

৮। অনন্তমিশ্রের জৈমিনি ভারত— অশ্বমেধ পর্ব্ব।

৯। নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত,— আদি, সভা, ভীষ্ম, দ্রোণ, শল্য, স্ত্রী, ও শান্তিপর্ব্বের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

১০। দ্বিজ রামচন্দ্র খানের— অশ্বমেধ পর্ব্ব।

১১। দ্বিজ কবিচন্দ্রের মহাভারত।

১২। উৎকল কবি স্মারণের— আদি, সভা ও বিরাট পর্ব্ব।

১৩। ষষ্ঠীবরের ভারত।

১৪। গঙ্গাদাস সেনের— আদি ও অশ্বমেধ পর্ব্ব।

১৫। রাজেন্দ্র দাসের— আদিপর্ব্ব।

১৬। গোপীনাথ দত্তের— দ্রোণপর্ব্ব।

১৭। রামেশ্বর নন্দীর মহাভারত।

১৮। কাশীরামদাসের মহাভারত।

১৯। কাশীদাসের পুত্র নন্দরাম দাসের— ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণপর্ব্ব।

২০। ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তীর মহাভারত।

২১। নিমাইদাসের মহাভারত।

২২। দ্বৈপায়নদাসের— দ্রোণপর্ব্ব।

২৩। বল্লভদেবের ভারত॥

২৪। দ্বিজ কৃষ্ণরামের— অশ্বমেধ পর্ব্ব।

২৫। দ্বিজ রঘুনাথ প্রণীত— অশ্বমেধ পর্ব্ব।

২৬। লোকনাথ দত্ত প্রণীত— মহাভারতান্তর্গত নলোপাখ্যান।

২৭॥ মধুসূদন নাপিত প্রণীত— ঐ ঐ

২৮। বিক্রমপুর কাঁটাদিয়ানিবাসী শিবচন্দ্রসেন প্রণীত,— মহাভারতের সাবিত্রী ও অপরাপর উপাখ্যানের অনুবাদ।

২৯। ভৃগুরাম দাসের ভারত।

৩০। দ্বিজ রামকৃষ্ণ দাসের— অশ্বমেধ পর্ব্ব।

৩১। ভরত-পণ্ডিতের— অশ্বমেধপর্ব্ব।

সঞ্জয় ও কবীন্দ্র-রচিত ভারত ও ছুটিখাঁর আদেশে-রচিত অশ্বমেধপর্ব্ব সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। অপরাপর যে সকল মহাভারতের উপাখ্যান আমরা কাশীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করি, তাহাদের কয়েকটি সম্বন্ধে এস্থলে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

রাজেন্দ্রদাসের আদিপর্ব্ব।

রাজেন্দ্রদাস, গোপীনাথ দত্ত, ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাসের রচিত মহাভারতের কতকগুলি অংশের অনুবাদ আমরা পাইয়াছি। সে গুলির হস্তলিপি কিঞ্চিন্ন্যূন দুইশত বৎসর পূর্ব্বের রচনা দেখিয়া বোধ হয়, এই সকল কবি অন্যূন ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে রাজেন্দ্রদাসকে আমরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করি। ইঁহার রচিত আদিপর্ব্বের প্রায় সমস্ত অংশ পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে শকুন্তলা উপাখ্যানটি বড় সুন্দর হইয়াছে— ইহা কালিদাসের শকুন্তলার প্রতিচ্ছায়া ও মধ্যে মধ্যে মাঘ প্রভৃতি কবির উৎপ্রেক্ষা-মণ্ডিত। ভাষাটি পূর্ব্ববঙ্গের, অতি জটিল তাহাতে আবার এত প্রাচীন; কিন্তু এই জটিল অপ্রচলিত শব্দবহুল রচনা কবির তীক্ষ্ণ সৌন্দর্য্যবোধকে পরাভূত করিতে পারে নাই—পুরাতন বন্ধুরগাত্র

বনদ্রুমের নিবিড় পত্র ভেদ করিয়া যেরূপ মধ্যে মধ্যে সৌরকিরণের আভা খেলিতে দেখা যায়, এই দ্বিশত বৎসরের জীর্ণ পুঁথির অদ্ভুত ভাষার মধ্যে মধ্যেও সেইরূপ প্রকৃতকবির উপযুক্ত সুন্দর ভাব আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শকুন্তলা উপাখ্যান।

এই কাব্যে অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা, বিদূষক প্রভৃতি কালিদাসের সমুদয় চরিত্রই গৃহীত হইয়াছে। দুষ্মন্ত মৃগয়ায় চলিতেছেন, তাঁহার অনুচরদল সঙ্গে সঙ্গে; রাজধানীর সুন্দরীগণ গবাক্ষ হইতে,—"যার যার প্রিয়জন এই যাস্ত বলি। প্রিয়-জন সম্বোধিয়া দেখায় অঙ্গুলী॥"–দুষ্মন্ত মুনির তপোবনে পৌঁছিলেন, শকুন্তলা তখনও আসেন নাই, কিন্তু আসিবেন; বহিঃপ্রকৃতি যেন আসন্ন প্রেমলীলার সাহায্যার্থ দাঁড়াইল, প্রকৃতির বর্ণনাটি বেশ সুন্দর— "শীতল পবন বহে সুগন্ধি বহে বাস। ফল ফুলে বৃক্ষ সব নাহি অবকাশ॥ মন্দ মন্দ বায়ু এ বৃক্ষ সব নড়ে। ভ্রমরের পদভরে পুষ্প সব পড়ে॥ নব নব শাখা গাছি অতি মনোহর। থোপা থোপা পুষ্প নড়ে গুঞ্জরে ভ্রমর॥ নির্ম্মল বৃক্ষের তলে পুষ্প পড়ি আছে। লম্ফে লম্ফে বানর বেড়ায় গাছে গাছে॥ হেন জল না দেখিলুম নাহিক কমল। হেন পদ্ম না দেখিলুম নাহিক ভ্রমর॥ হেন ভৃঙ্গ নাহি যে না ডাকে মত্ত হৈয়া। কেবা মোহ না যায়ন্ত সে বন দেখিয়া॥" শেষের চারি পংক্তির কবিত্ব প্রশংসনীয়, কিন্তু উহা ভট্টিকাব্যের একস্থলের পুনরাবৃত্তি মাত্র। বর্ণিত সুন্দর প্রকৃতিটি ছবির পশ্চাৎক্ষেত্রের ন্যায়, শকুন্তলা এই প্রকৃতির উপযোগী ছবি; তিনি যখন অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার সঙ্গে আসিলেন, তখন কবি "চিত্রের পুত্তলী যেন পটেতে লিখিল" বলিয়া পটপূর্ণ করিলেন। রাজা শকুন্তলাকে বনদেবী ভাবিয়া ফার্ডিনেণ্ডের ন্যায় কথা বলিতে লাগিলেন; শকুন্তলা ব্রীড়াবনতা, আবেশময়ী, সে সব শুনিয়া—"হইলা লজ্জিত। বসনে ঢাকিয়া মুখ হাসিলা কিঞ্চিৎ॥" তন্বী ঋষিকুমারীর বল্কলবাসে লজ্জা-রক্তিম গণ্ডের বোধ হয় সব অংশটুকু ঢাকা পড়ে নাই, এজন্যই বোধ হয়, দুষ্মন্ত বলিয়াছিলেন "কিমপি হি মধুরাণাং মণ্ডনং না কৃতীনাম্।" তৎপর গন্ধর্ব-

বিবাহ শেষ। বিবাহের বার্ত্তা মুনিকন্যাগণ জানেন না, বিবাহের পর শকুন্তলাকে তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহার সৌন্দর্য্য ঈষৎ পরিক্লিষ্ট কিন্তু বড় মধুর হইয়াছে, তাঁহাদের সরল বাক্‌চাতুরী পড়িতে পড়িতে বাল্মীকির "প্রভাতকালেষু ইব কামিনীনাং" শ্লোকটি মনে হইয়াছে। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন। শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্বাসার শাপ কণ্বমুনির স্নেহ; পরে কাঁদিতে কাঁদিতে শকুন্তলা এক দিন তাঁহার আজন্মসঙ্গিনী সখীগণ, উদ্যানের তরুলতা ও কুরঙ্গশাবকের গলা জড়াইয়া শেষ বিদায় লইলেন; রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের পর অপমানিতা সুন্দরীর অভিমানপূর্ণ তীব্র বাক্যগুলি,—রাজসভা হইতে তাড়িতা শকুন্তলা একাকিনী "কুহরি কুহরি কাঁদে তাপিত হইয়া।"—এই সব অংশ বেশ সৌন্দর্য্যজ্ঞান-বিশিষ্ট চিত্রকরের হস্তের অঙ্কনের ন্যায় সুন্দর হইয়াছে। শকুন্তলা অপমানিতা হইয়াও পতিতে অনুরক্তা, যিনি নিষ্ঠুর হইতেও নিষ্ঠুরের ন্যায় তাঁহার প্রতি ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাকে কাহারও সতীর নিকট নিষ্ঠুর বলিবার সাধ্য নাই; শকুন্তলা দুষ্মন্তদেবের পূজক; দুষ্মন্তের মুখে অনুশোচনা শুনিলে তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়—

"শকুন্তলা বোলে শুন, নিঠুর না বোল পুনঃ, প্রাণ হৈতে পতি ভিন্ন নহে। যাইব তোমার সনে, কোন দুঃখ নাহি মনে, তুমি বিনে কেবা মোর হয়ে॥ ভাবি চাহ মনে মনে, চন্দ্ররশ্মিপান বিনে, বৃষ্টিজলে না জীয়ে চকোর। মীন যেন জল বিনে, পঙ্কজ মধু বিহনে, পতি বিনে নারীর কঠোর॥"

এই উপাখ্যান লইয়া পাপ পুণ্য সম্বন্ধে দীর্ঘ গবেষণা ও অন্য নানারূপ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। কাশী-দাসের শকুন্তলার শ্লোকসংখ্যা ১৭৮, রাজেন্দ্র-দাসের শকুন্তলায় ১৫০০ শ্লোক। ইহা প্যারাডাইস্ লষ্টের দুইটি বড় অধ্যায়ের তুল্য। আমরা এরূপ বলি না যে, রাজেন্দ্রদাসের কবিতা সর্ব্বত্রই সরল ও সুন্দর। ইহা যে সময়ের রচনা তখনকার ভাষা আধুনিক ভাষা হইতে যতটা বিভিন্ন, সেই সময়ের কথাবার্ত্তা, হাস্য পরিহাস এবং

রচনার দোষভাগ।

রুচিও বর্ত্তমান সময় হইতে সেইরূপ স্বতন্ত্র ছিল, তন্নিবন্ধন ইহা পাঠকালে স্থলে স্থলে পাঠকের বিরক্তি জন্মিতে পারে।

ষষ্ঠীবরের স্বর্গারোহণ পর্ব্ব।

রামায়ণের অনুবাদ প্রসঙ্গে আমরা ষষ্ঠীবর ও তৎপুত্র গঙ্গাদাসের বিষয় জানাইয়াছি। ষষ্ঠীবরের রচিত স্বর্গারোহণ-পর্ব্ব আমার নিকট আছে। এবং উহার শেষ পত্রে এই কবির রচিত সমগ্র মহাভারতের কথা উল্লিখিত দেখিয়াছি। ষষ্ঠীবরের রচনা অনাড়ম্বর, বক্তব্য বিষয় বেশ সুন্দর ভাবে বলা হইয়াছে, তাহাতে কল্পনার জাঁকজমক নাই, মধ্যে মধে দুই একটি মিষ্ট শব্দ ও সুন্দর উপমা বেশ ফুটিয়াছে, যথা—"স্বর্গ হৈতে নামিয়াছে দেবী মন্দাকিনী। পাতালে বহন্তি গঙ্গা ত্রিপথগামিনী॥ উত্তরে দক্ষিণে বহে সুরেশ্বরী-ধার। পৃথিবী পরেছে যেন মালতীর হার॥" এই লেখা পড়িয়া আমাদের কালিদাসের "মন্দাকিনী ভাতি নগোপকণ্ঠে। মুক্তাবলী কণ্ঠগতেব ভূমেঃ॥" মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু কবি বোধ হয় তাহা মনে করিয়া লিখেন নাই।

গঙ্গাদাসের আদি ও অশ্বমেধ পর্ব্ব।

আমরা গঙ্গাদাস সেনের আদিপর্ব্ব ও অশ্বমেধপর্ব্ব পাইয়াছি। আদি পর্ব্বে তাঁহার রচিত দেবযানী-উপাখ্যান বেশ সুন্দর ; ইনি পিতা হইতে অধিক ক্ষমতা-শালী। কাশীদাসের রচনা বটতলা কর্ত্তৃক মার্জ্জিত না হইলে গঙ্গাদাস সেন প্রায় তাঁহার সমকক্ষ হইতেন,—অনেক স্থলে বেশ সমকক্ষতা চলিতে পারিত। গঙ্গাদাস সেনের অশ্বমেধ-পর্ব্ব কাশীদাসের অশ্বমেধ পর্ব্ব হইতে আকারে বৃহৎ। রচনার কিছু নমুনা দেওয়া যাইতেছে ;—"যৌবনাশ্ব পুরী ভীম দেখিলেক দূরে। সুবর্ণপূর্ণিত ঘট প্রতি ঘরে ঘরে॥ বিচিত্র পতাকা উড়ে দেখিতে সুন্দর। দীপ্তমান শোভে যেন চন্দ্র দিবাকর॥ অতি বিলক্ষণ পুরী দেখিতে শোভিত। সহস্রকিরণ বেড়ি থাকে চারিভিত॥ যূপ আরোপিত পথে আছে সারি সারি। যজ্ঞধূমে অন্ধকার গগন আবরি॥ নানা বাদ্য নৃত্য গীত জয়জয় ধ্বনি। বেদধ্বনি নূপুরধ্বনি এই মাত্র শুনি॥ মণ্ডব প্রাসাদ মঠ বিচিত্র নগর। পুরী দেখি হরিষ হইল বৃকোদর॥ ফলিত কদলীবন দেখিতে শোভিত। ডাল

সনে পুষ্পভরে হয়েছে নমিত॥ গন্ধে আমোদিত সব সুললিত ঘ্রাণ। নানা বৃক্ষ লতাতে বিচিত্র নির্ম্মাণ॥ খর্জ্জুর পাঞেলা যত ফলিত সঘন। দেখিতে জুড়ায় আঁখি দুঃখ বিমোচন॥ বিদারিত দাড়িম্বে বেষ্টিত পুরীখান। পুণ্যবন্ত দেখি যেন দেবতার স্থান॥ লেম্বু জাম্বীর আর নারাঙ্গার ফুল। অশোক চম্পক লঙ্গ কেশর বকুল॥ সুবর্ণ কেতকী আদি জাতি দ্রুম লতা। মালতি চম্পক কুন্দ লতিকা পুষ্পিতা॥ পশুপক্ষী বেড়ি ক্রীড়া করয়ে সকলে। কোকিলের ধ্বনি আর ভ্রমরের বোলে॥"

উদ্ধৃতাংশ ও এইরূপ নানা অংশের সঙ্গে কাশীদাস কবির সেই সেই স্থলের বর্ণনা তুলনা করিয়া দেখিলে, গঙ্গাদাস তাঁহার নিকট খর্ব্ব হইয়া পড়িবেন বলিয়া বোধ হয় না।

গোপীনাথের দ্রোণপর্ব্ব।

গোপীনাথদত্তের দ্রোণপর্ব্ব আমরা পাইয়াছি। ইহাতে উক্ত পর্ব্বের অন্যান্য বিষয়ের সহিত বহুপত্র জুড়িয়া দ্রৌপদী-যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে; অভিমন্যুবধে ক্রুদ্ধা রমণীদল কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিলেন—দ্রৌপদী, সেনাপতি। ঘনরামের কাব্যে আমরা কানাড়ার যুদ্ধ-বিবরণ পড়িয়াছি; ইতিহাসে দুর্গাবাই ও লক্ষ্মীবাইএর নাম পাঠকমণ্ডলীর নিকট অবিদিত নহে, আমরা কালী-দেবীর রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি গড়িয়া আজও পূজা করিয়া থাকি, সুতরাং মহাভারতের দ্রৌপদী-যুদ্ধে অসম্ভব কল্পনা কিছুই নাই। কিন্তু যে দেশের পুরুষই ললনার ন্যায় কোমল, সে দেশের ললনা স্বপ্নসৃষ্ট পুত্তলীর মত আঙ্গিনার রৌদ্রে ও বাতাসেই বিলীন হইয়া যাইবার কথা;—যুদ্ধক্ষেত্রের ত কথাই নাই। বোধ হয় কাশীদাস বাঙ্গালীর নাড়ী টের পাইয়াই দ্রৌপদী-যুদ্ধের পালা জানিয়া থাকিলেও ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। গোপীনাথদত্তের দ্রৌপদীযুদ্ধে কোন আশ্চর্য্য কবিত্বের চিহ্ন নাই, তবে তাঁহার বর্ণিত পত্রগুলির শেষে কাশীদাসের ভণিতা দিয়া তাহা কাশীদাসী মহাভারতের যুদ্ধ-বর্ণনাগুলির সঙ্গে আঁটিয়া দিলে কোন সমালোচক তাহা অন্য কবির লেখা বলিয়া ধরিতে পারিবেন

কিনা সন্দেহ, মধ্যে মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের দুই একটি শব্দ পরিবর্ত্তন করিলেই গোপীনাথ কাশীদাসের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারেন।

কাশীদাসের জীবনী।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, কাশীদাসই ধারাবাহিকভাবে মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। এই কবির জীবন সম্বন্ধে আমরা অতি যৎসামান্য বিবরণ জানিতে পারিয়াছি। কাশীরাম বর্দ্ধমানজেলার উত্তরে ইন্দ্রাণী পরগণাস্থিত সিঙ্গিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম ব্রাহ্মণীনদীর তীরস্থ। কাশীরামদাসের প্রপিতামহের নাম প্রিয়শঙ্কর, পিতামহের নাম সুধাকর ও পিতার নাম কমলাকান্ত দেব। কমলাকান্তের ৩ পুত্র ছিল, কৃষ্ণদাস, কাশীদাস ও গদাধর। এই গদাধরের হস্তলিখিত সমগ্র মহাভারত রাইপুর রাজবাড়ীতে এখনও আছে, তাহা ১০৩৯ সালের লেখা;—সে আজ ২৭৬ বৎসরের কথা। গদাধর কাশীদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; সুতরাং কাশীদাস ন্যূনাধিক ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন; এবং সম্ভবতঃ ২৭০ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারতের অনুবাদ সাঙ্গ করেন। রামগতিন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন, কাশীরামদাসের পুত্র আপন পুরোহিতদিগকে যে বাস্তুভিটা দান করেন-সেই দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১০৮৫ সালের লিখিত; বলা বাহুল্য এই দানপত্রোক্ত সময় আমাদের মতের অনুকূল।* সিঙ্গিগ্রামে "কেশেপুকুর" নামক একটি পুকুর আছে ও তথাকার লোকগণ "কাশীর ভিটা" বলিয়া একটি স্থান এখনও দেখাইয়া থাকেন।

কথিত আছে, কাশীরামদাস মেদিনীপুর আওসগড়ের রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া পাঠশালার শিক্ষকতা করিতেন। রাজবাড়ীতে যে সমস্ত কথক ও পুরাণ-পাঠকারী পণ্ডিত আসিতেন, তাঁহাদের মুখে তিনি মহাভারত

* ১৩০৭ সালের ২য় সংখ্যার পরিষৎপত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় একখানি কাশীদাসের বিরাটপর্ব্বের বিবরণ দিয়াছেন—তাহার শেষে লিখিত আছে— "চন্দ্র বাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়। বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়॥" সুতরাং ১৫২৬ শকে (১০১১ বাং সন) কাশীদাস বিরাটপর্ব্ব সমাধা করেন।

প্রসঙ্গ শুনিয়া ইহাতে অনুরক্ত হন ; এই অনুরাগের ফল—মহাভারতের অনুবাদ। সে সময়ের অনুবাদ মূল কাব্যের ছায়া লইয়া লিখিত হইত, কাশীদাসী মহাভারত ঠিক সংস্কৃতের অনুযায়ী নহে, এই জন্য কবি সংস্কৃত জানিতেন না, এরূপ মত প্রচার করা বোধ হয় উচিত নহে। নানা পুরাণ হইতে তিনি উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন, এইজন্য পুরাণ শুনিবার কথা লিখিয়া থাকিবেন। কৃত্তিবাসের ভণিতার সঙ্গে সঙ্গেও পুরাণ শুনিয়া গীতরচনার কথা লিখিত আছে, অথচ কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণে জানা যায়, তিনি সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ভণিতার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে পুঁথিলেখকগণও অনেক কথা যোজনা করিয়া থাকেন।

"আদি সভা বন বিরাটের কতদূর। ইহা লিখি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥"—

কাশীদাস সমস্ত মহাভারত লিখিয়াছিলেন কি না?

এই একটি চলিত বাক্য আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, স্বর্গপুর অর্থ কাশীধাম ; কিন্তু যে ভাবে কবিতাটি লিখিত, তাহাতে উক্ত মুন্সীয়ানা অর্থ গ্রহণ করিলেও তিনি যে বাকী অংশ সমাধা করেন, এরূপ বোধ হয় না। এই প্রবাদ-বাক্য সত্ত্বেও, কাশীরামদাসই সমস্ত মহাভারত অনুবাদ করেন, এই মত সমর্থন-অভিপ্রায়ে কেহ কেহ বলেন, মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী রচনায় কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু গঙ্গাদাস সেন, রাজেন্দ্রদাস, গোপীনাথ দত্ত প্রভৃতি কবির ভণিতা কাটিয়া যদি কাশীদাসী মহাভারতে আঁটিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও বোধ হয় কোন পার্থক্য লক্ষিত হইবে না। বর্ণনাগুলি অনেক স্থলেই একরূপ ; "জয়গোপালগণে"র প্রসাদে কাশীরামদাসের কিছু কান্তি বৃদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ নাই ; এই নবযুগের প্রভাব চলিয়া গেলে কাশী, গঙ্গা, গোপী, রাজেন্দ্র প্রভৃতি অনেক স্থলে একদরে বিকাইবেন। কাশীদাসী-মহাভারতের সর্ব্বত্র তাঁহার ভণিতা দৃষ্ট হয়;—যাঁহারা প্রাচীন পুঁথি নাড়া চাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন প্রাচীন পুঁথিগুলিতে একাধিক ভণিতা

থাকিলে পরবর্ত্তী পুঁথি-লেখকগণ সর্ব্বাপেক্ষা বড় কবির ভণিতা বজায় রাখিয়া অপরাপর কবির নাম ক্রমে ক্রমে বাদ দিয়া যান; এই ভাবে কৃত্তিবাসী-রামায়ণে, নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে এবং অপরাপর গ্রন্থে শ্রেষ্ঠ কবিগণের নামের ছায়ায় ছোট ছোট অনেক কবি লীন হইয়া গিয়াছেন। ১৫৮৩ খৃঃ অব্দের লিখিত একখানি কাশীদাসী মহাভারতের শৈল্য ও নারীপর্ব্বে ভৃগুরামদাসের ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। গদাধরলিখিত পুঁথি আমরা দেখি নাই—তাহাতে যদি সর্ব্বত্রই কাশীরামদাসের ভণিতা থাকে, তবে উহা প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তাহা হইলে "আদি সভা বন বিরাটের কত দূর।"—ইত্যাদি শ্লোকের মুন্সীয়ানা অর্থ গ্রহণ করিতে কিংবা উহা অমূলক প্রবাদ-বাক্য বলিতে আমাদের কোনও আপত্তি থাকিবে না।*

কাশীদাসী মহাভারতের সঙ্গে অপরাপর অনুবাদের ভাষার ঐক্য।

কাশীরামদাসের মহাভারতের সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারতগুলির রচনা তুলনা করিলে অনেকস্থলে বিশেষরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হইবে। আমরা না বাছিয়া যথেচ্ছা কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি।

যযাতির পতন।

"অষ্টক বোলেন্ত তুহ্মি কোন মহাজন।
পরিচয় দিয়া কহ জানাইয়া আপন॥
অগ্নি প্রায় তেজঃপুঞ্জ দেখিতে সাক্ষাৎ।
কোন্ পাপে অধর্ম্মে হইল স্বর্গপাত॥
* * * * *
যযাতি আমার নাম কহি শুনি তোক।
নহুষ নৃপতিসুত পুরুর জনক॥

* ৫২৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা দৃষ্টে বোধ হয়, যেন কাশীদাস বিরাটপর্ব্ব নিজেই শেষ করিয়াছিলেন, কিন্তু মুদ্রিত কাশীদাসী মহাভারতের বনপর্ব্বের শেষে এই দুইটি ছত্র পাওয়া যায়,—"ধন্য হ'ল কায়স্থকুলেতে কাশীদাস। তিন পর্ব্ব ভারত যে করিল প্রকাশ॥" এই কথাটির মধ্যে যে ইঙ্গিত আছে, তাহা আমাদের সন্দেহ দৃঢ়ীভূত করিতেছে।

করিলে সুকৃতি নর যেবা নরে কয়।
নরকেতে বাস হয় পুণ্য হয় ক্ষয়॥
কহিলুম ইন্দ্রের ঠাঁই কথা সকল।
পুণ্য ক্ষয় হৈয়া মুই পড়িল ভূমিতল॥"
—সঞ্জয়কৃত ভারত, আদি।

"অষ্টক বলিল তুমি কোন মহাজন।
কোন নাম ধর তুমি কাহার নন্দন॥
সূর্য্য অগ্নি প্রায় তেজ দেখি যে তোমার।
স্বর্গ হৈতে পড় কেন না বুঝি বিচার॥
রাজা বলে নাম আমি ধরি যে যযাতি।
পুরুর জনক আমি নহুষে উৎপত্তি॥
পুণ্যবান্ জনের করিলাম অমান্য।
সেই হেতু আমার হইল ক্ষীণ পুণ্য॥"
—কাশীদাস, আদিপর্ব্ব।

কৃষ্ণের ক্রোধ।

"এ বলিয়া সাত্যকিরে করি সম্বোধন।
হস্তেত লইল চক্র দেব জনার্দ্দন॥
সূর্য্যের সমান জ্যোতি সহস্র বজ্রসম।
চারিপাশে ক্ষুরতেজ যেন কালযম॥
রথ হৈতে লাফ দিয়া চক্র লৈয়া হাতে।
ভীষ্মক মারিতে যায় দেব জগন্নাথে॥
পৃথিবী বিদার হএ চরণের ভারে।
ক্রোধদৃষ্টিএ যেন জগত সংহারে॥
কুরুকুলে উঠিল তুমুল কোলাহল।
ভীষ্ম পড়িল হেন বলে কুরুবল॥
পদভরে কৃষ্ণের কম্পিত বসুমতী।
গজেন্দ্র ধরিতে যেন যাএ মৃগপতি॥

সম্ভ্রমে না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।
নির্ভয়ে বোলেন্ত তবে সংগ্রাম ভিতর॥
আইস আইস কৃষ্ণ মোরে করহ সংহার।
তোহ্মার প্রসাদে মুঞি তরিমু সংসার॥
তোহ্মার চক্রেতে মুঞি যদি সংগ্রামেতে মরি।
ত্রিভুবনে রহিবে কীর্ত্তি পরলোকে তরি॥" *

কবীন্দ্র (পরাগলী)—ভারত, ভীষ্মপর্ব্ব।

"অস্থির হইলা হরি কমললোচন।
লাফ দিয়া রথ হৈতে পড়েন তখন॥
ক্রোধে রথচক্র ধরি সৈন্যের সাক্ষাৎ।
ভীষ্মেরে মারিতে যান ত্রিলোকের নাথ॥
গজেন্দ্র মারিতে যেন ধায় মৃগপতি।
কৃষ্ণের চরণভরে কাঁপে বসুমতী॥
চমৎকৃত হয়ে চাহি দেখে সর্ব্বজন।
ভীষ্মেরে মারিতে যান দেব নারায়ণ॥
সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।
নির্ভয়ে বসিয়া ভাবে রথের উপর॥
আসিছে ভুবনপতি মারিতে আমাকে।
মারুক আমারে যেন দেখে সর্ব্বলোকে॥
শীঘ্র এস কৃষ্ণ মোরে করহ সংহার।
তোমার প্রসাদে তরি এ ভব সংসার॥
তোমার বাণেতে যদি সমরে মরিব।
দিব্য বিমানেতে চড়ি বৈকুণ্ঠে যাইব।"

—কাশীদাস, ভীষ্মপর্ব্ব।

বৃষকেতুর পরিচয়।

"আকর্ণ পূরিয়া ধনু টঙ্কার করিল।
উচ্চস্বরে রাজা বৃষকেতুরে বলিল॥

---

* ১৬২ পৃষ্ঠায় এই অংশ একবার উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে এই স্থল একটু স্বতন্ত্র, দুইখানি ভিন্ন পুঁথি দৃষ্টে এই দুই প্রকার পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে।

অতি শিশু দেখি তুহ্মি বীর অবতার।
মোকে পরিচয় দেও শিশু আপনার॥
কাহার পুত্র তুহ্মি কিবা তোমার নাম।
কোন্ দেশে বসতি কিবা মনস্কাম॥
কি লাগিয়া নেও ঘোড়া কারণ কিবা তার।
কি নিমিত্ত কর মোর সৈন্যের সংহার॥
*　　*　　*　　*　　*
রাজার বচন শুনি হাসে কুমার।
পরিচয় লও অহে নৃপতি আহ্মার॥
যাহার উদয়ে হএ তিমির নাশ।
যাহার উদয়ে হএ জগত প্রকাশ॥
মোর পিতামহ সেই জেন দিবাকর।
তার পুত্র উপজিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
ত্রিভুবনে বিখ্যাত বীর দাতার অগ্রণী।
যাঁর বলে দুর্য্যোধন ভুঞ্জিল মেদিনী॥
তার পুত্র বৃষকেতু হেন জান মোক।
কটাক্ষে নরপতি নাহি গণি তোক॥"

—শ্রীকরণনন্দীর (ছুটিখাঁর আদেশে রচিত)
ভারত, অশ্বমেধপর্ব্ব।

"বৃষকেতু দেখিয়া বলিছে নৃপবর।
কাহার তনয় তুমি মহা ধনুর্দ্ধর॥
কি নাম তোমার হে আসিলে কি কারণ।
পরিচয় দেও আগে তোমরা দুজন॥
যুবনাশ্ব বচনেতে বৃষকেতু বীর।
পরিচয় দিল নৃপে প্রফুল্ল শরীর॥
রবির তনয় কর্ণ জান এ জগতে।
জনম হইল যার কুন্তীর গর্ভেতে॥
কর্ণের তনয় আমি নাম বৃষকেতু।
তুরঙ্গ লইনু যুধিষ্ঠির যজ্ঞহেতু॥"

—কাশীদাসী মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব্ব।

গান্ধারী-বিলাপের শেষাংশ।

"কৃষ্ণের প্রবোধবাক্য মনেতে বুঝিয়া।
উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া॥
পুনঃ বলে কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা।
বিচিত্রবীর্য্যের বধূ রাজার বনিতা॥
দেখ কৃষ্ণ এক শত পুত্র মহাবল।
ভীমের গদার ঘাতে মরিল সকল॥
দেখ কৃষ্ণ বধূ সব উচ্চৈঃস্বরে কান্দে।
দেখিতে না পায় জারে সূর্য্য আর চান্দে॥
শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনু।
জাহার দেখিয়া রূপ রথ রাখে ভানু॥
হেন সব বধূগণ আইল কুরুক্ষেতে।
মুক্তকেশ হীনবেশ দেখহ সাক্ষাতে॥
ঐ দেখ নৃত্য করে নারী পতিহীনা।
শ্রুতি শব্দ শুনি যার নারদের বীণা॥
পতিহীনা কত নারী বীরবেশ ধরি।
ঐ দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র করি॥
সহিতে না পারি শোক শান্ত নহে মন।
মাএ এড়ি কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন॥
ওহে কৃষ্ণ হের দেখ পুত্রের অবস্থা।
জাহার মস্তকে ছিল সুবর্ণের ছাতা॥
নানা আভরণে যার তনু সুশোভন।
সে তনু ধুলায় ঐ দেখ নারায়ণ॥
সহজে কাতর বড় মাএর পরাণ।
সুপুত্র কুপুত্র মাএর একুই সমান॥
এককালে এত শোক সহিতে না পারি।
কি মতে বুঝাহ মোরে মুকুন্দ মুরারি॥
পুত্রশোক শেল জেন বাজিছে হিয়ায়।
দেখাবার হৈলে দেখাতাম মহাশয়॥

সংসারের মধ্যে শোক আছএ যতেক।
পুত্রের সমান শোক নহে পরতেক॥
গর্ভধারী হয়্যা জেবা কর্য়াছে পালন।
সেই সে জানিতে পারে পুত্রের মরম॥"

—নিত্যানন্দ ঘোষ, স্ত্রীপর্ব্ব।

গান্ধারী-বিলাপের শেষাংশ

কৃষ্ণের প্রবোধবাক্য মনেতে বুঝিয়া।
উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া॥
কহে কিছু কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা।
বিচিত্রবীর্য্যের বধূ রাজার বনিতা॥
দেখ কৃষ্ণ এক শত পুত্র মহাবল।
ভীমের গদার ঘাতে মরিল সকল॥
দেখ কৃষ্ণ বধূগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে।
দেখিতে না পায় দেখ কভু সূর্য্য চাঁদে॥
শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনু।
দেখিয়া যাহার রূপ রথ রাখে ভানু॥
হেন সব বধূগণ আইল কুরুক্ষেত্রে।
ছিন্ন কেশ মত্ত বেশ দেখ তুমি নেত্রে॥
ওই দেখ নৃত্য করে পতিহীন বধূ।
মুখ অতি সুশোভন অকলঙ্ক বিধু॥
ওই দেখ গান করে নারী পতিহীনা।
কণ্ঠশব্দ শুনি যেন নারদের বীণা॥
পতিহীনা কত নারী বীরবেশ ধরি।
ওই দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র করি॥
সহিতে না পারি শোক শান্ত নহে মন।
আমা ত্যজি কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন॥
হে কৃষ্ণ দেখহ মম পুত্রের দুর্গতি।
যাহার মস্তকে ছিল সুবর্ণের ছাতি॥

নানা আভরণে যার তনু সুশোভন।
সে তনু ধূলায় ওই দেখ নারায়ণ॥
সহজে কাতর বড় মায়ের পরাণ।
সুপুত্র কুপুত্র দুই মায়ের সমান॥
এককালে এত শোক সহিতে না পারি।
বুঝাইবে কিরূপে হে আমারে মুরারি॥
পুত্রশোক শেল যেন বাজিছে হৃদয়।
দেখাবার হইলে দেখিতে মহাশয়॥
সংসারের মধ্যে শোক আছয়ে যতেক।
পুত্রশোক তুল্য শোক নাহি তার এক॥
গর্ভধারী হয়ে যেই করিছে পালন।
সেই সে বুঝিতে পারে পুত্রের মরণ॥

—কাশীদাস, স্ত্রীপর্ব্ব।

এইরূপ সাদৃশ্য সর্ব্বত্রই দেখাইতে পারা যায়। মোটের উপর কাশীদাসই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অংশবিশেষের তুলনা করিলে সর্ব্বত্র তাঁহার এই গৌরব রক্ষিত হয় না। অপরাপর কবিগণ অপেক্ষা নিত্যানন্দ ঘোষের রচনার সঙ্গেই কাশীদাসী মহাভারতের অধিকতর সাদৃশ্য, এবং সেই সাদৃশ্য যুদ্ধপর্ব্ব এবং তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। নিত্যানন্দঘোষের রচনা বহু অংশেই কিছুমাত্র মার্জ্জন, পরিবর্ত্তন বা সংশোধন না করিয়া কাশীদাসী মহাভারতের অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে; কাশীদাসের সৌভাগ্যশ্রীর ছায়ায় নিত্যানন্দ ঘোষের যশঃ বিলীনপ্রায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ওকালতী-ফলে বোধ হয় এত দিন পরে বঙ্গীয় পাঠকসাধারণের নিকটে কবি নিত্যানন্দ সুবিচার পাইবেন, এবং আশা করি সাহিত্যের ক্ষেত্রে তমাদী সূত্র উত্থিত হওয়ার কোন আশঙ্কা দাঁড়াইবে না। তবে এ কথাও এখানে বলা উচিত যে, নিত্যানন্দের মহাভারত কাশীদাসের আদর্শ হই-লেও, সেই মহাভারতখানিই যে মৌলিক অনুবাদ, তাহা স্বীকার্য্য নহে।

বাঙ্গালা ভাষা পূর্ব্বে শিক্ষিতগণের দৃষ্টির বাহিরে অঙ্কুরিত হইয়া বিকাশ পাইতেছিল, তখন শক্তিশালী কবিগণ নয়নজল ও প্রাণের উষ্ণত্ব দিয়া ইহাকে পুষ্ট করিতেছিলেন; কিন্তু শিক্ষিতগণের হাতে পড়িয়া শব্দাড়ম্বরের প্রতি রুচিপ্রবলতাহেতু বাঙ্গালাসাহিত্যে প্রেমের প্রভাব তিরোহিত হইল; সংস্কৃত পুঁথির অলঙ্কার ও উপমারাশি দ্বারা ভাষা-সুন্দরী সজ্জিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাদের গুরুভারে ভাব নিপীড়িত এবং নির্জ্জীব হইয়া পড়িল। কাশীদাস এই দুই যুগের মধ্যবর্ত্তী; তাঁহার কাব্যে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের উদ্দীপনা আছে এবং নবযুগের লিপিপ্রণালী এবং মার্জ্জিত ভাষাও দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত বিষয়ে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ অপেক্ষা বিশেষ নিপুণ ও ভাবী যুগের অধিকতর নিকটবর্ত্তী।—"চলৎ চপলা রূপে কিবা বরকায়া।" "দ্বিকর কমল, কমলাংঘ্রিতল," "নিষ্কলঙ্ক ইন্দুজ্যোতি পীনঘনস্তনী," প্রভৃতি সংস্কৃতের টুকরা তাঁহার কাব্যের মধ্যে মধ্যে মুক্তার ন্যায় পড়িয়া আছে, ও 'মুখরুচি, কত শুচি,' 'সিংহগ্রীব. বন্ধুজীব,' 'অগ্নিঅংশু, যেন পাংশু'—প্রভৃতি পদে ভাবী অনুপ্রাসপ্রধান যুগের ছায়াপাত হইয়াছে। অনেক স্থলে সংস্কৃত উপমার অজস্র বর্ষণ হইয়াছে, কিন্তু উদ্দীপনার কোন হানি হয় নাই, যথা;—

কাশীদাসের ভাব ও ভাষা।

"মুখ তুলি বৃকোদর যেই ভিতে যায়। পলায় সকল সৈন্য তূলা যেন বায়॥ সিন্ধুজল মধ্যে যেন পর্ব্বত মন্দর। পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্ত করিবর॥ মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্র-মণ্ডলে। দানবের মধ্যে যেন দেব আখণ্ডলে॥ দণ্ড হাতে যম যেন বজ্র হাতে ইন্দ্র। খেদাড়িয়া লৈয়া যায় সব নৃপবৃন্দ॥ যেই দিকে বৃকোদর সৈন্য যায় খেদি। দুই দিকে তট যেন মধ্যে বহে নদী॥"—আদিপর্ব্ব।

লক্ষ্যভেদের উপলক্ষে সমাগত ব্রাহ্মণগণের চিত্র বঙ্গদেশীয় ভীরু অর্থ-লোভী ব্রাহ্মণগণ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে,—উহা একখানি যথাযথ ছবি। কাশীরামদাসের বর্ণনাগুলি সুন্দর ও স্বাভাবিক; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়নপর সৈন্য বর্ণনা—বঙ্গীয় কবির লেখনীর উপযুক্ত বিষয়, সুতরাং কবি ইহাতে আশাতীতরূপে কৃতকার্য্য;—"যে দিকে পারিল যেতে সে গেল সেদিকে।

পলায় পশ্চিমবাসী রাজা পূর্ব্বদিকে॥ উত্তরের রাজাগণ দক্ষিণেতে গেল। পথাপথ নাহি জ্ঞান যে দিক পাইল॥ হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি না পাইয়া পন্থ। একে চাপি আর যায় যেই বলবন্ত॥ রথের উপর বেগবন্ত আসোয়ার। অবস্থা হইল যত কি কব তাহার॥ ঠেলাঠেলি চাপাচাপি অর্দ্ধ সৈন্য মৈল। স্থানে স্থানে পর্ব্বত আকার শব হৈল। একপদ কাটা কারু, কাটা দুই ভুজ। বুকের প্রহারে কেহ হইয়াছে কুজ॥ সর্ব্বাঙ্গে বহিয়া পড়ে শোণিতের ধার। মুক্তকেশ নগ্ন দেহ কাণ কাটা কার॥ আড়ে, ওড়ে, ঝাড়ে, ঝোড়ে অরণ্যে পশিয়া। জলেতে পড়িয়া কেহ যায় সাঁতারিয়া॥ ক্ষত্রি দেখি ব্রাহ্মণ পলায় উভরড়ে। দ্বিজে দেখি ক্ষত্রিয় লুকায় ঝাড়ে ঝোড়ে॥ দ্বিজের ক্ষত্রিয় ভয়, ক্ষত্র দ্বিজ-ভয়। দ্বিজ ক্ষত্র বেশ ধরে ক্ষত্র দ্বিজ হয়॥ ধনুর্ব্বাণ ফেলিল হাতের গদা শূল। মাথার মুকুট ফেলি মুক্ত কৈল চুল॥ তুলিয়া লইল ছত্রদণ্ড কুমণ্ডল। ধনুর্ব্বাণ তুলি নিল ব্রাহ্মণ সকল॥ প্রাণভয়ে কেহ গিয়া ডুবে রহে জলে। কেহ কাঁটা-বনে পৈশে কেহ বৃক্ষডালে॥ মরার ভিতরে কেহ মরা হৈয়া রহে। দূর দূরান্তরে কেহ ভয়ে স্থির নহে॥"—কাশীদাস, আদিপর্ব্ব।

মহাভারতের আদ্যন্ত এইরূপ সুন্দর ও জীবন্ত। এক এক খানি পত্র এক একটি চমৎকার চিত্রপটের ন্যায়; পড়িতে পড়িতে জগৎপূজ্য, যুদ্ধবীর, ধর্ম্মবীর ও প্রেমিকগণের মূর্ত্তি মনশ্চক্ষের সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়; তাঁহাদের সরল বিবেক, দৃঢ় কামনা ও চরিত্রের সাহস, কবির সতেজ লেখনীর গুণে, ক্ষণকালের জন্য যে আমাদের নিজস্ব হইয়া পড়ে, এবং এই নিঃসম্বল, অর্দ্ধভুক্ত, পররোষকটাক্ষে পাণ্ডুরতাপন্ন বাঙ্গালীজাতিও ক্ষণকালের জন্য পৃথিবীজয়ী, উচ্চ আকাঙ্ক্ষাশালী, অভিমানস্ফীত পূর্ব্ব-পুরুষগণের কাহিনী পড়িয়া স্বীয় ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া গর্ব্ব অনুভব করে। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে এই মহাভারতপ্রসঙ্গ শুনিয়া দাক্ষিণাত্যে এক দেশহিতৈষী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বীরচরিত্র গঠিত হইয়াছিল, তিনি অর্জ্জুনতুল্য কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, মহাভারতের সঙ্গে তাঁহার নাম এখন ইতিহাসে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। বঙ্গদেশে এই মহাভারত সমুদ্র হইতে এখনও 'শ্রীকৃষ্ণচরিত্র', 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' প্রভৃতি অসংখ্য বুদ্বুদ উত্থিত হইয়া প্রাচীনভাবের অফুরন্ত আবেগ জ্ঞাপন করিতেছে। এই কাব্য লইয়া হিন্দুস্থানের ভাবী অধ্যায়ে আরও কত কবি, বীর ও চিত্রকর যশস্বী হইবেন, কে বলিতে পারে?

কাশীদাস মহাভারত ছাড়া আরও তিন খানি ছোট কাব্য রচনা করেন। ঃ—১। স্বপ্নপর্ব্ব, ২। জলপর্ব্ব, ৩। নলোপাখ্যান।

কাশীদাসের অপরাপর কাব্য।

কাশীদাসের অপর দুই ভ্রাতা,—জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাস এবং কনিষ্ঠ গদাধরদাস, উভয়েই সুকবি ছিলেন। কৃষ্ণদাস অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং গোপালদাস নামক জনৈক ব্রহ্মচারীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। এই গোপালদাস আজন্ম কৌমার ব্রত পালন করেন এবং ইহারই আদেশে কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' নামক ভাগবতের একখানি অনুবাদ প্রণয়ন করেন। কৃষ্ণদাস তাঁহার গুরুর নিকট হইতে "শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর" নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; ("সেই ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নাম থুঞা। আজ্ঞা কৈল শ্রীনন্দনন্দনে ভজ গিঞা॥"—শ্রীকৃষ্ণবিলাস)। এই "কৃষ্ণকিঙ্কর" নামেও তিনি স্বীয় গ্রন্থের অনেক স্থলে ভণিতা দিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ গদাধর তৎসম্বন্ধে জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থে এই দুইটি ছত্র লিখিয়াছিলেন ঃ—"প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর। রচিল কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর॥" শ্রীকৃষ্ণবিলাসের রচনা প্রকৃতই অতি মনোহর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাখালদাস কাব্যতীর্থ মহাশয় এই পুস্তকখানি উদ্ধার করিয়া এতৎসম্বন্ধে ১৩০৭ সনের ৪র্থ সংখ্যার পরিষদ্‌পত্রিকায় একটি সন্দর্ভ লিখিয়াছেন।

কৃষ্ণদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস'।

কনিষ্ঠ গদাধর দাসের "জগন্নাথমঙ্গল" একখানি উপাদেয় পুস্তক। এই পুস্তকের ভূমিকাটিতে ঐতিহাসিক অনেক নূতন তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

গদাধরের 'জগন্নাথমঙ্গল।'

"ভাগীরথীতীরে বটে ইন্দ্রয়াণী নাম। তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গিগ্রাম॥ অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের বামপদতলে। নিবাস আমার সেই চরণ কমলে॥ তাহাতে শাণ্ডিল্যগোত্র দেব যে দৈত্যারি। দামোদর পুত্র তার সদা ভজে হরি॥ ধ্রুবরাজ সুবরাজ তাহার নন্দন। ধ্রুবরাজ পুত্র হইল মিলএ যতন॥ তাহার তনয় হয় নাম

ধনঞ্জয়॥ তাহাতে জন্মিল শুন এ তিন তনয়। রঘুপতি, ধনঞ্জয় দেব, নরপতি॥ রঘুপতির পঞ্চপুত্র প্রতিষ্ঠিত মতি॥ প্রসন্ন রঘু, দেবেশ্বর, কেশব, সুন্দর। চতুর্থে শ্রীরঘুদেব পঞ্চমে শ্রীধর॥ প্রিয়ঙ্কর হইতে এ পঞ্চ উদ্ভব। অনু সুধাকর মধু রাম ও রাঘব॥ সুধাকর নন্দন এ তিন প্রকার। ভুমীন্দ্র কমলাকান্ত এ তিন কুমার॥ প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর'। রচিলা কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর॥ দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবানে। রচিলা পাচালী ছন্দে ভরত পুরাণে॥ জগত-মঙ্গল কথা করিলা প্রকাশ। তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস॥...নরসিংহ নামে দেখি উৎকলের পতি। পরম বৈষ্ণব জগন্নাথ ভজে নিতি॥ স্কন্দ পুরাণের মত শুনিয়া বিচিত্র। কত ব্রহ্ম পুরাণের প্রভুর চরিত্র। না বুঝয়ে পুরাণেতে ইত্যাদি লোকেতে। তেকারণে রচিলাম পাঁচালীর মতে। ইহা শুনি কৃতার্থ হইব পঞ্চ (?) জন। ইহলোকে সুখ অন্তে গতি নারায়ণ॥ সপ্ত-ষষ্ঠি শকাব্দা সহস্র পঞ্চশতে (১৫৬৭ শক)। সহস্র পঞ্চাশ সন (১০৫০ বাং সন) দেখ লেখা মতে॥ মহালয়া তাপী হয় বেরিজ সহর। উৎকল উত্তম শুনি নিকট নগর॥ মাখনপুরেতে ঘর তাহার ভিতর। বিশ্বেশ্বর বাটী চিহ্নিত সেই স্থানবর॥ দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী পড়িল পুরাণে। শুনিয়া পুরাণ বড় হইল মনে॥ নাহি সন্ধিজ্ঞান মোর না পড়ি ব্যাকরণ। আমি অতি মূঢ়মতি কবির রচন॥"

যে পুঁথি * হইতে এই বিবরণটি উদ্ধৃত হইল তাহার হস্তলিপি ১১৬৫ সালের। এই পুস্তকের শ্লোকসংখ্যা ২৫০০। লেখক শ্রীঅনুপচন্দ্র ঘোষ, "সাং ঝেঞা, পরগণে বারহাজারী, চৌকী কোতলপুর।"

'জগৎমঙ্গল' কাশীদাসের কনিষ্ঠের উপযুক্ত কাব্য; ইহার রচনা বেশ সুন্দর। রচনার ১০০ বৎসরের উর্দ্ধ কালের পরেও ইহা পুনশ্চ লিখিত হইবার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল, এতদ্দ্বারা ইহা অনুমিত হয় যে জগৎ-মঙ্গলের যশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, ১০৫০ সালে এই পুস্তকের রচনা হয় এবং তৎপূর্ব্বেই কাশীদাসের মহাভারত রচিত হয়, উদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা ইহা স্পষ্টরূপে জানিতে পারিলাম।

কাশীদাস নিজে কবি, তাঁহার অপর দুই সহোদর কবি, কিন্তু এই স্থানেই প্রতিভাশালী পরিবারের কবিত্ব-যশের শেষ নহে। কাশীরামদাসের পুত্র নন্দরামদাস ১৫০০ শ্লোকে মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বটি অনুবাদ করিয়াছিলেন; যে

নন্দরাম দাস।

* বিশ্বকোষ আফিসের ২৯০ সংখ্যক পুঁথি।

হস্তলিখিত পুঁথিখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১১৬২ সনের লেখা। "লেখক শ্রীশ্রীনাথ গোস্বামী, সাকিন বেল্যা।"

কাশীদাসী ভারত কোন্ কোন্ কবির রচনা।

যদি কাশীদাসের কৃত দ্রোণপর্ব্বের অনুবাদটি থাকিত, তবে তৎপুত্র পিতৃযশের লোপ-চেষ্টায় এই অনুবাদকার্য্যে ব্রতী হইতেন বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষ আর একটি কথা এই দেখা যায় যে, কাশীদাসের দ্রোণপর্ব্ব এবং নন্দরামদাসের দ্রোণপর্ব্ব,—একই গ্রন্থ। আমরা যে পর্য্যন্ত উভয় অনুবাদের রচনা অনুসরণ করিতে পারিলাম, তাহাতে কোন বিশেষ পার্থক্য অনুভব করিতে পারিলাম না,—এই কারণে এবং পূর্ব্বোল্লিখিত অপরাপর নানা কারণে মনে হয় যেন, কাশীদাস সমগ্র মহাভারতের অনুবাদটি সঙ্কলন করিয়া যাইতে পারেন নাই। কাশীদাস, গদাধর দাস এবং নন্দরাম দাস এই তিন জনের চেষ্টায় যে মহাভারতের অনুবাদ প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে সাধারণতঃ কাশীদাসের ভণিতা বজায় রাখিয়া উহা "কাশীদাসী মহাভারত" নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যদিও সমস্ত মহাভারতের মধ্যে একটি একভাবাত্মক ছন্দঃ ও বৈষম্যহীন সুন্দর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তথাপি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে প্রতীয়মান হইবে, "আদি, সভা, বন, বিরাট" এই তিন পর্ব্বে যে সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি ও শব্দঝঙ্কারের পরিচয় আছে, পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে তাহার সমূহ অভাব। "দেখ দ্বিজ মনসিজ" প্রভৃতি অংশের শব্দ-সরসতা একঘেয়ে পয়ার ছন্দের মধ্য হইতে ভারতচন্দ্রীয় যুগের সহিত এই কাব্যের সম্পর্ক বন্ধন করিয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলির শ্রেষ্ঠ অংশসমূহ নিত্যানন্দ ঘোষ, দ্বিজ রঘুনাথ * এবং অপরাপর পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারত-

---

* এই অনুবাদখানি উড়িষ্যাধিপতি মুকুন্দদেবের রাজত্বকালে বিরচিত হয়। পুস্তক আবিষ্কর্ত্তা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"কাশীরামদাসের অশ্বমেধ-পর্ব্বের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলাম; কোন কোন স্থলে সুন্দর মিল আছে, কেবল দুই একটি শব্দ মাত্র পৃথক্‌।"—পরিষৎ-পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩০৫ সন, ১৪১ পৃঃ।

রচকগণের রচনা হইতে অপহৃত হইয়াছে। কাশীদাসের মহাভারতের যদি কিছু মৌলিকত্ব থাকে, তাহা পূর্ব্বাংশেই পর্য্যবসিত।

রামেশ্বর নন্দীর মহাভারত।

রামেশ্বর নন্দী নামক কবি সম্ভবতঃ কাশীদাসের পরে মহাভারত অনুবাদ করেন; যে হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছি, তাহা ১০০ বৎসরের প্রাচীন। এই কবির রূপবর্ণনাতে ভারতচন্দ্রের মত স্বর্গ মর্ত্ত্য লইয়া ক্রীড়া ও যথেষ্ট বাক্যপল্লব আছে; ভাষাটি অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ—এই জন্য রামেশ্বরকে কাশীদাসের পরবর্ত্তী কবি বলিয়া মনে হয়,—শকুন্তলার রূপ বর্ণনা—"চামরে চিকুর কেশ হেন মনে লয়। চাঁচর তাহাতে নাই এইত বিস্ময়॥ চাঁদ কুন্দ দিয়া মুখ করিল নির্ম্মিত। তাহাতে কলঙ্কহেতু নহে পরতীত॥ অরুণ তিলক ভালে হেন লএ চিতে। সর্ব্বক্ষণ রক্তবর্ণ না থাকে তাহাতে॥ ভুরূযুগ নিরমিল কাম শরাসনে। কঠিন দেখিয়া তারে নাহি লয় মনে॥ কুবলয়দলে কৈল আঁখি নিরমাণ। চঞ্চলতা নাহি তাহে কটাক্ষ সন্ধান॥ বিম্বফল জিনিয়া অধর হেন দেখি। ঈষৎ মধুর হাস তাতে নাহি লক্ষ্যি॥" একবার উপমা দিয়া আবার সে উপমাটিকে ধিক্কৃত করা, অলঙ্কার শাস্ত্রের পত্র লইয়া এবম্বিধ কৌতুকপূর্ণ ক্রীড়া কাশীদাসের পরবর্ত্তী যুগের বিশেষত্ব।

রামেশ্বর কবির স্বভাব-বর্ণনা প্রাচীন কবিগণের স্বভাব-বর্ণনার পুনরাবৃত্তি, কিন্তু ভাষা অনেকটা বিশুদ্ধ। যথা,—

"সম্মুখে দেখিলা রাজা মুনির আশ্রম। নানা বৃক্ষলতা তথা অতি মনোরম॥ স্থলপদ্ম মল্লিকা মালতী বিরাজিত। লবঙ্গ কাঞ্চন নাগকেশর শোভিত। নানাজাতি বৃক্ষলতা সব পুলকিত। রক্তবর্ণে শ্বেতবর্ণে হৈছে বিকশিত। পুষ্পমধু পানে মত্ত মধুকরগণ। নানা স্থানে উড়ে পড়ে অস্থির সঘন॥ অন্যে অন্যে বাদ করি সতত ঝঙ্কারে। যাহারে শুনিলে কামে মুনি মন হরে॥ নানা জাতি পক্ষী নাদ করে সুললিত। বৃক্ষমূলে থাকিয়া খঞ্জন করে নৃত্য॥ কোকিল মধুরধ্বনি সঘনে কুহরে। তৃষ্ণায় চাতক পক্ষী পিউ পিউ বোলে॥ ময়ুর পেখম ধরি নৃত্য করে তথি। আশ্রম দেখিয়া তুষ্ট হইল নৃপতি॥"

—রামেশ্বর নন্দীর ভারত, বে, গ, পুঁথি, ৮৫। ৮৬ পত্র।

ইহা শকুন্তলা উপাখ্যানের পূর্ব্বভাগ। রাজেন্দ্রদাসের ন্যায় রামেশ্বরও

কালিদাসের শকুন্তলা হইতে উপাখ্যান ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন ;—"কণ্টক লাগয়ে পথে আপনা আঁচলে। খসাইতে রাজারে ফিরিয়া চাহে ছলে॥" প্রভৃতি শকুন্তলার চেষ্টা কালিদাসের জগদ্বিখ্যাত চিত্রের স্পষ্ট অনুকরণে চিত্রিত হইয়াছে।

ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী।

ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী নামক অপর এক কবি মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন, ১৩০৩ সালের বৈশাখ মাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত বাবু রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় ইঁহার বিষয় জানাইয়াছেন, উক্ত প্রবন্ধ-লেখকের মতে ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী ২০০ বৎসর পূর্ব্বের কবি।

ভাগবতের অনুবাদ।

ভাগবতের অনুবাদ তিন খানির বিষয় ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে ঃ— ১। গুণরাজ খাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, ২। মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, ৩। লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস প্রণীত বিষ্ণুপুরীর 'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী'র অনুবাদ। 'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী' ভাগবতের সারসংগ্রহ মাত্র। কিন্তু এই অনুবাদত্রয় সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ নহে,—শ্রীকৃষ্ণবিজয় ১০ম ও ১১শ স্কন্ধের এবং শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ১০ম স্কন্ধের অনুবাদ। লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের অনুবাদে অতি সংক্ষেপে ভাগবতের অংশবিশেষের পরিচয় আছে, কিন্তু গদাধরপণ্ডিতের শিষ্য ভাগবতাচার্য্য (রঘুনাথ) ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। এই অনুবাদখানি বেশ সুন্দর,

রঘুনাথ পণ্ডিতের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট ইহার প্রায় সমস্ত পুঁথিখানি সংগৃহীত আছে,—অনুবাদ প্রায় ২০০০০ শ্লোকে পূর্ণ। সম্প্রতি সাহিত্যপরিষদ্ এই অনুবাদখানি প্রকাশ করিতে ব্রতী হইয়াছেন। ১৫৭৬ খৃঃ অব্দে বিরচিত কবি কর্ণপুরের শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় এই পুস্তকের উল্লেখ আছে—"নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গিণী। শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যবল্লভঃ।" রঘুনাথ পণ্ডিতের ভাগবতানুবাদের

নাম "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী,"—ইহা সেই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই উল্লিখিত আছে—"শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী। একমনে শুন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী॥" "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী শুন সাবধানে।" চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থেও এই অনুবাদকারকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—"শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে মহত্তম। তাঁর উপশাখা কিছু করি যে গণন॥ শাখাশ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর কর্ম্মচারী। ভাগবতাচার্য্য, হরিদাস ব্রহ্মচারী॥"

কবিচন্দ্র।

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস কবিচন্দ্রপ্রণীত গোবিন্দমঙ্গলাখ্য ভাগবতানুবাদই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 'কবিচন্দ্র' সমস্ত ভাগবতের সুললিত পদ্যানুবাদ প্রণয়ন করেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।—কবিচন্দ্রের ভাগবতখানির নানা অংশের প্রাচীন পুঁথি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র যেরূপ সুলভ, ভাগবতাচার্য্যের অনুবাদ সেরূপ সহজ প্রাপ্য নহে; তাহা ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত ও কবিকঙ্কণের চণ্ডী প্রভৃতি কাব্যের সঙ্গে কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছেন। রাজার পুস্তকাগারে নানারূপ পুস্তকই থাকার কথা,—তন্মধ্যে যেখানি যে বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে, আমরা এরূপ অনুমান করিতে পারি।

কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল হইতে একটু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল; স্থানাভাব বশতঃ অধিক রচনা উদ্ধৃত করিতে পারিব না;—

"রাধিকার প্রেমনদী রসের পাথার। রসিক নাগর তাহে দেন যে সাঁতার॥ কাজলে মশিল যেন নব গোরোচনা। নীলমণি মাঝে যেন পশিল কাঁচাসোনা॥ কুবলয় মাঝে যেন চম্পকের দাম। কালো মেঘ মাঝেতে বিজলী অনুপাম॥ পালঙ্ক উপরে কৃষ্ণ রাধিকার কোলে। কালিন্দির জলে যেন শশধর হেলে॥"

অপরাপর ভাগবতানুবাদকগণ।

পূর্ব্বোক্ত অনুবাদগুলি ছাড়া অভিরামদাস নামক জনৈক সুকবি ভাগবতের সমস্ত কিংবা অধিকাংশের অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে সনাতন চক্রবর্ত্তী নামক অপর একজন কবি ভাগবতের অনুবাদ করেন। লেখক

আওরঙ্গজীবের সঙ্গে সুজার যুদ্ধের সময় উল্লেখ করিয়া পুস্তকরচনার কাল-নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বঙ্গবাসীকার্য্যালয় হইতে ইহার কতকাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভাগবতের উপাখ্যানভাগ অবশ্যই বহুসংখ্যক কবিই রচনা করিয়াছেন, জয়ানন্দের ধ্রুবচরিত্র, প্রহ্লাদচরিত্র, দ্বিজ কংসারির প্রহ্লাদচরিত্র, দ্বিজ ভবানন্দের নানা ভাগবতোক্ত উপাখ্যান, নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর পুত্র জীবন চক্রবর্ত্তী প্রণীত 'কৃষ্ণমঙ্গল' প্রভৃতি এই স্থলে উল্লিখিত হইতে পারে। কাশীদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাসের ভাগবতানুবাদের বিষয় ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ, অন্ধ ভবানীপ্রসাদ রায়।

ভবানীপ্রসাদ কর, জাতিতে বৈদ্য, বাড়ী কাঁটালিয়া, এখন মৈমনসিংহের মধ্যে,—কিন্তু ইঁহারা মৈমনসিংহের "সমাজবহির্ভূত বৈদ্য" নহেন, ইঁহাদের উপাধি 'রায়'। ভবানীপ্রসাদ ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন; ইনি জন্মান্ধ, এই টুকুই তাঁহার বিশেষত্ব। শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় এই অন্ধকবিকে আলোকে আনিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। কবিমহাশয়ের জ্ঞাতিগণের সঙ্গে সদ্ভাব ছিল না। জ্ঞাতিভ্রাতা কাশীনাথের পুত্রগণের বিরুদ্ধে তিনি অনেক অভিযোগ আনিয়াছেন; পাঠকগণ উভয় পক্ষের প্রমাণ না লইয়া অন্ধের প্রতি পক্ষপাতপরায়ণ হইয়া এক তরফা ডিক্রী দিতে পারেন, কিন্তু তাহা উচিত নহে। মুকুন্দরাম-অঙ্কিত ডিহিদার মামুদসরিফ দেশের শত্রু, সুতরাং কবির বর্ণনার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া তদ্বিরুদ্ধে বিচার চলে,—এস্থলে কিন্তু অভিযোগ নিতান্ত ব্যক্তিগত,—কবি স্বীয় পারিবারিক বিদ্বেষবশতঃ গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখিবার সুযোগ লইয়া অপরের গ্লানি না করিলে তিনি সর্ব্বতোভাবে সাধারণের কৃপাপাত্র হইতেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার অবতরণিকা কি ভাষা, রুচি কিংবা কবিত্ব ইহার কোন হিসাবেই প্রশংসা-যোগ্য হয় নাই।—"নিবাস কাঁটালিয়া গ্রাম বৈদ্যকুলজান। দুর্গার মঙ্গল

বোলে ভবানীপ্রসাদ॥ জন্মকাল হৈতে কালী করিলা দুঃখিত। চক্ষুহীন করি বিধি করিলা লিখিত॥ মনে দঢ়াইয়াছি আমি কালীর চরণ। দাঁড়াতে আমার নাহিক কোন স্থান॥ জ্ঞাতি ভ্রাতা আমার আছে নাম কাশীনাথ। তাহার তনয় দুই কি কহিব সম্বাদ॥ জ্ঞাতি ভাই করি তেঁহ করেন আপ্যিত। তাহার তনয় গুণ কহিতে অদ্ভুত॥ কনিষ্ঠ পুত্রের গুণ ভুবন বিদিত। পরদ্রব্য পরনারী সদায় পীরিত॥ বিদ্যা উপার্জ্জন তার নাহি কোন লেশ। পিতা পিতামহ নাম করিলা নিকাশ॥ দীর্ঘটানে সদা তেঁহ থাকেন মগন। জ্ঞাতি বন্ধু সহ তার নাহিক মরণ॥ তাহার চরিত্র গুণ কি কহিব কথা। খুড়া প্রতি করে তেঁহ সদায় বৈরতা॥ এহি দুঃখে কালী মোরে রাখিলা সদায়। তোমার চরণ বিনে না দেখি উপায়। দুষ্ট হাত হৈতে কালী কর অব্যাহতি। তুমি না তরাইলে মোর হবে অধোগতি॥ মনে ভাবি তোমার পদ করিয়াছি সার। এ দুষ্টের হাত হৈতে করহ উদ্ধার॥ আমি অজ্ঞ ক্রিয়াহীন না দেখি উপায়। শরণ লৈয়াছি মাত রাখ তব পায়॥" অন্যত্র,—

"ভবানীপ্রসাদ রায় ভাবিয়া আকুল। চক্ষুহীন কৈলা বিধি নাহি পাই কূল॥ কাঁটালিয়া গ্রামে করবংশেতে উৎপত্তি। নয়নকৃষ্ণ নামে রায় তাহার সন্ততি॥ —জন্ম-অন্ধ বিধাতা যে করিলা আমারে। অক্ষর পরিচয় নাই লিখিবার তরে॥"—

অন্ধকবি জীবনে অনেক কষ্ট সহিয়া গিয়াছেন, সেই কষ্ট বর্ণনায় যদি কিছু বিদ্বেষের চিহ্ন স্পষ্ট অপভাষায় প্রকাশিত হইয়া থাকে, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি শ্লেষ প্রয়োগ করিয়া আমাদের কবির প্রেতাত্মাকে রুষ্ট করা সুরুচির পরিচায়ক কিংবা, ভূতযোনিতে বিশ্বাস করিলে, নিরাপদ হইবে না। ভবানীপ্রসাদের রচনায় প্রসাদগুণ বেশ আছে, কিন্তু তিনি জন্মান্ধ থাকায় তাঁহার অক্ষর জ্ঞান ছিল না, তাহা "চণ্ডী"তে পরিষ্কারই ধরা যায়। এই উদ্ধৃত অংশেই,—"প্রসাদ" সঙ্গে "জাত," "নাথ" এর সঙ্গে "সম্বাদ," "কথা"র সঙ্গে "বৈরতা" প্রভৃতি শব্দ দ্বারা মিল দিতে দেখা যায়, তাঁহার পুস্তক ভরিয়া "রাজন" এর সঙ্গে "পরাক্রম", "আমি" এর সঙ্গে "মুনি," "শ্রীরাম" এর সঙ্গে "জাম্বুবান," "অনুপম" এর সঙ্গে "প্রজাগণ" মিল পড়িয়াছে ; প্রাচীন অনেক কাব্যেই এরূপ দৃষ্টান্ত মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হয় ; কিন্তু ভবানীপ্রসাদ এই ভাবের যেরূপ ঘন ঘন প্রয়োগ করিয়াছেন, অন্য কোন কবির রচনায় সেরূপ দেখা যায় নাই। শুধু শ্রুতিই তাঁহার

পদের মিল-নির্ণায়ক, সুতরাং লিখিত কথা অপেক্ষা তদ্দেশবাসিগণের উচ্চারিত কথাই তাঁহার কাব্যের অধিকতর আদর্শ হওয়া স্বাভাবিক হইয়াছিল।

ভবানীপ্রসাদের মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ সর্ব্বত্রই মূলের অনুবাদ নহে। মার্কণ্ডেয় মুনিকে ত্যাগ করিয়া গ্রন্থকার মধ্যে মধ্যে অন্যান্য মুনিগণেরও শরণাপন্ন হইয়াছেন। অনুবাদ বেশ সরল ও সুন্দর, নিম্নে চণ্ডীর সুপরিচিত একটি অংশের ভাষানুবাদ উদ্ধৃত করা হইল ;—

"যেহি দেবি বুদ্ধিরূপে সর্ব্বভূতে থাকে। নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার তাকে॥ যেহি দেবী লজ্জারূপে সর্ব্বভূতে থাকে। নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার তাকে॥ যেহি দেবী ক্ষুধারূপে সর্ব্বভূতে থাকে। নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার তাকে॥ যেহি দেবী তৃষ্ণারূপে সর্ব্বভূতে থাকে। নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার তাঁকে॥ যেহি দেবী দয়ারূপে সর্ব্বভূতে থাকে। নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার তাকে॥"

অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদের ক্ষমতা বেশ ছিল। বামনের চাঁদ ধরিবার সাধ ও অন্ধের কাব্য লেখার সাধ একমাত্র ভগবানই পূর্ণ করিতে সমর্থ, ভবানীপ্রসাদের সে আশা তিনি চরিতার্থ করিয়াছিলেন ; কিন্তু অন্ধকবি পাইলেই আমরা মিল্টন ও হোমার স্মরণ করিয়া উৎফুল্ল হইব, ইহা ঠিক নহে।

রূপনারায়ণ ঘোষকৃত চণ্ডীর অনুবাদ।

ভবানীপ্রসাদ অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর প্রতিভাশালী কবি রূপনারায়ণ প্রায় সমকালেই মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অপর একখানি অনুবাদ প্রণয়ণ করেন। এই কবি আদিশূর-আনীত কায়স্থ মকরন্দ ঘোষের বংশীয় ; যশোহর ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বসতিস্থান ছিল। যশোহরে রাষ্ট্রবিপ্লব (সম্ভবতঃ মানসিংহের আক্রমণ-ঘটিত) হইলে, জগন্নাথ ও বাণীনাথ এই দুই সহোদর—স্বদেশ ছাড়িয়া মাণিকগঞ্জ-আমডালা গ্রামে উপস্থিত হন। সেখানকার জমিদার জনৈক করবংশীয় নিম্নশ্রেণীর কায়স্থ দুই ভ্রাতাকে আদরের সহিত অভ্যর্থিত করিয়া স্বীয় দুই কন্যার পাণিগ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন ; জ্যেষ্ঠ বাণীনাথ এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হন না—উভয়

ভ্রাতা পলায়ন করিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু বাণীনাথ ধৃত হইয়া পদ্মার ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত হন,—মৃত্যুর পূর্ব্বেও তাঁহাকে করমহাশয়ের কন্যা-বিবাহ করিয়া জীবন রক্ষার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। তিনি "জগন্নাথের দ্বারা আমাদের বংশ রক্ষা হইবে, এই অভিমত প্রকাশ করিয়া বীরের মত পদ্মার আবর্ত্তে প্রাণত্যাগ করিলেন ; কিন্তু এই বল্লালীবীরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগন্নাথ বিস্তর যৌতুকের লোভে ময়মনসিংহ বাফলা গ্রামের জমিদার যাদবেন্দ্ররায়ের কন্যা বিবাহ করিয়া আদাজান গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন। যাদবেন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর বাফলার জমিদারগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া কবি যে শ্লোকটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার একার্দ্ধ এখনও তদ্দেশে প্রচলিত আছে,—"যাদবেন্দ্রবিহীনেয়ং বাফলা নিষ্ফলা গতা।"

শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু অনুমান করেন * জগন্নাথ-পুত্র রূপনারায়ণ খৃঃ ১৫৯৭ কিংবা তৎসন্নিহিত কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। কবি রূপনারায়ণের কৃত অনুবাদখানিতে তাঁহার সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির যথেষ্ট পরিচয় আছে, ইহাতে দশনের সহিত দাড়িম্ব বীজের, কম্বুর সহিত কণ্ঠের এবং কর্ণের কুণ্ডলের সঙ্গে মদনের রথচক্রের উপমা আছে,—"যে রথ আরোহি মদন বীর। জিনিল পিনাকপানি ধীর ॥"—শেষের উপমাটি একটু নূতন হইলেও উহা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র হইতেই আহৃত। কবি কালিদাসের রঘুবংশ পড়িয়াছিলেন, মার্কণ্ডেয় মুনির খাতায় সে বিদ্যারও উজ্জ্বল দীপ্তি পড়িয়াছে, যথা,—"গুণের গরিমা তার কে পারে বর্ণিতে। দুস্তর সাগর চাহি উড়ুপে তরিতে॥ প্রাংশুগম্য মহাফল লোভের কারণ। হাতে পাইতে ইচ্ছা করয়ে বামন॥ পরন্তু ভরসা এক মনে ধরিতেছে। বজ্রবিদ্ধ মণিতে সূত্রের গতি আছে॥" "পরন্তু" আমাদেরও বিশ্বাস এই যে রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া যদি মূলবহির্ভূত অতিশয়োক্তির আড়ম্বর একবারে পরিহার করিতেন, তবেই ভাল হইত, এবং তাহা হইলেও তাঁহার সংস্কৃত-

---

* পরিষৎ পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩০৪ সাল, পৃঃ ৭৭।

কাব্যশাস্ত্রে প্রবেশ নাই, আমরা এ কথা কখনই অঙ্গীকার করিতে পারিতাম না। গৃহিণীগণ এত অলঙ্কার প্রদর্শনাভিলাষী হইয়া তো কখনও অন্নব্যঞ্জনের সঙ্গে দুই একটি স্বর্ণ-দানা কিংবা মুক্তা রাঁধিয়া বসেন না ;—সেগুলি দেখাইবার স্থান ও সুবিধা বিবেচনা করা আবশ্যক, প্রাচীন কবিগণের অনেকেরই সেই জ্ঞানটির অভাব। "যেখানে যেটি"—ইহা কবি হইতে সামান্য মুটে মজুর সকলেরই কার্য্যে সূত্র হওয়া উচিত।

প্রভাসখণ্ড।

শিশুরামদাস নামক এক লেখক এই সময় প্রভাসখণ্ডের অনুবাদ করেন, তাঁহার পরে ঈশ্বরচন্দ্র সরকার প্রভাসখণ্ডের আর একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

সমাজের চিত্র।

অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত কাব্যগুলিতে বাঙ্গালা দেশের আচার ব্যবহার সুচিত্রিত আছে। কবিকঙ্কণের চণ্ডী সেই সমাজের একখানি সুনির্ম্মল দর্পণের ন্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বঙ্গীয় গার্হস্থ্য-জীবন প্রতিফলিত করিতেছে। সেই সময়ে যুদ্ধবিগ্রহাদি সর্ব্বদাই সংঘটিত হইত ; এখন কবিগণ বীররসে মাতিয়া তোপের শব্দে আম্রবন কম্পিত ও মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর শান্তিভঙ্গ করেন, ইহা সর্ব্বৈব কাল্পনিক ; বস্তুতঃ যুদ্ধের কথা ইতিহাস ও কাব্য পড়িয়াই আমরা জানিতে পারি, কোন বাঙ্গালা লেখকের সেই দৃশ্য দেখিবার কোন আশঙ্কা নাই ; কিন্তু ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যুদ্ধাদি সর্ব্বদাই ঘটিত এবং এই কৃশাঙ্গ ভীরু বঙ্গবাসীদের মধ্যেও সৈনিক

বাঙ্গালী সৈনিক।

পুরুষের অভাব ছিল না ; মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে আমরা ব্রাহ্মণপাইক, কর্ম্মকারপাইক, চামার-পাইক, নটপাইক, বিশ্বাসপাইক ও বাঙ্গাল পাইকগণের বিবরণ দেখিতে পাই ; ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অস্ত্রপ্রয়োগনিপুণ ও বলিষ্ঠ

ছিলেন, কালকেতুর বল ও সাহস একজন উচ্চদরের সৈনিকের উপযুক্ত, কিন্তু বঙ্গীয় কাব্যসমূহে অতিমাত্রায় যুদ্ধাদির বর্ণনা পাঠ করিয়াও আমরা প্রকৃত বীররস দেখিতে পাই না; কৃত্তিবাসী রামায়ণে দৃষ্ট হয়, শ্রীরামচন্দ্র চাঁপা নাগেশ্বর জটায় বাঁধিয়া যুদ্ধ করিতেছেন, মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে আছে, চণ্ডীদেবী ভয়ানক যুদ্ধে মঙ্গল দৈত্যকে বধ করিয়া সহচরীগণের নিকট বিশ্রামজন্য একটি পান ও পাখা চাহিতেছেন ও কলিঙ্গরাজ স্বপ্ন দেখিয়া আকুল হইয়া পড়াতে—'রাজার প্রকৃতি দেখি রাণী সব কাঁদে। কর্ণে জপ করে কেহ শিরে শিক্ষা বাঁধে॥" কবিকঙ্কণের কালকেতু এত বড় বীর হইয়াও যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ার পর স্ত্রীর প্ররোচনায় ধনাগারে লুক্কায়িত হইয়া রহিল, কলিঙ্গাধিপের কোটাল এই বলিষ্ঠ কাপুরুষটিকে তথা হইতে টানিয়া বাহির করিলে ফুল্লরা কাঁদিয়া বলিতে লাগিল,—"না মার না মার বীরে শুনহে কোটাল। গলার ছিঁড়িয়া দিব শতেশ্বরী হার॥"—(ক, ক, চ)। পরন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনায় এরূপ বর্ণনা বিরল নহে, "ব্রাহ্মণে না মার, ব্রাহ্মণে না মার, পৈতা দেখাইয়া কাঁদে।"—(ক, ক, চ)। "যতেক ব্রাহ্মণ পাইক পৈতা ধরি করে। দন্তে তৃণ করি তারা সন্ধ্যামন্ত্র পড়ে॥"—(মা, চ)।

কাব্যে বীর রসের অভাব।

এই বঙ্গদেশে তখন সীতারামের ন্যায় দুই একজন প্রকৃত বীর ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম স্বরূপ গণ্য হইবেন। লাউসেনের ভ্রাতা কর্পূরের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, লাউসেনের যুদ্ধাদি বর্ণনা হইতে কর্পূরের প্রাণরক্ষার চেষ্টায় বাঙ্গালী-চরিত্র বেশী সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রকৃত বীরত্বের অভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরগণের শরের শন্ শন্ ও বাঁশের লাঠির ঠন্ ঠন্ একরূপ ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় বোধ হয়।

হিন্দুরাজগণ সকালে বৈকালে পুরাণ-পাঠ শুনিতেন, ভাগবতই তখন শ্রেষ্ঠ পুরাণ বলিয়া আদৃত হইত। বড় বড় রাজগণের অধীন রাজগণ "ভূঞা রাজা" নামে আখ্যাত হইতেন; কোন শ্রেষ্ঠ রাজার অভিষেকের সময় "ভূঞারাজগণ"

রাজা ও প্রজা।

তাঁহার মাথায় ছত্র ধরিতেন, রাজগণ অনেক সময় গ্রামনগরাদি সংস্থাপনের সময় বহুসংখ্যক দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিতেন ও অনেক সময় কৃষকদিগকে লাঙ্গল ও চাষের বলদ প্রভৃতি দান করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন। রাজাদিগের দৌরাত্ম্যও প্রসাদের তুল্য অপরিমিত ছিল; বাজারে পণ্যজীবিগণ রাজকর্ম্মচারীদিগের ভয়ে অস্থির থাকিত, আমরা ভাড়ুদত্তের প্রসঙ্গে তাহা দেখাইয়াছি। অনেক রাজার ধর্ম্মবিশ্বাস ও বিনয় ইতিহাসে দৃষ্টান্তস্থলীয়, সচরাচর ব্রহ্মোত্তর-দানপত্রে এইরূপ বিনীত প্রার্থনা পাওয়া যায়,—"যদি আমার বংশের অধিকার লুপ্ত করিয়া অন্য কেহ এই রাজ্য লাভ করেন, তবে তাঁহার নিকট আমার এই প্রার্থনা আমি তাঁহার দাসানুদাস হইয়া থাকিব, তিনি যেন ব্রহ্মবৃত্তি হরণ না করেন॥" সাধারণতন্ত্র রাজশাসনে মোটের উপর অপেক্ষাকৃত ন্যায়-বিচার অধিক লাভ করা যায়, কিন্তু স্বেচ্ছাচারী রাজা উৎকৃষ্ট-চরিত্র হইলে তাঁহার শাসনে পৃথিবী স্বর্গের ন্যায় হয়। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে দুর্ব্বলার বাজার করার যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হইবে, সে সময়ে জিনিষপত্র সমস্তই অতি সুলভ-মূল্য ছিল; মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে প্রদত্ত ফর্দ্দে তদপেক্ষাও সুলভ মূল্য দৃষ্ট হয়, পূর্ব্ববঙ্গের বাজারে জিনিষের মূল্য আরও সস্তা ছিল বলিয়া বোধ হয়।

বাজার দর।

ভদ্রলোকগণ তখন সাধারণতঃ পাদুকা ব্যবহার করিতেন না; ভদ্রলোক অতিথি কোন গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে প্রথমেই তাঁহাকে পা ধুইবার জল দিয়া সম্ভাষণ করিতে হইত; বহু কষ্টে একটি জলপূর্ণ গাড়ুর সাহায্যে কাদা ধুইয়া ফেলিয়া ভদ্রলোকগণ "গাম্ভীরার পীড়া" চাপিয়া বসিতেন, এবং কখনও আহারান্তে একটি অর্দ্ধখণ্ডিত গুবাক চর্ব্বণ করিয়া মুখ শুচি করিতেন। খুব ভাল অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ রাত্রিতে শয়ন-প্রকোষ্ঠে যাইবার পূর্ব্বে ভাল

আচার ব্যবহার ও বেশ ভূষা।

করিয়া পা ধুইয়া পাদুকা পরিয়া শয্যায় যাইতেন; ধনপতি লক্ষেশ্বর ব্যক্তি, তিনি শুইবার পূর্ব্বে—"চরণে পাদুকা দিয়া করিল গমন। পদ্মনাভ স্মরি সাধু করিল শয়ন॥" স্ত্রীলোকগণ অঙ্গদ, কঙ্কণ, কর্ণপুর, প্রভৃতি নানারূপ সোণার অলঙ্কার পরিতেন, নানা ছন্দে খোঁপা বাঁধিতেন, ও "মেঘডুম্বুর" কাপড় এবং কাঁচুলি পরিতেন; নিকৃষ্ট শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ "ক্ষুঞা" বা ক্ষৌমবাস পরিত, ইহা একরূপ অল্পমূল্য পট্টবস্ত্র; মাণিকচাঁদের গানে দেখিয়াছি গোপীচাঁদের রাজত্বকালে বাঁদীগণও "পাটের পাছড়া" পরিত না; এই "পাটের পাছড়া" ও "ক্ষুঞাবাস" একই প্রকারের কাপড় বলিয়া বোধ হয়, ভারতচন্দ্র "খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত" কথার এই "খুঞা" বস্ত্রের প্রতি নিগ্রহ দেখাইয়াছেন। স্ত্রীলোকগণের অঙ্গমার্জ্জনার জন্য আমলকীই সাবানের কার্য্য করিত; স্বর্ণালঙ্কারের সঙ্গে ফুলও অঙ্গরাগের একটি বিশেষ উপকরণ ছিল, বাজারে নানারূপ ফুল বিক্রয় হইত, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে গোপিনীগণের বেশ করার প্রসঙ্গে "কিনিয়া চাঁপার ফুল কেহ দেহি কাণে" পাইয়াছি। কিন্তু একজন বড় ইংরেজ লেখক "Rude nations delight in flowers" এই উক্তি করিয়া উৎকৃষ্ট নাগকেশর, কুরুবক, চম্পক, পুন্নাগ ও মালতীর জাতি নষ্ট করিয়াছেন; সুন্দরীগণ এখন এই সব দেশীয় ফুল ছুঁইতে ভীত হইতে পারেন। পুরুষগণ বালা পরিতে লজ্জা বোধ করিতেন না, ও দরিদ্র ব্যক্তিও কর্ণে একটু সোণা পরিয়া কৃতার্থ হইত, গুজরাটপুরীর সৌভাগ্য বর্ণন করিয়া কোটাল বলিতেছে—"নগরে নাগরজনা, কাণে লম্বমান সোণা, বদনে গুবাক হাতে পান। চন্দনে চর্চ্চিত তনু, হেন দেখি যেন ভানু, তসর রঙ্গন পরিধান॥"—(ক, ক, চ)। নিম্নশ্রেণীর লোকগণ "খোসালা" নামক একরূপ শীতবস্ত্র গায় দিত। বাজারে জিনিষ খরিদ করিতে গেলে প্রথমেই কড়ি-প্রত্যাশী দুই ব্যক্তির সাক্ষাৎ-কার হইত; একজন লগ্নাচার্য্য,—ইনি পঞ্জিকা শুনাইয়া কিছু যাচ্ঞা করিতেন, অপর 'কুশারী' উপাধিবিশিষ্ট ওঝা, ইহার কাঁধে একটা বড়

কুশের বোঝা থাকিত এবং ইনি বেদ পাঠ করিয়া অভ্যাগতকে আশীর্ব্বাদ করতঃ কিছু যাচ্ঞা করিতেন।

বিদ্যাচর্চ্চা।

তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে শিক্ষার চর্চ্চা খুব বেশী ছিল, শ্যামানন্দ সদ্গোপ হইয়াও অতি অল্প বয়সেই ব্যাকরণ শাস্ত্রে কৃতী হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে ; চণ্ডীকাব্যে শ্রীপতিবণিকের শাস্ত্রে অধিকারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার পিতা ধনপতি বণিকও—"নাটক নাটিকা কাব্যে যাঁহার উল্লাস"—বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন। সংস্কৃতটোলে বাঙ্গালা অক্ষরের সঙ্গে দেবনাগর অক্ষরেও পুস্তক লিখিত হইত, ধনপতিবণিক সিংহলে "নাগরী বাঙ্গালা রায় পড়িবার জানি" বলিয়া স্বীয় বিদ্যার পরিচয় দিতেছেন, টোলে পাঠারম্ভ হইতে কি ভাবে অধ্যাপনা চলিত, মাধবাচার্য্য তাহার বিবরণ দিয়াছেন—"চ বর্গাদি বর্গ যত, পড়িলেক শ্রীমন্ত, কাগলয়ে প্রবেশিল মন॥ কেয় কর কন আদি, কল ক্কোব অবধি, রেফযুক্ত পড়ে যত ফলা। কিরি কিলি আর্ক আঙ্ক, একাবধি যত অঙ্ক, কাগলয়ে পারগ হ'ল বালা॥ পূজা করি সরস্বতী, আরম্ভিলা পাঠ্য পুঁথি, জানিবার সন্ধির প্রকার। স্বরসন্ধি পড়িয়া সুসম পল্লেতে গিয়া, শব্দ সন্ধি জানিলা অপার॥ চণ্ডিকার বর হেতু, পড়িলা সকল ধাতু, দ্বিবিকায় জানিতে কারণ। ষত্ব ণত্ব জ্ঞান হয়, সংস্কৃতে কথা কয় পারগ হইলা ব্যাকরণ॥" কিন্তু চৈতন্য-ভাগবতে দেখা যায় টোলের ঊর্দ্ধতন ছাত্রগণ ব্যাকরণকে 'শিশু শাস্ত্র' বলিয়া উপেক্ষা করিতেন। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে অনেকে সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হইতেন, কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গালারই অনুশীলন বেশী করিতেন। ২০০—১০০ বৎসর পূর্ব্বের যতগুলি বাঙ্গালা পুঁথি পাইয়াছি, তাহা-দের অনেকগুলি নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তির হাতের লেখা ; কয়েকটির কথা উল্লেখ করিতেছি ;—হরিবংশ (১১৯০ সন), লেখক শ্রীভাগ্যমন্ত ধুপি ; নৈষধ (১১৭৪ সন), লেখক শ্রীমাঝি কাইত ; গঙ্গাদাস সেনের দেবযানী উপাখ্যান (১১৮৪ সন), লেখক শ্রীরামনারায়ণ গোপ ; ক্রিয়াযোগসার (সনের নির্দ্দেশ নাই, ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের হস্তলিপি বলিয়া বোধ হয়),

লেখক শ্রীকালীচরণ গোপ; রাজা রামদত্তের দণ্ডীপর্ব্ব (১৭০৭ শক), লেখক শ্রীরামপ্রসাদ দেএ। এইরূপ আরও অনেক পুঁথি আমাদের নিকট আছে। ত্রিপুরাজেলায় রাজপাড়া গ্রামে ১০০ বৎসরের প্রাচীন একখানি নলদময়ন্তী এক ধোপা বাড়ীতে আছে, উহা সেই ধোপার পিতামহের লেখা, লেখাটি মুক্তার ন্যায় গোটা গোটা, বড় সুন্দর। আমরা মধুসূদন নাপিতরচিত নলদময়ন্তীর কথা উল্লেখ করিয়াছি এবং এই নাপিত কবি যে তাঁহার পিতামহের কবিত্ব-যশের গর্ব্ব করিয়াছেন, সে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি; গোবিন্দ কর্ম্মকাররচিত কড়চা অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। আমি জেলায় জেলায় প্রাচীন পুঁথি খুঁজিয়া দেখিয়াছি, ভদ্রলোকগণের ঘরে বাঙ্গালা পুঁথি বড় বেশী নাই, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকের ঘরে উহা রাশি রাশি পাওয়া যায়; ইহাদের দ্বারা প্রাচীন পুঁথিগুলি যেরূপ যত্ন সহকারে রক্ষিত, তাহাতে বঙ্গীয়সাহিত্যসেবকগণ তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

এখন লেখা পড়া শিখিলেই পৈতৃক ব্যবসায় ছাড়িয়া দিবার প্রবৃত্তি জন্মে; মধুসূদন নাপিত সংস্কৃত জানিতেন এবং স্বয়ং একজন কবি ও কবির পৌত্র ছিলেন, কিন্তু তিনি বোধ হয় স্বীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া দেন নাই। সে সময় ধর্ম্ম, আমোদ ও আত্মার উন্নতি কামনায় জ্ঞানের চর্চ্চা হইত; জ্ঞানচর্চ্চা যে শ্রেণীনির্ব্বিশেষে অর্থকরী, এ কথা তখন তাঁহারা জানিতেন না।

স্ত্রীশিক্ষা।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা ছিল, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা একজন শ্রেষ্ঠ স্ত্রীলোক কবির বিষয় আলোচনা করিব। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে দৃষ্ট হয়, খুল্লনা স্বামীর অক্ষর চিনিতেন ও তাহা লইয়া সতিনীর সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা করিতেছেন,—খুল্লনা বণিক্‌রমণী; বৈষ্ণব-সাহিত্যে জানা যায়, মহাপ্রভু যে সাড়ে তিন জন শ্রেষ্ঠ কৃপাপাত্রের কথা উল্লেখ করিতেন, তন্মধ্যে

শিখিমাহিতীর ভগিনী মাধবী—আধ জন; এই মাধবী অতি শুদ্ধাচারিণী ছিলেন, পদকল্পতরুতে ইঁহার রচিত অনেকগুলি সুন্দর পদ আছে (৭৮৮, ১৮০৪, ২১৯২ এবং ২১৯৩ পদ দেখুন)। স্ত্রীলোকগণের মধ্যে ঔষধ করিবার প্রথা বড় বেশী ছিল, আমাদের খোট্টাভ্রাতাদের গালি নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না, জগন্নাথতীর্থে এখনও পাণ্ডারা গাহিয়া থাকে,—

"ভাল বিরাজহুঁ, উড়িয়া জগন্নাথ। উড়িয়া মাগেঁ ক্ষীর খিচুড়ী, বাঙ্গালী মাগেঁ ডাল ভাত, সাধু মাগেঁ দর্শন পর্শন মহা পরসাদ॥ বাঙ্গালিনী রমণী, পরমাসুন্দরী, দেখ্‌ নয়নকতারা, ভজন সাধন নাহি জানেত, জানে বাঙ্গালিনী টোনা॥"

স্ত্রীলোকের কুসংস্কার।

এই "টোনা" অর্থাৎ ঔষধ করার বৃত্তান্ত মুকুন্দকবি বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি উপসংহারে নিজকে বৃদ্ধ বলিয়া বাঁচাইয়াছেন, "ঔষধ প্রবন্ধে কহে মুকুন্দ বিশারদ। বুড়াকে না করে বশ দারুণ ঔষধ॥" এই ঔষধ দ্বারা বশীকরণ প্রথা বিলাতেও চলিত ছিল, সেক্ষপীয়রের ম্যাক্‌বেথ নাটকে যাদুর উপকরণের এক লম্বা লিষ্টি দিয়াছেন, মুকুন্দের তালিকা তাহার অনুরূপ; adders fork, eye of newt, scale of dragon, maw of shark, wool of bat, gall of goat, lizard's leg, swings of owlet, প্রভৃতি বিলাতী যাদুর পার্শ্বে, "কচ্ছপের নখ, কাকের রক্ত, ভুজঙ্গের ছাল, কুম্ভীরের দাঁত, বাদুড়ের পাখা, কাল কুকুরের পিত্ত, গোধিকার আঁত, কোটরের পেঁচা,"—ইত্যাদি কবিকঙ্কণোক্ত উপকরণগুলি স্থান পাইতে পারে, এই ছাই ভস্মের উল্লেখ দ্বারা প্রতীয়মান হইবে, মনুষ্যকল্পনা বীভৎস হইলেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই ভাবে কার্য্য করে, একই দ্রব্য খুঁজিয়া বেড়ায় এবং নরপ্রকৃতি সর্ব্বত্র যে এক সাধারণ নিয়মাধীন তাহা প্রমাণ করে।

বৈষ্ণবপ্রভাব।

বঙ্গীয় সমাজ এই সময় বৈষ্ণবভাব দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইয়াছিল, চণ্ডীকাব্যে শ্রীমন্তের সহচরগণ ও বিবাহোপলক্ষে আগত এয়োগণের নাম পড়িয়া দেখুন; তাঁহাদের অধিকাংশ নাম আমাদের চির-পরিচিত গোপবালক ও

গোপিনীগণের; শ্রীমন্ত বাল্যকালে শকটভঞ্জন, পূতনাতৃণাবর্ত্তবধ প্রভৃতি খেলার অভিনয় করিতেছেন, নিরক্ষর কালকেতুব্যাধ পর্য্যন্ত কংস নদীর তীরে "হেথাই নরক স্বর্গ শুনি ভাগবতে।" (ক, চ), বলিয়া ভাগবতের দোহাই দিতেছে।

পাপ-পুণ্য-বিচার।

পূর্ব্ববঙ্গের রাজেন্দ্রদাসকবি শকুন্তলোপাখ্যান প্রসঙ্গে সমাজে পাপ-পুণ্যের যে আদর্শ আঁকিয়াছেন, বঙ্গের দূরপল্লীগুলিতে বোধ হয় এখনও ধর্ম্মাধর্ম্মের সেই শাসন কতক পরিমাণে বিদ্যমান আছে,—"ভক্তি করি ব্রাহ্মণ সেবা করে যেই জন। তার পুণ্য ব্রহ্মা কৈতে না পারে আপন॥ গোধন জলেতে যদি জল পান করে। তার ফলে সেই জন যায় স্বর্গপুরে॥" কিন্তু পুষ্করিণী রিজার্ভ করিবার এই হুজুগের সময় গোধনের জলপান করায় কোন পুষ্করিণীর মালিক পুণ্যসঞ্চয় ভাবিয়া সুখী হইবেন কি না সন্দেহ। মহাপাপগুলির ভয়ও ইদানীং অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত কাব্যে এই সব ব্যক্তি মহাপাপী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—"নিষেধ দিবসে যে মৎস্য মাংস খায়। মাঘে মূলা খায় যে নির্ম্মাল্য পুছে যায়॥ কুলাচার ছাড়ি যেবা অনাচার করে। কুলবিদ্যা ছাড়ি যেবা অন্য বিদ্যা ধরে॥ ভোজনান্তে ক্ষৌর করে না করে বিচার। উত্তম অধমে অন্ন একত্র আহার॥" এই শতাব্দীতে ইহার অনেকগুলি ধারা রদ হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্ববৎ শব্দার্থের তালিকা দিয়া যাইতেছি, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে,—

শব্দার্থ।

জাঙ্গাল—সেতু, নায়ক—গ্রন্থ-লেখক, সূপ—ব্যঞ্জন, উতাড়িয়া—উত্তোলন করিয়া, উত্তরিল—পৌছিল, উধার—ধার, পিছিলা—পূর্ব্ববর্ত্তী ("মাংসের পিছিলা বাকী ধারি দেড় বুড়ি")। জট—চুল, ("জটে ধরি মাগ মোরে করিলা নিস্তার", "জটে ধরি বাঁধে মহাবীরে," এখন জট অর্থ "জটা" হইয়াছে), পিছে—প্রতি, ("হাল পিছে এক তঙ্কা") নাবড়ো—ঠক, ক্রন্দনা—কান্না, নাটুয়া—রঙ্গভূমির অভিনেতা ("স্নান করি নীলাম্বর, ধরে পূর্ব্ব কলেবর, নাটুয়া ফিরায় যেন বেশ।") উভরায়—উচ্চরবে, জেঠি (জ্যেষ্ঠী)—টিক্‌টিকী, চিয়াইয়া—চেতন হইয়া, ভাজি—ভাজন, বাঁঝি—বাঁদি, আহড়ে—আড়ে ("লুকায় গগনবাসী মেঘের আহড়ে")। বালা—বালক ("চারি বছরের হল বানিয়ার বালা" চণ্ডীকাব্য ব্যতীত অপরাপর

অনেক পুঁথিতেই 'বালা' শব্দ বালক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা হিন্দীর অনুরূপ) ব্যাজে—ছলে (যৌবন করিয়া ডালি পো চাহিয়া ব্যাজে। কুলবতী জলাঞ্জলি দিল কুললাজে॥") এই ব্যাজ শব্দের অর্থ অনেক স্থলে গৌণ। দানা—দানব, জরারি—জরাগ্রস্ত, পুরোধা—পুরবাসী, মো—মমতা, লো—অশ্রু, কাতি—কাইস্তে, রোচা—দন্তহীন, খণ্ড—গুড়, টাবা—নেবু, রায়বার—দৌত্য, কড়া—কাঁচা ("বাড়ে যেন হাতী কড়া") দিয়ড়ি (দেউটী)—দীপ, তোক—অপত্য, শশা (শশারু)—খরগোস, বরিয়াতি—বরযাত্রী, বেসাতি—বাজারে সওদা, শাড়া (বা শাটা)—"শট্টক, ঘৃত, জল ও পিঠালী মিশ্রিত ছানা।" (অক্ষয় বাবুর চণ্ডী, ১৫৫ পৃঃ।) অপরাপর পুঁথিতে—দড়বড়—তাড়াতাড়ি, অনুবন্ধ—অবতারণা, গোড়াইল—সাথে সাথে চলিল, কাণি—ছেঁড়াবস্ত্র, হটে—ছলনায় ("মনসার হটে সাধু ভিক্ষা মাগি খায়।"—মনসার ভাসান)। ইটাল—ইট, নেউটিয়া—ফিরিয়া, গড়—প্রণাম, টোণ—তূণ, সমাধান- শেষ ("নিমিষেক জীবন যৌবন সমাধান,"—মা, চ) সমসর—তুল্য, বুদ্ধাইল—বুঝাইল, পাড়ে—ফেলে, ("অর্জ্জুন কাটিয়া পাড়ে, মুকুট ভূমিতে পড়ে।" কাশী), বাট—পথ, আগুসারি,—অগ্রসর হইয়া, সাবহিত—সাবধান, সহজে—স্বভাবতঃ (এই শব্দ পূর্ব্বে মূল অর্থেই ব্যবহৃত হইত, এখন অর্থচ্যুতি হইয়াছে।) আচরণ—ভ্রমণ, বিচরণ ("প্রেত কাক কুকুরাদি করে আচরণ।"—রসায়ন), চৌরস—প্রসারিত (চাঁচর-চিকুর রামের চৌরস কপাল,"—রামায়ণ), গদ্য—ঠাট্টা ("হেন বুঝি গদ্য মোরে করিল যুবতী"—মা, চ)। পাথর—পাপড়ি, নাট—নৃত্য, উলি—অবতরণ কর, উড়ন—পরিধান করা, খণ্ড—এই শব্দ পূর্ব্বে নানারূপ শব্দের সহিতই যুক্ত হইত, যথা চিরা-খণ্ড, দধিখণ্ড, চোরখণ্ড, ইত্যাদি, 'খণ্ড' কোন কোন সময় 'ভগ্ন' "অর্থে প্রযুক্ত হইত, যথা "খণ্ড কপালিনী"; উজা—সোজা, মেড়—প্রতিমা-পঞ্জর, আশ্বাস—আশঙ্কা ("উপায় করিয়া গেলে আশ্বাস ঘুচিবে"—জগৎরাম রায়ের রামায়ণ), শারি-নিন্দাবাদ।

বিভক্তি।

বিভক্তিগুলি পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন রূপ; সে সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা এ অধ্যায়েও অনেকাংশে খাটিবে; পূর্ব্ববঙ্গের পুঁথিতে "সংক্ষেপে কহিল"—(অর্থ "সংক্ষেপে কহিলাম"), "একই দেখিল আমি তোমা যোগ্য বর।" ইত্যাদি ভাবের প্রয়োগ অনেক দৃষ্ট হয়; জগৎরামের রামায়ণে—"সীতা ভেট দিয়া শিব মাগিব রাবণে।" এইরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়; এইরূপ ব্যবহার পশ্চিমবঙ্গ হইতে এখন উঠিয়া গেলেও পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত আছে;

কর্ত্তৃকারকের পর ক্রিয়ার নানা অদ্ভুত আকার উভয় স্থলের প্রাচীন পুঁথিতেই বিস্তর পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে প্রাচীন পুঁথি হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি পাঠ করিলেই জানা যাইতে পারে।

কতকগুলি বাঁধা বিষয়।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের কয়েকটি বাঁধা বিষয় ছিল, এ সম্বন্ধে ১১০-১১৪ পৃষ্ঠায় একবার উল্লেখ করা হইয়াছে; সেই বাঁধা বিষয়গুলি সংক্ষেপে এই ভাবে বিভাগ করা যাইতে পারে:—১। বারমাসী,—বাঙ্গালা মুলুক ষড়্‌ঋতুর প্রিয়-লীলাক্ষেত্র; বারমাসের বারটি রূপ প্রকৃতির পটে পরিষ্কার রেখায় অঙ্কিত হয়, কবিগণ বৎসরের বারখানি সুখ দুঃখের চিত্র সুন্দররূপে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। ২। অবরোধক্লিষ্টা বঙ্গীয় সীমন্তিনীগণ যখন একটু মুক্তি পান, তখন তাঁহাদের কতকটা অসতর্ক ও চঞ্চল হইয়া পড়া স্বাভাবিক, কবিগণ শ্যামের বাঁশীর তান কি বিবাহ বাসর উপলক্ষ করিয়া ঘরের বউগুলির অনভ্যস্ত স্বাধীনতার মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন, কাহারও কবরী অর্দ্ধ-মুক্ত, কাহারও সমস্ত অলঙ্কার পরা হয় নাই, অর্দ্ধ অঙ্গে অলঙ্কার পরা, অপরার্দ্ধ এলোথেলো যেন কোন চিত্রকরের তুলির অসম্পূর্ণ সৃষ্টি, ইঁহাদের উঁকি ঝুঁকি কতকটা অস্বাভাবিক ও—"হারাবতী একডাকে ভেঙ্গে আনে পাড়া" (ক, ক, চ) প্রভৃতির অসংযত স্ফূর্ত্তির অভিনয় বর্ণনায় কবিগণ সুন্দরীদিগের মোহিনীশক্তি দেখিতে সুবিধা দেন নাই; ভাগবতের একাংশে এই চিত্রের প্রথম ছায়াপাত হইয়াছিল। ৩। পুকুর ঘাটে রমণী। বঙ্গের পল্লী-গ্রামবাসিনী রমণীগণ বাহিরের লোকদিগকে স্বীয় রূপ দেখাইবার একবার সুবিধা দেন, পুকুরের জলে যখন পদ্মমুখ ভাসিয়া উঠে ও স্নিগ্ধকান্তি ফুটিয়া উঠে, তখন সেই রূপ কবির লেখনীর বিষয় হইতে পারে। বিদ্যাপতি হইতে আলওয়াল পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক কবি আর্দ্রবস্ত্রে কুম্ভকক্ষে রমণীগণের গৃহপ্রত্যাগমনের মুগ্ধকর আলোকচিত্র উঠাইয়াছেন। ৪। দাম্পত্য-কলহ—বিদেশ-বিদ্বেষী বাঙ্গালীগণের ঘরে বসিয়া স্ত্রীর গালি খাওয়া

নিত্যকর্ম্ম, এই গালির স্বাদ সর্ব্বদা তিক্ত নহে, একটু মধুরত্ব আছে, তারপর বৃদ্ধ স্বামীর ঘাড়ে যুবতী ভার্য্যার ক্রোধবৃষ্টি, কুলীনদিগের কৃপায় কুলললনার বিড়ম্বনা—দাম্পত্য প্রেমে অম্লরোগ,—কবিগণ, শিবপার্ব্বতী প্রসঙ্গ উপলক্ষ করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। ৫। পতি-নিন্দা, ইহা লইয়া অনেক অশ্লীলকথা বঙ্গসাহিত্য কলুষিত করিয়াছে, অশ্লীল বিষয়ের সঙ্গে আমাদের কোন সহানুভূতি নাই, কিন্তু এই পতি-নিন্দা এতগুলি কবি বর্ণনা করিয়াছেন, যে সমাজ ব্যাপিয়া ইহার কারণ ছিল বলিয়া বোধ হয়, ইহা নেহাৎ কল্পনা নহে ; 'কঠিন ব্যঞ্জন আমি যেই দিন রাঁধি। মারয়ে পিড়ার বাড়ি কোণে বসি কাঁদি॥"—(ক, চ) প্রভৃতি উক্তি মর্ম্মের ; পিতা মাতা অর্থাদির লোভে প্রাণপ্রিয় কন্যাগুলিকে জলে ভাসাইতেন, তাহারা সেই জলে পড়িয়া আজীবন ভাসিতে থাকিত, কিছু বলিতে পারিত না—তাহাদের অবস্থা চণ্ডীদাসের কথায় বলা যাইতে পারে—"বদন থাকিতে, না পারি বলিতে, তেঞি সে অবলা নাম।" ৬। হনুমান—এই সমুদ্র-লঙ্ঘন সেতুবন্ধন-পটু বীরচূড়ামণি বঙ্গসাহিত্যের দেবদেবীগণের দক্ষিণহস্ত ; সমুদ্রে ঝড় উঠাইতে হইবে, বড় প্রাচীর উঠাইতে হইবে, এ সমস্ত ব্যাপারেই দেবদেবীগণ হনুমানের শরণাপন্ন, কিন্তু বাল্মীকির এই মহাচরিত্র বঙ্গীয় সাহিত্যে শুধু একটি বানরে পরিণত হইয়াছে। ৭। শিশু-কন্যাকে স্বামীর ঘরে প্রেরণের সময় পিতৃগৃহ যে কারুণ্যপূর্ণ বেদনার তরঙ্গে প্লাবিত হইত, তাহা লইয়া কবিগণ উমা ও মেনকা-সংবাদ বর্ণন করিয়াছেন।

এই নির্দ্ধারিত বিষয়গুলি লইয়া বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিভা খেলিয়াছে, এই বিষয়গুলি প্রাচীন কবিগণের লেখনীর সাধারণ সম্পত্তি ; দেব-দেবীর ভাণ করিয়া কাব্যপটে বঙ্গীয় গৃহস্থালীর দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাচীন পুঁথির অনেকগুলি যখন মুদ্রিত হইবে, তখন পাঠক এই বাঁধা বিষয়গুলি কোন্ কবির হস্তে কিরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করিতে সুবিধা পাইবেন।

আমরা যে অধ্যায়ের সন্নিহিত হইতেছি, তাহার আভাস এই অধ্যায়-বর্ণিত নানা পুস্তকেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে; চণ্ডীর চৌত্রিশঅক্ষরা স্তুতি (চৌতিশা) অনেকগুলি প্রাচীন পুঁথিতে দেখা যায়; এই "চৌতিশা" শুধু শব্দ লইয়া খেলা,—উহা অনেক স্থলে শ্রুতিকটু হইয়াছে, যথা—"টিটকারী টকারে হইনু পরাজয়ী। টঙ্কারিয়া রক্ষা কর মোরে কৃপাময়ী॥" এই কোমল গীতি-কবিতার দেশে শ্রুতি-কটুতার অপরাধে কবির ফাঁসি হইতে পারে, জয়দেব এই আজ্ঞা দিতেন। যাহা হউক শ্রুতিকটুতা সত্ত্বেও এইরূপ শব্দ লইয়া খেলা হইতে ভাষা সাজাইবার চেষ্টা আরব্ধ হয়, মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে "ঘুচাও মনের রোষ, কর পতি পরিতোষ, দিয়াত বিরাটস্থত দান।" পাওয়া যায়, এই মুন্সীয়ানা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই চেষ্টার বিকাশ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। প্রকৃত প্রেমরসের অভাব হইলে হীরা-মালিনীগিরি আরম্ভ হয়, কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতেই লিপিচাতুর্য্যের হস্তে কবিতাসুন্দরীর ভ্রষ্টামীর পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যায়, নিম্নলিখিত অংশটি দেখুন—

কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের

"অশোক কিংশুক ফুল, হইল যেন চক্ষুশূল, কেতকী কুসুম কামকুন্ত। বৈরি কুসুমবাণ, অস্থির করয় প্রাণ, ঝাট নাশ যাওরে বসন্ত॥ শুইলে নলিনীদলে, কলেবর মোর জ্বলে, জল দিলে নহে প্রতিকার। মলয়ের সমীরণ, অগ্নিকণা বরিষণ, পতি বিনে জীবন অসার॥"

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেই আমরা ভারতচন্দ্রী উপমার প্রথমোদ্যম দেখিতে পাই—

"গৌরীবদন শোভা, লিখিতে না পারি কিবা, দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখা। ম্লানচন্দ্র এই শোকে, না বিচারি সর্ব্বলোকে, মিছে বলে কঙ্কণের রেখা॥ গৌরীর দশন রুচি, দেখি দাড়িম্ব বিচি, মলিন হইল লজ্জাভারে। হেন বুঝি অনুমানে, এই শোক করি মনে, পক্ককালে দাড়িম্ব বিদরে॥" পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই বাক্য-কলা ও লিপিচাতুরীর জাঁকালো বিকাশ দেখিতে পাইব।

নবম অধ্যায়।

কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ

অথবা

নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ।

১। নবদ্বীপ ও কৃষ্ণচন্দ্র।

নবদ্বীপের অবস্থান্তর।

নবদ্বীপ হইতে লক্ষ্মণসেন স্বাধীনতার পতাকা ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন; নবদ্বীপের অঙ্কারূঢ় হইয়া জয়দেবকবি সুধাময় গানে বঙ্গদেশ পরিপ্লাবিত করিয়াছিলেন; তার পর নবদ্বীপ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতচর্চ্চার স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আধুনিক কালে মহাপ্রভুর পদধূলি দ্বারা ইহা বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হইয়াছে,—নবদ্বীপের ধূলিরেণুতে হৃদয়বান্ বাঙ্গালী অশ্রুপাত করিবেন।

বঙ্গীয় সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। যুগে যুগে স্বর্গের শাসন লইয়া প্রতিভাবান্ ব্যক্তি পতিত সমাজকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা

করেন; কিন্তু দৈববরে দিগ্বিজয়ী রাজা যেরূপ সমস্ত বলপ্রয়োগ দ্বারাও কৈলাস পর্ব্বতকে কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়াই অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই গিরিতুল্য অচল সমাজের নিকট ধর্ম্মবীরের প্রাণান্ত চেষ্টাও সেইরূপ বিফল হইয়া পড়ে। যে নবদ্বীপে বৈষ্ণবগণ এক সময়ে মেঘদর্শনে কৃষ্ণভ্রম করিয়া প্রেমাবেশে পাগল হইতেন, সেই স্থানে ভারতচন্দ্রের শিষ্যগণ স্ফুরিত কদম্ব কি দাড়িম্ব দর্শনে কুভাবনায় কণ্টকিত হইয়া রাত্রি জাগরণ করিতে লাগিলেন। এই সময় নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গদেশের যুগাবতার। বঙ্গদেশ তখন বর্গীর হাঙ্গামে অস্থির ছিল; ইহার কিছু পরে নবদ্বীপে যে সংক্রামক ব্যাধির আবির্ভাব হয়, তাহাতে এক তৃতীয়াংশ লোক নষ্ট হইয়া যায়, "১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ডাকাতের দল বঙ্গদেশে ৫০০০০ গৃহ ও ২০০ লোক অগ্নিতে দগ্ধ করে।" (হাণ্টার, এনালস্ অব রুরাল বেঙ্গল, ৭০ পৃঃ)। এই সময় দ্বিজ ভারতচন্দ্র স্বীয় প্রভু—"সদা জ্যোৎস্নাময় দুই পক্ষ"-সেবী নৃপনন্দনের জন্য কামোদ্দীপক বটিকা প্রস্তুত করিতেছিলেন; জাতীয় চরিত্রের এই হীনতায় ভাবী রাষ্ট্রবিপ্লবের পথ সুগম হইয়াছিল। এই বিপ্লববন্যায় "ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি। কালোয়াত মরিল বীণার লাউ ধরি॥"—দশাটি হইয়াছিল, অযোধ্যার ওয়াজেদ আলি তাহার সাক্ষী।

কিন্তু দোষে গুণে সৃষ্টি; পৌরুষতরুর ভগ্নকাণ্ড বেষ্টন করিয়া "ললিত লবঙ্গলতার" ন্যায় সুকুমার বিদ্যাগুলি লতাইয়া উঠিল। কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় বিশ্রাম খাঁ গায়েনের ওস্তাদি গানের মূর্চ্ছনা, গদাধর তর্কালঙ্কারের পুরাণ পাঠ ও ভারতচন্দ্রের কবিতা দেশময় যে মধুর ভাব বিকিরণ করিতে লাগিল, তাহা এই রাজ-নৈতিক বাদলের মধ্যে মনোরম রৌদ্রের মত মৃদুহাস্য করিতেছিল; নবদ্বীপ হইতে একদা নিঃস্বার্থ ও নির্ম্মল প্রেমের রপ্তানি হইত, এখন নবদ্বীপাধিকার হইতে ভারতচন্দ্রের কবিতা, শান্তিপুরে ধুতি ও কৃষ্ণনগরের পুতুল বস্তায় বস্তায় বিক্রয়ের জন্য দেশে দেশে প্রেরিত হইতে লাগিল। ধূর্ত্ততা ও প্রতারণা—চরিত্র-হীনতার সঙ্গী, নবদ্বীপের

রাজসভায় এই সব শিক্ষার জন্য টোল প্রতিষ্ঠিত হইল। আমরা এখানে যুগাবতার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

কৃষ্ণচন্দ্র।

কৃষ্ণচন্দ্রের রাজনীতি।

১৭১০ খৃঃ অব্দে কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতৃব্য রাম-গোপালেরই রাজা হইবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি পথে তাম্রকূটপ্রিয় পিতৃব্যমহাশয়ের বিলম্ব সংঘটন করিয়া নবাব-দরবারে অগ্রে উপস্থিত হন এবং বাক্‌চাতুরী দ্বারা রাজ্য দখল করেন। আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে এতদূর ভালবাসিতেন যে, তাঁহাকে রাজসভায় না দেখিলে তাঁহার সম্বন্ধে সাগ্রহে অনুসন্ধান করিতেন এবং তাঁহাকে 'ধর্ম্মচন্দ্র' উপাধি দিয়াছিলেন; কিন্তু এই 'ধর্ম্মচন্দ্র'-মহাশয় প্রতারণাপূর্ব্বক আলিবর্দ্দী খাঁকে স্বীয় রাজ্যের অনুর্ব্বর ভূমিগুলি দেখাইয়া ২০ লক্ষ টাকা মাপ পান। যখন মীরকাশেমের হস্তে বন্দী, মৃত্যুর আজ্ঞা তাঁহার মস্তকের উপর, তখন তিনি পুত্র শিবরামকে লইয়া এক বিরাট পূজার ফাঁদ পাতিয়া উদ্ধার হইয়া আসেন। কনিষ্ঠ পুত্র শম্ভুচন্দ্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দকে আয়ত্ত করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিলে কৃষ্ণচন্দ্র হেষ্টিঙ্গ্‌স্-পত্নীকে একছড়া মুক্তার হার উপহার দিয়া পুত্রের উদ্দেশ্য বিফল করেন। ইংরেজ আনিতে যে ষড়যন্ত্র হয়, কৃষ্ণচন্দ্র তাহার গুরু। রাজবল্লভের হাতে "রাখি" বাঁধিয়া তিনি ঢাকার নবাবসরকারে কয়েক লক্ষ টাকা মাপ লইয়া আসেন, অথচ রাজবল্লভের বিধবাবিবাহ প্রচলনের চেষ্টা চক্রান্ত করিয়া বিফল করেন। তাঁহার অনুচরগণের কেহ কেহ উপস্থিত ধূর্ত্ততায় তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন; নবাব যখন অগ্রদ্বীপে লোকজন বিনষ্ট হওয়ার সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রশ্ন করেন,

"অগ্রদ্বীপ কাহার?" তখন অগ্রদ্বীপের মালিকের মোক্তার বিপদ আশঙ্কা করিয়া চুপ হইয়া রহিল, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের মোক্তার উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এ স্থল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের", তৎপর উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা লোকহত্যার একটী কৈফিয়ৎ দিয়া উক্ত স্থান কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যান্তর্গত করিয়া লইলেন। বীরোচিত সৎসাহসের অভাব থাকিলেও কূট রাজনীতিতে কৃষ্ণচন্দ্র অতি প্রাজ্ঞ ছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে মুসলমান শাসন এই কূট রাজনীতি-আশ্রিত হইয়াছিল। মুসলমান দরবারের দুর্নীতিগুলি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অনেকাংশে অনুসরণ করিয়াছিলেন; এক সময় মোগলসম্রাট পুত্রের ব্যাধি নিজে গ্রহণ করিয়া নিজের প্রাণ দিয়া পুত্রকে বাঁচাইয়াছিলেন, এরূপ প্রবাদ আছে; কিন্তু শেষসময়ে মুসলমানসম্রাটগণের রাজপ্রাসাদ অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়াছিল,—পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের ষড়যন্ত্র, পুত্রের হস্তে পিতা বন্দী, ভ্রাতৃহনন প্রভৃতি পাতক মুসলমান ইতিহাস কলুষিত করিয়াছে; হিন্দুর চক্ষে এই সকল পাপ অতি অস্বাভাবিক; কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের যোগ্যপুত্র শম্ভুচন্দ্র পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু রটাইয়া নিজে রাজ্‌গি লইয়াছিলেন; কৃষ্ণচন্দ্র এই ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িত হইয়া গঙ্গাগোবিন্দের নিকট দুই ছত্র কবিতা লিখিয়াছিলেন—পুত্র অবাধ্য, দরবার অসাধ্য। যা করেন গঙ্গাগোবিন্দ॥" বস্তুত পুত্রের বিশেষ দোষ নাই, তাঁহারও পড়া শুনা রাজসভার টোলেই হইয়াছিল।

কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র রাজ্য শাসনে ও সংরক্ষণে যেরূপ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়; সিংহাসনারোহণের সময় তাঁহার ঋণ দশ লক্ষ টাকার উপর ছিল,

তাঁহার রাজ্য-শাসন।

ইহা ছাড়া বার লক্ষ টাকা নজরানার জন্য মহাবদ্‌জঙ্গ তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিলেন, তিনি এই সমস্ত ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার রাজ্য অনেক পরিমাণে বাড়াইয়াছিলেন; তিনি "শিব-নিবাসকে" ইন্দ্রপুরীর মত

সাজাইয়াছিলেন, তাঁহার উৎসাহে স্থপতি-বিদ্যার উন্নতি হইয়াছিল ; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কোন কোন দেবমন্দির এখনও বঙ্গদেশের গৌরব। একটির সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—"এমন সুন্দর সুপ্রশস্ত ও সুদৃঢ় পূজার প্রাসাদ এবং এরূপ উন্নত ও দৃঢ়তর মন্দির বঙ্গদেশের অন্য কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না"—(ক্ষিতীশবংশাবলী, ৬১ পৃঃ)। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের—বিশেষ তাঁহার—যত্নে কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারগণ এরূপ সুন্দর মূর্ত্তি গড়িতে শিখিয়াছিল, তাঁহার উৎসাহে শান্তিপুরের ধুতির যশঃ দেশবিখ্যাত।

বিদ্যানুরাগ।

কৃষ্ণচন্দ্র নিজে সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার সভায় কেবল কবিগণের আদর ছিল এমত নহে ; দর্শন, ন্যায়, স্মৃতি, ধর্ম্ম—এ সমস্ত বিষয়েরই সেখানে চর্চ্চা হইত। তিনি এই সর্ব্বশাস্ত্রচর্চ্চায়ই নিজে যোগ দিতেন, এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিতগণের গুণের আদর করিতে জানিতেন ; তিনি হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি ও রামগোপাল সার্ব্বভৌমের সঙ্গে ন্যায়ের কূটবিচার করিতে পারিতেন ; প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, গোপাল ন্যায়ালঙ্কার ও রামানন্দ বাচস্পতির সঙ্গে ধর্ম্মশাস্ত্রের তত্ত্ব নিরূপণ করিতেন এবং শিবরাম বাচস্পতি, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ ও বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চাননের সঙ্গে ষড়্‌দর্শন সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে সমর্থ ছিলেন ; বাণেশ্বর তাঁহার সভার রাজকবি ছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সঙ্গে সংস্কৃত কবিতা প্রণয়ন করিতেন।

কৌতুকপ্রিয়তা।

এই উচ্চ-শিক্ষিত কূটরাজনীতিপ্রাজ্ঞ, মহিমান্বিত রাজচক্রবর্ত্তী একটি পল্লীগ্রামের ইতরশ্রেণীর ব্যক্তির ন্যায় কৌতুকপ্রিয় ছিলেন ; তাঁহার কৌতুকরাশিতে সুরুচি কি সংযত ভদ্রতা ছিল না, কিন্তু সেগুলি চার্লস দি সেকেণ্ডের পরিহাস হইতে বেশী দূষণীয় বলিয়া গণ্য হইবে না। কৌতুকার্থ রাজসভায় তিনটী লোক নিয়োজিত ছিলেন ; ১ম—গোপালভাঁড়, এই ব্যক্তির নাম এখন দেশবিখ্যাত, গোপাল নরসুন্দরকুলের

মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ২য়—'হাস্যার্ণব'-উপাধিবিশিষ্ট জনৈক সভাসদ, ইঁহার বাড়ী বিল্বপুষ্করিণী, ইনি বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ইঁহার নকল করিবার বিলক্ষণ শক্তি ছিল। ৩য়—মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, ইঁহার বাড়ী বীরনগর, রাজার সঙ্গে ইঁহার সম্বন্ধ ছিল না, সুরসিক দেখিয়া রাজা ইঁহাকে 'বৈবাহিক' বলিয়া ডাকিতেন। এই ব্যক্তিত্রয়ের কৌতুকাভিনয়ে রাজসভায় হাস্য ও বীভৎস রসের শ্রাদ্ধ হইত;—নমুনা এইরূপ,—গোপাল ভাঁড়ের সুন্দর ছেলেটি দেখিয়া একদিন রাজা বলিলেন "এ যে রাজপুত্র দেখিতেছি!" গোপালের উত্তর—"ধন্য তুই ছেলে, তোর কল্যাণে আমি রাজপুত্রের বাপ হইলাম।" মুক্তারামের বাড়ী বীরনগরের কোন দুষ্ট লোক কৌশলে অন্য এক ব্যক্তির স্ত্রী বিক্রয় করাতে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মুখুয্যে, তোমাদের ওখানে কি বউ বিক্রীত হয়?" তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ মহারাজ, গত মাত্রেই।" রাজা একদিন প্রাতে মুক্তারামকে বলিলেন—"মুখুয্যে, গতরাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন তুমি বিষ্ঠার হ্রদে ও আমি পায়েসের হ্রদে পড়িয়াছি।" তিনি উত্তর করিলেন—"ধর্ম্মাবতার আমিও এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি, কেবল বিশেষ এই যে হ্রদ হইতে উত্থান করিয়া আমরা পরস্পরের গাত্র লেহন করিতেছি।" রাজ-সভায় এইরূপ রহস্যের ধূলি-খেলা হইত, রাজা এই তিনটি ভাঁড় প্রতি-পালন করিয়া তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত মুষ্টি মুষ্টি ধূলি খাইতেন ও হাসিতেন।

এই আমোদ প্রমোদ ভিন্ন রাজা শাস্ত্রালোচনা করিতেন, রাজ্য বিস্তারের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেন, শিল্পের উন্নতি জন্য নানা-রূপ উৎসাহ দিতেন ও ভারতচন্দ্রকে দিয়া তোটক ছন্দে কবিতা লিখাইতেন। বিলাসের এই বিবিধ সম্ভারের মধ্যে নির্ম্মল প্রেমের কথা কেহ শুনাইতে গেলে উপহাসাস্পদ হইত; রাজা "কেবল চৈতন্যোপাসক সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ করিতেন।" (ক্ষিতীশবংশাবলী, ২৯ পৃঃ।) কৃষ্ণচন্দ্র শিব ও শক্তির বিশেষ

উপাসক ছিলেন, ভারতচন্দ্র যখন চণ্ডীর দশাবতার বর্ণনা করিয়া লিখিতেন,—"ভারত কহিছে মাগো এই দশ রূপে। দশ দিকে রক্ষা কর কৃষ্ণচন্দ্র ভূপে॥" তখন, আমরা কল্পনা-নেত্রে দেখিতে পাই, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তিপূর্ণ গলদশ্রুনেত্রে প্রিয়কবির প্রতি অনুগ্রহ-হাস্য বিতরণ করিতেছেন।

এই শাস্ত্রচর্চ্চা, সুকুমার বিদ্যায় অনুরাগ, কূটনীতি, কুরুচি ও বিলাসপ্রিয়তা এই যুগের সাহিত্যকে একরূপ মিশ্রিত ছাঁচে গঠিত করিয়াছে, তাহার দোষ গুণ পাঠকের বিচারাধীন করিতেছি।

২। সাহিত্যে নূতন আদর্শ।

বস্তুতঃ বাঙ্গালা কবিতা এখন আর 'কৃষকের গান' নহে; এখন বঙ্গভাষা স্বভাবসুন্দরী লজ্জাবতী পল্লীবধূটির মত শুধু পল্লীকবির আদরের জিনিষ নহে। ইহার প্রতি সংস্কৃত ও ফার্শীর বড় বড় পণ্ডিতগণের নজর পড়িয়াছে, অলঙ্কারের বাহুল্যে স্বভাবরূপ ঢাকা পড়িয়াছে; এখন বঙ্গভাষা রাজসভায় অনুগৃহীতা, পল্লীবাসিনীর সাদা জুঁইফুলের মত প্রাণটি ইহার আর নাই, সঙ্কুচিত সৌন্দর্য্য ও নিষ্কাম প্রেমের আবেগ ইহা পল্লীগ্রামে ফেলিয়া আসিয়াছে, রাজসভাতে ইহার কামকলাপূর্ণ ক্রীড়ায় দর্শকবৃন্দের চিত্তে উত্তপ্ত মদিরার উল্লাস প্রবাহিত হয়, এবং নীলনিচোলের অসংযত বিক্ষেপে নানা আভরণের জ্যোতি ফুটিয়া উঠে।

রাজসভায় বঙ্গভাষা।

কবিগণ এখন বুদ্ধি-সাগর মন্থন করিয়া রূপবর্ণনার উৎপত্তি করেন, যিনি কল্পনার কুহক সৃষ্টি করিতে যত পটু, তিনি তত প্রশংসনীয়; প্রকৃত রূপের আর কে খোঁজ করে! আমরা নৈষধ-চরিত হইতে একটি অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি, পাঠক দেখিবেন বঙ্গভাষা কোন্ আদর্শের অনুসরণ করিতেছিল;—

রূপবর্ণনায় উপমার বিকৃতি।

"হে রাজন্! দময়ন্তীর চুলের কথা কি বলিব? পশু হরিণ যে চামর স্বীয় পুচ্ছরূপে পশ্চাৎভাগে রাখিয়া তিরস্কৃত করে, সেই চামরের সঙ্গে কি দময়ন্তীর চুলের তুলনা দিতে ইচ্ছা হয়?" "দময়ন্তীর চক্ষু হরিণের চক্ষু হইতেও সুন্দর, তাই হরিণ ভূমিতলে ক্ষুরাঘাত করিয়া স্বীয় পরাজয় ও ক্ষোভ ঘোষণা করিতেছে।" "বিধাতা চন্দ্রের শ্রেষ্ঠভাগ গ্রহণ করিয়া দময়ন্তীর মুখ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এই জন্য চন্দ্রমণ্ডলে একটা গর্ত্ত হইয়াছে, লোকে তাহাকে কলঙ্ক বলে।" "দময়ন্তীর মুখ দেখিয়া পদ্মগুলি পরাজয় চিহ্ন-স্বরূপ জলদুর্গে বাস করিতেছে, অদ্যাপি উঠিতে সাহস পাইতেছে না।" "দময়ন্তীর পূর্ব্বে বিধাতা যত রমণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা শিক্ষানবিসের মক্সের মত, তার পর যেগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা তুলনায় দময়ন্তীর রূপের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্য।" বহুপত্র ব্যাপিয়া এই ভাবের বর্ণনা চলিয়াছে। বাঙ্গালী কবি শুধু সংস্কৃতের অনুকরণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, ফার্শী ও উর্দ্দু হইতেও ইচ্ছাক্রমে সংগ্রহ করিয়াছেন; "তাঁহার কাল চুল বুদ্ধিমানদিগের বেড়ি স্বরূপ," "তাঁহার নখর জ্যোতিতে সমস্ত মনুষ্যের মন লগ্ন আছে, তাহা নূতন চন্দ্রের ন্যায়," "তাঁহার নিতম্ব আক্কা-পাহাড়ের ন্যায়", "তাঁহার কটিদেশ চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম, বরং তাহারও অর্দ্ধেক," (জেলেখা)। "সুন্দরী স্নানান্তে মেন্দীরঞ্জিত অঙ্গুলী দ্বারা চুল ঝাড়িতেছে, যেন মেঘ হইতে মুক্তা বর্ষণ হইতেছে" (বদর-চাচ্)। এই শেষের কয়েকছত্র পড়িয়া বিদ্যাপতির—"চিকুরে গলয় জলধারা। মেহ বরিষে যেন মোতিম হারা॥" স্বভাবতঃই মনে পড়িবে। এইরূপ অতি-শয়োক্তি পড়িয়া পাঠকগণ কবির অতিবুদ্ধির অবশ্যই প্রশংসা করিবেন, কিন্তু কোন সুন্দরী রমণী দেখিলেন বলিয়া অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না। উপমার অতিরঞ্জন সৌন্দর্য্যের বর্দ্ধক নহে,—ক্ষতিকারক।

করুণ রসের দুর্গতি।

বঙ্গসাহিত্যে সৌন্দর্য্যের আদর্শের খর্ব্বতার সঙ্গে করুণ প্রভৃতি রসের ধারাও স্তিমিত হইয়া পড়িল। ভারতচন্দ্রের রতি সামান্য গণিকার ন্যায় কৃত্রিম সুরে পতি-বিয়োগে বিলাপ করিতেছে—"আহা আহা হরি হরি, উহু উহু মরি মরি, হায় হায়, গোসাঞি গোসাঞি॥" ইহা করুণ রসের বিদ্রূপ ভিন্ন কি বলিব? সুন্দরকে দেখিবার ব্যগ্রতা বর্ণনা করিয়া কবি বলিতেছেন—"এ নীল কাপড়, হানিছে কামড়, যেন কাল নাগিনী॥" গম্ভীরভাব বিরচনে ভারতচন্দ্র অনভ্যস্ত, অন্নদা-মঙ্গল রূপ ধর্ম্মমণ্ডপে তিনি বাই নাচ দেখাইয়াছেন; যে দেশে এক সময়ে

গোকুল চক্রবর্ত্তী, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের গীত গাইয়া শ্রোতৃকুলকে মোহিত করিতেন—"বঁধু কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক দুঃখ। তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার, গলায় পরিতে সুখ॥ সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভাল মন্দ নাহি জানি। কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য মম, তোমার চরণখানি॥" ইত্যাদি সরস প্রেমের কথার মর্ম্মের আবেগ ব্যক্ত হইত, সেই দেশে রামপ্রসাদের বলে মুহু মুহু মুখে উহু উহু। যেন কোকিল কূজিত কুহু কুহু॥" ও তৎপথাবলম্বিত ভারতচন্দ্রের তোটক পড়িতে তরুণ সম্প্রদায় আগ্রহান্বিত হইলেন; যে দেশে প্রেমের সরস মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলি সাহিত্যের অতুল্য গৌরবের সামগ্রী, সেই দেশে প্রেমের অভাবে কুলবধূকে স্বামী একটী হরবোলা পাখীর ন্যায় প্রেমের পাঠ শিখাইতেছেন,—বিদেশে গমনোন্মুখ সাধু স্ত্রীকে সাবধান করিয়া বলিতেছেন—"বাহিরে পদ রাখা জেন ফণিফণা পরে। দ্বীপান্তর যাওয়া হেন মা'ন অন্য ঘরে॥ পর পুরুষের রব বজ্রতুল্য কাণে। ভাল শয্যা কুসুমকণ্টক করি মনে॥" (জয়নারায়ণের চণ্ডী)।

কুট্‌নী-দাসীর আমদানী।

এস্থলে বক্তব্য এই, বিদ্যাসুন্দরের হীরা, বিদ্যু ব্রাহ্মণী প্রভৃতি কুট্‌নী ও কামিনীকুমারের সোণামুখীর ন্যায় দাসী বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের খাঁটি চরিত্র নহে; দুর্ব্বলাদাসীর ন্যায় চরিত্র এখনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকা সম্ভব, কিন্তু হীরার ন্যায় নাগর ধরিবার ফাঁদ বিদেশের আমদানী; মুসলমানী কেতাবে কুট্‌নীদাসী অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়, জেলেখার দাসী তাঁহাকে বলিতেছে;—"কে তোমাকে ঠকাইয়াছে বল, তোমার ফুলের বর্ণ মুখ হরিদ্রার ন্যায় বিবর্ণ কেন? তুমি চন্দ্রের মত দিন দিন ক্ষয় পাইতেছে কেন? আমি বোধ করি, তুমি কাহারও প্রেমের ফাঁদে পড়িয়াছ, বল সে কে? যদি সে আশমানের চাঁদ হয়, তবে তাহাকে জমিনে ফেলিয়া তোমার নিকট বন্দী করিব। সে যদি পাহাড়বাসী দেবতা হয়, তবে মন্ত্রবলে তাহাকে শিশিতে পুরিয়া তোমার নিকট হাজির করিব। যদি সে মনুষ্য হয়, তবে তুমি যাহার দাসী হইতে ইচ্ছা করিতেছ, সে আমার কুহকে তোমার দাস হইয়া পদানত হইবে॥" (জেলেখা)। লয়ালীমজনুতে পড়িয়াছি—"কুটনী আছিল এক সেই সহরেতে। তেমন কুট্‌নী কেহ না ছিল দেশেতে॥ মন ভুলাইত সেই কথায় কথায়। জমিনেতে চন্দ্রসূর্য্য করিত উদয়॥" (মুসলমানী কেতাব)।

এই যবনীগণের চন্দ্রসূর্য্য ও বাঘের দুধ করায়ত্ত ছিল, ইহারা আকাশে ফাঁদ পাতিয়া নায়িকার কামাভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিত; এই রমণী-গণই হিন্দু সাহিত্যে হীরামালিনী ও সোণামুখী হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, পাঠক তাহাদিগকে—নারদ ঋষির স্ত্রীসংস্করণ কুব্জা কিংবা দুর্ব্বলার সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত করিবেন না।

বিদ্যাসুন্দরে মুসলমানী প্রভাব।

বিদ্যাসুন্দরের সিঁধকাটা বিলাসের অভিনয় ও কুট্‌নীসংযোগে গৃহস্থের বাড়ীর কন্যাকে বশীকরণ—এ সমস্ত সম্ভবতঃ মুসলমানী সাহিত্যের প্রভাবের পরিচায়ক। ফার্শী অনুরাগী ধর্ম্মভীরু কবিগণ চণ্ডী পূজার বিল্বপত্র কাণে গুঁজিয়া মুসলমানী কেচ্ছা শুনাইয়াছেন, তাঁহাদের বক্ষঃস্থলে লম্বমান পৈতা, চন্দনচর্চ্চিতললাট, কর্ণলগ্ন বিল্বপত্র ও মুখে "কালি কালি কালি কালি কালিকে। চণ্ডমুণ্ডি মুণ্ডখণ্ডি, খণ্ডমুণ্ড মালিকে॥" প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ শুনিয়া শ্রোতৃগণ বিদ্যাসুন্দর পূজামণ্ডপে গাওয়াইয়াছেন; কিন্তু বিদ্যা-সুন্দরের উপর মুসলমান সাহিত্যের ছায়া বড় স্পষ্ট, "চণ্ডীর চৌতিশায়"ই উহার চূড়ান্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। লায়লীর মাতা হইতে বীরসিংহের মহিষী বিদ্যাকে গালি দিতে শিখাইয়াছেন, মুসলমানী কেতাব হইতে তুলিয়া দেখাইতেছি—"গোস্মা মনে লাল আঁখি, কহে লায়লীকে ডাকি, কালামুখী হায় কি করিলি। এই কি বাসনা তোর, জাত কুল গেল মোর, দেশমাঝে কলঙ্ক রাখিলি। কি পড়া পড়িতে গেলি, প্রেমে মন মজাইলি, কে শিখাল এমন ব্যাভার॥ লাজভয় গেল তোর, অখ্যাতি হইল ঘোর, কুলে কালি দিলি সবাকার॥" (লয়লামজনু)।

ভারতচন্দ্রের ভাষা ও রুচি।

বিদ্যাসুন্দরের জয়লাভের একমাত্র কারণ ইহার অপূর্ব্ব শব্দমন্ত্র। "তনু মোর হ'ল যন্ত্র, যত শিরা তত তন্ত্র, আলাপে মাতিল মন মাতালে নাচাও না। ওহে পরাণ বঁধু যাই গীত গেও না॥" প্রভৃতি পদ পড়িতেই সংগীতের ন্যায় সুধাবর্ষী, উহাদের ভাব চিত্তে উপলব্ধি হইবার পূর্ব্বে কর্ণ মুগ্ধ হইয়া পড়ে। বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি কাব্য নৈতিক-জীবনের ভগ্ন-পতাকা, বিজাতীয়

আদর্শ ও কুরুচি-কলুষিত ; কাচের মূল্যে বিকাইবার যোগ্য, কিন্তু ইহাদের ছাঁচে ঢালা সুন্দর মার্জ্জিত ভাষার জ্যোতিতে আদর্শের হীনত্ব পাঠকগণের উপলব্ধি হয় নাই, এক যুগ ভরিয়া এই কাব্যগুলি পাকা সোণার মূল্যে বিকাইয়াছে।

এই অশ্লীল মিষ্টভাষী সাহিত্য যখন রাজানুগ্রহে পুষ্ট হইতেছিল, তখন বঙ্গের দূর পল্লীতে সরলভক্তি ও প্রেমাশ্রু-বিধৌত সংগীত পুনশ্চ আরব্ধ হইয়া শ্রোতার প্রাণের কামনা পরিতৃপ্ত করিতেছিল, অনুপ্রাস-প্রিয়তা ও কোমলভাষা ব্যতীত সেই সব সংগীত কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের অন্য কোন ঋণ বহন করে না ; তাহারা সামান্য কবিওলার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া অশিক্ষিত সমাজকেই বেশী আকর্ষণ করিয়াছিল,—কিন্তু বোধ হয় তাহাদের ভাবের নির্ম্মলতা ও আবেগ—রুচিদুষ্ট বৃথা-শিক্ষাকে ধিক্কার দিয়া কালে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবে ; আমরা পরে তাহাদিগের কথা সংক্ষেপে লিখিব।

কবি-গীতির সরল আবেগ।

৩। কাব্যশাখা।

বিদ্যাসুন্দরই এ অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কাব্য ; বররুচি নামক কবি সংস্কৃতে যে কয়েকটি শ্লোক রচনা করেন, তাহা বঙ্গীয় বিদ্যাসুন্দরের ভিত্তি নহে। পল্লীগ্রামের অন্যান্য গল্পের ন্যায় বিদ্যাসুন্দরের গল্পও সম্ভবতঃ বহুদিন পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল কিন্তু উহা কবিগণের ক্রমাগত চেষ্টায় বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, এই আকারে উহা মুসলমানী প্রভাব দ্বারা বিশেষরূপে চিহ্নিত। বহু প্রাচীন ফার্শীতে বিরচিত একখানি বিদ্যাসুন্দর আমরা দেখিয়াছি, উহা ভারত-

বিদ্যাসুন্দর কাব্য।

চন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অনেক পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রীয় বিদ্যা-সুন্দরের উর্দ্দুভাষায় বিরচিত অনুবাদের বিষয় অনেকেই জানেন। মুসলমান ও হিন্দু দীর্ঘকাল একত্র বাস নিবন্ধন পরস্পরের প্রতি অনেকটা সহানুভূতি-পরায়ণ হইয়াছিলেন, ক্ষেমানন্দ রচিত মনসার ভাসানে দৃষ্ট হয়, লখীন্দরের লোহার বাসরে হিন্দুয়ানী রক্ষাকবচ ও অন্যান্য মন্ত্রপূত সামগ্রীর সঙ্গে একখানি কোরাণও রাখা হইয়াছিল, রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ মুসলমান ফকির সাজিয়া ধর্ম্মের ছবক্ শিখাইয়া গিয়াছেন,—তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। মিরজাফরের মৃত্যুকালে তাঁহার পাপমোচনের জন্য কিরীটেশ্বরীর পাদোদক পান করিতে দেওয়া হইয়াছিল, ইহা ইতিহাসের কথা। হিন্দুগণ যেরূপ পীরের সিন্নি দিতেন, মুসলমানগণও সেইরূপ দেবমন্দিরে ভোগ দিতেন। উত্তর পশ্চিমে হিন্দুগণ এখনও মহরম উৎসব করিয়া থাকেন। অর্দ্ধ শতাব্দী হইল, ত্রিপুরায় মৃজাহুসেনআলি নামক জনৈক মুসলমান জমিদার নিজ বাড়ীতে কালীপূজা করিতেন এবং ঢাকার গরিব হুসেন চৌধুরী সাহেব বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া শীতলা দেবীর পূজার অনুষ্ঠান করিতেন, আমরা এরূপ শুনিয়াছি। মুসলমানগণের 'গোপী', 'চাঁদ' প্রভৃতি হিন্দুনাম ও হিন্দুদিগের মুসলমানী নাম অনেক স্থলে এখনও গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু চট্টগ্রামে এই দুই জাতি সামাজিক আচার ব্যবহারে যতদূর সন্নিহিত হইয়াছিলেন, অন্যত্র সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল; চট্টগ্রামের কবি হামিদুল্লার ভেলুয়াসুন্দরী কাব্যে বর্ণিত আছে লক্ষপতি সদাগর পুত্রকামনায় ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীকে আহ্বান করিলে, তাঁহারা কোরাণ দেখিয়া অঙ্কপাত করিতে আরম্ভ করিলেন ও সদাগরের পুত্র বাণিজ্য যাইবার পূর্ব্বে 'বেদপ্রায়' পিতৃ-বাক্য মান্য করিয়া "আল্লার নাম" লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ১৫০ বৎসরের প্রাচীন কবি আপ্তাবদ্দিন তাঁহার "জামিল দিলারাম" কাব্যে নায়িকা দিলারামকে পাতালে প্রেরণ করিয়া সপ্তঋষির নিকট বর

হিন্দু ও মুসলমান।

প্রার্থনা করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন ও তাঁহার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে 'লক্ষ্মণের চন্দ্রকলা', 'রামচন্দ্রের সীতা', 'বিদ্যাধরি চিত্ররেখা' ও বিক্রমাদিত্যের 'ভানুমতীর' সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন; * হিন্দু ও মুসলমানগণ এইভাবে ক্রমে ক্রমে পরস্পরের ভাব আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল, সুতরাং বিদ্যাসুন্দর-কাব্যে যে অলক্ষিতভাবে মুসলমানী নক্সার প্রতিচ্ছায়া পড়িবে, তাহাতে বিচিত্র কি? এই সময় নায়ক নায়িকার বিলাসকলাপূর্ণ প্রেমের গল্প উর্দ্দু ও ফার্শী বহুবিধ পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছিল; এই সব পুস্তকে প্রায়ই দেখা যায়, নায়কগণ নায়িকাদের পটে লিখিত মূর্ত্তি দেখিয়াই পাগল হইয়া অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন, তাজি ঘোড়া সমারূঢ় সুন্দরকে নায়িকার খোঁজে যাইতে দেখিয়া আমাদের সেই সব নায়কের কথাই মনে পড়িয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে বিবাহের পূর্ব্বে বরের এইরূপ প্রেমাবেশ আর ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হয় নাই।

মুসলমানী গ্রন্থে নায়কের পূর্ব্বরাগ।

পদ্মাবতী।

প্রায় ২৫০ বৎসর হইল কবি আলওয়াল পদ্মাবতী নামক একখানি কাব্য প্রণয়ন করেন। এই কাব্য কৃষ্ণচন্দ্র রাজার বহুপূর্ব্বে রচিত হইলেও ইহাতে এই যুগের মুখ্য চিহ্নগুলি বিদ্যমান, সুতরাং কবিকে কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের পথ-প্রদর্শক বলা যাইতে পারে, আমরা এজন্য পদ্মাবতী প্রসঙ্গ দ্বারা কাব্য-শাখার মুখবন্ধ করিতেছি। পাঠক দেখিবেন, কবি আলওয়াল সংস্কৃতে

আলওয়ালের পাণ্ডিত্য।

---

* এই কাব্যের হস্তলিখিত পুঁথি আমার নিকট আছে; ইহাতে উর্দ্দু শব্দ খুব অল্প, বাঙ্গালাটি ঠিক হিন্দুকবির ভাষার ন্যায়।

কিরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন ও হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার কতদূর অভিজ্ঞতা ছিল। এই পুস্তক পড়িলে স্বতঃই মনে উদয় হইবে, মুসলমানের এতটা হিন্দুভাবাপন্ন হওয়া নিতান্তই আশ্চর্য্যের বিষয়। যাঁহারা ১১ জন মুসলমান বৈষ্ণবকবির কবিতা পড়িয়া চমৎকৃত, তাঁহারা কবি আলওয়ালের এই সুস্বাদু কাব্যখানা পাঠ করুন।

হিন্দী পদ্মাবৎ।

৯২৭ * সালে মীর মহম্মদ নামক জনৈক কবি হিন্দী-ভাষায় 'পদ্মাবৎ' রচনা করেন †—ইহা পদ্মিনী-উপাখ্যান; দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিন চিতোর-রাজ্ঞীর রূপ-তৃষ্ণায় যে সমরানল বা কামানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, এই কাব্য তাহারই ইতিহাস। দুই এক স্থলে প্রচলিত ঐতিহাসিক মতের বিপর্য্যয়

* "সন নবসৈ সত্তাইস অহৈ। কথা আরম্ভ বেন কবি কহৈ॥" মীর মহম্মদের পদ্মাবৎ।

"সেখ মহম্মদ যতি, যখন রচিল পুঁথি
সংখ্যা সপ্তবিংশ নবশত।"—আলওয়ালের পদ্মাবতী।

† এই পুস্তক সম্বন্ধে আমার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া 'ভারত-জীবন' পত্রিকার সম্পাদক কাশীনিবাসী শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র বর্ম্মা আমাকে লিখিয়া পাঠান—"মহাশয়, সাহিত্য নামক মাসিক পত্রে (১৩০১ বাং) মাঘ মাসের সংখ্যায় "মুসলমান কবির বাঙ্গালা কাব্য" শীর্ষক প্রবন্ধের ৬৯১ পত্রে ২১ পংক্তিতে আপনি লিখিয়াছেন যে, মীর মহম্মদের রচিত হিন্দী পদ্মাবতী পাওয়া যায় নাই। মহাশয়, ধন্যবাদ পূর্ব্বক জানাইতেছি যে, হিন্দী মীর-মালিক মহম্মদ রচিত পদ্মাবতীকাব্য কাশী ও লক্ষ্ণৌতে ছাপা হইয়াছে ও বাজারে পাওয়া যায়।" আমরা এবার মীরমালিক মহম্মদ-রচিত 'পদ্মাবৎ' গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে এই পুস্তকখানি উপহার দিয়া বাধিত করিয়াছেন—ইহা একখানি প্রসিদ্ধ হিন্দী কাব্য। ৯২৭ সনে এই পুস্তক বিরচিত হয়, এরূপ উক্ত হইয়াছে,—কিন্তু কবি সেরসাহের উল্লেখ করিয়াছেন, ৯৪৭ সনে সেরসাহ সম্রাট্ হন; সুতরাং শ্রীযুক্ত গ্রীয়ার্সন্ সাহেব অনুমান করেন—৯২৭ সন না হইয়া ৯৪৭ সন মুদ্রাকরের ভ্রমবশতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু আমরা প্রাচীন আলওয়াল-কৃত অনুবাদখানিতেও যখন মুদ্রিত হিন্দীকাব্যের অনুযায়ী ৯২৭ সনই উল্লিখিত দেখিতে পাই, তখন উহা মুদ্রাকরের প্রমাদ বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারি না। মালিক মহম্মদ একজন সাধু ফকির

আছে—চিতোরাধিপ ভীমসেন কবিকর্তৃক রত্নসেন নামে অভিহিত হইয়াছেন, পুঁথির শেষে আলাউদ্দিনের পরাজয় লিখিত হইয়াছে; যাহা হউক কবির স্বাধীন কল্পনাকে ইতিহাসের সীমাবদ্ধ তুলাদণ্ড দ্বারা মাপ করা উচিত হইবে না। মীরমহাম্মদ-কৃত কাব্যের অনুবাদ করিয়াছেন—কবি আলওয়াল; সে আমলের অনুবাদ অর্থে অনেক স্থলেই নূতন সৃষ্টি।

আলওয়ালের পরিচয়।

আলওয়াল কবি ফতেয়াবাদ পরগণায় (ফরিদপুর) জালালপুর নামক স্থানের অধিপতি সমসেরকুতুবের একজন সচিবের পুত্র ছিলেন। যৌবনারম্ভে ইনি পিতার সহিত জলপথে গমন করিতেছিলেন, পথে হার্ম্মাদগণ (পর্ত্তুগিজ জলদস্যু) তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে; কবির পিতা যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। এই সময় হার্ম্মাদগণের অত্যাচারে সমুদ্রের প্রান্তভাগে সর্ব্বদা বিপদাশঙ্কা

ছিলেন; আমেথির রাজা তাঁহার একজন নিতান্ত অনুরক্ত শিষ্য ছিলেন। সাধু কবির মৃত্যুর পর আমেথির রাজ-দুর্গের সমীপে তাঁহার সমাধি দেওয়া হয়, এখনও সেস্থলে তাঁহার সমাধিমন্দির দৃষ্ট হয়। গ্রীয়ার্‌সন্ সাহেব চৈতন্য লাইব্রেরীর এক অধিবেশনে হিন্দীসাহিত্য সম্বন্ধে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে 'পদ্মাবৎ' গ্রন্থের বিশেষ প্রশংসা করেন। তাঁহার হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে মালিক মহম্মদের কাব্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, "চিরাগত ধর্ম্ম ও সাহিত্যিক প্রথা হইতে অব্যাহতি লাভ করিলে হিন্দু-হৃদয় কি পরিমাণে কার্য্য করিতে পারে,—মালিক মহম্মদের গ্রন্থে তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়;—এই দৃষ্টান্ত অতীব উজ্জ্বল এবং হিন্দী সাহিত্যে একান্ত বিরল।"—("Malik Mohamad's work stands out as a conspicuous and almost solitary example of what the Hindu mind can do when freed from the trammels of literary and religious custom." P. 18) কবির সাধু-জীবনের পরিচয় তাঁহার গ্রন্থের অনেক স্থলেই দৃষ্ট হইবে। প্রারম্ভে প্রদত্ত ঈশ্বরবন্দনাটি অতি উদার দার্শনিক চিন্তায় পূর্ণ; গ্রন্থশেষে কবি তাঁহার বর্ণিত উপাখ্যানটি একটি ধর্ম্মের রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—চিতোর অর্থে তিনি মানব-শরীর বুঝাইয়াছেন, রত্নসেন অর্থ জীবাত্মা; শুকপাখী—ধর্ম্মগুরু,—পদ্মিনী অর্থে বিবেক, ইত্যাদি।

ছিল, কবিকঙ্কণচণ্ডীতেও আমরা ইহা দেখিয়াছি। কবি পিতৃবিয়োগের পর রোসাঙ্গের (আরাকানের) রাজার প্রধান অমাত্য মাগণঠাকুরের শরণাপন্ন হন। মাগণঠাকুর মুসলমান ছিলেন, এস্থলে আবার আমরা মুসলমানের হিন্দুনাম পাইয়াছি। সংগীত ও অপ্পরাপর সুকুমার শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল; আলওয়ালের উৎকৃষ্ট কবিত্ব-শক্তি দেখিয়া তিনি তাঁহাকে মীরমহাম্মদ-কৃত পদ্মাবৎকেচ্ছার বঙ্গানুবাদ করিতে আদেশ করেন, তদনুসারে পদ্মাবতী রচিত হয়। পদ্মাবতী লেখার পর তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু মাগণঠাকুর তাঁহাকে আবার বৃদ্ধবয়সে "ছয়ফুল মুল্লুক ও বদিউজ্জমাল" নামক ফার্শী-কাব্য অনুবাদ করিতে নিযুক্ত করেন। এই পুস্তক কতদূর রচনার পর মাগণঠাকুরের মৃত্যু হয়,—গভীর দুঃখে কবি লেখনী ত্যাগ করেন। সহসা আরাকানে এক ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। সুজাবাদসা তথায় আসিয়া আরাকানপতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন, আরাকানরাজ সুজার অনুচরগুলি বিনষ্ট করেন, মুসলমানগণের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হইল, মৃজা-নামক এক দুষ্ট লোকের মিথ্যা সাক্ষ্যে কবি আলওয়াল কারাগারে আবদ্ধ হইলেন; কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া কবি নয় বৎসর অতি দীন ভাবে অতিবাহিত করেন, এই দীর্ঘকাল পরে কবির উপর গ্রহগণ পুনরায় সুপ্রসন্ন হন; সৈয়দমুছা নামক এক সদাশয় ব্যক্তি তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া তাঁহাকে "ছয়ফুলমুল্লুক ও বদিউজ্জমাল" পুঁথির অবশিষ্টাংশ রচনা করিতে আদেশ করেন; তখন কবি ভগ্নবীণায় পুনরায় তার যোজনা করিলেন; কিন্তু তখন তিনি অতি বৃদ্ধ,—'বয়ঃ গতে বনিতাবিলাসে'র গীতি কণ্ঠে উঠিতে চাহে না,—আলওয়াল এই দায়িত্ব গ্রহণে প্রথমত অসম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু সৈয়দমুছা তাঁহার দেশ-বিখ্যাত বংশের কথা বলিয়া পীড়াপীড়ি করিলেন।

তদীয় গ্রন্থাবলী।

১৬৫৮ খৃঃ অব্দে সুজার মৃত্যু হয়, তাহার অন্যূন ২০ বৎসর পূর্ব্বে কবির

৪০ বৎসর বয়সে পদ্মাবতীরচনার কাল ধরিলে, তিনি ১৬১৮ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করা অন্যায় হইবে না। কবি আলওয়াল কবিকঙ্কণ ও কাশীদাসের পরবর্ত্তী কবি। পূর্ব্বোক্ত দুই খানি গ্রন্থ ছাড়া আলওয়াল, দৌলত কাজির 'লোর চন্দ্রানী' ও 'সতী ময়না'র উত্তরাংশ রচনা করেন,—রোসাঙ্গের রাজার অমাত্য সালেমানের আদেশে এই কাব্য রচিত হয়। তৎপর তিনি সৈয়দ মহম্মদখানের আদেশে পার্শী কবি নেজামিগজনবীর "হস্তপয়করের" একখানি বাঙ্গালা অনুবাদ প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কয়েকটি পদও পাওয়া গিয়াছে; একটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"ননদিনী রসবিনোদিনী ও তোর কুবোল সহিতাম নারি॥ ধ্রু।
ঘরের ঘরণী, জগত মোহিনী, প্রত্যূষে যমুনায় গেলি।
বেলা অবশেষ, নিশি পরবেশ, কিসে বিলম্ব করিলি॥
প্রত্যূষ বেহানে, কমল দেখিয়া, পুষ্প তুলিবারে গেলুম।
বেলা উদনে, কমল মুদনে, ভ্রমর দংশনে মৈলুম॥
কমল কণ্টকে, বিষম সঙ্কটে, করের কঙ্কণ গেল।
কঙ্কণ হেরিতে, ডুব দিতে দিতে, দিন অবশেষ ভেল॥
সিঁথের সিন্দূর, নয়নের কাজল, সব ভাসি গেল জলে।
হের দেখ মোর, অঙ্গ জরজর, দারুণি পদ্মের নালে॥
কুলের কামিনী, ফুলের নিছনি, কূলে নাই সীমা।
আরতি মাগনে, আলওয়াল ভণে, জগৎমোহিনী বামা॥"

পদ্মাবতী।

পদ্মাবতীকাব্যে আলওয়ালের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। কবি পিঙ্গলাচার্য্যের মগণ, রগণ প্রভৃতি অষ্টমহাগণের তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন; খণ্ডিতা, বাসকসজ্জা ও কলহান্তরিতা প্রভৃতি অষ্টনায়িকার ভেদ ও বিরহের দশ অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র লইয়া উচ্চাঙ্গের কবিরাজী কথা শুনাইয়াছেন, জ্যোতিষপ্রসঙ্গে লগ্নাচার্য্যের

ন্যায় যাত্রার শুভাশুভের এবং যোগিনীচক্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; একজন প্রবীণা এয়োর মত হিন্দুর বিবাহাদি ব্যাপারের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও পুরোহিত ঠাকুরের মত প্রশস্তবন্দনার উপকরণের একটি শুদ্ধ তালিকা দিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত টোলের পণ্ডিতের মত অধ্যায়ের শিরোভাগে সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া দিয়াছেন। আলওয়াল, "ছয়ফুলমুল্লুক ও বদিউজ্জমাল" কাব্যে লিখিয়াছিলেন—আজ্ঞা পাইয়া রচিলাম পুস্তক পদ্মাবতী। যতেক আছিল মোর বুদ্ধির শকতি॥" এই উক্তি অতি সত্য;—তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধিতে যতদূর কুলাইয়াছিল, তিনি পদ্মাবতীকাব্যে তাহার কিছু বাদ দেন নাই। তিনি বয়ঃসন্ধি বর্ণনায় একজন রসজ্ঞ বৈষ্ণব কবি, যথা—"আড় আঁখি, বক্র দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে হয়। ক্ষণে ক্ষণে লাজে তনু আসি সঞ্চরয়॥ চোর রূপে অনঙ্গ অঙ্গেতে উপজয়। বিরহ বেদনা ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়॥ অনঙ্গ সঞ্চার অঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গ সঙ্গে। আমোদিত পদ্মগন্ধ পদ্মিনীর অঙ্গে॥ * * * অভেদ আছয়ে দুই কমলের কলি। না জানি পরশে কোন্ ভাগ্যবন্ত অলি॥" অন্যত্র—"কুটিল কবরী কুসুমমাঝে। তারকামণ্ডলে জলদ সাজে॥ শশিকলা প্রায় সিন্দূর ভালে। বেড়ি বিধুমুখ অলকজালে॥ সুন্দরী কামিনী কামবিমোহে। খঞ্জনগঞ্জন নয়নে চাহে॥ মদন ধনুক ভুরু বিভঙ্গে। অপাঙ্গ ইঙ্গিত বাণতরঙ্গে॥ নাসা খগপতি নহে সমতুল। সুরঙ্গ অধর বাঁধুলীফুল॥ দশন মুকুতা বিজলী হাসি। অমিয় বরিষে আঁধার নাশি॥ উরজ কঠিন হেমকটোর। হেরি মুনি মন বিভোর॥ হরিকরিকুম্ভ কটিনিতম্ব। রাজহংস জিনি গতি বিলম্ব॥ কবি আলওয়াল মধু গায়। মাগন আরতি রহুক সদায়॥" স্থলে স্থলে কথার বাঁধুনি জয়দেবের মত,—"বসন্তে নাগরবর নাগরী বিলাসে। বরবালা দুই ইন্দু, স্রবে যেন সুধা বিন্দু, মৃদুমন্দ অধরে ললিত মধু হাসে॥ প্রফুল্লিত কুসুম, মধুব্রতঝঙ্কৃত, হুঙ্কৃত পরভৃত কুঞ্জে রতরাসে॥ মলয়সমীর, সুসৌরভ সুশীতল বিলোলিত পতি অতি রসভাষে॥ প্রফুল্লিত বনস্পতি, কুটিল তমালদ্রুম, মুকুলিত চূতলতা কোরক-জালে। যুবজন-হৃদয়, আনন্দে পরিপূরিত, রঙ্গমল্লিকামালতিমালে॥" অন্যত্র বিদ্যাপতিকে মনে পড়িবে,—"চলিল কামিনী, গজেন্দ্র গামিনী, খঞ্জনগমন শোভিতা।" ঋতু বর্ণনার পদগুলি মসৃণ ও ললিত, তাহা আমাদের বৈষ্ণব কবিকুলগুরুদিগের

রচনার সঙ্গে গাঁথিয়া রাথার উপযুক্ত—"নিদাঘ সময় অতি প্রচণ্ড তপন। রৌদ্র-ত্রাসে রহে ছায়া চরণে শরণ। চন্দন চম্পক মাল্য মলয়া পবন॥ সতত দম্পতি পাশে ব্যাপৃত মদন।" বর্ষাকালে—"ঘোর শব্দ করিয়া মল্লার রাগ গায়। দর্দ্দুরী শিখিনীরব অতি মনে ভায়॥ স্বামিসঙ্গে নানা রঙ্গে নিশি বসি জাগে। চমকিলে বিদ্যুত চমকি কণ্ঠে লাগে॥ বজ্রপাতে কমলিনী ত্রাসিত হইয়া। ধরয় পতির গীমে অধিক চাপিয়া॥ কীটকুলকলরব কঙ্কণঝঙ্কার। শুনিয়া যুবক চিত্তে চমকিত মার॥" শরৎকালে—"আসিল শরৎ ঋতু নির্ম্মল আকাশে। দোলয়ে চামর কেশ কুসুমবিকাশে॥ নবীন খঞ্জন দেখি বড়হি কৌতুক। উপজিত দামিনী দম্পতি মনে সুখ॥ কুসুমিত শ্বেত শয্যা অতি মনোহর। চন্দনে লেপিয়া কুঙ্কুম কলেবর॥ নানা আভরণ পটাম্বর পরিধান। যুবকের মরমে জাগয় পঞ্চবাণ॥" শিশিরকালে—"সহজে দম্পতি মজে শীতের সোহাগে। হেমকান্তি দুই অঙ্গ এক হৈয়া লাগে॥" হেমন্তে—"শীতলিত বাসে রবি ত্বরিতে লুকায়। অতি দীর্ঘ সুখ নিশি পলকে পোহায়॥ পুষ্প শয্যা মৃদু খেলা বিচিত্র বসন। বক্ষে বক্ষে এক হৈলে শীত নিবারণ॥" আলওয়াল কবির বারমাস্যা বর্ণনাটিও এ সুন্দর এবং নিপুণ তুলির উপযুক্ত। ভাদ্রে—"ভাদ্রেতে যামিনী ঘোর তমঃ অতিশয়। নানা অস্ত্র অনিবার মদন ক্ষেপয়॥"—"আশ্বিনে প্রকাশ নিশি নির্ম্মল গগন। গৃহ অন্ধকার নাহি চাঁদের কিরণ॥ সকলের মতে চন্দ্র, রাহু মোর মতে। মুদিত কমল আঁখি চন্দ্রিকা উদিতে॥ কার্ত্তিকে—"পরব দেওালি ঘরে ঘরে সুখভোগ। নিজপতি বিনে মোর ভোগ ভেল রোগ॥" ফাল্গুনে—"মোর অঙ্গ পরশি পবন যথা যায়। তরুকুল পত্র ঝরি পড়য় তথায়॥" বৈশাখে—"বিদরে মহী অরুণ প্রবলে। ভ্রষ্ট ভেল বায়ু জল বিরহে অনলে॥ মিত্র হৈয়া কমল না সহে দিনমণি। পতি বনে কেমতে সহিবে কমলিনী॥" জ্যৈষ্ঠে—"পুষ্প রেণু চন্দন ছিটায় সখিগণ। ভস্মবৎ হয় মোর অঙ্গ পরশন॥" মহাদেব বর্ণনায় আলওয়াল কবি শৈবের প্রশংসা পাইবেন,—"শিরে গঙ্গাধারা ঘটা গলে অস্থিমালা। অঙ্গে ভস্ম পৃষ্ঠেতে পরণ ব্যাঘ্র ছালা॥ কণ্ঠে কালকূট ভালে চন্দ্রমা সুচারু। কক্ষে শিঙ্গা ভূতনাথ করেত ডুমুরু॥ শঙ্খের কুণ্ডলী কর্ণে হস্তেতে ত্রিশূল। ওড়ের কলিকা জিনি নয়ন রাতুল॥"* এতদ্ব্যতীত

---

* মূলে এইরূপ রহিয়াছে,—

"ততখন পঁহুছে আয় মহেশু। বাহন কৈল কুষ্টিকর ভেশু। কাংথর কয়া হড়াবর

নানা বিচিত্র বিদ্যাসুন্দরী ধূয়াগুলির মত গীতভাঙ্গা পদ পুস্তকের সর্ব্বদা পাওয়া যাইবে। মধ্যে মধ্যে দর্শনাত্মক উচ্চভাবের বিকাশ আছে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয় কবি পাণ্ডিত্য ছাড়িয়া দিলে অন্তর্দৃষ্টির রাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ ছিলেন, যথা—"কাব্য কথা সকল সুগন্ধি ভরপূর। দূরেতে নিকট হয় নিকটেতে দূর॥ নিকটেতে দূর যেন পুষ্পেতে কলিকা। দূরেতে নিকট মধুমাঝে পিপীলিকা॥ বনখণ্ডে থাকে অলি কমলেতে বশ। নিকটে থাকিয়া ভেক না জানয়ে রস॥" * এবং ছয়ফলমুল্লুক ও বদউজ্জমালে—"উজ্জ্বল মহিমা নাহি অন্ধকার বিনে। অধর্ম্ম না হৈলে বল উত্তম কে চিনে॥ লবণ কারণে চিনে মিষ্ট জল সীমা। কৃপণ না হৈতো কোথা দাতার মহিমা॥ সত্য যে অসত্য দুই মতে হৈলো যত। ভাল মন্দ যে বলে না করি কর্ণগত॥ যেই পুঁজি আছে মাত্র হৃদয় ভাণ্ডার। লাজ ছাড়ি আলওয়াল ব্যক্ত কর তার॥"

মুসলমানী-ভাব।

পদ্মাবতী-কাব্যে মুসলমানী-ভাব না আছে, এমন নহে। এই কাব্যে কল্পনার কতকটা অস্বাভাবিক আড়ম্বর আছে, সেই সকল অংশ পড়িতে পড়িতে আরব্য ও পারস্যদেশের গল্পগুলির কথা মনে হয়। রত্নসেন শুকমুখে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন, প্রায়ই মূর্চ্ছিত হইয়া থাকিতেন, শেষে রাজ্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে—"ষোলশত রাজার কুমার হৈল যোগী।"—রাজকুমারীর দুঃখ সংবাদ জানাইতে যে

বাংধে॥ মুণ্ডহ্বার ও জনেউ কাংধে॥ শেষনাগ সোহৈ কণ্ঠমালা। তনবিভূতি হস্তী কর-চ্ছালা॥ পহুঁচী রুদ্র কমলকী কটা। শশী মাথে শিরপর জটা॥ চঁবর ঘংট ও ডমরু হাথা। গৌরী পার্বতী ধনী সাথা॥". সুতরাং আলওয়ালের অনুবাদটি আক্ষরিক নহে।

* মূলে এইরূপ আছে—

"কবি ব্যাস বস কঁবলা পুরী। দুরহিং নেরে নেরে দুরী॥ নেরে দুর ফুল জস কাংটা। দুর জে নেসে জস গুড় চাংটা॥" এখানে "নিকটেতে দূর যথা পুষ্পেতে কলিকা" অনুবাদটি ঠিক হয় নাই, মূলে পুষ্প এবং কণ্টকের সম্বন্ধ নিকট হইলেও ইহাদের দূরবর্ত্তিতা প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু পুষ্প এবং কলিকার উপমায় সে ভাবটি স্পষ্টরূপে বুঝা যায় না; তবে কষ্ট করিয়া একটা অর্থ করা যায়, কলি একবার ফুটিয়া ফুল হইলে আর তাহার কলিকার অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উপায় নাই, সুতরাং ফুল এবং কলিকার সম্বন্ধ নিকট হইলেও দূর। 'কলিকা' স্থলে 'কণ্টিকা' পাঠ ধরিলেই গোল চুকিয়া যায়।

পক্ষী দূত হইয়া চলিল, তাহার বর্ণনায় রাজকুমারীর বিরহব্যাথার পরিমাণ দত্ত হইয়াছে;—"দুঃখের সংবাদ লয়ে বিহঙ্গ উড়িল। সেই দুঃখে জলদ শ্যামল বর্ণ হৈল॥ স্ফুলিঙ্গ পড়িল উড়ি চাঁদের উপর। অন্তরে শ্যামল তহি ভেল শশধর॥ উড়িতে নারিল পাখা শূন্যের উপর। উল্কাপাত হয় যেন বলে তারে নর॥ সমুদ্র উপর দিয়া করিল গমন। জলনিধি হৈল তহি পূর্ণিত লবণ॥" যখন মুসলমান কবিকে পাঠক কিঞ্চিৎ কালের জন্য হিন্দুকবি বলিয়া ভ্রম করিবেন, তখনই সহসা কল্পনার আকস্মিক অদ্ভুত আড়ম্বরে শৈশব-শ্রুত পরীবানু কি দানহাসের বৃত্তান্ত স্মরণ হইবে, এবং পদ্মাবতীকাব্য মুসলমানীকেচ্ছার আকার ধারণ করিবে।

পদ্মাবতী-কাব্য-সমালোচনা।

পদ্মাবতী মৌলিক কাব্য নহে, ইহা একখানি অনুবাদপুস্তক। কিন্তু আলওয়ালের সুগভীর সংস্কৃতশাস্ত্রের জ্ঞান এবং হিন্দুসমাজের সঙ্গে সহানুভূতি তাঁহার অনুবাদ-গ্রন্থখানির উপর একটি মৌলিক সৌন্দর্য্যের প্রভা নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। মূলকাব্য সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীর রচনা, তাঁহার মানবীয় আখ্যানের ভিতর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সমাবেশ প্রচুর রহিয়াছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে লিখিতে আরম্ভ করিলে মালিক মহাম্মদ যেন নিজ স্বাভাবিক রাজ্যে প্রবেশ করেন। সেই সকল স্থলে, পরমেশ্বরের অপার করুণা স্মরণে আর্দ্রচিত্ত হইয়া তিনি স্বীয় রচনায় সুধামাখা তত্ত্বামৃত ঢালিয়া দিয়াছেন,—আলওয়ালকবি সেই সকল অংশে মালিক মহাম্মদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিঃশব্দে অনুবর্ত্তী হইয়াছেন,—সাধুর সাধুত্ব সম্বন্ধীয় কথাগুলির তিনি আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন,—নিম্নে দুই গ্রন্থ হইতে যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহা তুলনা করিয়া দেখুন।

(১) "প্রকট গুপ্ত সো সর্ব্ব্যাপী।
ধর্ম্মী চিহ্ন ন চিহ্নৈ পাপী॥"

মালিক মহাম্মদ।

(১) "অপ্রকট গুপ্ত আছে সবাকারে ব্যাপি।
ধার্ম্মিক চিনয়ে তারে না চিনয়ে পাপী॥"

আলওয়াল।

(২) "ধনপতি বহী জেহক সংসারু।
সব দেহ ছুনিত ঘটন ভংডারু॥"

মালিক মহাম্মদ॥

(২) "সেই ধনপতি সব যাহার সংসার।
সকলেরে দেয় দান না টুটে ভাণ্ডার॥"

আলওয়াল॥

(৩) "সুমিরো আদি এক করতারু।
জেং জীব দীহ্ন কীহ্ন সংসারু॥"

মালিক মহাম্মদ॥

(৩) "প্রথমে প্রণাম করি এক করতার।
যেই প্রভু জীবদানে স্থাপিল সংসার॥"

আলওয়াল।

এই সকল ঈশ্বরের স্তব-সূচক অংশ অনুবাদ করিতে যাইয়া আল-ওয়াল তাঁহার আদর্শের ভাব যথাসম্ভব সততার সহিত রক্ষা করিয়াছেন। উদার ঈশ্বর-স্তোত্রগুলি অনেক স্থানে মূলের মতই সুন্দর হইয়াছে, মূলের মতই তাহাতে সকরুণ ভক্তিভাব এবং অসীম শক্তির প্রতি সবিস্ময় বন্দনা-গীতি সরল উদ্দীপনায় প্রকাশিত হইয়াছে—আমরা নিম্নে আলওয়ালের সরল অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,—"আপনার প্রচার হেতু সৃজিল জীবন। নিজ ভয় দর্শাইতে সৃজিল মরণ॥ সুগন্ধি সৃজিল প্রভু স্বর্গ বুঝাইতে॥ সৃজিলেক দুর্গন্ধ নরক জানাইতে॥ মিষ্ট রস সৃজিলেক কৃপা অনুরোধ। তিক্ত কটু কষা সৃজি জানাইলা ক্রোধ॥ পুষ্পে জন্মাইল মধু গুপ্ত আকার। সৃজিয়া মক্ষিকা কৈল তাহার প্রচার॥" কোন কোন স্থানে কবি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য চিন্তায় স্তব্ধ ও ভাবগম্ভীর, কুত্রাপি তাঁহার অসীম করুণা স্মরণে কৃতকৃতার্থ—"হেন দাতা আছে কোন শুন জগজন। সবারে খাওয়ায় পুন না খায় আপন॥" সাধারণ প্রণয়-প্রণয়ীর উপাখ্যান

এরূপ ধর্ম্ম-তত্ত্ব-বহুল করা হইলে উহা প্রথম শ্রেণীর কাব্যে পরিণত করা কঠিন হয়, লেখক কোন ক্ষুদ্র কথা বা আখ্যানবর্ণিত ক্ষুদ্র প্রসঙ্গ লইয়া ধর্ম্মকথা শুনাইতে ব্যস্ত হন, সুতরাং উপাখ্যানটি কবির নিকট হইতে যথেষ্ট মনোযোগ প্রাপ্ত হইয়া বিকাশ পাইয়া উঠে না। আলওয়ালকবি 'পদ্মাবৎ' পুস্তকের ধর্ম্ম-তত্ত্বের অনুবাদ করিতে যাইয়া নিজের কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে চেষ্টা পান নাই, কিন্তু প্রণয়ি-প্রণয়িনীর ব্যাপারে তাঁহার নিজের অলঙ্কারের শাস্ত্রের জ্ঞান ফলাইতে ত্রুটি করেন নাই। সাধারণ আখ্যানের অনেক স্থলে আলওয়াল মূলের ছায়া মাত্র অবলম্বন করিয়া নিজের অনেক কাব্যকথা পূরিয়া দিয়াছেন। কিন্তু গল্পটি ঠিক একটি সুন্দর কুসুমহারের ন্যায় গ্রন্থন-কৌশলে সুসম্বদ্ধ হইতে পারে নাই। মালী যেন এক রাশ সুন্দর কুসুম লইয়া বসিয়াছিল, কিন্তু মালা গাঁথিয়া উঠিতে পারে নাই। আলওয়ালের কাব্যে নানারূপ ললিত ভাব ও কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা—গল্পসূত্রে অর্দ্ধ-সংযুক্ত ও অর্দ্ধ-বিযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়—মধ্যে মধ্যে সুন্দর সুন্দর কথায় চিত্ত তৃপ্ত হয়, কিন্তু কাব্যখানি অনুসরণ করিতে তাদৃশ কৌতূহলের উদ্রেক হয় না। ইহা ছাড়া প্রথম শ্রেণীর কাব্যে বড় কোন এক আদর্শ পরিষ্কার রেখায় অঙ্কিত থাকে, সেই আদর্শের চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্রতর সৌন্দর্য্যরাশি পল্লবিত হয়। পদ্মাবতীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্যের অভাব নাই, কিন্তু বড় আদর্শের অভাব; অথচ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে যেরূপ সর্ব্বত্র সুললিত ভাষা, উজ্জ্বল হাস্য রসের দীপ্তি ও কৌতুকাবহ প্রতিভার খেলা, পদ্মাবতীর সর্ব্বত্র তাহা নাই, ক্বচিৎ ক্বচিৎ সেরূপ আছে এবং ক্বচিৎ ক্বচিৎ আলওয়াল ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ। আলওয়াল-রচিত "ছয়ফল-মুল্লুক ও বদিউজ্জমাল" পদ্মাবতী হইতে নিকৃষ্ট; কিন্তু ইহার সকলগুলি কাব্যেরই ভাষা সংস্কৃত-প্রধান বাঙ্গালা, তাহাতে মুসলমানী ভাষার মিশ্রণ অল্প; আলওয়াল কবি বঙ্গীয় সাহিত্যে হিন্দুকবিগণের সমাজে আদরের

সহিত গৃহীত হইবেন। এই কবি সম্বন্ধে আমাদের শেষ বক্তব্য—চট্টগ্রামের মুসলমানগণের প্রথা অনুসারে আলওয়াল এই দুইখানি বাঙ্গালা কাব্য ফারশী অক্ষরে লিখিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং সংস্কৃতানভিজ্ঞ প্রকাশক হামিদুল্লাসেথ ফারশী অক্ষর বাঙ্গালায় প্রবর্ত্তিত করিতে যাইয়া অনেকগুলি গুরুতর ভ্রম করিয়াছেন,—তাহা সংশোধন করিয়া এই দুইখানি কাব্য উদ্ধার করা একান্ত আবশ্যক।

বিদ্যাসুন্দর, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্য।

এই যুগের বিশেষ প্রশংসিত কাব্য ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর; কিন্তু ইহাতে অপ্রশংসার কথা অনেক আছে।

বিদ্যাসুন্দরের দোষ।

এই কাব্যে হীরা মালিনি ভিন্ন অন্য কোন চরিত্রপরিষ্কাররূপে অঙ্কিত হয় নাই। আদিরসের ভূতাশ্রিত নায়ক-নায়িকার তোটকছন্দাত্মক রাত্রিজাগরণ বর্ণনায় তাঁহাদের চরিত্রের কোন অঙ্গ পরিস্ফুট হয় নাই। বিদ্যা ও সুন্দরের কামোন্মত্ততা ক্ষণস্থায়ী ইতর-প্রকৃতি-সুলভ উত্তেজনার ফল,—উহা চরিত্রের বিকাশ দেখায় না। বিদ্যার রূপবর্ণনায় রূপবতীর রূপ অপেক্ষা কবির লেখনী-লীলাই বেশী প্রদর্শিত হইয়াছে। সুন্দরের রাজসভায় বক্তৃতায়ও কেবল শব্দ লইয়া ক্রীড়া,—তাহাতে সুন্দরের চরিত্র খুঁজিলে অতিশয়োক্তির একটি নিবিড় ছায়া দেখিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। "শুন শ্বশুর ঠাকুর, শুন শ্বশুর ঠাকুর। আমার পিতার নাম বিদ্যার শ্বশুর॥" "বিদ্যাপতি মোর নাম, বিদ্যাপতি মোর নাম। বিদ্যাধর জাতি মোর, বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম॥"—এ সমস্ত উক্তির অশিষ্টতা লিপিচাতুর্য্যের নামে মার্জ্জনীয় নহে। ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের নিকট কোন জামাতা যে সত্য সত্যই এরূপ ছন্দ ও ভঙ্গীতে

আত্মপরিচয় দিতে পারেন,—ইহা আমাদের ধারণার অতীত। মশানে যখন সুন্দরের শিরোর্দ্ধে কোটালের খরশাণ খড়্গ উত্থিত, তখন তিনি নিশ্চিন্ত-মনে অভিধান খুঁজিয়া চণ্ডীশব্দের প্রতিশব্দ বাহির করিতেছিলেন, অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার এই প্রাণান্ত অনুরাগ দৃষ্টে,—বিপজ্জালবেষ্টিত গণিতবিজ্ঞানে ঘোর নিবিষ্টচিত্ত, ভ্রূক্ষেপহীন অর্কমিডাসের কথা মনে হয়; হর্ষচরিতে পড়িয়াছি, আসন্নমৃত্যু রাজা জ্বরবিকারগ্রস্ত হইয়া "হারং দেহি মে হরিণি" প্রভৃতি ভাবে কেবল যমক মিলাইতেছেন, শিক্ষা-স্পর্দ্ধিত কবিগণ বিদ্যা বুদ্ধি দেখাইবার ব্যস্ততায় বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন, মশানে পতিত সুন্দরকে দিয়াও ভারতচন্দ্র সেইরূপ সময়ানুচিত অলঙ্কার-শাস্ত্রের অভিনয় করিয়াছেন। সুন্দরের স্তবে ভক্তির কথা দুর্লভ—লিপিশক্তির পরিচয় সুলভ। সুন্দর ধরা পড়িলে বিদ্যা বিনাইয়া কাঁদিতে বসিল, তাহার ক্রন্দনে চক্ষুজল ব্যতীত সকলই ছিল—ছন্দের প্রতি সাবধানতা বিশেষ; রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দরের রাণী ও তাহার গর্ভবতী কন্যার শ্লেষপূর্ণ বাক্-বিতণ্ডা পড়িয়া বিজয়গুপ্ত-বর্ণিত পূর্ব্বদেশীয় বর্ব্বরগণের কথা মনে হইয়াছিল —"জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ তারা সব করে ঠাট্যা। ব্রাহ্মণ সজ্জন তারা বৈসে চর্ম্মকাটা॥" রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর হইতে সেই অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি— "আলো গর্ভের লক্ষণ সর্ব্ব। বিদ্যা বলে বাতাসে কি জন্মে গর্ভ॥ আলো উদর ডাগর তোর। বিদ্যা বলে উদরী হয়েছে মোর॥ আলো স্তনে কেন ক্ষরে পয়। বিদ্যা বলে এ রোগে বাঁচা সংশয়॥ আলো শয়ন কেন ভূতলে। বিদ্যা বলে নিরন্তর দেহ জ্বলে॥ আলো মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম। বিদ্যা বলে নিদাঘ কালের ধর্ম্ম॥" এই "মা ও মেয়ে"-প্রহসনের আর অধিক উদ্ঘাটিত করিতে লজ্জা বোধ হয়।

হীরা মালিনী।

বিজাতীয় আদর্শ অনুসরণ করার দরুণই হউক, কি অন্য যে কোন কারণেই হউক, বিদ্যা ও সুন্দরের চরিত্র অস্বাভাবিক হইয়াছে। কিন্তু ভারতচন্দ্র হীরা মালিনীর যে মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা জীবন্ত হইয়াছে। এই চরিত্রের ভাব কতকটা তাঁহার স্বীয় প্রতিভার অনুরূপ, বিশেষ হীরা

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের শ্রেষ্ঠ চরিত্র রূপে কল্পিত না হওয়াতে, কবি তাহাকে উপলক্ষ করিয়া বাক্‌জাল বিস্তার করা আবশ্যক মনে করেন নাই। শিক্ষিত কবির চেষ্টা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া হীরামালিনী স্বাভাবিক বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে, বিদ্যার রূপ বর্ণনায় কবির প্রাণান্ত চেষ্টাজালে খাঁটি মূর্ত্তি ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, তৎপার্শ্বে হীরার রূপবর্ণনা স্থাপন করিলে পাঠক তারতম্য করিতে পারিবেন—"সূর্য্য যায় অস্তগিরি, আইসে যামিনী। হেন কালে তথা এক আইল মালিনী॥ কথায় হীরার ধার, হীরা তার নাম। দাঁত ছোলা, মাজা দোলা, হাস্য অবিরাম॥ গাল ভরা গুয়া পান, পাকি মালা গলে। কাণে কড়ি, কড়েরাঁড়ি, কথা কয় ছলে॥ চূড়া বাঁধা চুল, পরিধান সাদা সাড়ী। ফুলের চুপড়ি কাঁখে, ফিরে বাড়ী বাড়ী॥ আছিল বিস্তর ঠাট, প্রথম বয়সে। এবে বুড়া, তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥ ছিটা ফোঁটা মন্ত্র তন্ত্র জানে কত গুলি। চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায়, জানে কত ঠুলি॥ বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কোন্দল ভেজায়। পড়সী না থাকে কাছে কোন্দলের দায়॥ মন্দ মন্দ গতি, ঘন ঘন হাত-নাড়া। তুলিতে বৈকালে ফুল, আইসে সেই পাড়া॥"—ভারতচন্দ্র প্রকৃত কবির প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অলঙ্কার শাস্ত্র তাঁহার মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছিল, যে সকল স্থানে তিনি অলঙ্কার শাস্ত্রখানি হস্ত হইতে ফেলিয়া রাখিয়া স্বভাবের আদত চিত্রের প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন, সে সকল অংশে তাঁহার বর্ণনা জীবন্ত ও সুন্দর হইয়াছে।

নানা দোষ সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর এত আদরণীয় হইল কেন, তাহার কারণ আমরা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি—

শব্দমন্ত্র।

ভারতচন্দ্রের অপূর্ব্ব শব্দমন্ত্র! বাঙ্গালা পৃথিবীর কোমলতম ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু এই কোমলতার কিরূপ আকর্ষণী শক্তি আছে, তাহা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর না পড়িলে সম্যক্ উপলব্ধি হইবে না; বাঁশীর রবে হরিণ ফাঁদে পড়ে, হাতী কাদায় মগ্ন হয়, ভারতচন্দ্রের ললিত শব্দে মুগ্ধ হইয়া একসময় বঙ্গীয় যুবকগণ নৈতিক কূপে পড়িয়াছিলেন।

আমরা যে সমস্ত বিদ্যাসুন্দর পাইয়াছি, তন্মধ্যে ১৫৯৫ খৃঃ অব্দে

বিরচিত কায়স্থ কবি গোবিন্দদাস কৃত কালিকামঙ্গলের অন্তর্গত বিদ্যা-সুন্দর প্রসঙ্গই প্রাচীনতম। স্থাননির্দ্দেশ এবং চরিত্রবর্গের নামকরণ প্রভৃতি বিষয়ে গোবিন্দদাসের বিদ্যাসুন্দরে অনেকটা স্বতন্ত্রতা দৃষ্ট হয়। ভারতচন্দ্র-কথিত বীরসিংহ বর্দ্ধমানাধিপতি; কিন্তু গোবিন্দদাসের বীরসিংহ রত্নপুরের রাজা। ভারতচন্দ্রের সুন্দর কাঞ্চিপুর নিবাসী; গোবিন্দদাসের সুন্দরের বাড়ী গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত কাঞ্চননগর। ভারতচন্দ্রের হীরামালিনী স্থলে গোবিন্দদাসের রম্ভামালিনীর নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। গোবিন্দদাস চট্টগ্রামের অন্তর্গত দেবগ্রামবাসী ছিলেন। তাঁহার রচিত উপাখ্যান চট্টগ্রামের দুর্ভেদ্য অরণ্য ভেদ করিয়া রাঢ়দেশে পঁহুছিতে পারে নাই; সুতরাং ভারতচন্দ্র রায় এক শতাব্দীর পরবর্ত্তী লেখক হইলেও তদীয় গ্রন্থের প্রভাব ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দরের উপর বিস্তারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। গোবিন্দদাসের বিদ্যাসুন্দরে শীলতার অভাব আদৌ নাই। উহা কালী-মাহাত্ম্যজ্ঞাপক ও ধর্ম্মতত্ত্ব পরিপূর্ণ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বহুপূর্ব্ব হইতে এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল। হিন্দুলেখকগণ উহা ধর্ম্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাখিয়া চণ্ডীকাব্যের ন্যায় উহাতেও দেবমাহাত্ম্যজ্ঞাপক উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছেন। মুসলমানী যুগে লেখকগণ নামে মাত্র ধর্ম্মসংস্রব রক্ষা করিয়া মুসলমানী উপাখ্যানসমূহের ভাবের দ্বারা উহা বিকৃত করিয়াছেন। স্বীয় বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের অনেকস্থলে গোবিন্দদাস কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। নিম্নে একটী শিবস্তোত্র উদ্ধৃত হইল :—

"রাগ গৌরী—গান্ধার।

জয় শিব শঙ্কর তহু গতি।
জয় দেবনাথ জগত তারণ চরণ সরোরুহে
বহু মিনতি॥

সুরনদী-চন্দ্রিম-মুকুট মালভূষণ ফণিমাল কুন্তল
সোহে শ্রুতি।
টলমল ত্রিনয়ন জ্বাল আধ মিলন
রজত-ধরাধর-অঙ্গদ্যুতি ॥
সুররিপু ত্রিপুর হরদাহন-অবলেহন-সীমবরণ
শিব যোগপতি।
বিলসতি যোগভোগ ভববাসন দীন শরণ
জয় গৌরীপতি ॥

রাগ—তুরী ॥

নৌমি নন্দিকেশ ঈশ, কণ্ঠে কালকূট বিষ,
নীলকণ্ঠ নাম রাম দেবদেব বন্দনী।
অর্দ্ধঅঙ্গ গৌরীসঙ্গ, মৌলী-কেলি চতুরঙ্গ,
অঙ্গভঙ্গ অতিরঙ্গ, সোহে জহ্নুনন্দিনী ॥
রঙ্গনাথ লোকপাল, অর্দ্ধঅঙ্গ বাঘছাল,
ব্যোমকেশ শেষ মাল ভালে ইন্দুমোহিনী ॥"

অন্যান্য কবির বিদ্যাসুন্দর।

ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী আর দুইখানি বাঙ্গালা বিদ্যাসুন্দর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ভারতের পদলালিত্য ও অপূর্ব্ব শব্দমন্ত্র নাই, কিন্তু দোষগুলি সমধিক পরিমাণে বিদ্যমান। এই দুইখানি বিদ্যাসুন্দর-প্রণেতা—কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ। প্রাণরাম নামক এক কবি ভারতচন্দ্রের পর আর এক খানি বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই কয়েকটি কথা আছে—"বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ। বিরচিল কৃষ্ণরাম নিমতা যার বাস ॥ তাঁহার রচিত পুঁথি আছে ঠাঁই ঠাঁই। রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই ॥ পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদা-মঙ্গলে। রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে ॥"

তুলনায় সমালোচনা।

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর অবলম্বন করিয়া ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন;—এই অবলম্বন অর্থে একরূপ চৌর্য্যবৃত্তি। কিন্তু প্রতিভাবান্ ব্যক্তির পক্ষে ইহা দোষ নহে, প্রতিভাশালী ব্যক্তির কৃতিত্বের মূলে

সংগ্রহ ;—প্রতিভাবান্ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট সংগ্রাহক নামে বাচ্য। প্রকৃতিতেও নূতন সৃষ্টি কিছু দেখা যায় না ; শুষ্ক পল্লবের স্থলে নূতন পল্লবটির উৎপত্তি হইতেছে—উহা অতীতের পুনরাবির্ভাব মাত্র। পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যাসুন্দর-গুলির ভাব ও ভাষা ঘষিয়া মাজিয়া ভারতচন্দ্র সুন্দর করিয়াছেন ; দোমেটে মূর্ত্তিতে রং ফিরাইলে যেরূপ দেখায়, পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যাসুন্দরগুলির পরে ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দরও ঠিক সেইরূপ দেখাইবে—নিম্নে তুলনার জন্য কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি,—

১। "কহে এক সতী, সেই ভাগ্যবতী, সুন্দর এ পতি, যার লো ঘটে॥ হৃদয়-মাঝারে, রাখিয়া ইহারে, নয়ন দুয়ারে, কুলুপ দিয়া। রূপ নহে কালো, নিরখিতে ভাল, দেখ্ সখি আলো, আঁখি মুদিয়া॥ কহে রামা আর, গলে পরিহার, এ হার কি ছার, ফেলিলো টেনে। সাধ পূরে তবে, হেন দিন হবে, কোন্ জন কবে, ঘটাবে এনে॥ কহে কোন আই, আমি যদি পাই, পালাইয়া যাই, এদেশ থেকে। নারী-কলাফাঁদে বাঁধি নানা ছাঁদে, প্রাণ বড় কাঁদে, দেনালো ডেকে॥"—রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর : নাগরী উক্তি।

১। "আহা মরি যাই, লইয়া বালাই, কুলে দিয়া ছাই, ভজি ইহারে। যোগিনী হইয়ে, ইহারে লইয়ে, যাই পলাইয়ে, সাগর পারে॥ কহে এক জন, লয় মোর মন, এ নব রতন ভুবন মাঝে। বিরহে জ্বলিয়া, সোহাগে গলিয়া, হারে মিলাইয়া পরিলো সাজে॥ আর জন কয়, এই মহাশয়, চাঁপা ফুলময়, খোঁপায় রাখি। হলুদী জিনিয়া, তনু চিকণিয়া স্নেহেতে ছানিয়া, হৃদয়ে মাখি॥"—ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর ; নাগরী উক্তি।

২। "ডুবিল কুরঙ্গশিশু মুখেন্দু সুধায়। লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায়॥ নাভিপদ্ম পরিহরি মত্ত মধুপান। ক্রমে ক্রমে বাড়িল বারণ কুম্ভ স্থান॥ কিবা লোম-রাজি ছলে বিধি বিচক্ষণ। যৌবন কৈশোর দ্বন্দ্ব করিল ভঞ্জন॥" "কোন বা বড়াই কাম পঞ্চশর তূণে। কত কোটি খর শর সে নয়ন কোণে॥"—বিদ্যার রূপবর্ণনা, রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর।

২। "কাড়ি নিল মৃগ মদ নয়নহিল্লোলে। কাঁদেরে কলঙ্কীচাঁদ মৃগ লয়ে কোলে॥ নাভিপদ্মে যেতে কাম কুচশম্ভুবলে। ধরিল কুন্তল তার রোমাবলী ছলে॥" "কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা। পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥" "কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম। কটুতায় কোটী কোটী কালকূট সম॥"—ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ; বিদ্যার রূপবর্ণনা।

৩। "উত্তম ঘটক সুন্দরের গাঁথা হার। বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তা চিত্ত দোঁহাকার॥ পুরোহিত হইলেন আপনি মদন। বিদ্যালাপ ছলে বুঝি পড়ালো বচন॥ উলু দিছে ঘন ঘন পিক সিমন্তিনী। নয়ন চকোর সুখে নাচিছে নাচনী। বরযাত্র মলয়পবন বিধুবর। মধুকর নিকর হইল বাদ্যকর॥ উভয়ত কুটুম্ব রসনা ওষ্ঠাধর। পরস্পর ভুঞ্জে সুধা মুখেন্দু উপর॥ নূপুর কিঙ্কিণী জালে নানা শব্দ হয়॥ দুই দলে দ্বন্দ্ব যেন চন্দন-সময়। সস্ত্রীক আইল কাম দেখিতে কৌতুক। দম্পতীরে পঞ্চশর দিলেক যৌতুক॥"—গন্ধর্ব্ববিবাহ, রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর।

৩। "বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার। গর্ব্বন্ধ বিবাহ হৈল মনে আঁখি ঠার॥ কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর। পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর॥ কন্যাযাত্র বরযাত্র ঋতু ছয় জন। বাদ্য করে বাদ্যকর কিঙ্কিণী কঙ্কণ॥ নৃত্য করে বেশরে নূপুরে গীত গায়। আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈল তায়॥ ধিক ধিক অধিক আছিল সখী তায়। নিশ্বাস আতসবাজি উত্তাপে পলায়॥ নয়ন অধর কর জঘন চরণ। দুহাঁর কুটুম্ব সুখে করিছে ভোজন॥"—গর্ব্বন্ধবিবাহ, ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর।

৪। "কেমন পণ্ডিত বাপা জানা কিছু চাই। রাজা বলে কাট চোরে মশানে বাযাই॥ আঁখি ঠেরে আর বার করে নিবারণ।"—রাজসভায় সুন্দর, রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর।

৪। "চাহে কাটিতে কোটাল চাহে কাটিতে কোটাল। নয়ন ঠারিয়া মানা করে মহীপাল॥"—ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর।

৫। "অগুরু চন্দন চুয়া চাইতে চাইতে। চক্ষু ঠিকরিয়া যায় আছে কি পাইতে। জায়ফল লবঙ্গ প্রসাদ মাত্র নাই। আনিয়াছি কিন্তু কিছু বলি আমি তাই॥"—মালিনীর বেসাতি; কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর।

৫। "আটপণে আধ সের আনিয়াছি চিনি। অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥ দুর্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল। সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল॥"—ভারত-চন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর।

৬। "বুঝিয়া বিদ্যার মনে বাড়িল আহ্লাদ। হেনকালে ময়ূর করিল কেকানাদ॥ সুন্দর কেমন কবি বুঝিতে পদ্মিনী। সখীরে জিজ্ঞাসা করে কি ডাকে স্বজনি॥"—প্রথম-মিলন, কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর।

৬। "হেনকালে ময়ূর ডাকিল গৃহপাশে। কি ডাকে বলিয়া বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে॥"—ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর।

কৃষ্ণরামের হাতে বিদ্যাসুন্দর একমেটে, রামপ্রসাদের হাতে দোমেটে এবং ভারতচন্দ্রের হাতে বিদ্যাসুন্দরের রং ফিরান হইয়াছিল। কংস-সভায় শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিতে গেলে তৎপ্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন,—
কংসের গায়ন যারা, যে বীণা বাজায় তারা, বীণা যে গোবিন্দ গুণ গায়।"
কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের বীণায় যে গান উত্থিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারাও সেইরূপ পদার্পণমাত্র অতুল সৌভাগ্যশালী ভারতচন্দ্রের গুণ-কথাই জ্ঞাপিত হইল। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদ্বয় ন্যায্য প্রশংসা হইতে বঞ্চিত হইয়া হতাদৃত অবস্থায় শ্মশানে সুপ্ত হইলেন এবং সমালোচকবর্গের জন্য এই নীতি-সূত্র ফেলিয়া গেলেন,—ভাগ্যবৃক্ষই সর্ব্বত্র ফল ধারণ করে, পরিশ্রম অনেক সময় কাঁটা বনের ন্যায় পদতল ক্ষত বিক্ষত করে মাত্র। আমরা এস্থলে কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের জীবন সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

কৃষ্ণরামদাস, ১৬৬৬ খৃঃ।

কবি কৃষ্ণরামদাস অনুমান ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে কলিকাতার নিকট-বর্ত্তী বেলঘরিয়া ষ্টেসনের আধ ক্রোশ পূর্ব্বে নিমতাগ্রামে কায়স্থকুলে জন্ম গ্রহণ করেন; তাঁহার পিতার নাম ভগবতীচরণ দাস। ১৬৮৬ খৃঃ অব্দে তিনি এক দিবস জনৈক গোয়ালের ঘরে রজনী অতিবাহিত করেন, সেই রজনীতে ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে চড়িয়া দক্ষিণরায় নামক সুন্দরবনবাসী দেবতা তাঁহাকে তৎসম্বন্ধীয় কাব্য রচনা করিতে স্বপ্নে আদেশ দেন, আমরা "রায়মঙ্গল" হইতে সেই অংশ ১১৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছি। এই কাব্যরচনার পর কবি বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, ইহা তাঁহার 'কালিকামঙ্গলের' অন্তর্গত। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কৃষ্ণরামকবির বিদ্যা-সুন্দরের যে হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছেন, তাহা ১১৫৯ সালের লেখা। এই পুঁথি নকল করিবার সময়ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের রচনা শেষ হয় নাই,—সম্ভবতঃ কৃষ্ণরামের কাব্য ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দরের

৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত দুইখানি কাব্য ছাড়া কৃষ্ণরাম "অশ্বমেধপর্ব্বে"র একখানি অনুবাদ প্রণয়ন করেন। কবি কৃষ্ণরাম চৈতন্যোপাসক ছিলেন বলিয়া বোধ হয়, তিনি চৈতন্যবন্দনায় লিখিয়াছেন—"যথায় কীর্ত্তিত হয় চৈতন্য চরিত্র। বৈকুণ্ঠ সমান ধাম পরম পবিত্র॥ তাহে গড়াগড়ি দেয় (যেবা) প্রেমে নৃত্য করে। জীবন সুকৃতি তার ধন্য দেহ ধরে॥ হেলায় শ্রদ্ধায় জীব কণ্ঠী ধরে যত। তাহা সবাকারে মোর প্রণাম শত শত॥" *

রামপ্রসাদ সেন।

বৈদ্যবংশোদ্ভব রামপ্রসাদ সেন হালিসহর অন্তঃপাতী কুমারহট্টগ্রামে ১৭১৮-১৭২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামরাম সেন। + রামরাম সেনের দুই বিবাহ; প্রথম পক্ষে নিধিরাম নামক পুত্র, ও দ্বিতীয় পক্ষে অম্বিকা ও ভবানী নাম্নী কন্যাদ্বয় এবং রামপ্রসাদ ও বিশ্বনাথ নামক পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতানিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণদাসের সঙ্গে রামপ্রসাদের দ্বিতীয়া ভগিনী ভবানীর পরিণয় হয়,—এই ভগিনীর দুই পুত্র জগন্নাথ ও কৃপারামের নাম কবি উল্লেখ করিয়াছেন। রামপ্রসাদের রামদুলাল ও রামমোহন নামে দুই পুত্র এবং পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নাম্নী দুই কন্যা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কবি তাঁহার পিতামহ রামেশ্বর এবং বংশের আদিপুরুষ কৃত্তিবাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার কাব্যে আরও জানিতে পারি যে রামপ্রসাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ধনাঢ্য ও প্রসিদ্ধ ছিলেন;—"শিশুকালে মাতা মৈল, রাজ্য নিল চোরে" বলিয়া কবি আক্ষেপ করিয়াছেন। কবির প্রিয় পুত্র রামদুলালের বংশ লুপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় পুত্র রামমোহনের পৌত্র ও কবির বৃদ্ধপ্রপৌত্র

---

* মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "কবি কৃষ্ণরাম" শীর্ষক প্রবন্ধ, সাহিত্য ১৩০০ সন, ২য় সংখ্যা, ১১৭ পৃঃ।

+ "রাম রাম সেন নাম, মহাকবি গুণাধাম, সদা যারে সদয় অভয়া। তৎসুত রামপ্রসাদে, কহে কোকনদপদে, কিঞ্চিৎ কটাক্ষে কর দয়া"—কবিরঞ্জন।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ সেন এখনও বর্ত্তমান; ইনি উড়িষ্যার অন্তর্গত আঙ্গুলে ইঞ্জিনিয়ারের কর্ম্ম করিতেছেন। গত পনর বৎসর যাবৎ হালিসহরে কবির জন্মতিথিতে মেলা হইয়া থাকে। রামপ্রসাদ সেন কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজার সমসাময়িক। এই গুণজ্ঞ রাজা ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে রামপ্রসাদকে ১০০/ বিঘা ভূমি নিষ্কর দান করেন, তাহাতে লেখা আছে "গর আবাদী জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে রহ" যে বৎসর ইংরেজগণ পলাশীক্ষেত্রে জাতীয় সৌভাগ্যধ্বজা প্রথম উত্থিত করেন, তাহার এক বৎসর পরে এই দানপত্র লিখিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র অনেক সময় কুমারহট্টে আসিতেন, তিনি রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দিয়াছিলেন ও তাঁহাকে রাজসভায় আনিতে আগ্রহ দেখাইতেন, কিন্তু বিষয়-নিস্পৃহ কবি স্বীয় পল্লীতে বসিয়া শ্যামা-সংগীত গানে নিজে মুগ্ধ থাকিতেন ও অপর সকলকে মুগ্ধ করিতেন, তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধ পালন করেন নাই। কবি লিখিয়াছেন, কুমারহট্টে রামকৃষ্ণের মণ্ডপে তিনি সিদ্ধি-কামনায় যোগ অনুষ্ঠান করিতেন, কিন্তু কোন দৈব-ঘটনাহেতু সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে নিজের অপেক্ষা তাঁহার স্ত্রীর পুণ্যবল বেশী ছিল বলিয়া কবি বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন,—"ধন্য দারা, স্বপ্নে তারা, প্রত্যাদেশ তারে॥ আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে॥ জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব; কহিবার নহে তাহা সে কথা কি কব॥"

কথিত আছে, রামপ্রসাদ জনৈক ধনী ব্যক্তির সেরেস্তায় মুহুরিগিরি করিতেন। জমিদারী সেরেস্তার হিসাবের অরণ্যে পথহারা পান্থের ন্যায় কবি মধ্যে মধ্যে হিসাবপত্রের ধারে দুই একটি গান লিখিয়া শ্রম লাঘব করিতেন। একদিন জমিদার মহাশয় সেরেস্তা পরিদর্শনের সময় মুহুরির হিসাবের খাতায়,—"আমায় দে মা তবিলদারী। আমি নেমকহারাম নই শঙ্করী॥" প্রভৃতি পদ পড়িয়া চমৎকৃত হইলেন, ও কবিকে ৩০৲ টাকা পেন্সন দিয়া ঘরে যাইয়া শ্যামা-সংগীত লিখিতে উপদেশ দিলেন। তদবধি কবি কুমার-হট্ট গ্রামে তাঁহার সংগীতমুক্তাবলী ছড়াইতে লাগিলেন। শৃঙ্খল-বিমুক্ত

পক্ষীর ন্যায় কবি প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সুধামাখা গানে জগৎকে সুখী করিলেন।

প্রাগুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন আর একজন ধনী ব্যক্তি তাঁহাকে কাব্য লিখিতে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, ইঁহার নাম রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়। ইনি কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজার পিসা শ্যামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা ছিলেন। কবি এই রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের আদেশে "কালীকীর্ত্তন" রচনা আরম্ভ করেন; সে কথা তিনি নিজেই লিখিয়াছেন— "শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন। রচে গান মোহান্ধের ঔষধ অঞ্জন॥" ভারতচন্দ্রও এই রাজকিশোর মহাশয়ের গুণ-জ্ঞাপক এক পংক্তি কবিতা লিখিয়াছেন—"মুখ রাজকিশোর কবিত্ব কলাধার।"—(অন্নদামঙ্গল)। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর সাত বৎসর পূর্ব্বে, যে বৎসর রোহিলাদিগকে উৎসন্ন করিয়া ইংরেজ-সৈন্য প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই বৎসর রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়।

কেহ কেহ বলেন রামপ্রসাদের রচিত 'বিদ্যাসুন্দর', তাঁহার 'কালিকামঙ্গলে'র অন্তর্গত। এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ বিদ্যাসুন্দরকাব্যখানি কবিগণের সকলেই কালীনামাঙ্কিত মলাটে পূরিয়া শোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দরের নাম 'কালিকামঙ্গল', ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর 'অন্নদামঙ্গলের' অন্তর্ব্বর্ত্তী। এই মতের বিরুদ্ধে আমাদের একমাত্র ও অতি গুরুতর আপত্তি এই যে 'কালিকামঙ্গল' পাওয়া যায় নাই। 'কালীকীর্ত্তন' ও 'কালিকামঙ্গল' এক কাব্য বলিয়া বোধ হয় না; 'কালীকীর্ত্তন' একখানি গীতিকাব্য, ইহার মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের পালার স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকা সম্ভাবিত নহে।

রামপ্রসাদ কোন স্থলেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কি তাঁহার বৃত্তিদাতা জমিদার মহাশয়ের নাম উল্লেখ করেন নাই; রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের আজ্ঞাক্রমে কালীকীর্ত্তন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সুতরাং বাধ্য হইয়া

তাঁহার নামটি উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাহাও অতি সংক্ষেপে ও অসম্পূর্ণ-ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। যে সময় রায়গুণাকর প্রভৃতি কবিগণ আশ্রয়-দাতাদিগকে কল্পনার স্বর্ণখট্টায় স্থাপিত করিয়া স্বর্গ-মর্ত্ত্যের যাবতীয় উপমার উপঢৌকন দিতেছিলেন, সেই সময়ে রামপ্রসাদের তোষামোদবৃত্তির প্রতি এই সগর্ব্ব উপেক্ষা প্রশংসনীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

রামপ্রসাদের গানের এক শত্রু ছিল, তাঁহার নাম আজু গোসাঞি। ইনি রামপ্রসাদী গানের সময়ে সময়ে যে টিপ্পনী করিতেন, তাহা বেশ হাস্যরসোদ্দীপক, যথা রামপ্রসাদের গান,—"এ সংসার ধোকার টাটী। ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি। ওরে ক্ষিতি বহ্নি বায়ু জল শূন্যে অতি পরিপাটী॥"—তদুত্তরে আজু গোসাঞের গান,—এই সংসার রসের কুটী, খাই দাই রাজত্বে বসে মজা লুটি। ওহে সেন নাহি জ্ঞান, বুঝ তুমি মোটামুটি। ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত, পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটী॥"

রামপ্রসাদের সঙ্গে সিরাজোদ্দৌলার সাক্ষাৎ এবং তাহার গান শুনিয়া নবাববাহাদুরের অনুগ্রহপ্রকাশ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে। ধর্ম্মসম্বন্ধে কাহারও একটু প্রসিদ্ধি হইলে তৎসম্পর্কে কতকগুলি অলৌকিক প্রবাদের উৎপত্তি হওয়া স্বাভাবিক। কালী কন্যারূপে কবির বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন; কাশীতে যাইতে অনুমতি দিয়া পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া-ছিলেন; কালীনাম করিতে করিতে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া তাঁহার তনুত্যাগ হয়;—এই সব জনশ্রুতির বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া ছাপাইতে অনেক সময় এবং ব্যয় আবশ্যক, তাহা আমাদের এখন আয়ত্ত নাই।

যাঁহারা কৃষ্ণচন্দ্র রাজার দূষিত রুচির সান্নিধ্যে ছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রবণতা সত্ত্বেও কথঞ্চিৎ সংক্রামিত না হইয়া যান নাই,—ইহার সাক্ষী রামপ্রসাদ। আমরা রামপ্রসাদের নির্ম্মল ভক্তি-বিহ্বলতায় মুগ্ধ, তাঁহার উন্নত চরিত্রের সর্ব্বদা পক্ষপাতী; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তৎপ্রণীত বিদ্যাসুন্দরের বীভৎস রুচির সমর্থন করিতে প্রস্তুত

নহি; ভারতচন্দ্রের রচনা যে গর্হিত রুচি-দোষ-দুষ্ট, রামপ্রসাদ তাহার পথ-প্রবর্ত্তক। ভারতচন্দ্রের মত রামপ্রসাদ বীভৎস আদিরসপূর্ণ কবিতা আপাতসুন্দর করিয়া দেখাইতে পারেন নাই; কিন্তু তাহা শক্তির অভাব জন্য,—ইচ্ছার ত্রুটিহেতু নহে।

রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের অপর নাম 'কবিরঞ্জন'। 'কবিরঞ্জনে' রামপ্রসাদের সংস্কৃত বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় আছে, কিন্তু তাঁহার সংস্কৃত বিদ্যার উত্তম পরিপাক হয় নাই; বাঙ্গালা পদগুলির মধ্যে সংস্কৃত কথাগুলির উত্তম সমন্বয় হয় নাই,—উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি স্থল তুলিতেছি,—"সহজে কলঙ্কী সে তবাস্য সম নহে।" "জলে স্থলে চান্তরীক্ষে।" "ক্ষেপ করে দশদিক্ষু লোষ্ট্র বিবর্দ্ধনে।" "পূর্ণচন্দ্র শোভা যেন পিবতি চকোর।" কালীকীর্ত্তনে,—"বারে বারে ডাকে রাণী জননী জাগৃহি জাগৃহি। আগত ভানু রজনী চলি যায়। উঠ উঠ প্রাণ গৌরী, এই নিকটে গিরি, উঠগো এবমুচিতমধুনা তব নহি নহি। সুত মাগধ বন্দী, কৃতাঞ্জলি কথয়তি, নিদ্রাং জহিহি জহিহি॥" এইরূপ সংস্কৃত পদের প্রভাবে বাঙ্গালা কবিতা একান্ত শ্রুতিকটু হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণদাসকবিরাজ এবং রামপ্রসাদ সংস্কৃতের সাহায্য গ্রহণ করিতে যাইয়া উপহাসজনক অযোগ্যতা দেখাইয়াছেন। কিন্তু রামপ্রসাদ যে স্থলে শিক্ষার অভিমান ত্যাগ করিয়াছেন,—সে স্থলে তিনি বাগ্দেবীর আদরের কবি; তাঁহার গানে প্রাণের কথা সহজ ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে; এই যুগের শিক্ষিত সমাজের রুচি বিদ্যা-বুদ্ধি দেখাইতে ব্যগ্র ছিল, এই দুষ্ট রুচির সংক্রমণে যখন রামপ্রসাদের ন্যায় ভাবপ্রধান কবিকেও আমরা লোকমনোরঞ্জনার্থ শব্দ লইয়া বিফল ক্রীড়া করিতে দেখি, তখন আমাদের ইডেন উদ্যানে এডাম এবং ইভের মনোরঞ্জনার্থ হস্তীর চেষ্টা মনে পড়ে—

> "The unwieldy Elephant,
> To make them mirth, used all his might, and wreathed
> His lithe proboscis."—Paradise Lost; Book IV.

রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দরের ভাষাকে অলঙ্কার পরাইয়া সুন্দরী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; "গোযুগে গলিত ধারা তৃষ্ণা নিষ্ঠাগত" প্রভৃতি ভাবের অনুপ্রাস বন্ধন দেখিয়া মনে হয় যেন উন্মত্তা রাধিকার * ন্যায় তিনি পদের অলঙ্কার কণ্ঠে ও কর্ণের দুল চুলে সংলগ্ন করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র সেই সব অলঙ্কার লইয়া ভাষাকে সাজাইয়াছেন,—একটু সাধারণ সৌন্দর্য্যবোধের অভাবে রামপ্রসাদের বিরাট চেষ্টা পণ্ড হইয়া গিয়াছে, সেই পণ্ডশ্রমের শ্মশানে অদ্য ভারতচন্দ্রের যশোমন্দির উত্থিত হইয়াছে।

কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন।

কিন্তু শিক্ষার ধূম্রপটলের পুঞ্জীকৃত আঁধার ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে রামপ্রসাদের কতগুলি সুন্দর কবিত্ব-পূর্ণ রচনা দৃষ্ট হয়। মেঘ-বিমুক্ত কিরণ-রাশির ন্যায় সেই সব স্থল তৃপ্তিপ্রদ; আমরা কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে দুইটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি,—

(১) "গিরিবর আর আমি পারি না হে প্রবোধ দিতে উমারে। উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন পান, নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥ অতি অবশেষে নিশি, গগনে উদয় শশী, বলে উমা ধরে দে উহারে। কাঁদিয়া ফুলাল আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি, মায়ে ইহা সহিতে কি পারে। আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়া কর-অঙ্গুলী, যেতে চায় না জানি কোথা রে॥ আমি বলিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়, ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে॥"
—কালীকীর্ত্তন।

(২) "প্রথম বয়সে রাই রসরঙ্গিণী। ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী॥ রাই বদন চেয়ে ললিতা বলে। রাই আমার মোহন মোহিনী॥ রাই যে পথে প্রয়াণ করে, মদন পলায় ডরে। কুটিল কটাক্ষ শরে জিনিল কুসুম শরে॥ কিবা চাঁচর সুন্দর কেশ,

* "রাই সাজে বাঁশী বাজে না পড়িল উল। কি করিতে কি না করে সব হৈল ভুল॥ মুকুরে আচরে রাই বাঁধে কেশ ভার। পদে বাঁধে ফুলের মালা না করে বিচার॥ করেতে নূপুর পরে জঙ্ঘে পরে তাড়। গলাতে কিঙ্কিণী পরে কটিতটে হার॥ চরণে কাজর পরে নয়নে আলতা। হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ পাতা॥ শ্রবণে করয়ে রাই বেশর-সাজনা। নয়ন উপরে করে বেণীর রচনা॥ বংশীদাসে বলে বাই বলিহারি। রাই-অনুরাগের বালাই লয়ে মরি॥"

সখি বকুলে বানাইল বেশ। তার গন্ধে অলিকুল, হইয়া আকুল, কেশে করেছে প্রবেশ। নবভানু ভালেতে বিকাশ, মুখচন্দ্র করেছে প্রকাশ॥"—কৃষ্ণকীর্ত্তন।

রামপ্রসাদ বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন। বৈষ্ণব-নিন্দায় একটু বিদ্রূপ-শক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ,—"খাসা চীরা বহির্বাস রাঙ্গা চীরা মাথে। চিকণ গুধড়ী গায় বাঁকা কোৎকা হাতে॥ মুণ্ড গুম্ফ ছড়া গলে ঠাঁই ঠাঁই ছাব। দুই ভাই ভজে তারা সৃষ্টিছাড়া ভাব॥ পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে খান সাত আট। ভেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট। এক এক জনার ধুমড়ী দুটি দুটি। দুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটি॥ ভুগলামি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে॥ বীরভদ্র অদ্বৈত বিষম ডেকে উঠে॥ সে রসে রসিক নবশাক লোক যত। উঠে ছুটে পায় পড়ে করে দণ্ডবত॥ সমাদরে কেহ নিয়া যায় নিজ বাড়ী। ভালমতে সেবা চাই পড়ে তাড়াতাড়ি॥ গোষ্ঠিশুদ্ধ খাড়া থাকে বাবাজীর কাছে। মনে মনে ভয় অপরাধী হয় পাছে॥"—বিদ্যাসুন্দর। আধুনিক কালের এক জন সুপ্রসিদ্ধ কবি শৈব এবং শাক্ত সন্ন্যাসিগণের যে বর্ণনা দিয়াছেন,—তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিতাটির উত্তর বলিয়া গণ্য হইতে পারে, যথা—"দিন দুপুরে সন্ন্যাসী-দল এসে জুটিল। "হর হর" এই রবেতে সে ঘর পুরিল॥ গুরু তাদের দীর্ঘাকৃতি নাম "অহংকার"। বিভূতিভূষিত অঙ্গ মাথায় জটাভার॥ পদ্মের পলাশ নয়ন দুটি আরক্ত নেশায়। ঢালে, সাজে, সাজে, ঢালে,—সদাই গাঁজা খায়॥ হাতে চিমটে গলায় গাঁথা রুদ্রাক্ষবিশাল। গাঁজায় দেয় দম্, বলে ব্যোম ব্যোম, সদা বাজায় গাল॥ অভিমানের হাঁড়ি জেন নরে হেয় জ্ঞান। জ্ঞানের তত্ত্ব সেই বুঝেছে আর সবে অজ্ঞান॥ পাঁচটি চেলা পাঁচটি অসুর এমনি বলবান। চক্ষুগুলি কুঁচের মত বয়সে, জোয়ান॥ বাহুগুলি লোহার গোলা তাতে মাখা ছাই। খেয়ে উদম ধর্ম্মের ষাঁড় সম কিছুই চিন্তা নাই॥ ধর্ম্মের ধার কেউ ধারে না কাজের মধ্যে তিন। গাঁজা টানে, ভিক্ষা আনে, কুস্তিতে প্রবীণ॥ অপভাষায় ছাই কথা কয় শুনে সরম লাগে। আশে পাশে, স্ত্রীলোক বসে, মনে তা না জাগে॥"

কালীকীর্ত্তনে রামপ্রসাদ কালীঠাকুরাণীকে দিয়া নৃত্য করাইয়াছেন, তাঁহার রাসলীলা ও গোষ্ঠ বর্ণনা করিয়াছেন; তাঁহার আরাধ্যা দেবতা যে কৃষ্ণের মত সকল কার্য্যই করিতে পারেন, কালীকীর্ত্তন দ্বারা তিনি এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কালীর 'রাসলীলা' ও 'গোষ্ঠ'-বর্ণনা পড়িয়া

শাক্তমহাশয়গণ অবশ্যই প্রীত হইয়াছিলেন, কিন্তু আজুগোসাঞি এই মধুরভাবে একটু বিদ্রূপের অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের গাঢ় রসসম্ভোগে বাধা দিয়াছিলেন; যথা,—"না জানে পরম তত্ত্ব, কাঁঠালের আমসত্ত্ব, মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে। তা যদি হইত, যশোদা যাইত, গোপালে কি পাঠায় রে॥" স্ত্রীলোকের যদি গোষ্ঠে যাইতে বিধান থাকিত, তবে স্নেহাতুরা যশোদা গোপালের গোষ্ঠ-গমনে সম্মত না হইয়া নিজেই যাইতেন। 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই, যে দুই পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি মধুর।

প্রসাদী সংগীত।

কিন্তু রামপ্রসাদের যশঃ কাব্যরচনার জন্য নহে; তিনি গান রচনা করিয়া এক সময় বঙ্গদেশ মাতাইয়াছিলেন, তাহাতে কালীদেবী স্নেহময়ী মাতার ন্যায় চিত্রিত হইয়াছেন, কবি মা-সম্বল শিশুর ন্যায় মধুর গুন্ গুন্ স্বরে কখন তাঁহার সহিত কলহ করিতেছেন, কখনও মায়ের কর্ণে সুধামাখা স্নেহ-কথা বলিতেছেন; জননীর ক্ষিপ্ত ছেলের মত কখনও মাকে গালি দিতেছেন—সেই কপট গালি—স্নেহ, ভক্তি ও আত্মসমর্পণের কথা-মাখা,—এখানে রামপ্রসাদ সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন কবি নহেন, এখানে তাঁহার ধূলিধূসর নেংটা শিশুর বেশ,—শিশুর কথা, তাহা পণ্ডিত ও কৃষকের তুল্য-বোধগম্য; সেই সংগীতের সরল অশ্রুপূর্ণ আবদারে সাধক-কণ্ঠের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিশু যেমন মায়ের হাতে মা'র খাইয়া 'মা', 'মা', বলিয়া কাঁদিয়া মায়ের কোলে যাইতে চায়, রামপ্রসাদও সেইরূপ সাংসারিক দুঃখ কষ্ট সমস্ত মায়ের দান জানিয়াও 'মা', 'মা', বলিয়া কাঁদিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছেন, সেই নির্ভয়-মিষ্ট সকরুণ গীতিমালা অত্যধিক হৃদয়াবেগে চিরপবিত্র হইয়া রহিয়াছে। আমরা গীতিশাখায় এই গানের বিষয় আবার সংক্ষেপে আলোচনা করিব। রামপ্রসাদ তাঁহার বিদ্যাসুন্দরে লিখিয়াছেন,—"গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত।" তাঁহার রচিত কাব্য প্রকৃত পক্ষেই ভারতচন্দ্রীয় বিদ্যাসুন্দর দ্বারা পরাভূত হইয়া আজ ধূলায়

গড়াগড়ি যাইতেছে,—তিনি তাহা ফেলিয়া গানে ব্যস্ত হইয়াছিলেন, বঙ্গের লোকগণও কাব্য ফেলিয়া তাঁহার গানগুলি লইয়া ব্যস্ত হইয়াছিল,—
"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥"

ভারতচন্দ্র—১৭২২ খৃঃ।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর অনুমান ১৭১২ খৃঃ অব্দে ভুরসুট পরগণাস্থ হুগলীর অন্তর্গত পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ভুরসুটের জমিদার ছিলেন, তিনি রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। কথিত আছে, কোন ভূমি-সংক্রান্ত সীমানির্ণয়ের তর্ক উপলক্ষে নরেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীৰ্ত্তিচন্দ্রের মাতা মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। মহারাণী এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া আলমচন্দ্র ও ক্ষেমচন্দ্র নামক রাজপুত সেনাপতিদ্বয়কে নরেন্দ্রনারায়ণের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেন; তাহারা বহুসৈন্য লইয়া নরেন্দ্র রায়ের অধিকারস্থ 'ভবানীপুরগড়', ও 'পেঁড়োরগড়' প্রভৃতি স্থান বলপূর্ব্বক দখল করিয়া লয়।

নরেন্দ্র রায় ইহার পর অতি দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার মাতুলালয় 'নাওয়াপাড়া' গ্রামে যাইয়া তাজপুরস্থ টোলে কিছুকাল সংস্কৃত পড়িলেন এবং অবশেষে মণ্ডলঘাট পরগণার সারদাগ্রামে কেশরকুনি আচার্য্যদিগের বাড়ীর একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতা মাতা ও ভ্রাতৃগণ এই বিবাহে তাঁহার উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন, বিবাহের সময় তাঁহার ১৪ বৎসর মাত্র বয়স ছিল। গুরুজনকর্ত্তৃক তিরস্কৃত অভিমানী কবি গৃহত্যাগ করিয়া হুগলীর অন্তর্গত দেবানন্দপুরনিবাসী রামচন্দ্র মুন্সী নামক জনৈক ধনাঢ্য কায়স্থের শরণাপন্ন হন, তাঁহার আনুকুল্যে তিনি ফার্শি শিক্ষা করেন। এই মুন্সী মহাশয়ের বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজোপলক্ষে পঞ্চদশ বর্ষীয় কবি স্বকৃত 'সত্যপীরের কথা' পাঠ করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন; এই সময়

তিনি দুইখানি সত্যপীরের উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার এক-খানি চৌপদী ছন্দে রচিত হইয়াছিল ; এই পুঁথির শেষে সময় নির্দ্দেশ করা আছে,—"ব্রতকথা সাঙ্গ পায় সনে রুদ্র চৌগুণা।" অর্থাৎ ১১৪৪ সালে (১৭৩৭ খৃঃ)। ইহার পরে ভারতচন্দ্র পুনরায় বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন ; এবার তাঁহার পিতা-মাতা ও ভ্রাতৃগণ তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে নরেন্দ্র রায় পুনশ্চ বর্দ্ধমানাধিপতির নিকট হইতে কিছু জায়গা ইজারা লইয়াছিলেন, ভারতচন্দ্র রাজস্বাদি যথাসময়ে রাজ-সরকারে প্রদান করিতে উপদিষ্ট হইয়া বর্দ্ধমানে প্রেরিত হইলেন, কিন্তু তথায় আকস্মিক কোন গোলযোগে পড়িয়া কারারুদ্ধ হন। কারা হইতে কৌশলে উদ্ধার পাইয়া ভারতচন্দ্র শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন, তথায় শিবভট্ট নামক সুবাদারের অনুগ্রহে পাণ্ডাগণের কর হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বিনা মূল্যে প্রতিদিন এক একটি 'বলরামী আটকে' প্রাপ্ত হন। এই সময়ে তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্মে অনুরাগ জন্মিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে, কিন্তু তাঁহার লেখায় সেই অনুরাগ মধ্যে মধ্যে একটি ঈষদ্ব্যক্ত বিদ্রূপে পরিণত হইতে দেখা যায়,—"চল যাই নীলাচলে। খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুছিব হাত, নাচিব গাইব কুতূহলে॥" এই লেখায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ-তীর্থের প্রতি কবির বেশ একটু সম্ভ্রমপূর্ণ পরিহাস লক্ষিত হয়। যাহা হউক, কবি বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি এতদূর কৃপাপরবশ হইলেন যে, তিনি বৃন্দাবন যাইয়া বৈরাগী সাজা ঠিক করিলেন, পথে হুগলীস্থিত খানাকুল গ্রামে শ্যালীপতির বাড়ী, এই মহাশয় নবীন সন্ন্যাসীকে ফিরাইয়া আনিলেন ; অতঃপর বৃন্দাবনে না যাইয়া কবি শনৈঃ শনৈঃ পদব্রজে স্বীয় শ্বশুরবাড়ী সারদাগ্রামে উপস্থিত হইলেন। তিনি স্ত্রীর আদরে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না,—নিজের অভ্যস্ত ব্যঙ্গসহকারে একস্থলে লিখিয়াছেন—

"দুই স্ত্রী নহিলে নহে স্বামীর আদর। সে রসে বঞ্চিত রায় গুণাকর॥"

কিছুকাল শ্বশুরবাড়ীতে থাকিয়া ও তাঁহার স্ত্রীকে সেস্থান হইতে

নিজ বাটীতে পাঠাইতে নিষেধ করিয়া, কবি ফরাশডাঙ্গায় উপস্থিত হন; তথায় বিখ্যাত দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়া কতকদিন অতিবাহিত করেন। এই ব্যক্তি ভারতচন্দ্রকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে ৪০৲ টাকা বেতনে সভাকবি নিযুক্ত করেন। এই রাজসভায় তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভার বিকাশ পায় কিন্তু তাহা ব্যভিচারী হয়। চণ্ডীপূজার মাহাত্ম্য বর্ণনোপলক্ষে তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের পালা বিরচিত হয় এবং তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ কতকগুলি স্নিগ্ধমধুর শ্লেষাত্মক ধুয়াতে পরিণত হইয়া যায়। বৃন্দাবনপ্রত্যাগত কবি বিদ্যাসুন্দর রচনা আরম্ভ করেন, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে এই প্রসিদ্ধ পুস্তক শেষ হয়; ইতিমধ্যে রাজা কবিকে মূলাযোড়গ্রাম ইজারা দিয়া তাঁহার বাটী নির্ম্মাণ সম্বন্ধে আনুকূল্য করেন, কিন্তু সেইস্থান কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজকে শীঘ্রই বর্দ্ধমান রাজার কর্ম্মচারী রামদেব নাগের নিকট পত্তনি দিতে হয়। এই নাগমহাশয়ের অত্যাচার সহ্য করিয়া কবি অতি সুন্দর নাগাষ্টক রচনা করেন, এই সংস্কৃত কবিতাটির এক দিকে হাসি অপর দিকে কান্না,—উহা অম্ল মিষ্ট; কৃষ্ণচন্দ্র উহা পড়িয়া হাসি রাখিতে পারেন নাই এবং দয়াপরবশ হইয়া কবিকে আনরপুরের গুস্তেগ্রামে ১০৫/ বিঘা এবং মূলাযোড়ে ১৬/ বিঘা ভূমি নিষ্কর প্রদান করেন। ৪৮ বৎসর বয়সে ১৭৬০ খৃঃ অব্দে, পলাশী যুদ্ধের তিন বৎসর পরে, মহাকবি ভারতচন্দ্র বহুমূত্র রোগে প্রাণত্যাগ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ তাঁহার প্রিয় কবিকে "রায় গুণাকর" উপাধি দিয়াছিলেন।

অন্নদামঙ্গল।

রায় গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই অন্নদামঙ্গল তিনভাগে বিভক্ত; প্রথমভাগে দক্ষযজ্ঞ, শিববিবাহ, ব্যাসের কাশীনির্ম্মাণ, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, ভবানন্দের জন্ম বিবরণ প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে; দ্বিতীয় ভাগে বিদ্যাসুন্দর পালা, ও তৃতীয়ভাগে মানসিংহ কর্ত্তৃক

যশোর-বিজয়, ভবানন্দ মজুমদারের দিল্লী গমন, সম্রাট জাহাঙ্গীরের সহিত তর্ক, দিল্লীতে প্রেতাধিকার ও ভবানন্দ মজুমদারের দেশে প্রত্যাবর্ত্তন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। অন্নদামঙ্গল ছাড়া তিনি 'রসমঞ্জরী', অসম্পূর্ণ 'চণ্ডীনাটক', ও বহুসংখ্যক হিন্দী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

দেবচরিত্রের দুর্গতি।

আমরা ভারতচন্দ্রের কবিতা ভাবের গুরুত্ব হিসাবে অতি নিকৃষ্ট মনে করি। বিদ্যাসুন্দর সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি; অপরাপর কাব্যেও কবি জীবনের কোন গূঢ় সমস্যা কি কঠোর পরীক্ষা উদ্ঘাটন করিয়া উন্নত চরিত্রবল দেখান নাই। 'নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার' ন্যায় মহাযোগী মহাদেবকে ভারতচন্দ্র একটা বেদিয়ার মত চিত্রিত করিয়াছেন,—শিশুগুলি তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে,—"কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল। কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল॥ কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া। ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া॥" দেবাদিদেব মহাদেবের এই অবমাননা একজন শিবশক্তিউপাসক কবির যোগ্য হয় নাই। তারপর নারদ ঋষি কলহের দেবতা, ঢেঁকি বাহনে আসিয়া সাপের মন্ত্র বকিতেছেন, যে নারদের নাম শুকদেব ও প্রহ্লাদ হইতে উচ্চে, তাঁহার এই দুর্গতি দেখিয়া ভাগবতগণ কবিকে প্রশংসা করিবেন না। মেনকা উমার মা, ইনি বঙ্গের ঘরের আদর্শ জননী; যশোদা ও মেনকার অশ্রুপূর্ণ অপত্য স্নেহে বঙ্গের স্নেহাতুরা মাতৃগণের প্রাণের ব্যগ্রতা একটি নির্ম্মল ধর্ম্মভাবে উন্নীত হইয়াছে, ভারতচন্দ্রের হস্তে মেনকা-চিত্র কি বিকটরূপ ধারণ করিয়াছে দেখুন,—"ঘরে গিয়ে মহাক্রোধে ত্যজি লাজ ভয়। হাত নাড়ি গলা তাড়ি ডাক ছেড়ে কয়॥ ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদ অল্পেয়ে। হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে॥" যাহা হউক স্বর্গের উচ্চ আদর্শের সন্নিহিত না হইলেও ঘরের কতকগুলি দুঃখচিত্র এই সব দেববর্ণন উপলক্ষে চিত্রিত হইয়াছে; "উমার কেশ চামর ছটা।

তামার শলা বুড়ার জটা॥ উমার মুখ চাঁদের চূড়া। বুড়ার দাড়ী শণের নুড়া॥" কিংবা "আমার উমার দন্ত মুকুতা গঞ্জন। বায়ে নড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দশন॥" প্রভৃতি পাঠ করিলে মনে হয় দ্বিতীয়ার শশিকলার ন্যায় সুন্দরী কুমারীগণ সামাজিক অত্যাচারে শিথিলদন্ত বৃদ্ধ স্বামীর হাতে পড়িয়া যে বিসদৃশ খেলার অভিনয় করিত, কবির চক্ষে সেই চিত্রের পূর্ণভাব বিরাজ করিতেছিল, তাই তিনি শিব-প্রসঙ্গ আশ্রয় করিয়া সমাজের এক অধ্যায় উদ্ঘাটন করিয়াছেন। পিতা মাতা কিন্তু অর্থ পাইয়া অনেক সময় "বাঘ ছাল দিব্য বস্ত্র, দিব্য পৈতা ফণী" বলিয়া জরাগ্রস্ত বরে নব সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিতেন।

উপমার বাহুল্য।

কাব্য-সাহিত্যে উপমা একটি ইঙ্গিতের ন্যায়; উহাতে রূপের চিত্রখানি সুন্দর হইয়া উঠে, কিন্তু সুন্দর জিনিষ লইয়া বেশী নাড়া চাড়া করিলে সৌন্দর্য্যের হানি হয়; এজন্য উপমা যত অল্প কথায় ব্যক্ত হয়, ততই উহা সুন্দর হয়। সৌন্দর্য্য-সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া উহার প্রতি আভাসে ইঙ্গিত করিতে হয়; তাহাতে অসীম বিস্ময় জাগিয়া উঠে,—জলে নামিলে অনন্ত জলরাশির শোভা দর্শন ঘটে না, সম্মুখের কতকটা অংশে দৃষ্টি এবং গতি সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। উপমার আতিশয্য ভাল নহে, উহাতে চিত্রগুলি কুজ্ঝটিকা-পূর্ণ হইয়া পড়ে। বিদ্যার রূপ ব্যাখা করিতে যাইয়া ভারতচন্দ্র নিজের বিদ্যার ব্যাখা করিয়াছেন মাত্র, আমরা তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অন্নপূর্ণার রূপবর্ণনাও বাহুল্য দোষ-বর্জ্জিত নহে ঃ—

"কথায় পঞ্চমস্বর শিখিবার আশে।
দলে দলে কোকিল কোকিলা চারিপাশে॥
কঙ্কণ ঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার।
ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার॥
চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি।
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী॥"

দলে দলে কোকিল কোকিলা, ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমরী ভ্রমরী, এবং খঞ্জন খঞ্জনী কর্ত্তৃক অনুসৃতা দেবী শিক্ষয়িত্রীর পদে বরিত হইয়া এস্থানে

কি বিড়ম্বিত হন নাই ? বাল্মীকি রাবণের পুরীর নিদ্রিত সুন্দরীগণের প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—"ইমানি মুখপদ্মানি নিয়তং মত্তষট্পদাঃ। অম্বুজানীব ফুল্লানি প্রার্থয়ন্তি পুনঃ পুনঃ॥" এবং কালিদাস কর্ণান্তিকচর ভ্রমরকর্ত্তৃক উৎপীড়িত শকুন্তলার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, অল্প কথায় সেই চিত্রগুলি কেমন সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু "সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং" ভারতচন্দ্র সেই রাগের অতি-রঞ্জন চেষ্টা করিয়া ছবিগুলি বিবর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন।

গৃহস্থালীর এক অঙ্ক।

শিব-পার্ব্বতীর কলহের আরম্ভে,—"শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল। আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল॥" হইতে শ্রীশিবের পরাজয়-সূচক—"ভবানীর কটুভাষে, লজ্জা হৈল কৃত্তি-বাসে, ক্ষুধানলে কলেবর দহে॥ বেলা হৈল অতিরিক্ত, পিত্তে হৈল গলা তিক্ত, বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে॥", ইত্যাদিরূপ ব্যাপারটিতে দরিদ্র স্বামী ও পাকাগিন্নির নিত্য ঘরকন্নার অভিনয় শ্লেষ ও বিদ্রূপের বর্ণে ফলিয়া বড় সুন্দর হইয়াছে। এই ভাবের আরও অনেক দৃশ্য কবির তুলিতে উৎকৃষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়াছে; কিন্তু কোথাও ভাবের গুরুত্ব নাই, কোথাও কবি হৃদয় ছুঁইতে পারিতে-ছেন না; একখানি সুন্দর ছবি দেখিতে চক্ষুর যে তৃপ্তি, ভারতের কবিতা-পাঠে সেইরূপ তৃপ্তিলাভ সম্ভব, কিন্তু চিত্রকর হইতে কবির উচ্চতর প্রশংসা প্রাপ্য; চিত্রকরের চিত্র কবির মন্ত্রপূত তুলির স্পর্শে প্রাণ পায়, ভারতচন্দ্রের তুলি প্রাণ দান করিতে পারে নাই। তাঁহার কাব্যে কোন

বর্ণনা প্রাণহীন।

স্থানেই হৃদয়ের ব্যাকুলতা নাই, হৃদয়ের মর্ম্ম-স্পর্শী দুঃখ কি স্নিগ্ধ সুখধারা তাঁহার কাব্যের কোন অংশ পবিত্র করে নাই।

শব্দমন্ত্র।

কিন্তু বোধ হয় এই ভাবে ভারতের গুণবিচার করিলে তাঁহার প্রতি সুবিচার হইবে না। ভাব-যুগ গতে সাহিত্যে শব্দযুগ প্রবর্ত্তিত হওয়া স্বাভাবিক, ভারতচন্দ্রের ভাব বিচার না করিয়া ভাষা বিচার করিলে তাঁহাকে প্রাচীনকালের

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিতে হইবে। তাঁহার মত কথায় চিত্ত হরণ করিতে প্রাচীনকালের অন্য কোন কবি সমর্থ হন নাই। তিনি উৎকৃষ্ট শব্দ-কবি। এই শব্দমন্ত্র কি পদার্থ তাহা নিম্নোদ্ধৃত পদগুলি পাঠে প্রতিপন্ন হইবে; 'ম'-কার, 'ল'-কার প্রভৃতি কোমল অক্ষর দ্বারা যে যাদু প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা শ্রুতির অমৃত, তাহা পক্ষীর কাকলীর ন্যায় স্থান বিশেষে অর্থশূন্য হইয়াও চিত্তবিনোদনে সমর্থ,—

(১) "কল কোকিল, অলিকুল বকুল ফুলে। বসিলা অন্নপূর্ণা মণিদেউলে॥ কমল পরিমল, লয়ে শীতল জল, পবনে ঢল ঢল, উছলে কূলে। বসন্তরাজা আনি, ছয় রাগিণী রাণী, করিলা রাজধানী অশোক মূলে॥ কুসুমে পুনঃপুনঃ, ভ্রমর গুনগুন, মদন দিলা গুণ ধনুক হুলে॥ যতেক উপবন, কুসুমে সুশোভন, মধু মুদিত মন ভারত ভুলে॥"—অন্নদামঙ্গল।

(২) "শুনলো মালিনী কি তোর রীতি। কিঞ্চিৎ হৃদয়ে না হয় ভীতি॥ এত বেলা হৈল পূজা না করি। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি॥ বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে। কালি শিখাইব মায়ের আগে॥ বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট। রাঁড় হৈয়ে যেন ষাঁড়ের নাট॥ রাত্রে ছিল বুঝি বঁধুর ধুম। এতক্ষণে তেঁই ভাঙ্গিল ঘুম॥ দেখ দেখি চেয়ে কতেক বেলা। মেয়ে পেয়ে বুঝি করিস্ হেলা॥ কি করিবে তোরে আমার গালি। বাপারে বলিয়া শিখাব কালি। হীরা থর থর কাঁপিছে ডরে॥ ঝর ঝর জল নয়নে ঝরে॥ কাঁদি কহে শুন রাজকুমারী। ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি॥ চিকণ গাঁথনে বাড়িল বেলা। তোমার কাজে কি আমার হেলা॥ বুঝিতে নারিনু বিধির ধন্দ। করিনু ভালরে হইল মন্দ। ভ্রম বাড়িবারে করিনু শ্রম। শ্রম বৃথা হৈল ঘটিল ভ্রম॥ বিনয়েতে বিদ্যা হৈল বশ। অস্ত গেল রোষ উদয় রস॥ বিদ্যা কহে দেখি চিকণ হার। এ গাঁথনি আই নহে তোমার॥ পুনঃ কি যৌবন ফিরে আইল। কিবা কোন বঁধু শিখায়ে গেল॥ হীরা কহে তিতি আঁখির নীরে। যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে॥"—বিদ্যাসুন্দর।

(৩) "জয় কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব, কংসদানব-ঘাতন। জয় পদ্মলোচন, নন্দনন্দন, কুঞ্জকানন-রঞ্জন॥ জয় কেশিমর্দ্দন, কৈটভার্দ্দন, গোপিকাগণ-মোহন॥ জয় গোপবালক, বৎসপালক, পূতনা-বক-নাশন॥"—অন্নদামঙ্গল।

শেষ পদটিতে ও তদ্রূপ অপরাপর বহুপদে দেখা যাইবে, ভারতচন্দ্রের

রচনায় সংস্কৃত ও বাঙ্গালার হরগৌরীমিলন হইয়া গিয়াছে। এই পরিণয় ঘটাইতে তিনি রামপ্রসাদের ন্যায় গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া পড়েন নাই; হাসিয়া খেলিয়া যাহা করিয়াছেন, রামপ্রসাদ এত পরিশ্রম করিয়াও তাহা পারেন নাই। ভারতচন্দ্রের লিপিচাতুর্য্যের গুণ এই, তাহাতে শ্রমজনিত একটি স্বেদবিন্দুও পাঠকের নেত্রগোচর হইবে না, শিশুর হাসি ও পাখীর ডাকের ন্যায় তাহা আয়াস ও আড়ম্বরশূন্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণনাগুলির মধ্যে স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল প্রতিভা ফুটিয়া ছোট ছোট ঘটনা ও চরিত্র, চিত্রের ন্যায় সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। ব্যাসের কাশী নির্ম্মাণ, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, মানসিংহের সৈন্যে ঝড় বৃষ্টি, ভবানন্দ মজুমদারের উপাখ্যান, তাঁহার দুই স্ত্রীর স্বামী লইয়া দ্বন্দ্ব—এই সমস্ত ছোট ছোট বিষয় পরিহাসরসে মধুর ও আমোদকর হইয়াছে। স্থানে স্থানে শুধু ছন্দ ও শব্দের ঐশ্বর্য্যে কোন মহামহিমান্বিত মূর্ত্তির অপূর্ব্ব অবতারণা হইয়াছে; নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিনিচয়ে মহাদেবের যে ভৈরব সুন্দর চিত্রখানি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা কাব্য-সাহিত্যে শীর্ষদেশে স্থান পাইবার যোগ্য—ইহাতে কবির ভাষা ও ছন্দের উপর আশ্চর্য্য অধিকার প্রতিপন্ন হইতেছে;—

"মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥
ফণাফণ ফণাফণ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধকধ্বক ধকধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ মহাশব্দ গালে॥

* * * *

ধিয়া তাধিয়া তাধিয়া ভূত নাচে।
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে॥

* * * *

অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে॥

ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥"

ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিতে যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে—"ছলচ্ছল, টলট্টল, কলকল তরঙ্গা" এই ছত্রে তরঙ্গের তিনটি গুণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, "ছলচ্ছল"—জলের প্রবাহব্যঞ্জক, "টলট্টল"—জলের নির্ম্মলতাব্যঞ্জক, 'কলকল'—জলের নিক্কণব্যঞ্জক,—গঙ্গাতরঙ্গের এরূপ সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর বর্ণনা বোধ হয় আর কোন কবি দিতে পারেন নাই।

এই শব্দ ও ছন্দের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া জনৈক সমালোচক ভারতচন্দ্রের কাব্যগুলিকে "ভাষার তাজমহল" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান।

এস্থলে বলা উচিত বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বররুচিকৃত কাব্যে উজ্জয়িনী নগরে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে; কৃষ্ণরামও ঘটনা-স্থান বর্দ্ধমান বলিয়া বর্ণন করেন নাই। রামপ্রসাদ বীরসিংহকে বর্দ্ধমানের রাজা করিয়াছেন, তৎপথাবলম্বী ভারতচন্দ্রও বর্দ্ধমান স্থির রাখিয়াছেন, এই স্থান নির্দ্দেশে প্রতারিত হইয়া কেহ কেহ এখনও সুড়ঙ্গ দেখিতে বর্দ্ধমান ভ্রমণ করেন। বর্দ্ধমানে বিদ্যার সুড়ঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে বিদ্যাসুন্দরের প্রবাদ দেশে প্রচলিত থাকা সম্ভব। আমরা প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে কবি আলওয়ালকে এই সুড়ঙ্গের বিষয় উল্লেখ করিতে দেখিতেছি; যথা 'ছয়ফলমুল্লুক ও বদিউজ্জমাল' পুস্তকে—"বিদ্যার সুরঙ্গ আদি সিন্ধু জগন্নাথ নদী, একে একে সব বিচারিল।"—এস্থলে বর্দ্ধমানের উল্লেখ নাই। বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের মূল ঘটনা ঠিক থাকিলেও কবিগণের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে অনৈক্য আছে, কৃষ্ণরাম মালিনীকে 'বিমলা' নামে অভিহিত করিয়াছেন,—সুন্দরের বীরসিংহ নগরীতে প্রবেশ সম্বন্ধেও তাঁহার গল্প একটু স্বতন্ত্র রকমের; রামপ্রসাদ 'বিদ্যাব্রাহ্মণী' নামক একটি নব চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন ও চোরধরা উপলক্ষে ভারতচন্দ্রের মত উপায় বর্ণন

করেন নাই। যাহা হউক, এরূপ পার্থক্য অতি সামান্য, মূল গল্পটি এক-রূপ। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ডিউসাহীর নীলমণি কণ্ঠাভরণ গায়েন-কর্ত্তৃক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সর্ব্ব প্রথম গীত হয়। ভারতচন্দ্রের পরে প্রাণারাম চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক কবি বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন,—এই ব্যক্তি পাগলের ন্যায় নদীর তীরে বসিয়া কূপ খনন করিয়াছিলেন।

ছোট কবিতা।

ভারতচন্দ্রের ছোট ছোট কবিতাগুলির সর্ব্বত্রই কথার বাঁধুনি প্রশংসনীয় ও পদ মধুমাখা; 'অনুকূল'শীর্ষক ক্ষুদ্র কবিতাটি তুলিয়া দেখাইতেছি, ইহা তাঁহার রসমঞ্জরীতে পাওয়া যাইবে,—"ওলো ধনি প্রাণধন, শুন মোর নিবেদন, সরোবরে স্নান হেতু যেওনালো যেওনা। যদ্যপি বা যাও ভুলে, অঙ্গুলে ঘোমটা তুলে, কমল কানন পানে চেওনালো চেওনা॥ মরাল মৃণাল লোভে, ভ্রমর কমল ক্ষোভে, নিকটে আইলে ভয় পেওনালো পেও না। তোমা বিনে নাহি কেহ, ঘামে পাছে গলে দেহ, বায় পাছে ভাঙ্গে কটি যেওনালো যেওনা॥"

সাহিত্যের বিকৃত আদর্শ।

এই বিকৃতরুচি ও পদলালিত্য কাব্য-সাহিত্যের আদর্শ হইল। গীতি-কবিতারও একাংশ ব্যাপিয়া বিদ্যাসুন্দরের পালা স্থান পাইয়াছে, আমরা যথাস্থলে তাহা আলোচনা করিব। কিন্তু এই সময়ের যতগুলি বড় কাব্য পাওয়া যায়, তাহার একখানিতে ভিন্ন নির্ম্মলভাব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই সাধারণ নিয়ম-বহির্ভূত, স্বীয় পবিত্রতা গৌরবে স্বতন্ত্র, কঠোর বিষয়-অনুসন্ধিৎসু কাব্যের নাম—"মায়াতিমিরচন্দ্রিকা"; এই পুস্তকখানি ক্ষুদ্র, কিন্তু সমাদরের যোগ্য, আমরা পরে ইহার সম্বন্ধে কিছু লিখিব। ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দরের আদর্শে যে কয়েক খানা কাব্য লিখিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে "চন্দ্রকান্ত", কালীকৃষ্ণ দাসের "কামিনীকুমার" এবং রসিকচন্দ্র রায়ের "জীবনতারা" এই কাব্যত্রয় লোকরুচির উপর বহুদিন দৌরাত্ম্য করিয়া-ছিল। এই কাব্যগুলির ভাষা খুব মার্জ্জিত, কিন্তু রচনা এত অশ্লীল যে

উহা পাঠে স্বয়ং ভারতচন্দ্রও লজ্জিত হইতেন। শুধু কঠোর সমালোচনা করিয়া নিবৃত্ত হইলে উক্ত কাব্যলেখকগণের যথোচিত শাস্তি হয় না, তাঁহারা নৈতিক আদালতের বেত্রাঘাতযোগ্য। এই তিনখানি কাব্যেই কালীনামের মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তিত আছে; কালীনামের সঙ্গে সংস্রব হেতু আমাদিগের বৃদ্ধগণ এই সব পুস্তকের শৃঙ্গাররসের মধ্যেও আধ্যাত্মিকত্ব দেখিয়াছেন, এবং প্রণিপাতপুরঃসর নিষ্কাম ধৰ্ম্ম-পিপাসার সহিত উপাখ্যানভাগ পাঠ করিয়াছেন। দেবদেবীগণ যখন এই ভাবে পাপের আবরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে মহাপুরুষ রামমোহনের আগমনের সময় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। বর্ণিত নারীচরিত্রগুলিতে হীন প্রবৃত্তির অসভ্য উল্লাস দৃষ্ট হয়। ফুল্লরা, খুল্লনা ও বেহুলার ন্যায় দুঃখসহনক্ষমা পতিপ্রাণা সুন্দরীগণ সাহিত্য-ক্ষেত্রে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিলেন। সহমরণ-প্রথা নিবারণার্থ আইন করা প্রয়োজন কেন হইল তাহা সাহিত্যে আংশিক দৃষ্ট হইবে, কারণ সাহিত্যেই সমাজ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। প্রায় একশত বৎসর হইল, ‘কামিনী কুমার,’ ‘চন্দ্রকান্ত’ ও ‘জীবনতারা’ রচিত হইয়াছিল; এই গুলি জাতীয় অধোগতির শেষ চিহ্ন। কবি ‘উইচারলীর’ নাম করিতে ইংরেজগণ যেরূপ লজ্জা বোধ করেন, এইসব কাব্যপ্রণেতৃগণের নাম করিতে আমাদের তেমনই লজ্জা হয়। কিন্তু ইঁহারা মধ্যে মধ্যে ভারতচন্দ্র অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, আমরা সেই ছাঁচে ঢালা ভাষার কিছু নমুনা দেখাইয়া ক্ষান্ত হইব। বসন্ত-আগমন,—

“হিমান্ত হইল পরে বসন্ত রাজন। দলবল লৈয়া আইল করিতে শাসন॥ প্রথমে সংবাদ দিতে পাঠাইল দূত। আজ্ঞামাত্র চলিলেক মলয়া মারুত॥ বায়ু মুখে শুনি বসন্তের আগমন। সুসজ্জা করিল যত পুষ্প সেনাগণ॥ কেতকী করাত করে করিয়া ধারণ। দন্তে দাঁড়াইল হৈয়া প্রফুল্ল বদন॥ শূলহস্তে করি শীঘ্র সাজিল চম্পক। অৰ্দ্ধচন্দ্র বাণ ধরি ধাইলেক বক॥ গোলাব সেউতি পুষ্প সেনার প্রধান। প্রস্ফুটিত হৈয়া দোহে হৈল আগুয়ান॥ গন্ধরাজ ধাইলেক পরি শ্বেতবস্ত্র। ওড় জবা ধাইলেক

ধরি তীক্ষ্ণ অস্ত্র॥ মল্লিকা মালতী জাঁতি কামিনী বকুল। কুন্দ আদি সাজে তারা যুদ্ধেতে অতুল॥ পলাশ ধনুক হস্তে ধরিয়া দাঁড়ায়। রঙ্গন তাহার বাণ হেন অভিপ্রায়॥ সরোরুহ ঢাল হয়ে ভাসিল জীবনে। এইরূপে সজ্জা কৈল পুষ্প সেনাগণে॥ মলয়ার মুখে শুনি রাজ আগমন। অগ্রগণ্য সেনাপতি সাজিল মদন॥ শরাসনে সন্ধান করিয়া পঞ্চশর॥ বিরহী নাশিতে বীর চলিল সত্বর॥ কোকিল ভ্রমরে ডাকি কহিল মদন। দেখ রাজ্যে বিরহিণী আছে কোন জন॥ প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া দেহ সমাচার। শীঘ্রগতি কর দিতে বসন্ত রাজার॥ বিশেষ রাজার আজ্ঞা কর অবধান। যে না দেয় কর তার বধহ পরাণ॥ আজ্ঞা পেয়ে দুই সেনা করিল গমন। রমণী মণ্ডলে আসি দিল দরশন॥ প্রথমে কোকিল গিয়া বসি বৃক্ষোপরে। রাজ আজ্ঞা জানাইল নিজ কুহুস্বরে। পতি সঙ্গে রঙ্গে ছিল যতেক যুবতী। শব্দ শুনি কর তারা দিল শীঘ্রগতি॥ প্রথমে চুম্বন দিল প্রণামি রাজার। হাস্য পরিহাস দিল বাজে জমা আর॥"—কালীকৃষ্ণ দাসের কামিনীকুমার।

মধ্যে মধ্যে অশ্লীলতার জন্য বাকী অংশের অনেক স্থল বিশেষ সুন্দর হইলেও উঠাইতে পারিলাম না। বসন্তরাজার রাজধানীর একটী সমগ্র সুন্দর চিত্রপট প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে রাজগণের অধিকারে শাসন ও কর-আদায়ের জন্য যে সব কৌশল অবলম্বিত হয়, তাহার কিছু বাদ পড়ে নাই। কবির হস্ত বেশ নিপুণ; সুসঙ্গতভাবে হউক, অসঙ্গতভাবে হউক, তাহা পরিপক্ক হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহার ইতর জন্তুর ন্যায় প্রবৃত্তির উদ্রেক দৃষ্টে তাহাকে ন্যায্য প্রশংসাটুকু দিতেও ইচ্ছা হয় না। অপর দুইখানি কাব্যসম্বন্ধেও এই সমালোচনা অনেকাংশে প্রযুক্ত হইতে পারে।

কিন্তু বিদ্যাসুন্দরাদি কাব্য ও আলওয়াল কবির পদ্মাবতী ছাড়া বঙ্গদেশের এক প্রান্তে আর তিনখানি কাব্য রচিত হইয়াছিল। ইহাদের রচকগণ বিক্রমপুরবাসী ও একপরিবারভুক্ত। জয়নারায়ণ সেন ও তাঁহার বিদুষী-ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ী দেবী উভয়ে মিলিয়া ১৭৭২ খৃঃ অব্দে 'হরিলীলা' নামক কাব্য রচনা করেন; ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রচনার ২০ বৎসর পরে এই কাব্য রচিত হয়। এই কাব্য রচনার পূর্ব্বে রামগতি সেন

তিনখানি গ্রন্থ।

'মায়াতিমিরচন্দ্রিকা' রচনা করিয়াছিলেন, ও পূর্ব্বোক্ত দুই কাব্যের রচনার পরে জয়নারায়ণকর্ত্তৃক 'চণ্ডীকাব্য' প্রণীত হয়। এই মনস্বী পরিবার বিশেষরূপে শিক্ষিত ছিলেন, তাঁহাদের কাব্যগুলিতে সেই পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। ইঁহাদের ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে।

রামগতি ও জয়নারায়ণ।

বৈদ্যকুলোদ্ভব বেদগর্ভ সেন পাঠাভ্যাস জন্য নিবাসভূমি যশোর ইত্নাগ্রাম হইতে বিক্রমপুর আগমন করিয়াছিলেন। তিনি বিলদায়িনীয়া (রাজনগর), জপ্সা, ভোজেশ্বর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামের ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া বিলদায়িনীয়াতে নিবাস স্থাপন করেন। সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ এই বেদগর্ভ সেনের অধস্তন ষষ্ঠ-পুরুষ। যে শাখায় রাজবল্লভ জন্মগ্রহণ করেন, তাহার জ্যেষ্ঠ শাখায় উৎপন্ন এবং বেদগর্ভের পঞ্চমস্থানীয় গোপীরমণ সেন এবং তদ্বংশীয় হরনাথ রায়ের নাম মেঃ বেভারিজ্ সাহেবের বাখরগঞ্জের ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। গোপীরমণের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণরাম "দেওয়ান" ও তৃতীয় পুত্র রামমোহন "ক্রোড়ী" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফিপ্থ্ রিপোর্টে দেখা যায়, তাঁহারা চাঁদপ্রতাপ প্রভৃতি পরগণার রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত ছিলেন; কৃষ্ণরাম দেওয়ানের দ্বিতীয় পুত্র "লালা রামপ্রসাদ" বিক্রমপুরের সেই সময়ের অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। লালা রামপ্রসাদের স্ত্রী সুমতিদেবী অতি গুণবতী ছিলেন। ইঁহাদের পাঁচটি পুত্র জন্মিয়াছিল—১ম, লালা রামগতি, ২য়, লালা জয়নারায়ণ, ৩য়, লালা কীর্ত্তিনারায়ণ, ৪র্থ, লালা রাজনারায়ণ ও ৫ম, লালা নরনারায়ণ। রামগতি বাঙ্গালা ভাষায় "মায়াতিমিরচন্দ্রিকা" ও সংস্কৃতে "যোগকল্পলতিকা" প্রণয়ন করেন। জয়নারায়ণ "চণ্ডীকাব্য" ও "হরিলীলা" নামক বাঙ্গালা কাব্য রচনা করেন; রামগতি সেনের কন্যা আনন্দময়ী দেবী 'হরিলীলা' প্রণয়নে তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ

করিয়াছি। রাজনারায়ণ 'পার্ব্বতীপরিণয়' নামক সংস্কৃত কাব্য প্রণেতা, এই পুস্তক আমরা পাই নাই।

সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ রামগতি সেন ৫০ বৎসর অতিক্রান্তে ধর্ম্মব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি যোগানুশীলন জন্য প্রথমে কলিকাতা কালীঘাটে ও পরে কাশীধামে অবস্থিতি করেন। ৯০ বৎসর বয়ঃক্রমে কাশীর মহাশ্মশানে তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হয়; চিরানুগতা সহধর্ম্মিণী সেই সঙ্গে অনুমৃতা হন। বাল্যকালে যে সব ভাবের লীলা চতুর্দ্দিকে লক্ষিত হয়, অজ্ঞাতসারে তাহা চিরকালের জন্য কোমল অন্তঃকরণে মুদ্রিত হইয়া যায়। রামগতি সেন শৈশবে তাঁহার খুল্লপিতামহ রঘুনন্দনের বাগানে আম চুরি করিয়া খাইতেন, একদিন ভৎর্সিত হইয়া রামগতি আবদার করিয়া বলিয়াছিলেন, "দাদা মহাশয়, এখন আমগুলি আমরাই খাই, তুমি কাশী যাও।" কিন্তু সেই শিশুর আবদারময় উক্তি বৃদ্ধের পক্ষে শাস্ত্রের ন্যায় কার্য্যকরী হইল, রঘুনন্দন এই কথা শুনিয়া নিরুত্তর রহিলেন; পরদিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল, গেরুয়া পরিয়া বৃদ্ধ রঘুনন্দন প্রফুল্ল মুখে কাশী যাত্রা করিয়াছেন। খুল্লপিতামহের এই গেরুয়া-পরা দেবমূর্ত্তি বালক রামগতির মনে চিরজীবন অঙ্কিত হইয়া রহিল; তিনিও সর্ব্বদা বিষয়নিস্পৃহ সন্ন্যাসীর ন্যায় সংসারাশ্রমের কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। কনিষ্ঠ জয়নারায়ণের প্রকৃতি বড় উচ্ছৃঙ্খল ছিল। তৎকালে তিনি ব্যবস্থাশাস্ত্রানুসারে।/১॥// অংশের মালিক ছিলেন, কিন্তু তিনি সমস্ত সম্পত্তির ॥০ আনা হিস্যা কলিকাতানিবাসী মাণিক বসুর নিকট বিক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত হন। তচ্ছ্রবণে তাঁহার কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ বলিলেন, তিনি তাঁহার অংশ হইতে সূচ্যগ্র ভূমিও ছাড়িয়া দিবেন না। অবিবেচক ও অসংস্থিতচিত্ত কবি-জয়নারায়ন প্রতিজ্ঞাভঙ্গে মর্ম্মাহত হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন, তদ্দর্শনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামগতি কনিষ্ঠকে সম্মত করিয়া ভ্রাতৃপ্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য ॥০ আনা অংশ বিক্রয় করিয়াছিলেন।

সেনহাটী, পয়গ্রাম, মূলঘর, জপ্‌সা প্রভৃতি স্থানে রামগতি সেনের বিদুষী কন্যা আনন্দময়ীর খ্যাতি শুনা যায়। পয়গ্রামনিবাসী প্রভাকরবংশীয় রূপরাম-

আনন্দময়ী; তাঁহার পাণ্ডিত্য।

কবিভূষণের পুত্র অযোধ্যারাম সেনের সঙ্গে ১৭৬১ খৃঃ অব্দে ৯ম বর্ষ বয়সে আনন্দময়ীর পরিণয় হয়। লালারামপ্রসাদ পৌত্রী ও তাঁহার পতিকে যে বৃত্তি প্রদান করেন, তাহা কৌতুকচ্ছলে "আনন্দীরামসেন" বলিয়া অভিহিত হয়; পতি-পত্নীর নামের যোগে এই অদ্ভুত সঙ্কর নামের উদ্ভব হয়। অযোধ্যারাম সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পত্নীর বিদ্যার খ্যাতি তাঁহার যশঃ লোপ করিয়াছিল। রাজনগর-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেববিদ্যাবাগীশের পুত্র হরি বিদ্যালঙ্কার আনন্দময়ীকে একখানি সংস্কৃত শিবপূজাপদ্ধতি লিখিয়া দেন, তাহার মাঝে মাঝে অশুদ্ধি থাকাতে তিনি বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে পুত্রের অধ্যয়ন সম্বন্ধে অমনোযোগী বলিয়া তিরস্কার করেন। রাজবল্লভ 'অগ্নিষ্টোম' যজ্ঞের প্রমাণ ও যজ্ঞকুণ্ডের প্রতিকৃতি চাহিয়া রামগতি সেনের নিকট পত্র লিখেন, রামগতি সেই সময় পূজায় ব্যাপৃত থাকায় আনন্দময়ী সেই প্রমাণ ও প্রতিকৃতি স্বহস্তে লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—"সকলেই তাহা বিশ্বাস করিলেন, কারণ আনন্দময়ীর বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে সে সময়ে কাহারও অবিদিত ছিল না, বিশেষতঃ সভাস্থ পণ্ডিত কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ আনন্দময়ীর অধ্যাপক ছিলেন।" আনন্দময়ীর রচনা হইতে আমরা যে সব অংশ উদ্ধৃত করিব, তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে পাঠকগণের অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ থাকিবে না।

রামগতিসেনের 'মায়াতিমিরচন্দ্রিকা' ধর্ম্মের রূপক; উহা সংস্কৃত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র পথাবলম্বী। সংসারে মন ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্ধ হইয়া সত্য কি বস্তু, বুঝিতে

মায়াতিমিরচন্দ্রিকা।

পারে না,—পথহারা হইয়া নানা কল্পনা জল্পনার স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়,

বিবেক ও আত্মজ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে ধীরে ধীরে চিত্তে বোধের উদয় হয়; তখন কি করিতে যাইয়া কি করিয়াছি, মণি ভাবিয়া লোষ্ট্রখণ্ড আদর করিয়াছি, যাহার জন্য ভবে জন্ম—সেই লক্ষ্য স্থির না রাখিয়া ভূতের বেগার খাটিয়াছি,—এই সব তত্ত্ব অনুশোচনার অশ্রুতে পবিত্র হইয়া চিত্তে প্রকটিত হয়,—তখন বানিয়ানের তীর্থযাত্রীর ন্যায় মন এই রাজ্য ছাড়িয়া তত্ত্বপথে প্রবিষ্ট হয়। তৎপর উদাসীনের কথা, যোগ কিরূপে হয়, তাহার নানারূপ কূটব্যাখ্যা, সেই সব শব্দের প্রহেলিকা ভেদ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারি, আমাদের এরূপ শক্তি নাই,—আমরা সে ভাবের ভাবুক নহি। যোগের অবস্থা বর্ণন করিতে যাইয়া কবি গোরক্ষ-সংহিতা প্রভৃতি পুস্তক হইতে অনেক দুর্ব্বোধ্য শ্লোক তুলিয়া দিয়াছেন। কবি—"পঞ্চাশ বৎসর বৃথা গেল বয়ঃকাল। কাটিতে না পারিলাম মহামায়াজাল॥" বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন, মনুষ্যের শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া সহানুভূতি ও ভয়কম্পিতকণ্ঠে লিখিয়াছেন,—"ভ্রমের তুরঙ্গে জীব করি আরোহণ। মায়ামৃগ লোভে সদা করেন ভ্রমণ॥" তৎপর ক্ষণস্থায়ী জীবনের কথা, তন্মধ্যে ক্ষণভঙ্গুর যৌবনের মদগর্ব্ব স্মরণ করিয়া কবি কাতরভাবে লিখিয়াছেন, "যৌবন কুসুম সম প্রভাতে বিলীন।" এই অনিত্য জীবনে মায়ামুগ্ধ মনুষ্যের অবস্থা অতি বিষম, একদা সুপ্রভাতে মনের মায়াপাশ কাটিয়া গেল, তখন নিজের অবস্থাটি সম্পূর্ণভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে মনের শক্তি জন্মিল, কবি রূপকচ্ছলে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"কোপে অতি শীঘ্রগতি মন চলি যায়। যথা বসে নানারসে সদা জীব ধায়॥ তনু যার সুবিস্তার দিব্য রাজধানী। হৃদি তারি রমাপুরী তথায় আপনি॥ অহঙ্কার হয় যার মোহের কিরীটী। দম্ভপাটে বৈসে ঠাঠে করি পরিপাটী॥ পুষ্পচাপ উগ্রতাপ লোভ অনিবার। দুই মিত্র সুচরিত্র বান্ধব রাজার॥ শান্তি, ধৃতি, ক্ষমা, নীতি, শুভশীলা নারী। মান করি রাজপুরী নাহি যায় চারি॥ পতিব্রতা ধর্ম্মরতা অবিদ্যা মহিষী। পতি কাছে সদা আছে রাজার হিতৈষী॥ নারী সঙ্গে রতি রঙ্গে রসের তরঙ্গে। এইরূপে কামকূপে জীব আছে রঙ্গে॥"

আমাদের প্রত্যেকের এক একটী রাজত্ব আছে, এই শরীরের বিদ্রোহী প্রবৃত্তিদিগকে শাসন করিয়া শিষ্টবৃত্তিগুলিকে পালন করার জন্য আমাদের দায়িত্ব আছে, তাহা আমাদের দ্বারা সুনির্ব্বাহিত হয় না; কবি পরিষ্কার একটি রূপক দ্বারা মনুষ্যের অবস্থা প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন, এই প্রতিবিম্ব ক্রমশঃ আরও পরিস্ফুট হইয়াছে,—তৎপর যোগের পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। সংস্কৃতকাব্যের ভাবে অধ্যায়গুলির উপসংহার করা হইয়াছে, যথা "ইতি মায়াতিমিরচন্দ্রিকায়াং জীবচৈতন্যপ্রসঙ্গে দ্বিতীয় কলা নাম দ্বিতীয়োল্লাসঃ॥"

যে সময় দেশ ব্যাপিয়া বিদ্যাসুন্দরের পালার গান, পচা আদিরসের গন্ধ হেতু যে সময়ের কাব্যগুলি ছুঁইতেও ঘৃণা হয়, সেই সময় জপ্‌সাপল্লীর এই প্রবৃত্তি-সংযম সম্বন্ধে কঠোর উপদেশগুলি সাহিত্যের বিবেকবাণীর ন্যায় উপলব্ধি হয়।

চণ্ডীকাব্য।

রামগতি সেন চক্ষু মুদিত করিয়া যে গৃহে যোগাভ্যাসে নিরত ছিলেন, সেই গৃহের এক প্রান্তে জয়নারায়ণ কল্পনার পুষ্পরথারোহণে আদিরসের রাজ্যে ঘুরিতেছিলেন; ইনি ভারতচন্দ্রের শিষ্য; ছন্দগুলি ইঁহার করায়ত্ত; নানারূপ ছন্দের সীমাবদ্ধ মণ্ডলীর মধ্যে কবিতা সুন্দরী আদিরসদুষ্ট হইয়া ইঁহার মনস্তুষ্টি করিতেছিলেন, কিন্তু ইঁহার লেখনী ভারতচন্দ্রের লেখনী হইতে কতকটা সংযত। জয়নারায়ণের চণ্ডীকাব্যের প্রথম ভাগে শিববিবাহাদি ব্যাপার, এইস্থলে শিষ্য গুরুর ছবির উপর তুলি ধরিতে সাহসী; ইহাতে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, বলা যায় না, কিন্তু তাঁহার সাহস ধৃষ্টতা নামে বাচ্য হইবার যোগ্য নহে। মহাদেবের যোগ ভঙ্গ করিতে ঋতুরাজ আসিয়াছেন কামদেব সেনাপতি। কবির বর্ণনা এইরূপ;—

"মহেশ করিতে জয় রতিপতি সাজিল। দামামা ভ্রমররব সঘনে বাজিল॥ নব

কিশলয়েতে পতাকা দশ দিশেতে। উড়িল কোকিল সেনা সব চারি পাশেতে॥ ত্রিগুণ পবন হয় যোগ গতি বেগেতে। ফুলধনু পিঠে, ফুলশর করপরেতে॥ ভ্রমাইয়া ভাঙ্গে আড় হেরি আঁখি কোণেতে। কুসুমের কবচ হাতে কিরীট সাজে শিরেতে॥ বামবাহু রতি গলে, রতিবাহু গলেতে। ভুবন মোহন কর হর মন মোহিতে॥ বায়ুবেগে সকলে উত্তরে হিমগিরিতে। আগমন মদন সকল ঋতু সহিতে॥ কুসুমে প্রকাশ গিরি বন উপবনেতে। নানা ফুল ফুটিল ছুটিল রব পিকেতে॥ ছুটিল মানিনী মান, লাগিল ধ্বনি কাণেতে। মৃত তরু জীবিত নবীন ফুল পাতেতে॥ থরথর কেতকী কাঁপিছে মৃদুবাতেতে অকালে অশোক ফোটে সেফালিকা-দিনেতে॥ ললিত মালতী ফোটে যুথিকার ডালেতে। বকুল কদম্ব নাগকেশরের পরেতে॥ মধুকর রব বলি ডাকে মন মদেতে। কুহরিছে কোকিলসমূহ পাঁচ শরেতে॥ নব লতা মাধবীর নতশির ভুমেতে। পলাশ টগর বেল নত ফুলভরেতে॥"

ইহার পর পশু পক্ষীর ক্রীড়ার একটি পূর্ণ আবেশময় চিত্র দেওয়া হইয়াছে,—তাহাতে অশ্লীলতার একটু গন্ধ আছে, এজন্য উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম, কিন্তু তাহা এত সুন্দর যে আমাদের ইচ্ছা হইয়াছিল সেই অশ্লীলতাটুকু মুছিয়া ফেলিয়া কবির কবিত্ব-শক্তি দেখাই; ভাবাবেশে হরিণী শূকরের সঙ্গে যাইয়া মিলিল, শূকরী হরিণের সঙ্গে খেলিতে লাগিল; স্বীয় শরপ্রভাবে এই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়া—

"ঢর ঢর রসেতে মোহন বাণ হাতেতে। সকলের ভাব দেখি মনে মনে হাসিতে॥"—

কামদেব শিবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু কবি মহিমান্বিত শিব-মূর্ত্তিটিকে ভাঙ্গিয়া একটি সুন্দর পুতুল গড়িয়াছেন; তিনি কালিদাসের স্পষ্ট অনুকরণ করিয়াও সেই শিবের মহিমার ছায়া উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, এইজন্যই বিশাল দেবদারুদ্রুমবেদিকা হইতে তাঁহাকে উঠাইয়া আনিয়া রত্নবেদীর উপরে স্থাপিত করিয়াছেন,—কিন্তু তিনি কালিদাসের কুমারসম্ভব এরূপভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, অনেক স্থলে তাঁহার পদ কালিদাসের শ্লোক ভাঙ্গিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে, যথা—

"নিরখিতে দেবগণ, ডাকে শুন ত্রিলোচন, রক্ষ রক্ষ দয়াল দীনেশ। যাবৎ এ দেববাণী, শিবকর্ণে হৈল ধ্বনি, তাবৎ মদন ভস্মশেষ॥"

জয়নারায়ণের রতিবিলাপটি ভারতের রতিবিলাপ হইতে সুন্দর; এই রতিবিলাপ অলঙ্কার শাস্ত্র হইতে অপহৃত; কিন্তু কবি পাকা চোর, এমন সুন্দরভাবে আহৃত কথা যোজনা করিয়াছেন যে, তাহা ধরিবার উপায় নাই, যথা,—

"অন্য নায়িকার ঘরে, নিশীথে বঞ্চিয়া ভোরে, মোর কাছে এসেছিলা তুমি। খণ্ডিতা অধীরা হৈয়া, মন রাগ না সহিয়া, মন্দ কাজ করিছিনু আমি॥ রঙ্গনের মালা নিয়া, দুহাতে বন্ধন করিয়া, কর্ণ-উৎপলে তাড়িছিলে। সে অভিমান মনে, করিয়া আমার সনে, রস রঙ্গ সকলি ত্যজিলে॥ আর দুঃখ মনে জ্বলে, একদিন নৃত্যকালে, পদের নূপুর খসেছিল। ত্বরা তুমি দিতে পায়, বিলম্ব হইল তায়, দিতে দিতে তাল ভঙ্গ হৈল। তাতে আমি মান করি, নৃত্য গীত পরিহরি, বসিয়া রহিনু মৌনী হয়ে। যত সাধ কৈলা তুমি, পুনঃ না নাচিনু আমি, তাতে রৈলে বিরস শুইয়ে॥" ইত্যাদি।

পুস্তক ভরিয়াই এইরূপ কোমল পদাবলী, কোমল পুষ্পমালিকায় যেন কবি তাঁহার কাব্যপটখানি ছাইয়া ফেলিয়াছেন; কপট সন্ন্যাসী গৌরীর নিকট শিবনিন্দা করিতেছেন, পাঠক কালিদাসের কবিতা স্মরণ করিতে করিতে বঙ্গীয় কবির এই লেখা পাঠ করুন,—"করেতে বদন যবে তোমার ধরিবে। ঐরাবত শুণ্ডে কি কমলিনী শোভিবে॥ বাম উরে বসাইলে শোভিবে তেমন। শিরীষ-কলিকা হিমগিরিতে যেমন॥ আলিঙ্গনে শোভা পাবে কুমুদিনী মত। সমুদ্রের মধ্যে অতি তরঙ্গ তুলিত॥ আভরণে অঙ্গভূষা চিতা ভস্ম যার। সিদ্ধি দিতে পারিলে পাইবে মন তার॥"

মূল চণ্ডীকাব্যের বিষয়ে জয়নারায়ণ মুকুন্দরামের চিত্র সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এ সমকক্ষতার চেষ্টা বড় সহজ নহে; ভাষার জোরে তিনি কবিকঙ্কণকে পদচ্যুত করিতে প্রয়াসী; এস্থলে কবিকে আমরা নিতান্ত ধৃষ্ট বলিব। জয়নারায়ণের চণ্ডীতে সুলোচনা এবং মাধবের উপাখ্যান জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা দীর্ঘ, কিন্তু শব্দ-বিন্যাসের লালিত্যে এই উপাখ্যানটি পাঠকের ক্লান্তিকর হয় নাই; নমুনা স্বরূপ কিছু তুলিতেছি,—শরীর থাকিলে দেখা সথায় অবশ্য। কমল ভ্রমরে দেখ

তাহার রহস্য॥ শিশিরে কমল মজি থাকে সুলক্ষণা। বর্ষাকালে পাই হয় জীবন বাসনা॥ দিনে দিনে লতা বারি ভেদিয়া উঠিয়া। হইয়া কলিকা, সখা সহায়ে ফুটিয়া॥ প্রফুল্ল হইয়া প্রেমে মনের উল্লাস। মিলে আসি পূর্ব্বভৃঙ্গ মনে বহু আশ॥ পুনঃ পদ্মিনীর মধু মধুকর পিয়ে। অবশ্য যে দেখা হয় যদি দুই জীয়ে॥"

হরিলীলা।

"হরিলীলা"—সত্যনারায়ণের ব্রত কথা, কিন্তু জয়নারায়ণের হাতে ইহা ব্রতকথার ক্ষুদ্র সীমা লঙ্ঘন করিয়া একখানি সুন্দর বড় কাব্যে পরিণত হইয়াছে। আমরা প্রাচীন সত্যনারায়ণের ব্রতকথা অনেকগুলি পাইয়াছি, কিন্তু ইহার সঙ্গে সেগুলির তুলনা হয় না,—ইহা বিস্তীর্ণ, নানারসপুষ্ট বড় কাব্যকথা। এই পুস্তকে আনন্দময়ীর. রচনা সন্নিবিষ্ট আছে,—সেগুলিতে তাঁহার ভণিতা নাই, স্ত্রীলোকের ভণিতা দেওয়ার রীতি ছিল না; বিশেষ পূর্ব্ব-বঙ্গের রমণী, তিনি লজ্জায় নিজের নাম ভণিতায় দিতে সম্মত হন নাই। আনন্দময়ীর পিতৃকুলোদ্ভব প্রাচীন ব্যক্তিগণ তাঁহার রচনাগুলির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত, তাঁহারা একবাক্যে সেই সকল অংশ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অশীতিপর বৃদ্ধ ফরিদপুর সেনদিয়ানিবাসী সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত গুরু-চরণ মজুমদার মহাশয় আমাদিগকে যে সকল অংশ আনন্দময়ীর রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, কবির বংশীয়েরাও ভিন্ন সময়ে ভিন্ন স্থানে আমাদিগের নিকট সেইগুলি তদীয় রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। এবিষয়টি স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা সুলেখক শ্রীযুক্ত অক্রূরচন্দ্র সেন ও আনন্দনাথ রায় মহাশয়দ্বয়ও নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পিতৃব্যের রচনা হইতে আনন্দময়ীর রচনায় আড়ম্বর ও পাণ্ডিত্য বেশী, আমরা তাঁহা পরে দেখাইব, এখন জয়নারায়ণের নিজ লেখার কয়েকটি অংশ হরিলীলা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—

(১) সভামধ্যে রত্ন সিংহাসনে নরপতি। শিরে শ্বেত ছত্র ইন্দুকুন্দ জিনি ভাতি॥ ফক্ ফক্ জ্বলে ভস্ম ত্রিপল্লব ভালে। মিস্ মিস্ যজ্ঞভস্ম ভ্রূমধ্যে জ্বলে॥ * * * টল্ টল্ মুকুতা কুণ্ডল কাণে দোলে। ঢল্ ঢল্ গজমতি মালা দোলে গলে॥ কস্ কস্

কসাত্তা সটুকা কটিতে। ঝল্ ঝল্ ঝকমকে স্বর্ণ ঝালরেতে॥ ডগমগ সপ্ত কন্তা চামর লইয়া। ধীরে ধীরে দোলাইছে রহিয়া রহিয়া॥ ঝন্ ঝন্ লাগে কাণে কঙ্কণের ধ্বনি। ঝক্মক্ চামর দণ্ডেতে জ্বলে মণি॥"—রাজসভা-বর্ণন।

(২) আঁচলে ধরিয়া টানিছে নাগর, টানিয়া ছাড়ায় সুন্দরী। মান ভঙ্গ করি সম্মুখে আনিল, নাগর যতন করি॥ সোণার নাগর নাগরী দ্বন্দ্ব, হেরিয়া করিল রঙ্গ। স্বত্ব-ত্যাগেতে করিলা দান, আপনার বর অঙ্গ॥ কাণে মুখ রাখি, কহিছে নাগর, হৈল নাকি মান ভঙ্গ॥"—নায়িকার মানভঙ্গ।

(৩) "ঘোরতর রজনী অতীত এই মতে। পূর্ব্বদিক রক্ত দিনকর কিরণেতে॥ আকাশে নক্ষত্রগণ ভাঙ্গি যায় মেলা। চক্রবাকী প্রবর্ত্ত পতির প্রেম-খেলা॥ * * * পাখীগণ ইতিউতি নিজ বাস ছাড়ে। বিরলে ডাকিছে কাক ভূমে নাহি পড়ে॥ চন্দ্রভাণ করযুগ ধরি সুনেত্রার। 'যাই' বলি বিদায় মাগিছে বার বার॥ উষা কালে যাত্রা করি যায় চন্দ্রভাণ। সজল নয়নে ধনী পাছেতে পয়াণ॥ যতদূর চলে আঁখি চাহে দাঁড়াইয়া। সুধাকর যায় ইন্দীবর ভাঁড়াইয়া॥ নিশি ভরি কুমুদিনী কৌতুকে আছিল। রবি অবলোকনে মুখ মলিন হইল॥"—সুখনিশি-প্রভাত।

মিষ্টশব্দপ্রয়োগপটু কবি জয়নারায়ণের কাব্যের একটি বৃহৎ দোষ আছে,—উহা সেই যুগের দোষ, এ অভিযোগ হইতে ভারতচন্দ্রেরও অব্যাহতি নাই। এই সব কাব্য কেবলই শব্দের কাব্য, ভাবের অভাবে শব্দের লালিত্য অনেক সময়ই নিষ্ফল হইয়া পড়ে। এত বড় কাব্যগুলি সমগ্র পাঠ করিয়াও চক্ষুর কোণে একবিন্দু অশ্রু নির্গত হয় না, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিবার প্রয়োজন হয় না। কাব্য অর্থ কেবলই বাক্য নহে, "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং।" রসবিহীন বাক্যাবলী চিত্তে কোন স্থায়ি-ভাব মুদ্রিত করে না; ঘষা মাজা সুন্দর শব্দ কর্ণের তৃপ্তিসাধন করিতে পারে মাত্র, কিন্তু তাহার ধ্বনি মনে পৌঁছে না। সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য ক্রমে বঙ্গভাষার উপর গভীরতর ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছিল, ভারতচন্দ্রের পরে বঙ্গভাষাকে সংস্কৃত দ্বারা পুষ্ট করিবার চেষ্টা রহিত হয় নাই, বরং ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে,—আমরা আনন্দময়ীর রচনা হইতে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি,—

আনন্দময়ীর বংশোদ্ভবা ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী কর্ত্তৃক ৭০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত

হরিলীলা পুঁথির এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি।

"হের চৌদিগে কামিনী লক্ষে লক্ষে। সমক্ষে, পরক্ষে, গবাক্ষে, কটাক্ষে॥ কতি প্রৌঢ়ারূপা ওরূপে মজন্তি। হসন্তি খলন্তি, দ্রবন্তি, পতন্তি॥ কত চারু বক্ত্রা, সুবেশা সুকেশা॥ সুনাসা, সুহাসা, সুবাসা, সুভাষা॥ কত ক্ষীণমধ্যা, শুভাঙ্গা, সুযোগ্যা। রতিজ্ঞা, বশীজ্ঞা, মনোজ্ঞা, মদজ্ঞা॥ দেখি চন্দ্রভাণে, কত চিত্তহারা। নিকারা, বিকারা, বিহারা, বিভোরা॥ করে দড়ি দৌড়া মদমত্ত প্রৌঢ়া॥ অনূঢ়া, বিমূঢ়া, নবোঢ়া, নিগুঢ়া॥ কোন কামিনী কুণ্ডলে গণ্ড ঘৃষ্টা। প্রহৃষ্টা, সচেষ্টা, কেহ ওষ্ঠদষ্টা॥ অনঙ্গাস্ত্রভিন্না, কত স্বর্ণবর্ণা। বিকীর্ণা, বিশীর্ণা, বিদীর্ণা, বিবর্ণা॥ কারো ব্যস্ত বেণী নাহি বাস বক্ষে। কারো হার কুর্পাস বিত্রস্ত কক্ষে॥ গলদ্ভুষণা কেহ, নাহি বাস অঙ্গে। গলদ্‌রাগিণী কেউ মাতিয়া, অনঙ্গে॥ কারো বাহুবল্লী কারো স্কন্ধ দেশে। রহিয়া সাধু বাক্য বক্তে প্রকাশে॥ * * * সুকক্ষে নিতম্বে উর হেমকুম্ভে। এভাবে ও ভাবে হাঁটিতে বিলম্বে॥ তাহে দোলিতা লাজভারি ভরেতে। পরে হেলি ঢুলি অনঙ্গ জ্বরেতে॥ সুনেত্রাকে কেহ, কেহ চন্দ্রভাণে। করে সেক তোয়ে সবে সাবধানে॥ সুহস্তে ঢালিছে সর্ব্ব বারি অঙ্গে। ঝণত্ ঝণত্ গলত্ গলত্ পড়ে নীর অঙ্গে॥ * * * সখী চন্দ্রভাণে বলে চাতুরীতে। এ রত্নের মালা কাকের গলাতে॥ শুনি চাতুরী দম্পতি হেট মাথে। ঢলাঢল গলাগল সখী সর্ব্ব তাতে॥"—চন্দ্রভাণ ও সুনেত্রার বাসি বিবাহ, (হরিলীলা)। বাঙ্গালা কবিতা এখন আর আপামর সাধারণের বুঝিবার বিষয় নহে। ইহার অর্থবোধের জন্য এখন অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হয়। এজন্য সহজ পদ্য রচনার প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের ইংরেজ গুরুগণ উপযুক্ত সময়েই আসিয়া গদ্য লেখার প্রণালী শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা না হইলে সংস্কৃতাজ্ঞ বাঙ্গালিগণ বাঙ্গালা ভাষায়ও দন্তস্ফুট করিতে অক্ষম হইয়া এককালে সাহিত্যরসে বঞ্চিত হইতেন বলিয়া আশঙ্কা হয়।

আনন্দময়ীর রচনা।

আনন্দময়ীর সহজ রচনার একটু নমুনা দিতেছি—"আসি দেখহ নয়নে। হীন তনু সুনেত্রার হয়েছে ভূষণে॥ হয়েছে পাণ্ডুর গণ্ড, রুক্ষ কেশ অতি। ঘরে আসি দেখ নাথ এ সব দুর্গতি॥ রহিয়াছি চির বিরহিণী দীন মনে। অর্পণ করিয়া আঁখি তোমা পথ পানে॥ * * * ভাবি যাই যথা আছ হইয়া যোগিনী। না সহে এ দারুণ বিরহ আগুনি॥ যে অঙ্গে কুঙ্কুম তুমি দিয়াছ যতনে। সে অঙ্গে মাখিব ছাই তোমার কারণে॥

যে দীর্ঘ কেশেতে বেণী বাঁধিছ আপনি॥ তাতে জটাভার করি হইব যোগিনী॥ শীতভয়ে যে বুকেতে লুকায়েছ নাথ। বিদারিব সে বুক করিয়া করাঘাত॥ যে কঙ্কণ করে দিয়াছিলা হৃষ্ট মনে। সে কঙ্কণ কুণ্ডল করিয়া দিব কাণে॥ তব প্রেমময় পাত্র ভিক্ষা পাত্র করি। মনে করি হরি স্মরি হই দেশান্তরী॥ তাতে মাতা প্রতিবন্ধ বাহিরিতে নারি॥ আর তব স্থাপ্য ধন বিষম যৌবন। লুকাইয়া নিয়া ফিরি দরিদ্র যেমন॥"—বিরহিণী সুনেত্রা; (হরিলীলা)। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই রমণীকবির দৃষ্টি শব্দালঙ্কারের প্রতি পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অলঙ্কার দেখাইবার স্পৃহা রূপসীগণের স্বাভাবিক, আনন্দময়ী নূতন কোন অপরাধ করেন নাই,—কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত রচনা পড়িয়া আনন্দময়ীর অলঙ্কারস্পৃহা পাঠক কি স্ত্রীলোকসুলভ রোগ বলিতে ইচ্ছা করিবেন?—"পতিশোক সাগরে, না দেখিয়া নাগরে, ফিরে যেন পাগরে, ডাক ছাড়ি। হইয়ে জীব শেষা, বিগলিত বেশা, লটপট কেশা, ভূমে পড়ি॥"

জয়নারায়ণের চণ্ডীতে দশ অবতার স্তোত্রের এই দুইটি পংক্তি আনন্দময়ী লিখিয়া দিয়াছিলেন;—"জলজ বনজ যুগ যুগ তিন রাম। খর্ব্বাকৃতি বুদ্ধদেব কল্কি সে বিরাম॥" এই পংক্তিদ্বয় একটি সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ, ইহা বলা বাহুল্য, এই দুই ছত্রেই দশ অবতারের নাম সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্তরূপ শব্দ-বিন্যাসের কৌশল গিরিধরকৃত "গীতগোবিন্দের অনুবাদে"ও বিশেষরূপে দৃষ্ট হইবে। এই গীতগোবিন্দানুবাদখানি ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে—(ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের ১৬ বৎসর পূর্ব্বে) সমাপ্ত হয়। রসময়দাস-কৃত একঘেয়ে পয়ার ছন্দের অনুবাদে মূল গীতগোবিন্দের পদলালিত্যের চিহ্ন উপলব্ধি হয় না, তথাপি উহা বেশ প্রাঞ্জল ও শ্রুতিমধুর। প্রথমাংশ হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক "মেঘৈর্ম্মেদুরমম্বরং" স্মরণ করিতে করিতে পাঠ করুন;—"মেঘ আচ্ছাদিলা সব গগনমণ্ডলে। মেঘাবৃত চন্দ্রমা হইয়াছে সেই কালে॥ বনভূমি তমালের বর্ণ সর্ব্ব স্থানে। শ্যাম হইয়াছে কেহো নাহি জানে। যদি বল মনুষ্যের গমনাগমনে। যেমনে চলিবে তার শুন বিবরণে॥ অন্ধকারে অভিসারের বেশ ভূষা করি। চলহ নিকুঞ্জে সব ভয় পরিহরি॥ আনন্দে নিদেশ পাইয়া চলে দুইজন।

গীতগোবিন্দের অনুবাদ।

প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জলীলা করে দুইজন ॥ অথব কুঞ্জ লক্ষ্য করি নানা লীলা করে। চলিলেন বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহারে ॥ প্রিয়া মিলনের ইচ্ছা জানি সেইকালে। মেঘ আসি আচ্ছাদিল গমনমণ্ডলে ॥" গিরিধর যথাসম্ভব সুন্দরভাবে জয়দেবকৃত গীতিগুলির মনোহারিত্ব বাঙ্গালা ভাষায় প্রতিভাত করিয়াছেন; গীতগোবিন্দের এই অনুবাদে কেবল অনুস্বার বিসর্গগুলি নাই, কিন্তু শব্দের মিষ্টত্ব বেশ বজায় আছে; চতুর বাঙ্গালা লেখক, বঙ্গভাষাকে কতদূর সংস্কৃতের মত করা যায়, তাহা সক্ষম লিপিকৌশলের সহিত প্রমাণিত করিয়াছেন। আমরা কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিলাম;—

(১) "তবদন্ত অগ্রে ধরণী রয়, যেন চন্দ্রে লীন কলঙ্ক হয়, জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত শূকররূপ ধরি। হিরণ্যকশিপু ধরিয়া করে, দলিলে ভৃঙ্গের মত নখরে, জয় জগদীশ হরি, অদ্ভুত নরহরি রূপ ধরি ॥

(২) এ সখি সুন্দরী যুবতী জনে হরি, নাচত কত প্রকার। পবনে লবঙ্গলতা, মৃদু বিচলিত, শীতল গন্ধ বহায়। কুহু কুহু করি, কোকিলকুল কূজিত, কুঞ্জে ভ্রমরীগণ গায় ॥ বকুল ফুলে মধু পিয়ে মধুকরগণ, তাহে লম্বিত তরুডাল। পতি দূরে যায়, তার প্রতি মনোরথ, মনমথনে হয় কাল। মৃগমদ গন্ধে, তমাল পল্লব, ব্যাপিত হইল সুবাস। যুবজন হৃদয় বিদারিতে, কামের নখ কিবা হইল পলাশ ॥ মদন নৃপের ছত্র হেম নির্ম্মিত কি নাগেশ্বর ফুল। শিলীমুখসদৃশ বাণ নিরমাওল, পাটলী ফুল অতুল ॥ দেখি বিলক্ষণ, জগত ফুল ছল তরুণ করুণ কিরে হাসে। কেতকী কর সদৃশ করি নিরমিল বিরহীবিদারণ আসে ॥"

(৩) "যমুনাতীরে মন্দ বহে মারুত, তাহাতে বসিয়া যুবরাজ। কর অভিসার, করি রতি রস, মদন মনোহরবেশে। গমনে বিলম্বন, না করু নিতম্বিনী, চল চল প্রাণনাথপাশে ॥ তুয়া নিজ নাম, শ্যাম করি সঙ্কেত, বাজায় মুরলী মৃদুভাষে। তুয়া তনু পরশি, ধূলিরেণু উড়ত, তাতে পুনঃ পুনঃ প্রশংসে। উড়ইতে পক্ষী, বৃক্ষদল বিচলিতে, তুয়া আগমন হেন মানে। দ্রুতগতি শেষ করত, পুনঃ চমকই, নিরখত তুয়া পথপানে। শবদ অধীর নূপুর দূরে, রিপুর সদৃশ রতিরঙ্গে। অতিতমপুঞ্জ, কুঞ্জবনে সখি চল, নীল ওড়নি নেহ অঙ্গে ॥"

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

এখন আমরা আর একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়া কাব্য-শাখার উপসংহার করিব, এই পুস্তকের নাম 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী'। 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী'-লেখক দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণনগরান্তর্গত উলাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন;

ইঁহার পিতার নাম আত্মারাম মুখোপাধ্যায় ও মাতার নাম অরুন্ধতী। অনুমান ১০০ বৎসর পূর্ব্বে 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' লিখিত হয়। সকল দেবতাই ভাষাকাব্যরূপবাহনে আরোহণ করিয়া বঙ্গীয় গৃহস্থের ঘরে পূজা গ্রহণ করিতে আগমন করিলেন; বোধ হয় শিবের জটার কুটিল ব্যূহে আবদ্ধ গঙ্গাদেবী যথাসময়ে এ সংবাদ জানিতে পারেন নাই, বহু বিলম্বে তাঁহার ধারণা হইল "ভাষায় আমার গান নাই।" তখন কালগৌণ না করিয়া উলাগ্রামে দুর্গাপ্রসাদের স্ত্রী হরিপ্রিয়ার স্কন্ধে আরূঢ় হইয়া স্বপ্ন প্রচার করিলেন—"তোমার স্বামীকে কহিয়া আমার জন্য কাব্য লিখাও।" কিন্তু তখন ইংরেজের অভ্যুদয়ে দেবদেবীর আফিস বন্ধপ্রায়; যে বৎসর রাজা রামমোহন রায় "হিন্দুগণের পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রণালী" রচনা করেন, সম্ভবতঃ সেই বৎসর স্ত্রীর মারফৎ প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' লিখিতে প্রবৃত্ত হন। 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী'তে মধ্যে মধ্যে রচনার পারিপাট্য আছে। আমাদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহীগণ যখন যুবতী ছিলেন, তখন তাঁহারা কি কি অলঙ্কারও পরিয়া আমাদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহগণের মন চুরি করিতেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি নিচয়ে দৃষ্ট হইবে;—

"ঢেঁড়ি, চাঁপি, মাক্‌ড়ি কর্ণেতে কর্ণফুল। কেহ পরে হীরার কমল নহে তুল॥ নাসিকাতে নথ কারো মুক্ত চুণী ভালো। লবঙ্গ বেশরে কারো মুখ করে আলো॥ কিবা গজমুক্তা কারো নাসিকার কোলে। দোলে সে অপূর্ব্ব ভাব হাসির হিল্লোলে। কুন্দ-কলিকার মত কারো দন্তপাঁতি। দাড়িম্বের বীজ মুক্তা কারো দন্তভাতি॥ মার্জ্জিত মজ্জনে দন্ত মধ্যে কালরেখা। মনে লয় মদনের পরিচয় লেখা॥ মুখ শোভা করে কারো মন্দ মন্দ হাসি। সুধার সাগরে ঢেউ হেন মনে বাসি॥ পরিল গলায় কেহ তেনরী সোনার। মুকুতার মালা কণ্ঠমালা চন্দ্রহার॥ ধুকধুকি জড়াও পদক পরে সুখে। সোণার কঙ্কণ কারো শঙ্খের সম্মুখে॥ পতির আয়ৎ চিহ্ন সোহাগ যাহাতে। পরাণ-বাক্কান লোহা সকলের হাতে॥ পাতা মল পাশুলি আনট বিছা পায়। গুজরী পঞ্চম আর শোভা কিবা তায়॥"

এই অলঙ্কারের অনেকগুলি এখন মুসলমান পাড়ায় খোঁজ করিলে পাওয়া যাইবে।

৪। গীতি-শাখা।

গীতি-সংস্কার।

মুসলমানী কেচ্ছার কলুষস্রোতের মুখে পড়িয়া বঙ্গসাহিত্য কলুষিত হইয়াছিল; বিদ্যাসুন্দর, পদ্মাবতী, হরিলীলা প্রভৃতি কাব্যের ভাষা খুব শ্রীসম্পন্ন; কিন্তু চিত্রের পদ্মে মধুমক্ষিকার তৃপ্তি হয় না, রসহীন লিপি-কৌশলেও শ্রোতার মন বহুক্ষণ মুগ্ধ থাকিতে পারে না; সাহিত্যের পঙ্ক উদ্ধার করিয়া নির্ম্মল ভাবের প্রবাহে পাঠকের কামনা পরিতৃপ্ত করিতে, পুনশ্চ প্রতিভাবান লেখকের লেখনীর প্রয়োজন হইল। এই প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে রাজদরবার ও তৎসংশ্লিষ্ট স্থান সমূহের কলুষিত হাওয়া হইতে অতি দূরে —পল্লীগ্রামের স্বভাবস্নিগ্ধ ছায়ায় অনেকগুলি কলকণ্ঠ কবির আবির্ভাব হইল। কিন্তু এই গীতিশাখা একবারে নির্দ্দোষ নহে, ইহার একাংশ বিদ্যাসুন্দরাদি কাব্যের রুচি কর্ত্তৃক অধিকৃত রহিয়াছে,—কিন্তু অপরাংশ অতি সুনির্ম্মল। এই দেশের সাহিত্যে কাব্য অপেক্ষা গীতিই প্রশংসনীয়, কারণ এখানে কর্ম্ম অপেক্ষা ভক্তিই অধিক কার্য্যকরী, এই যুগের সাহিত্যেও গীতিরই শ্রেষ্ঠত্ব দৃষ্ট হইবে।

গীতি কবিতায় গার্হস্থ্য চিত্র।

বঙ্গদেশের কতকগুলি গভীর প্রাণের কামনা ছিল,—শিশু কন্যার পিতৃগৃহ হইতে গমন, দুধের মেয়ে অষ্টমবর্ষে গৌরী সাজিয়া গৃহ ছাড়িয়া যাইত, তাহার ধূলিখেলা সাঙ্গ করিয়া অবগুণ্ঠনবতী যুবতী বধূর অভিনয় করিতে হইত, মাতৃবিরহে বালিকা ঘোমটা-ঢাকা সুন্দর

মুখ খানি চক্ষুজলে প্লাবিত করিয়া পথের পানে তাকাইয়া থাকিত; মায়ের রাত্রিও সুখে প্রভাত হইত না,—ক্রোড়ের শিশু ছাড়া মা স্বপ্ন দেখিয়া পাগলিনীর ন্যায় কাঁদিয়া বলিতেন,—"উমা আমার এসেছিল। স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল।" বহুদিনের অশ্রুসিক্ত এই বিরহ-ব্যাপারের পর যখন বালিকা ফিরিয়া আসিত, তখন কত সুখ,—"আমার উমা এলো, বলে রাণী এলোকেশে ধায়।" এই সকল গানের সরল কথায় শ্রোতা অশ্রুজলে গলিয়া পড়িলেন, এগুলির রঙ্গভূমি বস্তুত কৈলাস বা হিমালয়পুরী নহে,—প্রতি গৃহস্থের হৃদয় ইহাদের অনুভূতি-ক্ষেত্র। এই পরম সুন্দর বাৎসল্যভাবকে আমাদের সাধকগণ ধর্ম্মের ছায়ায় স্থান দিয়াছেন, পুত্রের প্রতি স্নেহ যশোদা-চিত্রে ধর্ম্মভাবে পরিণত হইয়াছে। শুন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ, দেখা দিয়ে গোপাল কোথায় লুকালে। যেন সে চঞ্চল চাঁদে, অঞ্চল ধরি কাঁদে, জননি দে ননী, দে ননী বোলে॥" প্রভৃতি স্নেহ-উদ্বেলিত ভাব-মধুর গানগুলি শ্রোতার হৃদয় ছুঁইত ও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ করিত—ইহা গৃহস্থের ধূলিমাখা আঙ্গিনার কথা, কিন্তু ইহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নির্ম্মল স্বর্গের প্রতি—কারণ স্বার্থশূন্য পবিত্র স্নেহ পৃথিবীর কথা হইয়াও স্বর্গের কথা। পুরুষের প্রতি রমণীর ভালবাসা এই দেশে উন্নত ধর্ম্মভাবাপন্ন হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের সঙ্গে একাঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে, আমরা "বৈষ্ণব-যুগ" অধ্যায়ে তাহা বিস্তারিতভাবে দেখাইয়াছি।

রামপ্রসাদের মাতৃভাব ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উচ্চতা।

শিশুর প্রতি মায়ের স্নেহের মাধুর্য্য এক দিকে, নির্ভরান্বিত শিশুর স্নিগ্ধ অভিমানপূর্ণ আবদার অপর দিকে। মায়ের প্রতি শিশুর সেই গঞ্জনাগুলি বড় মধুর—সেই গঞ্জনার বাহ্য কঠোরতা অশ্রুজলে ধৌত হইয়া কোমল হইয়া গিয়াছে। মায়ের প্রতি রামপ্রসাদের ক্রোধ অশ্রুগঠিত, উহা নামে মাত্র ক্রোধ—উহা নিগৃহীত বালকের স্নেহের স্বত্বস্থাপন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য প্রেমভক্তির বিশেষ লীলাভূমি। এই

প্রেমভক্তিই সময়ে সময়ে অঞ্জনশলাকার ন্যায় লোকচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছে। রাজা রামমোহন রায় গভীর শাস্ত্রানুসন্ধান পূর্ব্বক যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, রামপ্রসাদ নির্ম্মল ভক্তিবিহ্বলতায় তৎপূর্ব্বেই সেগুলি হৃদয়ে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি প্রেম-স্নিগ্ধ হৃদয়ের অনুভূতির বলে পুস্তকগত বিদ্যার অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়া নির্ম্মল সত্যরাজ্য ছুঁইতে পারিয়াছিলেন। "কি কাজ রে মন যেয়ে কাশী।" "নানা তীর্থ পর্য্যটনে শ্রম মাত্র পথ হেঁটে।" প্রভৃতি বাক্যে তিনি তীর্থযাত্রার সম্বন্ধে লৌকিক আস্থার প্রতি নির্ভীক ভাবে কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন।—"ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তা জান না। মাটির মূর্ত্তি গড়িয়ে মন তার কর্‌তে চাওরে উপাসনা॥ ধাতু পাষাণ মাটি মূর্ত্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে।" প্রভৃতি কথা তিনি রাজা রামমোহনের পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত গানের সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের "আবাহন বিসর্জ্জন কর তুমি কার।" প্রভৃতি গান এক স্থলে রক্ষিত হইবার যোগ্য। "বেদে দিল চক্ষে ধুলা, ষড়্‌দর্শনের সেই অন্ধগুলা"—বাক্যে রামপ্রসাদ ভক্তির বলে বলীয়ান্ হইয়া শাস্ত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার নির্ম্মল অদ্বৈতবাদসূচক অসংখ্য পদ দৃষ্ট হয়। যে বৎসর রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়, সেই বৎসরের শেষভাগে রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। রামপ্রসাদের কণ্ঠে যে গানের অবসান হইয়াছিল, তাহা পুনরায় রামমোহনের কণ্ঠে উত্থিত হইয়া নব্য সমাজকে মাতাইয়া তুলিল।

রামপ্রসাদ বিগ্রহপূজা করিতেন, কিন্তু তিনি সেই বিগ্রহের পদ-তলে বসিয়া অনন্তরূপের ছায়া অনুভব করিতেন, যে ভোগসম্ভার তৎপদ-প্রান্তে প্রস্তুত রাখিতেন, তাহা দেখিয়া কখনও ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক মনে মনে গাহিয়াছেন,—"জগত্‌কে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা। ওরে কোন্ লাজে খাওয়াইতে চাস্ তায়, আলচাল আর বুটভিজানা॥" কখনও পুষ্প, বিল্ব-পত্র পদে দিতে উদ্যোগ করিয়া সেই উৎসর্গ অসম্পূর্ণ জ্ঞানে বলিয়াছেন, "বনের পুষ্প, বেলের পাতা, মাগো আর দিব আমার মাথা।"

কালীমূর্ত্তি যে ভাবে তাঁহার মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ হইত, তাহা মহামহিম, গূঢ় রহস্যে ব্যক্ত—অতি সুন্দর; তাহা বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি শব্দ ও উপমার জন্য লালায়িত হইয়াছেন; অপ্রস্ফুট সৌন্দর্য্যাবলী জড়িত হইয়া সেই মূর্ত্তি ক্ষণে ক্ষণে নবভাবে তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইয়াছে,—"ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে দ্রুতগতি, দলে দানবদলে, ধরি করতলে গজ গরাসে। কেরে—কালীর শরীরে, রুধিরে শোভিছে, কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে॥" প্রভৃতি গান ভক্তের কণ্ঠে শুনিলে মানসপটে মাধুর্য্যমিশ্র এক ভৈরব ছবি অঙ্কিত হয়।

সংসারক্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এখনও রামপ্রসাদের গানগুলি শুনিয়া সাশ্রু-নেত্রে তাহাদের প্রশংসা করিবেন। আমার মনে পড়ে, গৃহপ্রাঙ্গণে বসিয়া শ্যাম-সন্ধ্যাকালে যখন চিরপরিচিত সুহৃদ কণ্ঠে,—"নিতান্ত যাবে এদিন কেবল ঘোষণা রবে গো। তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥"—প্রভৃতি গান শুনিতাম, তখন বাল্যকালের সুকোমল অন্তঃকরণে কত বিষাদমাখা, মহিমান্বিত ভক্তির কথা জাগিয়া উঠিত। "ভবে আসার আশা, কেবল আশা, আসা মাত্র সার হইল। চিত্রের পদ্মেতে পড়ি ভ্রমর ভুলি রৈল॥ নিম খাওয়ালি মা চিনি বলে কেবল কথার করি ছল। মিঠার আশে তেতো মুখে সারাদিনটা গেল॥ খেল্‌বি বলে আশা দিয়া মা এনেছিলি এ ভূতল। যে খেলা খেলিলি শ্যামা আশা না পূরিল॥ রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলা যা হ'ল তা হ'ল। সন্ধ্যা হল, এবার কোলের ছেলে মা কোলে নিয়ে চল॥" প্রভৃতি গান সাংসারিক কষ্টবিড়ম্বিত চিত্তের পক্ষে মাতৃ-অবলম্বনজনিত সান্ত্বনায় সুধাতুল্য। রামপ্রসাদের বৈষ্ণববিষয়ক গানও কোন কোনটি বড় মধুর, একটি এখানে তুলিয়া দেখাইতেছি;—"ওহে নূতন নেয়ে। ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে॥ দু-কূল রইল দূর, ঘন ঘন হানিছে চিকুর, কেমন কেমন করেছে দেয়া, মাঝ যমুনায় ভাসে খেয়া, শুন ওহে গুণনিধি, নষ্ট হোক ছানা দধি, কিন্তু মনে করি এই খেদ, কাণ্ডারী যাহার হরি, যদি ডুবে সেই তরী, মিছা তবে হইবে হে বেদ।"

শ্যামাসংগীতকারগণ।

রামপ্রসাদের পর শ্যামাবিষয়ক সংগীত রচনায় আরও কয়েকজন কবি বিলক্ষণ পটুতা দেখাইয়াছেন, আমরা এস্থলে সংক্ষেপে তাঁহাদের উল্লেখ করিয়া যাইব।

কবিওয়ালা রামবসু—(১৭৮৬—১৮২৮ খৃঃ) কলিকাতার পরপারস্থিত শালিকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে পাঁচ বর্ষ বয়ঃক্রমকালেই ইনি পাঠশালায় বসিয়া কলাপাতে কবিতা রচনা করিতেন, দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক কবির রচিত গান, ভবানীবণিক নামক কবিওয়ালা আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া নিজদলে গাওয়াইতেন। যে ফুলটি অতি শীঘ্র ফোটে, তাহা অতি শীঘ্র শুকায়; রামবসুর ৪২ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। প্রথম বয়সে ইনি ভবানীবেণে, নীলুঠাকুর, মোহনসরকার প্রভৃতির দলে গান বাঁধিতেন, শেষে নিজেই এক দল সৃষ্টি করেন। রামবসুর বৈষ্ণবসংগীতগুলিই অধিক হৃদয়গ্রাহী, আমরা স্থানান্তরে তাহার উল্লেখ করিব। তাঁহার উমাসংগীতগুলিও স্নেহ-রসে উদ্বেলিত। মায়ের নয়নজলসিক্ত এই পবিত্র কবিতাটি দেখুন,—"তুমি যে কোয়েছ আমায় গিরিরাজ, কত দিন কত কথা। সে কথা আছে শেল সম হৃদয়ে গাঁথা॥ আমার লম্বোদর নাকি, উদরের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে বেড়াতো। হোয়ে অতি ক্ষুধার্ত্তিক, সোণার কার্ত্তিক, ধূলায় পোড়ে লুটাতো॥" পরিবার ভরণপোষণে অসমর্থ ব্যক্তির হৃদয়ে এইরূপ গান শেলের ন্যায় বিঁধিবার কথা, গানের সময় গলদশ্রুনেত্রে দরিদ্র শ্রোতা ঘরের 'কার্ত্তিক', 'গণেশে'র কথা ভাবিতে থাকিতেন।

রামবসু—১৭৮৬ খৃঃ।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য—১৮০০ খৃঃ অব্দে অম্বিকা-কালনা হইতে বর্দ্ধমান কোটালহাট নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন; ইনি বর্দ্ধমানাধিপ তেজশ্চন্দ্রের সভাপণ্ডিত ও গুরু হইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত শ্যামাবিষয়ক পদাবলী রামপ্রসাদের গানগুলির মত মধুর।

কমলাকান্ত।

রামদুলাল রায়—(১৭৮৫—১৮৫১ খৃঃ) ত্রিপুরার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; ইঁহার কুলউপাধি নন্দী। কতককাল ইনি নোয়াখালির কলেক্টার হেলিডে সাহেবের সেরেস্তাদারী করেন ও পরে ত্রিপুরার মহারাজের

রামদুলাল—১৭৮৫ খৃঃ।

দেওয়ান হন। ইঁহার গানগুলিতে বিষাদ, বিরাগ ও ভক্তির কথা আছে। আমাদের স্থানাভাব, একটি গান হইতে কিছু অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি—"ধনাশা, জীবন-আশা গেল না সকলি গেল মা। কৌমার যৌবন গত জরা আগমন হল॥ * * অক্ষির গেল মা জ্যোতিঃ, শ্রবণের গেল শ্রুতি, মনের গেল মা স্মৃতি, চরণের গতি। আছে কান্তা অভিলাষ, অদর্শনে দেখার আশ, দরশনে জরা বলে কি দায় হল॥"

রঘুনাথ রায়—১৭৫০ খৃ।

দেওয়ান রঘুনাথ রায় (১৭৫০—১৮৩৬ খৃঃ)। বর্দ্ধমানস্থ চুপীগ্রাম-নিবাসী ব্রজকিশোর রায় দেওয়ানের পুত্র। ইঁহার কবিত্ব-শক্তি বেশ ছিল, বর্দ্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের আদেশে ইনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ সঙ্গীত বিশারদদিগের নিকট ধ্রুপদ ও খেয়াল শিক্ষা করেন; ইঁহার শ্যামাবিষয়ক গানগুলি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ও রামদুলাল রায় প্রণীত গানসমূহের সঙ্গে একত্র উল্লিখিত হইবার যোগ্য।

মুসলমান কবিগণ।

মৃজা হুসেন আলি ও সৈয়দ জাফর খাঁ,—এই দুইজন মুসলমান গীত-রচক সমসাময়িক। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির দশশালা বন্দোবস্তের কাগজে মৃজা হুসেন আলির নাম পাওয়া যায়, সুতরাং ইঁহারা এক শতাব্দী পূর্ব্বের কবি। মৃজা হুসেন আলি ত্রিপুরার অন্তর্গত বরদাখাতের জমিদার ছিলেন, কথিত আছে ইনি সমারোহ করিয়া কালী পূজা করিতেন। আমরা ১১ জন মুসলমান বৈষ্ণবকবির নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের সঙ্গে এই দুই শাক্ত ধর্ম্মে আস্থাবান্ মুসলমান কবির কথা বলা যাইতে পারে। মৃজা হুসেন আলির একটি গান এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—"যারে শমন এবার ফিরি, এসো না মোর আঙ্গিনাতে। দোহাই লাগে ত্রিপুরারি, যদি কর জোর জবরি, সামনে আছে জজ কাছারি, আইনের মত রসিদ দিব, জামিন দিব ত্রিপুরারি। আমি তোমার কি ধার ধারি, শ্যামা মায়ের খাসতালুকে বসত করি। বলে মৃজা হুসেন আলি, যা করে মা জয়কালী, পুণ্যে ঘরে শূন্য দিয়ে পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি॥"

এই দুই মুসলমান কবির পার্শ্বে আমরা আর একটি কবির স্থান নির্দ্দেশ করিব, ইঁহার নাম এণ্টুনি। ফরাসী অধিকারভুক্ত গরিটীর নিকট এণ্টুনি কবিওয়ালার বাগান-বাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। এণ্টুনি পর্ত্তুগিজ ছিলেন; ইঁহার ভ্রাতা কেলিসাহেব সেই কালের একজন ক্ষমতাপন্ন ও অর্থ-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। এণ্টুনি একটি ব্রাহ্মণরমণীর প্রেমে পড়িয়া হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়েন; তিনি দোল দুর্গোৎসবে সাগ্রহে যোগ দিতেন, এবং অবশেষে কবির দল বাঁধিয়া নিজে আসরে নামিয়াছিলেন। তখন ইংরেজ ও বাঙ্গালীতে সমাজগত পার্থক্য এত বেশী ছিল না; মনে করুন, মাথার টুপি ও গায়ের কুর্ত্তি ছাড়িয়া ভদ্র ও ইতর শত শত শ্রোতার গুঞ্জরণে মুখরিত বিস্তীর্ণ আসরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ফিরিঙ্গি কবি গানে তান ধরিয়াছেন। প্রতিপক্ষের দল-নেতা ঠাকুর সিংহ সাহেবকে আক্রমণ করিয়া বলিতেছে,—

এণ্টুনি ফিরিঙ্গি।

"বলহে এণ্টুনি আমি একটি কথা জান্‌তে চাই।
এসে এ দেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুর্ত্তি নাই॥"

এণ্টুনি ইহার জবাব কি দিবেন, মনে করিতেছেন। তিনি বিলাতি খাতায় লেখা সুরুচিসঙ্গত রহস্যের ভদ্রতায় এখানে কুলাইতে পারিবেন না, তিনি কবিওয়ালার আসরে আসিয়া যোড়শকলায় পূর্ণ কবিওয়ালাই সাজিয়াছেন; তিনি ঠাকুরসিংহকে 'শ্যালক' সম্বোধনে অভিহিত করিয়া এই আক্রমণের প্রতিশোধ লইলেন,—

"এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি।
হ'য়ে ঠাক্‌রে সিংহের বাপের জামাই, কুর্ত্তি টুপি ছেড়েছি॥"

রামবসু আসরে দাঁড়াইয়া সাহেবকে গালি দিয়া পূর্ব্বপক্ষ করিলেন,—

"সাহেব! মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি।
ও তোর পাদরী সাহেব শুন্‌তে পেলে, গালে দেবে চুণ কালী॥"

সাহেবের উত্তর,—

"খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই।
শুধু নামের ফেরে, মানুষ ফেরে, এও কোথা শুনি নাই।
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে,
ঐ দ্যাখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে,
আমার মানবজনম সফল হবে যদি রাঙ্গাচরণ পাই॥"

এণ্টুনি যে নিজের ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না;—শুধু আমোদের জন্য এই মুক্তপ্রাণ, সামাজিক বৈষম্যগর্ব্ববর্জ্জিত, একান্ত অনাড়ম্বর বিদেশী ভদ্রলোকটি দেশীয় সাজে সজ্জিত হইয়া আসরে গাহিতেন,—

"আমি ভজন সাধন জানি না মা নিজে ত ফিরিঙ্গী।
যদি দয়া ক'রে কৃপা কর হে শিবে মাতঙ্গী॥"

এই অনন্যসাধারণ দৃশ্য দেখিবার জিনিষ ছিল বটে।

অপরাপর কবিগণ।

পূর্ব্বোক্ত কবিগণ ছাড়া বঙ্গদেশের কয়েকজন রাজা মহারাজাও অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্যামাবিষয়ক সংগীত রচনা করিয়াছেন। প্রচলিত সংগীতসংগ্রহগুলিতে কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র, নাটোরাধিপতি রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি রাজন্যবর্গের রচিত বলিয়া অনেক গান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

গোপাল উড়ে।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, এই সংগীতরচকগণের মধ্যে সকলেই নির্ম্মল রুচির পক্ষপাতী ও ধর্ম্মপিপাসু ছিলেন না। এই সময় বিদ্যাসুন্দরাদির পালা যাত্রার দলে গীত হওয়ার জন্য,—কতকগুলি ললিত শব্দবহুল, কদর্য্য ভাবপূর্ণ গান রচিত হইয়াছিল; এই সকল গানের সর্ব্বসম্মতিক্রমে ওস্তাদ কবি গোপাল উড়ে; ইনি ভারতচন্দ্রের একবিন্দু ঘনরস তরল করিয়া এক

শিশি প্রস্তুত করিয়াছিলেন; এই গানগুলির রচনার ভঙ্গী এতাদৃশ যে ইহা গাওয়ার সঙ্গে নাচাও চলিতে পারে; হাটে, মাঠে, বাটে এই সব গান পথিকগণ গাহিয়া গাহিয়া পুরাতন করিয়া ফেলিয়াছেন, তথাপি এখন সমালোচনার অনুরোধে সেগুলি পুনর্ব্বার পড়িয়া গোপালচন্দ্র উড়ে মহাশয়কে একটি বেশ রসিক পুরুষ বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে। বিদ্যাসুন্দরের প্রধান চরিত্র হীরা মালিনী; সুন্দর ইহাকে "মাসী" বলিয়া সম্বোধন করাতে ইনি ভগ্ন বীণার মত আওয়াজ দিতেছেন,—"যাদু এমন কথা কেন বল্‌লি। ভোরের বেলা সুখের স্বপন এমন সময় জাগালি॥" ইনি নিজের রূপের ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন, যখন বামুনপাড়া ফুলের যোগানে গমন করেন, তখন পূজাপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ এই পক্ককেশী রূপবতীকে দেখিয়া,—"রহে কোশাকুশী অম্‌নি ধরে।" অনেক স্থলেই কেবল শব্দের মা'র,—"যামিনীতে কামিনীফুল নিত্যি নে যায় চোরে"—পড়িতে ভাল, গানে শুনিতে ততোধিক, কিন্তু কামিনীফুল ছুঁইতেই পড়িয়া যায়, চোরে লইবে কিরূপে? বিদ্যা হীরাকে দেখিয়া বলিতেছে—"ছেঁড়া চুলে বকুল ফুলে খোঁপা বেঁধেছ। প্রেম কি ঝালিয়ে তুলেছ॥" এই সব নাচিয়া গাহিয়া কহিবার কথা। হীরা যখন উত্তরে কিছু বলে, তখন তাহা মিঠেকড়া রসিকতা হয়; সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিদ্যার পরিণয় হইবে, এই লইয়া ঠাট্টা করিয়া হীরা বলিতেছে,—"ভাল ধ্বজা দিলি লো তুলে, এই রাজারি কুলে। সন্ন্যাসিনী হয়ে রবি, সন্ন্যাসী কুলে। আকড়াধারি মহৎ আশ্রম, অতিথ আস্‌বে রকম রকম, গাঁজাতে লাগাবি লো দম, 'বোম কেদার' বোলে॥" কৈলাসচন্দ্র বারুই ও শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়—

কৈলাস বারুই ও শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়।

এই দুই কবি গোপালচন্দ্র দাস উড়ের চেলাগিরি করিয়াছেন। ইহারা দুই জনই অতি যোগ্য শিষ্য, কৈলাস বারুই কবির আবার চুট্‌কি রাগিণী মিশাইয়া স্বভাব বর্ণনা করিবার হাতযশটুকু ছিল; নমুনা এইরূপ,—

"গা তোলরে নিশি অবসান প্রাণ। বাঁশ বনে ডাকে কাক, মালি কাটে কপিশাক, গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান।"

এই শ্রুতিসুখকর কিন্তু কুরুচি-দুষ্ট গীতরচকগণের মধ্যে দাশরথি রায় (১৮০৪—১৮৫৭ খৃঃ) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জেলা বর্দ্ধমানস্থিত বাঁদমুড়াগ্রামে দাশরথি রায়ের পিতা দেবীপ্রসাদ রায়ের বাসভূমি ছিল। কিন্তু দাশু শৈশবকাল হইতে পাটুলির নিকটবর্ত্তী পীলা নামক গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে বাস করিতেন। তিনি প্রথমতঃ সাঁকাই নামক স্থানের নীল-কুঠীতে কেরাণীগিরির পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু অকাবাই নাম্নী ইতরজাতীয়া কোন রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি চাকুরী ত্যাগ করেন। অকাবাই এক ওস্তাদী কবির দল গঠন করে, তন্মধ্যে দাশুরায় গান বাঁধিয়া দিতেন, কিন্তু অপর কোন এক কবির দলের সরকার দাশুকে ছড়া বাঁধিয়া বিশেষরূপ গালি দেন, সেই ভৎসনার কথা তাঁহার মাতা শুনিয়া পুত্রকে যথেষ্টরূপ গঞ্জনা করেন। মাতার ভৎসনায় দাশু প্রতিজ্ঞা করেন, আর কবির দলে গান বাঁধিবেন না; তদবধি তিনি পাঁচালীর দল সৃষ্টি করেন, এই নূতনাস্ত্র হস্তে দাশু দিগ্বিজয়ী হইয়াছিলেন। প্রভাস, চণ্ডী, নলিনীভ্রমরোক্তি, দক্ষযজ্ঞ, মানভঞ্জন, লবকুশের যুদ্ধ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি তাঁহার রচিত অনেক পালা এখন ছাপা হইয়াছে। তাঁহার লেখনীকে একরূপ অবিশ্রান্ত বলিতে হয়,—ইতিপূর্ব্বে যত শব্দকবি জন্মধারণ করিয়াছে, দাশু তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষিপ্রহস্ত। তাঁহার অশ্লীলতা এত জঘন্য যে তাঁহাকে অর্দ্ধ-চন্দ্র দক্ষিণা প্রদানানন্তর ভদ্রলোকের সভা হইতে দূর করিয়া দিতে ইচ্ছা হয়,—কিন্তু যেরূপ হোরেশ, বোকাসিও, বাইরণ ও ভারতচন্দ্র আদর পাইতেছেন,—দাশুও তদ্রূপ যশের কতকটা অংশী হইবেন, সন্দেহ নাই। দাশুর রচনা ভ্রমরের মত—মুখে মধু, কিন্তু হুলে বিষ বহন করে; উহা শিশুর নবোদ্গত দন্তের ন্যায়—দর্শনে সুন্দর কিন্তু দংশনে তীব্র; দাশু যে স্থলে গালি দিবেন,—সেখানে তাঁহার লেখনীসংযম অভ্যাস নাই। শত্রুর

দাশরথি রায়—১৮০৪ খৃঃ।

পাঁচালী।

গালে চূণকালী দিয়া তিনি তামাসা দেখিবেন। বৈষ্ণব নিন্দাটি দেখুন,—
"গৌরাং ঠাকুরের ভণ্ড চেংরা, যত অকাল কুষ্মাণ্ড নেড়া, কি আপদ করেছেন সৃষ্টি হরি। বলে গৌর ডাক রসনা, গৌরমন্ত্রে উপাসনা, নিতাই বলে নৃত্য করে, ধূলায় গড়াগড়ি॥ গৌর বলে আনন্দে মেতে, একত্র ভোজন ছত্রিশ জেতে, বাগ্দীকোটাল ধোপা কলুতে, একত্র সমস্ত। বিল্বপত্র জবার ফুল, দেখতে নারেন চক্ষের শূল, কালী নাম শুন্‌লে কাণে হস্ত॥ * * * কিবা ভক্তি, কি তপস্বী, জপের মালা সেবাদাসী, ভজন কুঠরী আইরি কাঠের বেড়া। গোসাঞিকে পাঁচশিকে দিয়ে, ছেলে শুদ্ধ করেন বিয়ে, জাত্যংশে কুলীন বড় নেড়া॥ ভজ হরি শ্রীনিবাস, বিদ্যাপতি, নিতাইদাস, শাস্ত্র ইহাদের অগোচর নাই কিছু। এক এক জন কিবা বিদ্যাবন্ত, করেন কিবা সিদ্ধান্ত, বদরিকাকে ব্যাখ্যা করেন কচু॥"

উপমা।

কথিত আছে কালিদাসের উপমা গুণ, নৈষধের পদলালিত্য গুণ, ও ভারবির অর্থগৌরব গুণ, এই সকল কবিগণের গুণের ইয়ত্তা আছে, কিন্তু দাশুরায়ের গুণের সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না; যখন কবি উপমা দিতেছেন, তখন দিগ্বিদিক্ জ্ঞান না করিয়া তিনি কথার ঝোঁকে চলিয়াছেন, লেখনীর মুখে মসীবিন্দু না শুকাইলে তাঁহার স্থগিত হওয়া নাই—
"পণ্ডিতের ভূষণ ধর্ম্ম জ্ঞানী, মেঘের ভূষণ সৌদামিনী, সতীর ভূষণ পতি। যোগীর ভূষণ ভস্ম, মৃত্তিকার ভূষণ শস্য, রত্নের ভূষণ জ্যোতি॥ বৃক্ষের ভূষণ ফল, নদীর ভূষণ জল, জলের ভূষণ পদ্ম। পদ্মের ভূষণ মধুকর, মধুকরের ভূষণ গুন্ গুন্ স্বর, উভয়ে উভয় প্রেম বদ্ধ॥ শরীরের ভূষণ চক্ষু যাতে জগত হয় দৃষ্ট। দাতার ভূষণ দান করে বলে বাক্য মিষ্ট॥"
কবিকে 'থাম', 'থাম' বলিয়া পরিত্রাহি চীৎকার না করিলে এই প্রবাহ স্থগিত হওয়ার নহে। 'নলিনীভ্রমরোক্তি' নামক ক্ষুদ্র পালা কবির বিদ্রূপ, কবিত্ব ও ভাষার অধিকারের এক অমর কীর্ত্তি বলা যায়।* পদ্মের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া মধুকর তীর্থ যাত্রা করিয়াছেন, এ পালায় তাহার বর্ণনা,—
"চলিলেন পদ্মিনী-স্বামী, যেন শুকদেব গোস্বামী, ডাক্‌লে কথা কন না কারু সনে।"
এইভাবে কবি কুসুম ও ভ্রমর জগৎ উপলক্ষ করিয়া তাঁহার ন্যায় নায়ক

* নিতান্ত অশ্লীল বলিয়া এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ও অকাবাইএর ন্যায় নায়িকার রসকোন্দল উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, রুচি ও পবিত্রতার অনুরোধে বলিতে হয়, এই চিত্র ঢাকা থাকাই উচিত ছিল, কিন্তু কবিত্বের আকর্ষণে তৎপ্রতি মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়।

নৈতিক প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়া দাশুকে সাহিত্যের তুলাদণ্ডে ধরিলে দেখা যাইবে, শব্দের বাঁধুনির জন্য যেরূপ প্রশংসাই দাশুর প্রাপ্য হউক না কেন, তাঁহার বিষয় ও চরিত্র বর্ণনের কৌশল আদৌ নাই। দাশুর প্রসঙ্গ-অপ্রসঙ্গ জ্ঞান নাই, সর্ব্বত্রই ইনি 'দন্তরুচি কৌমুদী' দেখাইয়া ঠাট্টার হাসি হাসিতেছেন; 'প্রভাস-মিলন' পড়িয়া দেখুন,—যে প্রভাসমিলনের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ, যুবা, বালক এক স্থানে বসিয়া কাঁদিয়া বিভোর হইয়াছেন, যে প্রভাসমিলনের সঙ্গে হিন্দুর সুখ দুঃখের কত উন্মাদকর স্বপ্ন জড়িত, দাশু তাহা বর্ণনা করিতে যাইয়া একটি নিঃসম্বল ব্রাহ্মণ তদুপলক্ষে কৃষ্ণের নিকটে ভিক্ষা চাহিয়া কিরূপে গলধাক্কা লাভ করিয়াছিল, এইরূপ একটি মিথ্যা গল্প দ্বারা প্রবন্ধ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। দাশুর পাগল প্রতিভা প্রসঙ্গাপ্রসঙ্গ গণ্য করে না। পাঁচালী পড়িতে পড়িতে স্বতঃই মনে হয়, যেন বহুসংখ্যক ইতর ও অর্দ্ধশিক্ষিত লোকমণ্ডলীর মধ্যে দাশু গাহিয়া যাইতেছে; যে কথা শুনিয়া শ্রোতৃগণ বিমুগ্ধ হইতেছে, দাশু প্রসঙ্গ ভুলিয়া সেই দিকেই গল্পের স্রোত বহাইয়া দিতেছে,—অপেক্ষাকৃত ভাবুক শ্রোতা মূল গল্প শুনিতে উৎসুক হইয়া মনে মনে সা, ঋ, গ, মা বাঁধিয়া সুর দিতেছেন এবং কোন্ সময় কবি মূল সুর ধরিবেন, তাহার অপেক্ষা করিতেছেন,—ইতিমধ্যে দেখিলেন পালা শেষ হইয়া গিয়াছে।

উপাখ্যানভাগে অপটুতা।

দাশুর পাঁচালী সম্বন্ধে আমরা যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করি না কেন, তাঁহার রচিত শ্যামাবিষয়ক গানগুলির প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিব; এখানে বাক্যচপল অসার আমোদপ্রিয় শব্দকুশল দাশু সহসা ধর্ম্ম-গম্ভীর গুরুত্ব দ্বারা স্বীয়

শ্যামাসঙ্গীত।

গানগুলিতে এক আশ্চর্য্য বৈরাগ্য ও ভক্তিপ্লুত কাতরতা ঢালিয়া দিয়াছেন; "দোষ কা'রও নয় গো মা" প্রভৃতি গান প্রকৃত বৈরাগ্য ও অনু-শোচনার অশ্রুতে পবিত্র। দোষ রামশ্যামের, আমি ত সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, প্রতিবাসী ও আত্মীয়বর্গের দোষ গাহিয়া গাহিয়া, জীবনের অনেকাংশ অতিবাহিত করিয়াছি; কিন্তু এমন দিনও আসিতে পারে যখন পরচ্ছিদ্র-অনুসন্ধিৎসু চক্ষুর গতি ফিরিয়া যায়, এবং নষ্টযুক্তি দ্বারা স্বীয় কার্য্য সমর্থনের চেষ্টা সম্পূর্ণ পরাভূত হয়, তখন মায়াতিমিরানুলিপ্ত সংসারচিত্র চক্ষু হইতে সরিয়া পড়ে, এবং নিঃসহায় হইয়া জগন্মাতার পদপ্রান্তে লুটা-ইয়া পড়িয়া মানুষ নিজের মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পায়। এই পুণ্যক্ষেত্রে রিপুবশে নিজে কূপ কাটিয়া ডুবিয়াছি, কাহাকে দোষ দিব? "দোষ কা'রও নয় গো মা" বলিয়া সরল মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে তখন দয়ার জন্য, ক্ষমার জন্য লালায়িত হইয়া পড়ি,—অভিমানস্ফীত মানুষ—প্রকৃতির মহাকরুণাময়ী মাতৃরূপিণী শক্তির নিকট তখন একটি নিঃসহায় শিশুর ন্যায় কৃপা-ভিখারী; এই ভাবের গান দাশরথির অনেকগুলি আছে। একটি বৈষ্ণব-বিষয়ক সঙ্গীতে দাশু রাধাকৃষ্ণের রূপকের বড় সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন, সেই গানটি আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি,—

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা।

"হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি। ওহে ভক্তি-প্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধা-সতী॥ মুক্তি কামনা আমার (ই), হবে বৃন্দে গোপনারী, আমার দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী॥ ধর ধর জনার্দ্দন, পাপ-ভার-গোবর্দ্ধন, কামাদি ছয় কংসচরে ধ্বংস কর সম্প্রতি॥ বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী, মনধেনুকে বশ করি, গোষ্ঠের সাধ কৃষ্ণ পুরাও, পদে তোমার এই মিনতি॥ প্রেমরূপ যমুনার কূলে, আশাবংশীবটমূলে, 'দাস' ভেবে সদয় হয়ে সদা কর বসতি॥ যদি বল সে রাখাল প্রেমে, বদ্ধ আছ ব্রজধামে, জ্ঞানহীন রাখাল তোমার দাস হ'তে চায় দাশরথি॥"

ইহার আর একটি শ্যামাবিষয়ক গানের কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ভক্তের নিকট মৃত্যুচিন্তাও কেমন সুখস্বপ্নময়, পাঠক গানটি পড়িয়া তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন;—

আর একটি গান।

"দুর্গে ক'র মা এ দীনের উপায়, যেন পায়ে স্থান পায়। আমার এ দেহ পঞ্চত্ব কালে, তব প্রিয় পঞ্চস্থলে, আমার পঞ্চভূত যেন মিশায়। শ্রীমন্দিরে অন্তর আকাশ যেন যায়। এ মৃত্তিকা যায় যেন ত্বৎপ্রতিমায়, মা মোর পবন তব চামর ব্যজনে যায়, হোমাগ্নিতে মমাগ্নি যেন মিশায়। আমার জল যেন যায় পাদ্যজলে, যেন ভবে যায়, বিমলে, দাশরথির জীবন মরণ দায়।"

দাশুর রুচি, দাশুর জীবন ও সাহিত্যের প্রতিভা আমাদিগকে জার্ম্মান্ কবি স্কুবার্ডের কথা স্মৃতিতে উদ্রেক করে।

কবির মৃত্যুর পর তাঁহার "ভাই তিনকড়ি" ও ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় কিছুকাল তাঁহার দল রাখিয়াছিলেন। কিন্তু 'পাঁচালীর' দল তাঁহার মৃত্যুর পরে আর প্রতিপত্তি লাভ করে নাই—যাঁহারা তাঁহার অনুকরণ করিয়া 'পাঁচালী' লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে শ্রীরামপুরের নিকটস্থ বড়াগ্রামনিবাসী কায়স্থকুলোদ্ভব রসিকচন্দ্র রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

পুনরায় বৈষ্ণব-গীতি।

কদর্য্য আদিরসের স্রোত হইতে দূরে নির্ম্মল বৈষ্ণব সঙ্গীতের ধারা পুনঃ বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই সঙ্গীত প্রাণের কামনা ও নিঃস্বার্থতার আবেগে পূর্ণ। এই গীতগুলি যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণকান্ত চামার, নীলমণি পাটুনী, নিত্যানন্দ বৈরাগী, ভোলানাথ ময়রা, মধুসূদন কিন্নর, গোজলা গুঁই, রঘুনাথ দাস তন্তুবায়, প্রভৃতি কবিগণ নিম্নশ্রেণী হইতে উদ্ভূত হন। বস্তুতঃ কবিওয়ালাগণের বহুসংখ্যক গীতি-রচকই হিন্দুসমাজের অধস্তন স্তর হইতে উৎপন্ন। যখন বড় বড় রাজগণ, সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বিশিষ্ট ভদ্রলোকবর্গ বঙ্গসাহিত্যকে কৃত্রিম সৌন্দর্য্য দ্বারা শ্রীসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন ও বিলাসের পঙ্ক দ্বারা ইহাকে কাব্য-পিপাসুর অসেব্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, তখন নিম্নশ্রেণীর লোকগণ ভাষার বিশুদ্ধতা ও রুচির নির্ম্মলতা রক্ষা করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন, ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই বিশেষ কার্য্যকর হইয়াছিল, সন্দেহ নাই—যে দেশের সামাজিক পদবীতে

নিতান্ত ঘৃণ্য ও অধঃপতিত ব্যক্তিগণ তদ্রূপ উৎকৃষ্ট নিষ্কাম প্রেমের কথা বলিতে পারে—সে দেশ কোন একরূপ সভ্যতার উচ্চ আদর্শ আয়ত্ত করিয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে।

রামনিধি রায়—১৭৪১ খৃঃ।

কবিওয়ালাগণের সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে আমরা রামনিধি রায়ের উল্লেখ করা উচিত মনে করি। ইনি ১৭৪১ খৃঃ অব্দে পাণ্ডুয়ার নিকট চাঁপাতা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন, পরে কলিকাতা—কুমারটুলি আসিয়া বাস স্থাপন করেন। ইনি ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কার্য্য করিতেন। ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে ৯৩ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। রামনিধি রায়ের গানগুলি সাধারণতঃ 'নিধুর টপ্পা' বলিয়া খ্যাত। প্রাচীন সাহিত্যে কবি নিধুরায় স্বতন্ত্রপথাবলম্বী; ইনি প্রেমসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, অথচ রাধাকৃষ্ণ কি বিদ্যাসুন্দর-প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করেন নাই, নিজের ভালবাসা ও মনের ব্যথা স্বাধীনভাবে গাহিয়াছেন, ইহা বঙ্গসাহিত্যে তৎকালে নূতন প্রথা। তাঁহার প্রেমসংগীতে সঙ্গত রুচি ও আত্মসমর্পণের কথা অধিক,—"ভাল বাসবে বলে ভালবাসিনে। আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥" "সুরভি গরবে কে তব তুলনা হবে, আপনি আপন সম্ভবে, যেমন গঙ্গা পূজা গঙ্গাজলে।" "তোমার বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে। আমি মাত্র এই চাই, মরি তাহে ক্ষতি নাই, তুমি আমার সুখে থাক, এ দেহে সকলি সবে॥" "যেও যেও প্রাণনাথ প্রেম নিমন্ত্রণ, নয়ন জলে স্নান করাব, কেশেতে মুছাব চরণ।" বিদ্যাসুন্দরাদির পঙ্কিল স্রোত হইতে সমুত্থান করিয়া পাঠক এই নিঃস্বার্থ উচ্চ অঙ্গের প্রেমের রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সুখী হইবেন, সন্দেহ নাই।

কবিওয়ালাগণ।

এখানে আমরা সংক্ষেপে কবিওয়ালাগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। শ্যামাসঙ্গীতরচকগণের বিষয় পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি, এস্থলে শুধু বৈষ্ণব সঙ্গীতকারগণের প্রসঙ্গ লিখিতেছি।

কবিগণ প্রথমে "দাঁড় কবি" নামে পরিচিত ছিলেন· আসরে দাঁড়াইয়া কবিতা প্রস্তুত করিতেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহারা এই খেতাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রঘু, মতে, নন্দ, এই তিনজনই সর্ব্বপ্রথম কবিওয়ালা বলিয়া পরিচিত হন। ইঁহারা বাঙ্গালা একাদশ শতাব্দীর লোক। রঘু চর্ম্মকার জাতীয় ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ প্রচার করিয়াছিলেন, অপর এক দলের মতে তিনি কায়স্থ ছিলেন।

রামবসুর বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। ইঁহার রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক গানগুলিই বিশেষ প্রশংসনীয়। রাধা জলে প্রতিবিম্বিত শ্রীকৃষ্ণের স্নিগ্ধ রূপ দেখিয়া বিমুগ্ধা, অশ্রুনেত্রে করযোড়ে সেই রূপ দেখিতেছেন ও সখীগণকে বলিতেছেন,—"ঢেউ দিও না কেউ এ জলে, বলে কিশোরী। দরশনে দাগা দিলে, হবে পাতকী।" এই দৃশ্য ছবির উপযুক্ত। রামবসুর বিরহে বঙ্গবধূর প্রেমপূর্ণ সলাজ হৃদয়টি অঙ্কিত হইয়াছে, বাঙ্গালী জানেন এ দেশে সেই হৃদয়ের দাম নাই। "যখন হাসি হাসি সে আসি বলে। সে হাসি দেখি ভাসি নয়ন জলে।" তাঁহার বিদায়ের সময়ের এই নিষ্ঠুর হাসি দেখিয়া যত দুঃখ হইয়াছিল, তাহা মানিনী লজ্জায় জানাইতে পারেন নাই। "তার মুখ দেখে মুখ ঢেকে কাঁদিলাম স্বজনি। অনায়াসে প্রবাসে গেল সে গুণমণি॥" সে হাসিতে হাসিতে অনায়াসে চলিয়া গেল—কিন্তু নীরব অশ্রুপূর্ণ একখানা সুন্দর মুখ এবং বুক ভাঙ্গা লজ্জা ও বিরহের একখানি ম্রিয়মাণ মধুর ছবি পাছে ফেলিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ভঙ্গে রাধিকা আবার কাঁদিতেছে—দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ বদন ঢেকে যেও না। * * তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না॥" পৃথিবীর উর্দ্ধভাগে অল্পকালশ্রুত চলন্ত স্বর্গবাসী পাখীর মধুর স্বরের ন্যায় এই সব কবির গীত সহসা মন মুগ্ধ করিয়া ফেলে। রামবসুর গানে মধ্যে মধ্যে অনুপ্রাসের লীলা আছে, যথা,—"এত ভৃঙ্গ নয় ত্রিভঙ্গ বুঝি এসেছে শ্রীমতীর কুঞ্জে, গুন্ গুন্ স্বরে কেন অলি, শ্রীরাধার শ্রীপদে গুঞ্জে।"

রামবসু।

হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে কলিকাতা সিমুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। হরুঠাকুর প্রথমতঃ রঘুনাথ দাস নামক একজন তন্তুবায়ের নিকট কবিতা রচনা শিক্ষা করেন। কথিত আছে, একদিন হরুঠাকুর মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়ীতে এক পেশাদারী কবির দলে সখ করিয়া গাহিতেছিলেন, রাজা তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে এক জোড়া শাল প্রদান করেন, হরুঠাকুর অপমান বোধ করিয়া সেই শাল জোড়া তৎক্ষণাৎ ঢুলির মস্তকে নিক্ষেপ করেন। হরুঠাকুর রামবসুর ন্যায় প্রতিভাপন্ন না হইলেও স্নিগ্ধ ও মধুর কথা রচনায় দক্ষ ; একটি গান এইরূপ,—"হরিনাম লইতে অলস হ'ও না, রসনা যা হবার তাই হবে। ঐহিকের সুখ হল না বলে, কি ঢেউ দেখি তরী ডুবাবে॥"

হরু ঠাকুর—১৭৩৮ খৃঃ।

বিরহ-বর্ণনায় হরুঠাকুর সিদ্ধহস্ত ছিলেন,—একটি গানের কতকাংশ উদ্ধৃত হইল ;—

"সুধীর ধার বহিছে এই ঘোরতরা রজনী।
এ সময়ে প্রাণসখীরে কোথায় গুণমণি, ঘন গরজে ঘন শুনি॥
ঐ ময়ুর ময়ুরী হরষিত, হেরি চাতক চাতকিনী,
এ কদম্ব কেতকী চম্পক জাঁতি সেউতি সেফালিকে,
ঘ্রাণেতে প্রাণেতে মোহ জন্মায় প্রাণনাথে গৃহে না দেখে,
বিদ্যুত খদ্যোত দিবা জ্যোতি মত প্রকাশে দিনমণি,
প্রিয় মুখে মুখ দিয়ে শারীশুক থাকে দিবস রজনী॥"

১৮১৩ খৃঃ অব্দে হরুঠাকুরের মৃত্যু হয়।

রাসু ও নৃসিংহ—ইঁহারা দুই সহোদর, ফরাসডাঙ্গার অধীন গোন্দলপাড়া গ্রামে বাস করিতেন। ইঁহারা সখী-সংবাদ গান রচনা করিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। অনুমান ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইঁহারা সঙ্গীত রচনা করেন। রচনার নমুনা যথা—"শ্যাম তোমার চরিত, পথিক যেমত, হোয়ে শ্রান্তিযুত, বিশ্রাম করে। শ্রান্তি দূর হলে, যায় পুন চলে, পুন নাহি চায় ফিরে॥"

রাসু ও নৃসিংহ এবং অপরাপর কবিওয়ালাগণ।

এতদ্ব্যতীত প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বের কবি গোঁজলাগুঁই রচিত অনেকগুলি গান পাওয়া যাইতেছে। নিত্যানন্দদাস বৈরাগী (১৭৫১ খৃঃ—১৮২১ খৃঃ) চন্দননগরবাসী ছিলেন। ইনিও একজন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ছিলেন। তাঁহার দলে রচিত কোন কোন গান বড় মিষ্ট, যথা—বঁধুর বাঁশী বাজে বিপিনে। শ্যামের বাঁশী বুঝি বাজে বিপিনে। নহে কেন অঙ্গ অবশ হইল, সুধা বরষিল শ্রবণে॥ বৃক্ষডালে বসি, পক্ষী অগণিত, জড়বৎ কোন্ কারণে। যমুনার জলে, বহিছে তরঙ্গ, তরু হেলে বিনে পবনে॥" আমাদের আর স্থানে কুলাইতেছে না, সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্র চর্ম্মকার (কৃষ্টে মুচি), লালু নন্দলাল, নিত্যানন্দ ভবানী, নীলমণি পাটুনি, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য, সাতুরায়, গদাধর মুখোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী, রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, গোরক্ষনাথ, নবাইঠাকুর, গৌরকবিরাজ প্রভৃতি বহুবিধ কবিওয়ালার গান উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। কিন্তু এস্থলে যজ্ঞেশ্বরী নাম্নী রমণী কবি রচিত একটি সখীসংবাদ গানের কতকাংশ তুলিয়া দেখাইতেছি,—"কর্ম্মক্রমে আশ্রমে সখা হলে যদি অধিষ্ঠান। হেরে মুখ, গেল দুঃখ, দুটো কথার কথা বলি প্রাণ। আমায় বন্দী করি প্রেমে, এখন ক্ষান্ত হলে হে ক্রমে ক্রমে, দিয়ে জলাঞ্জলি এ আশ্রমে। আমি কুলবতী নারী, পতি বই আর জানিনে॥ এখন অধীনী বলিয়া ফিরে নাহি চাও, ঘরের ধন ফেলে প্রাণ, পরের ধন আগুলে বেড়াও। নাহি চেন ঘর বাসা, কি বসন্ত কি বরষা, সতীরে করে নিরাশা, অসতীর আশা পূরাও॥"

যজ্ঞেশ্বরী।

আমরা ভোলাময়রা কবির নাম একবার উল্লেখ করিয়াছি; ইনি হরুঠাকুরের চেলা ছিলেন, তাঁহার 'ভোলানাথ' নামে-শিবত্ব আরোপ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী দল ব্যঙ্গ করাতে ভোলা গালি খাইয়া বলিতেছে—"আমি সে ভোলানাথ নই, আমি সে ভোলানাথ নই। আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা, শ্যামবাজারে রই, আমি যদি সে ভোলানাথ হই, তোরা সবাই, বিল্বদলে আমায় পূজলি কই॥" পূর্ব্বোক্ত কবিগণ ছাড়া মধুসূদন কিন্নররচিত রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক অনেকগুলি পদ পাওয়া যায়।

ভোলাময়রা।

এই সময় পূর্ব্ববঙ্গেও বহুসংখ্যক কবিওয়ালা উৎকৃষ্ট গান রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত কবিগণের পার্শ্বে দাঁড়াইবার যোগ্য; আমরা আপাততঃ তাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিতে পারিলাম না; সংগ্রহকার্য্য সম্পূর্ণ হইলে, পরে তাহা পাঠকগণের বিদিত করিতে ইচ্ছা রহিল। পূর্ব্ববঙ্গের কবিওয়ালা রামরূপঠাকুর-কৃত একটি সখীসংবাদ গান মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিতেছি —(চিতান) "শ্যাম আসার আশা পেয়ে, সখীগণ সঙ্গে নিয়ে, বিনোদিনী।

পূর্ব্ববঙ্গের রামরূপঠাকুর।

যেমন চাতকিনী পিপাসায়, তৃষিতা জল-আশায়, কুঞ্জ সাজায় তেম্নি কমলিনী॥ তুলে জাতী যূথি কুট্‌রাজ বেলি, গন্ধরাজ ফুল কৃষ্ণকেলী, নবকলি অর্দ্ধবিকসিত, যাতে বনমালী হরষিত, সাজাল রাই ফুলের বাসর, আস্‌বে বলে রসিক নাগর, আশাতে হয় যামিনী ভোর, হিতে হল বিপরীত। ফুলের শয্যা সব বিফল হল, অসময়ে চিকণ কালা বাঁশী বাজায়। রঙ্গদেবী তায় বারণ করে দ্বারে গিয়ে। (ধুয়া) ফিরে যাও হে নাগর, প্যারী বিচ্ছেদে হয়ে কাতর, আছে ঘুমাইয়ে। ফিরে যাও শ্যাম তোমার সম্মান নিয়ে। (পর চিতেন) ছিলে কাল নিশীথে যার বাসরে॥ বঁধু তারে কেন নিরাশ করে, নিশি শেষে এলে রসময়। বঁধু প্রেমের অমন ধর্ম্ম নয়। তুমি জান্‌তে পার সব প্রত্যক্ষে, দুই প্রেমেতে যে জন দীক্ষে, এক নিশিতে প্রেমের পক্ষে, দুইএর মন কি রক্ষা হয়। প্যারী ভাগের প্রেম কর্‌বে না, রাগেতে প্রাণ রাখ্‌বে না, এখন মর্‌তে চায় যমুনায় প্রবেশিয়ে॥"

কবিওয়ালাগণের সঙ্গে যাত্রাওয়ালা দলেরও উল্লেখ আবশ্যক। সখীসংবাদগান অপেরার ন্যায়, কিন্তু যাত্রাগুলি দেশীয় নাট্যাভিনয়,—এদেশে শ্রীকৃষ্ণযাত্রাই প্রথম অভিনীত হইত বলিয়া বোধ হয়,—শ্রীকৃষ্ণযাত্রার সাধারণ নাম ছিল 'কালিয়দমন'; কিন্তু এই যাত্রা শুধু নামের অর্থে সীমাবদ্ধ ছিল না, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকার লীলাই এই 'কালিয়দমন' যাত্রায় অভিনীত হইত। আমরা এস্থলে প্রাচীনকালের বড় বড় যাত্রাওয়ালা অধিকারী মহাশয়দিগের নাম উল্লেখ করিয়া যাইব; গোপালচন্দ্র দাস-উড়ের নাম আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। যাত্রাগুলির সর্ব্বাদৌ "গৌরচন্দ্রী" পাঠ হইত, তাহাতে বোধ হয় মহাপ্রভুর পরে যাত্রাসমূহ বর্ত্তমান আকারে প্রবর্ত্তিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণযাত্রায়,—বীরভূমনিবাসী পরমানন্দ অধিকারীর নাম সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তৎপর শ্রীদাম সুবল অধিকারী কৃষ্ণলীলা-[illegible] যশ অর্জ্জন করেন। এই

শ্রীকৃষ্ণ যাত্রা।

কবির সমসাময়িক লোচন অধিকারী অক্রূরসংবাদ এবং নিমাইসন্ন্যাস গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ইনি কুমারটুলির বিখ্যাত বনমালী সরকার ও মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়ীতে গাহিয়া তাঁহাদিগকে এরূপ মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলেন যে তাঁহারা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া কবিকে অপরিমিত সংখ্যক মুদ্রা দান করেন। করুণ রসে বিপ্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় কলিকাতার অন্য কোন ধনী ব্যক্তি ইহাকে গান গাইবার জন্য আহ্বান করিতে সাহসী হন নাই। জাহাঙ্গীরপাড়া—কৃষ্ণনগরনিবাসী গোবিন্দ অধিকারী ও কাটোয়াবাসী পীতাম্বর অধিকারী, ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুরনিবাসী কালাচাঁদ পাল শ্রীকৃষ্ণযাত্রায় পরসময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পাতাইহাটের প্রেমচাঁদ অধিকারী, আনন্দ অধিকারী ও জয়চাঁদ অধিকারী রামযাত্রায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ফরাসডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বল্লভ চণ্ডীযাত্রা ও বর্দ্ধমানের পশ্চিমাংশ-নিবাসী লাউসেন বড়াল 'মনসার ভাসান' পালা গাহিতেন ও দুই জনেই স্ব স্ব বিষয়ে অদ্বিতীয় যশস্বী ছিলেন।*

পূর্ব্ববঙ্গ কৃষ্ণযাত্রার এক বিশেষ অভিনয়ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সকল যাত্রালেখক কবিগণের নাম ও গ্রন্থাদির উল্লেখ আমরা এখন করিতে পারিলাম

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

না—কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে যিনি পূর্ব্ববঙ্গের যাত্রাগুলির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তিনি পূর্ব্ববঙ্গের লোক ছিলেন না। এই গীতি-কাব্য-শাখায় আমারা যে সকল কবির নাম উল্লেখ করিলাম, কৃষ্ণকমল গোস্বামী তাঁহাদিগের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরে কৃষ্ণকমলের ন্যায় পদকর্ত্তা

* ভারতী, মাঘ, ১২৮৮।

আর জন্মগ্রহণ করেন নাই—তিনি এই বৈষ্ণব-গীতি-সাহিত্যের পুনরুত্থান-কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।

বংশাবলী।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বচর বৈদ্যবংশীয় সদাশিব কবিরাজের বংশোদ্ভব; বংশাবলী এইরূপ, ১। সদাশিব, ২। পুরুষোত্তম, ৩। কানাই ঠাকুর, ৪। বংশীবদন, ৫। জনার্দ্দন, ৬। রামকৃষ্ণ, ৭। রাধাবিনোদ, ৮। রামচন্দ্র, ৯। মুরলীধর, ১০। কৃষ্ণকমল। সুখসাগর ইঁহাদিগের আদিম বাসস্থান ছিল, পরে যশোহর বোধখানা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন; বোধখানা গ্রাম হইতে এক শাখা নদীয়া ভাজনঘাট গ্রামে উপনিবিষ্ট হন। কৃষ্ণকমলের পিতা মুরলীধর ভাজনঘাটবাসী ছিলেন। এই বৈষ্ণব-বৈদ্যবংশের এক বিশেষ শ্লাঘার বিষয় এই,—পুরুষোত্তম গোস্বামী নিত্যানন্দ প্রভুর জামাতা মাধবাচার্য্যের গুরু ছিলেন, সুতরাং ইঁহারা নিত্যানন্দ-প্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবীর স্বামী ও সন্তান সন্ততির গুরুকুল।

বাল্যজীবন।

কৃষ্ণকমল ১৮১০ খৃঃ অব্দে ভাজনঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা সাধ্বী যমুনাদেবী পরদুঃখকাতরা আদর্শ-রমণী ছিলেন। সপ্তম বৎসর বয়স্ক বালককে মাতৃক্রোড়বঞ্চিত করিয়া মুরলীধর ঠাকুর বৃন্দাবনে লইয়া যান। সেইখানে কৃষ্ণকমল ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ করেন,—কথিত আছে, তথাকার এক নিঃসন্তান ধনকুবের বালক কৃষ্ণকমলের স্নিগ্ধ রূপ ও হরিভক্তির উদ্দাম ভাবাবেশ দেখিয়া তাহাকে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া পোষ্য পুত্র স্বরূপ রাখিতে ইচ্ছা করেন। মুরলীধর এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতির জন্য পুত্রসহ পলাইয়া গৃহে আগমন করেন। ৬ বৎসর পরে মাতা যমুনা-দেবী পুনরায় শিশুর মুখচুম্বন করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণকমল নবদ্বীপের টোলে পাঠ সাঙ্গ করিয়া 'নিমাইসন্ন্যাস' যাত্রা রচনা করেন ও তাহা অভিনয় করিয়া নবদ্বীপবাসীদিগকে মুগ্ধ করেন।

ইহার পর তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়সে কৃষ্ণকমল হুগলীর সোমড়া বাঁকিপুর গ্রামে স্বর্ণময়ীদেবীর পাণি গ্রহণ করেন। বিবাহের পর তিনি স্বীয় বদান্য শিষ্য [illegible]শোরের সঙ্গে ঢাকায় আগমন করেন। এই সময় হইতে তাঁহার কবিত্বের বিকাশ পাইতে থাকে। সেই সময় ঢাকা সংগীতচর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, যাত্রার নানা দল তথায় প্রতিযোগিতা করিতেছিল, কৃষ্ণকমলের "স্বপ্নবিলাস" রচিত হওয়ার পর সেই সব প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সকলেই নূতন কবির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিল। বৈরাগিগণ সারেং লইয়া স্বপ্নবিলাসের গান বাজাইতে লাগিল, বালকগণ পথে পথে চীৎকার করিয়া—"এঘর হতে ওঘর যেতে, অঞ্চল ধরি সাথে সাথে, বল্‌ত দে মা ননী খেতে, সে ননী অবনীতে পড়ে র'ল গো" প্রভৃতি গাহিতে লাগিল। স্বপ্নবিলাস রচিত হওয়ার পুর ৫০ বৎসর অতীত হইয়াছে, এখনও পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে সেই সব সংগীত গাহিয়া প্রেমিকগণ নীরবে অশ্রুপাত করেন,—সেই নির্ম্মল স্বার্থশূন্য স্বর্গীয় ভাবপূর্ণ বাণীগুলি মর্ত্ত্যধামের দুঃখপীড়িত লোকের মনে উৎকৃষ্ট নিষ্কাম প্রবৃত্তির উদ্রেক করিয়া দেয়। আবদুলাপুর গ্রামে 'স্বপ্নবিলাসের' প্রথম অভিনয় হইয়াছিল। তৎপর কবি 'রাই-উন্মাদিনী,' 'বিচিত্র-বিলাস,' 'ভরত মিলন,' 'নন্দ হরণ,' 'সুবল সংবাদ' প্রভৃতি পালা রচনা করেন। বিচিত্র-বিলাসের ভূমিকায় কবি 'রাই-উন্মাদিনী' ও 'স্বপ্নবিলাসের' কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—"বোধ হয় ইহাতে সাধারণেরই প্রীতি সাধিত হইয়াছিল, নতুবা প্রায় বিংশতি সহস্র পুস্তক স্বল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষিত হইবার সম্ভাবনা কি?" ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় 'স্বপ্নবিলাস,' 'রাই-উন্মাদিনী' এবং 'বিচিত্রবিলাস' জর্ম্মেনী, রুসিয়া প্রভৃতি দেশে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন ও লণ্ডন হইতে এই তিন পুস্তক অবলম্বন করিয়া "The Popular Dramas of Bengal" নামক সুন্দর পুস্তক প্রণয়ন করেন।

স্বপ্নবিলাস।

অন্যান্য গ্রন্থ।

কৃষ্ণকমল অসামান্য প্রসিদ্ধির সহিত ঢাকায় শেষজীবন অতিবাহিত করেন। প্রসিদ্ধ ডাক্তার সিম্‌সন্ সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন ও 'পণ্ডিত গোঁসাই' বলিয়া সম্বোধন করিতেন,—"বড়গোঁসাই" বলিলে ঢাকাবাসী লোক কৃষ্ণকমলকে বুঝিতেন। অশ্রুগদ্‌গদকণ্ঠে যখন "বড়গোঁসাই" ভাগবত পড়িতেন, তখন তাঁহার করুণ ব্যাখ্যায় কঠিন হৃদয় দ্রব হইত। জীবনে তিনি অনেক পাষাণ কোমল করিয়াছিলেন।

শেষ জীবন।

কবির বৃদ্ধ বয়সে জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যগোপাল গোস্বামীর মৃত্যু হয়। এই শোকে ও নানারূপ জটিল ব্যাধিতে তাঁহার শরীর ভগ্ন হয়,—১৮৮৮ খৃঃ। ১২ই মাঘ—৭৭ বৎসর বয়ঃক্রমে চুঁচুড়ার নিকট গঙ্গাতীরে তাঁহার লীলার অবসান হয়। তাঁহার পুত্র নিত্যগোপাল গোস্বামী এখনও ঢাকায় আছেন, এবং তাঁহার পৌত্র কামিনীকুমার গোস্বামী অল্প দিন হইল কলিকাতা হইতে 'কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলীর' এক নব সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর অপরাপর বিষয় সম্বন্ধে ১৮৯৪ সনের মার্চ্চ মাসের 'ন্যাসনাল্ ম্যাগাজিনে' এবং পৌষ মাসের 'সাহিত্যে' আমরা বিস্তারিত ভাবে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম।

কৃষ্ণকমল গোস্বামীর "রাই-উন্মাদিনী"ই বিশেষ প্রশংসনীয় কাব্য। এই পুস্তকের প্রতি পত্রেই চৈতন্যদেবকে মনে পড়িবার বিষয় আছে। যাঁহারা "চৈতন্য-চরিতামৃত" প্রভৃতি পুস্তক পড়েন নাই, তাঁহারা "রাই-উন্মাদিনীর" স্বাদ ভাল করিয়া পাইবেন না,—অঙ্কিত চিত্রখানি বৃন্দাবনের উন্মাদিনীর নামে নবদ্বীপের উন্মাদের। কৃষ্ণকমল পুস্তকের সূচনায় বলিয়াছেন,—"স্বাদিতে নিজ মাধুরী, * * * নাম ধরি গৌরহরি বিরহেতে হরি, কাঁদি বলে হরি হরি।" চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যখণ্ডে, ৮ম পরিচ্ছেদে ঠিক এই কথাই আছে,—"আপন মাধুর্য্য হরে আপনার মন। আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন॥"

রাই-উন্মাদিনী।

আমরা নরসিসাসের ন্যায় আত্মরূপে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ দিয়া থাকি, বাহিরের বস্তুতে কে কবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে! বাহিরের বস্তু উপলক্ষ করিয়া স্বীয় আদর্শরূপেরই সত্তা অনুভব করিয়া থাকি; এই রূপের আদর্শ ব্যক্তিগত; রূপ বস্তুগত হইলে সুন্দর ফুল কি স্নিগ্ধ পল্লবটি দেখিয়া মানুষের ন্যায় ইতর প্রাণিগণও মুগ্ধ হইত; জাতিগত হইলে চীন-দেশের ক্ষুদ্র পদ দেখিয়া আমরা সুখী হইতাম; সমাজগত হইলে দুই প্রতিবাসীর রুচি স্বতন্ত্র হইত না। আমরা প্রত্যেকে 'নিজের মাধুরী' দেখিয়া পাগল, সুতরাং ভালবাসাকে একার্থে আত্মরমণ বলা যাইতে পারে; নিজের কামনার প্রতিবিম্বই রূপ ধারণ করিয়া আমাদিগের অনুসরণ করিয়া থাকে।* গৌর অবতারে এই প্রেম-লীলা অতি পরিস্ফুট—নিজকে দুই ভাবিয়া এই প্রেমের উদ্ভব, তখন—"দুটি চক্ষে ধারা বহে অনিবার, দুঃখে বলে বারে বার, স্বরূপ দেখারে একবার,—নতুবা এবার মরি। ক্ষণে গোরাচাঁদ, হৈয়ে দিব্যোন্মাদ, উদ্দীপন ভাবে ভেবে কালাচাঁদ, ধরতে যায় করিয়া দৈন্য।"—(রাই-উন্মাদিনী)। কৃষ্ণ-কমলের চক্ষে এই বিরহী গৌরচন্দ্রের মধুর মূর্ত্তি প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহাই তিনি "রাই-উন্মাদিনী"-রূপ উৎকৃষ্ট রূপক চিত্রে পরিণত করিয়া-ছেন। কৃষ্ণকমল এই প্রেমস্নিগ্ধ গোরা রূপের তুলনায় অন্য সমস্ত রূপ অপকৃষ্ট মনে করিয়াছেন—"চাঁদে যে কলঙ্ক আছে। ছি, ছি, চাঁদ গোরাচাঁদের কাছে॥" প্রেমিক নিজেই পূর্ণ—তবে বিরহ কেন? গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন,—"তবে যে গোপিকার হয় এতই বিষাদ। তার হেতু প্রোষিতভর্ত্তৃকা রসাস্বাদ॥ স্ফূর্ত্তিরূপে মূর্ত্তি যখন দেখেন নয়নে। তখন ভাবেন বুঝি এল বৃন্দাবনে॥ অদর্শনে ভাবেন কৃষ্ণ গেছে মধুপুরী।" (রাই-উন্মাদিনী)। এই মিলন-বিরোধী পথের অন্ত-রায় যমুনা, যাহা অদ্বৈত ভাবটিকে দ্বৈতভাবে দ্বিখণ্ড করিয়া বিরহের সৃষ্টি

---

* লর্ড বাইরণের পদে এই তত্ত্বের আভাস দৃষ্ট হয়।—

"It is to create and in creating live,
A being more intense, that we endow,
With form our fancy, gaining as we give the life we enjoy."

করিতেছে,—তাহা আত্মবিস্মৃতি মাত্র। চৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে চতুর্থ পরিচ্ছেদে এই কথার বিশেষরূপ আলোচনা আছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কৃষ্ণকমলের রাধিকা—চৈতন্যদেবের ছায়া। তাঁহার প্রেমের আবেগ—নির্ম্মল, নিষ্কাম ও আত্মবিস্মৃতিপূর্ণ। রাধিকা এই প্রেমের আবেশে জড় জগতের স্তরে স্তরে কৃষ্ণসত্তা অনুভব করিতেছেন, তাঁহার প্রেম-বিলাপ প্রলাপের ন্যায় অসম্বন্ধ, মধুর ও আত্ম-বিহ্বলতার কারুণ্যে মাখা। কবি প্রেম চিত্রের মোহিনীতে মুগ্ধ, রাধিকাকে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে সুন্দরী করিয়া গড়িয়াছেন। তাঁহার প্রেম-মাখা কণ্ঠধ্বনি ও প্রেমাশ্রু উদ্বেলিত চক্ষুর সৌন্দর্য্য বুঝাইতে কম্বু কি কমলের তুলনার আবশ্যকতা নাই। চন্দ্রাবলী মূর্চ্ছাপন্ন রাধিকার রূপ দেখিয়া বলিতেছে,—

কৃষ্ণকমলের রাধিকা।

"যখন বঁধুর বামে দাঁড়াইত, আবার হেসে হেসে কথা ক'ত, তখন এই না মুখে—মুখের কতই যেন শোভা হ'ত—তা নৈলে এমন হবে বা কেন, বঁধু থেকে আমার বক্ষঃস্থলে, কেঁদে উঠ্‌ত রাধা বলে।"—"বঁধু থেকে কুসুমশয্যায়, হৃদয়ে রাখ্‌ত যায়, সে ধন আজ ধূলায় গড়াগড়ি যায়।" "অতুল রাতুল কিবা চরণ দুখানি। আল্‌তা পরাত বঁধু কতই বাখানি—এ কমল চরণে যখন চলিত হাঁটিয়ে—বঁধুর দরশন লাগি গো অনুরাগে। হেন বাঞ্ছা হ'ত যে পাতিয়ে দেই হিয়ে॥" পাঠক দেখিবেন, রাধিকা যখন কৃষ্ণের প্রীতি-পাত্রী, কিম্বা কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বলা—চন্দ্রাবলী সেই সকল স্থলেই শুধু রাধিকাকে সুন্দরী দেখিয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যখন রাধিকা হাসিয়া কথা বলিতেন, সেই সময় তাঁহার হাসির মাধুর্য্যে চন্দ্রাবলী মুগ্ধ হইত—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অতি যত্নে বক্ষে রাখিতেন, এই জন্য ধূলিলুণ্ঠিতা রাধিকার প্রতি চন্দ্রাবলীর এত কৃপা, বঁধু আল্‌তা পরাইতেন—এইজন্য সে পাদ-পদ্মযুগল চন্দ্রাবলীর চক্ষে সুন্দর—এবং যখন কৃষ্ণদর্শনের জন্য ব্যগ্র হইয়া রাধিকা ছুটিয়া যাইতেন, তখন অনুরাগিণীর পদে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হওয়ার ভয়ে চন্দ্রাবলী বক্ষ পাতিয়া দিতে চাহিয়াছেন। এস্থলে রাধিকার প্রেমই তাঁহার সৌন্দর্য্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

দিব্যোন্মাদের যে স্থলে বিরহিণী রাধিকা কুঞ্জকাননের কুন্দযূথি-লতিকার নিকট দুঃখ-কথা কহিতেছেন,—সে স্থলটি কবিত্বময়,—"এই কদম্বের মূলে, নিয়ে গোপ-কুলে, চাঁদের হাট মিলাইত। সেরূপ র'য়ে র'য়ে মনে পড়ে গো।" ইত্যাদি স্মরণ করিয়া পাগলিনী মিলনের সুখ গাহিতেছেন; নানা অতীত সুখের কথা মনে হইতেছে, একদিন কৃষ্ণ চম্পককুসুমদর্শনে রাধাকে স্মরণ করিয়া অজ্ঞান হইয়াছিলেন, দুপ্রহরে রাধা সুবল সাজিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিলেন,—"দেখি নীলগিরি ধূলায় পড়ে, অম্নি তুলে নিলাম ধূলা ঝেড়ে, রাখিলাম শ্যাম হিয়ার উপরি। কত যতন ক'রে গো। আমার পরশে চেতন পেয়ে, বলে আমার মুখ চেয়ে, কোথা আমার পরাণ কিশোরী, সুবল বলরে। কইলাম আমি তোমার সেই দাসী, আমায় বুঝি চিন নাই নাথ,—অম্নি হৃদয়ে ধরিল হাসি, বঁধু কতই বা সুখে।" তার পরে কিরূপে তপস্যার ফলে শ্রীকৃষ্ণ লাভ হইয়াছিল, তাহা বলিতেছেন,—"প্রেম করে রাখালের সনে, ফির্‌তে হবে বনে বনে, ভুজঙ্গ কণ্টক পঙ্ক মাঝে—সখি আমায় যেতে যে হবে গো রাই বলে বাজিলে বাঁশী। অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অতি পিছল, চলাচল তাহাতে করিতেম, সখি আমার চল্‌তে যে হবে গো, বঁধুর লাগি পিছল পথে। হইলে আঁধার রাতি, পথ মাঝে কাঁটা পাতি, গতাগতি করিয়ে শিখিতেম, সদা আমায় ফিরতে যে হবে গো, কণ্টক কানন মাঝে।" ইহা কি নিষ্কাম দেব-আরাধনার কথা নহে! শ্রীকৃষ্ণ কত আদর করিতেন, এখন তাঁহার উপেক্ষা কি সহা যায়!—"আঁচরি চিকুর বানাইত বেণী, সখি সে বেণী সম্বরি, বাঁধিত কবরী, মালতীর মালে বেড়াইত গো। কত সাজে সাজাইত, মুখ পানে চেয়ে র'ত, বঁধুর বিধু-বদন ভেসে যেত, দুটি নয়নের জলপুঞ্জে॥" এই বিলাপাত্মক গীতির স্তরে স্তরে আসন্ন মূর্চ্ছার মূর্চ্ছনা; এই অবস্থায় সহসা পাখীর স্বরে কি মেঘোদয়ে মন উতলা হইয়া পড়ে,—উদ্ভ্রান্ত চক্ষের নিকট মেঘ কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হয় ও পাখীর স্বর রাধানামে সাধা বাঁশীর ধ্বনিতে পরিণত হয়; রাধা মেঘকে কৃষ্ণ মনে করিয়া যুক্ত করে বলিতেছেন, "ওহে তিলেক দাঁড়াও, দাঁড়াও হে, অমন করে যাওয়া উচিত নয়, যে যার স্মরণ লয়, নিঠুর

বিরহ।

বঁধু, তারে কি বধিতে হয়, হেথা থাকতে যদি মন না থাকে, তবে যেও সেথাকে, যদি মনে মনরত, না হয় মনের মত, কাঁদলে প্রেম আর কত বেড়ে থাকে। তাতে যদি মোদের জীবন না থাকে, না থাকে, না থাকে, কপালে যা থাকে তাই হবে; বঁধু যথা যে না থাকে, তারে আর কোথা কে, ধ'রে বেঁধে কবে রেখে থাকে।" উন্মাদিনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিনাইয়া বলিতেছেন,—"নেত্রপলকে যে নিন্দে বিধাতাকে, এত ব্যাজে দেখা সাজে কিহে তাকে, যাহোক দেখা হ'ল দুঃখ দূরে গেল—এখন গত কথায় আর নাই প্রয়োজন"—গত কথা বলিতে কৃষ্ণের নিষ্ঠুরতার কথা আসিয়া পড়ে, সে কথায় তাই ক্ষমাশীলা বলিতেছেন,—"গত কথায় আর নাই প্রয়োজন।" তার পর আবার,—"বঁধু আমার মত তোমার অনেক রমণী, তোমার মতন আমার তুমি গুণমণি, যেমন দিনমণির অনেক কমলিনী, কমলিনীগণের ঐ একই দিনমণি"—"বঁধু আমার হৃদয়কমলে রাখিয়া শ্রীপদ, তিল আধ বস বস হে শ্রীপদ" পাগলিনীর এই ভ্রমময় কৃষ্ণপ্রীতিতে মগ্ন বিহ্বলতার চিত্রখানির সমগ্র পাঠক নিজে দেখিবেন। এই অবস্থায় ভ্রমেও কিছু সুখ আছে, উহা স্বপ্নে মিলনের ন্যায়, কিন্তু চৈতন্য হইলে এই সুখটুকু লুপ্ত হয়। রাধা এই ভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মেঘের অদর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; সখীগণ এই মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা—সাক্ষাৎ বিরহরূপিণী রাধিকার প্রেমাশ্রুমিশ্রিত প্রেমোক্তি শুনিয়া বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়াছিল; চৈতন্যপ্রভুর উন্মত্তাবস্থায় বিলাপ শুনিয়া এইভাবে গদাধর, মুরারি প্রভৃতি পার্শ্বচরগণ দাঁড়াইয়া থাকিত; এই ছবি এত সুন্দর ও স্বর্গীয় বলিয়া বোধ হইত যে, তাঁহারা জগতের কথা বলিয়া তাঁহাকে নির্ম্মল বিস্মৃতির সুখ হইতে জাগাইতে সাহসী হইতেন না। রাধিকার— 'নিশ্বাসে না বহে কমলের আস' এবং "গোবিন্দ বলিতে চাহে বারে বারে, মুখে নাহি সরে, শুধু গো গো করে, বিধুমুখ হেরি পরাণ বিদরে। আজ বুঝি রাধারে বাঁচান না যায়।" এই চিত্রের সঙ্গে আর একখানি চিত্র দেখুন—"প্রেমবেশে মহাপ্রভু গরগর মন। নাম সঙ্কীর্ত্তন করি করে জাগরণ॥ * * * সর্ব্বরাত্রি করে ভাবে মুখ সংঘর্ষণ। গো গো শব্দ করে স্বরূপ শুনিলা তখন॥"—চৈ, চ, অন্ত, ১৯ পৃঃ। উন্মাদিনী রাধিকার

"ওগো মালতি জাঁতি কুন্দলতিকে, যূথি, কনকযূথিকে গো" প্রভৃতি গান চৈতন্য-চরিতামৃত-ধৃত ভাগবতের দশম স্কন্ধের নবম শ্লোকানুবাদ—"তুলসি, মালতি, যূথি, মাধবি মল্লিকে" প্রভৃতি অংশের সহিত মিলাইয়া পড়ুন। রাধিকার মেঘদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা—"কিবা সজল জলদ শ্যামল সুন্দর।"—গোবিন্দলীলামৃতের অষ্টম স্বর্গের চতুর্থ শ্লোকের কৃষ্ণরূপসূচক পদটির অবিকল অনুরূপ,—"কি হেরিব শ্যাম রূপ নিরুপম" গানটিও জগন্নাথ-বল্লভ নাটকের একটি শ্লোকের অনুবাদ। এই সকল শ্লোক চৈতন্য বারংবার আবৃত্তি করিয়া পবিত্র করিয়া রাখিয়াছেন, এজন্য সেগুলি পড়িবার সময় তাঁহাকে মনে পড়া স্বাভাবিক। রাধার সঙ্গে সখীগণ কাঁদিয়া অজ্ঞান হইল, তখন চন্দ্রাবলী আসিয়া সেই মুদিত পদ্মসংকুল তড়াগের ন্যায় নীরব কুঞ্জবন দেখিয়া বলিতেছে—"মরি একি সর্ব্বনাশ আজ বিপিনে, এসব কনক পুতুলী, পড়িয়াছে ঢলি, বিপিনবিহারী শ্রীহরি বিনে, গজোৎখাতে যেন কমল-কানন, মহাবাতে যেন হেম রম্ভাবন।" ইত্যাদি। রাধাকে চন্দ্রাবলী চিনিত, কারণ চন্দ্রা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী,—ন্যায়পর শত্রু আজ রাধার প্রেম দেখিয়া বলিতেছে,—"মরি যে রাধার রূপ বাঞ্ছে শ্রীপার্ব্বতী, যার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে অরুন্ধতী" এ স্থল চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদের একটি অংশের পুনরাবৃত্তি।

মূর্চ্ছা-ভঙ্গে রাধা ক্ষীণ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে আধ ভাঙ্গা স্বরে বিশাখাকে বলিতেছেন,—"কো কো কো কোথা গো, বি বি বি বিশাখে। দে দে দে দেখা, সে ব ব ব বঁধুকে॥ না না না না দেখে বি বি বিধুমুখে। প প পরাণ যে যা যা যায় দুঃখে॥" চন্দ্রা মথুরা হইতে দাসখতের সর্ত্তানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিয়া আনিবেন বলাতে, প্রেম-বিহ্বলা রাধিকা তাহাই বিশ্বাস করিয়া বলিতেছেন, "বেঁধ না তার কমল করে, ভৎসনা ক'র না তারে, মনে যেন নাহি পায় দুঃখ। যখন তারে মন্দ কবে, চন্দ্রমুখ মলিন হবে, তাই ভেবে ফাটে মোর বুক॥" এইরূপ নির্ম্মল আত্ম-ত্যাগপূর্ণ প্রেমের কথা কৃষ্ণকমল গাহিয়া গিয়াছেন।

অভিনিবেশ সহকারে বহু স্থান লক্ষ্য করিলে কৃষ্ণকমলকৃত পদাবলী পাঠকের চক্ষে এক নূতন শ্রীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, উহা পড়িতে পড়িতে রাধিকা ছায়ার ন্যায় চক্ষু হইতে অপসৃত হইয়া পড়িবে এবং তৎস্থলে এক উপবাস-কৃশ দীন অথচ পরম সুন্দর ব্রাহ্মণ বালকের মূর্ত্তি হৃদয়ে মুদ্রিত হইবে। এই পদাবলীবর্ণিত রাধা-চরিত্রে চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি পুস্তকে ব্যাখ্যাত গৌরলীলার সার সংগৃহীত। রাই-উন্মাদিনীতে তাঁহারই মধুর আখ্যান বৃন্দাবননিবাসিনীর নামে বর্ণিত; আমরা কৃষ্ণ-কমলের পদ অন্য ভাবে পড়ি নাই।

উপসংহারকালে আমরা আর দুইখানি পুস্তকের নাম উল্লেখ করিব।

বৌদ্ধরঞ্জিকা।

ব্রহ্মভাষায় রচিত সুপ্রসিদ্ধ 'থাড়ুথাঙ্' পুস্তকে বুদ্ধের জন্মাবধি নির্ব্বাণতত্ত্ব প্রচার পর্য্যন্ত সমস্ত কাহিনী বিবৃত আছে। নীলকমল দাস নামক জনৈক বঙ্গীয় কবি 'বৌদ্ধরঞ্জিকা' নামে এই পুস্তকের একখানি পদ্যানুবাদ প্রণয়ন করেন। চট্টগ্রাম পার্ব্বত্যপ্রদেশের রাজা ধর্ম্মবক্সের প্রধানা মহিষী রাণী কালিন্দীর আদেশে এই পুস্তক বিরচিত হয়। রচনার সময় জানা যায় নাই; কিন্তু এ গ্রন্থের যে পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১০০ বৎসরেরও অধিক প্রাচীন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে এই গ্রন্থ ভিন্ন বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনী আর কোথায়ও দৃষ্ট হয় না।

নীলার বারমাস।

চৈত্র মাসে গাজনের উপলক্ষে এখনও হিন্দু-রমণীগণ নীলা বা লীলাবতী নাম্নী কোন মহিলার উদ্দেশ্যে উপবাস করিয়া থাকেন। বঙ্গীয় পঞ্জিকা-সমূহে এই উপবাসের সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। 'নীলার বারমাস' নামক যে ক্ষুদ্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, নীলা নাম্নী কোন মহিলার স্বামী গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন নীলার বয়স দ্বাদশ বর্ষ মাত্র। এই বয়সে যে উৎকট কৃচ্ছ্রসাধন পূর্ব্বক নীলা বনে বনে স্বামীকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিল,

এবং বহুদিনের পর স্বামীকে পাইয়া যে সকাতর মিনতি করিয়াছিল, তাহা গ্রাম্য-কবির অমার্জ্জিত ভাষায় বর্ণিত হইলেও অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠ কবির আবেগ সেই বর্ণনায় সূচিত হইয়াছে। নীলা মাথার কেশ এলাইয়া স্বামীর কণ্টকক্ষত ধূলিপূর্ণ পদযুগল মুছাইয়া দিয়াছিল। চৈত্রমাসে গাজন উপলক্ষে এই নীলার বারমাস অনেক স্থলে গীত হইয়া থাকে। আমাদের বিশ্বাস, বঙ্গীয় পঞ্জিকায় যে নীলার উদ্দেশে উপবাস নির্দ্দিষ্ট আছে, এই নীলাই সেই পতিব্রতা রমণী। তাহার স্বামীর পরিচয় উপলক্ষে কবি লিখিয়াছেন, সুলুক নামক প্রদেশস্থ নন্দপাটন পল্লীতে তাহার বাড়ী ছিল, এবং তাহার পিতার নাম গঙ্গাধর এবং মাতার নাম কলাবতী ছিল।

৯ম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

কবিওয়ালাগণের মধ্যে আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১১ খৃঃ—১৮৫৮ খৃঃ) নাম উল্লেখ করি নাই। তাঁহার লেখা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজীর প্রভাব বর্জ্জিত নহে—এজন্য আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসই তাঁহার গ্রন্থাদি আলোচনার উচিত স্থল হইবে। বিম্‌স্‌ সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রকে "হিন্দুস্থানী রেবিলেস" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন; * ইনি অনেকগুলি সখীসংবাদ গান রচনা করিয়াছেন, কিন্তু বোধ হয় সখীসংবাদ গান অপেক্ষা ব্যঙ্গকবিতা রচনাতে কবি সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ব্যঙ্গগুলি কোন শ্রেণীবিশেষ কি ব্যক্তি-বিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল না,—পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্যের উপর সেই ব্যঙ্গের

* "Ishwor Chandra Gupta, a sort of Indian Rebelais."—Beames' Comparative Grammar, Vol. I, p. 86.

তীব্ররশ্মি নিপতিত হইয়াছে,—লক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে লইয়া ব্যঙ্গ, * আইনের সূত্র লইয়া ব্যঙ্গ, † ইংরেজের বিবি লইয়া ব্যঙ্গ, ‡ গোস্বামিগণ লইয়া ব্যঙ্গ। § তাঁহার এই প্রখরব্যঙ্গরাশি ও সখীসম্বাদগীতি কালে সাহিত্যের অধঃস্তরে পড়িয়া বিস্মৃত হইবে—কিন্তু তাঁহার অধ্যবসায়ের চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি প্রাচীন কবিগণের জীবন-সংগ্রহ বিলুপ্ত হইবার নহে। আমরা বর্ত্তমান সাহিত্যের ইতিহাস রচনাকালে ঈশ্বরচন্দ্রের বিষয় পুনরায় আলোচনা করিব।

এই যুগের বঙ্গসাহিত্যে নানারূপ সংস্কৃত ছন্দ অনুকৃত হইয়াছিল।

ছন্দ।

কৃত্তিবাস, বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি লেখকগণের সময় হইতে সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালাতে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা দেখা যায়। এই অধ্যায়ের সাহিত্যে সেই চেষ্টার পূর্ণ পরিণতি দৃষ্ট হয়। আমরা নিম্নে সংক্ষেপে বিবিধ ছন্দের কিছু কিছু নমুনা দেখাইতেছি ;—

বৃত্তগন্ধী।

"কৌটায় কি আছে দেখ খুলিয়া। থাকিয়া কি ফল যাই চলিয়া॥ বিদ্যা খোলে কৌটা কল ছুটিল। শর হেন ফুলশর ফুটিল॥"—বি, সু (ভারতচন্দ্র)।

ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী।

"থাক, থাক, থাক, কাটাইব নাক, আগেতে রাজারে কহি। মাথা মুড়াইব, শালে চড়াইব, ভারত কহিছে সহি॥"—ঐ

* "লক্ষ্মীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে। কিছুমাত্র সুখ নাই হেন লক্ষ্মী নিয়ে॥ যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে। নিজে খাও খেতে দাও সাধ্য অনুসারে॥ ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে। প্যাঁচা লয়ে যাউন মাতা কৃপণের ঘরে॥"

† বিধবা বিবাহের আইন সম্বন্ধে—"সকলেই এইরূপ বলাবলি করে। ছুঁড়ির কল্যাণে যেন বুড়ি নাহি তরে॥ শরীর পড়েছে ঝুলি চুলগুলি পাকা। কে ধরাবে মাছ তারে কে পরাবে শাঁখা॥"

‡ "বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে।"

§ "অনেক কথাই ভাল গোঁসায়ের চেয়ে।"

ভঙ্গত্রিপদী।

"ওরে বাছা ধূমকেতু, মা বাপের পুণ্য হেতু, কেটে ফেল চোরে, ছেড়ে দেহ মোরে, ধর্ম্মের বাঁধহ সেতু।"—ভা, বি, সু।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

"কালীয়দহের জলে, কুমারী কমল দলে, গজ গিলে উগারে অঙ্গনা।"—ক, ক, চ।

দীর্ঘ চৌপদী।

"এক কাণে শোভে ফণিমণ্ডল, এক কাণে শোভে মণি কুণ্ডল, আধঅঙ্গে শোভে বিভূতি ধবল, আধই গন্ধ কস্তুরীরে।"—অ, ম।

লঘু চৌপদী।

"আহা মরে যাই, লইয়া বালাই, কুলে দিয়া ছাই, ভজি উহারে। যোগিনী হইয়া, উহারে লইয়া, যাই পলাইয়া, সাগর-পারে॥"—ভা, বি, সু।

মালঝাপ।

"কি রূপসী, অঙ্গে বসি, অঙ্গ খসি পড়ে। প্রাণ দহে, কত সহে, নাহি রহে ধড়ে॥" —কবিরঞ্জন, বি, সু।

একাবলী—একাদশাক্ষরাবৃত্তি।

"বড়র পীরিতি বালির বাঁধ। ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ॥"—ভা, বি, সু।

একাবলী—দ্বাদশ অক্ষরাবৃত্তি।

"নয়ন যুগলে সলিল গলিত। কনক মুকুরে মুকুতা খচিত॥"—কবিরঞ্জন, বি, সু।

তূণকছন্দ।

"রাজ্যখণ্ড, লণ্ডভণ্ড, বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে। হুলস্থূল, কুল কুল, ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে॥" —অ, ম।

দিগক্ষরাবৃত্তি।

"মৃদুমন্দ দক্ষিণ পবন, সুশীতল সুগন্ধি চন্দন, পুষ্পরসরত্নআভরণ, আজু কেন হৈল হুতাশন।"—আলওয়াল।

তরল পয়ার।

"বিনা সূত, কি অদ্ভুত, গাঁথে পুষ্পহার। কিবা শোভা, মনোলোভা, অতি চমৎকার॥"
—কবিরঞ্জন, বি, সু।

হীনপদ ত্রিপদী।

"হর হর মম দুঃখ হর। হর রোগ, হর তাপ, হর শোক, হর পাপ, হিমকর শেখর-শঙ্কর॥"—অ, ম।

মাত্রা ত্রিপদী।

"ঝন ঝন কঙ্কণ, নূপুর রণ রণ। ঘুনু ঘুনু ঘুঙ্ঘুরে বোলে।"—ভা, বি, সু।

মাত্রা চতুষ্পদী।

"হে শিব-মোহিনী, শুম্ভ-নিসূদনি, দৈত্য-বিঘাতিনি, দুঃখ-হরে॥"

তোটক।

"রমণী-মণি নাগর-রাজ কবি। রতি-নাথ বিনিন্দিত চারু ছবি॥"—কবিরঞ্জন, বি, সু।

ভুজঙ্গপ্রয়াত।

"অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে। অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে॥"—অ, ম।

পূর্ব্বোদ্ধৃত পদগুলিতে আমরা নানারূপ ছন্দের কিছু কিছু নমুনা দিলাম। সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালাতে অনেক স্থলে সুন্দররূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং পদবিন্যাস সংস্কৃতের ন্যায়ই সুনিপুণ ও শ্রুতিমধুর হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বিধান সর্ব্বত্রই নূতনকালের উপযোগী নহে, ঠিক সংস্কৃতের নিয়মানুসারে গুরু ও লঘু উচ্চারণে আবদ্ধ রাখিয়া বাঙ্গালা-পদবিন্যাস করিতে গেলে শব্দগুলি সর্ব্বত্র সুললিত হয় না। ভারতচন্দ্রের রচনায় ছন্দোভঙ্গের দৃষ্টান্ত অল্প, কিন্তু একবারে না আছে এমন নহে,—যথা তোটক ছন্দে,—"শুনি সুন্দর সুন্দরীরে কহিছে।" এখানে "রী" গুরু হওয়া উচিত হয় নাই। ভারতচন্দ্র ভিন্ন অন্যান্য কবির রচনায় ছন্দোভঙ্গের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইবে, যথা রামপ্রসাদের

বিদ্যাসুন্দরে,—তোটক ছন্দে,—"ধনি মুখ চিবুক ধরে যতনে॥" পদে "মু" ও "বু" লঘু হইয়াছে, এই দুই স্থলে উচ্চারণ গুরু হওয়া আবশ্যক; হরিলীলায় ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে—"বসিয়া সুবর্ণের পীঠে হাসিছে। প্রবালাধরে মন্দ মন্দ ভাসিছে॥" "হাসিছে" ও "ভাসিছে" শব্দদ্বয়ের "সি"র গুরু উচ্চারণ রাখা উচিত। আর অধিক উদাহরণ দেওয়ার স্থান নাই। সংস্কৃতের ছন্দানুকরণ এখনও শেষ হয় নাই, আধুনিক সময়ে মাইকেলের সমসাময়িক কবি বলদেব পালিতরচিত 'ভর্তৃহরি' কাব্যে এই চেষ্টার পূর্ণ বিকাশ দৃষ্ট হয়; আমরা কিঞ্চিৎ নমুনা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। মালিনী ছন্দ—"ফুল সম সুকুমারী, দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী। অচপল তড়িতাভা সুন্দরী গৌরকান্তি॥ মধুর নববয়স্কা পদ্মিনী অগ্রগণ্যা। যুবক নয়নলোভা কামিনী কামশোভা॥" বংশস্থবিল,—"তথায় ভীমাসিত-বর্ম্ম-ভূষিত। প্রচণ্ড আভাময় চক্র মস্তকে॥ সবিদ্যুতাগ্নি প্রলয়োন্মুখা-ভ্রবৎ। কৃপাণ-পাণি প্রহরী ব্রজে ভূমে॥" এই ছন্দের অনুকৃতি নির্ভুল হয় নাই, তাহাই বলা বাহুল্য। এখন সংস্কৃতের পন্থা হইতে তির্য্যক্ গমন করিয়া নব নব ভাবুকগণ নূতন ছন্দে কবিতা লিখিতেছেন, তাহা এস্থলে আলোচ্য নহে।

পদ্যের নিয়ম।

পদ্যসম্বন্ধে আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য। শুধু শেষ অক্ষরের মিল পড়িলেই পদ্য শ্রুতিমধুর হয় না; শেষ বর্ণের আদ্য বর্ণের স্বরের মিল থাকিলে দুইটি চরণে প্রকৃত মিল পড়িল বলা যায়। ভারতচন্দ্র ছাড়া প্রাচীন কালের কোন কবিই এ বিষয়টিতে মনোযোগ প্রদান করেন নাই;—স্থানে স্থানে শুধু শেষ বর্ণের মিল থাকিলেও, দুইটি চরণ নিতান্ত বিসদৃশ হইয়া পড়ে, যথা:—"দিবানিশি, থাকে বসি, ডানায় ঢাকিয়া। ইহাকেই বলে লোকে ডিমে 'তা' দেওয়া॥" এখানে "ঢাকিয়া" এবং "দেওয়া" নিতান্তই শ্রুতিকটু শুনায়। কবিকঙ্কণ, কাশীদাস প্রভৃতি সকল কবিই এ নিয়মটি উপেক্ষা করিয়াছেন। শুধু ভারতচন্দ্র এ

বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ছিলেন তাঁহার অতি অল্প বয়সের লিখিত "সত্য-পীরের" কথায় এ নিয়মের স্থানে স্থানে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়,—উক্ত কবিতাটিতে 'বসি'—'আসি', 'গুণে'—'ত্রিভুবনে', 'স্তুতি'—'অব্যাহতি', 'উত্তরিল',—'পেল', 'কথা'—'গাঁথা' প্রভৃতি শব্দগুলির দ্বারা মিল দেওয়া হইয়াছে,—'সত্যপীরের কথা' ভারতচন্দ্রের পঞ্চদশ বৎসর বয়সের রচনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি ছাড়িয়া দিলে, তৎপ্রণীত অন্য কোন কাব্যেই আমাদের নির্দ্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না,—ভারতচন্দ্রের কবিতায় অবলম্বিত এই অতীব প্রশংসনীয় গুণ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে অনন্যসাধারণ। আর একটি কথা, প্রাচীন এবং আধুনিক কবিতায় "ন" এর সঙ্গে "ম", "ক"এর সঙ্গে "খ", "চ" এর সঙ্গে "ছ", "জ"এর সঙ্গে "ঝ" দ্বারা অবিরত মিল পড়িতে দেখা যায়। ইহা যথাসম্ভব পরিহার করিতে পারিলে যে কবিতা শ্রুতিমধুর হয়, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই সকল নিয়ম দ্বারা কবিতা-সুন্দরীর গতি ক্রমাগত সীমাবদ্ধ করিলে অবশেষে তাঁহার পঙ্গু হইয়া পড়িবার আশঙ্কা যাঁহারা মনে পোষণ করেন, তাঁহাদিগের নিকট নিবেদন,—স্বাভাবিকশক্তিসম্পন্ন কবিগণের শ্রুতিই তাহাদিগের কবিতাকে উৎকৃষ্ট নিয়মানুযায়ী রচনার দিকে প্রবর্ত্তিত করিবে, তাঁহারা এ সকল নিয়ম মনে করিয়া লিখিতে আরম্ভ করেন না,—নিয়মগুলি কাব্যকলার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিতে, তাঁহাদিগকে আপনা আপনিই অনুসরণ করিবে; অবশ্য কষ্ট-কবিগণ এই সকল নিয়ম দ্বারা বিড়ম্বিত হইতে পারেন, তাঁহারা গদ্য দ্বারা স্বীয় মনোগত ভাব প্রকাশের চেষ্টা করুন, কিংবা এরূপ কোমল ব্যবসায়ের অনুশীলন ছাড়িয়া দিয়া কার্য্যান্তরে লিপ্ত হউন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

আমাদের নির্দ্দিষ্ট শেষোক্ত নিয়মটি সম্বন্ধেও ভারতচন্দ্র সতর্ক। এ বিষয়ে তিনি প্রাচীন এবং আধুনিক কালের কবিগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ প্রশংসা পাইবার যোগ্য। এ স্থলে বলা উচিত, প্রাচীন হিন্দীকাব্য

সমূহে এই দুইটি নিয়মই সর্ব্বদা অনুসৃত হইতে দেখা যায়। ভারতচন্দ্র হিন্দীকাব্যগুলির আদর্শে হয়ত এই নিয়ম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

এই পুস্তকে আমরা পদ্য-সাহিত্যেরই আলোচনা করিলাম। গদ্য-রচনার নমুনা একবারে না আছে, এমন নহে, কিন্তু তাহা একরূপ নগণ্য। কিন্তু আধুনিক বঙ্গভাষায় আমরা গদ্য-সাহিত্যের বিকাশ দেখাইবার পূর্ব্বে যাহা কিছু প্রাচীন গদ্য রচনা পাওয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা উচিত মনে করি,—সেই ক্ষুদ্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গদ্য রচনাগুলি নব্য সাহিত্যের ভিত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

গদ্য সাহিত্য।

আমরা পদকল্পতরুতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের 'গদ্য পদ্যময়' রচনার উল্লেখ পাইয়াছি, স্বর্গীয় পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের মতে —এই 'গদ্যরচনা' পদ্যেরই এক প্রকার রূপভেদ। এই মত নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে গ্রহণ করা উচিত কি না বলিতে পারি না।

প্রাচীন গদ্যের প্রথম নমুনা আমরা বৌদ্ধাধিকারের বঙ্গীয় অন্যতর প্রাচীনতম রচনা শূন্য পুরাণে প্রথম পাই। তন্নিদর্শন যথা—

শূন্য পুরাণ।

'পশ্চিম দুয়ারে কে পণ্ডিত। সেতাই জে চারিসএ গতি আনি লেখ্যা। চন্দ্রকটাল জে জে বসুয়া ঘটদাসী দুত নাহি ডরায় তুমারে দেখিআ। চিত্রগুপ্ত পাঁজি পরিমাণ করে।"

ইহা ছাড়াও অনেকস্থলে শূন্য পুরাণের যে গদ্যাংশ পাওয়া যাইতেছে তাহা দুর্ব্বোধ প্রহেলিকার ন্যায়। শূন্য পুরাণের পরে চণ্ডীদাসের গদ্য-রচনার কিছু নমুনা পাওয়া গিয়াছে।

'চৈত্যরূপ প্রাপ্তি' নামক চণ্ডীদাসকৃত যে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাওয়া গিয়াছে তাহা তান্ত্রিক উপাসনার কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন স্বরূপ। যথা—

চৈত্যরূপ প্রাপ্তি।

"চৈত্যরূপের রা চ অধরূপ লাড়ি। রা অক্ষরে রাগ লাড়ি। চ অক্ষরে চেতনা লাড়ি। র এতে চ মিশিল। রাএতে বসিল। ইবে এক অঙ্গ লাড়ি॥"

রূপগোস্বামীর 'কারিকা'।

চৈতন্যপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বচর রূপগোস্বামি-বিরচিত 'কারিকা' নামক ক্ষুদ্র গদ্যপুস্তক পাওয়া গিয়াছে।* প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা গদ্য বেশ প্রাঞ্জল ও গুরুতর বিষয় রচনার সর্ব্বতোভাবে উপযোগী ছিল বলিয়া বোধ হয়। দুইটি স্থল তুলিয়া দেখাইতেছি—প্রারম্ভ-বাক্য,—"শ্রীরাধাবিনোদ জয়॥ অথ বস্তু নির্ণয়। প্রথম শ্রীকৃষ্ণের গুণ নির্ণয়। শব্দগুণ গন্ধগুণ রূপগুণ রসগুণ স্পর্শগুণ এই পাঁচ গুণ। এই পঞ্চ গুণ শ্রীমতী রাধিকাতেও বসে। শব্দগুণ কর্ণে গন্ধগুণ নাসাতে রূপগুণ নেত্রে রসগুণ অধরে ও স্পর্শগুণ অঙ্গে। এই পঞ্চগুণে পূর্ব্বরাগের উদয়। পূর্ব্বরাগের মূল দুই; হঠাৎ শ্রবণ ও অকস্মাৎ শ্রবণ।" ইত্যাদি। শেষ অংশ—"আগে তারে সেবা। তার ইঙ্গিতে তৎপর হইয়া কার্য্য করিবে আপনাকে সাধক অভিমান ত্যাগ করিবে। ইতি।"

কৃষ্ণদাসের 'রাগময়ীকণা'।

আমরা কৃষ্ণদাস কবিরাজ-বিরচিত "রাগময়ীকণা" নামক পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা পদ্যগ্রন্থ, কিন্তু যে স্থলে কোন সূত্রের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে, সেই সব স্থল গদ্যে লিখিত। একটী অংশ এইরূপ—"রূপ তিন কি কি রূপ—শ্যাম১ শ্বেত২ গৌর৩ ধ্যান কৃষ্ণবর্ণ॥ কৃষ্ণ জীউর পঞ্চ নাম। গুণ তিন মত হয় কি কি গুণ। ব্রজলীলা ১। দ্বারকালীলা ২। গৌরলীলা ৩। দশা তিন কি কি দশা।" ইত্যাদি।

'দেহ কড়চ'।

"দেহকড়চ" পুস্তিকা খানি ১৩০৪ সালের ১ম সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে,—ইহার রচনাও অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ভাবপ্রকাশক; যথা,—"তুমি কে॥ আমি জীব। আমি তটস্থ জীব। থাকেন কোথা। ভাণ্ডে। ভাণ্ড কিরূপে হইল। তত্ত্ব বস্তু হইতে। তত্ত্ব বস্তু কি কি। পঞ্চ আত্মা। একাদশেন্দ্র। ছয় রিপু ইচ্ছা এই সকল য়েক যোগে ভাণ্ড হইল। পঞ্চ আত্মা কে কে। পৃথিবী।

---

* বর্দ্ধমান রায়নানিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ঘোষ এই পুস্তকের কথা প্রথম প্রকাশ করেন। বান্ধব, ১২৮৯ সন, অষ্টম সংখ্যা, ৩৬৯ পৃঃ।

আপ। তেজঃ। বাউ। আকাশ। একাদশীন্দ্র কে কে। কর্ম্ম-ইন্দ্র পাঁচ। জ্ঞানীন্দ্র পাঁচ। আবরণ এক।"

১১৮১ বাং সনের হস্তলিখিত ভাষাপরিচ্ছেদ নামক গদ্যপুস্তকের আরম্ভ ও মধ্যভাগ হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। এই পুস্তকখানি সংস্কৃত 'ভাষা-পরিচ্ছেদ' নামক গ্রন্থের অনুবাদ।

'ভাষাপরিচ্ছেদ।'

আরম্ভ—"গোতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমারদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয়। তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গোতম উত্তর করিতেছেন। তাবৎ পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, পদার্থ কতো। তাহাতে গোতম কহিতেছেন। পদার্থ সপ্তপ্রকার। দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায় অভাব। তাহার মধ্যে দ্রব্য নয় প্রকার।"

মধ্যে—"মীমাংসা মতে কর্ত্তাত্মক শব্দ নিজে ধ্বন্যাত্মক শব্দ জন্য বর্ণাত্মক শব্দকে ঈশ্বর কহেন। মীমাংসকেরা পরমাত্মা মানেন না। অতঃপর কর্ম্মের পরিচয় কহিতেছি। * * * ব্যাপারবৎ কারণের নাম করণ। কারণজন্য হইয়া কার্য্যজনক যে হয় তাহার নাম ব্যাপার। * * অনুমিতির অপর কারণ পক্ষতা আছে। ইহাতে প্রাচীন পণ্ডিতেরা কহেন পর্ব্বতে বহ্নি সন্দেহের নাম পক্ষতা। একথা ভালো নহে কারণ যে হয় সে অবশ্য কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ব ক্ষণেতে থাকে। প্রথম ক্ষণে সাধ্য সংশয় পরে ব্যাপ্তির স্মৃতি পরে পরামর্শ। তবে পরামর্শ কালে সংশয় নষ্ট হইলে অনুমিতির পূর্ব্বক্ষণ পরামর্শ ক্ষণ সে ক্ষণে সংশয় থাকিল না। জ্ঞান ইচ্ছাদ্বেষকৃত সুখ দুঃখ। ইহারা দ্বিক্ষণ স্থায়ী পদার্থ, ত্রিক্ষণে নষ্ট হয় জানিবে।"

অল্পদিন হইল 'বৃন্দাবনলীলা' নামক একখানি ১৫০ বৎসরের প্রাচীন গদ্যপুঁথি (খণ্ডিত) আমার হস্তগত হইয়াছে, আমি নিম্নে এই পুস্তকখানি হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—"তাহার উত্তরে এক পোয়া পথ চারণ পাহাড়ি পর্ব্বতের উপরে কৃষ্ণচন্দ্রের চরণচিহ্ন ধেনুবৎসের এবং উঠের এবং ছেলির এবং মহিশের এবং আর আর অনেকের পদচিহ্ন আছেন যে দিবস ধেনু লইয়া সেই পর্ব্বতে গিয়াছিলেন সে দিবস মুরলির গানে যমুনা উজান বহিয়াছিলেন এবং পাষাণ গলিয়াছিলেন সেই দিবস এই সকল পদচিহ্ন

'বৃন্দাবনলীলা।'

হইয়াছিলেন। গয়াতে গোবর্দ্ধনে এবং কাম্যবনে এবং চরণ পাহাড়েতে এই চারি স্থানে চিহ্ন এক সমতুল ইহাতে কিছু তরতম (তারতম্য ?) নাঞী। চরণ পাহাড়ির উত্তরে বড় বেস শাহি তাহার উত্তরে ছোট বেঁস শাহি তাহাতে এক লক্ষ্মীনারায়ণের এক সেবা আছেন, তাহার পূর্ব্ব দক্ষিণে সেরগড়। * * * গোপীনাথজীর ঘেরার দক্ষিণ পশ্চিম নিধুবন চতুর্দ্দিকে পাকা প্রাচীর পূর্ব্বপশ্চিমা বন পশ্চিমদিগের দরওয়াজা কুঞ্জের ভিতর জাইতে বামদিগে এক অট্যালিকা অতি গোপনিয় স্থান অতি কোমল নানান পুষ্প বিকশিত কোকীলাদি নানান পক্ষী নানান মত ধ্বনি করিতেছেন, বনের শৌন্দর্য্য কে বর্ণন করিবেক। শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যে মহন্তের ও মহাজনের ও রাজাদিগের বহু কুঞ্জ আছেন। নিধুবনের পশ্চীমে কিছু দুর হয় নিভৃত নিকুঞ্জ যে স্থানে ঠাকুরাণীজী ও সখি সকল লইয়া বেশবিন্যাষ করিতেন, ঠাকুরাণীজীউর পদচিহ্ন অদ্যাবধি আছেন নিত্য পূজা হয়েন।" অচেতন পদার্থের প্রতি গভীর সম্মানসূচক ক্রিয়ার ব্যবহার এবং "নাঞী" প্রভৃতি রূপ অদ্ভুত বর্ণবিন্যাসদৃষ্টে বিস্মিত না হইলে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, এ রচনা অনাড়ম্বর ও সহজ গদ্যের নমুনা। পরমভক্ত বৈষ্ণবলেখক যে শ্রীধাম বৃন্দাবনের অলিগলির প্রতি সম্মানসূচক পদ প্রয়োগ করিবেন, তাহাতে আমাদের আপত্তি করিবার বা আশ্চর্য্যান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ নাই। এই পুস্তক ভিন্ন কৃষ্ণদাস প্রণীত (১০৯৮ সনের হস্তলিপি) "আশ্রয় নির্ণয়," ১১১২ সনের হস্তলিপি "ত্রিগুণাত্মিকা", চৈতন্যদাসপ্রণীত "রসভক্তি-চন্দ্রিকা", "দেহভেদতত্ত্বনিরূপণ", নীলাচলদাসপ্রণীত "দ্বাদশ পাট নির্ণয়," ১০৮২ সনের লিখিত "প্রকাশ্যনির্ণয়", এবং (১১৫৮ সনের হস্তলিপি) "সাধন কথা" প্রভৃতি পুস্তকে প্রাচীন গদ্য রচনার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এস্থলে বলা উচিত এই পুস্তকগুলির অধিকাংশই "সহজিয়া" সম্প্রদায় কর্ত্তৃক লিখিত।

সহজিয়া পুঁথি।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রী মহাশয় 'স্মৃতিকল্পদ্রুম' নামক নিজ বাটীতে প্রাপ্ত একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ততর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে (সেরপুর)

স্মৃতিগ্রন্থ।

প্রাপ্ত অপর একখানা বাঙ্গালা গদ্যে রচিত স্মৃতিগ্রন্থের বিষয় জানাইয়াছেন। * আমরা রাজা পৃথ্বীচন্দ্রের রচিত গৌরী-মঙ্গল কাব্যে "স্মৃতি ভাষা কৈল রাধাবল্লভ শর্ম্মণঃ"। পদে স্মৃতির যে অনুবাদের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা খুব সম্ভব গদ্যগ্রন্থ। আমরা 'ব্যবস্থা তত্ত্ব' নামক একখানি প্রাচীন গদ্যপুস্তক পাইয়াছি। ইহার লেখক কে, তাহা জানা যায় নাই।

এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিদর্শন দ্বারা বোধ হয় দুরূহ সূত্রের ব্যাখ্যা সাধারণের বোধগম্য করিতে যাইয়া মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালী গদ্যগ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু ধারাবাহিক গদ্যরচনার অনুশীলন হইতেছিল বলিয়া বোধ হয় না।

তন্ত্রে গদ্যভাষা।

আমরা দেবডামরতন্ত্রে ভূতের মন্ত্রের ন্যায় কতকগুলি বাঙ্গালা গদ্যের নমুনা দেখিয়াছি। এই তন্ত্র খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালাটি বোধগম্য হইল না; একটি ছত্র এইরূপ,—"গোঁসাই চেলা সহস্র কামিনী ডোমা চাঁড়াল পাই মুই আকাটন বিষ হাতে এ গুয়া পান খাইয়া।"—বেঃ, গঃ, হস্তলিখিত পুঁথি।

নন্দকুমারের পত্র।

সূত্রের ব্যাখ্যায় সহজ বাঙ্গালার নমুনা দৃষ্ট হয়; বৈষয়িক পত্রাদির ভাষাও বেশ সহজ; আমরা কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজের সময়ে লিখিত কতকগুলি পত্র দেখিয়াছি, তাহার রচনা আধুনিক পদ্ধতি হইতে বিভিন্ন হইলেও সহজ, এবং ভাব-প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে নন্দকুমার মহারাজ কনিষ্ঠ রাধাকৃষ্ণ রায়ের ও 'দীননাথ সামন্তজীউ'র নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পাওয়া গিয়াছে; মেঃ বেভারিজ সাহেব ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ন্যাসনাল্ মেগাজিন্ পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পত্র দুইখানির ভাষা সহজ

* শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত, বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত, ১৫৯—১৬০ পৃষ্ঠা।

কিন্তু মধ্যে মধ্যে উর্দ্দুর সহিত মিশ্রিত, যথা—"অতএব এ সময়ে তুমি কমর বাঁধিয়া আমার উদ্ধার করিতে পার, তবেই যে হউক, নচেৎ আমার নাম লোপ হইল, ইহা মকররর, মকররর জানিবা। নাগাদি ৩রা ভাদ্র তথাকার রোয়দাদ সমেত, মজুম-দারের লিখন সম্বলিত মনুষ্য কাসেদ এথা পৌছে তাহা করিবা, এ বিষয়ে এক পত্র লক্ষ হইতে অধিক জানিবা।" শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ১৭ই ফাল্গুন ১১২৫ সনের লিখিত বৈষ্ণবদিগের যে একখানি প্রাচীন দলিলের প্রতি-লিপি সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (১৩০৬ সন, ৪র্থ সংখ্যা, ২৯৯ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা পত্রাদিতে প্রচলিত তাৎকালিক গদ্য রচনার একখানি উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এই দলিলে সহজিয়া মতের প্রাধান্য দৃষ্টে বৈষ্ণব সমাজের অধোগতির সূচনা উপলব্ধি হয়।

দরবারী ভাষা।

রাজদরবারে উর্দ্দু ও সংস্কৃত মিশিয়া একরূপ বিকৃত বাঙ্গালা গদ্য গঠন করিয়াছিল; এখনও "কস্য কর্জ্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে," "টাল মাটালে টাকা আদায় না করাতে," "ওয়াদা কার্ত্তিক মাসে টাকা পরিশোধ করিব" প্রভৃতি দলিল প্রচলিত ভাষায় সেই বিকৃত রূপের নমুনা কিছু বিদ্যমান আছে। আমরা পাঠ্য পুস্তক ও উপন্যাসের ভাষা সংশোধনার্থ ঘোর কোলাহল করিতেছি, কিন্তু সরকারী কাছারী ও জমীদারের সেরেস্তায় প্রাচীন জটিল গদ্য বদ্ধমূল হইয়া রহি-য়াছে, সেখানে সংস্কারের বীজ এখনও স্থান পাইতেছে না। আমরা নিম্নে ত্রিপুরেশ্বরের গোবিন্দমাণিক্যপ্রদত্ত একখানা তাম্রশাসনের প্রতি-লিপি উদ্ধৃত করিতেছি,—"৭স্বস্তি শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য দেব বিষম সমরবিজই মহা মহোদয়ি রাজনামদেশোহয়ং শ্রীকারকোনবর্গে বিরাজতে হনতে রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগনে মেহেরকুল মৌজে ষোলনল অজ হামিলা ১৮/ আঠার কাণি ভূমি শ্রীনরসিংহ শর্ম্মারে ব্রহ্মউত্তর দিলাম, এহার পাঁঠা পঞ্চক ভেট বেগার ইত্যাদি মানা সুখে ভোগ করোক। ইতি সন ১০৭৭ তে ১৯ কার্ত্তিক।" ১৪৮ পৃষ্ঠার ফুটনোটে উদ্ধৃত অনন্তরাম শর্ম্মার গদ্য রচনার কিছু অংশ দেখাইয়াছি, তাহাও

প্রায় এই সময়ের রচনা। এই উর্দ্দু-মিশ্র ভাষাকে যথাসাধ্য সহজ করিয়া ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে এইচ্, পি, ফর্ষ্টার্ সাহেব কতকগুলি আইনের তর্জ্জমা করেন, তাহা এস্থলে আলোচ্য নহে। সেই তর্জ্জমার ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও অন্বয় ইংরেজীর অনুকরণে সম্পাদিত হইয়া দুরূহ হইয়াছে, তাহাতে কর্ম্ম, কর্ত্তা ও ক্রিয়ার যথেচ্ছাচার সন্নিবেশ হেতু ছত্রগুলির পরিষ্কার রূপ অর্থ পরিগ্রহ করা যায় না।

আলালী ভাষার প্রাচীন আদর্শ 'কামিনীকুমার।'

যে ভাষায় টেকচাঁদ ঠাকুর "আলালের ঘরের দুলাল" রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনিই প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাতি আছে, কিন্তু অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে "কামিনীকুমার"-রচক কালীকৃষ্ণদাস "গদ্যছন্দের" যে নমুনা দিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে "আলালী ভাষা" তাঁহার সময়ও প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। আমরা "কামিনীকুমার" হইতে সেই অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

রামবল্লভের তামাক সাজা।

গদ্যছন্দ॥ সদাগর অতিকাতরে এইরূপ পুনঃ পুনঃ শপথ করাতে সুন্দরী ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক সোনাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেক। ওহে চোপদার এই চোর এতাদৃশ কটু দিব্য বারম্বার করিছে ও নিতান্ত শরণাগত হইয়া আশ্রয় যাচিঞা করিতেছে, অতএব শরণাগতে নিগ্রহ করা উচিত নহে, বরং নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দেওয়া বেদবিধিসম্মত বটে। আর বিশেষতঃ আপনার অধিক ভৃত্য সঙ্গেতে নাই, অতএব অন্য ২ কর্ম্ম উহা হৈতে যত হউক আর না হউক কিন্তু এক আধ ছিলিম তামাক চাহিলেও তো সাজিয়া দিতে পারিবেক। তাহার আর কোন সন্দেহ নাই তবু যে অনেক উপকার। সোনা কহিলেক হাঁ ক্ষতি নাই তবে থাকে থাক। কামিনী এইরূপ সোনার সহিত পরামর্শ করিয়া সদাগরকে কহিতেছে। শুন চোর তুমি যে অকর্ম্ম করিয়াছ তাহার উপযুক্ত ফল তোমাকে দেওয়া উচিত কিন্তু তোমার নিতান্ত ন্যূনতা ও বিনয়ে কাকতি মিনতি এবং কঠিন শপথে এ যাত্রা ক্ষমা করিলাম। এইক্ষণে সর্ব্বদা আমার আজ্ঞাকারী হইয়া থাকিতে হইবেক আমি যখন যাহা কহিব তৎক্ষণাৎ সেই কর্ম্ম করিবে তাহাতে অন্যথা করিলে তদ্দণ্ডে রাজার নিকট

প্রেরণ করিব তাহার আর কথা নাই কিন্তু যদি কর্ম্মের দ্বারায় আমাকে সন্তোষ করিতে পারহ তবে তোমার পক্ষে শেষ বিবেচনা করা যাইবেক। সদাগর এই কথা শুনিয়া মনে২ বিবেচনা করিলেক যে রাম বাঁচা গেল আর ভয় নাই পরে কৃতাঞ্জলীপূর্ব্বক কামিনীর সম্মুখে কহিতেছে মহাশয় আপনি যে ঘোর দায় হৈতে এদাসের প্রাণ রক্ষা করিলেন ইহাতেই বোধ হয় আপনি জন্মান্তরে এদীনের কেহ ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই নতুবা এমত উপকার পর পরের যে তো কখন করেন না। সে যাহা হউক আজি হৈতে কর্ত্তা তুমি আমার ধরম বাপ হইলে যখন যে আজ্ঞা করিবেন এই ভৃত্য কৃতসাধ্য প্রাণপণে পালন করিব। কামিনী কহিলেক ওহে চোর তুমি আমার কি কর্ম্ম করিবে কেবল হুঁকার কর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকহ আর এক কথা তোমাকে চোর চোর বলিয়া সর্ব্বদা বা কাঁহাতক ডাকি আজি হৈতে আমি তোমার নাম রামবল্লভ রাখিলাম। সদাগর কহিলেক যে আজ্ঞা মহাশয়, এইরূপ কথোপকথনান্তে ক্ষণেক বিলম্বে কামিনী কহিলেক ওহে রামবল্লভ একবার তামাক সাজ দেখি। রামবল্লভ যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তামাক সাজিয়া আলবোলা আনিয়া ধরিয়া দিলেক। এই প্রকার রামবল্লভ তামাক সাজা কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন পরে ক্রমে ক্রমে তামাক সাজিতে সাজিতে রামবল্লভের তামাক সাজায় এমত অভ্যাস হইল যে রামবল্লভ যদ্যপি ভোজনে কিম্বা শয়নে আছেন ও সেই সময়ে কামিনী যদি বলে ওহে রামবল্লভ কোথায় গেলেহে রামবল্লভের উত্তর আজ্ঞা তামাক সাজিতেছি।"

রাজীবলোচনের 'কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত।'

১৮১১ খৃষ্টাব্দে রাজীবলোচন কৃত "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত" লণ্ডন-নগরে মুদ্রিত হয়; ইহা প্রাচীন কালের খাঁটি বাঙ্গলায় লিখিত, ইহার উপর ইংরেজী-গদ্যের কোন প্রভাব দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন গদ্যের এই নিদর্শন দেখিয়া বোধ হয়, গদ্য রচনা পূর্ব্বে এতদ্দেশে বিশেষ রূপ প্রচলিত না থাকিলেও, ইহার বেশ বিকাশ হইয়াছিল। আমরা নিম্নে এই পুস্তকখানি হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রচরিত" শুধু গদ্য-সাহিত্যের হিসাবে নহে,—ইহা সেকালের এক খানি তত্ত্ববহুল উৎকৃষ্ট ইতিহাস।

"পরে ইঙ্গরাজের যাবদীয় সৈন্য পলাশীর বাগানে উপনীত হইয়া সমর আরম্ভ করিল। নবাবি সৈন্য সকল দেখিল যে প্রধান ২ সৈন্যেরা মনোযোগ করিয়া যুদ্ধ করে না এবং ইঙ্গরাজের অগ্নিবৃষ্টিতে শত ২ লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে কি করিব ইহাতে কেহ

উন্মাক্রমে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। যুদ্ধ ভাল হইতেছে না ইহা দেখিয়া নবাবের চাকর মোহনদাস নামে একজন সে নবাব সাহেবকে কহিলেন আপনি কি করেন আপনার চাকরেরা পরামর্শ করিয়া মহাশয়কে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। নবাব সঙ্গে প্রণয় করিয়া রণ করিতেছে না অতএব নিবেদন আমাকে কিছু সৈন্য দিয়া পলাশীর বাগানে পাঠান আমি যাইয়া যুদ্ধ করি আপনি বাকি সৈন্য লইয়া সাবধানে থাকিবেন পূর্ব্বের দ্বারে যথেষ্ট লোক রাখিবেন এবং এইক্ষণে কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবেন না। নবাব মোহনদাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়যুক্ত হইয়া সাবধানে থাকিয়া মোহনদাসকে পঁচিশ হাজার সৈন্য দিয়া অনেক আশ্বাস করিয়া পলাশীতে প্রেরিত করিলেন। মোহনদাস উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্ত হইল। মোহনদাসের যুদ্ধেতে ইঙ্গরাজ সৈন্য শঙ্কান্বিত হইল। মীরজাফরালি খান দেখিলেন এ কর্ম্ম ভাল হইল না যদ্যপি মোহনদাস ইঙ্গরাজকে পরাভব করে আর এ নবাব থাকে তবে আমাদিগের সকলেরি প্রাণ যাইবেক অতএব মোহনদাসকে নিবারণ করিতে হইয়াছে। ইহাই বিবেচনা করিয়া নবাবের দূত করিয়া একজন লোককে পাঠাইলেন। সে মোহনদাসকে কহিল আপনাকে নবাবসাহেব ডাকিতেছেন শীঘ্র চলুন। মোহনদাস কহিল আমি রণ ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে যাইব। নবাবের দূত কহিল আপনি রাজাজ্ঞা মানেন না। মোহনদাস বিবেচনা করিল এসকল চাতুরী এ সময়ে নবাব সাহেব আমাকে কেন ডাকিবেন ইহা অন্তঃকরণে করিয়া দূতের শিরশ্ছেদন করিয়া পুনরায় সমর করিতে লাগিল। মীরজাফরালি খান বিবেচনা করিল বুঝি প্রমাদ ঘটিল পরে আত্মীয় একজনকে আজ্ঞা করিল তুমি ইঙ্গরাজের সৈন্য হইয়া মোহনদাসের নিকট গমন করিয়া মোহনদাসকে নষ্ট করহ। আজ্ঞা পাইয়া একজন মনুষ্য মোহনদাসের নিকট গমন করিয়া অগ্নিবাণ মোহনদাসকে মারিল। সেই বাণে মোহনদাস পতন হইল। পরে নবাবি যাবদীয় সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল ইংরাজের জয় হইল॥

পরে নবাব স্রাজেরদৌলা সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন কোনমতে রক্ষা নাই আপন সৈন্য বৈরি হইল অতএব আমি এখান হইতে পলায়ন করি। ইহাই স্থির করিয়া নৌকাপরি আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। পরে ইংরাজ সাহেবের নিকটে সকল সমাচার নিবেদন করিয়া মীরজাফরালি খান মুরসিদাবাদের গড়েতে গমন করিয়া ইংরাজী পাতাকা উঠাইয়া দিলে সকলে বুঝিল ইঙ্গরাজ মহাশয়েরদিগের জয় হইল। যাবদীয় প্রধান ২ মনুষ্য ভেটের দ্রব্য দিয়া সাহেবের নিকট সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব সকলকে আশ্বাস করিয়া যিনি যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন সেই ২ কর্ম্মে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া

রাজপ্রসাদ দিলেন। মীরজাফরালিকে নবাব করিয়া সকলকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা সকলে সাবধানপূর্ব্বক রাজকর্ম্ম করিবা রাজ্যের প্রতুল হয় এবং প্রজালোক দুঃখ না পায়। সকলে আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

পরে নবাব স্রাজেরদৌলা পলায়ন করিয়া যান তিন দিবস অভুক্ত অত্যন্ত ক্ষুধিত নদীর তটের নিকটে এক ফকিরের আলয় দেখিয়া নবাব কর্ণধারকে কহিলেন এই ফকিরের স্থান তুমি ফকিরকে বল কিঞ্চিত খাদ্যসামগ্রী দেও একজন মনুষ্য বড় পীড়িত কিঞ্চিত আহার করিবেক। ফকির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৌকার নিকটে আসিয়া দেখিল অত্যন্ত নবাব স্রাজেরদৌলা বিষণ্ণবদন। ফকির সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছে বিবেচনা করিল নবাব পলায়ন করিয়া যায় ইহাকে আমি ধরিয়া দিব আমাকে পুর্ব্বে যথেষ্ট নিগ্রহ করিয়াছিল তাহার শোধ লইব ইহাই মনোমধ্যে করিয়া করপুটে বলিল আহারের দ্রব্য আমি প্রস্তুত করি আপনারা সকলে ভোজন করিয়া প্রস্থান করুন। ফকিরের প্রিয়বাক্যে নবাব অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া ফকিরের বাটীতে গমন করিলেন। ফকির খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিল এবং নিকটে নবাব মীরজাফরালিখানের চাকর ছিল তাহাকে সম্বাদ দিল যে নবাব স্রাজেরদৌলা পলায়ন করিয়া যায় তোমরা নবাবকে ধর। নবাব মীরজাফরালি খানের লোক এ সম্বাদ পাবামাত্রে অনেক মনুষ্য একত্র হইয়া নবাব স্রাজেরদৌলাকে ধরিয়া মুরসিদাবাদে আনিলেক॥

অপরাপর গদ্য-গ্রন্থ।

'তোতা ইতিহাস', 'বত্রিশ সিংহাসন', 'পুরুষ-পরীক্ষার অনুবাদ' প্রভৃতি কয়েকখানি গদ্য-পুস্তক উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত হয়,—উহাদের ভাষা কতকটা এই রকমের। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদিগকে বাঙ্গালা শিখাইবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়,—কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকগণ।

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁহারা কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিতে নিযুক্ত হন। তাঁহারা ভাবিলেন—তাঁহাদের পাণ্ডিত্য দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা অলঙ্কৃত করিতে হইবে,—সাধারণের দুরধিগম্য উৎকট সমাসাবদ্ধ রচনা দ্বারা তাঁহারা বাঙ্গালা গদ্যকে যেরূপ বিড়ম্বিত

করিয়াছিলেন,—তাহার নিদর্শন "প্রবোধ-চন্দ্রিকা" প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিলে পাওয়া যায়। প্রাচীন একখানি শিশু-বোধকে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের নিকট পত্র লিখিবার যে আদর্শ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শিশুবোধকের ধারা।

"শিরোনামা ঐহিক পারত্রিক ভবার্ণব নাবিক শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর মধ্যম ভট্টাচার্য্য মহাশয় পদপল্লবাশ্রয়প্রদানেষু।"

"শ্রীচরণ সরসী দিবানিশি সাধন প্রয়াসী দাসী শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেবী প্রণম্য প্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীপদসরোরুহ স্মরণমাত্র অত্র শুভম্বিশেষ। পরং মহাশয় ধনাভিলাষে পরদেশে চিরকাল কাল যাপন করিতেছেন, যে কালে এদাসীর কালরূপ লগ্নে পাদক্ষেপ করিয়াছেন, সে কাল হরণ করিয়া দ্বিতীয়কালের কালপ্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব পরকালে কালরূপকে কিছুকাল সান্ত্বনা করা দুই কালের সুখকর বিবেচনা করিবেন। * * * অতএব জাগ্রত নিদ্রিতার ন্যায় সংযোগ সঙ্কলন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীচরণযুগলে স্থানং প্রদানং কুরু নিবেদনমিতি।"

স্বামীর উত্তর—"শিরোনামা প্রাণাধিকা স্বধর্ম্মপ্রতিপালিকা শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেবী সাবিত্রীধর্ম্মাশ্রিতেষু।"

"পরম প্রণয়ার্ণব গভীর নীরতীরনিবসিত কলেবরাঙ্গসম্মিলিত নিতান্ত প্রণয়াশ্রিত শ্রীঅনঙ্গমোহন দেবশর্ম্মণঃ ঝটিত ঘটিত বাঞ্ছিতান্তঃকরণে বিজ্ঞাপনাঞ্চাদৌ শ্রীমতীর শ্রীকর-কমলাঙ্কিত কমলপত্রী পঠিতমাত্র অত্র শুভম্বিশেষ। বহুদিবসাবধি প্রতাবিধি নিরবধি প্রয়াস প্রবাস নিবাস তাহাতে কর্ম্মফাঁস ব্যতিরিক্ত উত্তক্তান্তঃকরণে কালযাপন করিতেছি। অতএব মন নয়ন প্রার্থনা করে যে সর্ব্বদা একতা পূর্ব্বক অপূর্ব্ব সুখোদ্ভব মুখারবিন্দ যথা-যোগ্য মধুকরের ন্যায় মধুমাসাদি আশাদি পরিপূর্ণ হয়। প্রয়াস মীমাংসা প্রণেতা শ্রীশ্রীঈশ্বরেচ্ছা শীতান্তে নিতান্ত সংযোগ পূর্ব্বক কালযাপন কর্ত্তব্য, বিত্তোপার্জ্জন তদর্থে তৎসম্বন্ধীয় কর্ত্তৃক দুঃখিতা এতাদৃশ উপার্জ্জনে প্রয়োজন নাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি। জ্ঞাপনামিতি।"

অনুপ্রাস বাহুল্যহেতু প্রাচীন গদ্যলেখা স্থলে স্থলে ঢক্কানাদের ন্যায় শ্রুতিকটু ও প্রহেলিকার ন্যায় দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িত, যথা—"রে পাষণ্ড ষণ্ড এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ড দেখিয়াও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া বকাণ্ড প্রত্যাশার ন্যায় লণ্ডভণ্ড হইয়া ভণ্ড সন্ন্যাসীর

অনুপ্রাসের বিকৃতি।

ন্যায় ভক্তিভাণ্ড ভঞ্জন করিতেছ এবং গবাপণ্ডের ন্যায় গণ্ডে জন্মিয়া গণ্ডকীস্থ গণ্ডশিলার গণ্ড না বুঝিয়া গণ্ডগোল করিতেছে?" অনুপ্রাস এস্থলে ভাষার অলঙ্কার হয় নাই, গলগণ্ড স্বরূপ হইয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত রচনার পার্শ্বে "কোকিল কালা- লাপ বাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।" (প্রবোধ-চন্দ্রিকা) প্রভৃতি উৎকট গদ্য সন্নিবেশ করা যাইতে পারে।

প্রাচীন গদ্য লিখিবার রীতি।

প্রাচীন গদ্যের কয়েকটি বিশেষ প্রণালী ছিল, তাহা এস্থলে উল্লেখ- যোগ্য। অনেক স্থলে গদ্য রচনার পূর্ব্বে "গদ্যছন্দ" এই কথাটি লিখিত দেখা যায়। পদ্য রচনার যেরূপ ভণিতা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল, গদ্য পুস্তকেও মধ্যে মধ্যে সেরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়, যথা কালীকৃষ্ণদাস রচিত 'কামিনীকুমারে'—"কালীকৃষ্ণ দাস বলে পশ্চাৎ রামবল্লভের এমনি কস্তু হইল যে, কামিনীকে আর পষ্ট রামবল্লভ বলিতে হয় না, রাম বলিবা মাত্রেই রামবল্লভ তামাক সাজাইয়া মজুত।"

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের কৃষ্ণচন্দ্রচরিতে দৃষ্ট হয়, এক একটি প্যারাগ্রাফের শেষে দুইটি দাঁড়ি (॥) প্রদত্ত হইয়াছে এবং অধ্যায়াংশের মধ্যবর্ত্তী রচনায় যে সকল স্থানে সম্পূর্ণ বিরামচিহ্ন দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে, সেই সকল স্থানে এক একটি দাঁড়ি (।) প্রদত্ত হইতে দেখা যায়। প্রাচীন গদ্যরচনাগুলিতে ব্যবহৃত অনেক শব্দ যে এখন অপ্র- চলিত কিম্বা ভিন্নার্থ-বোধক হইবে তাহা স্বাভাবিক; গদ্য পুস্তকে আমরা "সমাধান" —গুছান; "প্রকরণ"—কার্য্য, ঘটনা, "খেদিত"—বিমর্ষ—"সমভি- ব্যবহৃত"—সঙ্গযুক্ত; "অন্তঃকরণে করা"—মনে করা প্রভৃতি ভাবের অর্থে ব্যবহৃত শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি। "দিগের" এই বিভক্তিটির পূর্ব্বে প্রায়ই একটি 'র' প্রযুক্ত হইত, যথা "লোকের—দিগের", "ভৃত্যের— দিগের" "পণ্ডিতের—দিগের" এইরূপ প্রয়োগ রাজা রামমোহন রায়ের

গদ্য পুস্তকে অপ্রচলিত শব্দ।

গ্রন্থাবলীতে এবং প্রাচীন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সমূহেও অনেক পাওয়া যাইবে। প্রাচীন পুঁথির বর্ণবিন্যাসগুলির অদৃষ্টপূর্ব্বরূপ পরিদর্শন করিয়া এখন আমাদের আর বিস্ময় হয় না, মনোনীত শব্দের স্থলে "মনোন্বিত", থাকিবে না—"থাখিবে না", কুটুম্ব—"কুতুম্ব", বটে—"ভটে", এক—"য়েক", প্রভৃতি অনেক স্থলে দেখিতে দেখিতে আমাদের চক্ষে সহিয়া গিয়াছে। 'কৃষ্ণচন্দ্রচরিতে' কোন বিশিষ্ট পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করিবার সময় প্রায়ই "মহামহোপাধ্যায়" শব্দ ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই উপাধি সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বেও সাবেকী বাঙ্গালায় ইহার যথেষ্ট প্রচলন ছিল, স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বোদ্ধৃত শিশুবোধকের পত্র লিখিবার ধারা সংস্কৃত বিদ্যাভিমানী বিকৃতমস্তিষ্কের রচনা,—সাধারণ কাজকর্ম্মের জন্য এরূপ পত্রাদি প্রচলিত ছিল না। হাল্‌হেড্‌ সাহেব তাঁহার বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—সমস্ত বঙ্গদেশে কারবারের জন্য বাঙ্গালা পত্রাদি সর্ব্বদা লিখিত হইত। এইরূপে পত্রাদি-রচনায় বাঙ্গালা গদ্য নিত্য ব্যবহৃত হইত, সে সকল গদ্য সহজ ভাষা ও সরল কথায় লিখিত হইত।

প্রাচীনকালের পত্র লিখিবার প্রণালী দেখাইবার জন্য আমরা এই স্থলে দুইখানি পত্রের কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। প্রথম পত্রাংশ ৺দুর্গাপ্রসাদ মিত্রের লেখা। ১৮২৪ খৃঃ অব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী এই পত্র লিখিত হয়। * দ্বিতীয় পত্রখানি ড্রেক্‌ সাহেবের নিকট সিরাজউদ্দৌলা লিখিয়াছেন, উহা রাজীবলোচন যে ভাবে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রদত্ত হইল।

প্রথম পত্রাংশ—

"সেবকস্য প্রণামা নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে সেবকের মঙ্গল পরন্ত।—সম্প্রতি একজন দেশস্থ লোক দ্বারা জানিলাম যে, মহাশয় পুনর্ব্বার সংসার করিবেন

* লিপি-সংগ্রহ। আমরা এই পত্র এবং পরবর্ত্তী পত্র খানিতে বিরাম-চিহ্ন প্রদান করিলাম, মূলে বিরাম-চিহ্ন ছিল না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এমত অভিলাষ করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত রামগোপাল চক্রবর্ত্তী পাত্রী অন্বেষণ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন। এ বিবরণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মনস্তাপ পাইয়া যে প্রকার অন্তঃকরণে উদয় হইল, তাহা নিষ্কপটে নিবেদন করিতেছি। ইহাতে যদি কিছু অপরাধ হয়, তাহা ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হইবেক।"

দ্বিতীয় পত্র।

"ভাই সাহেবের পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম আপনি অনেক অনেক শাস্ত্র মত লিখিয়াছেন, এবং পূর্ব্বে যেমন যেমন হইয়াছে তাহাও লিখিয়াছেন, এ সকলি প্রমাণ বটে কিন্তু সর্ব্বত্রেই রাজাদিগের এই পণ যে শরণাগত ত্যাগ করেন না, তাহার কারণ এই রাজা যদি শরণাগত ত্যাগ করেন তবে তাঁর রাজ্যের বাহুল্য হয় না, এবং পরাক্রমেরও ত্রুটি হয়। আপনি রাজা নহেন মহাজন কেবল ব্যাপার বাণিজ্য করিবেন, ইহাতে রাজার ন্যায় ব্যবহার কেন, অতএব যদি রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে শীঘ্র এখানে পাঠান তবে ভালই নতুবা আপনকার সহিত যুদ্ধ করিব॥ আপনি যুদ্ধসজ্জা করিবেন, কিন্তু যদি যুদ্ধ না করেন তবে পূর্ব্বের যে নিয়মিত রাজকর আছে এইক্ষণ তাহাই দিবেন, আমি আপন চাকরেরদিগকে আজ্ঞা করিয়া দিলাম এবং শ্রীযুক্ত কোম্পানির নামে যে ক্রয় বিক্রয় হইবেক তাহারি নিয়ম থাকিবেক, কিন্তু আর আর সাহেব লোকেরা বাণিজ্য করিতেছেন তাঁহারদিগের স্থানে অধিক রাজকর লইব অতএব আপনি বিবেচক সৎপরামর্শ করিয়া পত্রের উত্তর লিখিবেন।"

শব্দের পরিবর্ত্তন ও অর্থান্তর গ্রহণ।

প্রায় শতাব্দী পূর্ব্বে যে সব শব্দ বঙ্গসাহিত্যে খুব প্রচলিত ছিল, তাহাদের কোন কোনটির ব্যবহার ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। পুছিল, পেখিল, মেনে, (এই শব্দ চণ্ডীদাসের কবিতা হইতে আরম্ভ করিয়া রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত বহু কবির রচনায়ই পাওয়া যায়, শেষোক্ত কবিদ্বয়ের পুস্তকে ইহার বিশেষ ছড়াছড়ি, কিন্তু অনেক স্থলেই এই শব্দের কোন অর্থ দৃষ্ট হয় না,—পাদপূরণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়) নেহারে, ঘরণী, দোঁহে, (দুইজন), আচম্বিত, এথায়, এবে,

এড়িল, প্রভৃতি শব্দের গদ্য-সাহিত্যে এখন আর স্থান নাই, ইহাদের কোন কোনটির প্রভাব গদ্য-সাহিত্যেও অস্তগামী।

সংস্কৃত শব্দের অর্থ কোন কোন স্থলে বাঙ্গালায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সংস্কৃত "প্রীতি" শব্দ বলিতে যাহা বুঝায় বাঙ্গালা "পীরিত" শব্দে, বোধ হয়, তাহা বুঝায় না। সংস্কৃত 'রাগ' শব্দ বাঙ্গালায় সম্পূর্ণ ভিন্নার্থ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু চৈতন্যপ্রভুর সময়েও রাগের অর্থ ক্রোধ ছিল না,—গোবিন্দ দাসের কড়চায় "রাগে ডগমগ প্রভু দেয় সন্তরণ। পাড়ে দাঁড়াইয়া দেখে যত ভক্তগণ।" অংশে রাগ শব্দ মূল অর্থবিচ্যুত হয় নাই, এখন 'রাগ' এবং 'অনুরাগ' বাঙ্গালায় দুই ভিন্নার্থবোধক শব্দ। ভর্ত্তা হইতে যে শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালায় কেবল মাত্র অর্থদুষ্ট হয় নাই, বোধ হয় একটু অশ্লীল হইয়াছে। ভাণ্ডারী নামে পরিচয় দিতে এক সময়ে মহারাজ দুর্য্যোধনও কুণ্ঠিত হন নাই, এখন ইহায় অর্থ তদ্রূপ গৌরবজনক নহে। দেব শব্দ হইতে 'দে' শব্দ উৎপন্ন হইয়া এখন ইহা ভাষায় নিতান্ত নিগৃহীত হইয়াছে, একটু মর্য্যাদাবিশিষ্ট হইলে "দে" গণ 'দাস' আখ্যা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হন। 'দেব'-গণের বংশধর 'দাস' হইতেও হীন হইয়াছেন। মনুষ্যের ভাগ্যচক্রের ন্যায় শব্দগুলির ভাগ্যচক্রও পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। "মহোৎসব" শব্দের অর্থ বাঙ্গালায় সীমাবদ্ধ হইয়াছে; বৈষ্ণবগণ এই শব্দের অর্থ সঙ্কুচিত করিয়াছেন। মহোৎসবের ন্যায় বোধ হয় "সঙ্কীর্ত্তন" শব্দও তাঁহাদের দ্বারা সঙ্কুচিতার্থ হইয়াছে।

খেঁউর গান।

পূর্ব্বে যাত্রাওয়ালা ও কবিওয়ালাগণের বিষয় আমরা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছি। "খেঁউর" গানে গালাগালির চূড়ান্ত করা হইত। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে নদে ও শান্তিপুর 'খেঁউর' গানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বিদ্যাসুন্দরকে বর্দ্ধমানে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য প্রলোভন দেখাইতেছেন,—

নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব। নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥"—(ভা, বি)।

কৃষ্ণনগরের পুতুল ও শান্তিপুরের ধূতির বিষয়ও ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা জয়নারায়ণের কাশীখণ্ডের পরিশিষ্টে দেখিতে পাইয়াছি, নবদ্বীপের কারিকরগণ পাথরের মূর্ত্তি গড়িতে বিশেষ পটু ছিল, কাশীধামেও তাহাদের আদর ও প্রতিপত্তি ছিল। ভক্তিরত্নাকরে আমরা হালিসহরনিবাসী নয়নভাস্কর নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ভাস্করের উল্লেখ পাইয়াছি—("নয়ন ভাস্কর হালিসহর গ্রামে ছিল"—ভক্তিরত্নাকর, ১০ তরঙ্গ)। জয়নারায়ণ সেনের চণ্ডীতে দৃষ্ট হয়, বঙ্গদেশে শ্রীহট্টের ঢাল, লাহোরী কামান, কাশ্মীরী কুঙ্কুম, মূলতানের হিঙ্গ, চিনের পুতুল ও দক্ষিণ দেশের গুবাক, বিশেষরূপ আদৃত ছিল। এতদ্ব্যতীত "কাশ্মীর দেশের ভাল শাল গঙ্গাজলি" উক্ত পুস্তকে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। দেশীয় বণিক্‌গণ বাণিজ্য করিয়া বিপুল ধনোপার্জ্জন করিতেন; শ্রীপতি, লক্ষপতি, ধনপতি,—প্রভৃতি নাম ধনের মর্য্যাদাব্যঞ্জক। রাজপুত্র কি সদাগরের পুত্রকে নায়করূপে বরণ করিয়া নিত্য নব উপাখ্যানের সৃষ্টি করা হইত,—আমরা শৈশবকালে সেই সব উপাখ্যান শুনিয়া রাজপুত্র এবং সদাগরের পুত্র উভয়কে প্রায় তুল্যরূপ সম্মানীয়ই জ্ঞান করিতাম। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য চণ্ডী ও মনসার গীতের নায়ক-নায়িকা—সদাগর-কুলোদ্ভব। এখন বণিকসম্প্রদায় য়ুরোপে সম্মানিত, আমাদের দেশে নিগ্রহভাজন।

শিল্প ও বাণিজ্য।

অন্তঃপুরশিক্ষার প্রবাহ স্তিমিত ছিল বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। আনন্দময়ী দেবীর যেরূপ রচনা-পরিপাট্যের উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী শিক্ষিতা

স্ত্রীশিক্ষা।

মহিলাগণের অন্ততঃ সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অধ্যায়-ভাগে আমরা যজ্ঞেশ্বরী নাম্নী এক রমণীর রচিত গানের কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। বিক্রমপুর অঞ্চলে লালা জয়নারায়ণের ভগিনী গঙ্গামণি দেবী এক শতাব্দী পূর্ব্বে অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি এখনও তদ্দেশে বিবাহোপলক্ষে গীত হইয়া থাকে। এক শত বৎসর পূর্ব্বে ফরিদপুর নিবাসিনী সুন্দরী দেবী নাম্নী ব্রাহ্মণ-রমণী ন্যায় শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড জে, লং সাহেবের বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকায় এই রমণীর নাম উল্লিখিত দৃষ্ট হয়।

সংস্কৃত ও ফরাশী।

যখন রমণীমহলে লেখাপড়ার এতদূর চর্চ্চা হইতেছিল, তখন পুরুষগণের অনেকেই যে সরস্বতীর বরপুত্র হইতে লালায়িত হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! বাঙ্গালা ভাষায় ফারশী ও সংস্কৃত এই দুই পদ মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিল। আমরা রামপ্রসাদের কবিতায় সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গালার সংযোগ চেষ্টা দেখাইয়াছি। সলিলে তৈলবিন্দুর মত উক্ত কবির কাব্যে এই দুই পদ ভালরূপ মিশ্রিত হয় নাই। ভারতচন্দ্র, কবি আলওয়াল্ প্রভৃতি এই বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন; ভারতচন্দ্র একস্থলে লিখিয়াছেন, "মানসিংহ পাতসার হইল যে বাণী। উচিত যে পারশী, আরবী, হিন্দুস্থানী॥ পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবার পারি। কিন্তু সে সকল লোক বুঝিবারে ভারি॥ না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল। অতএব কহি ভাষা যবনী মিশাল॥" কেবল যবনীমিশ্রিত ভাষা ব্যবহার করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। স্থলে স্থলে বিদ্যার দৌড় দেখাইতে যাইয়া সংস্কৃত, ফারশী, বাঙ্গালা, হিন্দী এই চতুর্বিধ উপকরণে এক বীভৎস অবয়ব প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা যজ্ঞান্তে পুনর্জীবিত দক্ষমূর্ত্তির ন্যায় উৎকট,*—

---

* ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে বিরচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভূমিকায় গ্রন্থকার হাল্‌হেড সাহেব লিখিয়াছিলেন,—"At present those persons are thought to speak this

যথা, "শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর, বারদকে গোয়দ রুবর, কাতর দেখে আদর কর, কাহে মররো রোয়কে। বক্তুং বেদং চন্দ্রমা, চুঁ লালা চে রেমা, ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা মেটিমে কাহে শোয়কে।" এই শিক্ষার তরঙ্গে নিমজ্জিত সভাগৃহ আন্দোলিত হইত। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ কি ভাবে বিচার করিতেন, জয়নারায়ণ সেন তাঁহার চণ্ডীকাব্যে তাহা অতি সুচারুভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা সেই অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক ইহাতে সে সময়ে কি কি পুস্তক পঠিত হইত, তাহারও একটা তালিকা দেখিতে পাইবেন।

"ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে, পাইয়া পত্র নিমন্ত্রণে, উপনীত সভা আরোহনে। কেবল অধিষ্ঠানমাত্র, দান নিতে নহে পাত্র, ধর্ম্ম সংস্থাপন কারণে॥ তেজস্পুঞ্জ সুকিরণ, শুক্লবর্ণ সুবসন, ভালেতে গঙ্গা মৃত্তিকা ফোঁটা॥ শুক্ল যজ্ঞোপবীতে, রক্তভোট আসনেতে, বসিতেহি বিচারের ঘটা॥ অনুমান প্রত্যক্ষেতে, পরম্পর সম্বন্ধেতে, তার্কিক ঘটায় নানা তর্ক। প্রমাণ কুসুমাঞ্জলী, নানামতে ব্রহ্মবলি, একে আর ঘটায় সম্পর্ক॥ পদ পদার্থ বিচারেতে এক দণ্ড সমাসেতে, কার কত নিন্দিত ঘটাইয়া। বৈয়াকরণিয়া সবে, বিচার কর্কশ রবে, গোপীনাথ পরিশিষ্ট লইয়া॥ মধুর বাক্যের বাণী, অলঙ্কার শুনি ধ্বনি, একদিকে কহিছে রসেতে। ধ্বনি বাক্য কয়ে কয়ে, ব্যঞ্জনাদিক লয়ে, কাব্যপ্রকাশক উদাহরণেতে॥ নানা ছন্দে শ্লোক পাঠ, সাহিত্যে বিচার ঠাট, কত মত বর্ণনা ভাবের। রসিক বিবুধগণে, মধ্যস্থ পণ্ডিত মানে, রঘু, ভট্টি, মাঘ, নৈষদের। পৌরাণিক পণ্ডিতে, নানামত প্রসঙ্গেতে, বিচার করিছে ভাবি মনে। বশিষ্ঠাদি বেদ জানে, স্তন্ক ভাবগণে, অন্তপ্রত্যন্তর লিখি। দশা বিদশা বসতি, জানায় সাধু প্রতি, সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত দেখি। সকলেতে ব্রহ্মময়, বেদান্তে এমত কয়, পাপ পুণ্যালয় নিরঞ্জন। শত্রু মিত্র সম তিনি, জ্ঞান ভেদে ভিন্ন মানি, শঙ্করাচার্য্যের এ লিখন॥ পড়িলে বিপত্তিকালে, দোষ যদি ঘটে বলে ধর্ম্মশাস্ত্র মতে পাপ নহে। স্মৃতিশাস্ত্রে লেখা এই, শূলপানি মত এই, মুক্তকণ্ঠ হৈয়া মনু কহে॥"

পণ্ডিতগণ পরকালের তত্ত্ব নিরূপণ করিতেছিলেন, রাজপুত্রগণ এক

---

compound idiom with the most elegance who mix with pure Indian verbs the greatest number of Persian and Arabic nouns."

হস্তে শুক পক্ষী ও অপর হস্তে রসকথাপূর্ণ কাব্য লইয়া বিলাস কলায় দীক্ষিত হইতেছিলেন,—এই সময় ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নবভাবে গঠিত হইতেছিল; তাঁহাদের শাস্ত্রকথা ও রসকথাও যে হঠাৎ প্রবল এক রাজনৈতিক ঝাপ্‌টা বাতাসে থামিয়া পড়িবে, ইহা তাঁহারা মনেও করেন নাই।

নবভাবের সূচনা।

ইংরেজ-আগমনের সঙ্গে সামাজিক জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে, পারিবারিক জীবনে নূতন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে; নূতন আদর্শ, নূতন উন্নতি ও নূতন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমগ্র জাতি অভ্যুত্থান করিয়াছে। সাহিত্যে এই নবভাবের ফলে গদ্যসাহিত্যের অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, বাঙ্গালী এখন বাঙ্গালা ভাষাকে মান্য করিতে শিখিতেছে, ইহা ভাবী শুভের পূর্ব্বলক্ষণ। ক্রীড়াশীল শিশু যেরূপ সমুদ্রতীরে খেলা করিতে করিতে একান্ত মনে গভীর উর্ম্মিরাশির অস্ফুট ধ্বনি শুনিয়া চমকিত হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রসঙ্গে ব্যাপৃত থাকিয়া আমিও সেইরূপ বঙ্গসাহিত্যের অদূরবর্ত্তী উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির কথা কল্পনা করিয়া প্রীত ও বিস্মিত হইয়াছি। অর্দ্ধ শতাব্দীতে বঙ্গীয় গদ্য যেরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে কাহার মনে ভাবী উন্নতির উচ্চ আশা অঙ্কিত না হয়! আমার ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলে ভবিষ্যতে নবভাবে স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত, নব-আশা-দৃপ্ত বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতিশীল চিত্র আঁকিয়া দেখাইব, আশা রহিল।

সম্পূর্ণ।

গ্রন্থভাগে অনুল্লিখিত প্রাপ্ত হস্তলিখিত পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

১। অদ্বৈততত্ত্ব—শ্যামানন্দপুরী। "ধরেন্দা, বাহাদুরপুর"-বাসী দুরিকানন্দন প্রসিদ্ধ শ্যামানন্দ এই পুস্তকে অদ্বৈতপ্রভুর প্রতি মাধবেন্দ্রপুরীর উপদেশবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

২। অস্তপ্রকাশ খণ্ড—শ্রীনিবাস পুত্র গতিগোবিন্দ প্রণীত। শ্লোক ১২৫।

৩। অভিরামবন্দনা—রাইচরণ দাস। অভিরামগোস্বামী ও জাহ্নবীঠাকুরাণী সম্বন্ধে অনেক কথা ইহাতে আছে। শ্লোক ৪২০। হঃ লিঃ ১০৯৫ বাং সন।

৪। অমৃতরত্নাবলী—মুকুন্দ দাস। বৈষ্ণবধর্ম্মের রূপক গ্রন্থ।

৫। অমৃতরসাবলী—শ্রীমুকুন্দ দেবের আদেশে কোন অজ্ঞাত লেখক দ্বারা লিখিত। ইহাতে সহজ-ভজনের ব্যাখ্যা আছে। গ্রন্থকার স্বপ্ন, প্রত্যাদেশ প্রভৃতির দোহাই দিয়া সহজ-ভজনাকে ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী। শ্লোকসংখ্যা ৩২০।

৬। আটরস—গোবিন্দদাস প্রণীত।

৭। আত্মজিজ্ঞাসা—গদ্যপুস্তিকা। কৃষ্ণদাসপ্রণীত। দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় হঃ লিঃ ১২০৮ বাং।

৮। আত্মনিরূপণ—কৃষ্ণদাসপ্রণীত। আত্মতত্ত্ববিষয়কপুঁথি। শ্লোকসংখ্যা ২১১। হঃ লিঃ ১২২২ সাল।

৯। আত্মনিরূপণ—খণ্ডিত।

১০। আত্মসাধন—কৃষ্ণদাসপ্রণীত। হঃ লিঃ ১২২২ সাল।

১১। আনন্দভৈরব—প্রেমদাস প্রণীত।

১২। আনন্দলহরী—খণ্ডিত।

১৩। ইতিহাসসমুচ্চয়—খণ্ডিত।

১৪। উদ্ধবদূত—মাধবগুণাকরপ্রণীত। "তাড়িত নামেতে গ্রাম অতি অনুপাম। কবিশেখরের পুত্র কবিচন্দ্র নাম॥ তাহার পুত্র মাধব নামেতে গুণাকর। পরম পণ্ডিত ছিল সর্ব্বগুণধর॥ গজসিংহ নাম রাজা ছিল বর্দ্ধমানে। তার সভাসদ ছিল দ্বিজ সর্ব্বগুণে।"

১৫। উদ্ধবসংবাদ—দ্বিজ নরসিংহ প্রণীত। শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০।

১৬। উপাসনাতত্ত্বসার—হঃ লিঃ ১২৪৭ সাল।

১৭। উপাসনাপটল—নরোত্তমদাসপ্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ৮১০।

১৮। উপাসনাপটল—শ্লোক ১২৫।

১৯। উপাসনাসারসংগ্রহ—শ্যামানন্দ দাস।

২০। একাদশীব্রতকথা—শ্যামদাসপ্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ২৮০।

২১। কণ্বমুনির পারণ—কৃষ্ণদাসপ্রণীত, হঃ লিঃ ১১৩৪ সাল। শ্লোকসংখ্যা ১৫০।

২২। কণ্বমুনির পালা—কৃষ্ণদাসপ্রণীত।

২৩। কপিলামঙ্গল—ক্ষুদিরামদাস ও কেতকাদাস প্রণীত। হঃ লঃ ১২২৮ বাং।

২৪। কবচাবলী—সত্রঙ্গরূপ। হঃ লিঃ ১০৮২। শ্লোক ১৪০।

২৫। কালনেমির রায়বার—কাশীনাথপ্রণীত। ১২৫৯ সাল। হঃ লিঃ।

২৬। কালকেতুর চৌতিশা—শ্রীচাঁদদাসপ্রণীত।

২৭। কালিকাপুরাণ—দ্বিজদুর্গারামপ্রণীত।

২৮। কালিকাষ্টক—শম্ভু প্রণীত।

২৯। কালিকাবিলাস—কালিদাসপ্রণীত, খণ্ডিত পুস্তক, যে অবধি আছে, শ্লোকসংখ্যা ১৭৪০।

৩০। কালিয়দমন—দ্বিজপরশুরামপ্রণীত। হঃ লি ১৭৬১।

৩১। কাশীখণ্ড—ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী কেদারপুরনিবাসী কেবলকৃষ্ণবসুকর্তৃক এই অনুবাদখানি ১২২২ সালে রচিত হয়।

৩২। কিরণদীপিকা—দীনহীনদাস—কবিকর্ণপুরপ্রণীত গৌরগণোদ্দেশদীপিকার অনুবাদ।

৩৩। কুঞ্জবর্ণন—নরোত্তমদাসপ্রণীত। "শ্রীলোকনাথগোসাঞি পাদপদ্ম করি আশ। কুঞ্জবর্ণন গায় নরোত্তম দাস॥" শ্লোকসংখ্যা ১৫০।

৩৪। ক্ষণদাগীতচিন্তামণি—পদসংগ্রহ গ্রন্থ।

৩৫। কৃষ্ণলীলামৃত—বলরামদাস।

৩৬। কৃষ্ণের একপদী চৌতিশা—ভবানন্দ।

৩৭। ক্রিয়াযোগসার—রামেশ্বর নন্দী প্রণীত, বৈষ্ণবদিগের নিত্য নৈমিত্তিক গ্রন্থ। পুঃ নঃ ১২১৯ বাং।

৩৮। গঙ্গামঙ্গল—জয়রামপ্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ৩৫০; সন ১২৪৮।

৩৯। গজেন্দ্রমোক্ষণ—ভবানীদাস প্রণীত। শকাব্দা ১৬১৫ হঃ লিঃ।

৪০। গীতগোবিন্দ—(অনুবাদক) অজ্ঞাত লেখক। "হেন জয়দেব বাক্যরচনা সংস্কৃতে। ভাঙ্গিয়া করিল আমি সংস্কৃত প্রাকৃতে॥ এই দোষ আমায় ক্ষেমিবে শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত-গণ। বৈষ্ণবের আজ্ঞাহেতু আমার রচন॥ সমাপ্ত করিল গজইক্ষুরস সোনে (১৬৫৮)। কৃষ্ণপক্ষ আষাঢ়ের দিবস পঞ্চমে॥ পটের তৃতীয় কর মধ্যেতে আকার। সেই নদীর নিকটে কেবল পুর্ব্বাধার॥ ইন্দ্রের বাহন পরে দময়ন্তী-পতি। বিরচিল সেই গ্রামে করিয়া বসতি॥"

৪১। গীতগোবিন্দসার—গীতগোবিন্দের অনুবাদ।

৪২। গীতগোবিন্দরতিমঞ্জরী—ঘনশ্যামদাস, (দিব্যসিংহের পুত্র)।

৪৩। গুরুদক্ষিণা—অযোধ্যারামপ্রণীত। হঃলিঃ ১২২২ সন। শ্লোক ১৫০।

৪৪। গুরুদক্ষিণা—পরশুরামপ্রণীত। শ্লোক ১৫০। হঃ লিঃ ১২৫৬ সাল।

৪৫। গুরুদক্ষিণা—স্বরূপরাম। হঃ লিঃ ১২৫৩ বাং।

৪৬। গুরুদক্ষিণা—শঙ্করপ্রণীত। হঃ লি ১২৫৯ সাল, শ্লোক ৩০০।

৪৭। গুরুশিষ্যসংবাদ—নরোত্তমদাসপ্রণীত, হঃ লিঃ ১২২২।

৪৮। গুরুশিষ্যসংবাদ—হঃ লিঃ ১২৫৩ বাং।

৪৯। গোপালবিজয়—কবিশেখর প্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ২৫০০। হঃ লিঃ শকাব্দা ১৭০১।

৫০। গোপীভক্তিরস বা কৃষ্ণলীলা } খণ্ডিত। শ্লোকসংখ্যা (প্রাপ্ত) ২১০০।

৫১। গোবিন্দরতিমঞ্জরী—ঘনশ্যামদাসপ্রণীত। সুন্দর পদাবলী।

৫২। গোলকবস্তুবর্ণন—গোপালভট্টপ্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ১০০।

৫৩। গৌরগণাখ্যান—দেবনাথপ্রণীত, ভক্তগণের বিবরণ। শ্লোকসংখ্যা ৩২৫।

৫৪। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা—দ্বিজ রূপচরণ দাস, কর্ণপূরকৃত সংস্কৃতের অনুবাদ।
ঐ হৃদয়ানন্দ দাস—গ্রন্থকার খণ্ডবাসী রঘুনন্দন বংশীয়। এখানিও কবিকর্ণপূরকৃত সংস্কৃতের অনুবাদ।

৫৫। গৌরীবিলাস—দ্বিজ রামচন্দ্র প্রণীত।

৫৬। ঘুঘুচরিত্র—ভবানন্দপ্রণীত। হঃ লিঃ ১২১২ সাল।

৫৭। চন্দ্রচিন্তামণি—প্রেমানন্দ দাস প্রণীত গদ্যপদ্যময় গ্রন্থ। "কনকমঞ্জরী পাদপদ্ম অভিলাষে। চন্দ্রচিন্তামণি কহে প্রেমানন্দ দাসে॥"

৫৮। চমৎকারচন্দ্রিকা—শ্রীমুকুন্দদাস—হঃ লিঃ ১২৪২ সাল।
ঐ—নরোত্তম দাস—হঃ লিঃ ১১৪৫ সাল।

৫৯। চম্পক কলিকা—গদ্যাংশযুক্ত পদ্যগ্রন্থ শ্রীরসময় দাস প্রণীত।

৬০। চাটুপুষ্পাঞ্জলি—রূপগোস্বামি-বিরচিত, খণ্ডিত পুঁথি।

৬১। চিন্তামণিটীকা—খণ্ডিত। হঃ লি ১২৪৩ সাল।

৬২। চৈতন্যচন্দ্রামৃত—প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত সংস্কৃত চৈতন্যচন্দ্রামৃতের অনুবাদ।

৬৩। চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী—প্রেমদাস বিরচিত, জীবনাখ্যায়িকা গ্রন্থ। শ্লোকসংখ্যা ৩৮২৫। হঃ লিঃ ১১০৬ সাল।

৬৪। চৈতন্যতত্ত্বসার—রামগোপালদাস প্রণীত, হঃ লিঃ ১০৮১। "শ্রীমধুমতীচরণে যার অভিলাষ। চৈতন্যতত্ত্বসার কহে রামগোপাল দাস॥"

৬৫। চৈতন্যপ্রেমবিলাস—লোচনদাসপ্রণীত, শ্লোক ১০০।

৬৬। চৈতন্যমহাপ্রভু—হরিদাস প্রণীত। হঃ লিঃ ১২২০ সাল। শ্লোক ২৫০।

৬৭। চৈতন্যরসকারিকা—যুগলকিশোর দাস প্রণীত। শ্লোক ৩০।

৬৮। জগন্নাথমঙ্গল—দ্বিজ মুকুন্দ প্রণীত। হঃ লিঃ। শকাব্দা ১৭৩৫। শ্লোকসংখ্যা ২০০০।

৬৯। জয়গুণের বারমাস্যা—প্রায় ১৫০ বৎসর গত হইল চট্টগ্রামস্থ আনোয়ার নিবাসী মহম্মদ হারি কর্ত্তৃক বিরচিত সংস্কৃতাত্মক মধুর পদাবলী।

৭০। জ্ঞানরত্নাবলী—কৃষ্ণদাসপ্রণীত।

৭১। ঝাড়ন মন্ত্র সংগ্রহ—খণ্ডিত।

৭২। তত্ত্বকথা—যদুনাথ দাস প্রণীত। খণ্ডিত পুঁথি।

৭৩। তত্ত্ববিলাস—বৃন্দাবন দাস প্রণীত। হঃ লিঃ ১০৮৭। শ্লোক ৮৫০।

৭৪। তামাকুচরিত্র—সীতারামকর প্রণীত।

৭৫। তুলসীচরিত্র—দ্বিজভগীরথ প্রণীত। হঃ লিঃ ১২০৩ সন। শ্লোকসংখ্যা ১৮০।

৭৬। ত্রিগুণাত্মিকা—ক্ষুদ্র গদ্য ব্যাখ্যাময় পুস্তক। সন ১১১২।

৭৭। দধিখণ্ড—বৃন্দাবন বিরচিত। হঃ লিঃ সন ১২১৩।

৭৮। দণ্ডীপর্ব্ব—কবি মহীন্দ্র প্রণীত। হঃ লিঃ ১২৫৯ সন। শ্লোক সংখ্যা ১৫০০।

৭৯। দর্পণচন্দ্রিকা—নরসিংহ দাস প্রণীত। হঃ লিঃ ১২৬৭ সাল। শ্লোক ২৫০।

৮০। দময়ন্তীর চৌতিশা—বিষ্ণুসেন প্রণীত।

৮১। দানখণ্ড—জীবন চক্রবর্ত্তী প্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ২২৫।

৮২। দাসগোস্বামীর সূচক—রাধাবল্লভ দাস প্রণীত, হঃ লিঃ ১২৫৬ সাল। শ্লোক-সংখ্যা ২০।

৮৩। দ্বাদশপাট নির্ণয়—নীলাচল দাসপ্রণীত, গদ্যপদ্যময় পুঁথি। শ্লোক ১১০; শেষ এইরূপঃ—"দ্বাদশ পাটের নির্ণয়। আদৌ ঠাকুর অভিরামের পাট খানাকুল কৃষ্ণনগর ১। অম্বিকা গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর ২। আকনা মহেশ পণ্ডিত ঠাকুর ৩। ঠাকুর সুন্দরানন্দ হলদা মহেশপুর ৪। উদ্ধরণ দত্ত সপ্তগ্রাম। ৫। কাল্যা কৃষ্ণদাস আকাইহাটের ৬। এই ছয় পাট। নবদ্বীপ পুরুষোত্তম পণ্ডিত ঠাকুর ১। কমলাকর পিপলাই ২। ধনঞ্জয় পণ্ডিত ৩। পরমেশ্বরীদাস ঠাকুর ৪। মুকুন্দদাস ঠাকুর ৫। কাশীশ্বরদাস ঠাকুর ৬। জোজানে মালীদাস ঠাকুর নবদ্বীপে ছয় পাট (?) উপমহান্ত গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের পাট অগ্রদ্বীপ ১, তমলুকে বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর ২, গৌবাপুর। ৩।

৮৪। দ্বারকাবিলাস—দ্বিজ জয়নারায়ণ প্রণীত। হঃ লিঃ ১২৫২। শ্লোক সংখ্যা ২০০০।

৮৫। দিনমণিচন্দ্রোদয়—মনোহর দাস "শ্রীযুক্ত অনঙ্গমঞ্জরীর পদে আশ। দিনমণি-চন্দ্রোদয় কহে মনোহর দাস॥"

৮৬। দীপকোজ্জ্বল—বংশীদাসপ্রণীত, খণ্ডিত (বৃহৎ পুঁথির অবশেষ বলিয়া বোধ হয়)।

৮৭। দেহনিরূপণ—লোচন দাস প্রণীত শ্লোকসংখ্যা ১০০।

৮৮। দেহভেদতত্ত্বনিরূপণ—গদ্যপদ্যময় ক্ষুদ্র পুঁথি।

৮৯। দুই দশার আখ্যা—হঃ লিঃ ১২৬৭ সাল।

৯০। দুর্গামঙ্গল—দ্বিজরামচন্দ্র প্রণীত।

৯১। ধর্ম্মমঙ্গল—দ্বিজ রামচন্দ্র প্রণীত "দ্বিজ রামচন্দ্র গায় নিবাস চামটে।"

৯২। ধ্রুবচরিত—ভারত পণ্ডিত। শ্লোক ৫৯০।

৯৩। ঐ—চট্টগ্রামনিবাসী লক্ষ্মীকান্ত দাস বিরচিত।

৯৪। নবদ্বীপপরিক্রমণ—ক্ষুদ্র পুঁথি।

৯৫। নামামৃতসমুদ্র—নরহরি দাস প্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ২৯০।

৯৬। নারায়ণদেবের পাঁচালী—দীনরাম প্রণীত।

৯৭। নারদপুরাণ—কৃষ্ণদাস, হঃ লিঃ ১১০৮ সাল। গ্রন্থশেষে কবির পরিচয় এইরূপ, "অতঃপর কহি শুন নিজ সমাচার। সুবর্ণ বণিক কুলে উৎপত্তি আমার॥ পৈত্রিক বসতি পূর্ব্বে অম্বিকানগর। হাঁসপুকুর নাম যথা তাহার উত্তর॥ পিতামহ নাম ছিল মদনমোহন। পিতা তারাচাঁদ নাম ধর্ম্মপরায়ণ॥ এ সকল পুণ্যবান আছে পূর্ব্বকীর্ত্তি। এ অধমের সংসারে রহিল অপকীর্ত্তি॥ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাম ছিল রামনারায়ণ। ভেক আশ্রয় হয়্যা তীর্থ করেন ভ্রমণ॥ রঘুনাথ মধ্যম

ভাই অধিক পুণ্যবান। স্বর্গবাসে গেলা তিহ চাপিয়া বিমান॥ আপনি কনিষ্ঠ মোর রসিককৃষ্ণ নাম। সাকিম কলিকাতা বহুবাজারেতে ধাম॥ সন দশ শত নিরেনব্বুই সালে। মাহ জ্যৈষ্ঠ মাসে এই পুস্তক রচিলে॥

৯৮। নিকুঞ্জরহস্যস্তব গীতাবলী—শ্রীরূপ এবং সনাতনকৃত মূল এবং বংশীদাস কৃত অনুবাদ হঃ লিঃ ১২০০ সাল।

৯৯। নিগম—শ্লোক ১৬০। হঃ লিঃ ১২২২ সাল।

১০০। নিগমগ্রন্থ—গোবিন্দ দাস প্রণীত, হঃ লিঃ ২৫৫ বাং। ১৪০।

১০১। নিগমগ্রন্থ।

১০২। নিগূঢ়ার্থ-প্রকাশাবলী গৌরীদাস প্রণীত। শ্লোক ১৫৫৫। বৈষ্ণব ধর্ম্মের রূপক গ্রন্থ।

১০৩। নিগূঢ় তত্ত্ব—হঃ লিঃ ১২৪২ সাল।

১০৪। নিত্যবর্ত্তমান—শ্রীজীব গোস্বামী।

১০৫। নিমাইচাঁদের বারমাস্যা।

১০৬। নিষ্কামী আশ্রয় নির্ণয়—এই পুস্তকে রূপ ও রঘুনাথ গোস্বামীর কথায় ভক্তির ব্যাখা প্রদত্ত হইয়াছে।

১০৭। নৌকাখণ্ড—জীবন চক্রবর্ত্তী, হঃ লিঃ ১২০২ সাল, শ্লোক ১২০।

১০৮। পাষণ্ডদলন—কৃষ্ণদাস।

১০৯। প্রার্থনা—লোচন দাস ঠাকুর।

১১০। প্রেমদাবানল—নরসিংহ- শ্লোকসংখ্যা ৩০০।

১১১। প্রেমবিষয় বিলাপ—যুগলকিশোর দাস, শ্লোক ৪৪২।

১১২। প্রেমভক্তিসার—গুরুদাস বসু প্রণীত।

১১৩। প্রেমামৃত—গুরুচরণ দাস। শ্রীনিবাস আচার্য্যের জীবনকাহিনী। গ্রন্থকার শ্রীনিবাসাচার্য্যের দ্বিতীয়া পত্নী গৌরপ্রিয়ার আদেশে পুস্তক রচনা করেন। শ্লোকসংখ্যা ৪৪০০।

১১৪। বাণ-যুদ্ধ—শ্রীগৌরীচরণ গুহ বিরচিত।

১১৫। বিক্রমাদিত্য উপাখ্যান—খণ্ডিত।

১১৬। বিদ্যাসুন্দর—শ্রীনিধিরাম কবিরত্ন প্রণীত।

১১৭। বিলাপকুসুমাঞ্জলি—শ্রীরঘুনাথ ও রাধাবল্লভ দাস প্রণীত। রাধিকার স্তব।

১১৮। বিলাপবিবৃতিমালা—খণ্ডিত।

১১৯। বীররত্নাবলী—গতিগোবিন্দ।

১২০। ব্রজতত্ত্বনির্ব্বর্ত্ত—হঃ লিঃ ১০৮২ সাল।

১২১। বৃন্দাবন-ধ্যান—খণ্ডিত।

১২২। বৃন্দাবন-পরিক্রমা—দুইখানি পাওয়া গিয়াছে—একখানি কৃষ্ণদাস প্রণীত ও অপরখানি শ্যামানন্দ পুরী প্রণীত। বৃন্দাবনের স্থান মাহাত্ম্য।

১২৩। বৈষ্ণববন্দনা—শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর। হঃ লিঃ ১০৮৮।

১২৪। বৈষ্ণবামৃত—খণ্ডিত।

১২৫। ভজনমালিকা—কৃষ্ণরাম দাস।

১২৬। ভক্তিউদ্দীপন—নরোত্তম দাস।

১২৭। ভক্তি চিন্তামণি—বৃন্দাবনদাস—শ্লোক ৬০০। হঃ লিঃ ১০৬৯ সাল।

১২৮। ভক্তিরসাত্মিকা—অকিঞ্চন দাস, শ্লোক ১৭৫।

১২৯। ভক্তিরসাত্মিকা—খণ্ডিত।

১৩০। ভগবদ্গীতা—বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মচারী প্রণীত। গীতার অনুবাদ। পুঃ নঃ ১২৪৬ বাং।

১৩১। ভ্রমরগীতা—দেবনাথ দাস—শ্লোকসংখ্যা ২৫০।

১৩২। ভ্রমরগীতা—খণ্ডিত।

১৩৩। ভাণ্ডতত্ত্বসার—রসময় দাস—হঃ লিঃ ১২৭৬ সাল। শ্লোক ২৫০।

১৩৪। মঙ্গলচণ্ডী—রঘুনাথ দাস—হঃ লিঃ ১২২৪ সন, শ্লোক ১৫০।

১৩৫। মঙ্গলচণ্ডী—শ্রীমদন দত্ত বিরচিত।

১৩৬। মদনমোহনবন্দনা—জয়কৃষ্ণ দাস—হঃ লিঃ ১২৬৭ সাল।

১৩৭। মনঃশিক্ষা—গিরিবর—দাস—হঃ লিঃ ১১৪৮ সন, শ্লোক ৩৫০।

১৩৮। মনসামঙ্গল—জগন্নাথ (বৈদ্য)। খণ্ডিত পুঁথি ; প্রাপ্তাংশের শ্লোকসংখ্যা।

১৩৯। মনসামঙ্গল—জগমোহন মিত্র প্রণীত। শেষাংশে গ্রন্থকার তাঁহার বংশের সুবিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন। আমরা সেই দীর্ঘ বিবরণ এখানে সন্নিবিষ্ট করিবার একান্ত স্থানাভাব স্বীকার করিতেছি। বালাণ্ডার গোহপুরে তাঁহার বংশীয় ব্যক্তিগণ বহুপুরুষ পূর্ব্ব হইতে বাস করিতেছিলেন। কবির পিতার নাম রামচন্দ্র। নিজের নাম সম্বন্ধে কবি সাধু বৈষ্ণবের ন্যায় বিনয় করিয়া লিখিয়াছেন। "নাম রাখিয়াছে সবে শ্রীজগমোহন। অন্ধের যেমন নাম কমললোচন॥" কবি জগমোহন ১৭৬৬ শকে মনসামঙ্গল রচনা করেন ; তিনি নিজে পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া বোধ

হয় ; সাঙ্কেতিক ভাবে পুস্তকরচনার কাল নির্দ্দেশ করিয়া "মূর্খের হইবে দুঃখ সূক্ষ্ম ভাবনায়" বিবেচনা করত মূর্খগণের প্রতি কৃপাপরায়ণতার একশেষ দেখাইয়া নিজের সংস্কৃতের ব্যাখ্যা নিজেই করিয়াছেন। প্রাপ্ত পুঁথির শ্লোকব্যাখ্যা ৬৭০০।

১৪০। মনসামঙ্গল—জীবন চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

১৪১। মাধব-মালতী—দ্বিজরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

১৪২। মুক্তাচরিত্র—নারায়ণ দাস প্রণীত। ১৫৪৬ শকে বিরচিত, হঃ লিঃ ১১০৪ সাল। শ্লোক সংখ্যা ২০০০।

১৪৩। মোহমুদ্গর—পুরুষোত্তম দাস প্রণীত। হঃ লিঃ ১১৯৯ সন।

১৪৪। যম উপাখ্যান—শঙ্কর দাস, হঃ লিঃ ১২৫৩ সাল, শ্লোক ১২৫।

১৪৫। যোগাগম—যুগলদাস—শ্লোক ২২৫।

১৪৬। রতিবিলাস—রসিক দাস প্রণীত, শ্লোক ২৯০।

১৪৭। রতিমঞ্জরী—হঃ লিঃ শকাব্দা ১৬৯০ ; শ্লোক ১০০।

১৪৮। রতিশাস্ত্র—গোপাল দাস প্রণীত, শ্লোক ১৫০।

১৪৯। রত্নমালা—পদ্যসংগ্রহ।

১৫০। রসকদম্ব—কবিবল্লভ প্রণীত। কবিবল্লভের পিতার নাম রাজ-বল্লভ, মাতার নাম বৈষ্ণবী, নরহরি দাস কবির দীক্ষা-গুরু। মুকুটরায় নামক ব্রাহ্মণ বন্ধুর অনুরোধে ১৫২০ শকে তিনি এই কাব্য রচনা করেন। কবিবল্লভের বাসস্থান "করোত জাতির মহাস্থানের সমীপবর্ত্তী আমবাড়া গ্রাম।"—বর্ণনা মধ্যে মধ্যে বেশ সুন্দর—বৈকুণ্ঠ বর্ণনা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল।

"গীতচ্ছন্দে কথা যাতে নৃত্যচ্ছন্দে গতি। সহজ কথনে যাতে বেদের উৎপত্তি॥
না ভোগিলে সর্ব্ব রস ভোগে সর্ব্বজন। না দেখিয়া সর্ব্বরূপ করে নিরীক্ষণ॥
না বলিলে সর্ব্ব কথা বোঝে অনুমানে। না শুনিলে সর্ব্ব ধ্বনি শুনে সর্ব্বজনে॥
না জানিঞা জানে সবে না রমিঞা রমে। মনের সকল কর্ম্ম পূরে বিনিশ্রমে॥

১৫১। রসকল্পসার—নিত্যানন্দ দাস প্রণীত, হঃ লিঃ শক ১৭০১, শ্লোক ৮০।

১৫২। রসভক্তিচন্দ্রিকা—নরোত্তম দাস প্রণীত, শ্লোক ১২৫।

১৫৩। রসসাগর,—কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ্ কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর উপাধি। তৎপ্রণীত বিবিধ উদ্ভট্ কবিতার অন্য কোন সংজ্ঞা না পাইয়া আমরা উহা 'রসসাগর' নামে অভিহিত করিব। রসসাগরের উদ্ভট কবিতাগুলি

তদীয় উপস্থিত বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ রহস্য শক্তির পরিচায়ক। "বড় দুঃখে সুখ," "গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর," "কাট পাথরে প্রভেদ কি ?" প্রভৃতি সমস্যা তাঁহার নিকট উপস্থিত করাতে তিনি নিম্নলিখিতভাবে তাহার পূরণ করিয়াছিলেন—

"বড় দুঃখে সুখ।"

"চক্রবাক চক্রবাকী এক(ই) পিঞ্জরে,
নিশিতে নিষাদ আনি রাখিলেক ঘরে॥
চখা কহে চখী প্রিয়ে এবড় কৌতুক।
বিধি হ'তে ব্যাধ ভাল বড় দুঃখে সুখ॥

"গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।"

"কৃষ্ণের নগর কৃষ্ণনগর বাহির।
বার(ই)য়ারী মা ফেটে হয়েছেন চৌচীর॥
ক্রমে ক্রমে খড় দড়ি হইল বাহির।
গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর॥"

"কাঠ পাথরে প্রভেদ কি ?"

"তোমার চা'ল না চুলো ঢেকি না কুলো
পরের বাড়ী হবিষ্যি।
আমি দীন দুঃখী, নাই লক্ষ্মী,
কতকগুলি কুপুষ্যি॥
আমার কাঠের না', দিলে পা,
না' হবে মোর মুনিষ্যি।
আমি ঘাটে থাকি, বুদ্ধি রাখি,
কাঠপাথরে প্রভেদ কি ?"

১৫৪। রসোজ্জ্বল—জগন্নাথ দাস প্রণীত, শ্লোক ৬৬০, হঃ লিঃ ১২৮৯ সাল।

১৫৫। রসোদ্ধার—প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তৃগণের ৩৬টি পদ সংগ্রহ।

১৫৬। রাগমালা—নরোত্তম দাস প্রণীত, শ্লোক ১৮০। হঃ লিঃ ১১৪৩ সাল।

১৫৭। রাগমার্গলহরী—শ্লোক ১২১।

১৫৮। রাগরত্নাবলী—কৃষ্ণদাস প্রণীত, শ্লোক সংখ্যা ২০০। হঃ লিঃ ১২৪৭ সাল।

১৫৯। রাগরত্নাবলী—মুকুন্দ গোস্বামী।

১৬০। রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব—যত্নুনন্দন দাস বিরচিত, বিদগ্ধমাধবের অনুবাদ। যত্নুনন্দন দাস কৃত অপরাপর পুস্তকের ন্যায় এই পুস্তকেও "শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণী"র প্রতি বন্দনাদি আছে। প্রাপ্ত পুঁথির হঃ লিঃ ১০৯০ সাল।

১৬১। রাধাচৌতিশা—দেবদাস প্রণীত।

১৬২। রাধারাগসূচক—(রঘুনাথ দাস গোস্বামি-কৃত মূলের বঙ্গানুবাদ) রাধাবল্লভ দাস প্রণীত। শ্লোক ৫০; হঃ লিঃ ১২৭৫ সাল।

১৬৩। রামায়ণ—গোবিন্দ দাস প্রণীত। আদি, অযোধ্যা, সুন্দরা, কিষ্কিন্ধ্যা, লঙ্কা, উত্তর কাণ্ড, পাওয়া গিয়াছে। এই কয়েক কাণ্ডের শ্লোকসংখ্যা এইরূপ;—আদি, ১৫০০। অযোধ্যা, ৭৫০। কিষ্কিন্ধ্যা, ১০০০। সুন্দরা, ৩৪০০। লঙ্কা, ৯৯০০। উত্তরকাণ্ড,, ৮৩৫০। গ্রন্থকারের পরিচয় এই—"কুঞ্জবিহারী পিতামহ সিদ্ধ অভিলাষ। তাহার তনয় বটে শোভারাম দাস॥ গাইল গোবিন্দ দাস তাহার অনুজ। কে যাবে বৈকুণ্ঠপুরী শ্রীরামেরে ভজ॥ গোবিন্দ দাসের মন রাম গুণ-নিধি। কি দোষ পাইয়া তবে বাদ সাধে বিধি॥ যে কর সে কর মোরে নিল মুনিরাম। শেষ হৈল পরমায়ু বিধি হৈল বাম॥ শিশু গোবিন্দ দাস গায় রামনাম। আমি কি গাওয়াব মোরে গাওয়ান হে রাম॥"

১৬৪। রামরত্ন-গীতা—ভবানীদাস রচিত হঃ লিঃ ১২৭৫ সাল।

১৬৫। রায়বার—দ্বিজ তুলসী। শ্লোক ১২৫।

১৬৬। রূপমঞ্জরী—কৃষ্ণদাস প্রণীত। শ্রীরূপ গোস্বামীর অন্তর্দ্ধানে বিলাপ। অনুবাদক বৈষ্ণবদাস। হঃ লিঃ ১২৪৪।

১৬৭। লক্ষ্মীব্রত পাঁচালী—শ্লোক সংখ্যা ১০৮। দ্বিজ অভিরাম প্রণীত।

১৬৮। শতস্কন্ধবধ—কৃত্তিবাস—হঃ লিঃ ১২৫০।

১৬৯। শাখাবর্ণন—রসিক দাস।

১৭০। শ্যামানন্দ প্রকাশ—কৃষ্ণদাস—হঃ লিঃ ১২১১ বাং। শ্যামানন্দ পুরীর প্রসঙ্গ।

১৭১। শিবায়ন—রামকৃষ্ণ দাস কবিচন্দ্র*—হঃ লিঃ ১০৯১ সাল।

---

* সম্প্রতি মুকুন্দরামের ভ্রাতা কবিচন্দ্রকে "অযোধ্যারাম" প্রতিপন্ন করিয়া শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতেছেন।

১৭২। শুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদ—হরিচরণ—৯ পত্র খণ্ডিত পুঁথি। গ্রন্থকারের পিতার নাম দাশরথি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম মুনিরাম।

১৭৩। সত্যনারায়ণ—ফকিররাম দাস।—গ্রন্থকারের নামটি যেমন, রচনার ভাষাও সেই প্রকার; যাবনিক ভাষার সংমিশ্রণে সিদ্ধ। সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের সঙ্গে সম্মিলিত। ভাষার নমুনা—"দেখ থাকে পুরাণ কোরাণ থাকে দেখো। জোই রাম রহিম দোনহি হোয়ে একো॥ "ফকির রাম কবিরাজে কয়। যাকু দেখি বড় মঙ্গলময়॥ ইতি সন হাজার সতর জ্যৈষ্ঠ মাসে। সাঙ্গ কৈল পুস্তক ফকিররাম দাসে॥" শ্লোক ৮৫০॥

১৭৪। সত্যনারায়ণ—নরহরি। শ্লোক ১৩৫।

১৭৫। সত্যনারায়ণ—দ্বিজ রামকৃষ্ণ, হঃ লিঃ ১১৪১ সন।

১৭৬। সত্যনারায়ণ—দ্বিজ বিশ্বেশ্বর—শকাব্দা ১৫৩১। শ্লোক ২৬০।

১৭৭। সত্যপীর-কথা—শঙ্করাচার্য্য—হঃ লিঃ ১০৬২ সাল।

১৭৮। সদ্ভাবচন্দ্রিকা—নরোত্তম দাস—খণ্ডিত পুঁথি, শ্লোক ৪৩২।

১৭৯। সনাতন গোস্বামীর সূচক—রাধাবল্লভ দাস—সাল ১২০৬ হঃ লিঃ।

১৮০। সরকার ঠাকুর-শাখা বর্ণন—রামগোপাল দাস।

১৮১। সহজতত্ত্ব—রাধাবল্লভ দাস। হঃ লিঃ ১১৯৫ সাল।

১৮২। স্বরূপবর্ণন—কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

১৮৩। সাধন-লক্ষণ—খণ্ডিত।

১৮৪। সাধন-কথা—গদ্যপুস্তক, হঃ লিঃ ১১৫৮।

১৮৫। সাধনোপায়—মুকুন্দদাস।

১৮৬। সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা—নরোত্তম দাস, শ্লোক ১৮২।

১৮৭। সাধ্যবস্তুসাধন—হঃ লিঃ ১২৫২ সাল, শ্লোক ৩১২।

১৮৮। সারসংগ্রহ—কৃষ্ণদাস কবিরাজ। হঃ লিঃ ১১৮৫ সন।

১৮৯। সারাৎসার কারিকা—হঃ লিঃ ১২৬৬ সাল।

১৯০। সিদ্ধসার—গোপীনাথ দাস, হঃ লিঃ সন ১২৫৫, শ্লোক ১৮০।

১৯১। সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা—রামচন্দ্র দাস, হঃ লিঃ সন ১০৮২ শ্লোক ২৬০।

১৯২। সিদ্ধিনাম—কৃষ্ণদাস কবিরাজ, হঃ লিঃ শকাব্দা ১৭১৮, শ্লোক ১২৫।

১৯৩। সুদামচরিত্র—বিপ্র পরশুরাম, হঃ লিঃ সন ১২৩১ সাল শ্লোক ২০০।

১৯৪। সুধন্বার চৌতিশা—রামানন্দ।

১৯৫। সূর্য্যব্রত পাঁচালী—১৬১১ শকাব্দায় শ্রীরামজীবন কর্ত্তৃক প্রণীত।

১৯৬। স্মরণ-দর্পণ—রামচন্দ্র দাস—হঃ লিঃ সন ১০৮৬, শ্লোক ১৫০।

১৯৭। স্মরণ-মঙ্গল—নরোত্তম দাস—শকাব্দা ১৬৪০ হঃ লিঃ।

১৯৮। স্মরণ-মঙ্গল সূত্র—গিরিধর দাস।

১৯৯। স্বরূপ বর্ণন—কৃষ্ণদাস, গদ্যপদ্যময় পুস্তক হঃ লিঃ সন ১০৮১।

২০০। হংসদূত—নরসিংহ দাস—হঃ লিঃ সন ১২০১।

২০১। হংসদূত—দাস গোস্বামী- হঃ লিঃ সন ১০৭৫, শ্লোক ১০০০।

২০২। হরপার্ব্বতীবিবাহ—তিলকচন্দ্র, হঃ লিঃ সন ১১০৭।

২০৩। হরিনামকবচ—গোপীকৃষ্ণ দাস হঃ লিঃ সন ১১৬৫। শ্লোক ১৫৪।

২০৪। হাটবন্দনা—বলরাম দাস—হঃ লিঃ ১১৭৫। শ্লোক ১২৫।

অনুক্রমণিকা

অ

আ

ক

খ

গ

ঘ

চ

ছ

জ

ট

ঠ

ড

ঢ

ত

দ

ধ

ন

প

ফ

ভ

ম

য

র

ষ

স

হ

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে অভিপ্রায়।

NO. 364 of 1899.

GOVERNMENT OF INDIA,

FINANCE AND COMMERCE DEPARTMENT,

PENSIONS AND GRATUITIES.

To

The Right Hon'ble Lord George Francis Hamilton,

Her Majesty's Secretary of State for India.

Simla, the 26th October, 1899.

MY LORD,

We have the honour to forward, for your Lordship's consideration, a letter from the Government of Bengal, No. 2637—Mis., dated the 21st August, 1899, enclosing a memorial from Babu Dinesh Chandra Sen, B. A., in which he prays for a pension in recognition of his services as the author of a work entitled Bangabhasa-O-Sahitya, a history of the Bengali Language and Literature.

This work has been pronounced by competent authorities to be of considerable original research in the history of the language and literature of Bengal and is the first attempt at a complete history of Bengali literature. The materials on which the work is founded were contained in manuscripts hitherto unknown to students, scattered over many districts of Bengal, and the great labour involved in discovering and collating them has told seriously on the health of Babu Dinesh Chandra Sen.

We consider, that in a country like India, whose scientific literature at the present day consists almost entirely of compilations or translations, the appearance of a meritorious work of original research is deserving of some recognition at the hands of the Government and we accordingly recommend for your

Lordship's sanction, the proposal made by the Government of Bengal that the Babu should be given a pension of Rs. 25 a month, with effect from 1st April, 1899.

We have the honour to be,
My Lord,
Your Lordship's most obedient
& humble Servant,
(Signed) CURZON OF KEDLESTON.
" W. S. A. LOCKHART.
" E. H. H. COLLEN.
" A. C. TREVOR.
" C. M. RIVAZ.
" C. E. DAWKINS.
" T. RALEIGH.

INDIA OFFICE.

London, 21st December 1899.

FINANCIAL.

No. 248.

To

His Excellency the Right Honourable the Governor General of India in Council.

MY LORD,

I have considered in Council your letter of the 26th of October, No. 364, proposing that a special pension of Rs. 25 a month should be granted to Babu Dinesh Chandra Sen.

2. Your recommendation is based on the opinion of competent authorities who consider that a work by Babu Dinesh Chandra Sen entitled *Banga Bhasha O Shahitya* exhibits considerable original research in the history of the language and literature of Bengal. You also state that the labour involved in discovering and collating the manuscripts on which the work is based, has told seriously on the health of the author.

3. Your proposal is sanctioned.

I have, &c.,
(Sd.) GEORGE HAMILTON.

EXTRACTS FROM LETTERS AND REVIEWS.

Mr. H. J. S. Cotton, C. S., C. S. I., Chief Commissioner of Assam, writes under date, March 24, 1897.

"Babu Dinesh Chandra Sen's History of Bengali Language and Literature appears indeed to be a work of great erudition and labour."

Dr. G. A. Grierson, C. S., C. I. E., writes from Simla.

"It is an admirable and original account of Bengali Literature. It must long remain the standard authority on the subject."

Mr. F. H. Skrine, late Commissioner of the Chittagong Division, wrote on the 22nd January 1897.

"The History is a work of profound research and severe thankless toil, which, I deeply regret, has affected your health. I say 'thankless' because it is much to be feared that your countrymen will not evince a proper appreciation of your labour in the interest of culture and knowledge; and unless Government comes to the rescue by purchasing a number of copies of the book for distribution amongst its officers, you are likely to be out of pocket by your disinterested exertions.

The task has not yet advanced beyond a description of the Bengali language in the times before British Rule. The second part, if it appears at all, will not be a satisfactory record of progress. Bengali, as I have said in print, is a true daughter of ancient Sanskrit, and approaches its parent more nearly than any Indian language in the qualities which have rendered Sanskrit so unrivalled a medium for the expression of the highest ranges of human thought. It unites the mellifluousness of Italian with the power possessed by German of rendering complex ideas and I cannot but regret that so little encouragement has been afforded by the State to its cultivation. If a tithe of the pain given by the Bengalis to acquire a smattering of English had been devoted to their mother tongue, they would long since have ceased to merit the reproach of producing little or no original work.

However, this is not their fault but their misfortune. Thanks to the decision arrived at by the influence of Lord Macaulay, Bengali, in common with the other vernaculars, has pined in the cold shade of official disdain. He who seeks to illustrate them receives neither recognition nor praise ; and he cannot look forward to the worldly success which attends a very moderate expertness in the English tongue. * * * Wishing you a speedy recovery and patronage of an enlightened Government."

Later on, Mr. Skrine wrote to Dr. Martin.

"It is an epoch-making book. Babu Dinesh Chandra Sen has entirely broken down by the severe labour entailed by this colossal task."

Extract from a letter from Dr. Martin, Director of Public Instruction, dated 29th November 1897.

"I have the honour to request that you will be so good as to send 70 copies of it (History of Bengali language and literature) to this office, with a bill of cost. You may also circulate a copy of Pandit Hara Prosad Sastri's review of your book to aided colleges and schools of Bengal, with the intimation that in the opinion of this office, the book is deserving of a place in their libraries."

Extract from a letter from Mr. A. Pedler, F. R. S., Director of Public Instruction, dated 2nd March 1899.

"I have the honour to state that I am willing to subscribe to 70 copies of this edition."

"I may add that I fully appreciate the value of the work otherwise I should not be subscribing to the 2nd as well as to the 1st edition."

Luzac's Oriental List says :—

Babu Dines Chunder Sen's "Banga Bhasa and Sahitya" or "Language and Literature of Bengal," divides, as its title indicates, into two parts. The first is a courageous and learned attempt to shew that, as under Bhuddhistic influence, Sanskrit degenerated into loose Prakrit dialects, so with the revival of Hinduism the modern Languages of India recovered much of the dignity and classical correctness of Sanskrit. In this part of his work, the

writer makes copious use of the researches of European scholars, and especially of Dr. Hoernle and Dr. Grierson, which do, in fact, shew that the Bengali and its cognate dialects are the survivals through Prakrit of the speech of the first Aryan invaders of India. The writer, however, in his patriotic zeal, goes further than this, and practically denies the existence of any indigenous influence at all. He traces all Bengali inflections, all Bengali metres to Sanskrit origins, and though he admits the existence of a few words which cannot be traced to Sanskrit originals, he regards these simply as unwelcome intrusions into a literature from verbal expressions. In short, his history is one of literary Bengali which is even more highly sanskritized now than English was latinized in the 18th century. Even if we do not accept all the writer's conclusions, we cannot help seeing how natural it is that so enthusiastic a scholar should recognise the importance of upholding the dignity and value of a literature which has been too little studied even by Bengalis. No student of the modern languages of India can read this part of Babu Dines Chander Sen's work without profit and enjoyment, so obvious is the scholarly zeal with which it is written. The second part of the book is entirely original, and is a record of the author's search for manuscripts of works written before the British occupation of India. We have here a description not only of the standard works of about a hundred authors hitherto forgotten. To the European reader, it is interesting to note that all this is Hindu literature. It was a literature of revolt against Muslim tendencies and has no trace of Mahomedan influence. Some day, Babu Dines Chunder Sen may write, we hope, of Bengali literature under British rule ; a literature broadened and enriched by European culture. In this literature, Babu Dines Chunder Sen's History will itself occupy a high place as an outcome of European methods of scholarship applied to Eastern learning.

Extract from the Calcutta Gazette of March 24, 1897.

"Vangabhasa O Sahitya" is perhaps the most noteworthy book of the year. It is the outcome, as the author says, of six years' patient labour and research. In it the history of the Bengali language and literature has been traced from the earliest times

down to 1858 A. D. The writer has, for the first time, brought to light a number of minor Bengali poems, the discovery whereof will greatly help the cause of linguistic research in Bengal. He has remarkably succeeded in utilising the materials at his command. The book is perhaps the first systematic and accurate treatise on the subject, shewing a great improvement in this respect over its predecessor, the late Pandit Ramgati Nayaratna's book. The chapters of the book on case-suffixes and verbal inflexions in Bengali may be regarded as perhaps the first systematic and the most successful attempt at the solution of a very knotty problem."

The Englishman *devotes two leaders of its two successive issues of the 24th and 25th December, 1897, to the review of the book from which the following short extract is taken :—*

"The work which under the above title (Bangabhasha O Sahitya) has been recently published by Babu Dinesh Chandra Sen, Head Master of the Victoria School at Tipperah, is one of the most valuable contributions to the history and growth of the language and literature of Bengal that have yet appeared, and will have the result of modifying several previously accepted conclusions on the subject. It is based chiefly on researches made throughout Eastern Bengal, with the object of discovering the numerous ancient manuscripts which have long lain hid in the houses of cultivators throughout the rural villages of Eastern Bengal, and whose existence was previously not suspected.

As the book is written in Bengali and its contents will be available to comparatively few European readers, a review of its contents and of the conclusions that it leads to may be found to be of interest. It was in 1892, when engaged in writing a treatise on the origin and growth of the Bengali language, that Babu D. C. Sen happened by chance to come across an ancient manuscript of the poem Mrigalabdha by Rati Deb and on further enquiries he ascertained from reliable sources that there were many such ancient books existing in the villages of Tippera and Chittagong. He thereupon set to work to find out and procure

such as could be got, and visited many rural villages for the purpose. He succeeded in obtaining a certain number and in ascertaining the existence of others, but they were frequently worm-eaten and otherwise ill-preserved and it was sufficiently clear that unless their contents could be preserved by means of printing them, the bulk of this valuable material must be ultimately lost. Mr. Sen consequently wrote for advice to Professor Hœrnlie, from whom he received valuable assistance, and also from Pundit Hara Prashad Shastri under whose advice Pundit Benode Behari Kabyatirtha of the Asiatic Society went to Comilla to assist him in his search and continued to do so from time to time for short periods.

Together, they discovered several further manuscripts, and in the intervals, the author continued his search by himself throughout the villages of Tippera, Noakhali, Sylhet, Dacca and Eastern Bengal generally. He thus collected numerous ancient manuscripts. The task, however, was one of difficulty, as the peasants in whose houses they were to be found, were unwilling to part with them or even to shew them fearing that the enquiry was being made with the object of imposing a tax on the owners of books. Others were unwilling to part with manuscripts that had been in their families for several generations. Babu D. C. Sen, however, persevered in his enquiries in spite of all obstacles and the results of his six years' labours are now incorporated in his History now published. The cost of publishing the work which would have been beyond the author's means has been borne by the Maharaja of Tippera who deserves the thanks of all students of the Bengali language. * * * The thanks of all students of Bengali literature are due to Babu Dinesh Chandra Sen for the labours he has patiently carried on for six years, in the face of many difficulties."

Extract from a lengthy review by Mahamahopadhyaya Pandit Hara Prosad Sastri in the Calcutta University Magazine, *May 1897.*

"The graduates of the Calcutta University are often reproached with renouncing the study of literature as soon as they enter into

the world. In many instances the reproach is well deserved. It is, therefore, with the greatest pleasure that we introduce Babu Dinesh Chandra Sen, B. A., to the notice of our educated countrymen as a gentleman who has done a good deal of original research in the field of Bengali literature. The result of his researches and labours has been embodied in a handy volume entitled 'Bangabhasha O Sahitya' in which he gives a history of Bengali literature which has cast into the shade all previous works on the subject. Indeed, this is the first work on the history of Bengali literature which deserves the name. Many hundreds of volumes of manuscripts, hitherto unknown to the educated public, have not only been brought to light, but classified, arranged and criticised. Different schools of poetry taking their rise at different periods of natural historical cause, and the lives of nearly a hundred authors have been saved from oblivion. The literature of Eastern Bengal was absolutely unknown. Nobody even thought that there were Bengali poets in Dacca, Tipperah and Chittagong who translated the whole of the Ramayan, the Mahabharat and the large number of other works bearing on Hindu religion and traditions, into Bengali. The credit of bringing this vast body of literature to public notice is entirely due to Babu Dinesh Chandra Sen and to him alone."

Extract from an article in the Calcutta Review, *dated October 1897, (the article covers 14 pages of the Journal.)*

'Bangabhasa O Shahitya' is the title of a Bengali work by Babu Dinesh Chandra Sen, B. A., Head Master of the Victoria School, Comilla, on the history of Bengali language and literature. It is a neat, handy volume running through 403 octavo pages, replete with information of the highest value to students who take any interest in the past of Bengali .aces or in their literature. * * * An active search for Bengali manuscripts began in various quarters, led by that admirably useful body of learned men, the Asiatic Society of Bengal. Many private individuals a'so devoted themselves to the work. The Bangiya Sahitya Parishad or Bengal Academy of Literature was started with this

as one of its special objects. But by tacit consent it was agreed that one scholar should be entrusted with the work of compiling and digesting the information already collected, and Babu Dinesh Chandra, whose enthusiasm and earnestness in the matter was an object of admiration to all concerned, took it up. Every one helped him with the result of his researches. For the first time in the history of Bengali literature, all jealousy, obstructionism and petty feelings were set aside to enable him to produce a great work. Whoever reads Dinesh Babu's preface with care will be struck with the modest, yet straightforward, dignified, yet grateful, acknowledgment of the services he has received from his collaborators. * * * He had to collect MSS. either himself or through friends, to read them, to classify them, and to digest them. The remoteness of his residence, in an out-of-the-way corner of Bengal, was a great drawback to him. It entailed a great deal of correspondence on him, and the progress of his work was often hindered by the dilatoriness of correspondents. But he has surmounted all those and other difficulties, and is now before the public. The public, in its turn, has received him kindly and his work is appreciated. * * * In the matter of Eastern poets, Babu Dinesh Chandra deserves the credit of a discoverer. He has laid bare one stratum of thought, and one phase of authorship, the value of which cannot be over-rated. His services in respect of Vaishnava literature, too, are very great."

Mr. A. C. Sen, M. A., C. S., District and Sessions Judge, Rangpur, writes referring to the illness of the author caused by his labours in compiling the work—

"It is no exaggeration to say that the great work is both his monument and epitaph."

Mr. B. C. Mitra, M. A., C. S., District and Sessions Judge, Cuttack, writes—

"I can say with the utmost confidence that it is a work which will ensure the permanence of your name and loving labour in the

annals of Bengali literature. I am thinking, as soon as I am permitted time, of writing a review of it. For the present, I will content myself with saying that it is a book of the merits and usefulness of which I entertain the very highest opinion. In wealth of details, it rivals Morley's First Sketch ; in power of graphic language, it rivals Taine ; in subtlety of critical analysis, it rivals Dowden. Your close study of the earliest classics in Bengali has been helpful in investing your language with a delicacy, a refinement, a directness which relieves and vivifies the minutiæ of details that your industrious research has brought to light, I think, for the first time. I anxiously await the publication of your second volume, and earnestly wish that you will soon recover health and spirits for that undertaking.

Mr. K. C. De, B. A., C. S., Magistrate and Collector of Faridpur, writes—

"I have made time to read through almost the whole of your book with great interest and not inconsiderable profit to myself."

Raja Benoy Krishna Bahadur of Sobhabazar, Calcutta, writes—

"You have dealt with the subject in a manner which has extorted admiration and appreciation from every quarter. Babu Hirendra Nath Dutt, M. A., B. L., Rai Jotindra Nath Choudhury, M. A., B. L., Babu Mano Mohan Bosu and several others who have had opportunities of reading your book, speak very favourably of your efforts. Indeed every one speaks in high terms of your very creditable performance. Although one or two gentlemen differ with you on certain points but none the less they appreciate your work and your precious labour. The language of the book is all that can be desired. It now remains for me to congratulate you most sincerely on the celebrated work you have published in Bengali language. Every Bengali gentleman is grateful to you for the rich and splendid production from your pen."

Extract from the half-yearly report of the Peace Association, Calcutta, for 1897.

Babu Dinesh Chandra Sen has published his book "বঙ্গভাষা ও

সাহিত্য' and a copy of it has been presented to the Association. Babu Dinesh Chandra was the first Vidyasagar medalist of the Association and he says in the preface to his book that the Vidyasagar medal gave him the incentive for its composition. 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' has been enthusiastically received by the public and has been declared to be an epoch-making book in Bengali literature. The members congratulate themselves on having a hand in the production of the work. Concerned as they are to learn that the pressure of work entailed by the composition of the book has shattered the author's health, they pray to God that he may soon be restored to health."

Extract from a circular from the late Babu Dinanath Sen, Inspector of Schools, Eastern Circle, to the Head Masters of High English Schools under him, dated Dacca, the 8th March, 1897.

"A very important book on the History of the Bengali language and literature has been published by Babu Dinesh Chandra Sen, Head Master of the Victoria School at Comilla. It is desirable that a copy of the book should be kept in the library of each school in which Bengali is taught and which may have funds to buy it * * *"

The late Hon'ble Babu Guru Prasad Sen, pleader of Bankipur, wrote—

"Now permit me to say that yours was the best book I read for many a year in Bengali and I at once came to be an admirer of the author and since then knowing that you are a Vaidya and of the same section to which I have the honour to belong and you belong to East Bengal there has grown in me a sort of, I hope, permissible pride in your work."

Rai Sarat Chandra Das Bahadur, C. I. E., writes—

"I have read your excellent work with keen interest. I should like to buy a copy of it. From the contents of the first volume one can draw a good deal of information for the interest of European scholars.

Extract from an article by Babu Ramananda Chatterji, M. A., Principal, Kayastha College, Allahabad, in the 'Pradip,' Phalgun 1305 B. S. The article covers 10 columns of the Journal.

"তিনি এরূপ একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, যাহা বঙ্গভাষায় অদ্বিতীয়। এই পুস্তকে যেমন তাঁহার পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণ সমালোচনা শক্তি, তেমনি তাঁহার গুণগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ভাষার মনোহারিত্ব, রচনানৈপুণ্য ও শিল্পীর মত নানা বিষয়ের যথাস্থানে সমাবেশ সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আমরা পাঠদ্দশায় যেরূপ আনন্দ ও আগ্রহের সহিত Taine প্রণীত ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস পড়িয়াছিলাম, দীনেশ বাবুর গ্রন্থও আদ্যোপান্ত প্রায় সেইরূপ আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি।"

Pandit Shivnath Shastri, M. A., makes the following incidental remark about the book in an article entitled "জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় উদ্দীপনা।"—

আমরা যদি অকপটচিত্তে আত্মোন্নতি ও স্বদেশের উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করি, তাহা হইলে সাহিত্য আপনি গড়িয়া উঠিবে। দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিবৃত্ত খানি এরূপ সর্ব্বজনপ্রশংসিত গ্রন্থ কেন? এই এক জন মানুষ যিনি অকপটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, একবার দেখিব আমাদের জাতীয় সাহিত্য কি ছিল? তিনি যথার্থই সাহিত্যের মর্ম্মগ্রাহী। এই এক খানি গ্রন্থ, যাহার জন্য আমরা গৌরব করিতে পারি, যাহা অপর জাতিরা অনুবাদ করিয়া কিছু নূতন শিখিতে পারে। গ্রন্থের প্রণেতা মানুষটিকে দেখি নাই, তাঁহার সঙ্গে পরিচয় নাই। কিন্তু তাঁহার অকপট স্বজাতি-প্রেম স্বতঃই হৃদয়ের প্রীতি শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করিয়াছে, কিন্তু প্রশ্ন এই, ইনি যেমন এক বিভাগে বহুশ্রম করিয়া রত্ন উদ্ধার করিয়াছেন, তেমনি অপরাপর বিভাগে কি অকপট শ্রম করিবার অবসর নাই?"

From a long review by Babu Rabindra Nath Tagore in the celebrated magazine Bharati, Baishak, 1305 B. S.

শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" এই শ্রেণীর বাঙ্গালা পুস্তকের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। রোগ-শয্যাশায়ী লেখক মহাশয় সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য উৎসুক হইয়াছেন।

Extracts from a review by Babu Hirendra Nath Dutt, M. A., B. L., Prem Chand Roy Chand Scholar, in the leading Bengali Journal Sahitya of Ashar, 1304 B. S. The article covers 12 pages of the journal.

* * * গ্রন্থখানি অতি অপূর্ব্ব ও উপাদেয় হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ গ্রন্থ সম্পূর্ণ নূতন জিনিস। এরূপ গ্রন্থ রচনার জন্য যে শ্রম, আয়াস, ঐকান্তিকতা ও অধ্যবসায় আবশ্যক, বাঙ্গালীতে তাহা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। * * * বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক জটিল, দুর্ব্বোধ্য, গুরুতর সমস্যার মীমাংসা আমরা দীনেশ বাবুর গ্রন্থে পাইয়াছি। * * * গ্রন্থ পাঠ সমাপন করিবার পূর্ব্বেই হৃদয়ে একটা বিস্ময়ের উদ্ভব হয়। একজন মানুষ নিজের যত্ন, উদ্যম ও অধ্যবসায়ে কতটা সম্পন্ন করিয়াছেন! অন্যান্য দেশে এরূপ বিষয়ে শ্রমবিভাগের নিয়ম আছে। এক শ্রেণীর লোক প্রাচীন পুঁথি পুস্তকাদি সংগ্রহ করেন। আর এক শ্রেণীর লোক (ইঁহারা বৈয়াকরণ) সংগৃহীত পুস্তকাদির আলোচনা করিয়া ভাষার ইতিহাস ও ব্যাকরণ সঙ্কলন করেন। আর এক শ্রেণীর লোক (ইঁহারা আভিধানিক) প্রাচীন শব্দাদির সংগ্রহ ও তাহাদিগের অর্থাদির মেলন করিয়া ঐতিহাসিক ক্রমানুযায়ী অভিধান প্রণয়নের ব্যবস্থা করেন। আর এক শ্রেণীর লোক (ইঁহারা ঐতিহাসিক) প্রাচীন সাহিত্যের দর্পণে প্রতিফলিত সমাজ-চিত্রের প্রতিলিপি আঁকিয়া জাতীয় ইতিহাস রচনার পথ সুগম করিয়া দেন। সর্ব্বশেষে সাহিত্য-সমালোচক পূর্ব্বোক্ত সকলের শ্রমফল স্বায়ত্ত করিয়া সাহিত্যের সমালোচনা সম্বলিত ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করেন। দীনেশ বাবুকে পুস্তক প্রণয়ন জন্য এতগুলি কার্য্য প্রায় এককই করিতে হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সংগ্রাহক, সমালোচক, ইতিবৃত্ত-লেখক প্রভৃতির নিকট তিনি যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রন্থের ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন বটে; কিন্তু সকল কথা ভাবিয়া দেখিলে ঐ সাহায্য বড় বেশী বলিয়া বোধ হইবে না। সেই জন্য "প্রায় একক" বলিলাম। গ্রন্থরচনার ও সঙ্কলনের বিপুল আয়াসে স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া গ্রন্থকারের জীবন সংশয় ঘটিয়াছিল। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি অচিরকাল মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া আবার বর্দ্ধিত প্রযত্নে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবায় ব্রতী হউন।

Babu Ramendra Sunder Tribedi, M. A., Prem Chand Roy Chand Scholar, writes—

"আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ নাই, কিন্তু আপনার লিখিত

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পাঠ করিয়া যে আনন্দ লাভ করিলাম, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অবশ্যকর্ত্তব্য বোধে এই পত্র লিখিতে সাহসী হইলাম। বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য আপনার যত্ন, উদ্যম ও পরিশ্রমের পরিচয় পাইয়া আমি নিতান্তই মুগ্ধ হইয়াছি এবং আপনি যে সাহিত্যানুরাগ ও শ্রমশীলতা দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য আপনার আদর্শ সর্ব্বথা অনুকরণযোগ্য হইবে। বাক্‌সর্ব্বস্ব বাঙ্গালী সমাজে আপনি প্রকৃত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কর্ম্মবীরের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। এজন্য বঙ্গদেশে আপনার কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। * * * বঙ্গের সাহিত্যই অধম বাঙ্গালী জাতির একমাত্র গৌরবের সামগ্রী। আপনি সুধী সমাজে সেই সাহিত্যের উদ্ধারসাধন করিয়া সমুদায় বাঙ্গালী জাতিকে ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।"

From a review by Babu Khirod Chandra Ray Choudhury, M. A., Headmaster, Hoogly Collegiate School, in the Nabyabharat of Chaitra, 1304 B. S. :—

"ছয় বৎসর পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থকার এ পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। পুস্তকে প্রাচীন সাহিত্যের সমালোচনা করা হইয়াছে। ছয় বৎসরেও যে মফঃস্বলে বসিয়া প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস সংগ্রহ করা যাইতে পারে ইহা কেবল অসীম ধৈর্য্য, একান্ত অনুরাগ, অবিরাম পরিশ্রম ও অটল অধ্যবসায়ের নিদর্শন। কিন্তু শুনিয়া আমরা ত্রাসিত হইয়াছি, তিনি শয্যাগত হইয়াছেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্গভাষার ইতিহাসের বীজ বপন করেন। সেই বীজ হইতে দীনেশ বাবুর এই প্রকাণ্ড কাণ্ড। * * * এই গ্রন্থগুণে দীনেশ বাবু অমরত্ব লাভ করিবেন। বীজ ও প্রফুল্ল কুসুমে যত প্রভেদ, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের গ্রন্থে ও দীনেশচন্দ্র সেনের গ্রন্থে তত প্রভেদ।"

Rai Kali Prasanna Ghosh Bahadur, of Dacca, writes—

"তোমার গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে দর্শনীয় বস্তুরূপ হইয়াছে। তুমি এই একই গ্রন্থের রচনা দ্বারা প্রবীণ পদবাচ্য হইয়াছ। গ্রন্থ সম্বন্ধে আমি শত লোকের কাছে শত কথা বলিব এবং শত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। আমার সেই বলা ও করা শুধু আত্মপ্রীত্যর্থে। কারণ, তোমার গ্রন্থ এমন নয় যে, তাহা পরের প্রশংসা অপেক্ষা করে।"

Babu Nagendra Nath Basu, I · of Vishwakosha, writes :—

* * "আপনি যে রত্ন সাহিত্য জগতে প্রকাশ করিলেন, ইহাতে বঙ্গভাষা প্রকৃত যশস্বিনী হইবেন।" * * *

From a long article in the Hitabadi of 1st Aswin, 1305 B. S.

"তিনি নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া অশেষ যত্নে যে সকল তত্ত্বের সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি স্বরূপ থাকিবে। কিন্তু এ দেশের সাহিত্যচর্চ্চা যেরূপ নিম্ন-স্তরে আবদ্ধ তাহাতে কয়জন এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের যথাযোগ্য সমাদর করিবেন বলিতে পারি না।"

From a review in the Sanjibani of 3rd Aswin, 1304 B. S. The article occupies nearly 3 columns of the paper.

"স্বদেশের সুসন্তান সাহিত্যসেবী পরমকৃতী শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন (বঙ্গভাষা সম্বন্ধীয় প্রশ্নের) উত্তর দানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অগ্রসর হইয়াছেন। স্বদেশপ্রেমিক মাত্র তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া গ্রহণ করুন। স্বদেশের কাহিনী অতি সামান্য হইলেও যাঁহার পক্ষে অতি মধুময়, স্বদেশের ভাষা অতি নীরস ও কটু হইলেও যাঁহার পক্ষে সুধাসিঞ্চিত, স্বদেশের ভাষা শীর্ণা দীনা হইলেও যাঁহার চক্ষে পূর্ণকান্তি প্রীতিপ্রফুল্লা,—তিনি দীনেশ বাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় এ পুস্তক পাঠ করুন,—পরিতৃপ্ত হইবেন। দেখিবেন, গ্রন্থকার কত কঠোর পরিশ্রম করিয়া, অশেষ ত্যাগ স্বীকার করিয়া, বহু-দিনব্যাপী অধ্যবসায়বলে এ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। দেখিবেন,—তিমিরাবৃত খনিগর্ভ হইতে কি অম্লান জ্যোতি মণিরাজি সংগ্রহ করিয়া বঙ্গমাতার কণ্ঠে কি অপূর্ব্ব হার লাইয়া দিয়াছেন। বিশাল কাননে নানা পুষ্প হইতে মকরন্দ সঞ্চয় করিয়া কি অপূর্ব্ব মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন।"

From an article in the Janmabhumi, Kartic, 1304 B. S.

"কি অসাধারণ পরিশ্রম ও অপূর্ব্ব সংগ্রহের সহিত তিনি এই মহাগ্রন্থের সঙ্কলন করিয়াছেন ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।"

From an article in the Dainick, 30th Agrahayan, 1304 B. S.

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" এই একমাত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া দীনেশচন্দ্র বাবু সাহিত্য-সংসারে অমরত্ব লাভ করিতে চলিলেন।"

From an article in the Anusandhan, 31st Bhadra, 1304 B. S.

"বলিতে কি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বঙ্গসাহিত্য জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, দীনেশ বাবু মাতৃভাষার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।"